সুন্দরবনের ইতিহাস

প্রথম খণ্ড

—সুন্দরবন

অতীত ও বর্তমান

(২)

তথ্যবহুল বিদ্যালয়ের সংকলিত হইয়াছে। বহুবর্ষ
ইহাতে গ্রন্থকারের বহুল পরিশ্রম প্রকাশিত হইয়াছে।
আমি ইহার মধ্যে যে অংশ ও অবলোকন করিয়াছি,
ভরসা করি সকল পাঠকই বিশেষ লাভ করিবেন।
পুস্তকের ভাষা সুললিত হয়, বিচার প্রায় নিরপেক্ষ।
আশা করি তাঁহার এই পুস্তকখানি বাঙলা সাহিত্যে
এবং বিশেষ ভাবে ইতিহাসরসিক পাঠকদের সমাদৃত
হইবে। আমি গ্রন্থকারের স্বাস্থ্যসহিত দীর্ঘজীবন
কামনা করি। ইতি

শুভার্থী শ্রীরবীন্দ্রনাথ

লেখকের কথা

অধ্যাপক ও গবেষকদের পক্ষে ঐতিহাসিক গ্রন্থ প্রণয়নে যে সুযোগ সুবিধা আমার পক্ষে ইহার বহু অন্তরায় ছিল। রাজধানী ও বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরিবেশ ও গবেষণার ক্ষেত্র আমার পক্ষে সীমাবদ্ধ। প্রতিকূল পরিবেশের আওতায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমাকে কার্য করিতে হইয়াছে। তবে আঞ্চলিক ইতিহাস প্রণয়নে বাস্তব অভিজ্ঞতা লইয়া চাক্ষুষ প্রমাণ পাইয়া সবিস্তারে জানিয়া শুনিয়া গবেষণা ও অনুসন্ধান কার্যের যথাসম্ভব সুযোগ সুবিধা লাভ করিয়াছি। ঢাকা, কলিকাতা ও অন্যান্য স্থানের বহু প্রামাণ্য গ্রন্থ ও দলিলপত্রের সাহায্য গ্রহণ করিতে বহুল পরিশ্রম ও সময় ব্যয়িত হইয়াছে। আমার কর্মব্যস্ত জীবনের সাধনা ও দীর্ঘ দিনের আকাঙ্খার ফল এই সুন্দরবনের ইতিহাস। যশোর, খুলনা, বাকেরগঞ্জ ও আধুনিক সুন্দরবনের ইতিবৃত্ত প্রদত্ত হইয়াছে এই গ্রন্থে।

আঞ্চলিক ইতিহাস লেখার সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণবঙ্গ তথা সমগ্র প্রাচীন বঙ্গের সংশ্লিষ্ট ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ সন্নিবেশিত হইয়াছে। পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিটি জিলার কিছু না কিছু তথ্য প্রসঙ্গক্রমে আসিয়া পড়ায় উহার বিবরণী লিপিবদ্ধ করিতে হইয়াছে। সেদিক দিয়া এই গ্রন্থ পূর্বপাকিস্তানের ইতিহাসও বটে।

গ্রন্থ প্রণয়নে আমি আমার পূর্বসূরীদের মামুলী বা গতানুগতিক পন্থা অবলম্বন করি নাই। আমাদের দেশের প্রকৃত ইতিহাস ভূয়া প্রবাদ ও কু-সংস্কারের স্তূপীকৃত আবর্জনারাশির তলে চাপা পড়িয়া গিয়াছে। উহার উদ্ধার সাধন এক সুকঠিন কাজ। সেজন্য আমাকে অমানুষিক পরিশ্রম, কঠোর সাধনা এবং প্রভূত আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছে। খানজাহান, হোসেন শাহ্, গাজী কালু-চম্পাবতী,

যবন হরিদাস প্রভৃতি প্রাচীন বঙ্গের কয়েকটি জটিল অধ্যায়ের ইতিহাস প্রণয়নে পর্বত প্রমাণ তুষরাশির মধ্য হইতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণার মাধ্যমে তণ্ডুলকণার ন্যায় যৎসামান্য ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছি। কুসংস্কারের পুঞ্জীভূত আবর্জনারাশির তলদেশ হইতে বহু অলীক ও অলৌকিক এবং অসত্য ও অনৈতিহাসিক ঘটনাবলীকে স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে যুক্তিতর্কের কষ্টিপাথরে যাচাই করিয়া ঐতিহাসিক তত্ত্বোদ্ঘাটন করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছি। প্রক্ষিপ্ত বিষয় সমূহের সমন্বয় সাধনে চেষ্টার ত্রুটি করি নাই।

অনুসন্ধান ও গবেষণার ভিত্তিতে যে সমস্ত বিষয়ের সঠিক সন্ধান দেওয়া অসম্ভব এবং যাহা সন্দেহের দোলায় দোদুল্যমান উহার সমাধানের জন্য আমাকে গবেষণার আনুমানিক ফলাফলের উপর নির্ভর করিয়া নিজস্ব মত সন্নিবেশ করিতে হইয়াছে। যথাসম্ভব আধুনিক ও শেষ গবেষণার ফলাফল সর্বত্র সংযোজিত করিয়াছি। ইতিহাস দর্শনে কতটুকু সত্য আর কতখানি অসত্য সর্বক্ষেত্রে তাহা বলা সম্ভবপর নহে। সূক্ষ্ম দার্শনিক যুক্তি, নিরপেক্ষতা, কুসংস্কার বর্জন ও বাস্তবধর্মী পন্থা অবলম্বনই জটিল সমস্যা সমাধানের মাপকাঠি।

সুফী দরবেশদের জীবনী লিখিতে গিয়া আমাকে বহু সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। তাঁহাদের পুণ্য স্মৃতির সহিত বিজড়িত অসংখ্য উদ্ভট স্বেচ্ছা-কাহিনী, অসত্য ও ভূয়া কিংবদন্তীসমূহ এড়াইয়া যাইতে প্রয়াস পাইয়াছি। নিরপেক্ষতা ও ন্যায়ের তুলাদণ্ডে সত্যোদ্ঘাটন করিতে ত্রুটি করি নাই।

স্থানিক পুরাতত্ত্ব ও সুন্দরবনের রহস্যোদ্ঘাটনের জন্য সদলবলে বহুবার সুন্দরবন ভ্রমণ করিতে হইয়াছে। সমুদ্র ভ্রমণ, গভীর জঙ্গলস্থ পুরাকালীন ভগ্ন অট্টালিকা, বসত বাটীর ভগ্নাবশেষ, দীঘিকা, রাস্তাঘাট, নেমকখালাড়ী, মৎস্য সংগ্রহ কেন্দ্র প্রভৃতি পরিদর্শন করিয়া গ্রন্থের

উপকরণ সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। বন ভ্রমণে দুর্গম ও ভয়সঙ্কুল স্থান-সমূহ পরিদর্শনের আকর্ষণ ছিল অত্যধিক। নদনদী বিধৌত বিশ্বের এহেন মনোরম ও রহস্যঘেরা জনমানবহীন জঙ্গলে পরিভ্রমণ করিতে কতইনা আনন্দ উপভোগ করিয়াছি। মটরলঞ্চ ও নৌকাযোগে ভ্রমণ ব্যাপদেশে কবি, সাহিত্যক, শিল্পী, দুর্জয় ব্যাঘ্র শিকারী, বনাঞ্চলের অভিজ্ঞ ব্যক্তি, পদস্থ কর্মচারী, বহু বন্ধুবান্ধব ও শুভানুধ্যায়ীর সাহায্য লাভ করিয়াছি। কোন কোন সময় সপ্তাহাধিক কাল সুন্দরবনস্থ নদীতে নৌকাপরি অবস্থান করিয়া গ্রন্থের উপকরণ সংগ্রহে লিপ্ত রহিয়াছি। গ্রন্থ প্রণয়নে নিভৃতে যে সাধনা করিয়াছি তাহাতে কতটা কৃতকার্য হইয়াছি সুধী পাঠকগণ তাহার বিচার করিবেন।

পূর্ব পাকিস্তানের কোন প্রামাণ্য ইতিহাস আজ পর্যন্ত লিখিত হয় নাই। এ বিষয় কতটুকু প্রচেষ্টা চলিয়াছে জানি না। সরকার হইতে ইতিপূর্বে বিভিন্ন জেলার গেজেটিয়ার প্রণয়নে যে প্রচেষ্টা চলিয়াছিল উহা এখনও অসম্পূর্ণ। পূর্ব পাকিস্তানের শহরাঞ্চলের ইতিহাস সরকারী তত্ত্বাবধানে প্রকাশের পথে। খুলনা শহরের এইরূপ একখানি ইতিহাস আমাকে লিখিয়া দিতে হইয়াছে। আদমশুমারী রিপোর্ট, গেজেটিয়ার, সুন্দরবনের চলচ্চিত্র গ্রহণ প্রভৃতি ব্যাপারে আমার সীমাবদ্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়াছে।

স্বদেশ ও স্বজাতির গৌরব গাঁথা তথা পৌরাণিক কথা ও কাহিনী লিপিবদ্ধ করিতে যে কত আনন্দ ভাষার মাধ্যমে উহার প্রকাশ সম্ভব নহে। প্রাচীন ইতিহাসের উদ্ধার সাধন সুকঠিন দায়িত্ব, কিন্তু আনন্দ বিপুল। ঐতিহাসিক তথ্য লিখিতে যে অনাবিল আনন্দ লাভ করিয়াছি তাহা বলাই বাহুল্য। আরব কবির নিম্নোক্ত বর্ণনায় তাহা সুন্দরভাবে প্রস্ফুটিত হইয়াছে;

"পূর্ণ নহে মন যার ইতিহাস—জ্ঞানে
জীবনের তিক্ত হ'তে মিষ্ট নাহি জানে ;
অতীত কাহিনী মালা গাঁথে যে যতনে
নব নব জন্ম সেই লভে এ জীবনে।"

নিত্য নূতন পরিবেশ সৃষ্টিই এ বিশ্বের লীলাখেলা। প্রাচীন কালে কেমন ছিল, বর্তমানের রূপই বা কী ? সৃষ্টির এই বৈচিত্র্যময় ক্রমবিকাশ জানার আকাঙ্খা মানব মনে চিরন্তন। অতীত ইতিহাস ও ঐতিহ্যের আলোচনায় প্রত্যেকটি জাতি গর্বানুভব করে। পূর্ব পাকিস্তানের ঐতিহ্য ও লোক সাহিত্য এক অমূল্য সম্পদ। বিশ্বের লোক-বিজ্ঞান ক্ষেত্রে ইহার সমাদর আছে। লোক-সাহিত্য ও ইতিহাসের সম্পর্ক সুনিবিড়। লোক সাহিত্যের মধ্যে লুক্কায়িত আছে অগণিত ঐতিহাসিক তথ্য। সেই জন্য যথাস্থানে উহার উপযুক্ত সদ্ব্যবহার করিতে ত্রুটি করি নাই। প্রাচীন বঙ্গের লোক গাঁথা যে ভাবে রচিত আমি হুবহু সেই-ভাবেই তুলিয়া ধরিয়াছি।

সুন্দরবনের ভৌগোলিক ভূ-তাত্বিক, বিজ্ঞান-ভিত্তিক ও প্রত্নতাত্বিক বিষয় প্রথম খণ্ডে বিধৃত হইয়াছে। ভয়সঙ্কুল জঙ্গল, ভয়ঙ্কর জীবজন্তু, "ডাঙ্গায় বাঘ—জলে কুমীর" জলদস্যুর ভীতি,মগ-পর্তুগীজ অত্যাচারের মর্মন্তুদ কাহিনী,' বরিশাল কামান' অতলস্পর্শ, প্রলয় ঝটিকা ও জলোচ্ছ্বাস নীরব, নিথর অরণ্যসঙ্কুল স্থানে মানুষের আনন্দ ও অসহায়তার তথ্যবহুল বিবরণী সন্নিবেশিত হইয়াছে এই খণ্ডে। এই সঙ্গে আলোচিত হইয়াছে বনাঞ্চলের অধিবাসীদের অভিনব জীবনালেখ্য এবং বাঘে মানুষে যুদ্ধের লোমহর্ষক কাহিনী।

গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে দেশ শাসন, শাসক সমাজ এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস বিবৃত হইয়াছে। যশোর, খুলনা ও বাকেরগঞ্জ জিলাত্রয়ের নিজস্ব ইতিহাসও বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে প্রাচীনকালীন

বসতি ও সমাজ. বঙ্গের আদি ইতিহাসের টুকিটাকি, পরবর্তী যুগে ইসলাম প্রচার, ভাষা ও সাহিত্যের আলোচনা স্থান পাইয়াছে।

বাংগালী জাতীয়তাবাদের স্রষ্টা তুর্ক আফগান শাসক গোষ্ঠি এবং বঙ্গভাষার পথিকৃত তাঁহারাই। বঙ্গভাষার জন্ম হয় এই পূর্বপাকে— হাজার বৎসর পূর্বে। বর্তমানের পশ্চিম বঙ্গ ছিল রাঢ় দেশ, প্রাচীন বঙ্গের অংশবিশেষ নহে। সেজন্য এতদুভয়ের ঐতিহ্য ও কৃষ্টি পৃথক। এই নীতিগত পার্থক্যের বিষয় যথাস্থানে আলোচিত হইয়াছে।

সুদীর্ঘ দ্বাদশ বর্ষের উর্দ্ধকাল চাক্ষুষ প্রমাণের ভিত্তিতে গ্রন্থের উপকরণ সংগ্রহের জন্য এতদঞ্চলের ঐতিহাসিক স্থানসমূহে ব্যাপকভাবে পরিভ্রমণ করিয়া বহু অনাবিষ্কৃত ও অনুদ্ঘাটিত তথ্যের সন্ধান পাইয়াছি। আজীবন সঞ্চিত অভিজ্ঞতা ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া সেই সমস্ত যথাস্থানে সংযোজন করিতে চেষ্টা পাইয়াছি। বহু ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী লেখকদের ত্রুটিপূর্ণ বর্ণনার সমালোচনা করিয়া নিজস্ব অভিমত ব্যক্ত করিতে হইয়াছে। সমস্ত সিদ্ধান্ত যে নির্ভুল সে কথা বলার ধৃষ্টতা আমার নাই। আমার লেখনীর মধ্যে সম্ভাব্য ভুলত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। ভবিষ্যতে সুধীবৃন্দের সমালোচনা, সংশোধনী ও সংযোজনা সানন্দে গৃহীত হইবে।

কোন কোন ঐতিহাসিক বিষয়বস্তুর সন্দেহ নিরসন করিতে এবং সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে দিনের পর দিন ধৈর্যের সহিত অপেক্ষা করিতে হইয়াছে। ভাষা ও সাহিত্য অপেক্ষা সঠিক ঐতিহাসিক তথ্যের দিকে অধিকতর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াছি। নিরস বিষয়বস্তুকে সরস করিয়া প্রকাশ করিতে ত্রুটি করি নাই।

গ্রন্থের নাম কেন সুন্দরবনের ইতিহাস রাখিয়াছি সে সম্পর্কে আমার বক্তব্য এই যে, যশোর, খুলনা ও বাকেরগঞ্জ অঞ্চল এক অতি অজানা প্রাচীন কালে বঙ্গোপসাগরের তরঙ্গাভিঘাতের মধ্যে বিলীন

ছিল। গঙ্গার পলি দ্বারা সৃষ্টি হইয়াছিল অসংখ্য চর ও দ্বীপ এবং স্বাভাবিকভাবেই সেই সমস্ত স্থানে সৃষ্টি হইয়াছিল গহীন অরণ্য বা সুন্দরবন। দ্বিগ্বিজয় প্রকাশ নামক গ্রন্থে দেখা যায়; "উপবঙ্গে যশোরাদ্যাঃ দেশঃ কানন সংযুক্তাঃ" অর্থাৎ উপবঙ্গের যশোরাঞ্চল ছিল জঙ্গলাবৃত দেশ। প্রাচীনকালে সমুদ্র তটবর্তী জঙ্গলাকীর্ণ গাঙ্গেয় বদ্বীপ ব্যাঘ্রের আনাগোনায় ভরপুর ছিল। তন্নিমিত্ত উহার নাম হইয়াছিল ব্যাঘ্রতটি (Tiger Coast)। বাকেরগঞ্জ জিলার কাটিযুক্ত নাম সমূহ (ঝালকাটি, ঘাঘরকাটি ইত্যাদি) জঙ্গলের পরিচয় বহন করে। ঈদৃশ নানা কারণে যশোর, খুলনা, বাকেরগঞ্জ এবং বর্তমান সুন্দরবনের পারস্পরিক সম্পর্ক নিবিড় এবং উহার আদি ইতিহাস এক ও অভিন্ন। তন্নিমিত্ত গ্রন্থের এইরূপ নামকরণ করিয়াছি।

বিচিত্র ধরণের ছবির সমাবেশ গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য। ভ্রমণ ব্যাপদেশে ক্যামেরার সাহায্যে আমাকে অসংখ্য ছবি গ্রহণ করিতে হইয়াছে। ঐতিহাসিক বিবরণের পাশাপাশি চিত্রের সমাবেশ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। দ্রুততার জন্য আরও কয়েকটি মানচিত্র ও ছবি দেওয়া সম্ভব হইল না।

কয়েক বৎসর যাবৎ গ্রন্থের প্রকাশনা লইয়া নানারূপ অসুবিধার সম্মুখীন হইয়াছি। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হইতেও প্রকাশের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নাই। খুলনা শহরে মুদ্রণ শিল্পের অনগ্রসরতা, ছাপাখানার অপ্রতুলতা প্রভৃতি কারণে এবম্বিধ গ্রন্থের প্রকাশনা একরূপ অসম্ভব। চুক্তিপত্র সত্ত্বেও একাধিক ছাপাখানা এ বিষয়ে ব্যর্থকাম হইয়াছে। শুধু ছাপা নহে আনুষঙ্গিক ব্যাপারেও আমাকে নানা অসুবিধার মধ্যে গ্রন্থের মুদ্রণ কার্য শেষ করিতে হইয়াছে। লেখক হওয়ার দুর্ভোগ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়াছি। এতদসত্ত্বেও যোসেফ প্রেসের ব্রাদার রোম্বী ও তাঁহার সহকর্মীদের আপ্রাণ চেষ্টার জন্য

গ্রন্থখানির প্রকাশ কোন প্রকারে সম্ভব হইয়াছে। আমি তাঁহাদের ধৈর্য, সততা ও আন্তরিকতার ভূয়সী প্রশংসা করি।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও কিছু কিছু দোষ ত্রুটি রহিয়া গেল। গ্রন্থখানি সর্বদিক দিয়া সর্বাঙ্গীন সুন্দর না হওয়ার জন্য আমি দুঃখিত ও লজ্জিত। ভবিষ্যতে এদিকে বিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখার আশা পোষণ করি। মুদ্রণ প্রমাদের দরুণ সন, তারিখ ও কয়েকটি 'সংশোধনী' গ্রন্থ শেষে প্রদত্ত হইল, পাঠকগণকে উহা দেখিয়া লইতে অনুরোধ করি।

পাক-ভারতের স্বনামধন্য পণ্ডিত ও ভাষাতত্ত্ববিদ ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ বইখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহার নিকট আমি চির কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ।

বিতর্কমূলক সমস্যা সমাধানের জন্য ডক্টর এনামুল হক, মওলানা আকরম খাঁ, অধ্যাপক ডক্টর এ, এইচ, দানী, সৈয়দ মুর্তজা আলী প্রমুখ প্রবীন ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিকদের সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে আলোচনা করিয়া উপকৃত হইয়াছি। যে সমস্ত শুভানুধ্যায়ী অধ্যাপক, আইনজীবি ও সাহিত্যিক কয়েক বৎসর যাবৎ অতীব আগ্রহ সহকারে তথ্য সংগ্রহ ব্যাপারে এবং সন্দেহ-মূলক বিষয়ের সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে সাহায্য করিয়া আমাকে অনুগৃহীত করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অধ্যক্ষ অমূল্যধন সিংহ ও খান বাহাদুর সৈয়দ সুলতান আলী মরহুম; এডভোকেট দিলদার আহাম্মদ ও ডাঃ আবুল কাসেমের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যে সমস্ত গ্রন্থাগার, পত্র-পত্রিকা ও গ্রন্থকারের লিখনী হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছি উহার একটি ধারাবাহিক তালিকা পুস্তকের শেষে প্রদত্ত হইল।

খুলনা সাহিত্য পরিষদ-সদস্যদের সম্মিলিত ও সক্রিয় সাহায্য এবং সহযোগিতার জন্য আমি তাঁহাদের কাছে ঋণী। বনবিভাগীয় প্রধান

এম, এ, আলীম, ও তাঁহার পূর্ববর্তী অফিসারগণ, এ, ডি, এফ, ও, মকবুল হোসেন আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছেন।

এডভোকেট আবদুল হাকিম (প্রাক্তন স্পীকার), পল্লীকবি জসিমউদ্দীন, আবদুর রব চৌধুরী সি. এস, পি, সৈয়দ আবদুল হালিম ই. পি, সি, এস, ন্যাশনাল বুক সেন্টার অব পাকিস্তানের সরদার জইনউদ্দীন ও আরও অনেকের সাহায্য কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি।

স্নেহাস্পদ আনিস সিদ্দিকী, এস. এম ইসরাঈল হোসেন জাফ্‌রী, আমজাদ হোসেন, মতিয়ুর রহমান, জি, এম, ওকালত আলী এ, হাসেম ও কিউ. এম, রহমান প্রমুখ অশেষ সাহায্য করিয়াছেন।

প্রাদেশিক প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সৌজন্যে অধিকাংশ প্রাচীনকালীন অট্টালিকার চিত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। সুন্দরবনের নদ-নদী ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কয়েকখানি ব্লক দৈনিক ইত্তেফাকের সিরাজ উদ্দিন হোসেন আমাকে দিয়াছেন। অধ্যক্ষ রুহল আমীন সুন্দরবনের কয়েকখানি ছবি আমাকে সরবরাহ্‌ করিয়াছেন।

আমার স্নেহাস্পদ কন্যা কানিজ মাওলা (বোজী) গ্রন্থখানির প্রায় হাজার পৃষ্ঠা পাণ্ডুলিপি কপি করিয়া দিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রাখিয়াছে। তাহার প্রতি আমার অশেষ স্নেহাশিস্‌।

পরম করুণাময়ের ইচ্ছায় এবং সহৃদয় দেশবাসীর সাহায্য ও উৎসাহ পাইলে গ্রন্থের তৃতীয় ও শেষ খণ্ড প্রকাশের ব্যবস্থা গৃহীত হইবে।

নূর মঞ্জিল, খুলনা
৩রা মার্চ, ১৯৬৭

বিনীত—
এ, এফ, এম, আবদুল জলীল।

বিষয় সূচী ঃ-

প্রথম খণ্ড

বিষয় পৃষ্ঠা

দ্বিতীয় খণ্ড

চিত্র সূচী :—

সুন্দরবনের ইতিহাস

প্রথম খণ্ড

॥ এক ॥

গাঙ্গেয় বদ্বীপ ও উহার গঠন প্রণালী

সুন্দরবনের আদি ইতিহাস জানিতে হইলে গাঙ্গেয় বদ্বীপের উৎপত্তি ও গঠনের বিষয় অবগত হওয়া আবশ্যক। বাংলা দেশের যে ত্রিকোণ ভূ-ভাগের পশ্চিমে ভাগীরথী এবং উত্তর পূর্বদিকে পদ্মা ও মেঘনা নদ এবং দক্ষিণ দিকে বঙ্গোপসাগর সেই বিস্তীর্ণ ভূভাগকে গাঙ্গেয় বদ্বীপ (Gangetic Delta) বলা হয়। এই ভূভাগের মধ্যে যশোর, খুলনা, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর ও বাকেরগঞ্জ পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্ত এবং কলিকাতা শহর, ২৪ পরগণা, মুর্শিদাবাদ এবং নদীয়া জেলা ভারতের অন্তর্গত।

পাকভারত উপমহাদেশের মধ্যে গঙ্গা অন্যতম শ্রেষ্ঠ নদী। হিমালয় পর্বতের সানুদেশে গঙ্গোত্রী নামক স্থান হইতে উহার উৎপত্তি বলিয়া উহার নামকরণ হয় গঙ্গা। হিমালয়ের ন্যায় বিশাল এলাকা বিস্তৃত সুউচ্চ এবং চির তুষারাবৃত পর্বতমালার সহিত গঙ্গা নদীর সম্পর্ক অতীব ঘনিষ্ঠ। হিমালয়ের তুষার নিঃসৃত জলরাশি শতশত নির্ঝরিণী পথে বহির্গত হইয়া গঙ্গা নদীতে পতিত হয়। অপরিমিত পর্বতরেণু বহন করিয়া গঙ্গা সমুদ্রের দিকে ধাবিত হয় এবং উহার পলি দ্বারা নূতন ভূমি গঠন করে। গঙ্গা ও উহার শাখা নদীসমূহ পলিমাটি বহন করিয়া পার্শ্ববর্তী ভূমি গঠন করিতে করিতে সুদূর দক্ষিণে সাগরে মিশিয়া যায়। এইভাবে যুগ যুগ ধরিয়া পলি দিয়া গঙ্গা স্বীয় শাখা প্রশাখার দ্বারা দুই বাহুর মধ্যবর্তী ত্রিকোণ ভূভাগ গঠন করিয়াছে। এই ভূভাগকেই গঙ্গা নদীর দ্বারা সৃষ্ট বলিয়া গাঙ্গেয় বদ্বীপ বলা হয়।

নবীন চন্দ্র দাস তাঁহার এশিয়ার প্রাচীন ভূগোল (Ancient Geography of Asia) গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, অতি প্রাচীন কালে গাঙ্গেয় বদ্বীপের দক্ষিণাঞ্চল গঠিত হয় নাই এবং উহা তখন অতল সমুদ্রের একাংশ ছিল। বর্তমান

মুর্শিদাবাদ ও নবদ্বীপ হইতেই বদ্বীপের গঠন শুরু হইয়াছিল। অতএব সুন্দরবন ও তন্নিকটবর্তী জিলা সমূহ সমুদ্র গর্ভে অবস্থিত ছিল। যশোর, খুলনা ও বাকেরগঞ্জের যে সমস্তস্থানে প্রাচীন কাল হইতে শত সহস্র গ্রাম, নগর ও শহর গঠিত হইয়া শিল্প ও সভ্যতা বিস্তার লাভ করিয়াছে তাহা এক অতি অজানা প্রাচীন কালে বঙ্গোপসাগরের তরঙ্গাভিঘাতের মধ্যে বিলীন ছিল। গঙ্গানদী পূর্বদিকে পদ্মা নাম ধারণ করিয়া মেঘনায় মিশিয়াছে। মেঘনা পদ্মা অপেক্ষা আরও ভয়ঙ্কর। পদ্মানদী শতশত বৎসর ধরিয়া উহার দুইতীরে যেমন বহুভূমি গঠন করিয়াছে, তেমনই বহু নগর ও শহর ধ্বংস করিয়া দিয়াছে। সেইজন্য উহার আর এক নাম কীর্তিনাশা। গঙ্গা নদী হইতে আর এক শাখা ভাগীরথী নাম ধারণ করিয়া মুর্শিদাবাদ ও কলিকাতা হইয়া বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে। ভাগীরথী ও পদ্মা মেঘনার মধ্যবর্তী ভূভাগের দক্ষিণে এবং বঙ্গোপসাগরের উত্তরে অবস্থিত জঙ্গলাবৃত ভূভাগকে সুন্দরবন নামে আখ্যাত করা হইয়াছে। এই সুন্দরবন ২৪ পরগনা, খুলনা ও বাকেরগঞ্জ জিলার মধ্যে পড়িয়াছে।

বাংলা দেশ অতীব প্রাচীন স্থান। বৈদিক যুগের গ্রন্থে এবং হিন্দুপুরাণে বঙ্গদেশের উল্লেখ আছে। পৌরাণিক গ্রন্থে এইটুকু জানা যায় যে বিহার প্রদেশের নাম ছিল অঙ্গ, উড়িষ্যা দেশ কলিঙ্গ, দক্ষিণ রাঢ় বা হুগলী অঞ্চল সুহ্ম এবং মালদহ হইতে ময়মনসিংহ পর্যন্ত ভূভাগের নাম ছিল পুণ্ড্র। ভাগীরথীর দুই কূলবর্তী স্থান সমূহের নাম ছিল বঙ্গ। মহাভারত ও রামায়ণে বঙ্গদেশের উল্লেখ আছে। রামায়ণে বর্ণিত সীতার পৈতৃক বাসভূমি মিথিলা বঙ্গের পশ্চিম-উত্তর কোণে অবস্থিত ছিল। বর্তমান মালদহ জিলা এবং রাজশাহীর একাংশ অর্থাৎ মহানন্দা নদীর পশ্চিমাংশ মিথিলার অন্তর্গত ছিল। তৎকালীন বঙ্গের দক্ষিণে ও পূর্বে সমুদ্র ছিল। গঙ্গা নদীর শাখা প্রশাখাই যে পলিমাটির দ্বারা বদ্বীপের সৃষ্টি করিয়াছে উহাই ভূতত্ত্ববিদ ও ঐতিহাসিকগণের সুচিন্তিত অভিমত। এখনও বঙ্গোপসাগরের তীরে পলিমাটির চর পড়িতেছে এবং পূর্ব পাকিস্তানের বিশেষ করিয়া খুলনা ও বাকেরগঞ্জের দক্ষিণ সীমার ভূমি বৃদ্ধি হইতেছে। সুখের বিষয় যে নদীর ন্যায় সমুদ্রকূল ভাঙ্গে না, সর্বদাই কূলের সীমানা বৃদ্ধি করিয়া যাইতেছে।

বদ্বীপের ধর্ম জলকে স্থল করা এবং স্থলভাগকে উন্নত ও উর্বর করা। প্রথমে

সাগরের গর্ভে নদীস্রোত পতিত হয়। স্রোতের সঙ্গে পলিমাটি ধাবিত হয় এবং জল সরিয়া গেলে ভূমি উত্থিত হয়। কোন কোন স্থলে নদী বা নালা থাকিয়া যায়। পলিমাটির দ্বারা যে সব চরভূমির সৃষ্টি হয় উহা ক্রমশঃ বৃক্ষলতায় ভরিয়া যাইতে থাকে এবং মনুষ্য বসতি স্থাপিত হয়। নদীর স্রোত গতি পরিবর্তন করিলে বৃহৎকায় চরভূমি রাখিয়া যায়। উহাকে মাদিয়া, দিয়াড়া বা দ্বীপ নামে অভিহিত করা হয়। ক্রমাগত নদীর খাতগুলি ভরাট হইয়া জমিতে পরিণত হয়। এইভাবে বদ্বীপের কার্য চলিতে থাকে। কিছু দিন পর্যন্ত নদীর তলভাগে জল জমিয়া থাকিলে উহা বিল বা বাওড় নামে কথিত হয়। আবাদ হইতে হইতে তাহাও থাকে না। এইভাবে গঙ্গা ও উহার শাখা প্রশাখার মোহনা ক্রমেই দক্ষিণ দিকে সরিয়া যাইতেছে—ফলে বদ্বীপের আয়তন বাড়িতেছে এবং সাগরের আয়তন ক্রমাগত হ্রাস পাইতেছে।

সুন্দরবনের ৪৪ নং কম্পার্টমেন্টের দক্ষিণে ডুবলা দ্বীপের পশ্চিমে এবং পত্নী দ্বীপ হইতে সাত আট মাইল পূর্বে ভাণ্ডার গাঙ্গের সন্নিকটে সম্প্রতি একটি ছোট চর উঠিয়াছে। উক্ত চরের পরিধি এক বর্গমাইলের অধিক। এই চর আয়তনে ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। চরের উপর জোয়ারের সময় সুন্দরী, গরাণ প্রভৃতি বৃক্ষের বীজ ভাসিয়া মাটির সহিত মিশিয়া যাইবে এবং উহা হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া স্থানটি যথা সময়ে সুন্দরবনে পরিণত হইবে। এই ভাবে যুগে যুগে সুন্দরবনের আয়তন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং সাগরের অবস্থান দক্ষিণে সরিয়া যায়। শিবসা নদীর মধ্যস্থলে শেখের ট্যাকের দক্ষিণে আল্‌কী দ্বীপ পর্যন্ত প্রায় ১ বর্গমাইল ব্যাপী একটি চর পড়িয়াছে। চরটি যথাসময়ে সুউচ্চ হইয়া জঙ্গলে পরিণত হইবে। সুন্দরবন ভ্রমণকালে কোন এক নিশীথে নদীর মধ্যস্থলে অবস্থিত এই চরে হঠাৎ আমাদের নৌকা থামিয়া গিয়াছিল।

পটুয়াখালি মহাকুমার দক্ষিণে চর কুক্‌রী মুক্‌রী, চরমমতাজ, চরআণ্ডা প্রভৃতি দ্বীপের সৃষ্টি হইয়া বহুপূর্ব হইতে এখানে বসতি স্থাপিত হইয়াছে। এই চর সমূহের বর্তমান লোকসংখ্যা প্রায় বিশ সহস্র হইবে। এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা ব্যতীত আরও বহুলোক উত্তর অঞ্চল হইতে আসিয়া চাষাবাদ করিয়া ধান্যের ফসল ফলায়। তাহারা বর্ষাকালে আসিয়া ধান্য রোপণ করে এবং শীতকালে পক্বধান্য কাটিয়া লইয়া যায়। বঙ্গোপসাগরের এইদিকে

মাঝে মাঝে চর উঠিয়া থাকে। সুযোগ সন্ধানীরা এদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখে এবং চর উঠিবার সম্ভাবনা হইলেই মূল্যবান জমি পাইবার আশায় কালেক্টরের নিকট হইতে পূর্বাহ্নেই বন্দোবস্ত লইয়া সম্পত্তির মালিক হইয়া বসে। খুলনার দক্ষিণে চর উঠিলে উহা স্বাভাবিক ভাবে সুন্দরবনে পরিণত হয়। আর বাকেরগঞ্জের দক্ষিণে সুন্দরবন না থাকায় চরভূমি পার্শ্ববর্তী ভূমির ন্যায় ধান্যের আবাদে পরিণত হয়। এইভাবে খুলনা হইতে কক্সবাজার পর্যন্ত বঙ্গোপসাগরের মধ্যে যে সমস্ত চর উত্থিত হয় উহা যথা সময়ে পার্শ্ববর্তী ভূমির ধর্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। ১৯৬১ সালের ৯ই মে এবং ১৯৬৫ সালের ১১ই মে যে মহাপ্রলয়ঙ্করী ঝড় হয় উহাতে বাকেরগঞ্জ ও চট্রগ্রামের সমুদ্রকূলবর্তী বসতি অঞ্চল বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ঝড়ের সঙ্গে সামুদ্রিক বন্যার জলোচ্ছাসে এতদঞ্চলের অসংখ্য মানুষ ও গবাদি পশু ভাসাইয়া লইয়া যায়। ঝড়ের পরে কোন কোন এলাকা জনমানবশূন্য হইয়া শ্মশান ভূমিতে পরিণত হয়। খুলনার দক্ষিণে ঘনাবৃত বনানীর অবস্থিতির জন্য যশোর খুলনায় এই ধরনের জলস্ফীতির কারণ সচরাচর ঘটে না।

গাঙ্গেয় বদ্বীপের আর একনাম ছিল বকৃদ্বীপ। বকৃদ্বীপই বৌদ্ধ আমলে বগ্‌দী নামে পরিচিত হয়। হিন্দু রাজত্বের শেষ দিকে সেন ও পালরাজগণের সময় উহার নাম হইয়াছিল বাগ্‌ড়ি। এতদঞ্চলে যে সব অসভ্য জাতি বাস করিত তাহারা বাগ্‌দী নামে পরিচিত ছিল। এখনও এই জাতির বসতি কোন কোন স্থানে দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ বলেন ব্যাঘ্রতাভী (Tiger coast) শব্দ হইতে বাগ্‌ড়ি নামের উৎপত্তি হইয়াছে। এবিষয় অন্যত্র বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। এই বদ্বীপে মনুষ্য বসতি অপেক্ষা জঙ্গলই ছিল অধিক। প্রাচীন কালীন বহুগ্রন্থে এতদঞ্চলের গভীর জঙ্গলের কথা উল্লেখ আছে। বাকেরগঞ্জ ও যশোর জিলার বহুস্থানে এবং খুলনা জিলার প্রায় সর্বত্র পুকুর খুড়িলে এখনও সুন্দরী প্রভৃতি গাছের গুঁড়ি পাওয়া যায়। অন্যান্য জিলায় ও এই ধরণের বৃক্ষ মৃত্তিকার নীচে প্রোথিত অবস্থায় পাওয়া যায়। অনেক সময় এতদঞ্চলের লোকেরা পুকুর খনন কালে প্রাপ্ত বৃক্ষের গুঁড়ি রৌদ্রে শুকাইয়া জ্বালানী রূপে ব্যবহার করিয়া থাকে। সঠিক বৈজ্ঞানিক তথ্যের অভাবে উহার কাল নিরূপণ করা সম্ভব নয়। এই সমস্ত নিদর্শন হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, গাঙ্গেয় বদ্বীপের সর্বত্র এককালে জঙ্গলে পূর্ণ ছিল এবং ধীরে ধীরে এই সমস্ত জঙ্গল অপসারিত হইলে বা কাটিয়া

ফেলিবার পর মনুষ্য বসতি গড়িয়া উঠিয়াছিল।

নদীর স্রোতে যে পলিমাটি বহন করিয়া আনে উহা শেষ সীমান্ত বা সমুদ্রের পার্শ্বে চরভূমি গঠন করে। জোয়ারের সময় বৃক্ষের বীজ ভাসিয়া আসে এবং প্রাকৃতিক নিয়মে বৃক্ষের উৎপত্তি হয় এবং চরভূমি যথাসময়ে গভীর অরণ্যে পরিণত হয়। এই জঙ্গল কাটিয়া আবাদ করিলে ধানক্ষেত বা মানুষের আবাস যোগ্য ভূমি সৃষ্টি হয়। এই ভাবে যুগ যুগ ধরিয়া ঘরবাড়ী, বাগিচা, ঘনবসতিপূর্ণ গ্রাম ও কোলাহলময় নগরের সৃষ্টি হইয়া থাকিবে। কোন কোন সময় ভূমিকম্প, প্লাবন প্রভৃতি দৈব দুর্বিপাকে জনপদ বা জঙ্গল বিধ্বস্ত হইয়া সমুদ্রগর্ভে বিলীন হইয়া যায়। নদীগর্ভে বসতবাটী বিলীন হওয়া নদীমাতৃক পূর্ব পাকিস্তানের নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্গত ফরিদপুরের দক্ষিণে জলির পাড় অঞ্চলে এবং উত্তর খুলনার তেরখাদা ও মোল্লাহাট থানায় সম্প্রতি যে পিট কয়লা আবিষ্কৃত হইয়াছে উহা দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে যে ঐ সমস্তস্থানে সুন্দরবন বা গভীর জঙ্গল ছিল। প্রমাণ স্বরূপ ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে ঐ সবস্থানে ৩/৪ ফুট মাটি খুড়িলেই জোব মাটি পাওয়া যায়। এই জোব মাটিই প্রাচীন কালীন বৃক্ষলতা এবং পলিমাটির সংমিশ্রণে গঠিত হইয়াছে। যে সমস্ত স্থান জঙ্গল ছিল তাহার কিয়দংশ মনুষ্য দ্বারা এবং প্রাকৃতিক বিপ্লবের ফলে মৃত্তিকার সহিত মিশিয়া জোব মাটিতে পরিণত হইয়াছে। এই জোব মাটির এলাকায় যেখানে কাষ্ঠের সংমিশ্রণ বেশী সেখানেই পিট পাওয়া যাইবে। এই পিট রৌদ্রে শুকাইলে আগুনে জ্বলিয়া থাকে। ইহাই বহু বিঘোষিত পিট কয়লা। ওয়াপদার একটি বিভাগ এই পিট উত্তোলন কার্যে লিপ্ত আছে। সম্প্রতি জলীর পাড়ের দক্ষিণ পার্শ্বে চাঁদার বিলে পিট খননের সময় প্রাচীন কালীন বৃক্ষ, মৎস্য ও পশুর হাড় পাওয়া গিয়াছে।

গাঙ্গেয় বদ্বীপ বঙ্গদেশের একাংশ বলিয়া প্রাচীন গ্রন্থে উহা উপবঙ্গ বলিয়া খ্যাত। এই উপবঙ্গ একটি বিশালকায় দ্বীপ। এক সময় উহা অনেকগুলি দ্বীপের সমষ্টি ছিল। সমস্ত দ্বীপই গঙ্গার পলিমাটি হইতে উৎপন্ন। মুসলীম আক্রমণের প্রাক্কালে বঙ্গের দ্বিতীয় রাজধানী ছিল নবদ্বীপে। ইখ্‌তিয়ারউদ্দীন মোহাম্মদ বিন বখ্‌তিয়ার খিলজী নবদ্বীপ আক্রমণ করতঃ বল্লাল সেনের পুত্র লক্ষ্মণ সেনকে বিতাড়িত করিয়া বঙ্গবিজয় করেন। নবদ্বীপ নয়টি দ্বীপের সমষ্টি বলিয়া ঐ নামে

অভিহিত হয়। ঐ সময় নবদ্বীপের অধীনে ১২টি প্রধান দ্বীপ ছিল। ঐ ১২টির মধ্যে নবদ্বীপ একটি এবং উহা আবার নয়টি দ্বীপের সমষ্টি ছিল। দ্বীপগুলির নাম যথা-ক্রমে অগ্রদ্বীপ, উহার মধ্যাংশের নাম কণ্টক দ্বীপ বা কাটোয়া দ্বিতীয় নবদ্বীপ উহার মধ্যবর্তী দ্বীপগুলির নাম—মধ্যদ্বীপ, সীমান্ত দ্বীপ, রুদ্র দ্বীপ, অন্তর দ্বীপ, মোদক্রুম দ্বীপ, জহ্নু দ্বীপ, ঋতু দ্বীপ, গোদ্রুম দ্বীপ ও কোল দ্বীপ। তৃতীয় মধ্য দ্বীপ বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের শান্তিপুর এই দ্বীপের অন্তর্গত ছিল। চতুর্থ চক্রদ্বীপ বা চাক্‌দাহ। পঞ্চম এড়োদ্বীপ বা এড়োদাহ, ষষ্ঠ প্রবাল দ্বীপ, সপ্তম কুশ দ্বীপ, অষ্টম অন্ধ্র দ্বীপ, ঝিকিরগাছা, বেনাপোল, লাউজানী ও কেশবপুর এই দ্বীপের অন্তর্গত ছিল। নবম বৃদ্ধ দ্বীপ বা বুড়ন। সাতক্ষীরা ও খুলনা সদরের উত্তর ভাগ এই দ্বীপের অন্তর্গত ছিল। দশম সূর্যদ্বীপ— যশোর জিলার পশ্চিমে মহেশপুর ইহার প্রধান নগর ছিল। একাদশ জয়দ্বীপ এবং দ্বাদশ রুদ্র দ্বীপ—খুলনার পূর্ব-ভাগ এবং বাকেরগঞ্জের দক্ষিণাংশ লইয়া এই দ্বীপ গঠিত হইয়াছিল।

গাঙ্গেয় বদ্বীপের আদিম বাসিন্দা অনার্য এবং এদেশের আদিম অধিবাসী। তাহাদের ধর্ম সম্বন্ধে কোন সঠিক তথ্য জানা যায় না। আর্য্য জাতির আগমনের পর এদেশে আর্যধর্ম প্রবর্তিত হয়। স্থানীয় অধিবাসীরা ধীরে ধীরে বৃহৎ আর্য্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া ঐ ধর্ম অনুকরণ করিতে থাকে। মুসলমান আমলে আর্যধর্মের নাম পরিবর্তিত হইয়া হিন্দুধর্ম হয়। সিন্ধুনদী তীরের বাসিন্দা এবং পাক-ভারতের সকল অধিবাসী পরে সিন্ধু বা হিন্দু এই নামে গ্রীক ও আরবগণ কর্তৃক অভিহিত হইত। আরবদের পক্ষে "স" স্থলে "হ" উচ্চারণ করা সহজসাধ্য ছিল। এই জন্য সিন্ধু হইতে হিন্দু নামের উৎপত্তি হইয়াছে এবং পরবর্তী কালে পাক-ভারতের অধিবাসীরা হিন্দু জাতি নামে কথিত হয় এবং অচিরাৎ জাতির নাম হইতে ধর্মের নূতন নামের উৎপত্তি হয়।

প্রাচীনকালে দেশ মধ্যে বিশেষ কোন শাসন ব্যবস্থা ছিল না। প্রতাপান্বিত রাজগণ স্থানে স্থানে শাসন কার্য পরিচালনা করিতেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাঁহারা রাজ্যশাসন বা সামাজিক নিয়ম পদ্ধতি মানিয়া চলিতেন না। ফলে হর্ষবর্ধনের রাজত্বের পর দেশ ব্যাপী অরাজকতার সৃষ্টি হয়।

আদিমযুগের পর আসে বৌদ্ধ ও জৈন যুগ। এদেশে বহু বৌদ্ধ সংঘারাম ছিল। ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। যশোর জিলার বারবাজার, মহেশপুর প্রভৃতি স্থানে বৌদ্ধ সংঘারাম ছিল বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। খুলনা জিলার আগ্রা ও যশোরের ভরতভয়না গ্রামে (চুক নগরের নিকট) দুইটি বৌদ্ধ স্তূপের নিদর্শন আছে বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। এখানকার প্রাচীন কালীন নিদর্শন সমূহ দর্শনে এইরূপ অনুমান করা হইয়াছে। বাগেরহাটেও একটি বৌদ্ধ সংঘারাম ছিল বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। খানজাহান আলীর সমাধি সংলগ্ন জলাশয় খনন কালে মৃত্তিকার নীচে একখানি কৃষ্ণপ্রস্তরের বুদ্ধ মূর্তি পাওয়া যায়। উক্ত মূর্তি এখনও বাগেরহাট হইতে চারি মাইল পূর্বে শিববাড়ী গ্রামে শিবমূর্তি হিসাবে পূজিত হইতেছে। যোগী জাতীয় হিন্দু, ভড়ং গন্ধবণিক কোন কোন কায়স্থ এবং অন্যান্য কতিপয় জাতি এককালে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিল। এই সমস্ত ঘটনা পরম্পরায় ইহাই প্রমাণিত হয় যে, এতদঞ্চলে এক সময় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের দ্বারা পরিব্যাপ্ত ছিল। পরবর্তীকালে শঙ্করাচার্যের প্রচারিত হিন্দুধর্মের প্রভাবে বৌদ্ধধর্মের গৌরবময় দিনের অবসান ঘটিয়াছিল। সামন্ত সেন ও বিজয় সেনের রাজত্বকালে বৌদ্ধদিগকে জোরপূর্বক হিন্দুধর্মে দীক্ষিত করা হয়। এবং বৌদ্ধদের শেষ চিহ্ন বিলুপ্ত প্রায় হইয়া পড়ে। ইহাই প্রাচীন কালীন গাঙ্গেয় বদ্বীপের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি।

সুন্দরবনের নদনদী

॥ দুই ॥

পূর্ব-পাকিস্তানের মধ্যে খুলনাই বনবিভাগের বৃহত্তম কেন্দ্র। বাকেরগঞ্জের মধ্যে যে সামান্য সুন্দরবন আছে উহাও খুলনা বনবিভাগের অধীন। পশ্চিম-বঙ্গের ভিতর ২৪ পরগনায় যে টুকু সুন্দরবন পড়িয়াছে উহার দিগুণ আয়তনেরও বেশী পড়িয়াছে খুলনা জিলায়। সুন্দরবনের মধ্যে এবং তন্নিকটবর্তী অঞ্চলে যে সমস্ত বড় বড় নদী বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে উহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতেছি।

পূর্বদিকের বৃহত্তম নদী হরিণঘাটা—বলেশ্বর। পূর্ব—মধ্যদিকে খুলনা সদর ও বাগেরহাটের সীমা নির্দেশক বৃহৎ নদী পশর। খুলনা সদরের দক্ষিণে পড়িয়াছে প্রলয়ঙ্করী শিবসা এবং দক্ষিণ পশ্চিম দিকে সাতক্ষীরার পূর্ব সীমায় কপোতক্ষ—আড়পাঙ্গাসিয়া। সুন্দরবনের পশ্চিম সীমার বৃহত্তম নদীর নাম রায়মঙ্গল ও হরিণভাঙ্গা। সমস্ত নদী আঁকিয়া বাঁকিয়া উত্তর হইতে দক্ষিণাভিমুখী হইয়া সমুদ্রে পতিত হইয়াছে। সুন্দরবনের সমস্ত নদীই গঙ্গা বা পদ্মা হইতে উৎপত্তি হইয়াছে। গৌরী বা গড়ই নদী পদ্মা হইতে বাহির হইয়া কুষ্টিয়ার পার্শ্ব দিয়া যশোরে প্রবেশ করিয়া কুমার নদীতে মিশিয়াছে। কুমারের শাখা বারাসিয়া হইয়া এলেংখালিতে পড়িয়াছে। বারাসিয়া ও কুমার নদীদ্বয় মোঘল আমলে ফতেহাবাদ পরগণার ফৌজদারের এলাকাভুক্ত ছিল। এই দুই নদীর তীরে সেই সময় হইতে মুসলীম সভ্যতা গড়িয়া উঠে। জনৈক ইংরেজ লেখকের মতে সুমিষ্ট জল বা মধু বহনকারী (Honey bearing river) বলিয়া নদীর নাম হইয়াছে মধুমতী। পূর্বে বারাসিয়ার নাম মধুমতী ছিল। এলেংখালি নদী ও মধুমতীর সহিত মিশিয়া পরবর্তী নাম গ্রহণ করিয়াছে। মধুমতী দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বহুদূর আসিয়া মাণিকদাহের নিকট হইতে ডান দিকে আঠারবাঁকী শাখা প্রসারিত করিয়াছে এবং তথা হইতে আঠারবাঁকী আলাইপুরের সন্নিকটে আসিয়া

ভৈরবের সহিত মিশিয়াছে। মধুমতী মোল্লাহাট হইয়া দক্ষিণদিকে যাইতে যাইতে বিস্তৃত হইয়া বলেশ্বর নাম ধারণ করিয়াছে। কচুয়ার নিকট ভৈরব আসিয়া এই বলেশ্বরের সহিত মিশিয়াছে। বলেশ্বর যথাক্রমে বিষখালি, পানগুচি, কচা, ভোলা, পাকাশিয়া প্রভৃতি বহুনদীর জলস্রোত বহন করিয়া বঙ্গোপসাগরের নিকটে গিয়া হরিণঘাটা নাম গ্রহণ করিয়াছে। হরিণঘাটার বিখ্যাত মোহনার প্রলয়ঙ্কররূপ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। উহার প্রশস্ততা প্রায় ৯ মাইল। খুলনা গেজেটিয়ার প্রণেতা মিঃ ওমালী বলেন যে হুগলী নদীর মোহনায় যেরূপ পলিমাটির দ্বারা স্রোতাবেগ হ্রাস পাইয়া থাকে এখানে সেরূপ কোন ভয় নাই। নদীর মোহনায় ভাটার সময় মাত্র ১৭ ফুট জল থাকে। মোরেলগঞ্জ হইতে সমুদ্রে প্রবেশ করিতে এই নদী বহিয়া আসিতে হয়। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে মোরেলগঞ্জকে একটি সামুদ্রিক বন্দর বলিয়া ঘোষণা করা হয়। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের জন্য এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। তবে এখনও মোরেলগঞ্জ শহর একটি ব্যবসায় কেন্দ্র।

গড়ই নদী বর্তমানে হীনবল হইয়া পড়িয়াছে। মধুমতীর সে বেগ আর নাই। পূর্বের মত বহুল পরিমাণে মিষ্টিপানি সে বহন করিয়া আনিতে পারে না। তবে পদ্মার মত এখনও এককূল ভাঙ্গে ও অন্যকূল গড়িয়া যায়। আঠার-বাঁকী প্রায় মজিয়া আসিতেছে।

মাথাভাঙ্গা নদী পদ্মা হইতে বাহির হইয়া আলমডাঙ্গার নিকট হইতে কুমার নদ যশোরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। লোহাগাড়া হইতে নবগঙ্গা কালনার নিকট মধুমতীতে মিশিয়াছে। বহুদিন হইল উহা মজিয়া উত্তম শস্যক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। লোহাগড়া হইতে নবগঙ্গা বড়দিয়ার নিকট আসিয়া কালিয়ার পূর্বে কালিগঙ্গায় মিশিয়া গাজির হাটের নিকট আসিয়া আতাই নদীতে পড়িয়াছে। আতাই নদী চন্দনী মহালের নিকট আসিয়া ভৈরবে পতিত হইয়া খুলনা শহরের সন্নিকটে স্রোতের বেগ জোরদার করিয়াছে।

ভৈরব যশোর খুলনার দীর্ঘতম নদী। এই নদীর তাণ্ডব ছিল অত্যধিক এবং গর্জন ছিল ভয়ঙ্কর। সেইজন্য উহার নাম হইয়াছিল ভৈরব। যশোর ও খুলনা শহর এই নদীর তীরে অবস্থিত। পদ্মা নদীর যে স্থান উত্তর হইতে মহানন্দায় মিশিয়াছে তাহারই দক্ষিণে ভৈরব নদীর জন্মস্থান। ভৈরব নদীয়া ও

মুর্শিদাবাদের মধ্যদিয়া জলাঙ্গী নদীর সহিত কোথাও মিশিয়া আবার কোথাও পৃথকভাবে যশোরে প্রবেশ করিয়াছে। বারবাজার, যশোর, শিঙ্গিয়া, নওয়াপাড়া, ফুলতলা, দৌলতপুর, খুলনা, আলাইপুর, ফকিরহাট ও বাগেরহাট হইয়া ভৈরব কচুয়ায় শেষ হইয়াছে।

পশর সুন্দরবনের এক অতি বৃহৎ নদী। ভৈরবের সহিত উহার কোন সংযোগ ছিল না। এককালে সমুদ্রের জল ইহাতে জোয়ার ভাটা খেলিত। কিন্তু পর্বতের সঙ্গে কোন যোগসূত্র ছিল না। বিলপাবলা হইতে বয়রা শ্মশানঘাটের খাল খুলনা শহরের দক্ষিণে মৈয়ার গাঙ্গের সহিত মিশিয়া পশরে পড়িয়াছিল। নড়াইল মহাকুমার ধোন্ধা গ্রামের রূপচাঁদ সাহা নামক জনৈক লবণের ব্যবসায়ী নৌকা যাতায়াতের জন্য ভৈরব ও কাজিবাচার সহিত সংযোগ করতঃ একটি ছোট খাল খনন করিয়াছিলেন। এই খাল প্রথমে লম্ফ দিয়া পার হওয়া যাইত। পরে বাঁশের পোল দিয়া বরাবর লোক যাতায়াত করিত। রূপচাঁদের নামানুসারে এই খালের নাম হয় রূপসা। বর্তমানে রূপসা এক ভয়ঙ্কর নদী। পূর্ববর্তী নিয়ম এখনও পরিবর্তিত হয় নাই। সেইজন্য আদালতের সমনজারীর কর্মচারীরা এই নদী পারাপারের খরচা পায় না। শ্রীরামপুরের রামনারায়ণ ঘোষ আর একটি ছোট খাল কাটাইয়া কাজিবাচার সহিত পশরের সংযোগ করিয়া দেন। উহার নাম হয় নারাণখালির খাল। এইস্থান হইতে পশর বিস্তৃত হইতে হইতে চালনার সন্নিকট দিয়া বাজুয়া, চালনা পোর্ট ও ডাংমারী ফরেষ্ট অফিস ধরিয়া সুন্দরবনের বিখ্যাত দেউরমাদে বা ত্রিকোণ দ্বীপের উত্তরে মজ্জতের সহিত মিশিয়াছে। ত্রিকোণ দ্বীপের উত্তর দিকে পশরের দক্ষিণ বাহু, শিবসা এবং আরও চারিটি নদী একত্রে মিশিয়াছে। এই সঙ্গমস্থল হইতে নদী বৃহৎকায় রূপ ধারণ করিয়া পূর্বোক্ত নদীসমূহের স্রোত বহন করিয়া ডুবলা দ্বীপের নিকট গিয়া সমুদ্রের সহিত মিশিয়াছে। ত্রিকোণ দ্বীপের উত্তর পশ্চিম হইতে উক্ত তিনটি নাম পরিবর্তিত হইয়া সমুদ্র পর্যন্ত উহা কঙ্গো বা মারজাট্রা (মজ্জত) নাম গ্রহণ করিয়াছে। সাধারণ লোকে এই বনাঞ্চল ও জলস্থলীর দক্ষিণদিককে নীলকমল বলিয়া থাকে। পশ্চিম তীরে নীলকমল খাল পশ্চিম দিকে গিয়াছে। উহার নিকটবর্তী চরভূমিকেও নীলকমলের চর বলে। মারজাট্রার মোহনার দৈর্ঘ্য প্রায় আট মাইল। ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে "বার্কশিয়া" নামক একখানি

জাহাজ এই নদীতে নিমজ্জিত হয়। মারজাত্রার মুখে বঙ্গোপসাগরের তীরে বিখ্যাত "ফিসার ম্যানস আইল্যাণ্ড" এবং উহার পূর্ব দিকে "টাইগার পয়েণ্ট" বা "বাঘের কোণা" অবস্থিত।

সুন্দরবন প্রদেশের আর একটি বিখ্যাত নদীর নাম কপোতক্ষ (Eye of a pegion)। ভৈরব নদী হইতে উৎপত্তি হইয়া কপোতক্ষ ক্ষুদ্রাকারে চৌগাছা, ঝিকিরগাছা, চাকলা, ত্রিমোহিনী, সাগরদাড়ী, তালা, কপিলমুনি, রাড়ুলী, চাঁদখালী, বড়দল, আমাদি, বেদকাশী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ স্থান সমূহের পার্শ্ব দিয়া সুন্দরবনের মধ্যে খোলপেটুয়ার সঙ্গে মিশিয়াছে। এই সঙ্গমস্থলেই কপোতক্ষ ফরেষ্ট অফিস। খোলপেটুয়া ও কপোতক্ষের যুক্ত স্রোত প্রবল হইয়া আড়-পাঙ্গাসিয়া নাম ধারণ করিয়াছে। বঙ্গোপসাগর হইতে দশ বার মাইল উত্তরে আড়পাঙ্গাসিয়া নদী উত্তর পশ্চিম দিক হইতে আগত মালঞ্চ নদীর সহিত মিশিয়া সমুদ্র পর্যন্ত মালঞ্চ নাম ধারণ করিয়াছে। এই নদীর মোহনায় স্রোত ভয়ঙ্কর। ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দে বৃটিশ জাহাজ "ফালমাথ" (Falmouth) এখানে নিমজ্জিত হয়। মালঞ্চ ও রায়মঙ্গলের দক্ষিণ দিকে বিখ্যাত অতলস্পর্শ বা অতলতল (Swatch of no ground) অবস্থিত।

কপোতক্ষের স্রোত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় ভৈরবের শক্তি হ্রাস পাইয়া উহা একেবারে মজিয়া যায়। যশোর জেলার সর্বাঙ্গীন উন্নতির অন্তরায় হইয়া পড়ে এই মরা ভৈরব। বর্তমানে এককালীন প্রলয়ঙ্করী ভৈরবের উপর দিয়া বহুস্থানে পদব্রজে লোক যাতায়াত করে। বসুন্দিয়ার নিম্নে আফ্‌রার খালের দ্বারা চিত্রার জল ভৈরবে পড়িত বলিয়া সেই স্থান হইতে নদী এখনও নামে মাত্র জীবিত আছে। আলাইপুর হইতে বাগেরহাট পর্যন্ত ভৈরব একরূপ মজিয়া গিয়াছে। কয়েকবার সংস্কার করার পরও সে পূর্বতন অবস্থা ফিরিয়া পাইবার কোন আশা নাই। তবে এই পথে এখনও নৌকা চলাচল অব্যাহত আছে। কপোতক্ষের মত বেতনা বা বেত্রবতী ভৈরবের আর একটি শাখা। সোনাই নদী ইছামতী হইতে উৎপত্তি হইয়া সাতক্ষীরার বল্লী বিলে পতিত হইয়াছে। বেতনা মহেশপুরের সন্নিকটে ভৈরব হইতে বাহির হইয়া নাভারণ বাগাছড়া ও কলারোয়া হইয়া খুলনার সীমানায় আসিয়া বুধহাটার গাঙ্ নাম ধারণ করত সুন্দরবনের সন্নিকটে খোল পেটুয়ায় মিশিয়াছে।

গুতিয়াখালী ও উজির পুরের কাটাখালের সঙ্গমস্থল হইতে গলঘেসিয়া নদী কল্যাণপুর ও শ্রীউলা গ্রামের নিকট দিয়া খোলপেটুয়ায় পড়িয়াছে। উজিরপুর কাটাখাল এবং গুতিয়াখালী একসময় কলিকাতার পণ্য দ্রব্য নৌকাযোগে আসাম ও পূর্ববঙ্গে বহন করিত। গলঘেসিয়া সুন্দরবন যাতায়াতের একটি বিশিষ্ট নদীপথ।

কপোতাক্ষ হইতে হরিহর নদী আসিয়া ভদ্রে মিশিয়াছিল। ত্রিমোহিনী ও মির্জানগর ভদ্রের তীরে মোঘল ফৌজদারের রাজধানী ছিল। ভদ্র ডুমুরিয়ার নিকটে খুব ছোট হইয়া পরে আবার বৃহৎ আকার ধারণ করতঃ ঢাকি নদীর মধ্য দিয়া শিবসায় এবং পূর্বদিকে কিছুদূর গিয়া পশরে আত্মবিসর্জন দিয়াছে।

শিবসা অতিকায় বৃহৎ নদী। রাড়ুলীর সন্নিকটে কপোতক্ষ নদী হইতে শিবসার উৎপত্তি হইয়াছে। গড়ই খালির ত্রিমোহনায় উহার ভয়ঙ্করী রূপ পরিলক্ষিত হয়। ঢাকী, বাদুড়গাছা, ডেলুটী, মেনস, কয়রা এবং অন্যান্য কতিপয় ক্ষুদ্র বৃহৎ নদী বিভিন্ন দিক হইতে আসিয়া শিবসাকে জোরদার করিয়াছে। ঢাকী ভদ্রনদী ও শিবসাকে সংযুক্ত করিয়াছে এবং মেনস ও কয়রা ইহাকে কপোতক্ষের সহিত সংযুক্ত করিয়াছে। শিবসা নলিয়ান ফরেষ্ট অফিস হইয়া দক্ষিণে কিছুদূর গিয়া পশ্চিম দিকে উহার একশাখা দক্ষিণমুখী হইয়া আড়ো শিবসা নামধারণ করিয়াছে। ত্রিকোণ দ্বীপের ২।৩ মাইল উত্তরে শিবসা নদী মারজাট্রা বা কঙ্গোর সহিত মিশিয়া সমুদ্রে বিলীন হইয়াছে। এই শিবসা নদীর পূর্বতীরেই সুন্দরবনের বিখ্যাত সেখের ট্যাক ও কালীবাড়ী নামক প্রাচীন শহরের ভগ্নাবশেষ অবস্থিত। শিবসার পশ্চিমতীরে অনেকগুলি ছোটবড় দ্বীপ জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে।

সুন্দরবনের পশ্চিমদিকের বৃহত্তম নদী রায়মঙ্গল। এই নদীও পদ্মার সহিত সংযুক্ত। মাথাভাঙ্গা নদী ভৈরব ছাড়িয়া দক্ষিণদিকে কৃষ্ণগঞ্জের নিকট চূর্ণী নাম ধারণ করিয়া উহার একশাখা পূর্বাভিমুখে বহির্গত হইয়াছে। এই নদীর নাম ইছামতী। ইছামতী বনগ্রাম রেলষ্টেশনের পূর্বদিক দিয়া গোবরডাঙ্গার দক্ষিণে বিখ্যাত যমুনা নদীর সহিত মিশিয়াছে। ভাগীরথী হইতে বাঘের খাল নামক স্থান যমুনার উৎপত্তি স্থল। যমুনা ক্রমে চৌবেড়িয়া ও গোবরডাঙ্গা ঘুরিয়া অবশেষে চারঘাটের নিকট ইছামতীর সহিত মিলিত হইয়াছে। ইছামতী সোজা

দক্ষিণমুখী হইয়া বসিরহাট, টাকী, দেবহাটা, শ্রীপুর ও কালীগঞ্জ হইয়া ঐতিহাসিক যশোর বা ইশ্বরীপুরে মিশিয়াছিল। এইখানেই রাজা প্রতাপাদিত্যের প্রসিদ্ধ যশোর রাজ্যের রাজধানী ছিল। বসন্তপুর হইতে ইছামতী কালিন্দী নাম গ্রহণ করিয়াছে। পূর্বে ইহা একটি খালের মত ছিল। পরে কালিন্দী নদীর প্রবাহ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। সাহেবখালী ও কাকশিয়ালীর (Good lad-creek) খাল খননের পর কালিন্দী বেগবতী হইয়া সুন্দরবনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া রায়মঙ্গল নাম ধারণ করে। এই নদী বর্তমানে পাক-ভারতের সীমা নির্দেশ করিতেছে। দেশ বিভাগের পর রায়মঙ্গলের সীমান্ত পুলিশ ও শুল্ক বিভাগের অফিস স্থাপিত হইয়াছে। রায়মঙ্গল নদী ক্রমাগত দক্ষিণে আসিয়া ভীমমূর্তি ধারণ করতঃ বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে। রায়মঙ্গল নদী এবং মাদার বাড়ীর চরের উত্তর দিক হইতে নদী পশ্চিম দক্ষিণমুখী হইয়া হরিণভাঙ্গা নাম গ্রহণ করতঃ সাগর গর্ভে বিলীন হইয়াছে। মাদার বাড়ীর চর প্রথমে ভারতের অন্তর্গত ছিল পরে উহা পাকিস্তানভুক্ত হইয়াছে।

চারঘাট হইতে যমুনা নাম বিলুপ্ত হইয়া ইছামতী হয়। বসন্তপুর হইতে ইছামতীর পূর্বদিকে আবার যমুনা প্রবাহিত হয়। যমুনার ন্যায় স্রোতস্বিনী নদী সে যুগে আর ছিল কিনা সন্দেহ। কালিন্দীর স্রোত প্রবল হইবার পর যমুনার যৌবন ফুরাইয়া গেল। উহাতে আর জোয়ার আসিল না। এহেন সময়ে ১২৭৪ সালে এক ভীষণ ঝটিকা (Tornado) হয় তাহাতে সুন্দরবনে ১২ ফুট জল বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এই সময় হইতে যমুনার স্রোত একেবারে নিস্তব্ধ হইয়া পড়ে। বালি জমিয়া যমুনার গতি শান্তভাব ধারণ করে। ওদিকে কালিন্দীর জোয়ার যমুনায় প্রবেশ করিয়া উহাকে দোটানা করিয়া দেয় এবং অল্পদিনের মধ্যে বিশালকায় যমুনা ভরাট হইয়া যায়। যমুনা নদী এখন শুষ্কপ্রায়। একটি খালের মত সূক্ষ্ম রেখা এখনও যমুনার চিহ্ন রাখিয়া দিয়াছে। এই নদীর মধ্যে এখন সুন্দর ফসল ফলে। যে নদীর তীরে রাজা প্রতাপাদিত্যের সহিত মোঘল সেনাপতি মানসিংহের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল এবং যে নদীতে মোঘল ও প্রতাপাদিত্যের রণসম্ভার বহন করিয়া অসংখ্য রণতরী যাতায়াত করিত তাহা এখন মৃত। রোথনপুরের ত্রিমোহনা, জাহাজঘাটার চাকচিক্য মুকুন্দপুর ও মহৎপুরের গড়, রাজধানীর ধুমধাম, ধুমঘাটের দুর্গ সবই ধূলির সহিত বিলীন

হইয়াছে। বহুকাল পরে যমুনার অবস্থা দর্শনে দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জনৈক পল্লীকবি গাহিয়াছেন ,

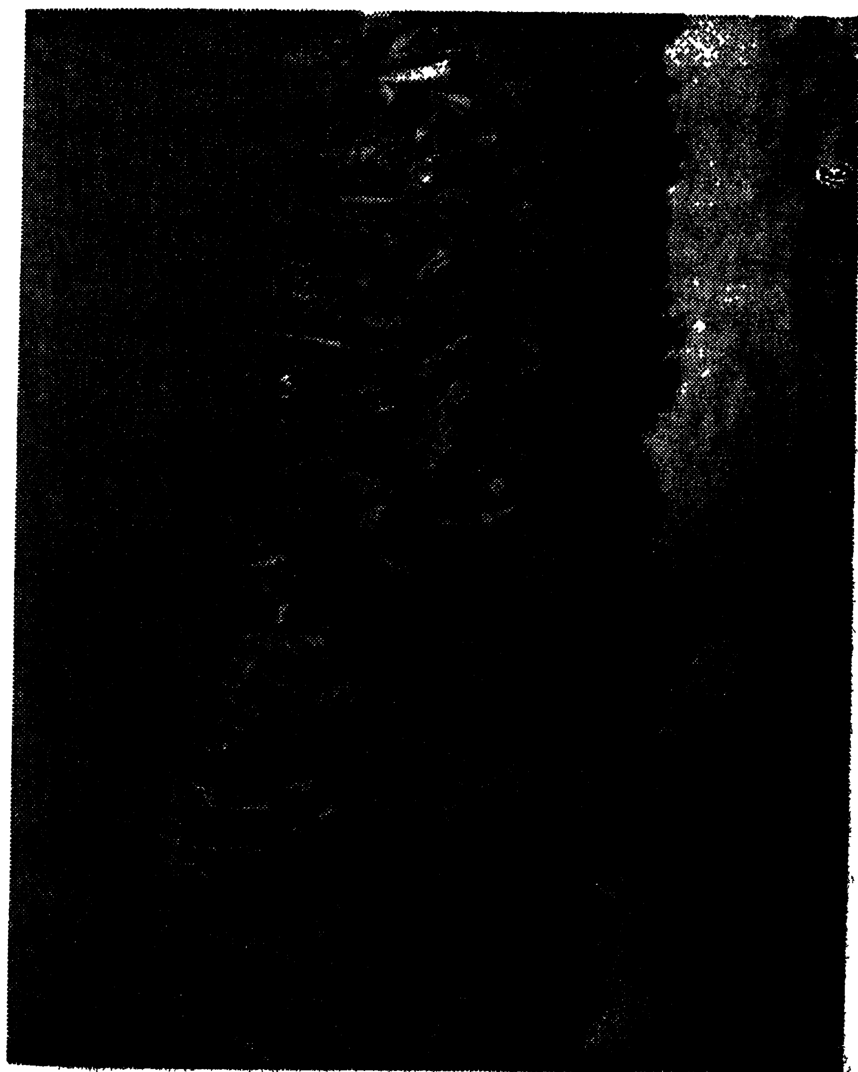
"যমুনা ! মোটেই তোমার নাই নমুনা ;
দেখিলে লাগে বেদনা,
যখন তোমার ছিল যৌবন
পাহাড় সমান উঠ্‌ত তুফোন
তুলিয়ে পাল, কত ভূপাল
ভরিয়ে জাহাজ আনত সোনা।
তোমার বুকে সকাল বিকাল
কত জাহাজ উড়াতো পাল
এখন চাষী চষিছে হাল
নিয়তিব খেলাব নাই তুলনা । „

কালিগঞ্জ অঞ্চলে লোকমুখে নিম্নোক্ত প্রবাদ প্রচলিত ছিল।

"যমুনা নদী মরবেনা
নকীপুরের জমিদার পড়বে না"

পরবর্তীকালে প্রবাদটির বিপরীত ফলই ফলিয়াছে । সুন্দরবনের নদনদী দিবারাত্র ২৪ঘণ্টার মধ্যে প্রতিবারে ৬ঘণ্টা করিয়া ২বার জোয়ার ও ২বার ভাটা হয়। ভাটার সময় বনাঞ্চলের পানি সমুদ্রে পতিত হয় এবং জোয়ারের সময় সমুদ্রের পানিতে নদী ফাঁপিয়া উঠে। এই জোয়ার-ভাটার সঙ্গমস্থলে উভয় দিক্‌কার জলের ধাক্কাধাক্কিতে জল এদিক ওদিক সরিয়া নদী হইতে পার্শ্ববর্তী জঙ্গলের মধ্যদিয়া অসংখ্য খাল ও নালার সৃষ্টি হয়। চাঁদের গতিবিধির সঙ্গে সঙ্গে জোয়ার-ভাটার তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। জোয়ারের সময় পানি সাত আট ফুট বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং ভাটার সময় সর্বনিম্নস্তরে সরিয়া যায়। ভাটার সময় জঙ্গলের অসংখ্য খালনালা শুকাইয়া কর্দমাক্ত হইয়া পড়ে।

সুন্দরবনের সর্বত্র জোয়ার-ভাটার জন্য এখানকার বৃক্ষলতা বিশ্বের যে কোন জঙ্গল অপেক্ষা পৃথক ধরণের। নদীর স্রোতপ্রবাহে পলি জমিয়া যে চরভূমি গড়িয়া উঠিয়াছিল, সমুদ্রের লবণাক্ত জল ও মৌসুমী বায়ুর জলীয় আবহাওয়া তথায় বিশেষ ধরনের বৃক্ষলতার জন্ম হইয়াছিল। এইরূপ অভিনব জল-



সুন্দরবনের পার্শে কুলুকুলু প্রবাহিত নদী

বায়ুর জন্য সুরন্দবনের উৎকর্ষতা হ্রাস পাইতে পারে না। সেজন্য জঙ্গলের গাছ-পালা কাটিয়া ফেলিলে সেখানে আবার উহার জন্ম হয়। বৃক্ষের পাতা, ডাল পালার পচানীতে শক্তিশালী সার থাকে এবং অনুরূপ জঙ্গল সৃষ্টিতে বাঁধাপ্রাপ্ত হয় না। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন বিশ্বের কোন পদার্থের বিনাশ নাই— আছে শুধু রূপান্তর। জীবজগতে যেরূপ একটি মাত্র প্রাণ হইতে ক্রমাগত বিবর্তনের ফলে প্রাণীজগতের সৃষ্টি হইয়াছে তেমনই বৃক্ষলতার জীবনে উহার কোন ব্যতি-ক্রম ঘটে না। সুন্দরবনের সর্বত্র নদী নালা ও খাল জালের ন্যায় বিস্তৃত। নদীর জলে সমস্ত সুন্দরবন জোয়ারের সময় প্লাবিত হইয়া যায় এবং ভাটার সময় ঐ জল অসংখ্য নির্ঝরিণী দিয়া খালে ও নদীতে পতিত হয়। সুন্দরবনের লোকেরা এই সমস্ত জল নিকাশের নির্ঝরিণীকে শীষে, ঝরা বা ঝরণা বলিয়া থাকে। দৈনিক দুইবার জোয়াবের জল উঠা নামার জন্য সুন্দরবনের সর্বত্র কর্দমাক্ত থাকে।

সুন্দরবনের প্রায় একপঞ্চমাংশ জলভাগ এবং এই জলই সুন্দরবনের বৃক্ষ-লতার প্রাণ। নদী নালা সমূহ উত্তরদিক হইতে ক্রমাগত প্রশস্ত হইতে হইতে অতলসাগরে মিশিয়াছে। শিবসা, পশর, হরিণভাঙ্গা প্রভৃতি নদী সমুদ্র তীর-বর্তী মোহনায় ৫। ৬ মাইল প্রশস্ত হইয়া ভয়ঙ্করী রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। সুন্দরবনের সমস্ত নদীর পরিচয় দেওয়া এখানে সম্ভব নহে। বেদকাশী— গাবুরা অঞ্চলের জনৈক ব্যক্তি সুন্দরবনের নদনদী, খাল, নালা, জঙ্গল প্রভৃতির নাম দিয়া একটি শায়ের বা গান রচনা করিয়াছেন। কর্ম ক্লান্ত নৌকার মাঝিরা এবং গ্রামাঞ্চলে যুবকেরা চিত্ত বিনোদনের জন্য এই গানটি গাহিয়া থাকে।

"বলেন মূর্খ মেহের
শোনেন সবাই গাঙ্গের শায়ের
খোদার মহিমা বুঝা ভার,
বলেশ্বর, সুমতি, ভোলা,
ছাপড়াখালি বড়শেওলা
হরিণটানা, স্মরণখোলা
আমবাড়ে আর চান্দেশ্বর।

ঝাপা, কালিদা, কট্‌কা
জাভা, আর মরা পশর ।।
ডাংমারী, বড়পশর, চিলে, ছুতোরখালী,
শিবসা নদী, পড়ে বড় স্রোত।
চা'লো বগি, হর মহাল, সে নদীতে বহুজল
বেড়ী আদা চাকীর খাল।
আড়ো শিবসা. আড়ের পথ
হড্ডা, মহিষে, ছাছোন হোগলা
ঝপ ঝপে, মাইর কি মজ্জত ।।
শাকবাড়ে— সিঙ্গা, গোলখালী
কুকুমারী, ভোমরখালী
হংসরাজ, কাগা, নীলকমল।
খেজুর দানা, সেজীখালী বাইনতলা, রাঙ্গাবালী
মালঞ্চ আর রায়মঙ্গল।
দোবেকী, ফিরিঙ্গি, মাম্‌দো
কেওড়াসূতী, বন্দো, ধঙ্কোল ।।
লতাবেড়ী, আঠারবেকী, ভেটুইপাড়া, বালুইঝাকী,
কালিকাবাড়ী, বেকারদ'নে
আন্দারমাণিক, আড়পাঙ্গাসে
ঝা'লে, পাটকোষ্টা, বাসে
গোলভক্‌সা, ধানীবুনে;
হরিখালী, মনসারবেড়,
পুষ্পকাটী সামনে ।।
কালীলাট, বগী চেচানে,
কুড়েখালী, ভুয়ের দ'নে,
কাঠেশ্বর, সোনারূপা খালী।
দুধমুখ, লাঠিমারা, তের্‌কাটী, ধানঘরা
আড়বাসে, দক্ষিণচরা, সাপখালী, কদমতলী

বুড়ের ডাবুর, লক্ষীপশর।
মান্‌কী আশাশুনি ।।
তালতক্তা, ধ্বজিখালী, মণ্ডপতলা, নেতোখালী
ভায়েলা, বাগানবাড়ী, ঝাড়াবাগ্‌না।
বগাউড়া, বক্‌শখালী
চাইলতাবাড়ী, সিঙ্গড়তলী, মাথাভাঙ্গা, কইখালী,
মথুরা, খাসীটানা।
আগুণ জ্বালা, ফুলঝুরী,
কালাবগা, খাজুরদানা ।।
শুবদে, গুবদে, সোনাইপাটী,
ধোনাইর গাং, কানাইকাটী
মরিচঝাপী, নেতাই তালপাটী,
ধনপতি, রাজাখালী, মুক্তবাঙ্গাল, আরিজখালী,
ডুবন্নার ট্যাক, বিন্‌জিলী,
বিবির মাঁদে, চট্‌কাখালী,
দেউর মাঁদে, চাম্‌টা কাম্‌টা ।।
কুঞ্জেমাটি, ব্যয়লা কয়লা,
মাদার বা'ড়ে, রয়ার নলা।
হান্‌কে, কলাগা'ছে।
মূল্যে মেঘনা, বাট্‌লো, বেতমুড়ী, বুড়িগঙ্গী, চুনকুড়ী
মায়াদী, আর ফুলবাড়ী, তালতলী, আংরাক্‌না,
গাড়ার নদী, বাদামতলী, ভূতের গাং, বৈকণ্ঠহানা ।।
করপুরো, ছায়া হল্‌দি, আড়াভাঙ্গা, তালপাটী,
খেজুরে, কুড়ুলে, ছোটশেওলা।
কাচিকাটা, কুকুমারী, দাইরগাং, বৈকিরী।
জলঘাটা, ইলিশমারী,
ঝল্‌কী, আর সাতনলা
হেলার বেড়, কালিন্দে,

শাকভাতে, গোন্দা আর পালা ॥
তেরবেকী, তালবাঁড়ে, হেড়মাতলা ভুড়ভুড়ে,
ছদনখালী, ফট্‌কের দ'ণে
ভরকুণ্ঠে, কেঁদোখালী
নওবেকী, কলসের বালি
পানির খাল, কুলতলী
বলবাঁড়ে আর স্থকুনে
মধুখালী, পালকাটী,
গোছবা, ঘটিহারানে ॥
জাবাত্তম, লোকের দ্বিপী,
ভাবিয়া আল্লার নবী,
জাম্বুরদ্বীপ, বাহার নদীপার
বড়মাতলা, পায়রাটুনী,
কালবেয়ারা, ঢুকুনী,
পারশেমারী, ঠাকুরুণী,
মানুষ সমুদ্রে যায়
ধনচের নদী নারায়ণতলী,
কলাগাছে, গঙ্গাসাগর ॥

সুন্দরবন এক আজব দেশ, ইহার নদীনালা অসংখ্য। প্রলয় ঝটিকার সময় এবং স্রোতাবেগে কত নৌকা নদীতে ডুবিয়া যায় তাহার ইয়ত্তা নাই। বিগত ইংরাজী ১৯২১ সালে দক্ষিণ খুলনার ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সময় একখানি হিন্দুস্থানী পাট বোঝাই বিশালকায় জাহাজ কলিকাতায় যাইবার পথে সুতারখালী গ্রামে শিবসা নদীর মধ্যে ডুবিয়া যায়। প্রাক্ বিভাগ যুগে এই নদী বহিয়া অসংখ্য পণ্যবাহী জাহাজ কলিকাতা, আসাম ও পূর্ববঙ্গ যাতায়াত করিত। বর্তমানেও সে লাইন আছে। তবে পূর্বাপেক্ষা কম জাহাজই চলাচল করিয়া থাকে।

বনাঞ্চলের অধিবাসীদের নদী সমস্যা প্রকট। প্রধান সমস্যা কিভাবে বন্যা ও নদীর লবণাক্তজল জমিতে প্রবেশ করিতে না পারে। লবণাক্ত জল প্রবেশ করিলে জমির ফসল একেবারেই নষ্ট করিয়া দেয়। এইজন্য এতদঞ্চলে নদী-

তীরে উচু বাঁধের সাহায্যে লবণাক্ত জল প্রতিহত করা হয়। প্রচুর আবাদযোগ্য ভূমি আজিও বাঁধের অভাবে অনাবাদী পড়িয়া আছে। অনেক সময় লবণাক্ত-জলের সহিত সুন্দরবন বৃক্ষের পক্কফল সমূহ জোয়ারের সময় ভাসিয়া আবাদী জমিতে প্রবেশ করে। এই বীজসমূহের অঙ্কুরিত চারাগাছ পরিষ্কার করিতে চাষীর অতিমাত্রায় কষ্ট হয়। বাঁধবন্দী সমস্যার সমাধান হইলে আরও একটি গুরুতর সমস্যা থাকিয়া যায়। প্রচুর পরিমাণ মিষ্টজল সরবরাহের জন্য ভৈরব, মধুমতী, আঠারবাঁকী, কপোতক্ষ প্রভৃতি নদীর সংস্কার একান্ত আবশ্যক। গঙ্গা, কপোতক্ষ স্কীমে অনেকটা সুবিধা হইবে আশা করা যায়। সুমিষ্ট জলের চাপাধিক্যে লবণাক্ত জল সমুদ্রে সরিয়া যায় এবং তাহাতে বাদা অঞ্চলের ধান্য ফসল উৎপন্নের বিশেষ সহায়ক হয়। এখানে একমাত্র ধান্য ভিন্ন অন্য কোন ফসল জন্মায়না। সেইজন্য সুমিষ্ট জলই বাদা অঞ্চলের জঙ্গল ও ধান্য ফসলের প্রাণ।

সুন্দরবন নামের উৎপত্তি অবস্থান ও প্রাচীনত্ব

॥ তিন ॥

পূর্ব পাকিস্তানের দক্ষিণ পশ্চিম দিকে এবং বঙ্গোপসাগরের তীরে অবস্থিত ভূভাগকে সুন্দরবন বলে। ২৪ পরগণা জিলার দক্ষিণভাগও সুন্দরবন। "নিম্নবঙ্গে যেখানে গঙ্গা বহুশাখা বিস্তার করিয়া সাগরে আত্মবিসর্জন করিয়াছে, প্রাচীন বঙ্গের দক্ষিণাংশে অবস্থিত সেই লবণাক্ত পল্ললময় অসংখ্য বৃক্ষগুল্ম সমাচ্ছাদিত শ্বাপদ সঙ্কুল চরভাগ সুন্দরবন বলিয়া পরিকীর্তিত হয়।" পশ্চিমে ভাগীরথী নদীর মোহনা হইতে পূর্বে মেঘনার মোহনা পর্যন্ত এই সুন্দরবন বিস্তৃত। কেহ কেহ ভুল করিয়া মেঘনারও পূর্বে অর্থাৎ চট্টগ্রাম, নোয়াখালী জিলা ও সন্দীপ হাতিয়াদ্বীপের দক্ষিণে অবস্থিত জঙ্গলকেও সুন্দরবনের অন্তর্গত মনে করেন। কিন্তু তাহা ঠিক নহে। প্রকৃতপক্ষে গঙ্গা ও মেঘনা নদীদ্বয়ের মধ্যবর্তী ভূভাগের নামই সুন্দরবন।

পূর্ব পাকিস্তানের সুন্দরবনের পশ্চিম সীমান্ত হরিণ-ভাঙ্গা ও রায়মঙ্গল নদী। কালিন্দী হইতে মধুমতী পর্যন্ত খুলনা জিলা এবং মধুমতী হইতে মেঘনা পর্যন্ত বাকেরগঞ্জ জিলা। খুলনা জিলার বর্তমান আয়তন ৪৬৫২ বর্গমাইল। তন্মধ্যে ২৩১৬ বর্গমাইল সুন্দরবন। অর্থাৎ খুলনার প্রায় অর্ধেক ভূভাগই গভীর জঙ্গলে পরিপূর্ণ। সুন্দরবনের মধ্যে প্রায় ৫০০ বর্গমাইল আবার জলভাগ। এই সমস্ত জলভাগই অসংখ্য খাল ও বড় বড় নদী। এইগুলিই সুন্দরবনের চলাচলের একমাত্র বাহন। বাকেরগঞ্জের দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত সুন্দরবনের আয়তন মাত্র ২৫ বর্গমাইল। অসংখ্য নদ নদী ও খালই সুন্দরবনের প্রাণ। শিরা ও উপশিরা সমূহ মানবশরীরে যেরূপ আবশ্যক, সুন্দরবন রক্ষণের জন্য উহার নদীনালার তেমনই প্রয়োজন। সুন্দরবনের লোক সংখ্যা প্রায় দশ সহস্র। জনসখ্যার প্রায় সবই ভাসমান (Floating Population)। তাছাড়া বনবিভাগের কর্মচারীরা কোথাও অফিস ঘরে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে নৌকায় অবস্থান করেন। "ফিসার ম্যানস" দ্বীপে কয়েক সহস্র লোক বৎসরে প্রায় ছয়মাস বসবাস করিয়া থাকে।

কাঠুরিয়া ও জেলে ব্যতীত কিছু সংখ্যক লোক সর্বদা ভ্রাম্যমান অবস্থায় সুন্দর-বনের মধ্যে সাময়িকভাবে ব্যবসায় ও ভ্রমণ ব্যপদেশে অবস্থান করে।

সুন্দরবন নামের উৎপত্তি সম্পর্কে অসংখ্য মতের সৃষ্টি হইয়াছে। সুন্দরবনের সর্বত্র প্রচুর সুন্দরী বৃক্ষ জন্মে এবং সুন্দরী বৃক্ষই অন্যান্য বৃক্ষ অপেক্ষা জনসাধারণের নিকট অধিক পরিচিত। সুন্দরীবৃক্ষের দ্বারা যে সব নৌকা প্রস্তুত হয় তাহা এদেশে বহুকাল হইতে বিশেষ সুপরিচিত। জ্বালানী কাষ্ঠ হিসাবে সুন্দরীই সর্বত্র অবাধভাবে চিরদিন ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। ইহার দ্বারা ঘরের খুঁটি ও সাজসরঞ্জাম প্রস্তুত করা হয়। এই সর্বজন পরিচিত সুন্দরীবৃক্ষ হইতেই বনবিভাগের নামকরণ হইয়াছে সুন্দরবন। ইংরাজী পরিভাষায়ও ইহাকে সুন্দরবনই (Sundarbans) বলা হয়। সুন্দরবনের নাম সম্পর্কে ইহাই জনপ্রিয় অভিমত (Popular opinion)।

কথিত আছে যে ইংরাজ আমলের প্রথমে বা উহারও অনেক পূর্বে বিদেশীয় পর্যটকেরা সুন্দরবনের নানাপ্রকার বৃক্ষাদি দর্শনে উহাকে "Jungle of Sundry Trees" নামে আখ্যাত করিতেন। এই ধরণের বর্ণনা কোন কোন লেখনীর মধ্যে দৃষ্ট হয়। ইংরাজী শব্দ "Sundry" — উহার অর্থ "নানাপ্রকার", এই মতাবলম্বীরা বলেন যে এই সানড্রী শব্দ হইতে ধীরে ধীরে জঙ্গলের নাম সুন্দরীবন ও উহা হইতে সুন্দরবনে দাঁড়াইয়াছে।

অন্য মতাবলম্বীরা বলেন সুন্দরবনে শুধু সুন্দরীবৃক্ষই নহে অন্যান্য বহু বৃক্ষ আছে। গেঁউয়া, কেওড়া, ওড়া, পশুর, গরাণ, বাইন প্রভৃতি বৃক্ষও প্রচুর জন্মে। অতএব সুন্দরীবৃক্ষ হইতে সুন্দরবনের নামের উৎপত্তি তাঁহারা স্বীকার করেন না। এই দলের মতে সমুদ্রের তীরে এই জঙ্গল অবস্থিত এবং সর্বত্র সামুদ্রিক জোয়ার জলে সিক্ত বলিয়া উহার নাম সমুদ্রবন এবং এই সমুদ্রবন শব্দের অপভ্রংশই সুন্দরবন। এদেশের অশিক্ষিত লোকেরা সমুদ্রকে সুমুদ্দুর বা সুমুন্দুর বলিয়া থাকে। বাকেরগঞ্জের ইতিহাস প্রণেতা বিভারিজ সাহেব আর একটি মত পোষণ করেন। তিনি বলেন যে ঐ জিলার সুন্ধা নামক নদী হইতেই সুন্দরবনের নামকরণ হইয়াছে। সুন্ধা নদীর পূর্বনাম ছিল সুগন্ধা এবং এই সুন্ধার কূলের বনবিভাগকে সুন্ধারবন বলা হইত এবং পরে এই নাম সুন্দরবনে পরিণত হয়। বিভারিজ সাহেবের দেওয়া এই

নামটির বেশ কিছুটা তাৎপর্য আছে বলিয়া মনে হয়। নামের সহিত আপাততঃ মিল ও ঘনিষ্ঠ। কিন্তু বিভারীজ সাহেব "হিষ্টরী অব বাকেরগঞ্জ" লিখিয়াছেন, উহাতে সুন্দরবনের বিস্তৃত ইতিহাস ও ব্যাপক পরিচয় নাই। তদ্ব্যতীত সুন্দর-বনের বেশীর ভাগই খুলনার দক্ষিণে। ইহা ২৪পরগণার পশ্চিম সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত। এই বিশালকায় বনস্থলীর নাম এক কোণের একটি নদীর নাম হইতে উৎপত্তি হওয়া অসম্ভব মনে করি। বহু প্রাচীন ঐতিহাসিক কীর্তিমালা আজিও সুন্দরবনের মধ্যে উহার চিহ্ন রাখিয়া দিয়াছে। এই সমস্ত বিষয়ের বিস্তারিত গবেষণা করিলে বিভারীজ সাহেব হয়ত একটি স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারিতেন।

বাকেরগঞ্জের দক্ষিণ ও খুলনার পূর্ব সীমা লইয়া চন্দ্রদ্বীপ রাজ্য গঠিত হইয়াছিল। চন্দ্রদ্বীপের বনবিভাগকে চন্দ্রদ্বীপ বন বলা হইত এবং কেহ কেহ অনুমান করেন যে এই চন্দ্রবন হইতে সুন্দরবন নামের উৎপত্তি হইয়াছে। এই অনুমান কাগজ কলমেই রহিয়া গিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে আজ পর্যন্ত ইহার কোন সমর্থন পাওয়া যায় নাই। আবার কেহ কেহ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যে চণ্ডভণ্ড নামে এক বন্যজাতি পূর্বে বসবাস করিত এবং এই চণ্ডভণ্ড শব্দ হইতেই সুন্দরবন নামের উৎপত্তি হইয়াছে। চণ্ডভণ্ড জাতির কথা বাকেরগঞ্জ জিলার আদিলপুর বা ইদিলপুরে প্রাপ্ত তাম্রশাসনে উল্লিখিত আছে।

সুন্দরবন অনেকের মতে এক ভয়সঙ্কুল স্থান। হিংস্র ব্যাঘ্র, বন্য বরাহ, ভয়াবহ অজগর ও বিষাক্ত সর্প এবং জঙ্গল মধ্যবর্তী নদীসমূহে হাঙ্গর ও কুমীর প্রভৃতির বাস। সেইজন্য এদেশের লোক সবচেয়ে ভয়ঙ্কর বিপদকে বলে "জলে কুমীর — ডাঙ্গায় বাঘ।" অর্থাৎ সুন্দরবনের মধ্যে ঢুকিলেই বাঘের ভয় আর জলে নামিলেই কুমীরের আক্রমণ। কামট বা হাঙ্গর ভয়ঙ্কর হিংস্র জলজন্তু। কুমীর অপেক্ষাও ইহারা অধিকতর হিংস্র। নদীতে মানুষ দেখিলেই শরীরের একাংশ কর্তন করিয়া উধাও হয়।

ফ্রেডারিক ইডেন পার্গিটার বলিয়াছেন — সুন্দরবনের দৃশ্যে কোনরূপ সৌন্দর্য নাই। তিনি হয়ত সুন্দরবনের দুই একটি কদাকার স্থান দেখিয়া ঐরূপ মন্তব্য করিয়াছেন। কোন কোন সময় মনস্তাত্বিক অবস্থার দরুনও সুন্দরকে অসুন্দর বলিয়া ধারণা হয়।

কিন্তু সুন্দরবন যে বাস্তবিকই অভিনব এবং অতীব সুন্দর সে বিষয় কোন সন্দেহ নাই। দিগন্ত প্রসারিণী লবণাক্ত সলিলা নদনদী, অসংখ্য খাল এবং উহার দুই তীর ব্যাপী বিটপীশ্রেণী এক মনোরম দৃশ্যের সৃষ্টি করিয়াছে। বৃক্ষগুলি সবই যেন একই সময় শৃঙ্খলার সহিত রোপিত এবং একই ভাবে ক্রমান্বয়ে বর্দ্ধিত হইয়াছে। হিংস্র জন্তু সঙ্কুল প্রদেশে এহেন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বাস্তবিকই মনোমুগ্ধকর। এ বনে হস্তরোপিত বৃক্ষ বা পুস্পোদ্যান নাই। দেখিলে মনে হয় বৃক্ষগুলি যেন আবহমানকাল হইতে প্রীতির বন্ধনে পরস্পর আবদ্ধ রহিয়াছে। তাই সুন্দরবনের দৃশ্য মোটেই অসুন্দর নহে। সুন্দরবনের বিরাট আর্থিক সম্পদ এই বৃক্ষরাজি ও জীবজন্তু (Flora and fauna)। পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা সুন্দর জানোয়ার হরিণ এই বনে প্রচুর এবং সংখ্যায় সব জন্তুকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। সুন্দরবনের চরভূমিতে ঝাকে ঝাকে হরিণ চরিয়া বেড়ায়। বৃক্ষের শীতল ছায়ায় হরিণ ঘুরিয়া ঘুরিয়া ওড়া, কেওড়া, আমুড় প্রভৃতি বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিয়া উদর পূরণ করে। এই দৃশ্য সত্যই নয়নাভিরাম। পৃথিবীর নিয়ম, যেখানে পুষ্প আছে, সেই স্থানেই কণ্টক আছে, যেখানে মদিরা থাকে, সেখানেই মাদকতা আছে, যেখানে মৃত্তিকা গর্ভে গুপ্তধন লুকায়িত আছে তাহারই নিকট বিষধর সর্প বাস করে। সমুদ্রের যে গভীর তলদেশে অসংখ্য মুক্তা জন্মে সেইখানেই মানুষের প্রাণ-নাশক হাঙ্গর, কুম্ভীর ইত্যাদি বাস করিয়া থাকে। জীবনের সমগ্র আনন্দ ও আরামের পশ্চাতে মরণের বিষাক্ত দংশন সংগুপ্ত রহিয়াছে। সুন্দরবন প্রদেশের পারিপার্শ্বিক অবস্থাও বহুলাংশে অনুরূপ। সুন্দরবনের দৃশ্য নয়নাভিরাম, উহার চর সমূহের সবুজ বৃক্ষরাজি ও বিভিন্ন বর্ণের মৎস্য ও পক্ষী, আঁকা বাঁকা নদীর জলস্রোত ও ধু ধু জলরাশি, বন্য জন্তুর দলে দলে অবাধ বিচরণ, বানরের নানাপ্রকার মুখভঙ্গী, নর্তন ও কুর্দন, দক্ষিণ সীমার সমুদ্র উপকূলের সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের দৃশ্য প্রভৃতি মিলিয়া সুন্দরবনকে সত্যই সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে। রসিকসুজন ও সৌন্দর্যপিপাসু ব্যক্তি ইহার সৌন্দর্য সহজেই উপলব্ধি করিতে পারেন। সুন্দরবনের নিকটস্থ সবুজ ধানক্ষেত শরৎকালে সুন্দর ও স্বচ্ছরূপ ধারণ করে। হৃদয় ও চক্ষু লইয়া দর্শন করিলে সুন্দরবনকে সত্যই সুন্দর দেখিতে পাইবেন।

কেহ কেহ মনে করেন যে উপরোক্ত বর্ণনাসমূহের জন্য দক্ষিণবঙ্গের এই বনবিভাগের নাম হইয়াছে সুন্দরবন। জঙ্গল শ্রেণীবদ্ধভাবে সজ্জিত এবং বাস্তবিকই মনোরম বলিয়া এই বনের নাম সুন্দরবন হইয়াছে। সুন্দরবনের এই নামকরণটিও বিশেষ প্রণিধান যোগ্য। কিন্তু এসব সত্বেও আমরা এই মতকে স্থির সিদ্ধান্ত হিসাবে গ্রহণ করিতে পারিনা। সুন্দরবন নাম খুব প্রাচীন না হইলেও আধুনিক নহে। এতদঞ্চল নদীমাতৃক দেশ। এখানকার জলবায়ু আর্দ্র। সেই জন্য সমুদ্রকূলবর্তী দক্ষিণ প্রদেশকে মধ্যযুগের ঐতিহাসিকেরা ভাটী দেশ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন এবং মোঘল যুগের বারভূঞাদিগের নামানুসারে এই দেশের নাম হইয়াছিল "বারভাটী বাংলা।" ঐতিহাসিক আবুল ফজল বারভূঞার সেরা ইসা খাঁ মসনদই আলাকে "মরজ-বান ই-ভাটী" বা ভাটী দেশের শাসনকর্তা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

সুন্দরবন নামেব উৎপত্তি সম্পর্কে আমরা উপরে যে আলোচনা করিলাম তাহাতে সুন্দরী বৃক্ষের প্রাচুর্যের জন্য সুন্দরবন মনোরম ও সুন্দর বনানী বলিয়া সুন্দরবন এবং বিভাবীজ সাহেবের পূর্বোক্ত মত — এই তিনটি মতই বিশেষ ভাবে প্রবল। তবে একথা সত্য যে সুন্দরী বৃক্ষ বনবিভাগের সর্বত্র আছে, উহাই সুন্দরবনের প্রধান ও উল্লেখযোগ্য বৃক্ষ। উহার কাঠ অত্যন্ত শক্ত ও ভারী। এতদ্ব্যতীত গাঙ্গেয় বদ্বীপের বিভিন্ন স্থানে পুকুর খননের সময় প্রায়ই সুন্দরী বৃক্ষের গুড়ি মৃত্তিকার নিম্নে পাওয়া যায়। যুগ যুগ ধরিয়া ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে যে সুন্দরীবৃক্ষ এদেশে সর্বত্র বিদ্যমান ছিল। সুন্দরীই সুন্দরবনের কাঠের রাজা বা সর্বোৎকৃষ্ট কাঠ এবং তজ্জন্য বনবিভাগের নাম সুন্দরবন হওয়া ন্যায় সঙ্গত এবং স্বাভাবিক।

অতি প্রাচীনকাল হইতে সুন্দরবনের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। "সুন্দরবনের নর খাদক" (Man eaters of Sundarbans) পুস্তক প্রণেতা তাহাওয়ার আলী বলিয়াছেন যে সমুদ্রগর্ভে পলিমাটি জমিতে জমিতে প্রশস্ত হইয়া দুই হাজার বছর পূর্বে সুন্দরবন উত্থিত হয়। আমাদের মতে এই মন্তব্য এক প্রকার জোর করিয়া করা হইয়াছে। ইহার ভিতর কোন সঠিক তথ্য নাই।

সুন্দরবনের নদীনালা ও জঙ্গলে এখনও যেরূপ অবস্থা পাঁচশত বৎসর পূর্বেও তদরূপ ছিল। ছত্রভোগ হইতে শ্রীচৈতন্য নৌকা ছাড়িবার পর প্রিয় সহচর মুকুন্দ কীর্তনগান আরম্ভ করেন :—

অবুঝ নাবিক বলে হইল সংশয়
বুঝিলাম আজ আর প্রাণ নাহি রয়॥
কুলেতে উঠিলে বাঘে লৈয়া যে পলায়
জলেতে পড়িলে যে কুমীরে ধরে খায়॥
নিরন্তর এ পানিতে ডাকাইত ফিরে
পাইলেক ধনপ্রাণ দুই নাশ করে॥
এতেক যাবৎ না উড়িয়া দেশ পাই
তাবৎ নিরব হও সকল গোসাই। ("চৈতন্য ভাগবৎ")

নিকোলাস পাইমেণ্টার বিবরণে সুন্দরবনের উল্লেখ আছে। তিনি ফার্ণাণ্ডেজ ও সোসা নামক দুইজন পুরোহিতকে ১৫৯৮ খৃষ্টাব্দে বঙ্গে পাঠান। তাঁহারা বাকেরগঞ্জ ও যশোর পরিভ্রমণ করেন। পর বৎসর ফেনসেকো ও এণ্ড্রুজ নামক আরও দুইজন পুরোহিত ইটালী হইতে প্রেরিত হন। কোচিন হইতে ১৮দিন সফরের পর তাঁহারা বঙ্গে উপনীত হন এবং চণ্ডিকানের রাজার আমন্ত্রণে ১৫৯৯খৃঃ তথায় গমন করেন। বাকলা হইতে চণ্ডিকান আসিবার পথে পুরোহিতদ্বয় সুন্দরবনের নদনদী ও বৃক্ষের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হন। সুন্দরবনকে তাঁহারা ভয়সঙ্কুল বনস্থলী (Horrid Jungle) বলিয়া অভিহিত করেন। বিভারীজ সাহেব বলেন যে তখন সুন্দরবনে অসংখ্য হরিণ ও গণ্ডার ছিল। হরিণের প্রাচুর্যের জন্য নদীর নাম হয় হরিণঘাটা। জলদস্যুদের কথাও উক্ত বিবরণে আছে। পুরোহিতদ্বয় চণ্ডিকানে বঙ্গদেশের সর্বপ্রথম গীর্জা নির্মাণ করেন। পরবর্তী গীর্জা চট্টগ্রাম ও ব্যাণ্ডেলে। বিভারীজ ধুমঘাটকে চণ্ডিকান বলিয়াছেন। সুন্দরবন অধিপতি চাঁদখান এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি বলেন যে খানজাহানের উত্তরাধিকারী চাঁদখান হইতে চণ্ডিকান নামের উৎপত্তি হইয়াছে। বিক্রমাদিত্য এই রাজ্য গ্রাস করেন এবং প্রতাপাদিত্য এই নাম তুলিয়া দেন। বিবরণীতে চণ্ডিকানের রাজাকে নিষ্ঠুর ও হত্যাকারী বলা হইয়াছে। বিভারীজ প্রতাপাদিত্যকে নিষ্ঠুর দানব বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

সুন্দরবন যে অতীব প্রাচীন তাহাতে সন্দেহ নাই। সম্ভবতঃ পূর্বে যেখানে সুন্দরবন ছিল এখন আর সেখানে নাই। গঙ্গা নদীর শাখা প্রশাখা যেখানে বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে, সেই স্থানের উপরিভাগ কালে জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া সুন্দরবনে পরিণত হইয়াছে। গঙ্গা হিমালয়ের শীর্ষদেশ হইতে অত্যধিক পরিমাণ গৈরিক মৃত্তিকা বহন করিয়া সাগরে ফেলিয়া দেয়। এই মৃত্তিকা এবং নদীর পার্শ্ববর্তী দেশের ভগ্ন বা ক্ষয়িত ভূ-ভাগ পলিমাটিরূপে নদীর মোহনার সন্নিকটে সঞ্চিত হইয়া ক্রমে ক্রমে চরভূমির সৃষ্টি করে। প্রথমে উহা দ্বীপাকৃতি হয়, পরে বৃক্ষাদি জন্মিয়া নিবিড় জঙ্গলে পরিণত হয়। গঙ্গানদীর সুমিষ্ট জল ও সমুদ্রের লবণাক্ত জলের সংমিশ্রণে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ বৃক্ষের জন্ম হয়। সুন্দরবনের বৃক্ষ জন্মাইবার ইহাই বৈশিষ্ট। এইভাবে ক্রমাগত গঙ্গানদীর শাখা প্রশাখা সমূহের মোহনা যতই দক্ষিণ দিকে সরিতেছে সঙ্গে সঙ্গে সুন্দরবন ততই দক্ষিণগামী হইতেছে। এক কালে গাঙ্গেয় বদ্বীপের আকৃতি ক্ষুদ্র ছিল এবং যশোর-খুলনা, বাকেরগঞ্জ প্রভৃতি জিলা সমূহ অতল সমুদ্রের মধ্যে নিহিত ছিল। তবে সেকালের কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। সে এক সুদূর প্রাচীন কাল। মৃত্তিকা খনন করিলে এখনও গাঙ্গেয় বদ্বীপের বহুস্থানে বৃক্ষের গুঁড়ি পাওয়া যাইবে। পিরোজপুরের মধ্যে মঠবাড়িয়া স্কুলের পুকুর খনন কালে বৃক্ষের গুঁড়ি পাওয়া গিয়াছিল। ২৪ পরগণা ও কলিকাতায় এবং যশোর খুলনার বিভিন্ন স্থানে পুকুর খনন কালে অসংখ্য বৃক্ষের গুড়ি পাওয়া গিয়াছে এবং সেগুলি সুন্দরী বৃক্ষের বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

ভাগীরথী ও পদ্মা—মেঘনার মধ্যবর্তী ভূভাগ যে পলিমাটি সংযোগে যুগ যুগ ধরিয়া গঠিত হইয়াছে সে বিষয় কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। গাঙ্গেয় বদ্বীপের প্রায় সর্বত্র যে এককালে সুন্দরবন ছিল অবস্থা দর্শনে তাহাই প্রমাণিত হয়। মানুষের প্রয়োজনে বা প্রাকৃতিক দুর্বিপাকে অর্থাৎ ভূমিকম্প, বন্যা ও ঝটিকায় সুন্দরবনের আকৃতি পরিবর্তিত হইয়াছে। বহু স্থানে সুন্দরবন সমতল ভূমিতে পরিণত হইয়াছে এবং মনুষ্য বসতির প্রয়োজনে ব্যবহৃত হইয়া নগর ও লোকালয় গড়িয়া উঠিয়াছে। বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী স্থানে পলিমাটি জমিয়া এখনও চর পড়িতেছে এবং সুন্দরবন দক্ষিণ সীমায় আরও আয়তন বৃদ্ধি

করিতেছে। সুন্দরবনের উত্তরদিকে জঙ্গল কাটিয়া বহুস্থান লোকালয়ে পরিণত হইয়াছে এবং এখনও কিছু কিছু হইতেছে। তোডরমল্লের জরিপে সুন্দরবনের উল্লেখ নাই। ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে শাহ্ সুজা নূতন সরকার পত্তন করিয়া সুন্দরবনকে উহার অন্তর্ভুক্ত করেন।

তোডরমল্লের রাজস্ব তালিকা ১৫৮২খৃঃ প্রণীত হয়। ইহাতে সুন্দরবনের কোন রাজস্ব নির্দ্ধারিত হয় নাই। সুলতান সুজা ১৬৫৮খৃঃ এই তালিকা পুনর্বিন্যাস করেন। তোডরমল্ল বঙ্গদেশকে ১৯টি সরকার বা জিলায় বিভক্ত করেন। প্রতি জিলায় কতকগুলি পরগণার সৃষ্টি হয়। তখন দিল্লীর কেন্দ্রীয় সরকারকে বঙ্গদেশের দেয় রাজস্বের পরিমান ছিল ১০৬৯৩১৫১৲। এই রাজস্ব ১০বৎসরের জন্য নির্দ্ধারিত ছিল। কিন্তু ৭৬বৎসর পর্যন্ত উহা চালু থাকে। সুজার সময় এই রাজস্ব ১০৭লক্ষ টাকা হইতে বর্দ্ধিত হইয়া ১৩১লক্ষে দাড়ায় এবং ১৭২৫খৃঃ বাংলার নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ ১৪২লক্ষ টাকা বঙ্গদেশের রাজস্ব নির্দ্ধারিত করেন। খলিফাতাবাদ দেশের অন্যতম সরকার বা জিলা ছিল। এই সরকার শাহ সুজার সময় দুই পরগণায় বিভক্ত হয়:— (ক) আকলা — গোচারণ ভূমি এবং (খ) বুনজের বা বনভূমির ফসল। সুন্দরবনকে তখন মোরাদখানা ও জেরাদখানা বলা হইত। ইহার নাম মাত্র রাজস্ব ছিল ৮৪৫৪৲। বাকেরগঞ্জের সুন্দরবন বোজর্গউমেদপুর পরগণাভুক্ত ছিল। তখন পর্যন্ত অধুনা সুন্দরবন পরগণার সৃষ্টি হয় নাই।

১৭৭০খৃঃ ক্লডরাসেল সুন্দরবন আবাদ করেন। ইহার পর১৭৮৪খৃঃ টিলম্যান হেংকেলের প্রশংসনীয় উদ্যম পরিলক্ষিত হয়। হেংকেল সম্পর্কে আমরা অন্যত্র বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। ১৮১৭খৃঃ ২৩ রেগুলেশন অনুসারে সুন্দরবনের শাসন পৃথকভাবে দেখান হয় এবং উক্ত বিধানের বলে "কমিশনার অব সুন্দরবনস্" পদের সৃষ্টি হইয়া সুন্দরবনের শাসন ব্যবস্থা শৃঙ্খলিত হয়। ১৮৩০খৃঃ লেফটেন্যান্ট হজেজ সুন্দরবন জরিপ করেন। আলীপুর সুন্দরবনের সর্বপ্রথম হেড কোয়ার্টার। বাকেরগঞ্জ জিলায় মেঘনা ও ব্রহ্মপুত্রের মিষ্ট জলের আধিক্যে সমুদ্রের জল ২৪পরগণা ও খুলনার ন্যায় অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারেনা। তন্নিমিত্ত উক্ত জিলার জঙ্গল ক্ষুদ্র এবং বাড়িতে পারেনা,

সুন্দরবন পূর্বে সংরক্ষিত ছিল না। ইংরেজ আমলের প্রথম দিকে সমগ্র বনবিভাগ জমিদারেরা ভোগদখল করিত। তখন বনবিভাগের জন্য কোন সরকারী অফিস স্থাপিত হয় নাই। খুলনা গেজেটীয়ার প্রণেতা মিঃ ওমালী বলেন যে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের পূর্বে সুন্দরবন হইতে রাজস্ব আদায়ের কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় নাই। সুন্দরবন সর্বপ্রথম পোর্ট ক্যানিং কোম্পানীকে বাৎসরিক আট হাজার টাকায় বন্দোবস্ত দেওয়া হয়। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্ট সুন্দরবনের ব্যবস্থাপনা স্বহস্তে গ্রহণ করেন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ডেপুটী কনজারভেটর অব ফরেষ্ট মিঃ শ্লিচ বনবিভাগের আর্থিক গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে তৎকালীন গভর্ণর স্যার রিচার্ড টেম্পল সুন্দরবনের অবস্থা সরেজমিনে তদন্ত করিয়া পার্শ্ববর্তী জিলার অধিবাসীদের নিকট উহা যে বিশেষ প্রয়োজন সে বিষয় মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেন। জনসাধারণ এই সময় সুন্দরবনের স্থানে স্থানে চাষাবাদ যোগ্য ভূমি প্রস্তুত করিয়াছিল। সুন্দরী কাঠের অভাব দেখা দিলে জঙ্গল আবাদের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী আপত্তি উঠিল। এ বিষয় তদন্ত করিবার পর সুন্দরী বৃক্ষ রক্ষণের জন্য সরকার কর্তৃক সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল। ১৮৭৪-৭৫ খৃষ্টাব্দে সুন্দরবনের জন্য স্বতন্ত্র বিভাগ সৃষ্টি হইল এবং ৮৮৫ স্কোয়ার মাইল জঙ্গল সংরক্ষিত বলিয়া ঘোষিত হইল। ১৮৭৫-৭৬ খৃষ্টাব্দে আরও ৩১৪ বর্গ মাইল এলাকা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এইভাবে যথা সত্বর সমগ্র সুন্দরবন এলাকা সংরক্ষিত হইয়া সরকারের সরাসরি তত্বাবধানে আসিয়া ক্রমাগত সুন্দরবন অঞ্চলে লোকালয়ের ন্যায় আইন কানুন প্রবর্তিত হইল।

বরিশাল কামান, অতলতল ও সুন্দরবনের অবনমন

।। চার ।।

সুন্দরবন চিরদিনই গাঙ্গেয় বদ্বীপের বর্মরূপে উহাকে রক্ষা করিয়া আসিতেছে। সাগরের সীমা যতই দক্ষিণগামী হইতেছে সুন্দরবনও সেই অনুপাতে দক্ষিণে সরিয়া যাইতেছে। দেশের জলবায়ু এবং ভূমির উর্বরতার উপর সুন্দরবনের প্রভাব অত্যধিক। সুন্দরবনের সর্বত্র মৃত্তিকার নিম্নে জল সঞ্চিত থাকে। বনবৃক্ষসমূহ সেই সঞ্চিত জল হইতে উৎপন্ন রসাংশ পত্রসমূহের ভিতর দিয়া বায়ুতে সঞ্চারিত করিয়া দেয়। ইহার দ্বারা আকাশের বায়ুশৈত্য রক্ষিত হয়। বৃক্ষের পত্রসমূহ যেখানে গরম থাকে সেখানে গ্রীষ্মের প্রখরতা উপলব্ধি করা যায়না। যেখানে জঙ্গল নাই সেই স্থান অতিবৃষ্টিতে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বৃক্ষহীন উলঙ্গ প্রদেশ বর্ষায় ভাসিয়া যায়; সেখানকার মৃত্তিকা যথেষ্ট জলগ্রহণ করিতে পারেনা; অথবা সে জল প্রবাহ দূরবর্তী স্থানে গিয়া প্লাবনের সৃষ্টি করে। মৃত্তিকার মধ্যে জলাংশ এবং বায়ুস্তরে জলীয় বাষ্প হ্রাস প্রাপ্ত হওয়ায় আবশ্যকীয় শস্যাদির সমধিক ক্ষতি হয়। এজন্য পাশ্চাত্যের কোন কোন দেশে অতিবৃষ্টি নিবারণের জন্য কৃত্রিম উপায়ে জঙ্গল প্রস্তুত করা হইয়া থাক। পূর্ব পাকিস্তানের দক্ষিণাংশে জঙ্গলের প্রাচুর্যের জন্য এদেশে অনিষ্টের আশংকা কম। এতদঞ্চলে যদি বিশাল অরণ্যানি না থাকিত, তাহা হইলে বঙ্গোপসাগরের মেঘমালা উত্তরমুখে বহুদূরে গিয়া হিমালয়ের পাদদেশে বারিবর্ষণ করিত। তখন এই প্রদেশ বালুকা প্রান্তরে পরিণত হইয়া মানব বসতির অযোগ্য হইয়া পড়িবার আশঙ্কা থাকিত।

সুন্দরবনের অবস্থিতির জন্য দেশ অনেক বিপদ আপদ হইতে রক্ষা পাইতেছে। সমুদ্রের অস্বাভাবিক জলোচ্ছ্বাস প্রবল হইলেও দেশ ভাসিয়া যাইবার ভয় নাই। সামুদ্রিক ঝড় বা বায়ুপ্রবাহ বসতিস্থান সমূহ উৎখাত করিতে পারিবে না। সুন্দরবন আবাদ করিলে বর্তমান সময় অপেক্ষা বহুগুণে আরও বর্দ্ধিত হইতে পারে। এক সময় সুন্দরবনের জঙ্গল ধ্বংস করিয়া সমস্ত স্থান

আবাদ করার পরিকল্পনা চলিতেছিল। অনেক গবেষণার পর সে পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয়। জঙ্গল কাটিয়া দিলে দেশে বর্ষা হইবেনা এবং ঝড় ও প্লাবনের আধিক্য অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাইবে। সেইজন্য সুন্দরবন জাতীয় জীবনের এক অমূল্য সম্পদ।

সুন্দরবন আবাদ করা সম্ভবপর নহে। জঙ্গলের মধ্যে বৎসরের প্রায় অধিকাংশ সময় জোয়ার আসে। জমি আপনা আপনি না উঠিলে কৃত্রিম উপায়ে উহাকে উঠান যায়না। যে স্থানে ভূমি নিম্ন থাকে সেখানে শত চেষ্টা করিয়াও জঙ্গল ধ্বংস করা যায়না। উহা কাটিয়া ফেলিলে পানির সাহায্যে আবার জন্মিয়া থাকে। জমি যখন আপনা আপনি উত্থিত হয়, তখন মানুষের হস্তে পড়িয়া আবাদযোগ্য ও বাসের উপযোগী হয়। ক্রমে জমি উচ্চ হইলে বসতবাটী স্থাপিত হয় এবং ফল ও ফুলের বাগান প্রতিষ্ঠিত হয়। এইভাবে ক্রমে ক্রমে সুন্দরবনের স্মৃতি লোপ পায়। তবে পুকুর খনন কালে গাছের গুঁড়ি প্রায়ই সেই সব স্থান হইতে বাহির হয়। কোন স্থানে একবার কাঁচা গোলপাতা ও মৃত্তিকার নিম্নে পাওয়া গিয়াছে।

সময় সময় প্রাকৃতিক বিপ্লব আসিয়া সুন্দরবনের ঘোর পরিবর্তন ঘটাইয়া দেয়। কখনও কখনও ঝটিকায় বৃক্ষসমূহ উৎপাটিত করিয়া ফেলে। বড় বড় নদী প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় মজিয়া যায়, আবার একটি ক্ষুদ্র খাল ভীমমূর্তি ধারণ করে। কোন কোন স্থান মৃত্তিকা অবনমনের জন্য জলমগ্ন হয় এবং কোথাও উচ্চ ভূমি সৃষ্টি করে। পুনরায় হঠাৎ জলমগ্ন হইয়া বসতবাটী এমন ভাবে ডুবিয়া নষ্ট হইয়া যায় যে উহা বাসের অযোগ্য হইয়া পড়ে। তখন মানুষ বাধ্য হইয়া অন্যত্র হিজ্‌রত করে। ভগ্ন ও পরিত্যক্ত ভিটায় বৃক্ষ জন্মিয়া জঙ্গলে পরিণত হয়। ঝটিকা, প্লাবন, ভূমিকম্প ইত্যাদি দুর্যোগ সুন্দরবনের পতনের কয়েকটি কারণ তাহা সহজেই অনুমেয়। ফার্গাসন ও বিভারীজ স্থির করিয়াছেন যে বঙ্গোপসাগরের মালঞ্চ মোহনা ও রায়মঙ্গল হইতে দক্ষিণদিকে একস্থানে অতলতল (Swatch of no ground) আছে। উহা ২১^0 হইতে ২২^0 অক্ষরেখার মধ্যে অবস্থিত। তীরবর্তী স্থান হইতে ১৫ মাইল দক্ষিণে অতলতলের অবস্থান। এই স্থানের চারিদিকের জলের গভীরতা ৫০। ৬০ ফুট। কিন্তু অতলতল বা অতলস্পর্শের গভীরতা ১৭। ১৮ শত ফুট হইবে। এই স্থানের কয়েক মাইল পশ্চিম

দক্ষিণে ৭০০ ও ১০০০ ফুট নিম্নে মৃত্তিকা পাওয়া যায়। এই প্রকার গভীর অতলতল বঙ্গোপসাগরের আর কোথাও আছে কিনা জানা যায় নাই। ফার্গাসন বলেন যে বঙ্গোপসাগরের পূর্ব পশ্চিমদিক হইতে বিপরীতমুখী স্রোতের সংঘাতের জন্য ঐ স্থানে আবর্তের সৃষ্টি হইয়াছে। সেইজন্য সেখানে কোন মৃত্তিকা জমিতে পারেনা। সুন্দরবনের ভূপঞ্জরের তলদেশ হইতে মাটি অবিরত অল্প অল্প ধুইয়া স্রোতের গতি অনুযায়ী এই অতলতলের গহ্বরে পড়িতেছে। এইভাবে মাটি সরিয়া যাইতে যাইতে হয়ত বহুদিন পরে জঙ্গলাকীর্ণ ভূভাগের অতিরিক্ত ভার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের জমিকে কোথাও বসাইয়া দিয়া যায়। জমি নীচু হইয়া গেলে তৎক্ষণাৎ জল প্লাবনে সেইস্থান জলমগ্ন হয় আবার সেই জল পলির সহিত মিশিয়া ধীরে ধীরে জমির উচ্চতা সম্পাদন করে। অতলস্পর্শের জন্য এই ভাবে মাঝে মাঝে সুন্দরবনের উত্থান ও পতন হয়। বিভারীজ সাহেব বলেন যে পূর্বে বহু বাড়ীঘর সুন্দরবনে ছিল। অতলতলের জন্য জঙ্গল ধ্বংস হওয়ায় সে সমস্ত নিশানা মুছিয়া গিয়াছে "ম্যানুয়াল অব দি জিওগ্রাফী অব ইণ্ডিয়ার" লেখক বলেন যে অনুরূপ একটি অতলতল সিন্ধু বদ্বীপের অদূরে সাগরবক্ষে বিদ্যমান আছে। বিভারীজ ও ফার্গাসনের মতে এই অতলস্পর্শই সুন্দরবনের অবনমন ও উহার সাময়িক ধবংসের প্রধান কারণ। আধুনিক যুগে মিঃ য়্যাডমস উইলিয়ামস অতলস্পর্শ সম্পর্কে সর্বশেষ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন — "অতলতল বঙ্গোপসাগরের অতি প্রাচীন কালীন মূল তলদেশ এবং এখানে বহুকাল যাবৎ গঙ্গার পলিমাটী জমিতে পারে নাই।"

উপরে যে অতলস্পর্শের কথা বলা হইল উহা যেমন আশ্চর্য ও ভয়াবহ এবং সুন্দরবন ধ্বংসের অন্যতম কারণ তেমনই ইহাকে আর একটি অত্যদ্ভুত ঘটনার মূল বলা হইয়া থাকে। সুন্দরবন অঞ্চলে আষাঢ় শ্রাবণ মাসের মাঝে মাঝে দক্ষিণ বা দক্ষিণ পূর্ব কোণ হইতে কামানের আওয়াজের ন্যায় একপ্রকার গুরুগম্ভীর শব্দ শ্রুত হয়। খুলনার এই শব্দ বরিশালের দক্ষিণাংশ হইতে আসিতেছে বলিয়া অনুমিত হয়; এইজন্য কতিপয় ইংরেজ লেখক ইহাকে "Barisal guns" বা বরিশাল কামান" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বরিশালের সাধারণ লোকে উহাকে "গায়েবী আওয়াজ" বলিয়া আখ্যাত করিয়াছে। এ সম্পর্কে এদেশে বহু আজগুবি প্রবাদ শ্রুত

হয়। "হিন্দুরা বলে লংকা দ্বীপে রাবণের বিশাল তোরণদ্বার খোলা বা বন্ধ করিবার সময় এইরূপ শব্দ হয়। মুসলমানেরা বলে ইমাম মেহেদী আবির্ভূত হইতেছেন এবং তাঁহারই আগমণ বার্তা এই কামানের শব্দ।" কিন্তু ইহার কোনটাই ঠিক নহে। এই শব্দ এত দূরবর্তী স্থান হইতে আসে যে সাধারণের গোচরীভূত কোন শব্দ ঐ ধরণের হইতে পারে না। বৈজ্ঞানিক গবেষকদের কেহ কেহ বলেন বঙ্গোপসাগরের অতলতল হইতে এই শব্দ উত্থিত হয়। যখন এতদঞ্চলের অনেক স্থান হইতে বর্ষাকালে বা প্রবল বারিপাতের পর এই শব্দ স্পষ্টভাবে শুনা যায়, তখন বর্ষা বা জলপ্রবাহের সহিত উহার কোন সম্পর্ক আছে, এইরূপ অনুমান করা অসঙ্গত হইবেনা। একথা সঠিক যে উক্ত আওয়াজ খুলনা জিলার দক্ষিণ পূর্ব এবং বরিশালের ঠিক দক্ষিণে শ্রুত হয়। অতএব বরিশালের দক্ষিণে সাগরের মধ্যে উহার স্থান হওয়া উচিত। কিন্তু পূর্বোক্ত অতলতলের স্থান রায়মঙ্গলের মোহনার নিকটেই এবং খুলনার দক্ষিণ পশ্চিম কোণে অবস্থিত। শব্দটি যদি এই অতলস্পর্শ হইতে নির্গত হয়, তবে উহা খুলনার দক্ষিণে এবং বরিশালের পশ্চিম দক্ষিণ কোণে শ্রুত হওয়া উচিত। 'হিষ্টরী অব বাকেরগঞ্জের' লেখক বিভারীজ সাহেব বরিশালের দক্ষিণে অবস্থিত দ্বীপাঞ্চলে ভ্রমণ কালে তথাকার অধিবাসীদের নিকট জানিতে পারেন যে, তাহারা ঐ শব্দ জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে ও ঝটিকার সময় দক্ষিণ পশ্চিম ও উত্তর দিক হইতে শুনিতে পায়। উহা অবিকল বন্দুকের আওয়াজের ন্যায়। বাগেরহাটের তৎকালীন এস, ডি, ও বাবু গৌরদাস বসাক বলেন যে সমুদ্রের দক্ষিণ হইতে শব্দ আসিলে যতই দক্ষিণ দিকে যাওয়া যাইবে শব্দ ততই উচ্চতর হইবে। কিন্তু তিনি এ বিষয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করিয়াও কিছু নির্ণয় করিতে পারেন নাই। বাগেরহাটের গ্রামাঞ্চল হইতে পূর্বে এই শব্দ শোনা যাইত। পটুয়াখালী ও পিরোজপুরের দক্ষিণ হইতে পূর্বে এই শব্দ শ্রুত হইত। পটুয়াখালী মহাকুমার প্রবীণ লোকের নিকট শুনিয়াছি যে পর পর তিনটি আওয়াজ হইত। দিনের বেলা এবং রাত্রেও ঐ শব্দ শ্রুত হইত। তাঁহারা বলেন যে ভাটার সময় সমুদ্রে ৩০।৪০হাত উচ্চ ঢেউ উঠিত এবং অনুরূপ দুইটি ঢেউয়ের সংঘর্ষের ফলে ঐরূপ আওয়াজ শোনা যাইত। বর্তমানে ঐরূপ আওয়াজ সচরাচর শ্রুত হয়না। পটুয়াখালীর দক্ষিণাঞ্চল অর্থাৎ চর মমতাজ, আণ্ডারচর, কুকুরী, মুকুরী প্রভৃতি

স্থান হইতে এখনও বর্ষাকালে ঐরূপ শব্দ শ্রুত হয়। কেহ কেহ বলেন এই ভীষণ শব্দ গভীর সমুদ্রের তরঙ্গাভিঘাতের জন্য হইয়া থাকে। যখন ভীমবেগে প্রধাবিত তরঙ্গে তরঙ্গে আঘাত লাগে; তখন জলোচ্ছ্বাস প্রথমে ঊর্ধ্বমুখী হইয়া উঠে, পরে ভীষণ বেগে নিম্নে পতিত হয়। ঐ ধরণের পতন কালে যে ভীষণ শব্দ হয়, তাহাই 'বরিশাল কামান'। এই শব্দটি সাগরের বিভিন্ন দিক হইতে শ্রুত হয়। শেষ পর্যন্ত বিভরীজ সাহেব বহু গবেষণার পর স্থির করিয়াছেন যে, ইহা বায়ুমণ্ডলের কোন বৈদ্যুতিক ব্যাপার হইতে সম্ভূত। আবার কেহ কেহ অনুমান করিয়া বলিয়াছেন যে আরাকানের উপকূলে মৃত্তিকার তলদেশে একটি আগ্নেয় গিরিশ্রেণী আছে। চট্টগ্রামের অন্তর্গত চন্দ্রনাথে উহার প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটে। ইহার অগ্ন্যুদ্গমের সহিত 'বরিশাল গানের' সম্বন্ধ থাকা একেবারে অসম্ভব নয়; তবে এখনও এ বিষয়ের কোন স্থির সিদ্ধান্ত হয় নাই। এ সম্পর্কে আরও বৈজ্ঞানিক গবেষণার আবশ্যক।

'বরিশাল গান' ও অতলস্পর্শের মধ্যে কার্যকারণসম্পর্ক (Causal connection) আছে কিনা তাহা এখনও নির্ণীত হয় নাই—উহা কেবল অনুমান মাত্র। তবে উক্ত দুই বিষয়েরই অস্তিত্ব প্রমাণিত হইয়াছে। আমাদের মতে এই দুইয়ের সত্তা পৃথক। অতলস্পর্শ খুলনা জিলার দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং 'বরিশাল গান' অত্র জিলার বহু পূর্বে অবস্থিত। দুইয়ের দূরত্ব অন্যূন শতাধিক মাইল। সমুদ্রের গভীর তলদেশের নিম্নস্থ মৃত্তিকার মধ্য দিয়া কোন সম্পর্ক থাকা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। অতলস্পর্শই যে সুন্দরবন অবনমনের অন্যতম কারণ তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। সুন্দরবনের নিম্নস্থিত মৃত্তিকার কর্দমপ্রকৃতি অবনমনের দ্বিতীয় কারণ এবং ভূমিকম্পন দ্বারাও সুন্দরবনের ধ্বংস হইতে পারে। যাহা হউক বিভিন্ন প্রকারের অবনমনকেই সুন্দরবন ধ্বংসের প্রথম কারণ বলা যাইতে পারে।

সুন্দরবন ধ্বংসের দ্বিতীয় কারণ জলপ্লাবন ও প্রবল ঝটিকা। প্রাচীন কালীন ঘটনাবলীর কোন ইতিহাস নাই। তবে মোঘল আমল হইতে যে ইতিহাস পাওয়া যায়, তাহাতে প্লাবন ও ঝড়ে সুন্দরবনের অসংখ্য জীবন ও ধন নষ্ট হইয়াছে। ১৫৫৮খৃষ্টাব্দে সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে এমন ভয়ঙ্কর জলপ্লাবন হয় যে, চন্দ্রদ্বীপ রাজ্য জলমগ্ন হইয়া যায়। ৫ঘণ্টা ব্যাপী ক্রমাগত ঝড়বৃষ্টি ও

বজ্রপাত হইয়াছিল। সমুদ্রের তরঙ্গমালা সমগ্র রাজ্য গ্রাস করিয়াছিল। ঘর-বাড়ী, নৌকা, জাহাজ সমস্ত ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যায় এবং প্রায় দুই লক্ষ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সুন্দরবনেরও যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়। সেই সময় হইতে এদেশে সুউচ্চ বাঁধ বা ভেড়ীর গুরুত্ব উপলব্ধ হইতে আরম্ভ করে।

১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে যে ভীষণ ঝটিকা হয় তাহাতে সাগর দ্বীপে ৬০ হাজারের বেশী লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে আর একটি ঝড়ে সুন্দরবনের বৃক্ষাদি ও জীবনের ভীষণ ক্ষতি হইয়াছিল। সুন্দরবনের নিকটস্থ লোকেরা ঘরবাড়ী ত্যাগ করিয়া উত্তরদিকে পলায়ন করিয়াছিল। ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দের ভূমি-কম্পের সঙ্গে আর একটি ঝড় হয়। এই ঝড়ের পর সুন্দরবনের মনুষ্য বসতির চিহ্নসমূহ লোপ পায়। ইহাতে ৩০সহস্র লোক অকালমৃত্যু বরণ করে। প্লাবনে গঙ্গানদীর জল ৪০ফুট উচ্চে উঠিয়াছিল বলিয়া প্রকাশ। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের ১০ই মে (১২৬৯ সালের ২রা জ্যৈষ্ঠ) সুন্দরবন অঞ্চলে ও যশোর খুলনায় যে প্রবল ঝটিকা হয় উহাতেও গুরুতর ক্ষয়ক্ষতি হয়। এই বিখ্যাত ঝড়কে 'জ্যৈষ্ঠের ঝড়' বলা হয়। অসংখ্য মানুষ ও গবাদি পশু এই ঝড়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। শতবর্ষ পূর্বের এই ঝড়ের কথা এখনও লোকমুখে প্রচারিত হয়:

"তাল গাছে ঘিড়ালের ছাও শালিক নেয়ট পাড়ে,
কত মানুষের গরু মারা গেল জ্যৈষ্ঠ মাসের ঝড়ে।"

১৮৬৯ খৃঃ মে মাসে যে ঝড় হয় তাহাতে অসংখ্য গবাদি পশু ও মানুষ মারা যায়। সুপারী ও নারিকেলবৃক্ষের ক্ষয়ক্ষতি হয় অপরিসীম। একমাত্র মোরেলগঞ্জে ২৫০ জন লোক ঝড়ের চাপে মারা যায়। ১৮৯৫ খৃঃ বাগেরহাট ও সাতক্ষিরার প্রচণ্ডতম বেগে ঝটিকা প্রবাহিত হয়। সুপারী গাছের অপূরণীয় ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয় এবং লবণাক্ত জলপ্লাবনে ঐ বৎসরের আমন ধানের চারা নষ্ট হইয়া দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে এবং ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দ আরও দুইটি ভীষণ ঝড় হয়। শেষোক্ত ঝড়ে খোলপেটুয়া ও কপোতাক্ষ নদীতে এবং তীরে ৪হাত জল উঠিয়াছিল। সুন্দরবনের দিকে ৯হইতে ১২ফুট পর্যন্ত জল হয়। এই ঝড় ও প্লাবনে কালিগঞ্জের দক্ষিণে যমুনা নদী ভরাট হইয়া যায়। এই ঝড়কে কার্তিকের ঝড় বলে। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে যে ভয়ঙ্কর ঝড় হয় তাহাতে বরিশাল ও নোয়াখালী জিলার প্রায় দুই লক্ষ লোকের প্রাণহানি

হইয়াছিল। এই সময় হইতে সুন্দরবনের পূর্বভাগ বৃক্ষশূন্য হইয়া পড়ে। ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে ১২ মিটার উচ্চ এক সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস মেদিনীপুর জিলার উপর প্রচণ্ডতম শক্তিতে আঘাত হানে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে অন্যূন বিশ হাজার নৌজান নিমজ্জিত ও ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। এই জলেচ্ছ্বাসে প্রায় তিন লক্ষ লোকের প্রাণ হানি ঘটে। বিশ্বের প্রকৃতিক দুর্যোগ সমূহের মধ্যে এই জলোচ্ছ্বাস সর্বাধিক ভয়াবহ।

বিংশ শতাব্দীর সর্বাপেক্ষা বড় ঝড় হয় ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ১৭ই অক্টোবর (১৩১৬ সালের ৩০শে আশ্বিন)। এ ঝড় বাকেরগঞ্জ ও খুলনা জিলায়ই অধিক হইয়াছিল। এই ঝড়ে অসংখ্য বৃক্ষ ভূপাতিত হইয়া সুন্দরবনের অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়। আর একটি ঝড় হয় বাংলা ১৩২৬ সালের আশ্বিন মাসে। এই ঝড়েও সুন্দরবনের ভীষণ ক্ষতি হয়। বহু পুবাতন বৃক্ষ এই ঝড়ে উপড়াইয়া ফেলিয়া দেয় এবং ঘরবাড়ী নষ্ট করিয়া দেয়। ইহার পর সম্প্রতিকালে এক ভয়াবহ ঝড় হইয়াছে ১৯৬১ সালের ৯ই মে তারিখে। চট্রগ্রাম নোয়াখালির প্রলয়ঙ্করী ঝড় ও প্লাবনের তাণ্ডব লীলাব কয়েক মাস পরে এই ঝড় হয়। ঝড়ে খুলনা সহরের বৈদ্যুতিক তারসমূহ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। বহু পুরাতন বৃক্ষাদি উৎপাটিত হয়। অসংখ্য ঘরবাড়ী উড়িয়া যায়। বরিশাল ও বাগেরহাটে উহার প্রকট প্রলয়ঙ্করী আকার ধারণ করে। এই ঝড়ে খুলনা-বরিশালের নারিকেল সুপারি, আম-কাঠাল, লিচু-জাম, জামরুল ও অন্যান্য বৃক্ষের বাগ-বাগিচা ধ্বংস করিয়া দিয়াছে। ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে খুলনা ও বরিশালের দক্ষিণে যে প্লাবন হয় তাহাও ঝড়ের চেয়ে আরও ভয়ঙ্কর। প্লাবনে মানুষ ও গবাদি পশু ভাসিয়া যায় এবং ঝড়ে সুন্দরবনের পূর্বদিকের বহু বৃক্ষ ভাঙ্গিয়া যায়, সুন্দরবনের দক্ষিণ পূর্ব দিকেই অধিকতর ক্ষতি সাধিত হয়। অনুরূপ আর একটি ঝড় হয় ১৯৬৫ সালের ১১ই মে।

এইভাবে মধ্যে মধ্যে ঝটিকা ও প্লাবনে সুন্দরবন ধ্বংস হওয়ায় মনুষ্যবাসের অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে। সর্বদা জোয়ারের জল আসিয়া সুন্দরবনের মাটিকে আর্দ্র করিয়া রাখে সেজন্যও বর্তমানে সুন্দরবনে মনুষ্য বসতি সম্ভবপর হয় না।

ভূমিকম্প ও সুন্দরবন ধ্বংসের আর একটি কারণ। ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে ভূমিকম্পনে সুন্দরবনের ভয়াবহ ক্ষতি সাধিত হয়। ১৭৬২ খৃষ্টাব্দের ২রা

এপ্রিল তারিখে এক ভূমিকম্প আরাকান হইতে চট্টগ্রাম ও ঢাকা হইয়া কলিকাতা পর্য্যন্ত গিয়াছিল। এই সময় সুন্দরবন একপ্রকার ডুবিয়া গিয়াছিল। ১৮১০ ও ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে গাঙ্গেয় বদ্বীপে তুইটি ছোটখাট ভূমিকম্প হয়। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের ভূমিকম্প সর্বাপেক্ষা গুরুতর। এই ভূ-কম্পনে বঙ্গদেশ হইতে আফগানিস্থান পর্যন্ত থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। উহা দ্বারা সুন্দরবনের অশেষ ক্ষতি সাধিত হয়। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ভূমিকম্প ছিল আরও ভীষণ। এই ভূমিকম্পনে পূর্ব-পাকিস্তান ও তথা সুন্দরবনের বিশেষ ক্ষতি সাধিত হয়।

সুন্দরবন ধ্বংসের শেষ বা চতুর্থ কারণ মগ ফিরিঙ্গিদের অমানুষিক অত্যাচার। ঝটিকা, প্লাবন ও ভূমিকম্পের সঙ্গে সঙ্গে আরাকানবাসী মগ ও পাশ্চাত্য দেশ হইতে আগত ফিরিঙ্গি জলদস্যুদের অত্যাচার চরমে পৌঁছিয়া দেশব্যাপী দারুণ অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছিল। ফিরিঙ্গি জলদস্যুদিগকে হারমাদ বলিত। ইহারা কলিকাতার দক্ষিণাংশে অত্যাচারের ষ্টীমরোলার চালাইয়া তাহাদের অধীন করিয়া লইয়াছিল। মগেরা সুন্দরবনে কোন কোন স্থানে লোকশূন্য করিয়া "মগের মুল্লুকে" পরিণত করিয়াছিল।

বিখ্যাত ফরাসী পর্যাটক বর্ণিয়ার বলেন যে জলপথে ও স্থলপথে লুঠতরাজ করাই পর্তুগীজ জলদস্যুদের প্রধান ব্যবসায় ছিল। বিভিন্ন প্রকার জাহাজের সাহায্যে তাহারা বাংলা দেশের মধ্যে শতাধিক মাইল প্রবেশ করতঃ লুটতরাজ করিয়া যাইত। ইহারা হঠাৎ আক্রমণ করিয়া মনুষ্যবসতিপূর্ণ গ্রাম, নগর, হাট-বাজার, বিবাহ মজলিস্ লুটপাট করিয়া অর্থ ও জিনিষপত্র লইয়া উধাও হইত। শিশু ও নারীদের বন্দী করিয়া তাহাদের উপর অমানুষিক অত্যাচার চালাইত। কোন কোন স্থানে তাহারা অগ্নি সংযোগ করিয়া ধ্বংস করিয়া দিত।

অন্য একটি বিবরণে জানা যায় যে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে আরাকান অধিপতি দক্ষিণ বঙ্গ ধ্বংস করিয়া উহার অধিবাসীদিগকে বন্দী করিয়া লইয়া যায়। মগদিগের অত্যাচারে সুন্দরবন প্রদেশের অধিবাসীরা এ সময় স্থান ত্যাগ করিয়া অন্যদিকে হিজরত করে। এই সমস্ত বিবরণ হইতে জানা যায় যে সুন্দরবন এককালে জনবহুল স্থান এবং উর্বর ক্ষেত্র ছিল। পর্তুগীজ ও আরাকানীজ দস্যুদল মানুষ ধরিয়া ক্রীতদাসের ব্যবসায় চালাইত।

"ইষ্ট ইণ্ডিয়া ক্রোনিকল্" হইতে জানা যায় যে ১৭১৮ খৃষ্টাব্দে মগেরা এই প্রদেশের ১৮০০ অধিবাসীকে বন্দী করিয়া লইয়া তাহাদের রাজার সম্মুখে উপস্থিত করে। আরাকান রাজ তাহাদের মধ্য হইতে একদলকে বাছিয়া লইয়া নিজের দাসত্ব কার্যে নিয়োগ করেন। অবশিষ্ট লোকদিগকে গলায় দড়ি বাঁধিয়া বাজারে বিক্রয় করা হয়। এই দাসগণ জমিচাষের কার্যে নিযুক্ত হয়। মাসিক খোরাকের জন্য প্রত্যেকের ১৫ সের করিয়া চাউল নির্ধারিত ছিল। এই সমস্ত অত্যাচারের কাহিনী আমাদিগকে আরব জগৎ ও রোম সাম্রাজ্যের প্রাচীন কালীন ভয়াবহ দাসত্ব প্রথার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

অধ্যাপক স্যার যদুনাথ সরকার তদীয় মোঘল আমলের ইতিহাস গ্রন্থে মগ পর্তুগীজদের অমানুষিক অত্যাচার সম্পর্কে এক হৃদয় বিদারক বর্ণনা দিয়াছেন। তিনি উক্ত বিবরণীতে শামসুদ্দিন তালিস লিখিত ফার্সি গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছেন। উক্ত বিবরণীতে আছে ঃ

—মোগল সম্রাট আকবরের সময় হইতে শায়েস্তা খাঁ কর্তৃক চট্টগ্রাম বিজয় পর্যন্ত আরাকানীজ মগ ও পর্তুগীজ জলদস্যুগণ জলপথে আসিয়া এদেশে লুণ্ঠন করিত। তাহারা হিন্দু, মুসলমান, আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলকেই বন্দী করিয়া তাহাদের হাতের তালুতে একটি ছিদ্র করিয়া উহার মধ্যে সরু বেত ঢুকাইয়া দড়ির মত করিয়া বাঁধিয়া রাখিত। জাহাজে উঠাইয়া একজনের উপর আর একজনকে চাপা দিয়া পাটাতনের নিম্নে ফেলিয়া দিত। প্রতি সন্ধ্যায় ও সকালে পাখীদের খাদ্যের ন্যায় তাহাদিগকে চাউল ছড়াইয়া খাইতে দিত। যে সমস্ত বন্দী এত জুলুমের পরও বাঁচিয়া থাকিত তাহাদিগকে ক্ষমতানুযায়ী কাজে লাগাইত এবং অমানুষিকভাবে নির্যাতন চালাইত। আবার কোন কোন সময় বন্দীদের লইয়া ওলন্দাজ, ফরাসী ও ইংরেজ বণিকদের নিকট ক্রীতদাসরূপে বিক্রয় করিত। ফিরিঙ্গি দস্যুরা এই বিক্রয় কার্যে লিপ্ত থাকিত। বহু উচ্চ বংশীয় পুরুষ ও মহিলা দাসদাসী রূপে বিদেশে ব্যবহৃত হইত। ঐ সমস্ত দস্যুদের নির্মম অত্যাচারে তথায় বর্তমানে একখানা বসতবাটী অথবা আলো জ্বালিবার কোনও লোক নাই। উপরোক্ত অত্যাচারের কাহিনী শ্রবণ করিলে শরীর শিহরিয়া উঠে। মনে হয় এও কি বিশ্বাস্য? এই ধরনের অত্যাচারের ফলে যে সুন্দরবন জনমানব-

শূন্য হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা একেবারেই নিঃসন্দেহ। সুখের বিষয় বাংলার তৎকালীন মোঘল সুবেদার শায়েস্তা খাঁ মগ-ফিরিঙ্গিদের অত্যাচার কঠোর হস্তে দমন করেন। যে ভাবে দস্যুগণ এদেশে অত্যাচার চালাইয়াছিল, ঠিক সেইভাবেই তাহারা অত্যাচারিত হইয়া চিরদিনের জন্য এদেশ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। আমাদের দেশে কোন অন্যায়, অবিচার ও জুলুম হইলে এখনও লোকে উহাকে "মগের মুল্লুক" বলিয়া তুলনা করে। অত্যাচারী বা অন্যায়কারীকে শাস্তি দিতে হইলে লোকে বলে "শায়েস্তা" করিয়া দিব। কথা দুইটির উৎপত্তি ঐ সময় হইতে এদেশে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে।

অধুনা সুন্দরবন ধ্বংশের আর একটি অস্বাভাবিক কারণ দেখা যাইতেছে। সম্প্রতিকালে একাধিকবার সুন্দররনের জঙ্গলে আগুন ধরিয়া অসংখ্য বৃক্ষলতা পুড়িয়া ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। কেহ কেহ বলেন বৃক্ষে বৃক্ষে ঘর্ষণ লাগিয়া এই অগ্নুৎপাতের কারণ ঘটায়। স্থানীয় লোকেরা বলে দুষ্কৃতিকারীর দল জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া বসতি স্থাপন ও ধান্যের আবাদ প্রস্তুতের জন্য এইভাবে আগুন ধরাইয়া জাতীয় সম্পদের সর্বনাশ করে। শেষোক্ত কারণই বিশেষ প্রণিধান যোগ্য। চাঁদপাই ফরেষ্ট অফিসের কয়েক মাইল দক্ষিণে একই বৎসর (১৯৬৫ সাল) দুইবার জঙ্গলে আগুন লাগে। গত ১৯৬৫ সালের মে মাসের প্রলয়ংঙ্করী ঝড়ে সুন্দরবনের অসংখ্য বৃক্ষ উৎপাটিত হয়। বহু সংখ্যক হরিণ ও কয়েকটি ব্যাঘ্রও ঝড়ের আক্রমণে মারা যায়। ঝড়ের পর পর যে আগুন লাগে তাহাতে অসংখ্য বৃক্ষ ভষ্মীভূত হয়। সুন্দরবনের কর্দমাক্ত মৃত্তিকাও তৎসহ পুড়িয়া যায়। প্রায় এক হাজার একর ভূমির জঙ্গল অকালে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। অনুরূপ দৈব দুর্বিপাক যথাঃ- ঝড়, প্লাবন ও সর্বদা দুষ্কৃতিকারীদের দ্বারা সুন্দরবনের সম্পদ অপহরণ প্রভৃতি কারণেও সুন্দরবন দ্রুত ধ্বংসের দিকে আগাইয়া যাইতেছে।

একটি দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য শতকরা ২৫ ভাগ ভূমিতে জঙ্গলের প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের দেশে উহার অর্ধেক পরিমাণ জঙ্গলও নাই। সুন্দরবন ধ্বংস হইলে দেশের সমূহ সর্বনাশ উপস্থিত হইবে। বাকেরগঞ্জ, নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম জিলার দক্ষিণাংশ যেভাবে জলোচ্ছাস ও প্লাবনের ধ্বংসলীলা চলিতেছে তাহাতে সমুদ্র তীরবর্তী সমগ্র এলাকার গভীর জঙ্গল প্রস্তুত করিলে দেশের সমূহ উপকার সাধিত হইতে পারে বলিয়া মনে করি।

সুন্দরবনের পুরাকালীন জনপদ।

।। পাঁচ ।।

অতি প্রাচীন কাল হইতেই এদেশে সুন্দরবনের অস্তিত্ব আছে। তবে পূর্বে যে সমস্ত স্থান জুড়িয়া সুন্দরবন ছিল, এখন তাহার বহুস্থানে মনুষ্য বসতি ও ফসলের জন্য আবাদভূমি ও বিলে পরিণত হইয়াছে। বহু ঘাত-প্রতিঘাতের পরও সুন্দরবন টিকিয়া আছে, ইহাই আশার কথা। তোডরমল্লের রাজস্ব তালিকা উদ্ধৃত করিয়া মিঃ ব্লকম্যান দেখাইয়াছেন যে, উত্তরদিকে প্রায় চারিশত বৎসরের মধ্যে সুন্দরবনের কোন পরিবর্তন সাধিত হয় নাই। কারণ এই সময়কার রাজস্বের পরিমাণ গড়ে প্রায় একরূপই ছিল। সুন্দরবন অঞ্চলে মনুষ্য বসতি ছিল এবং কোথাও কোথাও ছোট খাট নগর গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহাই আমরা আলোচনা করিব। মুসলমান আমলের পূর্বে বৌদ্ধ ও আদিম অধিবাসীরাই (Aboriginals) এদেশের প্রধান বাসিন্দা ছিল। প্রাচীন আমলের বুদ্ধমূর্তি ও অন্যান্য নিদর্শন বৌদ্ধ জাতির অস্তিত্বের প্রমাণ দেয়। মুসলমান আক্রমণের পূর্বে এদেশে কায়স্থ-ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বর্ণ হিন্দুদের বসতি ছিলনা। মোঘল আমলে ভৈরব ও কপোতাক্ষী তীরে হিন্দু সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল।

আচার্য স্যার প্রফুল্ল চন্দ্র রায় তাঁহার আত্মজীবনী গ্রন্থের প্রথমেই উল্লেখ করিয়াছেন :— "১৪শ, ১৫শ, ও ১৬শ শতাব্দীতে মুসলমান পীরগণ প্রথম ধর্ম প্রচারক সুলভ উৎসাহ লইয়া এই যশোর অঞ্চলে ইসলাম ধর্মের পতাকা বহন করিয়াছিলেন এবং তথায় লোক বসতি গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। এই অঞ্চলের ইতস্ততঃ বহু গ্রামের নামই তাঁহার জলন্ত সাক্ষ্য স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। যথা :— ইসলামকাটী, মামুদকাটী, হোসেনপুর, হাসনাবাদ (হোসেন- আবাদ) ইত্যাদি। ইসলামের এই অগ্রদূতের মধ্যে খাঞ্জা আলীর নাম সর্বপ্রধান। ইনিই ১৪৫০ খৃষ্টাব্দে বাগেরহাটের নিকট বিখ্যাত ষাটগুম্বজ নির্মাণ করেন। রাড়ুলীর প্রায় দশ মাইল দক্ষিণে আর একটি মস্‌জিদও এই মুসলমান পীরের নির্মিত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে।

"সুন্দরবন অঞ্চল আবাদ করিবার সময় কতকগুলি লোক জঙ্গল পরিস্কার করিতে করিতে কপোতাক্ষী নদীতীরে চাঁদখালীর প্রায় ছয় মাইল দক্ষিণে, একটি প্রাচীন মসজিদ মৃত্তিকার নিয়ে প্রোথিত দেখে, সেইজন্য তাহারা গ্রামের নাম রাখে "মসজিদকুড়"। এই মসজিদটি দেখিলেই বোঝা যায় যে ইহা ষাটগুম্বজের নির্মাতারই কীর্তি"।

ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে গাঙ্গেয় বদ্বীপের দক্ষিণভাগের সর্বত্র সুন্দরবন ছিল। মুসলমানেরা এদেশে আগমন করতঃ ব্যাপকভাবে জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া তুলিয়াছে। বহিরাগত মুসলমানেরাই বসবাস আরম্ভ করিয়া এতৎপ্রদেশে চাষাবাদ করিয়া জমিতে ফসল উৎপন্ন করিয়া জীবন ধারণ করিত। খানজাহান আলী এদেশে অসংখ্য জলাশয়, মসজিদ ও ইমারত গড়িয়া বহু জনপদের সৃষ্টি করেন। যশোরের বারবাজার হইতে মুরলী কসবা হইয়া, পায়গ্রাম কসবা, দীঘলীয়া ও সেনহাটি হইয়া বাগেরহাট পর্যন্ত তাঁহার রাস্তার চিহ্ন অদ্যাপি বিদ্যমান। বঙ্গোপসাগরের তীরে এই সুন্দরবন অঞ্চলে তিনি ইসলামী কৃষ্টি ও সভ্যতা গড়িয়া দেশব্যাপী এক নবযুগের সূচনা করেন। এল, আর, ফকাস বলেন :— "পীর খানজাহান আলী পঞ্চদশ শতকে বহুদিন যাবৎ দক্ষিণ বঙ্গ শাসন করেন। বাগেরহাটের সন্নিকটে তঁহার সমাধি মন্দির, দীঘি, মসজিদ, রাস্তাসমূহ তাঁহার কীর্তি তারস্বরে ঘোষণা করিতেছে।" তাঁহারই কিছু কাল পরে খলিফাতাবাদ (বর্তমান বাগেরহাট) বাংলার স্বাধীন সুলতান হোসেন শাহের সুযোগ্য পুত্র নসরত শাহের রাজধানী ছিল। নসরত শাহ এইখানে বসিয়া কিছুদিন সুন্দরবন অঞ্চল শাসন করেন এবং তথা হইতে নিজনামে মুদ্রাংকণ করেন।

খুলনা গেজেটিয়ার প্রণেতা এল, এস, এস, ওমালী আই, সি, এস, বলেন :— "The carliest ttaditions of the district arc connected not with any ancient Budhist or Hindu Kingdom but with a Mohammedan called Khanjahan Ali or more generally Khanja Ali. Local legend relates that he came here over four centuries ago to reclaim and cultivate the

মসজিদকুড়ের মসজিদ, আমাদি—৪০

(প্রাকৃতিক বিপ্লবে মসজিদটি জঙ্গলাবৃত হয়, বহু বৎসর পরে জঙ্গল আবাদ করার সময় মৃত্তিকা গর্ভে ইহা আবিষ্কৃত হয়)

Sundarbans which were then waste and covered with forest." অর্থাৎ "প্রাচীন কালীন প্রবাদ হইতে ইহাই জানা যায় যে, এই জিলার ইতিহাসে কোন বৌদ্ধ বা হিন্দু রাজত্বের সম্পর্ক ছিলনা। খানজাহান আলী বা খাঞ্জালী নামক জনৈক মুসলমানের নামই সর্বাগ্রে শ্রুত হয়। স্থানীয় কাহিনীতে জানা যায়, তিনি চারি শতাব্দী পূর্বে যখন এদেশ জঙ্গলাকীর্ণ ছিল, তখন সুন্দরবন আবাদযোগ্য করার জন্য এদেশে শুভাগমন করেন।"

মিঃ ওয়েষ্টল্যাণ্ড তাঁহার প্রণীত Report on Jessore (যশোরের ইতিবৃত্ত) পুস্তকে বলিয়াছেন :— "চতুর্দশ হইতে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত মুসলমান পীর ও ধর্মযাজকগণ ইসলামের মহিমা প্রচারের উদ্দেশ্যে যশোর অঞ্চলে আগমন করিয়া জঙ্গল আবাদ, পুষ্করিণী খনন এবং দালান কোঠা নির্মাণ করিয়া মানুষের আবাদযোগ্য ভূমি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, দ্বাদশ জন আউলিয়া সর্বপ্রথম যশোরের উত্তর পশ্চিমে যে স্থানে অবস্থান করেন তদনুসারে ঐ স্থানের নাম হয় বারবাজার। গরীবশাহ ও বোরহানুদ্দীন মুরলীতে (যশোর টাউন) ইস্‌লাম প্রচার করেন। অন্যান্য কতিপয় আউলিয়া চট্টগ্রাম ও সিলেটের দিকে গমন করিয়াছিলেন। খানজাহানের দুইজন শিষ্য আমাদী গ্রামে বসতি স্থাপন করতঃ ইসলাম প্রচার করেন। তাঁহাদেব নাম বুড়া খাঁ (বোরহান খাঁ) ও ফতে খাঁ। এই সমস্ত প্রমাণ হইতে ইহাই প্রতীত হয় যে মুসলমানেরা প্রধানতঃ সুন্দরবন আবাদ করিয়া তথায় মানব সভ্যতা গড়িয়া তোলে।

রামপাল থানার হুড়কোর ঝলমলিয়া দীঘি এবং কালেখাঁর বেড়ের দীঘি খানজাহান আলীর সময় খনিত বলিয়া প্রবাদ আছে। হুড়কোব দীঘিতে একটি পাকা ঘাট ছিল। একটি রাস্তা পেড়ীখালির মধ্য দিয়া এই দীঘিতে আসিয়াছিল। প্রতি বৎসর রাস পূর্ণিমার সময় এখানে মেলা হয়। পেড়ীখালি গ্রামে নারিকেল বুনিয়ার দীঘি ও ফুলপুকুরিয়ার দীঘি আছে। থানার উত্তর পার্শ্বে রামপাল ও শ্যামপাল নামক দুই ভাইয়ের দীঘি। প্রত্যেকটি দীঘির জল সুপেয়। চাঁদপাই গ্রামে একটি পুরাতন পুকুর ও মাজার আছে। কথিত আছে এখানে বাছের শাহ ও মেছের শাহ ফকির জঙ্গল আবাদ ও ইসলাম প্রচার করেন। তাঁহাদিগকে তয়েবাড়ীর ফকির বলা হয়। এখানে প্রতি বৎসর মেলা বসিয়া থাকে। খান

জাহান ও হোসেনশাহী বংশের ইতিবৃত্ত দ্বিতীয় খণ্ডে পৃথকভাবে সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে।

বাগেরহাট থানার অন্তর্গত যাত্রাপুর বাজারের তিন মাইল উত্তরে বিখ্যাত অযোধ্যার মঠ অবস্থিত। কে বা কাহারা কোন্ প্রাচীনকালে বঙ্গোপসাগরের অদূরে সুন্দরবন আবাদ করিয়া লোকালয় স্থাপন করিয়াছিলেন এবং এই ঐতিহাসিক ও গগনচুম্বী মঠ নির্মাণ করেন তাহা জানিবার সঠিক উপায় নাই। ইষ্টক নির্মিত এই বিরাট মঠ আজিও উহার প্রাচীনত্বের সাক্ষ্য দিতেছে। দেশ বিদেশ হইতে অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিরা এই মঠ পরিদর্শন করিতে এখানে আসিয়া থাকেন। অযোধ্যার মঠের সহিত রামায়ণে বর্ণিত প্রাচীন অযোধ্যা নগরীর কোন সম্পর্ক নাই। এতদঞ্চল এককালে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের দ্বারা অধ্যুসিত ছিল। সম্ভবতঃ কোন বৌদ্ধ ভিক্ষুর সম্মানার্থে এই মঠ নির্মিত হইয়া থাকিবে। গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে এবিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি।

সম্রাট আকবরের সময় রাজা প্রতাপাদিত্যের পিতা বিক্রমাদিত্য ও তদীয় ভ্রাতা বসন্ত রায় যশোহর রাজ্যের প্রতিষ্ঠার জন্য বিশ বর্গ মাইল ব্যাপী গভীর জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া জনাকীর্ণ করিয়াছিলেন। এই স্থানেই যশোর রাজ্যের রাজধানী গড়িয়া উঠিয়াছিল। গৌড়ের প্রচুর ধনসম্পদ মুসলীম বাদশাহের কর্মচারী বিক্রমাদিত্য ও তদীয় ভ্রাতা বসন্ত রায়ের হস্তগত হয়। তাঁহারা এই ধনসম্পদ সুদূর সুন্দরবন অঞ্চলে আনিয়া একটি ক্ষুদ্রায়তনবিশিষ্ট রাজ্য গঠন করেন। ইহাই পরবর্তী কালের ইতিহাস প্রসিদ্ধ রাজা প্রতাপাদিত্যের যশোর রাজ্য। এই স্থান হইতে ক্রমাগত সুন্দরবনের মধ্যে বসতি গড়িয়া উঠিতে থাকে। চাকশ্রী নামক দ্বীপে বসন্ত রায়ের রাজধানী এবং যশোর রাজ্যের নৌবাহিনীর কেন্দ্র ছিল। তখন হইতে এই অঞ্চলেও মনুষ্য বসতি গড়িয়া উঠে। চাকশ্রীতে মোঘল আমলে নির্মিত একটি মস্‌জিদ অদ্যাপি বিদ্যমান। স্থানীয় বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিরা বলেন এককালে তথায় সুন্দরবনের জঙ্গল মধ্যে সুশ্রী মৌচাক শোভা পাইত সেজন্য গ্রামের নাম হইয়াছে চাকশ্রী।

বর্তমান সুন্দরবনের প্রান্তসীমা বেদকাশী গ্রাম। তুর্ক-আফগান আমলে খালেস খাঁ নামে এক ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি এখানে একটি বিরাট দীর্ঘিকা খনন করেন। তিনি ইস্‌লাম প্রচারক ছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে। দীঘির উত্তরদিকে একটি বাড়ীর ভগ্নাবশেষ ও গড়খাই আছে। এখানে পরে একটি কালী মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। উহার বিশেষ চিহ্ন এখন নাই। কিন্তু জলাশয়টি দেশবাসীর অশেষ কল্যাণ-সাধন করিতেছে। সতীশবাবু বলেন, হিন্দু মুসলমানের মিলন প্রতীক চিহ্ন হিসাবে এই দীঘিটির নাম হয় কালীখালাস খাঁ। কিন্তু আমরা স্থানীয় তদন্তের ফলে জানিতে পারিয়াছি যে ঐ দীঘির নাম কোন দিনই কালী খালাস খাঁ দীঘি ছিল না। উহা পূর্বের ন্যায় এখনও সকলের নিকট খালেস খাঁ বা খালাস খাঁ দীঘি নামে পরিচিত। বেদকাশী গ্রামে বড় বড় প্রস্তর পড়িয়া আছে। এখানে যত্রতত্র ইষ্টক পাওয়া যায়। একটি পুরাতন বাড়ীর ভগ্নাবশেষকে লোকে বড়বাড়ী বলে, সেখানে জাহাজ ঘাটা বা ডকের চিহ্ন পরিদৃষ্ট হয়। খালেস খাঁর দীঘি ব্যতীত এই গ্রামে আরও তিনটি পুরাকালীন দীঘি আছে। উহার নাম যথাক্রমে রত্নদীঘি, ডুই সতীনের পুকুর এবং লোনাদীঘি। শেষোক্ত জলাশয় সর্বাপেক্ষা বৃহৎকায়। প্রবাদ আছে যে ধনপতি সওদাগার রত্নদীঘি খনন করেন। ডুই সতীনের পুকুরে ইষ্টক ও প্রস্তর অসংখ্য আছে। বড় বাড়ীর সন্নিকটে অট্টলিকার ভগ্নাবশেষ আছে। এখানে প্রস্তর নির্মিত থাম ও তীর আছে। বাড়ীর চতুর্দিকে প্রাচীরের চিহ্ন আছে। খালেস খাঁ জঙ্গল আবাদ করিয়া সর্বপ্রথম বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন পঞ্চদশ শতকে। পরবর্তী শতাব্দীতে বসন্তরায় তাঁহার রাজধানী নির্মাণ করিয়া এই স্থানকে সুসজ্জিত করিয়াছিলেন। সুন্দরবনের গভীর অরণ্যানীর মধ্যে এই ধরণের জনবসতি এইভাবে স্থাপিত হইয়াছিল

বেদকাশীর উত্তরে কপোতাক্ষীর তীরে গোবরা গ্রাম। কপোতাক্ষ এক সময় পদ্মার মিষ্ট জল বহন করিয়া সুন্দরবনাঞ্চলে পৌঁছাইয়া দিত। সেইজন্য এখানে সুন্দর ধান্য ফসল ফলিত। কপোতাক্ষীর সে মিষ্ট জল আর নাই। সর্বত্রই লবণাক্ত, সেজন্য নদী তীরবর্তী জমিতেও সুন্দর ফসল ফলেনা। মিঃ ওমালী বলেন যে কর্ণেল গ্যাষ্ট্রিল গোবরা গ্রামের দক্ষিণে একটি ইষ্টক নির্মিত বড় বাড়ীর ভগ্নাবশেষ দেখিয়াছিলেন। ঐ বাড়ীতে একটি প্রাচীন প্রাঙ্গণ, বাগিচা এবং বৃক্ষলতা ছিল। উক্ত বাড়ীর কে বা কাহারা মালিক ছিল জানা যায় নাই।

ইংরেজ আমলে স্যার ডানিয়েল হ্যামিল্টন কতৃক গোসবা নামক স্থানে সুন্দরবনের মধ্যে একটি আধুনিক সহর নির্মিত হয়। ইহা আদর্শ কৃষি উপনিবেশ। এখানে অতিথিশালা, পথঘাট ও সুপেয় জলের বন্দোবস্ত আছে। বর্তমানে উহা ভারতের অন্তর্গত।

পাইকগাছা থানার মধ্যে মহারাজপুর গ্রামে মৃত্তিকা গর্ভে প্রাচীনকালীন ইষ্টক প্রাচীর পাওয়া গিয়াছে। ঐ গ্রামে তিনটি ভিটায় ইষ্টক নির্মিত বাটীর চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে। শাকবা'ড়ে নদীর তীরে লবণের কারখনার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছিল। সেখানে দশ বার হস্ত দীর্ঘ পাকা গাঁথুনী মৃত্তিকা গর্ভে পাওয়া যায়। স্থানীয় বিজ্ঞ লোকেরা উহাকে একটি বৃহৎকায় লবণ প্রস্তুতের কারখানা বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। মদিনারাবাদে অনেকগুলি পুরাতন কবরের নিদর্শন এবং অসংখ্য পুরাতন কড়ি পাওয়া গিয়াছে। কড়ি দিয়া এককালে ক্রয় বিক্রয় চলিত তাহা সহজেই অনুমেয়। মাত্র ৮০ বৎসর পূর্বে এইখানে জঙ্গল আবাদ করিয়া বসতি স্থাপিত হয়। এখানে মৃণ্ময় পাত্র নির্মাণের যন্ত্রপাতি, প্রচুর পরিমাণে পুরাকালীন ইষ্টক ও ঝামা পাওয়া গিয়াছে। কয়রা গ্রামে ইটখোলার পুকুর নামে একটি প্রাচীন পুকুর আছে। এখানে পাকা ঘাট ও রাস্তার চিহ্ন আছে। প্রাক্-মোঘল ও মোঘল আমলে এতদঞ্চলে জঙ্গল মধ্যে যে বসতি গড়িয়া উঠিয়াছিল, ঝটিকা ও প্লাবনে তাহা ধ্বংস প্রাপ্ত হয় এবং মানুষ অন্যত্র হিজরত করে। তাহাদের অনেকে আবার ইংরেজ আমলে এখানে পুনরায় বসতি স্থাপন করিয়াছিল।

বর্তমানে যেখানে মনুষ্য বসতি পূর্বে সেখানে সুন্দরবন ছিল। আবার বর্তমানে যেখানে সুন্দরবন সেখানে ভবিষ্যতে মনুষ্য বসতির সমূহ সম্ভাবনা আছে। এখন যে স্থান সুন্দরবনে পরিপূর্ণ সেখানে পূর্বে স্থানে স্থানে মনুষ্য বসতি ছিল একথা অনেকেই জানেনা এবং উহা বিশ্বাস করিতেও অনেকের কষ্ট হয়। ইংরেজ লেখকদের অনেকেরই মত সুন্দরবনের মধ্যে কখনও সুদৃশ্য বাসভূমি ছিলনা। মাঝে মাঝে দুঃসাহসী লোক আবাদ করার চেষ্টা করিলেও তাহা সব সময়ে সফলকাম হয় নাই। অধ্যাপক সতীশচন্দ্র প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, এতদঞ্চলে এবং চন্দ্রদ্বীপ, নোয়াখালীর সন্দ্বীপ প্রভৃতি অঞ্চলে সভ্য জাতির আবাস-

ভূমি প্রাচীনকাল হইতে ছিল। আমরা এই অভিমতকে সঠিক ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। কোন সঠিক তথ্যের ভিত্তি না থাকিলে তাহা ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না। একথা প্রমাণিত হয় যে, সুন্দরবনের সর্বত্র না হইলেও মধ্যে মধ্যে সুন্দর জনবসতি গড়িয়া উঠিয়াছিল। তবে আদিলপুরের চণ্ডভণ্ড জাতি এবং যশোর খুলনার বিভিন্ন স্থানে আদিম অধিবাসীরা বসবাস করিত। খুলনার বিরাট দক্ষিণাঞ্চলে যে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের ঘনবসতি এবং কৃষিকার্যে তাহাদের দক্ষতা ইহাই প্রমাণ করে যে মুসলমানদের পূর্বেও এই জাতীয় লোকেরা এদেশের অনেকস্থান আবাদ করিয়াছিল। মিঃ ফকাস এই জাতিকে আদিম জাতির অন্তর্ভুক্ত এবং পোদ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সুন্দরবন অঞ্চলে যুগ যুগ ধরিয়া ইহাদের দান অস্বীকার করিলে এই বিরাট একটি জাতির প্রতি অবিচার করা হইবে।

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়গণের ন্যায় নমঃশূদ্র সমাজও ফরিদপুর, বাকেরগঞ্জ, যশোর ও খুলনা জুড়িয়া বসবাস করিতেছে। তাহারাও এদেশের এক প্রাচীন জাতি এবং এদেশে তাহাদের সভ্যতা ও কৃষ্টি গড়িয়া তুলিয়াছে। সুন্দরবন আবাদে এই জাতির অবদানও কম নহে। ফকাস সাহেবের মতে ইহারাও আদিম অধিবাসী শ্রেণীর মানব এবং চণ্ডাল জাতীয় হিন্দু সমাজ হইতে উদ্ভূত। কৃষিকার্যে এই উভয় জাতি বিশেষ দক্ষ এবং এদেশের মুসলমান ও অন্যান্য জাতি অপেক্ষা ইহারা জমিতে অত্যধিক ফসল ফলাইয়া থাকে। এই দুইটি জাতির লোকেরা জঙ্গল কাটিয়া মাটি তুলিয়া নিম্নস্থানকে সুউচ্চ করিয়া বহুস্থানে বসতি স্থাপন করিয়াছে।

সুন্দরবন চিরদিন আবাদ হইতে পারে নাই। এক সময় সুন্দরবন উঠিয়াছে এবং উহা আবাদ করিবার পর বসতি স্থাপিত হইয়াছে। আবার উহা জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে। সুন্দরবন ভ্রমণ কালে আমরা স্থানে স্থানে পুকুর, বাঁধা ঘাট, দুর্গ, মন্দির, বসতবাটীর চিহ্ন সচক্ষে দর্শন করিয়াছি। গভীর অরণ্যানীর মধ্যে এই সমস্ত স্থানে ঘনবসতির চিহ্ন দর্শন করা এক ভয়াবহ ব্যাপার। যেখানে ইষ্টক নির্মিত বসতবাটীর ভগ্নাবশেষ সেখানেই বাঘের আবাসভূমি। মানুষের আগমন বুঝিতে পারিলে শিকারীর ভয়ে বাঘ সরিয়া পড়ে। জনমানবশূন্য জঙ্গলে মনুষ্য বসতির চিহ্ন দর্শন আমাদের সুন্দরবন ভ্রমণের প্রধান আকর্ষণ ছিল।

একটি বিষয় স্মরণ রাখা আবশ্যক যে মনুষ্য বসতির পার্শ্বে যে সমস্ত বৃক্ষ পাওয়া যায় সুন্দরবনে তাহা জন্মে না এবং সুন্দরবনে যে সমস্ত বৃক্ষ বিদ্যমান, আবাদকৃত ভূমিতে তাহা দুষ্প্রাপ্য। সুন্দরবনের ভিতর কোন কোন স্থানে গাব, জাম, বট, জিওল গাছ প্রভৃতি দৃষ্টিগোচর হয়। এগুলি সুন্দরবনের বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যে পড়েনা। এই সমস্ত দর্শনে ইহাই প্রতীত হয় যে মানুষের দ্বারা এই সমস্ত বৃক্ষাদি এককালে রোপিত হইয়াছিল। আবার সুন্দরী, গরাণ, পশুর ইত্যাদি বৃক্ষ লোকালয়ে জন্মে না। তেমনই গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি পশু সুন্দরবনে নাই। আবার ব্যাঘ্র, হরিণ, বানর ইত্যাদি লোকালয়ে দুষ্প্রাপ্য। ইংরেজ লেখকদের নিকট ফ্লোরা ও ফনা শব্দদ্বয় সবিশেষ প্রিয়। মিঃ ফকাস প্রমুখ লেখকেরা বলিয়াছেন যে সুন্দরবনের ফ্লোরা (উদ্ভিদ) এবং ফনা (জীবজন্তু) লোকালয় হইতে পৃথক। সুন্দরবনে মৎস্য ও পক্ষী বহুলাংশে লোকালয় হইতে ভিন্ন ধরণের। ইহাই সুন্দরবনের বৈশিষ্ট।

সুন্দরবনের সর্বত্র না হইলেও মধ্যে মধ্যে সুন্দর মনুষ্য বসতি ছিল সেকথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। সুন্দরবনের প্রাচীন কীর্তি সমূহের ভগ্নাবশেষ এখনও বহুস্থানে বিদ্যমান। কিন্তু এখনও বহুস্থান মানুষের অগম্য রহিয়াছে এবং সমস্ত স্থান দর্শন করাও আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। কালীগঞ্জের নিকট শিব-বাটীতে মন্দিরের ভগ্নাবশেষ পাওয়া গিয়াছিল। যশোরের সর্বপ্রথম ম্যাজিষ্ট্রেট ও জজ হেংকেল সাহেব হেংকেলগঞ্জ (হিঙ্গলগঞ্জ) নাম দিয়া সুন্দরবন আবাদের জন্য একটি নগর স্থাপন করেন এবং উহার উত্তরসীমা নির্ধারণ করেন। হেংকেল সাহেব সুন্দরবন অঞ্চলে ১৬টি তালুকদারীর সৃষ্টি করেন এবং জঙ্গল কাটিয়া আবাদ করিবার জন্য নাম মাত্র খাজনায় জমি বন্দোবস্ত দেন। শুধু হিঙ্গলগঞ্জ নহে, হেংকেল সাহেব বাগেরহাটের কচুয়া এবং খুলনার চাঁদখালি সুন্দরবনের উত্তরসীমা নির্দেশ করেন। এই কেন্দ্রগুলিকে খাস-আবাদ নাম দেওয়া হয়। প্রতাপশালী জমিদারগণ সুন্দরবনের সর্বত্র এমনকি বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত জমির দখল দাবী করিয়া বসিলেন, তখন হেংকেল নদী তীরবর্তী স্থানে বরাবর পূর্ব হইতে পশ্চিম পর্যন্ত প্রায় শত মাইল পথ বাঁশ গাড়ীয়া সীমা নির্দেশ করেন। ইহাই হেংকেলের "বাঁশ গাড়ী" নামে সর্বজন বিদিত। জমিদারদের দাবীর উত্তরে রেভিনিউ বোর্ড তিন মাসের মধ্যে তাঁহাদের দাবীকৃত সীমানার বিবরণ দাখিল

করিতে বলেন। হেংকেলের মধ্যস্থতায় জমিদার ও সরকারের মধ্যে সুন্দরবনের সীমা শেষ পর্যন্ত মীমাংসা হয়। চাঁদখালীতে হেংকেল হিঙ্গলগঞ্জের ন্যায় একটি শহর নির্মাণ করেন। তাঁহার সময় একটি ইষ্টক নির্মিত কাছারীঘর নদীগর্ভে বিলীন হইয়াছে। সেদিনকার একটি দীঘি মাত্র আছে। উহার পার্শ্বে পুরাতন কয়েকটি বট বৃক্ষ দৃষ্ট হয়। আরও অনেক দক্ষিণে কপোতাক্ষী নদীতীরে জঙ্গল আবাদ করিয়া লোকে বসতি স্থাপন করিয়াছিল। কয়েকটি প্রাচীন দীঘি এখনও দৃষ্ট হয়। এখানে দিল্লীর সুলতান গিয়াসউদ্দীন বলবন মুদ্রিত ২টি এবং অন্য প্রাচীন-কালীন ৩৫টি মুদ্রা ইংরেজ আমলের প্রথমদিকে মৃত্তিকাগর্ভে পাওয়া যায়। উহার মধ্যে কয়েকটি মুদ্রা গৌড় সুলতান নাসিরউদ্দীন মাহমুদ শাহ অঙ্কিত। সব কয়টি মুদ্রাই বঙ্গদেশের টাঁকশালে মুদ্রিত হইয়াছিল।

বুড়ী গোয়ালিনীর অধীন ছদনখালীর জঙ্গলে ইষ্টক নির্মিত বাড়ীর ভগ্নাবশেষ পরিদৃষ্ট হয়। সিন্দুকখালীতে গাব, জাম, বটগাছ এবং লবন তৈয়ারীর চিহ্নস্বরূপ ইষ্টক নির্মিত উনান দৃষ্ট হয়। এখানে একটি লোহার সিন্দুক পাওয়া যায় বলিয়া স্থানের নাম হইয়াছে সিন্দুকখালি। তাম্বুলবুনিয়ায় নারিকেল, তাল, জাম গাছ ও বৃহৎকায় একটি দীঘি আছে। ঝুলঝুরির জঙ্গলে একটি তাল গাছ দৃষ্ট হয়। বিবি মাদে বা পতণী দ্বীপে ও সুপতি নদী তীরে ইষ্টক নির্মিত দশ বার হাত লম্বা উনান আছে। শরণখোলার দক্ষিণে ভোলা নদীর তীরে খুদিরামের চরে নারিকেল, জাম, তালবৃক্ষ ও দুবলা ঘাস আছে। টাইগার পয়েন্টের সন্নিকটে কালীদাহ নদীর মুখে নারিকেল ও কলাগাছ আছে। এখানে বট, তাল ক্ষুদেজাম এবং বোরই গাছও দৃষ্ট হয়। আমাদের একখণ্ড জমি বাণীশান্তা মৌজার খাজুরিয়া অঞ্চলে অবস্থিত। এই জমিও স্থানীয় বসতবাটী সমূহ জঙ্গল আবাদ করিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে। জঙ্গল ও জমির মধ্যে একটি ছোট নদী। পরিপক্ক হইলে অনেক সময় পার্শ্ববর্তী জঙ্গল হইতে হরিণ আসিয়া ধান খাইয়া যায়।

খোলপেটুয়া ও কদমতলীর মধ্যবর্তী তের্কাটী ভীষণ জঙ্গলাকীর্ণ স্থান। চুনানদী হইতে তের্কাটীর খাল, নৈহাটীর দোয়ানিয়া, মোড়লখালি ও পোদ-খালীর খাল এই জঙ্গলে প্রবেশ করিয়াছে। এই সমস্ত নদী ও খালের পার্শ্বে বসতবাটীর চিহ্ন আছে। তিওর ও পোদ জাতীয় লোকেরা এখানে বাস করিত বলিয়া অনেকেই মনে করেন। তিওর হইতে তিওরকাটী এবং পরে উহা তের্-

কাটীতে দাঁড়াইয়াছে। এই জঙ্গলে বসতবাটীর চিহ্ন ভাঙ্গা মৃণ্ময় পাত্র, বট, রয়না, সড়া, ক্ষুদেজাম, নিম ও অন্যান্য বৃক্ষ, দুর্বাঘাস প্রভৃতি দৃষ্ট হয়। ২/১টি ক্ষুদ্রকায় ইষ্টক স্তূপও আছে। পে'দখালীর পশ্চিমদিকে একটি দীঘি ও কোঠাবাড়ী আছে। এখানে একটি মস্‌জিদের ভগ্নাবশেষও দৃষ্ট হয় বলিয়া সতীশবাবু উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু আমরা উহার কোন সন্ধান পাই নাই। মামদো বা মাদার নদীর পার্শ্বে দুইটি পাকা ইমারতের ভগ্নাবশেষ আছে।

সুন্দরবনের বহুস্থানে নেমকখালাড়ী অর্থাৎ লবন প্রস্তুতের কারখানা ছিল। মলঙ্গীরা সুন্দরবনের মধ্যে কারখানা স্থাপন করিয়া লবন তৈয়ার করিত এবং এই ব্যবসায় তাহারা বিশেষ লাভবান হইত। মালঞ্চ, রায়মঙ্গল, শিবসা, পশর, আলকী প্রভৃতি নদীর পার্শ্বে বহু লবনের কারখানা ছিল। বর্তমানে এই সমস্ত কুটীর শিল্পের নাম নিশানা দেশ হইতে একরূপ মুছিয়া গিয়াছে। মারজাটার পার্শ্বে ভেদাখালীর জঙ্গল। দুবলা ভাবানী খালের উত্তর তীরে বহু সংখ্যক নেমকখালাড়ীর চিহ্ন ছিল এবং অদ্যাপি কিছু কিছু নিশানা বিদ্যমান থাকিয়া এই কুটীর শিল্পের অস্তিত্বের সাক্ষ্য দিতেছে। ত্রিকোণ দ্বীপেও নেমকখালাড়ীর চিহ্ন দৃষ্ট হয়। সুন্দরবনের আরও বহু স্থানে নেমকখালাড়ীর সরঞ্জাম পাওয়া গিয়াছে। এখনও বহুস্থানে মৃণ্ময় পাত্র ও বসতির নিদর্শন বিদ্যমান আছে। সুন্দরবনে পূর্বে লবণ ও কাগজ প্রস্তুতের কারখানার অসংখ্য প্রমাণ পাওয়া যায়। মলঙ্গী ও কাগচীরা এই ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিত। এজন্য সুন্দরবনে প্রচুর কাঁচামাল মওজুদ ছিল। উহার ব্যয়ও নগণ্য ছিল। ইংরেজ আমলে অত্যাচারমূলক আইন দ্বারা লবন প্রস্তুত নিষিদ্ধ করা হয়। এই আইন বলে বড়দল মোরেলগঞ্জ ও চালনায় তিনটি অফিস স্থাপিত হয়। তিন জন সবইন্‌সপেক্টর, ৬ জন জমাদার এবং ৬২ জন পিওন একজন প্রতাপশালী ইনস্‌পেক্টরের অধীনে লবণ প্রস্তুতের কার্যকলাপ পরিদর্শন করিত। দমনমূলক আইনের প্রকোপ এবং এই বাহিনীর অত্যাচারে সম্ভবতঃ লবন শিল্প দেশ হইতে দূরীভূত হয়। দরিদ্র জাতির পক্ষে সে এক করুণ ইতিহাস। ডি জুরিখ বলেন যে শুধু সন্দ্বীপে প্রস্তুত লবনের দ্বারা সমগ্র বঙ্গদেশের চাহিদা মিটিত। ইহাতেই জানা যায় যে তৎকালে লবন শিল্প কিরূপ উন্নতিলাভ করিয়াছিল।

উপরে বর্ণিত সমস্ত নিদর্শন হইতে ইহাই প্রতীত হয় যে, সুন্দরবনের সর্বত্র কোন একসময় ভয়াবহ ও বিপদসঙ্কুল স্থান ছিল না বরং স্থানে স্থানে মনুষ্য বসতি ছিল। আড়পাঙ্গাসীয়া ও মালঞ্চের মধ্যবর্তী জঙ্গলে হরিখালী ও পূর্ববর্ণিত সিন্দুকখালীতে ইষ্টক নির্মিত বাড়ীর ভগ্নাবশেষ আছে। বেয়ালাকয়লা দ্বীপের পার্শ্বে বিবির মাদিয়ায় পুরাতন রাস্তা আছে। উহাকে গোলাপদীখালীর আট বলে। ইহা প্রায় ১ মাইল লম্বা।

ধূমঘাট, জাহাজঘাটা, বসন্তপুর, মহৎপুর, নূরনগর প্রভৃতি স্থান জুড়িয়া সুন্দরবনের যে অংশে শহর গড়িয়া উঠিয়াছিল উহারই আশেপাশে আরও বহুদূর বেষ্টন করিয়া জঙ্গলের মধ্যে লোকালয় স্থাপিত হইয়াছিল। পরভাজ খাঁ নামক জনৈক পাঠান প্রতাপাদিত্যের বহু পূর্বে কালিগঞ্জের দক্ষিণে জঙ্গল আবাদ করিয়া বসতি স্থাপন করেন। কথিত আছে যে বঙ্গেশ্বর নবাব নুরুদ্দীনের শাসনকালে পরভাজ খাঁ নামক সেনাধ্যক্ষ যমুনা নদী তীরে এই স্থানে আসিয়া ঘাটী নির্মাণ করেন। তিনি এখানে একটি মস্‌জিদ নির্মাণ করেন। জঙ্গলময় স্থানে এখনও মস্‌জিদটি কোন প্রকারে টিকিয়া আছে। তাঁহারই নামানুসারে গ্রামের নাম হয় পরভাজপুর। ইহারই অদূরে মুকুন্দপুরের গড। আশাশুনি থানার অন্তর্গত প্রতাপনগর ও শ্যামনগরের মধ্যে গড়কোমলপুরে প্রতাপাদিত্যের গড় ও সেনানিবাস ছিল। প্রতাপাদিত্যের অন্যতম সেনাপতি খাজা কামালের নামানুসারে এই নগরীর নাম হয় কামালপুর, পরে ঐ নাম কোমলপুর এবং উহা হইতে বিকৃত হইয়া কোমরপুরে দাঁড়াইয়াছে। আশাশুনি বাজারের পশ্চিম পার্শ্বে গুতিয়াখালী নদী। উহার পশ্চিম দিকে সাঁইহাটী গ্রাম। এই স্থানে এক সময় গভীর জঙ্গল ছিল। স্থানীয় প্রবীণ লোকদের মুখে জানা যায় যে প্রায় শতাধিক বৎসর পূর্বে গভীর জঙ্গল আবাদ হয়। সেখানে কয়েকটি পাকা ইমারতের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। সাঁইহাটীর পার্শ্বে উজিরপুর গ্রাম। এখানে একটি বৃহদাকায় পাকা ইমারতের প্রাচীন ভগ্নাবশেষ ছিল। উহাকে সাধারণে, উজিরের বাড়ী বলে। দশালীয়া ও প্রতাপনগরে এখনও বিরাট গড় আছে এবং উহারই পার্শ্বে খোলপেটুয়া নদীর তীরে একটি মিষ্ট জলের পুকুর আছে। সুন্দরবনের কোথাও পানীয় জল পাওয়া যায় না। সবই লবনাক্ত। সেইজন্য বিশ মাইল

দূরে অবস্থিত থাকিলেও বহুলোক তথা হইতে নৌকাযোগে পানীয় জল সংগ্রহ করিয়া লয়। এই ধরনের পুষ্করিনী হইতে এককালে সুন্দরবনের একপ্রকার স্থানে কিছু লোক বসতি ছিল বলিয়া নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়। প্রতাপনগর হইতে উত্তরে বিছটগ্রাম। এখানে নৌবাহিনীর অধীনে সুন্দরবনের মধ্যে একটি ডক প্রস্তুত হইয়াছিল। এখানে বানিয়াপুকুর নামে একটি দীঘি ও বিরাটকায় গড়ের চিহ্ন বিদ্যমান। লঞ্চযোগে দক্ষিণ খুলনা ভ্রমণ করিলে এই সমস্ত ঐতিহাসিক স্থান ও কীর্তিরাজি পরিদৃষ্ট হয়।

হরিণঘাটার মোহনা হইতে চাঁদেরআড়া নদী পশ্চিম দিকে গিয়াছে। উহার পার্শ্বে এখনও পুকুর ও কলাগাছ আছে। সেখানে রাস্তার চিহ্ন এবং অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। প্রবাদ আছে যে এই চাঁদের আড়ায় বিখ্যাত চাঁদ সওদাগরের ডিঙ্গাগুলির পোতাশ্রয় ছিল। হরিণঘাটার পশ্চিম দিকে বাঘের কোণা (Tiger point) — উহার সন্নিকটে ইষ্টকের স্তূপ আছে। কেহ কেহ অনুমান করেন যে বৈদেশিক বাণিজ্যের সুবিধার্থে এখানে একটি পোতা-শ্রয় ও বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল। পশরের নিকট নন্দবালা নামক খালের উত্তর তীরে জঙ্গলের মধ্যে বকুল বৃক্ষ বেষ্টিত একটি দীঘি মনুষ্য বসতির কথা প্রমাণ করাইয়া দেয়। শেলা নদীর পার্শ্বে তাম্বুলবুনিয়ায় একটি জলাশয় ও উহার উত্তর পাড়ে নারিকেল ও খেজুর বৃক্ষ জঙ্গলের মধ্যে বিরাজ করিতেছে। খড়মা নদী হইতে সোনাখালী খাল দক্ষিণে শেলা নদীতে পড়িয়াছে। উহার পার্শ্বে অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ সুন্দরবনের জানোয়ার সমূহের আবাসভূমিতে পরিণত হইয়াছে।

কপোতাক্ষীর তীরে আমাদী গ্রামে পীর খানজাহান আলীর শিষ্যদ্বয় বুড়ো খাঁ ও ফতে খাঁ এতদঞ্চলে আবাদ করেন। ঐ গ্রামে তাঁহাদের সমাধি অদ্যাপি বিদ্যমান। সম্ভবতঃ ফতে খাঁর নামীয় ফতেকাটী গ্রামের প্রতিষ্ঠা হয়। এই সময় শিবসা নদীর তীরে পাটকেলপোতা মৌজায় অনেকগুলি ইষ্টক স্তূপ পাওয়া গিয়াছে। "পাটকেলপোতা" শব্দটী উহার পরিচয় দেয়। এখানেও পুরাকালে সুন্দরবনের মধ্যে জন বসতি গড়িয়া উঠিয়াছিল। এখানে শিবসা নদীর ভাঙ্গনকূলে মৃত্তিকার নিম্নে বহু ইষ্টক পাওয়া যায় এবং অনেক সময় উহার মধ্যে গৃহস্থের ব্যবহার্য প্রাচীন কালীন জিনিষপত্র পাওয়া গিয়াছে।

সবল ও লস্কর গ্রামের বিশালকায় দীঘিসমূহ এতদঞ্চলে সেকালের মনুষ্য বসতির পরিচয় দিতেছে। এই সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণ দ্বারা ইহাই প্রতীত হয় যে দক্ষিণ খুলনার সর্বত্র জন বসতি ছিল এবং পরে মগদের অত্যাচারে বা প্রাবৃতিক দুর্ঘটনার কবলে পড়িয়া লোকেরা স্ব স্ব স্থান ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যায়। পুনরায় এই সমস্ত স্থান জঙ্গলে পরিণত হয়। বহু পরে আবার জঙ্গল কাটিয়া এই সব স্থানে দ্বিতীয়বার মনুষ্য বসতি গড়িয়া উঠিয়াছে। যাহারা কাটি বা জঙ্গল কাটিয়া সর্বপ্রথম গ্রামের পত্তন করিয়াছিল তাহাদিগকে 'কাটিকাটা' বলা হয়। তাহারাই গ্রামের আদি বাসিন্দা বলিয়া গৌরব অনুভব করে। এদেশে 'কাটিকাটা' বংশকে গ্রামের সর্বাপেক্ষা সম্মানিত বংশ হিসাবে গণ্য করা হয়।

মঙ্গলা পোর্টের পশ্চিমে করমজলীর জঙ্গলে রাস্তা, পুকুর ও বাড়ীর ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। সেখানে গাবগাছ ও বকুলগাছ বহুকাল ধরিয়া বাঁচিয়া আছে। এখানে সুন্দরবনের দুষ্প্রাপ্য মাগুর ও কই মৎস্য প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। করমজলীর উত্তরে বানীশান্তা ও লাউডোবের আবাদ। এখানেও জঙ্গল কাটিয়া চাষীরা ধান্য ফসল ফলাইতেছে। কালিকাবাড়ীর খালের পার্শ্বে এক প্রকাণ্ড ইষ্টক স্তূপ পাওয়া গিয়াছিল। আমাদী ও বেদকাশীর দীঘি এবং অন্যান্য বহুস্থানের সুপেয় জলাশয় প্রভৃতি প্রাচীন নিদর্শন আজিও রক্ষিত আছে। শরণখোলা ফরেষ্ট অফিসের পশ্চিম দিকে ভোলা নদীর উপর প্রাচীর বেষ্টিত একটি বাড়ী ছিল, উহার ভগ্ন প্রাচীর অদ্যাপি বিদ্যমান। চাঁদপাই ফরেষ্ট অফিসের দক্ষিণ পূর্বে সোনামুখী খালের পার্শ্বে গভীর জঙ্গলের মধ্যে একটি ইটের পাজা পাওয়া গিয়াছিল। আড়ো শিবসা হইতে গ্যাওারখালী নদী উত্তর দিকে গিয়াছে। উহার তীরে একটি প্রকাণ্ড দীঘি প্রায় ভরাট হইয়া গিয়াছে। এই দীঘি গ্যাওারখালি দীঘি নামে সুপরিচিত। দীঘির পার্শ্ব দিয়া পুরাতন রাস্তার চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। এই স্থানে ব্যাঘ্রের আড্ডা খুব বেশী। সুউচ্চ স্থানে জোয়ারের জল না আসার জন্য এখানে সর্বদা ব্যাঘ্রদের আনাগোনায় ভরপুর থাকে। এখানে আরও একটি দীঘি আছে, ইহাকে লোকে বুড়ের পুকুর বলে। তথায় কয়েকটি বকুল ও গাবগাছ আছে। মুরলীর খাল পার্শ্বে জঙ্গলের মধ্যে অনেকগুলি পাকা বাড়ীর ভগ্নাবশেষ, গাব ও জিওলগাছ আছে।

সুন্দরবনের পশ্চিম দিকে নেটোর দোয়ানে ও মহিষাদল নদী। এই নদী হইতে একটু দক্ষিণ দিকে গিয়া তথা হইতে পশ্চিম দিকে বসতবাটীর সর্বপ্রকার চিহ্ন পরিদৃষ্ট হয়। একটি বাটীর ভগ্নস্তূপ এবং গোরস্থানের চিহ্ন আছে। গোরস্থানটি পাকা ইটের দ্বারা এককালে প্রস্তুত হইয়াছিল। ছাচনাংলা খালের পশ্চিম দিকে পাশখালী ভারানী এবং মঠের খাল। মঠের খালের পার্শ্বে একটি ইটের পাঁজা ছিল। এখানে বট ও গাবগাছ পরিলক্ষিত হয়।

পর্তুগীজেরা এদেশ হইতে চিরবিদায় লইয়াছিল কিন্তু মগেরা অনেকে বনাঞ্চলে বসতি স্থাপন করিয়া এদেশে থাকিয়া যায়। তাহারা পটুয়াখালী মহকুমার গুলিশাখালী থানার অধীন চাপালী, নিশানবাড়ী, মোধুবী, খাপরাভাঙ্গা প্রভৃতি স্থানে বসবাস করে। মগেরা সকলেই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। কয়েকসহস্র মগ— সবাই বাংলায় কথা বলে। কুকৃরী মুকৃরী, নলুয়া, কলমীচর ও খেপুপাড়ায়ও মগবসতি আছে। বরিশাল-খুলনার আদিম অধিবাসী, দক্ষিণ বাকেরগঞ্জের চণ্ডভণ্ড জাতি, যশোর-খুলনার পৌণ্ড্রগণ সর্বপ্রথম সুন্দরবনে বসতি স্থাপন করে। খানজাহান ও প্রতাপাদিত্যের পিতার ন্যায় দনুজমর্দনদেবও চন্দ্রদ্বীপে বনাঞ্চলে এক রাজ্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সেই সময় এখানে অসংখ্য নূতন বসতি গড়িয়া উঠিয়াছিল। তেতুলিয়া নদীর পশ্চিম তীরে কচুয়ায় চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যের রাজধানী ছিল। মগের অত্যাচারে বা নদী ভাঙ্গনে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়।

বরিশাল হইতে ৫ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে সুজাবাদ গ্রামে একটি পুরাতন দুর্গের ভগ্নাবশেষ আছে। সম্রাট শাহ্‌জাহানের পুত্র শাহ্‌সুজা যখন বাংলার সুবাদার ছিলেন তখন সুন্দরবনাঞ্চলে মগদিগের আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষার জন্য এই দুর্গটি নির্মাণ করাইয়াছিলেন। আজিও সুজাবাদ গ্রাম মোঘল যুবরাজ শাহ্‌সুজার নাম বহন করিয়া আসিতেছে। বঙ্গদেশের অখণ্ডত্ব রক্ষার জন্য তিনি নৌপথে অসভ্য মগদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে করিতে চট্টগ্রামের জলপথে নির্মমভাবে শত্রুহস্তে নিধন প্রাপ্ত হন। ইতিহাসের সে এক মর্মন্তুদ ঘটনা। শায়েস্তা খানের ভ্রাতা বোজর্গউমেদ খাঁ মগ অত্যাচার দূরীকরণে এক বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করায়

তাঁহারই নামানুসারে বাকেরগঞ্জের প্রধান একটি পরগণার নাম হয় বোজর্গ-উমেদপুর। দক্ষিণ বাকেরগঞ্জের স্থানে স্থানে এখনও প্রাচীন কালীন বহু জলাশয় ও অন্যান্য নিদর্শন পরিলক্ষিত হয়।

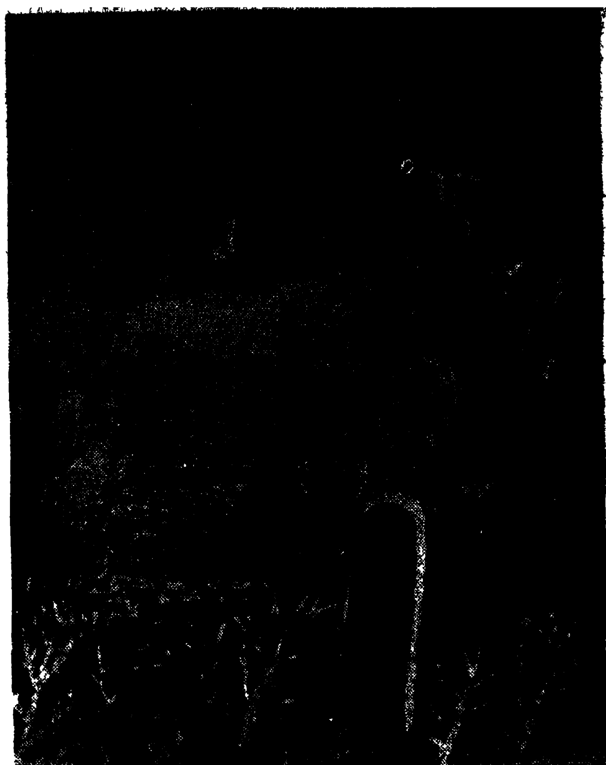
বনবিভাগের কতিপয় অভিজ্ঞ কর্মচারীর নিকট জানিতে পারি যে, সুন্দরবনের কোথাও একটি বিরাটকায় লোহার সিন্দুক আছে। বহুদিন ধরিয়া কেহ আমাদের এ সন্ধান দিতে পারে নাই। কয়েক বৎসর চেষ্টার পর সুন্দরবনের এক জন প্রবীন শিকারী আমাদের বলেন যে উক্ত সিন্দুক "বন্ধুর গাঙ্গের" পার্শ্বে এক জঙ্গলের মধ্যে মৃত্তিকায় প্রোথিত আছে।

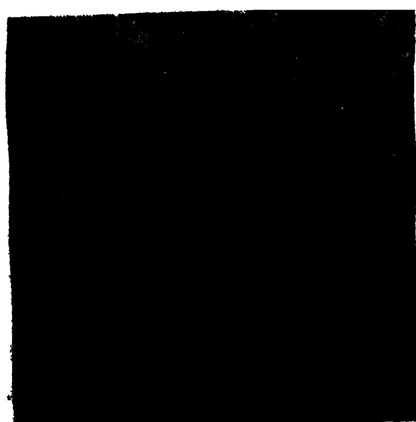
শিবসা নদীর পূর্বতীরে যে স্থান হইতে শেখের খাল পূর্ব দিকে গিয়াছে উহার সঙ্গমস্থলের জঙ্গলের নাম শেখেরট্যাক। সুন্দরবন ভ্রমণ-কালে একদা উত্তর দিক হইতে এই স্থানের মনোরম দৃশ্য অবলোকন করিতে করিতে আমরা একদল ভ্রমণকারী শেখেরট্যাকে উপস্থিত হই। সুন্দরবনের কেন্দ্রস্থলে এই স্থান অবস্থিত। কাঠুরিয়া ও ভ্রমণকারীদের নিকট স্থানটি সুপরিচিত। আমরা ৮।৯ জন ভ্রমণকারী, কয়েকটি বন্দুক ও রাইফেল সহ জঙ্গলে প্রবেশ করি। নদী তীর হইতে অন্যূন ১০০গজের মধ্যেই কথিত শেখেদের বাড়ী। নদী তীরেই কয়েকটি প্রাচীন অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাইলাম। কালের কঠোর আঘাত ও শিবসার ভয়াবহ তাণ্ডবে তীরভূমি ভাঙ্গিয়া অট্টালিকাগুলি নদীগর্ভে বিলীন হইয়াছে। এখনও লবনাক্ত জলে ক্ষয়িত ইটের চিহ্ন দেখিলে উহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়। এই প্রকার কয়েকখানা ইট আমরা সঙ্গে আনিয়াছিলাম। শেখের বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া অনেকগুলি অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ এবং বাড়ীগুলির মধ্যস্থলে একটি জলাশয় দর্শন করি। অট্টালিকার মধ্যে কয়েকটি দ্বিতল বলিয়া অনুমিত হইল। জলাশয়ের চতুর্দিক প্রাচীর বেষ্টিত। উহার ভগ্নাবশেষ আজিও বিদ্যমান। এই স্থানে সুন্দরবনের দুষ্প্রাপ্য এবং লোকালয়ের পরিচিত জিওল, সড়া, গাব গিলেলতা, ক্ষুদে জাম ও বটগাছ আছে। একটি প্রকাণ্ড জিওল গাছ — উহার বেড় ৯৪″ ইঞ্চি অর্থাৎ প্রায় আট ফুট। এই স্থানে কবে কাহারা বাস করিত তাহার কোন সঠিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। সাধারণের নিকট ইহা শেখের বাড়ী বলিয়া সুপরিচিত। নলীয়ান ফরেষ্ট অফিস হইতে

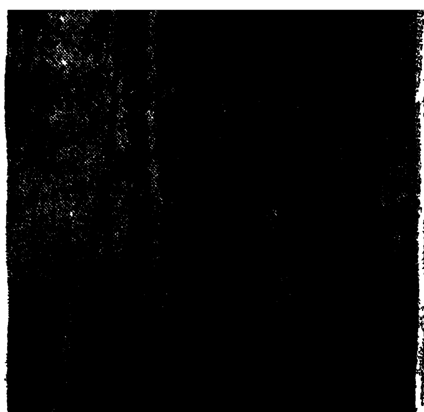
উহার দূরত্ব দক্ষিণ দিকে ২০ মাইল হইবে। শেখের ট্যাকের অবস্থান সম্পর্কে খুলনা গেজেটীয়ার প্রণেতা ওমালী সাহেব যে বর্ণনা দিয়াছেন, অধ্যাপক সতীশ-চন্দ্র তাহাই অনুসরণ করিয়াছেন। এই বর্ণনার সহিত আমরা ঐক্যমত স্থাপন করিতে পারিনা। শেখের বাড়ী বলিয়া কথিত স্থনটি সম্পর্কে সতীশ বাবু লিখিয়াছেনঃ "বাস্তবিকই এই স্থানে উপরে বহুদূর ধরিয়া নানা বসতি চিহ্ন আছে। তন্মধ্যে একটি বাড়ী বেশ জাঁক জমকশালী ছিল বলিয়া বোধ হয়। উহাকে কাঠুরিয়াগণ "কামার বাড়ী" বলে। কারণ কোনকালে নাকি সেখানে কামার দিগেব লোহাপিটান একটি "নোহাই" পাওয়া গিয়াছিল। কিন্তু ইহা প্রবাদ মাত্র। দ্বিতল একটি বাড়ীর ভগ্নাবশেষ দেখিলে তাহা কোন বিশেষ প্রতিপত্তিশালী ধনীর বাড়ী বলিয়া মনে হয়।" আমবা বহু চেষ্টা করিয়াও এখানে "কামার বাড়ী" বলিয়া কথিত কোন বাড়ী পাই নাই এবং ঐরূপ কোন প্রবাদের বিষয়ও জানিতে পারি নাই। কাঠুরিয়া, শিকারী ও সুন্দরবনের নিকটবর্ত্তী সকলের কাছেই উহা শেখেদের বাড়ী বলিয়া সুপরিচিত।

সতীশবাবু শেখেরট্যাকের অবস্থান সম্পর্কে বলিয়াছেনঃ "মার্জাল নদী হইতে একটি খাল পূর্বাভিমুখে জঙ্গলে প্রবেশ করিয়াছে, উহার নাম কালীর খাল। সেখের খাল ও কালীব খালেব মধ্যবর্তী অপেক্ষাকৃত উচ্চ ভূমি বিশিষ্ট নিবিড় জঙ্গলকে শেখেরট্যাক বলে।" কিন্তু উহা ঠিক নহে। শেখের খাল এবং কালীর খাল শিবসা নদী হইতে পূর্বদিকে গিয়াছে। মার্জাল নদীর কোন নাম গন্ধ এখানে নাই। শেখের খালের সংলগ্ন উত্তরদিকে শিবসা নদীর তীরে শেখেরট্যাক অবস্থিত।

আমরা ভ্রমণ কালে বরাবর শেখের খালের মধ্যদিয়া দুই তীরবর্তীর গভীর জঙ্গল অতিক্রম করিয়া পূর্বদিকে প্রায় দেড় মাইল পৌঁছিবার পর খালের দক্ষিণ তীরে একটি প্রাচীন বাড়ীর ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাইলাম। এখানে কয়েকটি গাব-গাছ আছে, তথায় নৌকা রাখিয়া আমরা দক্ষিণ দিকে পদব্রজে গাছের ঘন গুড়ি, গুলো ও হদোবনের মধ্য দিয়া কর্দমাক্ত পথ ধরিয়া প্রায় এক মাইল পরে একটি নগরের চিহ্ন দেখিতে পাইলাম। সেখানে এক বিরাটকায় দীঘির চারিপার্শ্বে দুর্গের ভগ্নাবশেষ, দীঘির দক্ষিণ পশ্চিম কোণে একটি মন্দির ভগ্ন অবস্থায়







[illegible] অবস্থিত মন্দির (৫৫ বৎসর পূর্বের [illegible])

বর্তমান কালের ছবি [illegible]

রহিয়াছে। ভগ্ন অট্টালিকার স্তূপ ও মন্দিরের মধ্যে প্রায়ই ব্যাঘ্রদল আসিয়া আশ্রয় লয়। ভয়সঙ্কুল গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়া এইস্থানে উপস্থিত হইলাম। শেখের বাড়ীর ন্যায় এখানে প্রচুর বট ও গাব গাছ ইত্যাদি আছে। জলাশয় প্রচুর মৎস্যে পূর্ণ। জলাশয়ের চারিদিকে শতাধিক পাকা ইমারতের ভগ্নাবশেষ। মন্দিরটি কোন্ সময় নির্মিত সঠিকভাবে কেহ বলিতে পারে নাই। মন্দিরের ইটের মাপ ৬''×৩''×২'' এবং ছোট সাইজের টালির মত ইটও ব্যবহৃত হইয়াছে। মন্দিরের পূর্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিমদিকের দরজা খোলা। অধ্যাপক সতীশচন্দ্র এই স্থানকে রাজা প্রতাপাদিত্যের শিবসাদুর্গ অথবা মোগল আমলে নির্মিত কোন দুর্গ বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। মন্দিরের অবস্থানের জন্য এই স্থান সাধারণের নিকট কালী বাড়ী বলিয়া সুপরিচিত এবং ইহার দক্ষিণদিকের খাল, কালীর খাল নামে পরিচিত। এই স্থানকে অবশ্য কেহ কেহ কামার বাড়ীও বলে।

উপরোক্ত কালীবাড়ীর প্রায় এক মাইল দক্ষিণ পূর্বে এবং কালীর খালের উত্তর পারে অনেকগুলি বাড়ীর ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। সেখানেও অনেক ইষ্টক নির্মিত বাড়ীর ভগ্নাবশেষ আছে। এই অঞ্চলটি গড়ে ১০ বর্গমাইল হইবে। এককালে এখানে বহুলোকের বসবাস ও গমনাগমন ছিল তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। সম্ভবতঃ মগ পর্তুগীজ জলদস্যুদের অত্যাচার হইতে প্রজাগণকে রক্ষা করার জন্য মোগল শাসকেরা এইখানে সামরিক ঘাঁটি নির্মান করেন এবং তথায় সুন্দর লোকালয় গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। মন্দিরটি হিন্দুরাজ কর্মচারীদের জন্য নির্মিত হইয়া থাকিবে। ওমালী বলিয়াছেন যে মোগল সাম্রাজ্যের গৌরবময় যুগে পর্তুগীজদের প্রণীত মানচিত্রে বঙ্গোপসাগরের তীরে পাঁচটি শহরের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। উহাদের নাম যথাক্রমে কুইপিটাভীজ, নলদী, ডাপারা, প্যাকাকুলী, এবং টীপারিয়া। শেখেরট্যাক, কালীবাড়ী প্রভৃতি স্থান মিলিয়া এই পাঁচটি শহরের একটি হইতে পারে। গভীর অরণ্যানীর মধ্যে এবং ব্যাঘ্র সঙ্কুল স্থানে এই ধরণের প্রাচীন কীর্তি অদ্যাপি দর্শকদের অন্তরে অপরূপ বিস্ময়ের সৃষ্টি করে।

পর্তুগীজদের উপরোক্ত মানচিত্রে বর্ণিত হইয়াছে যে সুন্দরবন উর্বরদেশ এবং তাহাতে পাঁচটি নগরী প্রদর্শিত হইয়াছে। ডি ব্যারোজ প্রণীত এশিয়ার ইতিবৃত্তে তাহাই প্রমাণিত হয়। পেচাকুলী ২৪ পরগণা জিলার মধ্যে একটি

পরগণা ছিল। কুইপিটাভীজ খুব সম্ভব খলিফাতাবাদ (বাগেরহাট)। খলিফাত পর্তুগীজদের বিকৃত ভাষায় কুইপীট এবং আবাদ হইতে আভাজ হইয়াছে। ভ্যাণ্ডেন ব্রুক ও মিঃ ওমালী এই মতের প্রতিষ্ঠাতা। ডাপারা ও নলদী সম্পর্কে কোন সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। টিপারীয়াকে ত্রিপুরার বিকৃত নাম বলিয়া সতীশ বাবু উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তাহা শুধু অনুমান মাত্র। মোঘল পর্তুগীজ আমলে বঙ্গোপসাগর হইতে ত্রিপুরা বহুদূরে অবস্থিত ছিল এবং সুন্দরবনের সহিত এই স্থানের কোন সম্পর্ক ছিল না। সুন্দরবন ঘনবসতিপূর্ণ সহর ছিল, না মধ্যে মধ্যে বসতি ছিল অথবা বর্তমানের ন্যায় ছিল এবিষয়ে বিভিন্ন লেখক ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। ব্লকম্যান বলেন যে সুন্দরবনে কোন এক সময়ে শহর, পথঘাট এবং বাড়ীঘর গড়িয়া উঠার চেষ্টা চলিয়াছিল মাত্র। ক্যাপ্টেন মরিসন বলেন যে সুন্দরবনে ঘনবসতি ছিল এবং চাষাবাদ হইত। ব্লাকম্যান এই মতের বিরোধী। তিনি বলেন যে পর্তুগীজ ও ডাচ মানচিত্রে সুন্দরবনে যে পাঁচটি সহরের উল্লখ আছে তাহা কিছুই প্রমাণ করে না। ওমালী বলেন যে তোডরমল্লের জরিপে জানা যায় যে ষোড়শ শতাব্দীতে এখনকার ন্যায় জঙ্গল ছিল। বিভারীজ বলেন সুন্দরবনের জঙ্গল এখন যে অবস্থায় আছে তখনও তদরূপ ছিল। তিনি আরও মন্তব্য করিয়াছেন যে বাঙ্গালী জাতি অতীতকে অনেক বড় করিয়া দেখে এবং তাহারা বলে যে সুন্দরবনে বড় বড় শহর ছিল। আমাদের মন্তব্য পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, অধিক লেখা নিষ্প্রয়োজ মনে করি।

সুন্দরবনের শাসনব্যবস্থা, পর্যটক, লোকালয় ও দস্যুদল

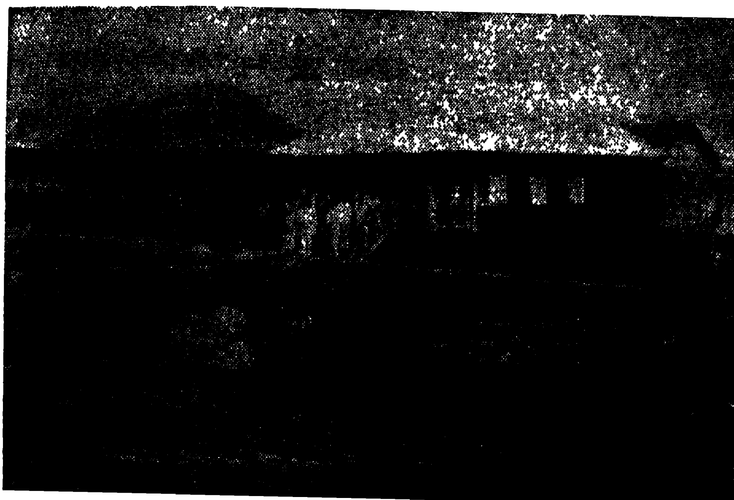
।। ছয় ।।

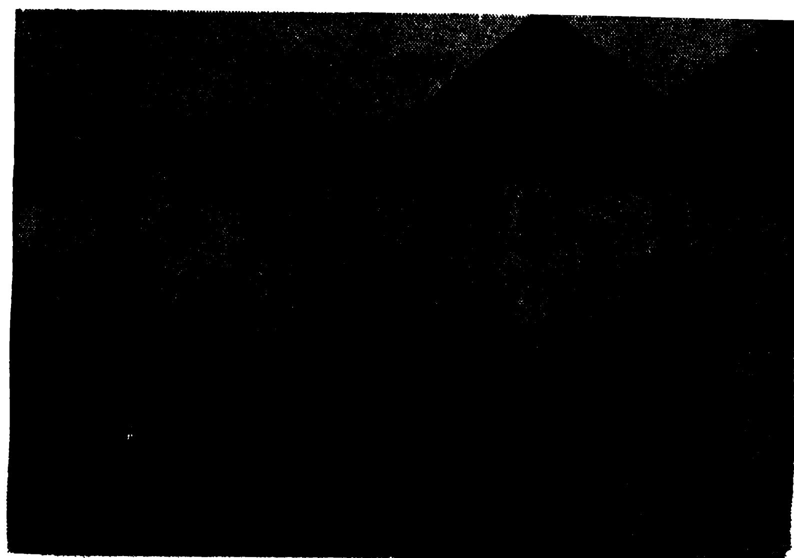
বর্তমান সময়ে সুন্দরবনের মধ্যে জন বসতির সংখ্যা অতি নগণ্য। তবে সুন্দরবনের বিভিন্ন এলাকায় অবস্থিত বনবিভাগের অফিস সমূহে দিবারাত্র লোকের ভিড় থাকে। স্থায়ী বাসিন্দা হিসাবে বনবিভাগের কর্মচারীরা বৎসরের সবসময়েই সুন্দরবনে অবগান করেন। জঙ্গলের মধ্যবর্তী এই সমস্ত স্থানে লোকালয়ের ন্যায় হাটবাজার, মাঠ, ঘাট, ডাকঘর ইত্যাদি নাই। লোকালয় হইতেই এই সমস্ত কর্মচারীদের খাদ্য ও অন্যান্য তৈজসপত্র সরবরাহ করা হইয়া থাকে। সপ্তাহে দুই তিন বার তাঁহারা চিঠি-পত্র আদান প্রদান করিতে পারেন। সুন্দরবনের ভয়সঙ্কুল নির্জ্জন স্থানে এইভাবে তাঁহারা কর্মময় জীবন অতিবাহিত করেন। লোকালয়ের সুযোগ সুবিধা হইতে তাঁহারা একেবারেই বঞ্চিত।

বনবিভাগের কার্য পরিচালনার জন্য জনমানবশূন্য স্থানে সুউচ্চ ঘর অফিস ও বাসগৃহরূপে ব্যবহৃত হয়। গৃহগুলিতে বাঘের আক্রমণ হইতে রক্ষা করার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। এই সমস্ত উচু ঘরে কাঁচা বা পাকা মাটির দেওয়াল বা মেঝে হয় না। কাঠের পাটাতন মেঝেরূপে ব্যবহৃত হয়। ঘরগুলি প্রায় সবই কাঠ নির্মিত—ছাউনী গোলপাতা বা করোগেট টীনের। কাঠের মই দিয়া মাটি হইতে সাধারণত এই সব ঘরে উঠিতে হয়। নদী বা সমুদ্রতীরেই সাধারণের সুবিধাজনক স্থান নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। কাঠুরিয়াগণকে কাঠ ও গোলপাতা আহরণের পূর্বে নির্ধারিত এলাকার কর্মচারীদের নিকট হইতে পাশ বা ছাড়পত্র গ্রহণ করিতে হয়। নির্ধারিত স্থান ব্যতীত অন্য কোথাও হইতে কাঠ বা গোলপাতা কাটা একেবারেই নিষিদ্ধ। সকাল বেলা হইতে এই সমস্ত অফিসে সুন্দরবনে আগত লোকের ভীড় জমিতে থাকে। কেহ কাঠের পাশ, কেহ গোলপাতার, কেহ মধু সংগ্রহ বা মাছ ধরার ছাড়পত্রের জন্য ঐ সমস্ত কর্মচারীদের নিকট হাজির হয়। কয়জন মানুষ ও আদেশপত্র থাকিলে কয়টি বন্দুক নম্বরসহ লেখাইয়া লইতে হয়। নৌকার বিবরণও দিতে হয়। হরিণ ও

ব্যাঘ্র শিকার, কুম্ভীর বা সর্প শিকারের জন্যও এই ধরণের পাশের আবশ্যক হয়। দৈনিক শতশত লোক এইভাবে বনবিভাগের অফিস সমূহে ভিড় জমায় এবং নির্জন স্থানে অবস্থিত অফিসগুলিকে জনকোলাহলময় করিয়া তোলে। সুন্দরবনে তিনটি বিভাগ আছে। বিভাগগুলির নাম যথাক্রমে সাতক্ষীরা, সদর ও বাগেরহাট। শাসন কার্যের সুবিধার জন্য সমগ্র সুন্দরবন এলাকায় ৫০টির অধিক কুপ অফিস আছে। বাকেরগঞ্জ জিলায় যে সামান্য জঙ্গল আছে, তাহার জন্যও একটি পৃথক অফিস আছে। তবে এই এলাকার জঙ্গল নগণ্য বলিয়া অফিসটিও খুব ক্ষুদ্র। এই এলাকা কুয়াকাটা বিট অফিস কর্তৃক শাসিত হয়। বনকরের কোন কোন অফিসার নৌকায় অফিসের কার্যাদি পরিচালনা করেন এবং নৌকায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া সর্বত্র পাহারা দেন এবং পরিদর্শন করেন। এই সমস্ত নৌকা এতদঞ্চলের অধিবাসীদের নিকট "পিটেল বোট" বলিয়া পরিচিত। নৌকার কর্মচারীদের পিটেল বাবু বলা হয়।

পূর্বপাকিস্তানের সুন্দরবনের শাসক বিভাগীয় ফরেষ্ট অফিসার (ডি, এফ, ও)। সুন্দরবন একটি বনবিভাগ সেইজন্য এইরূপ নামকরণ হইয়াছে। তাঁহার পর সহকারী ফরেষ্ট অফিসার। উভয়ে সুন্দরবন বিভাগের উপর স্থানীয় ব্যাপারে সর্বময় কর্তৃত্ব করেন। তাঁহাদের উপরে আছেন কনজারভেটর অব ফরেষ্ট। তিনি রাজধানীতে থাকেন। খুলনা শহরে তাঁহাদের কার্যালয় অবস্থিত। তাঁহারা মধ্যে মধ্যে সুন্দরবন ভ্রমণ করিয়া কার্যাদি পর্যবেক্ষণ করেন। বৎসরের সবসময় কাজ হয়। তবে আশ্বিন হইতে ফাল্গুন মাস পর্যন্ত সুন্দরবনের সর্বত্র অত্যধিক কার্যতৎপরতা পরিলক্ষিত হয়। এই সময় নদী ও সমুদ্র শান্ত থাকে; ইহাই সুন্দরবন ভ্রমণের অতি উত্তম সময়। সুন্দরবনের কাঠের ঘের শহরে নিলামে বিক্রয় হয়। গোলপাতারও ডাক হয়। ইহাতে প্রচুর পরিমাণে রাজস্ব আদায় হয়। বৎসরের নির্ধারিত সময় খুলনা অফিসে প্রকাশ্যে বন্দোবস্ত দেওয়া হয়। নানাপ্রকার কাঠ, গোলপাতা, মৎস্য, হাঙ্গর, কুমীর, ব্যাঘ্র, হরিণ শিকারী, মৌয়াল ও ভ্রমণকারী প্রভৃতি সকলের নিকট হইতে সুন্দরবনে কিছু কিছু রাজস্ব সংগৃহীত হয়। কাঠ ও গোলপাতার আয় সর্বাধিক। বিভাগ পূর্ববর্তী যুগে সুন্দরবনের আয় ছিল সামান্য। বর্তমানে উহার বাৎসরিক আয় প্রায় এক কোটি টাকায় দাঁড়াইয়াছে। কাঠ ও গোলপাতা সংগ্রাহকদের অনেক সময় বনবিভাগের





উপরে : নলিয়ানালা অফিসে ফরেষ্ট কর্মচারীদের সঙ্গে লেখক।

নীচে : বুড়ীগোয়ালিনী অফিসে বাওয়ালীদের সঙ্গে লেখক ও তাঁর সঙ্গীরা—৫৯

দুর্নীতিপরায়ণ কর্মচারীদের হস্তে নির্যাতন ভোগ করিতে হয়। উৎকোচের পরিমাণ অত্যধিক সেইজন্য ঐ সমস্ত জিনিষ লোকালয়ে আসিয়া মূল্য তিন চারিগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। মধ্যে মধ্যে এই সমস্ত দুর্নীতির তদন্ত হয় এবং কর্মচারীদের শাস্তি হয়। সুন্দরবনের দুর্নীতি প্রশমিত না হইলে জনসাধারণের দুর্গতির সীমা থাকিবে না। রেঞ্জ অফিস ও কুপ অফিস সমূহে মন্থর গতিতে কাজ চলে। একে কর্মচারীর অভাব, তদ্ব্যতীত কোন কোন সময় সুন্দরবন প্রবেশকারীদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঐ সমস্ত অফিসে অযথা বসিয়া থাকিতে হয়। বিভাগীয় পদস্থ কর্মচারীদের হস্তক্ষেপের ফলে অনেক সময় এই সব অবিচারেরও প্রতিকার হয়। নির্জন বনানী এবং নদীনালা বেষ্টিত ভয়সঙ্কুল স্থানে অসহায় ও দরিদ্র কাঠুরিয়া ও অন্যান্যদের নিকট হইতে ছলে বলে কৌশলে উৎকোচ গ্রহণ একটি নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বৈপ্লবিক পন্থায় ইহার প্রতিকারের ব্যবস্থা করা উচিত।

সমগ্র সুন্দরবন বিভাগের প্রধান অফিস খুলনা শহরে অবস্থিত তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। সাতক্ষীরা রেঞ্জের অফিস বুড়ীগোয়ালিনী, জঙ্গলের সন্নিকটে অবস্থিত। সদরের রেঞ্জ অফিস নলিয়নে, শিবসা নদীর তীরে, সুন্দরবনের পার্শ্বে। এখানে সদর হইতে যাতায়াতের সুবিধা আছে। এখানে হাটবাজার ও পোষ্ট অফিস নিকটেই আছে। মৎসজীবিরা সুদূর সুন্দরবনের নদী সমূহ হইতে মৎস্য ধরিয়া নৌকাযোগে এখানে আনিয়া বিক্রয় করে। জঙ্গলের পার্শ্বে অবস্থিত হইলেও এখানে লোকালয়ের ন্যায় প্রায় সর্বপ্রকার সুযোগ সুবিধা আছে। খুলনা শহর হইতে সুন্দরবনে প্রবেশ করিবার এই একটি প্রধান পথ। বাগেরহাট রেঞ্জের অফিস শরণখোলায় অবস্থিত। বর্তমানে উক্ত রেঞ্জের শাসন কার্যের সুবিধার্থে অন্য একটি অফিস স্থাপিত হইয়াছে রামপাল থানার মধ্যে চাঁদপাই নামক স্থানে। চাঁদপাই বর্তমান চালনা পোর্টের সন্নিকটে অবস্থিত। এই সমস্ত রেঞ্জ অফিসে অফিসারদের পরিবারবর্গসহ বসবাসের সুযোগ সুবিধা আছে। সুবিধাজনক প্রবেশদ্বারে এই সমস্ত অফিস স্থাপিত। বহু কর্মচারীর খাওয়া, থাকা, উভয়ই নৌকায় চলে। মাঝিরা নৌকা চালায় এবং নির্ধারিত সময়ে রন্ধন কার্যে রত থাকে। সুন্দরবনের ভ্রাম্যমান জনবসতি ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে।

আদম শুমারিতে সুন্দরবনের জনসংখ্যা পৃথকভাবে দেখানো হয়। বিধিবদ্ধ শাসন ব্যবস্থা না থাকিলে,সুন্দরবন আবার "মগের মুল্লুকে" পরিণত হইত।

কাঠুরিয়া বা বাওয়ালীগণ সুন্দরবনের জনসংখ্যার একটি বিশেষ অঙ্গ। এই বাওয়ালীদের অধিকাংশের বাড়ী বাকেরগঞ্জ জিলার সরূপকাটী থানায়। তাহারা সুন্দরবনের বৃক্ষ ছেদনের জন্য ছোটবড় অসংখ্য নৌকা লইয়া সুন্দরবনে প্রবেশ করে। মহাজনেরা প্রতিবৎসর বনবিভাগের চিহ্নিত ঘের প্রকাশ্য নীলামে খরিদ করেন এবং তাঁহাদের নৌকা ও অর্থানুকূল্যে কাঠুরিয়াগণ বৃক্ষ ছেদন করিয়া লোকালয়ে রপ্তানী করে। দরিদ্র কাঠুরিয়াগণ নিজেদের জীবন বিপন্ন করিয়া সামান্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে এহেন কঠিন কার্যে লিপ্ত হয়। কাঠুরিয়াদের একমাত্র অস্ত্র কুঠার। বন বিভাগের আইন কানুন কঠোরভাবে তাহাদিগকে মান্য করিতে হয়। তাহারা ঘেরের মধ্যে নির্ধারিত এবং মার্কা দেওয়া বৃক্ষ ব্যতীত অন্য বৃক্ষ স্পর্শ করিতে পারেনা। যশোর ও খুলনা জিলার বহুলোক জঙ্গলে বৃক্ষ ছেদন করিতে আসিয়া থাকে। বাওয়ালীরা সুন্দরবনের বড় বড় নদীতে এবং খালের মুখে নৌকা নোঙ্গর করিয়া প্রায়ই একত্রে বসবাস করে। গভীর জঙ্গলে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে সর্বপ্রকার সৌহার্দ ও সহানুভূতি পরিলক্ষিত হয়। বাওয়ালীরা সুন্দরবনের নির্জন ও ভয়াবহ স্থানকে মধ্যে মধ্যে জন কোলাহলময় করিয়া রাখে। সুন্দরবনের অসংখ্য কাহিনীর সহিত এই বাওয়ালীদের করুণ ইতিহাস জড়িত। প্রতি বৎসর তাহাদের মধ্য হইতে কিছু কিছু লোককে ব্যাঘ্রের উদরে বিজীবন বিসর্জন দিয়াও বাওয়ালীগণ কাঠ সংগ্রহ কার্য লইতে বিরত হয়না। ব্যাঘ্র, সর্প, বন্যবরাহ এবং নদীতে হাঙ্গর ও কুমীরের সঙ্গে একত্রে তাহারা বসবাস করিয়া থাকে। ধন্য তাহাদের জীবন। তাহারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া মেহনত করিয়া পার্থিব সুখভোগ হইতে বঞ্চিত হইল।

বড় বড় নৌকায় ৬।৭ জন এবং ছোট নৌকাগুলিতে ৩।৪ জন করিয়া দাঁড়ি মাঝি থাকে। কুঠার দ্বারা বৃহৎকায় বৃক্ষসমূহ তাহারা ধরাশায়ী করিয়া সাইজ মাফিক কর্তন করতঃ লোকালয়ে আনিয়া বিক্রয় করে। তাহারা সময় সময় মাসাধিক কাল পর্যন্ত সুন্দরবনে অবস্থান করে। সুন্দরবন হইতে লোকালয় এবং তথা হইতে সুন্দরবন যাতায়াত এবং কঠোর পরিশ্রম করাই তাহাদের জীবনের দৈনন্দিন কার্য। বাওয়ালীদের নিকট সুন্দরবনের অধিকাংশ স্থান সুপরিচিত।



সুন্দরবনের সন্নিহিত নদীবক্ষে নৌকা চলিয়াছে

শহর-গঞ্জের দিকে

কোথায় ভগ্ন অট্টালিকা, কোন্‌স্থান হরিণ শিকারের আশুযোগ্য, কোথায় ব্যাঘ্র আছে, কোথায় নরখাদক ঘুরিয়া বেড়ায়, কোন্ জঙ্গলে বানর ও হরিণের আড্ডা, সমস্তই তাহাদের জানা থাকে। বাওয়ালীরা সূর্যাস্তের পর সায়াহ্নে লণ্ঠন, চেরাগ বা হ্যারিকেন প্রজ্বলিত করিয়া কত সত্য মিথ্যা এবং আজগুবি গল্পের আসর জমাইয়া তাহাদের চিত্ত বিনোদন করিয়া থাকে। গাজী-কালু ও চম্পাবতী, সোনাভান, জয়গুন বিবি, বনবিবির জহুরানামা, বেহুলার পাঁচালী প্রভৃতি পুঁথি পাঠ করিয়া তাহারা আনন্দ লাভ করে। মাঝিরা অনেক সময় একত্রিত হইয়া তাস প্রভৃতি খেলিয়া থাকে। নৌকায় নৌকায় রূপকথারও ছড়াছড়ি। ধূয়া, জারি প্রভৃতি গানও মাঝে মাঝে গীত হয়। এতদ্ব্যতীত বাও-য়ালীদের মধ্যে যাহারা সামান্য লেখাপড়া জানে তাহারা আলো জ্বালাইয়া সন্ধ্যার পর বটতলার পুঁথি লইয়া বিশিষ্ট ধরণের সুর করিয়া পড়িতে থাকে। পুঁথিগুলির মধ্যে প্রেমরস মিশ্রিত উপাখ্যানগুলি বিশেষ আগ্রহের সহিত পঠিত ও শ্রুত হয়। এই পুঁথিগুলি এদেশের গ্রামাঞ্চলে বেশ সুপরিচিত। গভীর জঙ্গলের পার্শ্ববর্তী নদীতে এই ধরণের সাময়িক আমোদ প্রমোদ বাওয়ালীদের দুঃখময় জীবনের পক্ষে একটু শান্তিদায়ক। বাওয়ালীগণ সুন্দরবনের একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। খ্যাতনামা পল্লীকবি জসিমউদ্দীনের সঙ্গে সুন্দরবন ভ্রমণকালে একদা আমরা বাওয়ালীদের সঙ্গে আমোদ প্রমোদে যোগদান করি। হাটডোরা কুপ অফিস — নিকটেই আদাচাকী। চারিদিকে গহীন অরণ্যানী বেষ্টিত এই অফিস। ডি. এফ, ও, আলীম সাহেব, পল্লীকবি জসিমউদ্দীন এবং খুলনা সাহিত্য পরিষদের নাফিউদ্দীন সহ লেখক লঞ্চে ঘুরিয়া ঘুরিয়া জঙ্গলের বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন শেষ করিয়া কুপ অফিসে রাত্রিযাপন করেন। সারারাত্রি গল্প, রূপকথা, ধূয়া ও জারিগান চলিল। বিরাটকায় সাঁকোর ন্যায় পথ কুপ অফিসের পার্শ্ব দিয়া সম্প্রতি নির্মিত হইয়াছে। বাও-য়ালীদের ভীড় অতি মাত্রায়। কবি জসিমউদ্দীন সাহেবের এই প্রথম সুন্দরবন পরিদর্শন। তিনি জঙ্গলের নির্জন স্থানসমূহ ও বিস্ময়কর পরিবেশ দর্শনে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। এইভাবে আমাদের বহুবার কবি, শিল্পী; সাহিত্যিক, ঐতি-হাসিক, পদস্থ কর্মচারী, অভিজ্ঞ শিকারী, বনাঞ্চলের দুর্জয় ব্যক্তিদের সাহায্যে অত্র গ্রন্থের উপকরণ সংগ্রহের জন্য বন হইতে বনান্তরে ভ্রমণ করিতে হইয়াছে।

শুধু সুন্দরবনের কাঠ নহে। গোলপাতা আহরণের জন্য বহু নৌকা সুন্দরবনে প্রবেশ করে। আশ্বিন, কার্তিক মাসে এই সব নৌকার মাঝিরা সাধারণত সুন্দরবনের নদী ও খালের পার্শ্ববর্তী স্থান সমূহ হইতে গোলপাতা আনিয়া লোকালয়ে বিক্রয় করে। দক্ষিণ খুলনা ও বাকেরগঞ্জ জিলার লোকই প্রধানত গোলপাতা কাটার ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকে। বাওয়ালীরা মাঝে মাঝে কদাচিৎ সুন্দরবনের নদী পার্শ্বে গোলপাতার ঘর বাঁধিয়া রাত্রিতে শুইয়া থাকে এবং দিনের বেলায় কাঠ ও গোলপাতা কাটিয়া বেড়ায়। এই ধরণের ঘর খুব উচু করিয়া বাঁধা হয় এবং কাঠের মই দিয়া ঘরে উঠিবার ব্যবস্থা থাকে। বাঘের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য এইরূপ বিশেষ ধরণের ব্যবস্থা করা হয়। বর্ষাকাটির লোকেরা সুন্দরবনের নদী ও খালের মধ্যে গোলপাতার গাছে মাটির পাত্র বাঁধিয়া রস আহরণ করে। খেজুর ও তালগাছের ন্যায় গোলগাছেও সুমিষ্ট রস হয় এবং বর্ষাকাটি প্রভৃতি স্থানের লোকেরা এই রস হইতে গুড় প্রস্তুত করিয়া খায়। বর্ষাকাটির লোকদিগকে রসিক বলা যাইতে পারে, যেহেতু তাহারা সুন্দরবনের নীরস গোলগাছ হইতেও রস আহরণ করিতে সক্ষম হইয়াছে। সরূপকাটি থানার বর্ষকাটি, সোহাগদল, বলদিয়া, সুতিয়াকাটী, বালিহারী ও জগন্নাতকাটী প্রভৃতি গ্রামের অসংখ্য অধিবাসী বাওয়ালীর কার্যে বিশেষ দক্ষ। বর্তমানে খুলনা ও যশোরের বাওয়ালীদের সংখ্যাও কম নহে।

সুন্দরবনের মৎস্যজীবিরা সর্বত্র নদী নালায় মাছ ধরিয়া বেড়ায়। বনবিভাগের আদেশপত্র পাইয়া তাহারা সমুদ্র, নদী ও খালে মৎস্য ধরে এবং বনবিভাগের কর পরিশোধ করিয়া লোকালয়ে আনিয়া বিক্রয় করে। একটি নৌকায় ৩/৪ জন করিয়া লোক থাকে এবং ঐ সমস্ত নৌকায় রান্না, খাওয়া ও থাকার ব্যবস্থা থাকে। জনমানবশূন্য নদীতে জালিয়াদের নৌকা মাঝে মাঝে দৃষ্ট হয়। অনেক সময় পাইকারী ব্যবসায়ীরাও ধীবরদের মৎস্য কিনিবার জন্য সুন্দরবনের নদী সমুহে ঘুরিয়া বেড়ায়। তাহারা জোয়ার ভাটার সাহায্যে সুন্দরবন হইতে লোকালয়ে যাতায়াত করে। ধীবরগণ একত্রে বহুদিন ধরিয়া সুন্দরবনে অবস্থান করে। বিভিন্ন রোগের ঔষধপত্রও তাহারা সঙ্গে রাখে। সুন্দরবন হইতে তাহারা জ্বালানী সংগ্রহ করে এবং সখ্যতা স্থাপন করিয়া বাওয়ালী ও ভ্রমণ-কারীদের

নিকট হইতে মাঝে মাঝে মৎস্যের পরিবর্তে চাউল, মরিচ ইত্যাদি বিনিময় করিয়া লয়। সুন্দরবনের ভাসমান লোকদের মধ্যে পারস্পরিক সহানুভূতি খুব বেশী। বিপদের সম্ভাবনাও আছে। মাঝে মাঝে সুন্দরবনের মধ্যে ডাকাতদল লুক্কায়িত থাকে। মাছ ধরা ও অনুরূপ ভাণ করিয়া বে-আইনী বন্দুকসহ তাহারা অতি সন্তর্পনে ঘুরিয়া বেড়ায়। সুযোগ পাইলে ডাকাতেরা ধীবর ও বাওয়ালীদের যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন করে। বনবিভাগের কর্মচারীদের জীবনের উপরও সুযোগ মত আক্রামণ চালাইয়া ডাকাতি করিয়া যথাসর্বস্ব লইয়া যাওয়ার কথাও শুনা যায়। ধীবর ও বাওয়ালীদেব নিকট বন্দুক ও অন্য অস্ত্রসস্ত্র না থাকায় ডাকাতদের প্রতিরোধ কবা তাহাদের পক্ষে সম্ভব হয় না।

সুন্দরবনেব নিকটেই লোকালয় আছে এবং মাঝে মাঝে জঙ্গল পরিস্কার করিয়া ঐ জমি চাষেব যোগ্য কবিয়া তোলা হয়। এইভাবেও সুন্দরবনের লোকসংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়।

বর্তমানে এতদঞ্চলে ব্যবসায় কেন্দ্র গড়িয়া উঠিতেছে। গোড়ইখালী, নলিয়ান, বেদকাশী, মঙ্গলা, বুড়ীগোয়ালিনী ও বায়েন্দা প্রভৃতি বাজাবে সুন্দরবনের লোকেরা খাদ্য বস্ত্র ও অন্যান্য পণ্যদ্রব্য সংগ্রহ করে। পুরাতন পোর্ট চালনা হইতে উঠিয়া গিয়া মঙ্গলা নামক স্থানে স্থাপিত হইয়াছে। এই পোর্টও সুন্দরবন অঞ্চলের সংলগ্ন এলাকার মধ্যে। পশর নদী তীরের এই বন্দর বঙ্গোপসাগরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। সামুদ্রিক জাহাজ দেশ বিদেশ হইতে পশর নদীর উপর দিয়া উহার পার্শ্ববর্তী সুন্দরবনের গভীর অরণ্যানী অতিক্রম করিয়া বন্দরে আসিয়া বিদেশী পণ্য দেশে আমদানী কবিয়া থাকে। এই সমস্ত বিশালকায় সামুদ্রিক জাহাজ আবার দেশীয় পণ্য বোঝাই করিয়া ইউবোপ, আমেরিকা ও এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন স্থানে রপ্তানী করে। এই সমস্ত সামুদ্রিক জলজান গমনাগমনে সুন্দরবনের এতদঞ্চলে মানুষের চলাচলের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। বেতার ও বৈদ্যুতিক যোগাযোগ দ্বারা চালনা বন্দরে নানা প্রকার সুযোগ সুবিধা হইয়াছে। কালক্রমে সুন্দরবনের পার্শ্বে অবস্থিত এই বন্দরে একটি বৃহৎকায় শহর গড়িয়া উঠার সমূহ সম্ভাবনা আছে। মঙ্গলার নির্জন স্থানে আধুনিক ধরণের মনুষ্য আবাদ, হাট, বাজার প্রভৃতি স্থাপিত হওয়ায় এতদঞ্চলের অধিবাসীদের বহু সুযোগ সুবিধা মিলিয়াছে।

এই বন্দরের তিন মাইল উত্তরে বাজুয়া নামক স্থানে একটি বরফ প্রস্তুতের কারখানা (কোল্ড ষ্টোরেজ) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সুন্দরবনের মৎস্য এখানে আমদানী হইয়া বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে বিদেশে রপ্তানী হয়। এই ধরনের ব্যবস্থাপনায় সুন্দরবনের মৎস্য হইতে দেশের আয় বৃদ্ধি পাইতেছে।

সুন্দরবন হইতে গেউয়া কাঠ আনিবার জন্য নিউজপ্রিণ্ট মিল কর্তৃপক্ষ কয়েকস্থানে বড় বড় গৃহ নির্মান করিয়া কাঠ সংগ্রহের অফিস স্থাপন করিয়াছেন। ঐ সমস্ত কেন্দ্রের কার্যরত কর্মচারী ও ঠিকাদারগণ সর্বদা কাঠ সংগ্রহের কার্যে লিপ্ত থাকে। বর্তমানে সুন্দরবনের প্রাপ্ত কাঠের সাহায্যে হার্ডবোর্ড প্রস্তুতের জন্য একটি আধুনিক ধরণের কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনা চলিতেছে এবং তজ্জন্য আবশ্যকীয় মালমসলা এখানকার জঙ্গলে পাওয়া যাইবে।

সম্প্রতি চালনা বন্দরের কর্তৃপক্ষ মারজাট্টা বা মর্জত নদীর পশ্চিম তীরে বিখ্যাত নীলকমল চরে এবং বঙ্গোপসাগরের সন্নিকটে এক মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমিতে নির্জন স্থানে একটি আরাম নিবাস নির্মাণ করিয়াছেন। একটি বেতার কেন্দ্র এখানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গভীর জঙ্গলের পার্শ্বে এখানে আধুনিক ধরনের যে সুন্দর ইমারত নির্মিত হইয়াছে, উহা বনাঞ্চলে এক অভিনব সৌন্দর্য সৃষ্টি করিয়াছে। পোর্ট ডাইরেক্টরের অধীনে কয়েকজন কর্মচারী এখানকার কার্যাদির তত্ত্বাবধান করেন। বিদেশীয় মেহমান ও কেন্দ্রীয় সরকারের পরিদর্শকদের জন্য সাময়িক অবস্থানের সুন্দর বন্দোবস্ত আছে। এই স্থানটিকে "হিরণ পয়েণ্ট" বলা হয়। মর্জতের পশ্চিম তীরে এবং দুবলা দ্বীপে সামুদ্রিক জাহাজের পথ নির্দেশের জন্য দুইটি লাইট হাউজ আছে। মর্জতের পূর্বতীরে লাইট হাউজের স্থানকে "জাফর পয়েণ্ট" বলা হয়। পশ্চিম তীরের লাইট হাউজ চাঁদাবুনিয়ার চরে অবস্থিত। জঙ্গল হইতে পাঁচ মাইল দক্ষিণে ফাঁকা চরের উত্তরে এই লাইট হাউজ বহুদূর হইতে দৃষ্ট হয়। সমুদ্র হইতে মঙ্গলা পোর্ট পর্যন্ত নদীমধ্যে লাইট পোষ্টের সাহায্যে সামুদ্রিক জাহাজ রাত্রিকালে পথ চলাচল করিয়া থাকে।

বাগেরহাট রেঞ্জের কটকা ও ঝাপার জঙ্গলে বনবিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত স্থান

বিশেষ ভাবে সংরক্ষিত (Sanctuary) আছে। এই স্থানে হরিণ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি শিকার একেবারেই নিষিদ্ধ। এখানে কর্মচারীদের বাসের জন্য স্থায়ী ও অস্থায়ী ব্যবস্থা করা হইয়াছে। রায়মঙ্গলে জঙ্গল মধ্যে সীমান্ত পুলিশ ও শুল্কবিভাগীয় অফিস স্থাপিত হইয়াছে।

সুন্দরবন পরিভ্রমণের জন্য প্রতিবৎসর বিদেশ হইতে বহু পরিদর্শক এখানে আগমন করেন। ইংরাজী ১৯৬১ খৃষ্টাব্দে বহু পাশ্চাত্য সাংবাদিক (Common Wealth press men) সুন্দরবন পরিদর্শন করেন। ইংল্যাণ্ড, জার্মানী, আমেরিকা, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশের পর্যটকগণ সুন্দরবনের অবস্থান, গঠন প্রণালী, জীবজন্তু দর্শন এবং শিকার প্রভৃতি উদ্দেশ্যে সুন্দরবন ভ্রমণ করিয়া থাকেন। বনবিভাগের সহায়তায় তাঁহারা সুন্দরবন ভ্রমণ করেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যাপারে সরকারকে পরামর্শ প্রদান করেন। দেশের অধিকাংশ অধিবাসীই সুন্দরবনের প্রকৃত পরিচয় সম্পর্কে অজ্ঞ। সুন্দরবন এক সুন্দর দেশ। উহার অবস্থান ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট দর্শন মানসে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান হইতে ভ্রমণকারীরা এতদঞ্চল পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন। শরৎ, হেমন্ত ও শীতকাল সুন্দরবন ভ্রমণের উত্তম সময়। এই সময় বহু দেশী ও বিদেশী ভ্রমণকারী নৌকা, লঞ্চ ও ষ্টীমারযোগে সুন্দরবন ভ্রমণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা সুন্দরবনে ব্যাঘ্র ও হরিণ শিকার করেন এবং ক্যামেরার সাহায্যে সুন্দরবনের দৃশ্য প্রভৃতির ছবি সংগ্রহ করেন। বর্তমানে সুন্দরবনের ফিল্ম প্রস্তুতের জন্য প্রচেষ্টা চলিতেছে। কিছুদিন পূর্বে এক বিদেশীয় প্রতিষ্ঠান লেখকের নিকট হইতে সুন্দরবনের ঐতিহাসিক স্থান সমূহের হর্ম্যরাজি ও উহার ভগ্নাবশেষের বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়াছেন। এই ধরনের ফিল্ম তৈয়ার হইলে দেশবাসী সুন্দরবন সম্পর্কে অনেক তথ্য জ্ঞাত হইতে পারিবে।

ভ্রমণকারী ব্যতীত সরকারী কর্মচারী বিশেষ করিয়া বনবিভাগ ও মৎস্য-বিভাগের কর্মচারীরা কার্যোপলক্ষে মোটর-লঞ্চ ও নৌকাযোগে প্রায়ই সুন্দরবন ভ্রমন করিয়া থাকেন। মৎস্য শিকার ও মৎস্য বহনকারী মোটর-লঞ্চ বঙ্গোপসাগর হইতে খুলনা সহর পর্যন্ত প্রায়ই যাতায়াত করে। সুন্দরবনের সরকারী রাজস্ব আদায়, জঙ্গল পরিদর্শন ও উহার রক্ষনাবেক্ষণ ব্যাপারে কর্মচারীরা সুন্দরবন পরিদর্শন করেন। আকস্মিক ঘটনা ঘটিলেও তাহারা সেখানে উপস্থিত হন।

বিগত মহাযুদ্ধের সময় বঙ্গোপসাগরের সন্নিকটে সুন্দরবনের মধ্যে চাঁদাবুনিয়া নামক স্থানে সাময়িক বেতার কেন্দ্র ও পর্যবেক্ষণ অফিস স্থাপিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হইতে আজ পর্যন্ত অনেকগুলি উড়োজাহাজ সুন্দরবনের মধ্যে দুর্ঘটনায় পতিত হইয়াছে। মালিকবিহীন কয়েকখানি উড়োজাহাজের অংশ বিশেষ সরকার বিক্রয় করিয়া দিয়াছেন। বিগত ইং ১৯৬০ সালে একখানি বৃটিশ এরোপ্লেন (R.A.F. Plane) সুন্দরবনে দুর্ঘটনায় পতিত হয়। একজন পাইলট দুর্ঘটনায় প্রাণ ত্যাগ করেন এবং অন্য একজন জীবিত অবস্থায় দুইদিন দুইরাত্রি বৃক্ষের উপর একান্ত অসহায় অবস্থায় কালক্ষেপণ করেন। দ্বিতীয় পাইলট প্যারাসুটের সাহায্যে বৃক্ষের উপর অবতরণ করিয়াছিলেন। পরে তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া খুলনা শহরে আনায়ন করা হয়।

সাধারণ ভ্রমণকারী ব্যতীত পাকিস্তানের রাষ্ট্র নায়ক, মন্ত্রী এবং উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিরাও সুন্দরবন পরিদর্শন করিয়া থাকেন। তাঁহারা মোটর লঞ্চ বা জাহাজ লইয়া সুন্দরবনের মধ্যে বিশেষ জাঁকজমকের সহিত পরিভ্রমণ করেন এবং ব্যাঘ্র, হরিণ, কুম্ভীর প্রভৃতি শিকার করিয়া থাকেন। এই ধরনের উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিদের আগমনে সুন্দরবনের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হয়। তাঁহাদের আগমনে প্রাচীন ইরাণ সাম্রাজ্যের সাসানীয় সম্রাট বাহরামগুরের শিকারের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। বর্তমানে দেশী-বিদেশী পর্যটকের আনাগোনায় সমগ্র সুন্দরবন মধ্যে মধ্যে কোলাহল মুখরিত থাকে।

সুন্দরবনে সাধারণের বিনা আদেশ পত্রে প্রবেশ নিষেধ। আদেশ পত্র ভিন্ন কাঠ সংগ্রহ, মৎস্য ধরা, জীবজন্তু শিকার প্রভৃতি সমস্তই বে-আইনী। কিন্তু অনেক সময় চোর ডাকাতেরা গোপনে সুন্দরবনে প্রবেশ করিয়া চৌর্য ও দস্যুবৃত্তি গ্রহণ করে। চুরি করিয়া তাহারা সুন্দরবনের মূল্যবান সম্পদ আহরণ করে এবং দস্যুবৃত্তির দ্বারা নিরীহ ও নিরস্ত্র ব্যক্তিদের যথাসর্বস্ব হরণ করে। সুন্দরবনের কোন কোন স্থানে ডাকাতদল আত্মগোপন করিয়া থাকে এবং সুযোগমত লোকালয়ের কোন ধনীর গৃহে ডাকাতি করিয়া জঙ্গলের মধ্যে উধাও হয়। মগ-পর্তুগীজদের সময় এই ধরনের ডাকাতি অহরহ সংগঠিত হইত। বিগত বিশ বৎসরের মধ্যে জঙ্গলের অভ্যন্তরে ও বাহিরে অসংখ্য ডাকাতি সংগঠিত হইয়াছে।

সুন্দরবনের কোথাও গভীর জঙ্গলের মধ্যে ডাকাতদের আড্ডা আছে বলিয়া শুনা যায়। ভারত ও পূর্ব-পাকিস্তানের সীমান্তে অবস্থিত স্থানে ভয়াবহ একদল ডাকত আছে। এই ডাকাত দল দক্ষিণ খুলনা ও বাকেরগঞ্জের দক্ষিণাংশে প্রবেশ করিয়া আগ্নেয়াস্ত্র সহ ডাকাতি করিয়া জনসাধারণের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করে। নিষ্ঠুর ও নির্দয় ডাকাতেরা নরহত্যা ও লুণ্ঠন করিয়া বিপুল ধন সম্পদ আহরণ করতঃ উধাও হয়। এইরূপ একটি দলের সর্দার পাইকগাছা থানার অন্তর্গত গোবরা গ্রামের বাছের ঢালী। সরকার এই দস্যু সর্দারকে ধরিবার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন। বহু চেষ্টার পরও পুলিশ এই কুখ্যাত দস্যু সর্দারকে গ্রেফতার করিতে সক্ষম হয় নাই। শুনা যায় বাছের ঢালী গভীর অরণ্যানীর মধ্যে সদলে লুকাইয়া থাকিত। আবার কেহ কেহ বলেন, সে ভারত সীমান্তে কোথাও লুকায়িত থাকিয়া পাকিস্তানে প্রবেশ করিয়া দস্যুবৃত্তি করিয়া আবার ভারতে ফিরিয়া যাইত। পূর্ব-পাকিস্তান ও পশ্চিম বঙ্গের পুলিশ অফিসারদের এক সম্মেলনে তাহাকে আন্তর্জাতিক জলদস্যু বলিয়া ঘোষণা করা হয়।

কুখ্যাত ডাকুসর্দার বাছেরের সঙ্গে পূর্ব-পাকিস্তান পুলিসের এক সংঘর্ষ হয়। উক্ত সংঘর্ষে হাবিলদার ঈদ্রিস বন্দুকের গুলিতে নিহত হন। হাবিলদার বাকেরগঞ্জ জিলার অধিবাসী এবং ঐ সময় তিনি পাইকগাছা থানার অন্তর্গত এবং সুন্দরবনের প্রান্তসীমায় বেতকাশীর পশ্চিমে অবস্থিত ঘড়িলাল পুলিস ক্যাম্পের অধিনায়ক ছিলেন। বাছের যখন স্বদলবলে ডাকাতি করিয়া সুন্দরবনের পার্শ্বস্থ সত্য পীরের খাল দিয়া নৌকারহণ করিয়া যাইতে ছিল সেই সময় হাবিলদার ঈদ্রিস সংবাদ পাইয়া নৌকাযোগে বাছেরের নৌকার পিছু পিছু ধাওয়া করেন। অত্যন্ত সতর্কতার সহিত হাবিলদার ডাকাতদের অনুসরণ করিতে থাকেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে ডাকাতদল তাহার বিষয় ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারে নাই। কিন্তু ধূর্ত ডাকুসর্দার পুলিশের আগমন পূর্বে বুঝিতে পারিয়া অতি সন্তর্পনে আগ্নেয়াস্ত্র সহ ওত পাতিয়া নৌকার মধ্যে বসিয়া থাকে। হাবিলদার নৌকাটি প্রকৃত ডাকাতদলের কিনা সে বিষয় নিশ্চিন্ত হইয়া বন্দুক ছুড়িবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, এমন সময় সুচতুর বাছের মুহূর্তমাত্র কালক্ষেপ না করিয়া হাবিলদারের বক্ষস্থল লক্ষ্য করিয়া গুলী করে। ঐ গুলী তাহার

বক্ষস্থল ভেদ করিয়া যায়। রুধিরাক্ত কলেবর লইয়া হাবিলদার বীরদর্পে হুঙ্কার ছাড়িয়া নিমিষের মধ্যে ডাকাতদের উপর কয়েক রাউণ্ড গুলী বর্ষণ করেন এবং উহার আঘাতে ২ জন ডাকাত ধরাশায়ী হয়। কিন্তু বাছের কোন প্রকারে দ্রুত পলাইতে সক্ষম হয়। ডাকু বাছেরের গুলীর আঘাতে হাবিলদার ঈদ্রিসের জীবন প্রদীপ নিভিয়া যায়।

সম্প্রতি (ইংরাজী ১৯৬২ সাল) এক সংবাদে প্রকাশ যে বাছের ৫০০ কার্তুজ সহ ডাকাতি করার জন্য সুন্দরবনের কোথাও লুকাইয়া আছে। বুড়ি-গোয়ালিনীর নিকটে তাহার দল একটি ডাকাতি করিয়াছে এবং বনবিভাগের একটি সরকারী নৌকায় অকস্মাৎ গুলী ছুড়িয়া একটি বন্দুক ছিনাইয়া লইয়া-গিয়াছে। একজন বোটম্যান গুলীর আঘাতে গুরুতর ভাবে আহত হইয়াছে।

ইংরাজী ১৯৪৬সালের ২৩শে জুন বাছের সদলবলে ডাকাতি ও লুণ্ঠন করিয়া স্বগ্রামের হাজী পরিবারকে ধ্বংস করিয়া দেয়। শ্রীউলার মুচী দস্যুদের সাহচর্যে এবং ওস্তাদ আছিরুদ্দিন সানার নেতৃত্বে বাছের দস্যুবৃত্তি শিক্ষা করে। বাছেরের পিতার নাম তাবেজ ঢালী। ভ্রাতা আছের, নুরম্যান, নুরআলী, ও রুহুল কুদ্দুস। ইহাদেরও সে দস্যুবৃত্তি শিক্ষা দিয়াছে। ডাকাতির সময় বাছে-রের দল গোলাগুলী, বন্দুক, রাইফেল, রিভলভার, পিস্তল, রামদা, ভেলা, ঢাল-সড়কী, বল্লম, টর্চ, ও হেসাক লাইট সঙ্গে রাখিত। ফাঁকা আওয়াজ করিয়া তাহারা ভীতি প্রদর্শন করিত। প্রায় প্রতি ডাকাতিতে তাহারা নরহত্যা করিত। বিভাগোত্তর কালে বাছের ভারতে পলায়ন করে। সেখানে সে ৬জন শিক্ষিত হিন্দু যুবককে শিষ্যরূপে গ্রহণ করে। ইহাদের কয়েকজন এবং তাহার আরও বহু সঙ্গী জলদস্যু ইতিপূর্বে ধরা পড়িয়া বিচার আদালতে নীত হইয়াছে। তন্মধ্যে কয়েকজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও বিভিন্ন মেয়াদের কঠিন কারা জীবন যাপনের আদেশ হইয়াছে। দক্ষিণ খুলনা তথা সুন্দরবনের ডাকাতির কথা নূতন নয়। মগ-পর্তুগীজ জলদস্যুগণ দেশ হইতে চির বিদায় গ্রহণ করার পরও তাহাদের কিছু কিছু শিষ্য এদেশে থাকিয়া যায়। ডাকাতির বিভিন্ন কলাকৌশল তুর্ক-আফগান আমল হইতে এতদঞ্চলে প্রচলিত আছে। ঘন বসতির অভাব, নির্জন বনানী, বিশালকায় ও প্রলয়ংকর নদনদী, অসংখ্য খাল বিল, দ্রুত পলায়নের সুযোগ সুবিধা, আর্থিক অনটন,

অশিক্ষা, কুশিক্ষা, শাসন ব্যবস্থার শিথিলতা প্রভৃতি কারণে এই সব দস্যুদল সৃষ্টি হইয়া মধ্যে মধ্যে ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করে। ইহারাই রাষ্ট্রের প্রকৃত দুষমন।

এই আন্তর্জাতিক ডাকুসর্দার ডাকাতি করার সময় যেরূপ নির্মমভাবে নরহত্যা করে তদ্রূপ শৃঙ্খলাভঙ্গ ও বিশ্বাসঘাতকতার জন্য স্বদলের লোককেও হত্যা করিতে কুণ্ঠিত হয়না। এ সম্পর্কে জানিতে পারা যায় যে, এই ডাকু সর্দারের পুত্রের সঙ্গে তদীয় ভাগ্নে বধুর গুপ্ত প্রণয় হয়। বাছের উক্ত ভাগ্নেকে আদেশ করে তাহার স্ত্রীকে পাকিস্তানে রাখিয়া আসিতে। ডাকু সর্দারের আদেশ অমান্য করিয়া সে তাহার স্ত্রীকে চরিত্র হীনতার জন্য সুন্দরবনের জঙ্গলে নির্মমভাবে খুন করিয়া নদীতে ফেলিয়া দেয়। সে বাছেরের নিকট ফিরিয়া গিয়া আদেশ পালন করিয়াছে বলিয়া মিথ্যা রিপোর্ট দেয়। পরে বাছের জানিতে পারে যে, তাহার ভাগ্নে হুকুম তামিল করে নাই, তদাক্রোশে সে নিজ হস্তে উহাকে গুলী করিয়া মারিয়া ফেলে।

একদা সুন্দরবনের দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে অবস্থিত বেয়ালা-কয়লা দ্বীপে বাছের গৃহ নির্মাণ করিয়া গুপ্ত ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। পুলিশ সংবাদ পাইয়া এই দ্বীপে বাছেরের অন্বেষণ করে। সেখানে তাহারা একখানা ভগ্ন নৌকা ও ভগ্ন কুঁড়েঘর দেখিয়া ফিরিয়া আসে। শত চেষ্টার পরও বাছের ধরা পড়েনা।

পুলিশের হিসাবমতে বাছের সুন্দরবনের কর্মচারীদের নিকট হইতে এপর্যন্ত প্রায় ২০টি বন্দুক ছিনাইয়া লইয়াছে। তাহার দলের বন্দুক ও রাইফেলের সংখ্যা শতাধিক হইবে বলিয়া কোন অভিজ্ঞ পুলিশ কর্মচারী অনুমান করিয়াছেন। এই ডাকুদল কয়েক বৎসর পূর্বে শ্যামনগর থানার মানিকগঞ্জ গ্রামে এক গৃহস্থের বাড়ীতে ডাকাতি করিয়া নগদ ১,৩০,০০০ টাকা এবং ১২সের স্বর্ণ লুণ্ঠন করিয়া লয়। তাহারা পাইকগাছা থানার অন্য আর একটি বাড়ী হইতে ৯০,০০০ টাকা ডাকাতি করিয়া উধাও হয়।

বাছের ছোট খাট ডাকাতী করেনা। ১০,০০০ টাকার নীচে নগদ অর্থের কোন মালিকের উপর হামলা করেনা। কোন গৃহে আধ ঘণ্টার বেশী ডাকাতির সময় থাকেনা। এই ধরনের আরও অনেক নিয়ম কানুন এই দলের আছে। লুণ্ঠিত অর্থের একাংশ দরিদ্রদের মধ্যে বাছের বিতরণ করিত এবং কেহ দুর্ব-

লের উপর অযথা অত্যাচার করিলে সে তাহাকে শাস্তি দিত বলিয়া শুনা যায়।

সম্প্রতি বাছের ধরা পড়িয়া খুলনা জেলখানায় আটক আছে। জেল জীবন তাহার নিকট নূতন নহে। সে একবার আলীপুর জেল হইতে পলায়ন করে। খুলনা পুলিশ কোর্টে আমরা বাছেরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। সে সংক্ষেপে তাঁহার জীবন বৃত্তান্ত আমাদের নিকট বর্ণনা করে। পশ্চিম বঙ্গে সে বাবর আলী মোল্লা নামে পরিচিত বলিয়া আমাদের জানায়, বিভিন্ন সংবাদ পত্রে বাছেরের গ্রেফতারের খবর প্রকাশিত হয়। উহা মোটামুটি এইরূপ :

"সুন্দরবনের রাজা, ডাকাত বাছের ঢালী গ্রেফতার"

খুলনা, ৭ই জানুয়ারী ১৯৬৬।— পাক-ভারত উপমহাদেশের কুখ্যাত ডাকাত বাছের ঢালীকে এই জেলার পাইকগাছা থানার একটি গ্রামে গ্রেফতার করা হইয়াছে। গত ১৯৫০ সাল হইতে পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব পাকিস্তানের পুলিশ তাহার অনুসন্ধান করিতেছে। বাছের ঢালী এ যাবৎ প্রায় শতাধিক ডাকাতি করিয়াছে এবং বহু ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছে। ১৯৫৬ সালে সে ঈদরিস নামক একজন হাবিলদারকে হত্যা করে। ঈদরিস তাহাকে গ্রেফতার করিতে গেলে প্রচণ্ড সংঘর্ষ বাধে। বাছের ঢালী হাবিলদারকে গুলী করিয়া হত্যা করিয়া পলায়ন করে। ঈদরিসের স্মৃতি উপলক্ষে প্রতিবৎসর খুলনায় ঈদরিস স্মৃতিট্রফি ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

পূর্ব পাকিস্তান সরকার এই কুখ্যাত ডাকাতকে গ্রেফতার করার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন। বাছের ঢালী পশ্চিমবঙ্গেও ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করিয়াছিল। সেখানে সে "গঙ্গা সাগর" নামে পরিচিত। পশ্চিমবঙ্গ সরকারও তাহাকে গ্রেফতারের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেন। বাছের ডাকাত হিন্দু না মুসলমান তাহা কেহই জানিত না। তাহাকে গ্রেফতারের পর অত্যন্ত কড়া পুলিশ পাহারায় খুলনা শহরে আনয়ন করা হয়। এই দুর্ধর্ষ ডাকাতকে দেখার জন্য বিপুল জনসমাগম হয়। বাছের জানায় যে, তাহার একজন সাগরেদের বিশ্বাসঘাতকতার ফলেই গ্রামবাসীদের হাতে সে ধরা পড়িয়াছে। যুদ্ধের সময় সে ভারতে অবস্থান করিতেছিল। কালিপদ সেন নামক এক ভারতীয় মাঝির নৌকায়

সে পাকিস্তানে আগমন করিয়াছিল। ইতিমধ্যেই সে পাকিস্তানে ৬ জন অনুচর সংগ্রহ করিয়াছে। আর একদিনের মধ্যেই সে একটি বন্দুক যোগাড় করিতে পারিত। এই সময় সে গ্রেফতার হইয়াছে। মাঝি কালিপদ সেনকেও গ্রেফতার করা হইয়াছে।

পাকিস্তান ও ভারতের পুলিশ গত ১৫ বৎসর যাবৎ তাহার অনুসন্ধান করিয়া আসিতেছে। তাহার বয়স বর্তমানে ৫০ বৎসর। তাহার চেহারায় কোনও অসাধারণত্ব বা কোনও বৈশিষ্ট্য নাই। ৫ ফুট লম্বা বাছের ঢালীর ওজন প্রায় ১১০ পাউণ্ড। লুঙ্গী, শার্ট ও পুরাতন ছোট উলের কোট পরিহিত খর্বকায় বাছের ঢালীকে অত্যন্ত সাধারণ লোক বলিয়া মনে হইতেছিল।

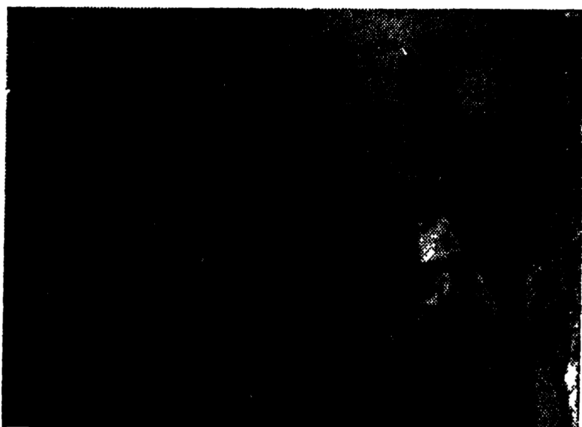
সে আরও জানায় যে, পশ্চিমবঙ্গের বারাসতে তাহার পাকা বাড়ী রহিয়াছে। সেখানে তাহার বৃদ্ধা মাতা, স্ত্রী ও পাঁচটি সন্তান রহিয়াছে। বাছের ঢালীর নিকট হইতে জানা গিয়াছে যে, তাহার বারাসতের বাড়ীতে ১৪টি বন্দুক, ৪টি রাইফেল ও ২টি রিভালবার রাখিয়া আসিয়াছে। তাহার সম্পর্কে অনেক কাহিনী ও কিংবদন্তী প্রচলিত রহিয়াছে। অনেকে মনে করে বাছের ঢালী নানাপ্রকার মন্ত্র জানে বলিয়া তাহাকে গ্রেফতার করা সম্ভব নহে।

এই দুর্ধর্ষ আন্তর্জাতিক জলদস্যুর কাহিনী রূপকথার ন্যায় বিস্তার লাভ করিয়াছে। শারিরীক অবয়ব দর্শনে অনেকেই তাহাকে বাছের ঢালী বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারে নাই। খুলনা জেলে কঠোর পাহারাধীনে শৃঙ্খলাবস্থায় বাছের অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্দী আছে। পাপীর শাস্তি বিচারালয়ে অনুষ্ঠিত হইবে। তাহার বিরুদ্ধে মামলাগুলি বর্তমানে তদন্তাধীন।

বঙ্গোপসাগরের তীরে দুবলা দ্বীপ সুন্দরবনের এক মনোরম স্থান। এই দ্বীপকে সাধারণে দুবলার ট্যাক বলিয়া থাকে। এই স্থানের বালুকা খুঁড়িলেই সুমিষ্ট জল পাওয়া যায়। দুবলার চরে বহুদূর বিস্তৃত বালুকারাশি দৃষ্ট হয়। লবনাক্ত প্রদেশে কর্দমাক্ত স্থানই সর্বত্র। সুন্দরবনে সমুদ্রতীর ভিন্ন বালুকা কদাচিত দৃষ্ট হয়। এখানে চরের পরিধি ক্রমাগ তবৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। বালুকার

শ্বেতকায় কণাগুলি রৌদ্র কিরণে ঝক্‌মক্ করে। দ্বীপের উচু স্থানে কাশবন এবং উলুখড়। এই স্থানের উত্তরদিকে শিবসা, মারজাট্রা, পশর ও অন্যান্য নদী মিলিত হইয়া এক ভীষণাকার ধারণ করিয়াছে। নদীর প্রশস্ততা এখানে কিঞ্চিদধিক ৫মাইল। এখানে জোয়ারের সময় ভীষণ ঢেউ হয়। স্বচক্ষে না দেখিলে উহার ভয়াবহতা উপলব্ধি করা সুকঠিন। দুবলা দ্বীপের দক্ষিণে অনন্ত সমুদ্র। শুধু জলে জলময়। দুবলার চরে হরিণ ঝাকে ঝাকে বিচরণ করিয়া আহার সংগ্রহ করে।

এই বিখ্যাত দুবলার ট্যাকে প্রতি বৎসর কার্তিক মাসে রাসপূর্ণিমার সময় ধুমধামের সহিত মেলা বসিয়া থাকে। বঙ্গোপসাগরের তীরে এহেন নির্জন ও মনোরম স্থানে এই মেলায় অসংখ্য দর্শকের ভীড় হয়। সন্তানাদি জন্ম গ্রহন না করিলে অনেক অশিক্ষিত হিন্দু এই মেলায় মানত করে এবং বছরের এই সময় আসিয়া মানতকারীরা অনুষ্ঠানাদি করিয়া থাকে। কেহ কেহ কৃত পাপ মোচন হইবে মনে করিয়া এই স্থানে আগমন করে এবং সমুদ্রের তরঙ্গমালার মধ্যে ডুবিয়া ঢেউয়ে স্নান করিয়া থাকে। মেলায় কয়েক সহস্র লোকের সমাগম হয়। মৎস্যজীবিদের আবাসস্থল হইতে এই মেলার স্থান পাঁচ মাইল পশ্চিমে এবং টাইগার পয়েন্ট এখান হইতে প্রায় দশ মাইল পূর্বে অবস্থিত। মকর সংক্রান্তি অর্থাৎ পৌষমাসের শেষদিনে গঙ্গাসাগরের মেলা হয়। উহার সহিত এই মেলার কিছুটা সম্পর্ক ছিল বলিয়া জানা যায়। হিন্দুগণ এই স্থানকে গঙ্গাসাগরের মেলার ন্যায় একটি তীর্থ স্থান মনে করিয়া এখানে আসিয়া ভীড় জমায়। যশোর ও বাকেরগঞ্জের দূরবর্তী স্থান হইতে ও বহু হিন্দু নরনারী ও শিশু এই মেলায় জমায়েত হয়। খুলনা জিলার অসংখ্য নরনারী প্রতিবৎসর এই মেলায় যোগদানের জন্য সুন্দরবন ভ্রমণ করিয়া থাকে। মুসলমানেরাও এই মেলার সময় সুন্দরবন ও সমুদ্র ভ্রমন করে। লোকালয় হইতে মিষ্টান্ন, ইক্ষু, ফলমূল, খেলনা মৃন্ময়পাত্র ইত্যাদি পণ্যসম্ভার নৌকাযোগে দুবলার চরে নীত হইয়া ক্রয় বিক্রয় হয়। সাধারণ গ্রাম্য লোকের এই নির্জন স্থানে এক অপূর্ব সমাবেশ। সরকারী কর্মচারীদের অনেকেই এতদোপলক্ষে সেখানে উপস্থিত থাকেন। অনেকে এই মেলাকে মগদের মেলা বলিয়া উল্লেখ করেন। কিন্তু তাহা ঠিক নহে। দেশীয় লোকেরাই এই মেলার উদ্যোক্তা। এখানে দিগন্তব্যাপী সলিল রাশির তীরে





উপরে : দুবলার মেলায় সমুদ্রতরঙ্গে স্নানরত হিন্দু নরনারী ও শিশু।

নীচে : সুন্দরবনের প্রান্তসীমায় বনবিভাগের একটি অফিস।

শ্যামমমান বৃক্ষশ্রেণীর সবুজরেখা তীরভূমির অস্পষ্ট আভাষ জানায়। মেলার কয়দিন নির্জন দুবলা দ্বীপে একটি ক্ষুদ্রকায় সহরের ন্যায় মনে হয়।

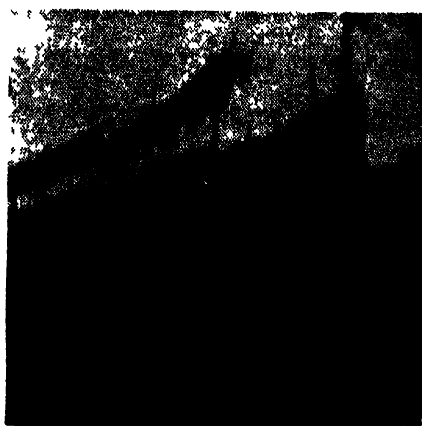
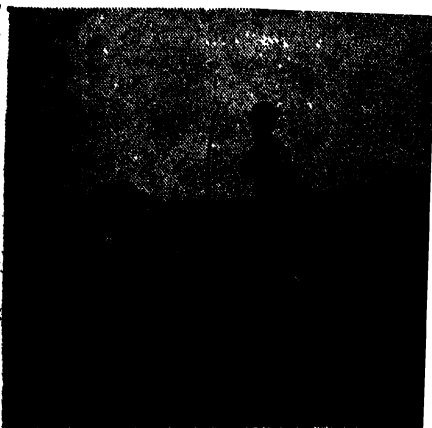
ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহের জন্য বিগত ১৯৬৫ সালের রাস পূর্ণিমার সময় খুলনা সাহিত্য পরিষদের ডাঃ আবুল কাসেম, এস, এম, মোবারক আলী প্রমুখ-সহ সমুদ্র তটবর্তী দু'লা দ্বীপে গমন করি। বয়োবৃদ্ধ হিন্দুদের নিকট জানিতে পারি যে প্রায় ৩৫ বৎসর পূর্বে ওড়াকান্দির জনৈক ঠাকুর সপ্নাদিষ্ট হইয়া এখানে পূজা পার্বণাদি অনুষ্ঠান করেন। তদবধি ধীরে ধীরে ক্রমাগত এই মেলায় জন সমাগম বৃদ্ধি পাইতে থাকে। দেবতা নীলকমল ও গঙ্গাদেবীর উদ্দেশ্যে হিন্দুরা প্রার্থনা করে। বাদ্য, নৃত্যগীত ও বিভিন্ন প্রকার অনুষ্ঠানাদি হইয়া থাকে। ঢেউ সেবনের সময় মন্ত্রাদি উচ্চারণ, ফল ও মিষ্টান্ন উৎসর্গ করিতে দেখা যায়।

গভীর বনানীর পার্শ্বে যে চরে সর্বদা হরিণ ও ব্যাঘ্র চরিয়া বেড়ায় সেখানে দুই দিনের জনসমাগমে তাহার কোনই কিছু পরিলক্ষিত হয় না। জনসমাগমের জন্যই ব্যাঘ্রকুল দূরে সরিয়া থাকে। অশিক্ষিত হিন্দুরা বলে এই দুই দিন বড়দাদা বা গাজী ঠাকুর (ব্যাঘ্র) কোন লোককে আক্রমণ করে না।

অধুনা হিন্দু মুসলীম সকল শ্রেণীর লোক এই মেলায় আমোদ প্রমোদ করিতে সমবেত হয়। সমুদ্রতটে ৫/৬ মাইল ব্যাপী সুদীর্ঘ ও প্রশস্ত বালুচরে পদব্রজে ভ্রমণ মানবমনে অপূর্ব আনন্দ দান করে। যুবকেরা বালুচরে ফুটবল ইত্যাদি ক্রীড়ায় লিপ্ত থাকিয়া চিত্ত বিনোদন করে। অসংখ্য ক্যামেরার সাহায্যে ফটো তোলার হিড়িক পড়িয়া যায়। জনমানব শূন্য প্রদেশে সে এক অভিনব ও নয়নাভিরাম দৃশ্য। সমুদ্র দর্শন, সুর্যোদয় ও সুর্যাস্তের নিখুঁত অথচ মনোরম দৃশ্য সৌন্দর্যপিপাসু ব্যক্তিরা উপভোগ করেন। পানীয় জলের অভাব পড়িলে লোকে বালুচরের কূপ হইতে সংগ্রহ করে। তীর্থ যাত্রীরা সমুদ্রের ফেনায় গঠিত শক্ত পদার্থ সংগ্রহে কালক্ষেপ করে। শত শত নৌকা ও বহু মটর লঞ্চের সমাগমে স্থানটি দুই এক রাতের জন্য আলোকমালায় সজ্জিত হয়।

দুবলা চরের পূর্বে মানিকদিয়া নদী। এই নদী পশরের শেষ সীমান্ত হইতে উৎপত্তি হইয়া বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে। মানিকদিয়া নদীর উভয় তীরে ধীবরেরা বসবাস স্থাপন করিয়াছে। তাহারা বৎসরের নির্ধারিত সময়ে এখানে

মৎস্য ব্যবসায় পরিচালনা করে। মৎস্য জীবিদের এতদঞ্চলে দুইটি আড্ডা আছে। এই উপনিবেশ সমুদ্রের সংলগ্ন বলিয়া বাহির কেল্লা নামে পরিচিত। বহুকাল ধরিয়া চট্টগ্রামের কৈবর্ত সমাজ ও মগজাতীয় লোকেরা এই ব্যবসায় করিয়া বিশেষ লাভবান হইতেছে। বিত্তশালী লোকেরা অগ্রিম টাকা দাদন দিয়া চট্ট-গ্রাম হইতে মজুর আনয়ন করিয়া তাহাদের সাহায্যে মৎস্য ধরে। চট্টগ্রামের বিশিষ্ট জলযান সাম্পান ও বিভিন্ন প্রকারের নৌকাসহ প্রতি বৎসর কার্তিক—অগ্রহায়ণ মাসে ধীবরগণ দলে দলে সাগরকূল ধরিয়া দুবলা দ্বীপে উপনীত হয়। ফাল্গুন মাসে দখিণা হাওয়া প্রবল হইবার পূর্বে তাহারা আবার নৌকাযোগে নিজ নিজ বাড়ীতে ফিরিয়া যায়। মানিকদিয়া নদীর নিকট মোরাদিয়া খাল। এখানেও জালিয়াদের একটি প্রধান আড্ডা স্থাপিত হইয়াছে। সমুদ্রের তীর-বর্তী উন্মুক্ত স্থান হইতে একটু দূরে জঙ্গলের মধ্যে অবস্থিত বলিয়া ইহাকে অন্দর-কিল্লা বলা হইয়া থাকে। উভয় কিল্লার লোকসংখ্যা প্রায় ৫০০০ সহস্র। মৎস্য জীবিদল মানিকদিয়া নদী ও মোরাদিয়া খালের পার্শ্ববর্তী সুন্দরবনের সংলগ্ন এবং বঙ্গোপসাগরের তীরে এক সুন্দর লোকালয় স্থাপন করিয়াছে এবং তাহাদের নামানুসারে এই স্থানের নামকরণ হইয়াছে "ফিসার ম্যানস আইল্যাণ্ড" অর্থাৎ ধীবরদের দ্বীপ। বনবিভাগের কর পরিশোধ করিয়া এখান হইতে শুট্‌কী মৎস্য চট্টগ্রাম ও অন্যত্র রপ্তানী হয়। এই স্থানের অধিবাসীদের নিকট চাউল, ডাল, মরিচ, পিঁয়াজ, মসলা প্রভৃতি পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিবার জন্য নৌকা বোঝাই করিয়া ব্যবসায়ীরা মধ্যে মধ্যে শহর ও বন্দর হইতে যাতায়াত করে। ইংরাজী ১৯৫৭ সালে কতিপয় মিলিটারী কর্মচারী বড় বড় নৌকা বোঝাই মৎস্য দেখিয়া কতিপয় ধীবরকে চোরাচালানী মনে করিয়া মাঝি-মাল্লাসহ গ্রেফতার করিয়া খুলনা সদরে আনয়ন করে। ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে ধীবরদের শাস্তি হয়, কিন্তু আপীলে জজকোর্ট হইতে সকলেই খালাস পায়। চট্টগ্রামের মৎস্য জীবিদের এক আবেদনে তৎকালীন মৎস্য বিভাগের মন্ত্রী ও লেখক সরকারের পক্ষ হইতে সরে-জমিনে তদন্তের জন্য দুবলদ্বীপে যান এবং তাহাদের অবস্থা ও মৎস্য ধরার প্রণালী পরিদর্শন করেন। শুনিতে পাইলাম কিছুদিন পূর্বে জ্বালানী সংগ্রহের সময় বিশজন লোকের মধ্য হইতে একজনকে ব্যাঘ্রে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। প্রতি বৎসর মৎস্যজীবিদের ২।১জন লোক ব্যাঘ্রে ভক্ষণ করে এবং অনুরূপ

সুন্দরবনস্থ দুবলা দ্বীপে মৎস্য শুটকি করিবার বিভিন্ন প্রণালী—৭৫

সংখ্যা সর্পাঘাতে প্রাণত্যাগ করে। তথাপি মৎস্যজীবিরা তাহাদের এই কষ্টকর ব্যবসায় হইতে বিরত হয়না। তাহাদের ঘরগুলির সম্মুখে ও পার্শ্বে বিস্তৃত প্রাঙ্গণ আছে। তথায় তাহারা বিভিন্ন প্রণালীতে মৎস্য শুকাইয়া থাকে। উচ্চ স্থানে ঝুলাইয়া মৎস্য শুকাইবার বিশেষ ব্যবস্থা আছে। দূর হইতে উহা উচুঁ ঘরের ন্যায় মনে হয়। গভীর অরণ্যানীর মধ্যে বিশাল সমুদ্রের তরঙ্গমালার পার্শ্বে মৎস্যজীবিদের এই উপনিবেশ বাস্তবিকই সুন্দর দেখায়। এ বিষয়ে অন্যত্র বিস্তারিত আলোচনা করা হইবে।

সুন্দরবনের নদীপথে বিভাগ পূর্বে অসংখ্য বাণিজ্যপোত কলিকাতা-আসাম যাতায়াত করিত। এখন উহা বহুলাংশে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে। সুন্দবরন ভ্রমণ-কালে অনেকে দিনের পর দিন ঘুরিয়া মানুষের মুখ দেখিতে পান না। সপ্নেঘেরা রহস্যময়ী এই দেশ। দেশ বিদেশ হইতে কত প্রকার জলযান সুন্দরবনের পার্শ্ব-দিয়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পরিচালনা করিয়া থাকে তাহার ইয়ত্বা নাই। ডাকাতের ন্যায় কাল বাজারীরাও জাহাজ ও নৌকাযোগে সাধারণের অগোচরে ব্যবসায় চালাইয়া থাকে। দুর্ধর্ষ কালবাজারীদের নিকট গভীর জঙ্গলের জলপথ জানা আছে। আন্তর্জাতিক কালবাজারীরাও কোন কোন সময় সুন্দরবনে অবস্থান করে। শুল্ক ও পুলিশ বিভাগের বেড়াজাল ভেদ করিয়াও তাহারা ব্যবসায় চালায়। আবার কোন কোন সময় কালবাজারীদের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটে। মগ ফিরিঙ্গিদের ন্যায় ব্যাপক না হইলেও দুর্ধর্ষ ডাকাতেরা এখনও সুন্দরবন এবং পার্শ্ববর্তী লোকালয়ে দস্যুবৃত্তি চালাইয়া মধ্যে মধ্যে ভীষণ ত্রাস সৃষ্টি করে।

রহস্যময়ী সুন্দরবনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য

।। সাত ।।

সহস্র সহস্র বর্গমাইল ব্যাপী যে সুবিস্তৃত ও সুসংন্যস্ত বনবিভাগ দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের তীর হইতে উত্তরে লোকালয় পর্যন্ত স্থান জুড়িয়া শোভা পাইতেছে উহাই আমাদের দেশে সুন্দরবন বলিয়া পরিকীর্তিত হয়। এই সুন্দরবন বাস্তবিকই সুন্দর কিনা তাহাই আমাদের আলোচ্য বিষয়। যাঁহারা সুন্দরবনের দৃশ্য অবলোকন করিতে পারেন নাই, তাঁহাদের পক্ষে সুন্দরবন সম্পর্কে কোন মন্তব্য করা সম্ভব নয়। বহুদিন ধরিয়া সুন্দরবন দেখিয়া উহার সৌন্দর্য উপভোগ করিয়া আসিতেছি। একথা সত্য যে সুন্দরবন সাধারণের নিকট এক কল্পনাময় রাজ্য। বিদেশী পরিদর্শকেরা অত্যুৎসাহের সহিত সুন্দরবন ভ্রমণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা জানেন অধুনা প্রতিষ্ঠিত চালনা বন্দরের কয়েক মাইল দক্ষিণে অবস্থিত এই সুন্দবরন। বিশ্ববিশ্রুত রয়াল বেঙ্গল টাইগারের আবাসভূমি ও শিকারীদের স্বর্গ সুন্দরবন। নিবিড়, ঘন, চিরসবুজ এবং নিস্তব্ধ এই সুন্দরবন। গাছের মাথা কোথাও উঁচু নিচু নাই। সামান্য শব্দ করিলেই জঙ্গলমধ্যে উহা প্রতিধ্বনিত হয়। তাই সুন্দরবন এক রোমাঞ্চকর জনমানবশূন্য অভিনব দেশ। সাধারণ লোকালয় হইতে ইহার সবকিছুই ভিন্ন ধরনের। তন্নিমিত্ত উহাকে রহস্যময়ী এক দেশ বলা যাইতে পারে। এ রাজ্য সাধারণ লোকালয় হইতে বিশিষ্ট ধরনের। এখানকার বৃক্ষলতা ও জীবজন্তু সচরাচর লোকালয়ে দৃষ্ট হয়না। সেইজন্য সুন্দরবন জাতীয় জীবনে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে।

সুন্দরবনের দৃশ্য গুরুগম্ভীর অথচ নয়নাভিরাম। জীবনে সর্বপ্রথম যখন সুন্দরবন দর্শন করি তখন হৃদয় ভাবাবেগে অভিভূত হইয়াছিল। মনে হইয়াছিল এ যেন অজানা জিন-পরীদের আবাসভূমি এবং আশ্চর্য এক দেশ। কিছু দূর হইতে সুউচ্চ বৃক্ষ সমূহের মস্তক উন্নত অবস্থায় দর্শন করিয়া বিপুল আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলাম। এহেন দৃশ্য সর্বদিকেই একপ্রকার। পর্বতের ন্যায় সুন্দরবন এখানে সেখানে উঁচু-নীচু নহে। সর্বত্র বৃক্ষের মস্তক সমানভাবে বর্ধিত। নদী তীরে বৃক্ষরাজির শ্রেণী দেখিলে মনে হয় কোন ঐন্দ্রজালিক হস্তের দ্বারা

মনোরম বাগিচা সুসজ্জিত হইয়াছে। জঙ্গলের বৃক্ষ শ্রেণীবদ্ধভাবে জন্মিবারও কারণ আছে। অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা বলেন যে জোয়ারের সময় বৃক্ষের পক্ক ফলগুলি ঢেউয়ের ধাক্কায় একই লাইনে জমা হয়। জোয়ারের জল সরিয়া গেলে ফলগুলি মাটিতে বসিয়া একই লাইনে অঙ্কুরিত হয় ও সুন্দরভাবে একই শ্রেণীতে বর্ধিত হইয়া থাকে। তজ্জন্য জঙ্গলে একই প্রকার বৃক্ষ একই স্থানে বহুলাংশে দৃষ্ট হয়। ইহারও অবশ্য ব্যতিক্রম আছে। জোয়ার-ভাটা কম বেশী ও ঋতু পরিবর্তনের জন্য তীরবর্তী স্থানে বা জঙ্গলের অভ্যন্তরে একই শ্রেণীর বৃক্ষের অবস্থান হওয়া স্বাভাবিক। গৃহস্থের দ্বারা সযত্নে প্রস্তুত উদ্যান সমূহের চেয়ে সুন্দরবনের বৃক্ষ-রাজির একত্র সমাবেশের দৃশ্য মনোমুগ্ধকর। বৃক্ষের ডালপালা ছাতার ন্যায় উপ-রিভাগে বিস্তৃত হয়। সূর্যকিরণ পাইবার জন্য উহারা যেন একে অন্যের সহিত প্রতিযোগিতায় লিপ্ত থাকে।

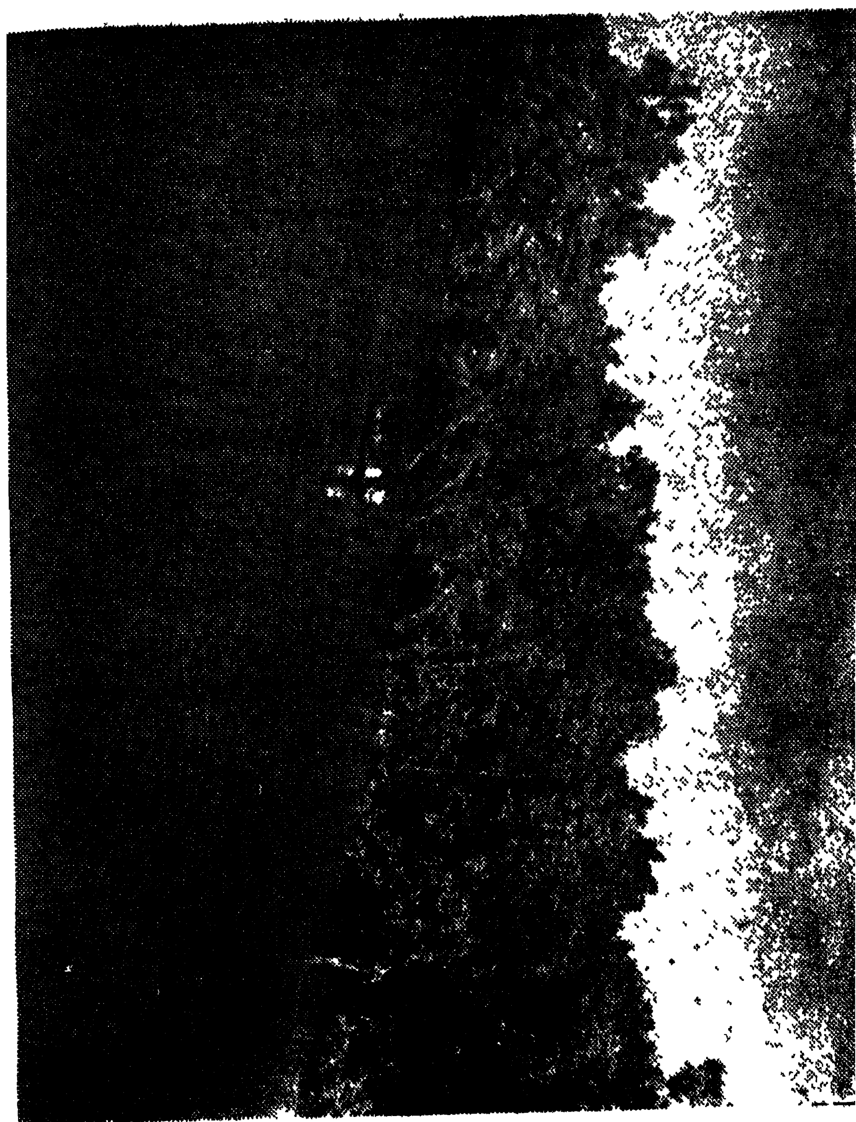
সুন্দরবনে নূতন চর উঠিলে অল্পদিনের মধ্যে অসংখ্য বৃক্ষের উৎপত্তি হইয়া সবুজ শোভা ধারণ করে। চারা গাছের শ্রেণীসমূহ পাটক্ষেতের ন্যায় মনে হয়। নদীতটের সুউচ্চ বৃক্ষরাজিকে অনেক সময় দূর হইতে গ্রামাঞ্চলের পাটক্ষেত বলিয়া ভ্রম হয়। কিন্তু জঙ্গলাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে সেখানে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ পরিলক্ষিত হয়। একদা পাঠাকাটা নদীর পূর্বতীরে এক নূতন চরে মধ্যবয়সী কয়েকশত কেওড়া গাছের এক ক্ষুদ্র জঙ্গল দেখিয়া চক্ষু জুড়াইয়া যায়। আমরা মোটর লঞ্চে প্রায় ৫০ জন দর্শক। কেহই বলিতে পারিল না কোন্‌টি বড় আর কোন্‌টি ছোট। সর্বত্র সবুজের রাজত্ব এবং একই দৃশ্য। বৃক্ষশাখা ও পত্রসমূহ অপরূপ সবুজ সাজে সজ্জিত; হেমন্তের মলয় হিল্লোলে মৃদুমন্দ দোল খাইতেছে। পার্শ্বে নারিকেল চারার ন্যায় অসংখ্য গোলগাছের শ্রেণী, অপরূপ বন্য শোভা ধারণ করিয়াছে। কেওড়া বৃক্ষের শ্রেণীগুলি যেন নববধূর ন্যায় ঘোমটা বিজড়িত বেশে, কেশ বিন্যাস করিয়া নদী মেখলা শ্যাম কুঞ্জ কাননে অসাধারণ সৌন্দর্য-মণ্ডিত দৃশ্যের সৃষ্টি করিয়াছে। "ছায়া ঢাকা-মায়া মাখা" গ্রাম বাংলার অতুলনীয় সৌন্দর্যের চেয়ে এ দৃশ্য আরও মনোরম বলিয়া মনে হইল।

পাক-ভারত উপমহাদেশে সুন্দরবনের ন্যায় বৃহৎ অরণ্যসঙ্কুল জঙ্গল আর নাই। এইরূপ বৈচিত্রপূর্ণ জঙ্গল কোথাও দৃষ্ট হয় না। ইরানের শাহানশাহ

আবেদুররেজা শাহ্‌ পাহলভী ইং ১৯৫৭ সালে সুন্দরবন পরিভ্রমণ করেন। তিনি অরণ্যসঙ্কুল এই সুন্দরবনকে বিশ্বের সর্বাপেক্ষা মনোরম ও ভয়াবহ সমুদ্র উপকূল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, যেখানে নরখাদকেরা ইচ্ছামত স্বাধীনভাবে ঘুরিয়া বেড়ায়। যোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে ফেনসেকো ও এণ্ড্রু নামক দুইজন পুরোহিত বাকলা হইতে চণ্ডিকানের পথে সুন্দরবনের নদীনালা, বিটপী শ্রেণীর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়াছিলেন, সে কথা অন্যত্র বর্ণন করিয়াছি।

আমাদের সুন্দরবন বাস্তবিকই অতীব মনোরম। দুর্গম শ্বাপদসঙ্কুল এ জঙ্গল। মানুষের স্বপ্ন ও কল্পনা বিজড়িত আছে এই সুন্দরবন নামের সহিত। ব্যাঘ্রের ভীম গর্জন, হিংস্র সর্পের বিষাক্ত ফণা বিস্তার, কুম্ভীরের তীক্ষ্ণ দন্তের মুখব্যাদান, হরিণের আর্তনাদ, মানুষের আনন্দ ও অসহায়তা এবং নীরব নিথর সুন্দরবনের কথা মনে করিয়া কাহারও হৃদয় শিহরিয়া না উঠিয়া পারেনা। এই বনে ফলবান বৃক্ষ নাই বলিলেও চলে। পুষ্পোদ্যানও এখানে নাই। বৃক্ষগুলি বৎসরে সর্বসময়ে সবুজরূপ ধারণ করিয়া থাকে। কোন সময়ে ইহার রূপ পরিবর্তন হয়না। সুন্দরবনের বৃক্ষরাজি প্রায়ই সুদীর্ঘ এবং আকাশগামী। ইহার শাখা প্রশাখা অধিক নহে। পূর্ব পাকিস্তান নদীমাতৃক দেশ। কিন্তু সুন্দরবনের নদীনালার আধিক্য আরও বেশী। সুন্দরবনের প্রায় একপঞ্চমাংশ জলভাগ এবং এই জলস্থলই সুন্দরবনের প্রাণ। উহা যুগ যুগ ধরিয়া সুন্দরবনের সৌন্দর্য রক্ষার্থে স্বীয় কর্তব্য সাধন করিয়া যাইতেছে। সুন্দরবনের সমস্ত নদীই সাগরমুখী এবং নদী যতই দক্ষিণে গিয়াছে ততই প্রশস্ত হইতে প্রশস্ততর হইয়াছে। নদীর দুই কূল বহিয়া কত বৃক্ষের শাখা প্রশাখা বিস্তার করিতে করিতে ধাবিত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। জঙ্গলময় প্রদেশের নদীর বর্ণনা দিতে গিয়া প্রাচ্যের মহাকবি রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন :

নদী চলিছে ডাহিনে বামে
কভু কোথাও সে নাহি থামে।
হোথায় গহন গভীর বন
তীরে নাহি লোক নাহি জন।
শুধু কুমীর নদীর ধারে
সুখে রোদ পোহাইছে পাড়ে।



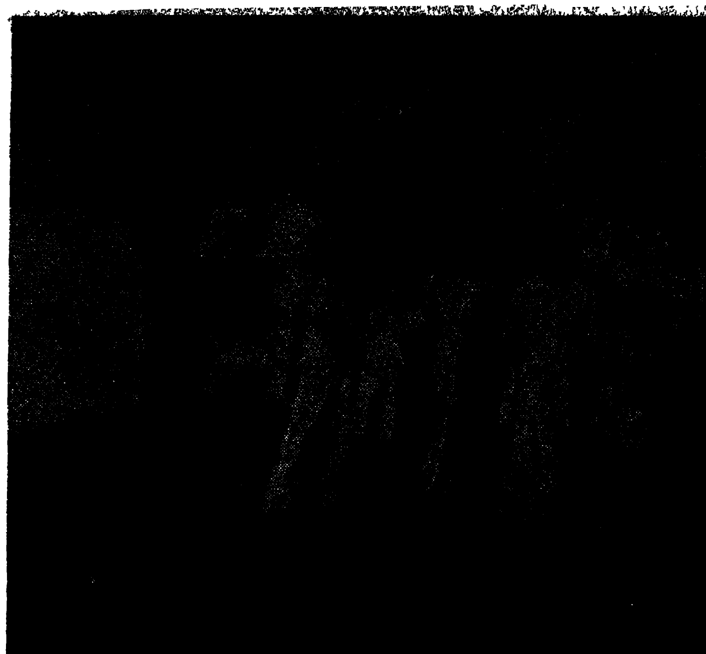
নদীবক্ষ হইতে বনানীর নয়নাভিরাম দৃশ্য।

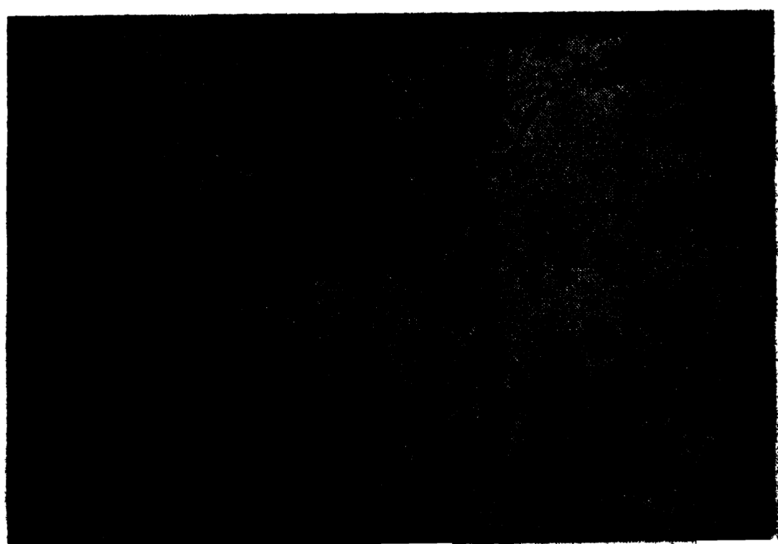
বাঘ ফিরিতেছে ঝোপে ঝাপে,
ঘাড়ে পড়ি আসে এক লাফে।
কোথাও দেখা যায় চিতাবাঘ
তাহার গায়ে চাকা চাকা দাগ,
রাতে চুপি চুপি আসে ঘাটে
জল চকোচকো করি চাটে।

নদী হইতে উভয় পার্শ্বস্থ সুন্দরবনের দৃশ্য একই রূপ। গাছগুলি যেন সর্বত্র সমানভাবে দণ্ডায়মান। "নদী সমূহের পার্শ্বে কোথাও বলার ঝোপ এবং বন্য সুন্দরী ও হেন্তাল প্রভৃতি ক্ষুদ্র গাছসমূহ স্রোতের উপর ঝুকিয়া পড়িয়া তীর-ভূমি অন্ধকার করিয়া রাখিয়াছে, কোথাও সুন্দরী, পশুর, গর্জন বা আমূড় প্রভৃতি বৃক্ষের শিকড়সমূহ বাহু বিস্তৃত হইয়া প্রবল প্রবাহ হইতে বৃক্ষাদি রক্ষা করিতে গিয়া ভগ্ন তীরের সহিত জড়াজড়ি করিতেছে। কোথাও বা নদী হইতে খাল উঠিয়া আঁকা বাঁকা ভাবে গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়া অন্য নদী বা খালের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। নদীনালা ও খালসমূহ যেন সুন্দরবনের সর্বত্র জাল বিস্তৃত করিয়া রহিয়াছে। নদী বা খালের উভয় তীরে গোলগাছের সারিগুলি প্রাচীরের ন্যায় দণ্ডায়মান থাকিয়া এক অতি অদ্ভুত অথচ মনোরম বন্য শোভা বিস্তার করিয়াছে।" যে কোন নদীর শেষ প্রান্ত বা ত্রিমোহনায় পৌছিলে বন-স্থলীর অপূর্ব শোভা উপভোগ করা যায়। মাঝে মাঝে চর ও নদীর মধ্যবর্তী বা পার্শ্বে দ্বীপ পরিলক্ষিত হয়। কোথাও দেখা যায় বানরেরা দলবদ্ধ হইয়া ক্রীড়া ও কৌতুক করিতেছে। ক্রীড়ারত সুন্দরবনের এই সমস্ত সুচতুর জন্তুর অঙ্গ-ভঙ্গীর দিকে মানুষের মন আকৃষ্ট হয়। বানরেরা কোথাও ডালে ডালে নাচিয়া বেড়ায় এবং বৃক্ষের শাখা, ফল ও পাতা ভাঙ্গিয়া হরিণের দল ডাকিয়া আনে এবং উহাদিগকে তাহা খাইতে দেয়। হরিণের সঙ্গে বানরের সখ্যতা অত্যধিক। শিকারী বা ব্যাঘ্রের আগমনে বানরেরা হরিণদের সরিয়া যাইবার জন্য সংকেত-সূচক ধ্বনি করে। আবার বানরেরা হরিণের পিঠে চড়িয়া আনন্দ করিয়া থাকে। সুন্দরবনে চলিতে চলিতে প্রায় সর্বপ্রকার জীবজন্তুর সহিত সাক্ষাৎ হয়, কিন্তু ব্যাঘ্রের সাক্ষাৎ পাওয়া দুষ্কর।

সুন্দরবনের সুন্দর হরিণ এক অমূল্য সম্পদ। হরিণেরা দলে দলে বনানীর পার্শ্বস্থ উন্মুক্ত ময়দানে চরিয়া বেড়ায়। দূর হইতে ডাক দিলে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়ায় এবং শিকারী দেখিলে সভয়ে প্রস্থান করে। হরিণের চক্ষু প্রখর এবং গতি ক্ষিপ্র। অনেক সময় অসংখ্য হরিণ ঝাকে ঝাকে বিচরণ করিয়া আহার সংগ্রহ করে। জঙ্গলের মধ্যে এই ধরণের অপূর্ব শোভা দর্শনে ভ্রমণকারীর হৃদয় পুলকিত হয়। মানুষ নিকটবর্তী হইলে হরিণ দৌড়াইয়া বনস্থলীর মধ্যে অদৃশ্য হইয়া যায়। সুন্দরবনে অসংখ্য ছোট ছোট দ্বীপ আছে। এই সমস্ত দ্বীপের জঙ্গল গভীর এবং এখানে প্রচুর পরিমাণে হরিণ থাকে। তাড়া পাইলে দলে দলে হরিণ নদীতে ঝাপাইয়া পড়ে এবং ক্ষিপ্রগতিতে অন্য তীর বা দ্বীপে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে।

সুন্দরবনের অন্যতম বৃহৎ নদী শিবসা। গড়ইখালী বাজার হইতে সুন্দরবনের দৃশ্য দূর হইতে উপভোগ করিতে করিতে কোন এক শরৎকালে শিবসা নদী হইয়া সুন্দরবনে প্রবেশ করি। এই ভ্রমনে আমরা ১২ জন যাত্রী। নলিয়ান অফিস হইতে ছাড়পত্র লইয়া নৌকা দুইখানি দক্ষিণ দিকে যাত্রা করিল। মাঝিরা মাঝে মাঝে গান ও গল্প করিয়া আপন মনে নৌকা চালাইতে লাগিল। নদীর উভয় পার্শ্বস্থ খালের নাম নোট করিতে লাগিলাম। সুদূর দক্ষিণে ত্রিকোণ দ্বীপ পর্যন্ত যে সমস্ত খাল ও নদী শিবসায় পড়িয়াছে বা শিবসা হইতে উঠিয়া পশ্চিমমুখী হইয়াছে, উহার নাম যথাক্রমে খোষখালি, গাংরখি, হড্ডা, আগার দোয়ানে, বোতলখালি, মুচির দোয়ানে. লক্ষীপ্রসাদ, কাটরার খাল, ছাচনাংলা, ভাই জোড়া, মার্গির খাল, মার্গির চরের খাল, বড়বুজবুনিয়া, ছোটবুজবুনিয়া, ছোট কালীর খাল, আড়ো শিবসা নদী, চেতলার চরের খাল, ছোট দুধমুখী, বড়দুধমুখী, মান্দার বাড়ীর ভারানী, মান্দার বাড়ীর খাল, আলকীর ভারানী এবং আরও কয়েকটি খালের পর মর্জাত নদী। পূর্ব পারের খালগুলির নাম যথাক্রমে সুতার খালী, চরের খাল, আড় বাউনে, বড় কুকরোকাটী, ছোট কুকরোকাটী, মজোখালী, কোড়াকাটা, কুমোরের চরের খাল, পাখী উড়োর খাল, হাটডোরা, হাট ডোরার চরের খাল, আদাচাকি, বেদের খাল, শেখের খাল, কালীর খাল, মোচড়া শিঙে, নিশান খালি। নীল কমল পর্যন্ত আরও কয়েকটি খাল আছে। হংসরাজ, শিবসা, পশর, অগ্নিজাল প্রভৃতি সাতটি নদীর





উপরে : সুন্দরবনের শূলোর মধ্যে দাঁড়াইয়া—লেখক ও তাঁর সঙ্গীরা

নীচে : সুন্দরবনের প্রান্তসীমা গাবুরা হইতে নৌকাযোগে জলযাত্রী —লেখক ও তাঁর সঙ্গীরা

মোহনা সেখানে একত্রিত হইয়াছে, উহাকে লোকে "সাত মুখ আগুন জ্বাল" বলিয়া থাকে। এই স্থানে নদীর প্রস্থ প্রায় ৫মাইল। সে দৃশ্য যেমন অভিনব ও ভয়াবহ তেমনই অতীব সুন্দর। নীলকমল খালের পার্শ্বে এক স্থানে জঙ্গলের মধ্যে একটি সুন্দর ময়দান দৃষ্ট হয়। এই ধরনের সৌন্দর্যশালী মাঠ জঙ্গলে বিরল। খালের নামগুলি সাধারণতঃ আমাদের দেশের গ্রামের নামের ন্যায় মনে হয়। নামগুলির কোন কোনটির কারণও জানা গেল। নলিয়ান গ্রামের মজিদ ওরফে ম'জোকে বাঘে খাইয়াছিল বলিয়া উহার নাম হইয়াছে মজোখালীর খাল। কামারখোলা গ্রামের কাদেরকে একটি চরে বাঘে ধরিয়া লইয়া যায়। তদবধি ঐ চরের নাম হইয়াছে কেদোখালীর চর। সুন্দরবনের প্রত্যেকটি জঙ্গল, নদীর তীর ও খাল ইত্যাদির নাম নির্ধারিত আছে। এই বর্ণনা হইতে সুন্দরবন ও উহার অভিনব সৌন্দর্য সম্পর্কে পাঠকগণ উহার অবয়ব ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার একটা ধারণা করিতে পারিবেন। যুগ যুগ ধরিয়া সরকার, জনসাধারণ, বাওয়ালী ও ভ্রমণকারীদের দ্বারা সুন্দরবনের সর্বত্র বিভিন্ন প্রকার নামের সৃষ্টি হইয়াছে। এই জন্য সুন্দরবনের প্রতিটি স্থানের সঠিক পরিচয় পাওয়া যায়। স্থানের নাম ও অবস্থান জানা থাকিলে সহজেই গন্তব্যস্থলে পৌঁছা যায়।

খালের পার্শ্বস্থিত বনবাজির দৃশ্য আরও সুন্দর। উহার পার্শ্ব দিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া শিকারীরা ব্যাঘ্র ও হরিণ শিকার করিয়া কতই না আনন্দ উপভোগ করে। নদীর পার্শ্ববর্তী চর বা দ্বীপের উপর জল তেমন স্রোতস্বিনী নহে। এবম্প্রকার স্থানে অসংখ্য পক্ষী ঝাকে ঝাকে আশ্রয় লয় এবং আহার সংগ্রহ করে। নানা বর্ণের পক্ষীর দৃশ্য সত্যই আনন্দদায়ক। ভীমরাজ, টিয়ে. মানিকজোড় গগনভীর. মাছরাঙ্গা. গয়াল, শামখোল, বাটাও, করমকুলী, প্রভৃতি পক্ষী সুন্দরবনে বহুল পরিমাণে দেখা যায়। এই সমস্ত পক্ষীকুল জঙ্গলের শোভা বৃদ্ধি করিয়াছে। খলসীর চর, মালঞ্চ, দুবলা দ্বীপ, কটকা, আলকী ও অন্যান্য সমস্ত স্থানে পক্ষীরা নির্ভয়ে বিচরণ করিয়া বেড়ায়। আমরা চলিতে চলিতে বনের সুন্দর দৃশ্য অবলোকন করিতে থাকি এমন সময় দূর হইতে শেখের ট্যাক দেখা গেল। সুউচ্চ বৃক্ষলতা-বেষ্টিত নদীতীরে মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে সর্বজন পরিচিত বিখ্যাত শেখের ট্যাক। এই ঐতিহাসিক স্থান দর্শনের আগ্রহ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে

লাগিল। অবশেষে শেখের ট্যাকের নয়নাভিরাম দৃশ্য দেখিতে দেখিতে তথায় সূর্যাস্তের পূর্বে অবতরণ করিলাম। সবুজ বৃক্ষরাজির উপর সূর্যের কিরণ পড়ায় উহার শোভা আরও বর্দ্ধিত হইয়াছিল। শিবসা তীরে প্রাচীন অট্টালিকাসমূহের ভগ্নাবশেষ ও শেখেদের বাড়ী দেখিয়া শেখের খালের মধ্য দিয়া চলিলাম। খালের উত্তর তীরে ঘন গোলগাছ, হেন্তাল ও অন্যান্য বন্য বৃক্ষ শোভা পাইতেছে। অতঃপর কালীবাড়ীও দুর্গের ভগ্নাবশেষ পরিদর্শন করিয়া শেখের ট্যাকেই রাত্রিযাপন করিলাম। রাত্রিতে গ্রামাঞ্চলের ন্যায় পাখীর কলরব শ্রুত হইলনা। ভোরবেলা শেখের ট্যাকের দক্ষিণে আলকীর নিকট কয়েকটি ক্ষুদ্র দ্বীপ দৃষ্ট হইল। দ্বীপগুলির নাম যথাক্রমে আলকীরমাদে, ফুলমাদে, টিবলেরমাদে, বাহিরমাদে, বড়মাদে, ছোটমাদে। সুন্দরবনের মধ্যে নদীবেষ্টিত এই দ্বীপগুলির অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ভুলিবার নহে। এই সমস্ত দ্বীপে প্রচুর হরিণ বাস করে। আমরা এখানে একদিন অবস্থান করিলাম। খলসীর চরে গিয়া আর একদিন তথায় অবস্থান করিলাম। এই চরে বহু নূতন বৃক্ষ গজাইয়া উঠিতেছে। এক স্থানে একটি ফুটবল খেলিবার মাঠের ন্যায় বিস্তৃত ময়দান। দুই দিকে গোল পোষ্ট দিয়া এখানে রীতিমত ফুটবল খেলা যায়। এখানে কেওড়া গাছের আধিক্য এবং নদী তীরে হরিণ দলবদ্ধ হইয়া কেওড়া ফল ভক্ষণ করে। খলসীর চরে এক প্রকার ধানের গাছ দেখিলাম। উহাকে সুন্দরবনের লোকেরা ধানী বলে। খরচে পোষায় না বলিয়া উহা কেহ কাটিয়া লয় না। ধানী গাছের মধ্যে নানা বর্ণের পক্ষী আপন মনে আহার সংগ্রহ করে। এই চরে প্রচুর গোলগাছ আছে। বন্য মোরগ-মুরগীও এখানে দৃষ্ট হইল। এই চরের সৌন্দর্য বর্দ্ধিত হইয়াছে উহার সুউচ্চ ভূমির জন্য। কর্দমাক্ত স্থান এই চরে নাই। সুন্দরবনের বিরক্তিকর শুলো ও হ'দোবন খুবই কম। জুতা পরিধান করিয়া শীত-গ্রীষ্ম কালে এখানে চলাফেরা করা যায়। বৃক্ষের নীচের পথগুলি খুবই পরিষ্কার। এখানে আমুড় বৃক্ষ অত্যধিক। বহু চারাগাছ হরিণে শিং দ্বারা নষ্ট করিয়াছে। তবুও অন্যান্য স্থান অপেক্ষা এই চরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বিশেষ ভাবে উপভোগ করিয়াছি। এখান হইতে পাঠাকাটা এবং তথা হইতে ত্রিকোণ দ্বীপ ও নীলকমল প্রভৃতি স্থান দর্শন করিতে করিতে কতই না আনন্দ উপভোগ করিলাম। মনে হইয়াছিল কি অপূর্ব এই দেশ! আর সৃষ্টিকর্তা কিরূপ নিপুণ তুলিকায় শ্রেণীবদ্ধ জঙ্গল সৃষ্টি করিয়া তাঁহারই কারুকার্যের মহিমা ঘোষণা

করিতেছেন। ইরাণের মহাকবি শেখ সা'দীর একটি আধ্যাত্মিক কবিতা মনে পড়িয়া গেল। কবিতাটি এখানে উদ্ধৃত করিতেছি।

"বর্গে দরখ্‌তানে সব্‌য্‌'দব্‌ নয্‌রে হুশিয়ার্‌
হর্‌ ওর্‌ফে দফ্‌তবেস্ত মা'রেফাতে কির্‌দিগার"।

—হে প্রভু! তোমার মাহাত্ম্য বুঝিবার জন্য সহস্র খণ্ড হাদীস ও দর্শনের প্রয়োজন হয়না। ঐ যে শ্যামল তরুশিবে সুচিত্রিত পল্লবরাজি, তত্বজ্ঞানীর নয়নে উহার প্রত্যেকটি পত্র তোমাব মহিমা সম্পর্কে এক একটি মহাগ্রন্থ সরূপ।

সুন্দরবনের আবম্ভ হইতে বঙ্গোপসাগরের তীব পর্যন্ত সর্বত্র মনোরম দৃশ্য। সে দৃশ্যের ব্যাপক বর্ণনা দেওয়া এখানে সম্ভবপব নহে। পাঠাকাটার জঙ্গলে বাঘের আড্ডা খুব বেশী। স্থানীয় লোকেবা এই স্থানকে সেই জন্য দ্বিতীয় টাইগার পয়েণ্ট বলিয়া থাকে। এ জঙ্গল অত্যন্ত গভীর এবং সুন্দব।

সাতক্ষীবা বেঞ্জের জঙ্গলের মধ্যে সুব্‌দী নামক স্থানে পাখীদেব একটি বিবাট আড্ডা। হাজার হাজাব নয়, লক্ষ লক্ষ পাখী এখানে আশ্রয় গ্রহণ করে। বৃক্ষের উপর অসংখ্য বাসা বাঁধিয়া পাখীবা বসবাস করে। এত বিপুল সংখ্যক পাখী মানস সরোবর ভিন্ন পৃথিবীব কোথাও একত্রে বাস করে কিনা জানা যায় নাই। বড় বড় ষ্টেডিয়ামে খেলা শেষ হইবার পর যেরূপ মানুষের মস্তকে মাঠ ভরিয়া যায় উহাব চেয়েও অধিক সংখ্যক পাখী এখানে একত্রে চলাফেবা করে। এই জন্য এই স্থানকে সাধারণে "পাখীর আলয়" বলিয়া থাকে। জুলাই মাসের দিকে পাখীর আড্ডা আরও অধিক ভাবে জমিয়া থাকে। বৎসরের এই সময় লক্ষ লক্ষ পাখীব অবস্থান এক অভাবনীয় ও অত্যাশ্চর্য ব্যাপার। এ দৃশ্য না দেখিলে এরূপ বর্ণনা বিশ্বাস করা সুকঠিন হইয়া পড়ে। এখানকার পাখীর মধ্যে শাম্‌খোল, বক, বিলবাচুচ এবং বাঁশীচোরা পাখীর সংখ্যাই অধিক। ভীমরাজ, কাক, পানকৌড়ি ও অসংখ্য দৃষ্ট হয়। অকস্মাৎ সম্প্রতিকালে এখানে পাখীর বসবাস হ্রাস পাইয়াছে।

শরণখোলার মধ্যে খড়মা নদীর পার্শ্বে সোনামুখী বাওড়ে অসংখ্য পক্ষী দৃষ্ট হয়। পক্ষীর অভিনব ভীড় দেখিলে আশ্চর্যন্বিত হইতে হয়। বৃক্ষের ডালে ডালে অসংখ্য পাখী বাসা বাঁধিয়া থাকে। বৈশাখ হইতে কার্তিক মাস পর্যন্ত

পক্ষীকুল এখানে থাকে। শীত সমাগমে উহারা অন্যত্র চলিয়া যায়। এখানে পাখীরা ডিম পাড়ে এবং অসংখ্য বাচ্চা ফুটাইয়া থাকে। ইহাই সুন্দরবনের দ্বিতীয় পাখীর আড্ডা। এ দৃশ্য যেমন অত্যাশ্চার্য তেমনই নয়নাভিরাম। চাঁদপাই রেঞ্জের জিউধারা অফিসের সন্নিকটে ঐরূপ পাখীর আর একটি আড্ডা আছে। শরণখোলা রেঞ্জের অধীন সুপতি ফরেষ্ট অফিসের দক্ষিণে চান্দেশ্বর নামক স্থানে ও একটি পাখীর আলয় আছে। এই সমস্ত স্থানে সাধারণতঃ শিকারীরা পক্ষী শিকার করেনা।

সুন্দরবনের দক্ষিণ সীমান্তে অনন্ত সাগর, সর্বত্র জলে জলময়। সাগর তীরে দুবলার চরের পূর্ব ও পশ্চিম দিকে একটি সুন্দর প্রাকৃতিক বাঁধ সাগরের ঢেউ হইতে সুন্দরবনকে রক্ষা করে। বাঁধটি দর্শনে মনে হয়, ইহা মানুষের তৈয়ারী কিন্তু আসলে উহা আপনা-আপনি গঠিত হইয়াছে। এই বাঁধের উপর হরিণ দলে দলে চরিয়া বেড়ায়; ব্যাঘ্ররাজ সুযোগ পাইলে খপ্ করিয়া হরিণ শিকার করিয়া থাকে। দুবলার চরে এক সময় একই সঙ্গে অনুমান এক সহস্র হরিণ দলবদ্ধভাবে বিচরণ করিতে দেখা গিয়াছে। দুবলার চর, টাইগার পয়েণ্ট এবং "ফিসার ম্যানস দ্বীপ" হইতে সাগরের দৃশ্য অবলোকন করিতে বড়ই মধুর লাগে। সমুদ্র তরঙ্গ কোথাও তীরের মৃত্তিকা ধুইয়া লইয়া যাইতেছে। আবার কোথাও সমুদ্রের মধ্যে চর পড়িতেছে। শীতকালে যখন সমুদ্রের ঢেউ শান্তভাব ধারণ করে, তখন অসংখ্য নৌকা বাদাম তুলিয়া সমুদ্রের মধ্যে মৎস্য ধরিবার জন্য যাতায়াত করে। এ দৃশ্য অতীব আনন্দদায়ক। সমুদ্র হইতে জঙ্গলের দৃশ্যও খুব সুন্দর দেখায়।

জনমানবশূন্য নির্জন স্থানে বিশাল সমুদ্রের জলরাশি ও তরঙ্গমালা এবং পার্শ্বেই গভীর এবং সুদৃশ্য অরণ্যানীর মধ্যে জালিয়াদের বসবাস ও চলাফেরা দেখিলে অন্তর পুলকিত হয়। এ দৃশ্য যাঁহারা সচক্ষে দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা উহার সৌন্দর্য উপভোগ করিয়াছেন।

গহীণ বনানীর পার্শ্বে সাগরের মধ্য হইতে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের দৃশ্য অতীব মনোমুগ্ধকর। আমরা একদা মোটরলঞ্চে বসিয়া সমুদ্র গর্ভ হইতে সূর্যাস্তের ছবি দর্শন করিতে থাকি। লোকালয় হইতে সূর্যাস্ত-যত তাড়াতাড়ি বোঝা যায়, এখানে ঠিক তাহার বিপরীত। অনেকক্ষণ সূর্য রক্তিমবরণ ধারণ করিয়া থাকে।

বেশ কিছু সময় অতিক্রান্ত হইলে সূর্য ক্ষুদ্রাকারে পরিবর্তিত হইতে থাকে। ডুবলা দ্বীপের দক্ষিণে সমুদ্রের মধ্য হইতে এই সূর্যোদয় অবলোকন করিতে ছিলাম। সেই স্থান হইতে পশ্চিমে আকাশ একেবারে পরিষ্কার—অনন্ত সাগর, শুধু জল আর জল। সেই জন্য সূর্যাস্ত দর্শনে আমাদের আদৌ বিঘ্ন হইল না। সূর্য যে স্থানে অদৃশ্য হইতেছে মনে হইল দূর দূরান্তের অসীম নীলাকাশের সব কিছুই নয়ন গোচর হইতেছে। চন্দ্র গ্রহণের ন্যায় সূর্য যেন ক্রমাগত ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর এবং ধীরে ধীরে আপন মনে অদৃশ্য হইতে লাগিল। আমাদের সম্মুখে ও পিছনে অনন্ত সাগর, উত্তর দিকে বিশাল সুন্দরবন, আকাশের সুদূর পশ্চিম সীমায় সূর্যলোকের এই খেলা সমুদ্র হইতে যেরূপ অবলোকন করা যায় এইরূপ আর কোথাও সম্ভব নহে। উন্মুক্ত সমুদ্রের মধ্যে এহেন দৃশ্য বাস্তবিকই মনোমুগ্ধকর।

সুন্দরবন যেমন অভিনব উহার পার্শ্ববর্তী অধিবাসীরা তেমনই বিশিষ্ট ধরণের। চির সবুজের মেলা এই সুন্দরবন এবং তৎপার্শ্ববর্তী বাকেরগঞ্জ জিলার দক্ষিণাঞ্চল। এসম্পর্কে জনৈক নবীন কবি বলিয়াছেন।

"ছায়া ঢাকা পাখী ডাকা" প্রকৃতির অভিনব খেলা
সীমাহীন নদ নদী, আ-দিগন্ত সবুজের মেলা।
... ...
আশ্চর্য মানুষ সব; অত্যাশ্চার্য জীবনের ধারা।
বৈদেশিক জলদস্যু পর্তুগীজ-মগ-ফিরিঙ্গিরা
পারেনি ছিনিয়ে নিতে অতীতের বিপুল সম্পদ,
সমুদ্রের বালুচরে গড়ে উঠা এই জনপদ"

পূর্বেই বলিয়াছি সুন্দরবনের নদী নালা স্থানীয় ভ্রমণকারীদের নখাগ্রে। সুন্দরবন সম্পর্কে তাহারা গল্প রচনা করে। ভৌতিক, অধিভৌতিক, কাল্পনিক গল্পের আসর জমাইয়া সুন্দরবনের লোকেরা চিত্ত বিনোদন করে। নৌকা চালাইবার সময় এবং বিশেষ করিয়া নৌকা ছাড়িবার সময় মাঝিরা গাজী গাজী ও বদর বদর বলিয়া পীরবদর ও গাজীকে স্মরণ করিয়া থাকে। বিচিত্র এ জঙ্গল এবং উহার সব কিছুই বৈচিত্রময় পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছে। বিশ্বের কোথাও এহেন বৈচিত্রময় গহীণ অরণ্য নাই। প্রকৃতির এ এক অভিনব অবদান।

সুন্দরবনের জঙ্গলী ভাষার মাধ্যমে স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে সমস্ত আলাপ আলোচনা চলে। নিম্নে কয়েকটি জংলী ভাষা ও উহার অর্থ দেওয়া হইল। এই ভাষারও একটী বৈশিষ্ট ও সৌন্দর্য আছে:— বাদা = সুন্দরবন, নেমক খালাড়ী = লবনের কারখানা, আফালী = মৎস্যের লম্ফ প্রদান, কাগজী = যাহারা পূর্বে কাগজ তৈয়ার করিত, নাও বা লাও = নৌকা, বনবিবি = বনের কাল্পনিক দেবতা, কড় = মনুষ্য পায়ের দাগ, ঢোড় = বৃক্ষের ফাঁপা স্থান, ভাত সরাও = ভাত খাও, দোয়ানে = খাল, ভেড়ী = উচ্চ বাঁধ, মাদিয়া = দ্বীপ, বা'য়ে = বাহিয়া, বাঁক = নদীর মধ্যবর্তী একটানা সোজা স্থানকে বাঁক বলে। এইরূপ কয়েকখানি বাঁক অতিক্রম করিলে গন্তব্য স্থানে পৌঁছা যায়, নদীপথে মাঝিরা তাহা ঠিক করিয়া লয়। গাঙ্গ = নদী, টান = স্রোত, সায় সায় = সোজাসুজি, ঝরা = ঝরণা, শীষে = ক্ষুদ্রখাল, ভারাণী = বড় খাল, ধুমাকল = ষ্টিমার, আড় পাউড়ী = সোজাসুজি নদী পাড়ি দেওয়া ইত্যাদি। স্থানীয় ভাষা সুন্দরবনের সর্বত্র ব্যবহৃত হয়। সুন্দর-বনের একাংশের গ্রাম ও নদীনালার নাম স্মরণ রাখার জন্য গড়ইখালি অঞ্চলে নিম্নোক্ত কবিতাটি এখনও গীত হয়। ছেলে মেয়ে আবালবৃদ্ধ বনিতার নিকট কবিতাটি সুপরিচিত। সকলেই যেন ইহা কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিয়াছে। গ্রাম্য ছেলে মেয়েরা ইহা সানন্দে গান করিয়া বেড়ায়। নৌকাপথে সুন্দরবনের পথ নির্দেশের জন্য বহুদিন পূর্বে স্থানীয় জনৈক ব্যক্তি উহা রচনা করিয়াছিলেন:

টেঁচোর গ্রামে বাস করি খাস নবীশের মাটি
পূর্ব অংশে তু'লে দিলাম নিমাইখালীর ভাটী।
হা'ড়ে বা'সে ছোট নদী ত্রিমোহনা ভারী
সেখানেতে বা'য়ে দিলাম মনোসুখের তরী।
বাঁকের মাথায় কেদোর গাঙ্গ জানে সর্বজনা
বায় থাকিল দেলুটীর গাঙ্গ ডানি সোলাদানা।
মাহুর পাল্টা, হাড়র গাঙ্গ তাতে বড় টান
পূবের দিকে চেয়ে দেখি তিল ডাঙ্গার গাঙ্গ।
তিল ডাঙ্গার পশ্চিমে ভাই আছে গড়খালি
সেইখানেতে চেয়ে দেখি কুচিয়া আর চাঁদখালি।

কুচিয়া আর চাঁদখালি গিয়া মনে হ'ল আশা
দক্ষিণ পারে চেয়ে দেখি আলমচাঁদের বাসা।
ঘোষখালি আর ঢাকির মুখ আছরে সায় সায়
সাতুল্যার তুফান দেখে পরাণ কেঁপে যায়।
গাঙ্গরখি, বুড় হড্ডা, নলেন রইল বায়
সুতারখালির মুখে কত লাও মারা যায়,
আড়বাউনে, লক্ষীপ্রসাদ, ছাচ-নাংলার মুখে
কত না'যে চাপান থাকে অতি পরম সুখে
আড়ো শিবসা মুখে টান ক'রেরে কল্ কল্
পূবের পারে চেয়ে দেখ, কুকড়াকাটির খাল।
মার্গির চর, বুজবুনে নজরেতে দেখি
নোঙ্গর ক'রলাম গিয়ারে ভাই হাত ধাবড়ার মুখী।
কেউ বলে মরা ভদ্র কেউ বলে হাত ধাবড়া
রূপসার তুফান দেখেরে ভাই কাঁপে পিঠের চামড়া।
আদাচাকি দিয়া কত ধূমাকল যায়,
আড়পাউড়ী দিয়া তারা আড়ো শিবসায় ধায়।
সেই যে কল মহাবল বুঝে কার সাধ্যি
ডা'ন হাতে তু'লে দিলাম চা'লো বগীর মধ্যি
বা'য় থাকলো টগিবগি দক্ষিণ মুখো হ'লাম
তিন বাঁক বা'য়ে গিয়ে নলবুনের খাল পালাম
বনেতে মা বনবিবি করেছে কি খেলা
(দেখলে) রোগশোক দূরে যায় আর সংসারের জ্বালা।
বনের মধ্যে বনবিবির কতইরে ভাই খেলা
দুই পার দিয়ে চেয়ে দেখি শুধু গোলের মেলা।
মা যদি করেন দয়া তবেত আর আসিব
চা'লোবগীর কয়খান বাঁক সেইবার গ'ণে যাব।"

লোকালয় হইতে সুন্দরবনের মধ্যবর্তী স্থান পর্যন্ত শিবসা ধরিয়া যাইতে গ্রাম্য কবি যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহাতে এদেশের চলতি ভাষার সুন্দর রূপ

বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। কবিতায় আলম চাঁদের কথা আছে। ইনি গড়ইখালীতে বসবাস করিতেন। ইহার প্রকৃত নাম আলম শাহ্ ফকির। এদেশে তাঁহার অনেক ভক্ত ছিল। এখন সে বাড়ী নদী গর্ভে বিলীন হইয়াছে। কবিতার মিল করিতে গিয়া কুচে আর চাঁদখালীকে একই স্থানে দেখান হইয়াছে। কুচিয়া গড়ইখালীর উত্তরপার যে স্থানে পূর্বে জমিদারের দোতলা কাছারী ঘর ছিল। চাঁদখালী এখান থেকে প্রায় ১০ মাইল পশ্চিম দিকে অবস্থিত। রূপসা, খুলনা শহরের নিকটবর্তী রূপসা নদী নহে। সুন্দরবনের মধ্যে রূপসা নামক স্থানে শিবসা নদীর তুফান খুব বেশী বলিয়া উহার ভয়াবহতার কথা বলা হইয়াছে।

সুন্দরবনের পার্শ্ববর্তী জমিতে প্রচুর ধান্য ফসল ফলে। এখানকার জমি উর্বর এবং বাঁধ বা ভেড়ী থাকিলে প্রচুর ধান্য উৎপন্ন হয়। লবনাক্ত ও সুমিষ্ট জলের সংমিশ্রনে ধান্য সর্বাপেক্ষা উত্তম হয়। এমন একটি মনোরম স্থানের শরৎকালীন ধান্যের আবাদ দর্শনে ডি, এল, রায় তাহার বিখ্যাত কবিতা "আমার জন্মভূমি" রচনা করিয়াছিলেন। খুলনা শহরের পূর্বে রূপসা নদীর তীরে একটি বহু পুরাতন অচেনা বৃক্ষ আছে। সেই জন্য লোকে উহাকে অচিন বৃক্ষ বলিয়া থাকে। এই বৃক্ষ তলে বসিয়া কবিতাটি রচিত হয়। ডি, এল, রায় তখন খুলনার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। কবিতাটির কয়েক লাইন এখানে উদ্ধৃত করা গেল:

"ধনধান্যে পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা
তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা,
ও সে, স্বপ্ন দিয়ে তৈরী সে দেশ, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা
... ...
পুষ্পে পুষ্পে ভরা শাখী, কুঞ্জে কুঞ্জে গাহে পাখী।
গুঞ্জরিয়া আসে অলি পুঞ্জে পুঞ্জে ধেয়ে —
তারা ফুলের উপর ঘুমিয়ে পড়ে ফুলের মধু খেয়ে,
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাক তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি।"

বঙ্গসাহিত্যে এই কবিতাটির স্থান অতি উচ্চে। "সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা" বাংলা দেশের সমস্ত অংশই পূর্ব পাকিস্তানভুক্ত হইয়াছে। এমন

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত দেশ আর কোথাও নাই। সুন্দরবনের অবস্থিতি এই সৌন্দর্যকে আরও মনোরম রূপদান করিয়াছে।

খ্যাতনামা সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও এক সময় খুলনার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তখন তিনি সুন্দরবন ভ্রমণ করিতেন। সুন্দরবনের পারিপার্শ্বিক অবস্থা দর্শনে তিনি সাহিত্যিক অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন। সুন্দরবনের গম্ভীর নাদিনী বারিধি তীরে বসিয়া তিনি উপন্যাস রচনার বিষয় চিন্তা করিতেন। গভীর জঙ্গলের প্রচ্ছদ পট সম্মুখে রাখিয়া তাঁহার বিখ্যাত উপন্যাস 'কপাল কুণ্ডলা' গ্রন্থের পটভূমি রচিত হইয়াছিল। পুস্তকের প্রথম অংশের রোমাঞ্চকর কাহিনী সুন্দরবন হইতে গৃহীত হইয়াছিল। গল্পের নায়ক নবকুমার সঙ্গীদের জন্য জ্বালানী কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতে জঙ্গলে প্রবেশ করিয়া নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নৌকায় ফিরিয়া আসে নাই। ইতিমধ্যে নৌকার অন্যান্য আরোহীরা বহুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া নবকুমারের সন্ধান না পাইয়া লোকালয়ে ফিরিয়া আসে। একদিকে ভীষণ জোয়ারের টান অন্যদিকে নবকুমারকে ব্যাঘ্রে ভক্ষণ করিয়াছে, নিশ্চিত বুঝিতে পারিয়া সহযাত্রীরা তাহার আশা ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হয়। নবকুমারের কাপালিকের নিকট আশ্রয় গ্রহণ, মন্দিরের পুরোহিত উক্ত কাপালিকের নরবলির কাহিনী এবং সুন্দরী কপালকুণ্ডলার সাহায্যে লোকালয়ে প্রত্যাগমন প্রভৃতি ঘটনাবলী আমাদের আলোচ্য সুন্দরবন হইতে সংগৃহীত বলিয়া মনে হয়।

এখনও নবকুমারের ন্যায় কত নিরীহ ব্যক্তি জঙ্গলে হারাইয়া যায় বা প্রাণ ত্যাগ করে তাহার ইয়ত্তা নাই। কবি ও সাহিত্যিকদের ভূরি ভূরি উপকরণ এই সুন্দরবনের সর্বত্র বিদ্যমান; কয়জন উহার খোঁজ রাখে? সুন্দরবন শুধু প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর এক মনোরম গহীন অরণ্যসঙ্কুল স্থান নহে; উহা রহস্যময়ী ও অভিনব এক দেশ।

বনজ সম্পদ ও উহার আর্থিক গুরুত্ব

॥ আট ॥

আমরা সুন্দরবনের বৃক্ষলতা বা বনজ সম্পদ সম্পর্কে অন্যত্র আলোকপাত করিয়াছি। হিমালয়ের পলিমাটি ও সাগরের লবনাক্ত জল মিশ্রিত হইয়া এখানকার বৃক্ষসমূহ জন্মলাভ করে এবং দিনে দিনে বর্ধিত হয়। প্রত্যেক গাছের ফল আছে এবং উহার বীজ হইতেই গাছ জন্মিয়া থাকে। সুন্দরবন নিবিড় জঙ্গলাকীর্ণ। এই নিবিড় জঙ্গলে অসংখ্য জীবজন্তু বাস করে। বৃক্ষলতা ও জঙ্গল না থাকিলে জীবজন্তুর বাস করা আদৌ সম্ভব হইত না। ইহাই সুন্দরবনের বিশেষত্ব। সুন্দরবনের প্রায় সর্বত্র জোয়ারেব সময় জল উঠিয়া বৃক্ষের শিকড় আর্দ্র করিয়া দেয়। সেজন্য সুন্দরবন প্রায় সর্বত্রই সর্বসময়ে কর্দমাক্ত অবস্থায় থাকে। কর্দমাক্ত হইলেও বৃক্ষের নিম্নস্থান সমূহ পরিষ্কার থাকে এবং বৃক্ষপত্রও জমিয়া থাকেনা এবং কোথাও কোন দুর্গন্ধ নাই। বৃক্ষ-শিকড় হইতে শুলোর উৎপত্তি হয়। এই শুলো ২।১ হাত লম্বা হয়। এগুলি শক্ত এবং ইহার অত্যাচারে সুন্দরবনে চলাচল অতীব কঠিন। সুন্দরবনের কর্দমাক্ত স্থানে এবং লবনাক্ত জলে যে সমস্ত চারাগাছ বিপদ আপদ সহ্য করিতে পারে, কেবল সেইগুলিই টিকিয়া থাকে। প্রবল বাতাসের সহিত যুদ্ধ করিয়া বৃক্ষলতার টিকিয়া থাকিতে হয়। তীব্র স্রোত অনেক সময় নদী তীর ভাঙ্গিয়া দিলে বৃক্ষের গুঁড়ি বাহির হইয়া পড়ে। এক বৃক্ষের গুঁড়ি অন্য বৃক্ষের গুঁড়িকে জড়াইয়া ধরিয়া রাখে এবং সেইজন্য নদীস্রোত সহজে উহাকে ভূপাতিত করিতে পারে না। সুন্দরবনের মাটির নীচে শুধু শিকড়ের রাজত্ব। কোন কোন গাছের শিকড় আবার মাটির উপর হইতে দেখা যায়। সূর্যের কিরণ, মৃত্তিকার রস ও লবনাক্ত জলের পার্শ্বে এই সমস্ত বৃক্ষ দিনে দিনে বর্ধিত হয়। সুন্দরবনের সমস্ত বৃক্ষই সুউচ্চ হয়; আম বা গাব গাছের ন্যায় ঝাপটা হয় না। বৃক্ষগুলির গোড়ার দিকে কোন ডালপালা গজায় না। উপরে বর্ধিত হইয়া বৃক্ষসমূহের শাখা প্রশাখা বাহির হয়। বৃক্ষ লম্বা হওয়ার জন্য উহার উপকারিতা ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। সুন্দরী, পশুর প্রভৃতি বৃক্ষ অত্যধিক লম্বা হইয়া থাকে। প্রত্যেকটি বৃক্ষ সম্ভবতঃ সূর্যকিরণ পাইবার আশায় একে

অন্যের সহিত প্রতিযোগিতা করে। বৃক্ষ ঘন হয় এবং সেইজন্য উহার ডালপালাও অধিক হয় না। পৃথিবীর অন্য কোথাও সুন্দরবনের ন্যায় বৈচিত্রপূর্ণ বৃক্ষলতা নাই। এখানে এই অমূল্য সম্পদ জন্মিবার কোন কৃত্রিম উপায় বা খরচ নাই।

এখানে আমরা বনবিভাগের সংরক্ষিত বৃক্ষলতার একে একে পরিচয় দিব এবং জাতীয় জীবনে উহার আবশ্যকতা এবং আর্থিক গুরুত্বের বিষয়ও বর্ণনা করিব।

সুন্দরী

সুন্দরবনের শ্রেষ্ঠ বৃক্ষ সুন্দরী। সর্বত্র উহা প্রচুর পরিমাণে জন্মে। এই বৃক্ষ সাধারণতঃ লোকালয়ের বড় জামগাছের ন্যায় মোটা হয়, আম্র বা অশ্বত্থ বৃক্ষের ন্যায় তত বড় হয়না। ইহা খুব লম্বা হয় এবং উহার কাঠের রং লাল; তন্নিমিত্ত বৃক্ষের নাম সুন্দরী হওয়া স্বাভাবিক। সুন্দরীর চারা সোজা ও সরলভাবে মস্তক উন্নত করিয়া উঁচু হইতে থাকে। এই বৃক্ষের পত্রগুলি ক্ষুদ্র এবং খুব ছোট ছোট হলুদ বর্ণের ফুল হয়।

সুন্দরী বৃক্ষ পূর্ব পাকিস্তানের ঘরে ঘরে বিভিন্ন প্রকার কাযে ব্যবহৃত হয়। ইহার কাঠে মজবুত তক্তা হয় এবং তদ্বারা নৌকা এবং ঘরের জানালা দরজা প্রস্তুত হইয়া থাকে। সুন্দরী কাঠের নৌকা এদেশে প্রসিদ্ধ। এই কাঠ শক্ত ও দীর্ঘস্থায়ী এবং বহু প্রয়োজনীয় কার্যে ব্যবহৃত হয়। দৈনন্দিন কাজের জন্য শহর অঞ্চলে এমন কি অধুনা গ্রাম অঞ্চলেও সুন্দরী কাঠ জ্বালানীরূপে ব্যবহৃত হয়। এতদঞ্চলে ইট তৈয়ারীর জন্য পাঁজা পোড়াইবার সময় কয়লার পরিবর্তে সুন্দরী কাঠ বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এইজন্য সুন্দরী কাঠের চাহিদা দিনদিন বৃদ্ধি পাইতেছে। বড় বড় নৌকা বোঝাই হইয়া সুন্দরী কাঠ জ্বালানীরূপে ব্যবহৃত হইবার জন্য রাজধানী ঢাকায় চালান যাইয়া থাকে। ময়মনসিংহ জিলার বিখ্যাত মির্জাপুর হাসপাতালে সুন্দরী কাঠ জ্বালানীরূপে ব্যবহৃত হয়। উত্তরবঙ্গের রাজশাহী, বগুড়া, রংপুর, প্রভৃতি জিলায়ও প্রচুর পরিমাণে কাঠ রপ্তানি হয়। সুন্দরী কাঠ মৃত্তিকার নীচে প্রোথিত করিয়া কাজে লাগাইলে শত শত বৎসরেও উহার সার নষ্ট করিতে পারে না। বর্তমানে সেগুন কাঠের অভাবে সুন্দরী কাঠের দ্বারাই প্রচুর পরিমাণে নৌকার ডালি প্রস্তুত হইতেছে। সুন্দরীকাঠ জনসাধারণের অতীব উপকারী।

সুন্দরীর চারা গাছকে ছিট বলে। উহার দ্বারা নৌকা চালাইবার লগী প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই কাঠের দ্বারা নৌকার দাড় ও বৈঠা প্রস্তুত হয়। গৃহের সাজ সরঞ্জাম, অর্থাৎ রুয়া, বাতা, পাইড় প্রভৃতি কাজে সুন্দরী সর্বত্র অবাধভাবে ব্যবহৃত হয়। সুন্দরীর খুঁটিও মজবুত। এই কাঠের বহুল প্রকার ব্যবহারের জন্য উহাকে সুন্দরবনের কাঠের রাজাও বলা হইয়া থাকে। তবে গেউয়া ও পশুর অতিমাত্রায় ব্যবহৃত হওয়ার জন্য সুন্দরীবৃক্ষের প্রতিপত্তি পূর্বাপেক্ষা হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে।

সুন্দরীকাঠের বাকল রং প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন প্রকার ছড়ি, ছাতার বাট, দাড়িপাল্লার কাঠ প্রভৃতি জিনিষ প্রস্তুতের জন্য এই কাঠ পর্যাপ্ত পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। এই বৃক্ষ বর্তমানে এত প্রয়োজন যে উহা দ্বারা বৈদ্যুতিক তার চলাচলের জন্য অসংখ্য থাম প্রস্তুত হইতেছে। লোহার অভাবে সুন্দরীর থামের দ্বারা এই অতীব আবশ্যকীয় কার্যটি সমাধা হইতেছে। সম্প্রতি খুলনা হইতে বাগেরহাট ও যশোর পর্যন্ত বৈদ্যুতিক তার লওয়া সম্ভব হইয়াছে এই সুন্দরী বৃক্ষের দ্বারা। ইহা দ্বারা নদী ও খালের উপর সাঁকো নির্মিত হয়।

কেওড়া

সুন্দরীবৃক্ষের পরই কেওড়ার স্থান। এ বৃক্ষ বৃহৎকায় ও দীর্ঘ হয়। বড় বড় নদী ও খালের তীরে এবং চরের উপর কেওড়ার আধিক্য পরিলক্ষিত হয়। হেমন্ত ও শীতকালে জোয়ারের প্রকোপ অপেক্ষাকৃত কম থাকায় জোয়ারের জল সুন্দরবনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারেনা। ঐ সময় কেওড়াফল পাকিয়া বৃক্ষতলে স্তূপীকৃত হয়। সেইজন্য ঐ সমস্ত ফল জোয়ারে ভাসিয়া নদী বা খালের তীরভূমি হইতে অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে না। তন্নিমিত্ত নদী বা খালের তীরবর্তী স্থানে কেওড়া বৃক্ষের আধিক্য দেখা যায়। এই গাছ নীচ ও কর্দমাক্ত জমিতে অধিক পরিমাণে জন্মিয়া থাকে।

কেওড়া বৃক্ষ দেখিতে সুন্দর এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বৃদ্ধির সহায়ক। এই বৃক্ষের উপরদিকে কিছু ডাল পালা হয়। বৃক্ষের ডাল ধরিয়া উপরেও উঠা যায়। কেওড়ার পাতাগুলি সরু। হরিণ ও বানরের নিকট কেওড়ার ফল ও পাতা উপাদেয় খাদ্য। এই বৃক্ষে ছোট গাবের আকৃতির ন্যায় প্রচুর পরিমাণে ফল

জন্মে। উহার স্বাদ জলপাই-এর ন্যায় অম্ল এবং বীজ খুব বড়। খোসা ফেলিয়া লবন মিশ্রিত করিয়া বা অম্বল প্রস্তুত করিয়া সুন্দরবনের অধিবাসীরা উহা তৃপ্তির সহিত আহার করে। সুন্দরবনের সন্নিকটবর্তী লোকেরা বলিয়া থাকে ঃ

"যে খেয়েছে কেওড়ার ঝোল
সে ছেড়েছে মায়ের কোল।"

শরৎকালে কেওড়া ফল পরিপক্ক হয়। হেমন্তের প্রারম্ভে বৃক্ষের তলে পড়িয়া ফলগুলি স্তূপীকৃত হয়। লক্ষ লক্ষ মণ কেওড়ার ফল যত্র তত্র পড়িয়া থাকে। কেহ কেহ উহা কুড়াইয়া আনিয়া হাটে বাজারে বিক্রয় করে। বৈজ্ঞানিক উপায়ে এই ফল দ্বারা চাটনি প্রস্তুত হইলে প্রচুর অর্থাগম হইতে পারে। কেওড়ার ফল ও পাতা খাইবার জন্য এই সমস্ত বৃক্ষের তলে ঝাঁকে ঝাঁকে হরিণ চরিয়া বেড়ায় এবং মনুষ্য সমাগমের আভাস পাইলে এক প্রকার বিশিষ্ট ধরনের শব্দ করিয়া তীরবেগে প্রস্থান করে। যে বনে কেওড়া বৃক্ষের আধিক্য সেখানেই হরিণ শিকারের উপযুক্ত স্থান। কেওড়া কাঠ পশুর বা সুন্দরীর ন্যায় শক্ত ও ভারী নহে। তবে ইহার প্রয়োজনীয়তা দিন দিন বিশেষভাবে উপলব্ধি হইতেছে। কেওড়ার তক্তা হাল্‌কা এবং সুন্দর হয়। শাল ও সেগুনের দুষ্প্রাপ্যতার জন্য কেওড়া কাঠ এদেশে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। ইহার তক্তা দিয়া ঘরের বেড়া, জানালা-দরজা প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। গ্রাম্য লোকে এই কাঠের দ্বারা আসবাবপত্র প্রস্তুত করিয়া থাকে। করাত কলের দ্বারা এতদঞ্চলে প্রচুর পরিমাণ কেওড়ার তক্তা প্রস্তুত হইয়া বন্দর ও বাজারে আমদানি হয়। সুন্দরী ও কেওড়ার মূল্য প্রায় সমান সমান।

পশুর

সুন্দরবনের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান কাঠ পশুর। এই কাঠ অত্যন্ত ভারী বিধায় স্থানান্তরিত করা কষ্ট সাপেক্ষ। সুন্দরী অপেক্ষা পশুরের ওজন বেশী। এই বৃক্ষ যেমন মোটা তেমন লম্বা হয়। স্থায়িত্বের দিক দিয়াও এই কাঠ বিশেষ সুনাম অর্জন করিয়াছে। পশুর কাঠের মূল্য সুন্দরী ও কেওড়ার প্রায় দ্বিগুণ। পশুরের আবার শ্রেণী বিভাগ আছে। সাধারণ পশুর ও কালী পশুর। কালী পশুরের ভিতরকার বর্ণ গাঢ় কাল এবং সর্বত্র সারযুক্ত। এজন্য এতদঞ্চলে অধুনা নির্মিত হর্ম্যরাজির জানালা-দরজায় ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। এই কাঠ জলে

ভিজাইয়া রাখিলে বা উহার উপর বন্যা পতিত হইলে এক প্রকার চমৎকার রং নির্গত হয়। বর্তমানে পশুরের বাকল দ্বারা মূল্যবান রং প্রস্তুত হইতেছে। চামড়ার কারখানায় সুন্দরী, গরাণ, ও পশুরের বাকল রং প্রস্তুতের জন্য প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

পশুরের তক্তাও মূল্যবান। তবে অত্যন্ত ভারী বলিয়া জানালা দরজার পাল্লায় কম ব্যবহৃত হয়। পাটাতন হিসাবে পশুর বিশেষ উপযোগী। ছাদের বরগা হিসাবে এই কাঠ বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। শক্ত ও ভারী হওয়া সত্ত্বেও ইহার দ্বারা ছাদের কড়ি মজবুত হয় না। বক্র হইবার সম্ভাবনা থাকে বলিয়া এই কাঠ ঐ কাজে ব্যবহৃত হয় না। পশুর বৃক্ষের পত্র কাঁঠালের পাতার ন্যায় প্রশস্ত। পশুর গাছের খুঁটি এতদঞ্চলে গৃহ নির্মাণের জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় এবং মৃত্তিকার নীচে শতবৎসরের মধ্যে ও নষ্ট হয়না। সুন্দরবন অঞ্চলে পুকুর খনন কালে হাজার বৎসর পূর্বের পশুর ও সুন্দরী বৃক্ষ মৃত্তিকার তলদেশে প্রায়ই অপরিবর্তিত অবস্থায় পাওয়া যায়। দৌলতপুর, ফুলতলা, অভয়নগর, কালীয়া, মোল্লাহাট, তেরখাদা ও পিরোজপুর প্রভৃতি স্থানে পুকুর খননের সময়ে সুন্দরী ও পশুরের গুঁড়ি মৃত্তিকার নিম্নে পাওয়া যায়। শাল বৃক্ষের দুষ্প্রাপ্যতার জন্য বর্তমানে সর্বত্র পশুরের খুঁটি ব্যবহৃত হয়। এই সমস্ত খুঁটি দীর্ঘস্থায়ী হইয়া থাকে। পশুর কাঠের দ্বারা গৃহের সাজ সরঞ্জামও প্রস্তুত হইয়া থাকে। একটি বৃক্ষে দুই হইতে চারিটি পর্যন্ত খুঁটি হয়। বৃক্ষ বড় হইলে ৬টি পর্যন্ত হইয়া থাকে। বৃক্ষ যত লম্বা হইবে খুঁটির সংখ্যা ততই অধিক হইবে। সম্পূর্ণ বৃক্ষ দ্বারাও বড় বড় খুঁটি প্রস্তুত হইয়া প্রকাণ্ড ঘরে ব্যবহৃত হয়। এতদঞ্চলে দিন দিন পশুরের চাহিদা অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাইতেছে।

গেউয়া

গেউয়া গাছ সুন্দরবনের আর্থিক সম্পদের মধ্যে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। এই বৃক্ষ সুন্দরবনে বহুল পরিমাণে জন্মে। গাছগুলি খুব লম্বা এবং সোজা হয়। গেউয়া কাঠ খুব হাল্কা। এই কাঠের দ্বারা লোকে কয়লা ও টিকিয়া প্রস্তুত করিয়া থাকে। ইহার গাত্রে একপ্রকার শ্বেতবর্ণ আঠা আছে। বৃক্ষ কাটিবার সময় কোনপ্রকারে চোখে লাগিলে চক্ষু নষ্ট হইবার বিশেষ সম্ভাবনা।

সেজন্য কাঠুরিয়াগণ সাবধানতার সহিত এই বৃক্ষ ছেদন করিয়া থাকে। গেউয়া গাছের ফুলে সুমিষ্ট মধু হয় এবং উহার ফল হরিণে ভক্ষণ করে। এই বৃক্ষের গুঁড়িতে ঢোলক, তবলা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের সুন্দর খোল প্রস্তুত হয়। এই কাঠের দ্বারা জ্বালানীও প্রস্তুত হইয়া থাকে।

অধুনা গেউয়া কাঠের প্রয়োজনীয়তা ও উহার বৈজ্ঞানিক উপায়ে ব্যবহার জাতীয় জীবনে এক নব যুগের সূচনা করিয়াছে। গেউয়া কাঠ হইতে কাগজ প্রস্তুত হয়। এই কাগজ দেশ বিদেশে "নিউজ প্রিন্ট" হিসাবে সংবাদ পত্রের জন্য ব্যবহৃত হইতেছে। কয়েক বৎসর পূর্বে পাকিস্তান শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন বিদেশ হইতে বিশেষজ্ঞ আনয়ন করিয়া গেউয়া কাঠ পরীক্ষা করিতে থাকে। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার পর প্রমাণিত হয় যে উহার দ্বারা সুন্দর কাগজ প্রস্তুত হইতে পারে। উক্ত প্রতিষ্ঠান অতঃপর ১৩ কোটী ৭৪ লক্ষ টাকা ব্যয় খুলনার সন্নিকটে খালিশপুরে একটি বিরাটকায় নিউজপ্রিন্ট মিলের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। যান্ত্রিক উপায়ে গেউয়া কাঠের দ্বারা উত্তম কাগজ প্রস্তুত হইয়া দেশবাসীর অশেষ কল্যাণ সাধন করিতেছে। বাদা অঞ্চলে এজন্য কর্পোরেশনের অফিস খোলা হইয়াছে। ঠিকাদার ও কর্মচারীগণ সুন্দরবনে এই কাঠ সংগ্রহ করে। খালিশপুরে নদী মধ্যে সর্বদা লক্ষ লক্ষ টুকরা গেউয়া কাঠ ভাসমান অবস্থায় একত্রে দৃষ্ট হয়। এগুলিকে কাঠের ভূর বলে। ক্রেনের সাহায্যে বাণ্ডিল করিয়া এগুলি তীরে নীত হয় এবং তথা হইতে মিলের কাজে ব্যবহৃত হইয়া বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে দৈনিক শত শত টন কাগজ প্রস্তুত হয়। এই কাগজ ছাত্রদের লেখারও উপযোগী হইয়াছে। তবে উহা কর্ণফুলী কাগজের ন্যায় পরিষ্কার ও শক্ত নহে। এই কাগজ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হয় এবং প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়। সুন্দরবন হইতে খালিশপুর পর্যন্ত নদীপথে গেউয়া কাঠ আনিতে দেখা যায়। সুন্দরবনের সর্বত্র এই কাঠের প্রাচুর্য অত্যধিক এবং উহা বহু বৎসরের জন্য প্রকাণ্ড নিউজপ্রিন্ট মিলের চাহিদা মিটাইতে পারিবে। পাকিস্তানের শিল্পোন্নয়নে নিউজপ্রিন্ট এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। পাকিস্তান শিল্পোন্নয়ন কর্পোরেশনের জনৈক মুখপাত্র বলিয়াছেন যে নিউজপ্রিন্ট মিলের সম্প্রসারণ সুসম্পন্ন হইলে বৎসরে ৫০ হাজার ৬ শত টন কাগজ উৎপাদিত

হইবে। পাকিস্তানের সমস্ত দৈনিক সংবাদপত্র এবং অন্যান্য অসংখ্য পত্র পত্রিকার চাহিদা এই শিল্প প্রতিষ্ঠান মিটাইতেছে।

দেশলাইয়ের কাঠি এবং পেন্সিলের কাঠ গেউয়া ও ধুন্দুল কাঠের দ্বারা প্রস্তুত হয়। পর্যাপ্ত পরিমাণ শিমুল বৃক্ষের দুষ্প্রাপ্যতার জন্য ম্যাচ ফ্যাক্টরী সমূহে গেউয়া কাঠ প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। গেউয়া কাঠ হাল্‌কা এবং উহাতে সুন্দর দেশলাইয়ের কাঠি প্রস্তুত হয়। শিল্প এলাকায় এই কাঠের চাহিদা অত্যধিক।

বাইন

সুন্দরবনের প্রধান প্রধান বৃক্ষের মধ্যে বাইন অন্যতম। এই বৃক্ষ অত্যধিক বড় হয় এবং দীর্ঘস্থায়ী হইয়া থাকে। গভীর জঙ্গলের মধ্যে মাঝে মাঝে বাইন বৃক্ষের গুঁড়ি পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়। বাইন, আম বা অশ্বত্থ বৃক্ষের ন্যায় প্রকাণ্ড পরিধি বিশিষ্ট হইয়া থাকে। অনেক সময় গাছের গুঁড়ি শূন্য-গর্ভ হয়। বাইনের তক্তা এদেশে বিখ্যাত। এই কাঠ দিয়া ঘরের বেড়া দেওয়া হয়। জানালা, দরজা প্রভৃতি কাজেও এই তক্তা অবাধভাবে ব্যবহৃত হয়। অন্যান্য কাঠের চেয়ে বাইনের দামও একটু কম। গাছ মোটা বলিয়া বাইনের তক্তা খুব প্রশস্ত হয় এবং উহার দ্বারা গৃহস্থের বাক্স, পিঁড়ি, আলমারি, টেবিল প্রভৃতি আসবাব পত্র প্রস্তুত হয়। বাইন গাছে ধান ভানা ঢেঁকি প্রস্তুত হইয়া থাকে। বরিশাল জিলার সরূপকাঠি থানার ইন্দিরহাটে বাইন কাঠের বহু আসবাবপত্র প্রতি হাটবারে ক্রয় বিক্রয় হইতেছে।

গরান

গরান সুন্দরবনের একটি নামকরা বৃক্ষ। ইহা অন্যান্য বৃক্ষের ন্যায় বৃহৎকায় হয়না। এগুলি সাধারণতঃ সরু বাঁশের ন্যায় এবং ৭-৮ হাতের অধিক লম্বা হয় না। গরান গাছের ঝাড় হয়। এক একটি ঝাড়ে অনেকগুলি গাছ জন্মে। ইহার পাতা হরিদ্রাবর্ণের এবং পুরু ও গোলাকার। গরান কাঠ ছোট হইলেও বেশ শক্ত। গরান কাঠে ঘরের খুঁটি ও সরঞ্জাম প্রস্তুত হয়। গরানের কাঠ রুয়া, বেড়া ও ঘিরিবার খুঁটি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ইহা দ্বারা নৌকা চালাইবার লগিও প্রস্তুত হয়। সুতার মিস্ত্রীরা এই কাঠের দ্বারা হুকার নলচে প্রস্তুত করিয়া থাকে।

দৌলতপুর থানার অন্তর্গত বারাকপুরে এই নল্চে তৈয়ারীর অনেকগুলি কুটীর শিল্পের কারখানা আছে। গরান কাঠের দ্বারা দাড়ি পাল্লার কাঠ, ছাতার বাট, ছড়ি ও খাটের নোলা, রুটি তৈয়ারীর বেলুন প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। গরান কাঠের বর্ণ রক্তিম এবং এই কাঠ জ্বালানী কাঠের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছে। এই কাঠ দিয়া দ্রুত রান্না করা যায় এবং উহা পোড়াইতে কোন বেগ পাইতে হয় না। ইহা কুঠার দ্বারা চেরাই করিতেও সুবিধা হয়। সুন্দরীও অন্যান্য কাঠের জ্বালানী অপেক্ষা গরান কাঠের মূল্য অধিক। শহরের কাঠগোলায় সর্বত্র জ্বালানী কাঠের জন্য সুন্দরী ও গরান সর্বদা মজুত থাকে। গরানের বাকলেও সুন্দর রং তৈয়ার হয়।

গর্জন

গর্জন বৃক্ষ সুন্দরীর ন্যায় সোজা হইয়া উঠে। ইহা সুন্দরবনের সর্বত্র পাওয়া যায়। নদী বা খালের তীরে এই বৃক্ষ দৃষ্টিগোচর হয়। বট বৃক্ষের ন্যায় শিকড়গুলি গাছকে সোজা করিয়া রাখে। গর্জন বৃক্ষের ফুল হয় এবং ঐ ফুল হইতে সজিনার ন্যায় খাড়া বাহির হয়। পাতাগুলি বেশ পুরু। গর্জন বৃক্ষে তৈল প্রস্তুত হয়। হিন্দুরা উক্ত তৈল প্রতিমার গাত্র উজ্জ্বল করিবার জন্য ব্যবহার করিয়া থাকে। কুষ্ঠরোগে গর্জন তৈল মহা উপকারী।

ধোন্দল

ধোন্দল বৃক্ষ অনেকটা পশুরের মত। ধোন্দল বৃক্ষে খুঁটি ও তক্তা হয়। তবে এ কাঠ খুব মূল্যবান নহে এবং সুন্দরবনে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। ধোন্দল বৃক্ষে পেয়ারার সাইজের চেয়েও বড় ফল হয়। ফলগুলি হরিণে খায়। হরিণ এই ফল খাইতে গেলে কড়মড় শব্দ হয় এবং শিকারীরা তথায় হরিণ আছে বুঝিতে পারিয়া ছুটিয়া যায়। ধোন্দলের পাকা ফলগুলি ফাটিয়া গেলে উহার ভিতর হইতে তালের আঁটির মত কয়েকটি বীজ বাহির হয় এবং তাল বৃক্ষের ন্যায় অঙ্কুরিত হইয়া উহা হইতে চারা গজায়।

কাকড়া

বর্তমানে কাকড়া বৃক্ষের নাম সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। পূর্বে এতদঞ্চলে এ বৃক্ষের নাম শুনা যাইত না। কাকড়া বৃক্ষ সুন্দরী বা পশুরের চেয়ে ও অধিক

লম্বা ও সোজা হয়। তবে উহার কাঠ ভারী নহে। এই কাঠে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র প্রস্তুত হয়। বর্তমানে কাক্ড়া কাঠ দিয়া লোকে ছাদের কড়ি, বর্গা প্রস্তুত করিয়া থাকে। সেগুনের অভাবে লোকে কড়ি হিসাবে কাকড়াই ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। খুব শক্ত না হইলেও কড়ির জন্য কাকড়া কাঠই উত্তম। কাক্ড়ার তক্তায় জানালা দরজা ও অন্যান্য আসবাবপত্রও প্রস্তুত হয়। কাক্ড়ার মূল্য সুন্দরী ও কেওড়ার সমান।

হেন্তাল

সুন্দরবনের সর্বত্র হেন্তাল গাছ আছে। জঙ্গলের লোকেরা উহাকে 'হ্যাতাল্‌সী' বলিয়া থাকে। ইহা বহুলাংশে খেজুর গাছের ন্যায়। তবে উহার ন্যায় দীর্ঘ হয়না ইহারও মাথায় খেজুরের ডালের মত ছোট ছোট ডাল জন্মে। এগুলি সাধারণতঃ ৭।৮ হাত লম্বা হয় এবং খালের পার্শ্বেই বহুল পরিমাণে জন্মে। ইহাতে ঘরের রুয়া প্রস্তুত হয়। এই বৃক্ষ অন্য কোন কাজে লাগে বলিয়া আমাদের জানা নাই। সুন্দরবনের বাওয়ালীরা হেন্তালের অগ্রভাগ কাটিয়া খেজুর বৃক্ষের ন্যায় উহার মাথি খাইয়া থাকে। এই জংলী গাছের মধ্যে বাঘ লুকাইয়া থাকে। ইহা এতই ঘন হয় যে বাঘ লুকাইয়া থাকিলে দূর হইতে দেখা সম্ভব হয় না। হেন্তাল কণ্টকাকীর্ণ বৃক্ষ এবং উহার মধ্যে মানুষের যাতায়াত দুঃসাধ্য।

ওড়া

ওড়াবৃক্ষ এদেশে সুপরিচিত। ওড়াগাছ কেওড়ার ন্যায় বৃহৎ হয়। শুধু সুন্দরবনে নহে, লবণাক্ত নদী ও খালের পার্শ্বে লোকালয়ে এই বৃক্ষ অহরহ জন্মিয়া থাকে। ওড়া গাছে বড় বড় ফল হয়। উহা কাচা ও রান্না করিয়া গ্রামের লোকেরা 'অম্বল' করিয়া খায়। ওড়া বৃক্ষের পাতার পচানির গন্ধে চিংড়ি মৎস্য তথায় আশ্রয় গ্রহণ করে এবং লোকে এই উপায়ে মৎস্য ধরিয়া থাকে। ওড়ার ফল বেশ বড় এবং মসৃণ। উহা হরিণের সুখাদ্য। ওড়ার ফল বহুলাংশে টম্যাটোর আকৃতিবিশিষ্ট।

অন্যান্য বৃক্ষ

আমুড় সুন্দরবনের আর একটি বৃক্ষ। এই বৃক্ষগুলি মসৃণ এবং হরিণ চলিবার সময় আঘাত পাইলে উহার চারা গাছগুলি ভাঙ্গিয়া যায়। আমুড়

বৃক্ষে সুন্দর জ্বালানী প্রস্তুত হয়। সুন্দরবনের ভ্রমণ-কারীরা শুকনা আমুড় বৃক্ষ সংগ্রহ করিয়া তাহা জ্বালানীরূপে ব্যবহার করে। জঙ্গলে কৃপে নামে আর এক প্রকার গাছ জন্মে। উহা পশুরের ন্যায় শক্ত বলিয়া উহাতে ঘরের খুঁটি প্রস্তুত হয়। ডাওর নামক আর একটি বৃক্ষের নামও শুনা যায়। তবে উহা সুন্দরবনে পর্যাপ্ত পরিমাণে জন্মে না। ইহাতে আমের ন্যায় ফল জন্মে, উহা লোকে খায় না।

হ'দো গাছের ঝোপ হয় এবং উহা ৫ফুটের বেশী উঁচু হয় না। নিবিড় হ'দো গাছের নীচে ব্যাঘ্রের লুকাইয়া থাকিবার সর্বোৎকৃষ্ট স্থান। শিঙ্গড়া, ভাদাল, গ'ড়ে, খলসী, হিঙ্গে প্রভৃতি গাছ সুন্দরবনের আগাছা বিশেষ। উহাতে জ্বালানী কাঠ হয়। খলসী ফুলে মধু হয় এবং ঐ ফুল বেশ সুগন্ধযুক্ত। হিঙ্গের কাঠ খুব পাতলা এবং উহার দ্বারা পালকীর বাট হয়। সুন্দরবন অঞ্চলের লোকেরা জাল ভাসাইয়া রাখার জন্য হিঙ্গের কাঠ দ্বারা "ভাসান কাঠি" প্রস্তুত করে। হিঙ্গের কাঠে কৃষিকার্যের জন্য লাঙ্গলের জোয়াল ও সুন্দর মই প্রস্তুত হয়।

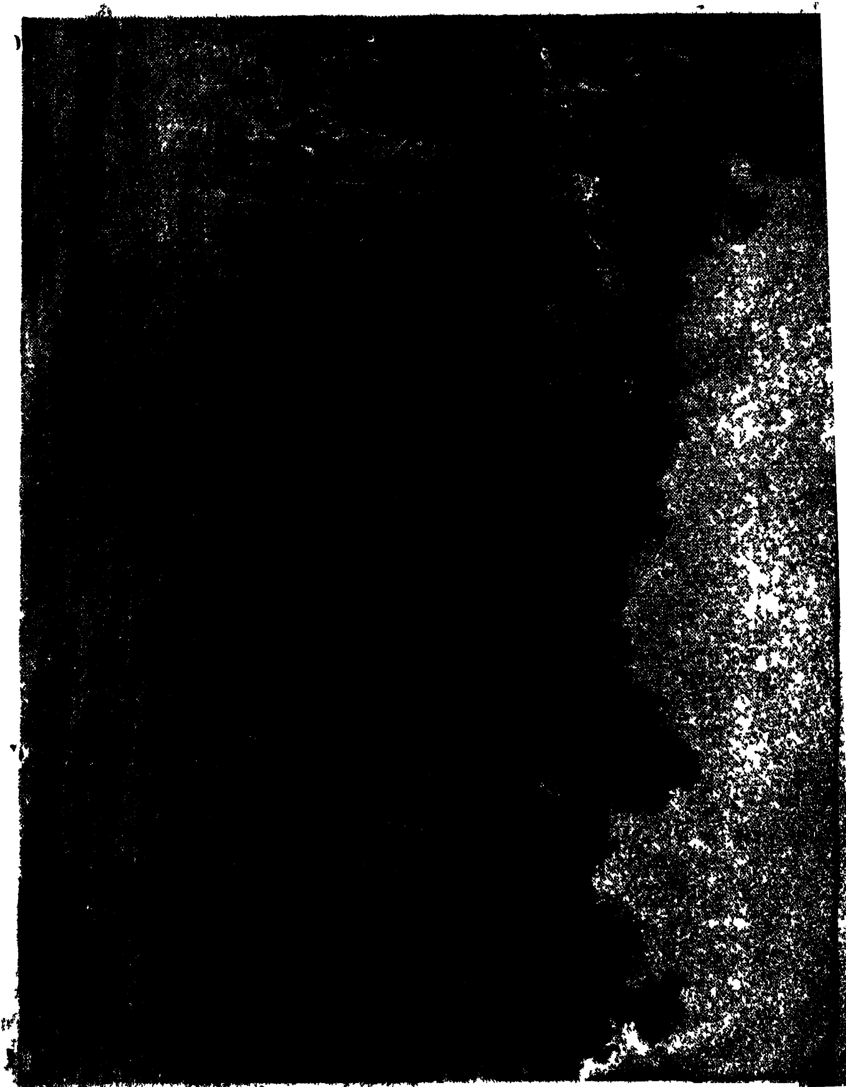
হ'দো গাছের ন্যায় বলাসুন্দরীর নীচেও বাঘ লুকাইয়া থাকিতে পারে। বলা গাছে হলুদ বর্ণের ফুল হয়।

সুন্দরবনের গহীন অরণ্যে গিলে গাছ দৃষ্ট হয়। এগুলি খুব দীর্ঘ। শেখের ট্যাকে এই গাছ আছে এবং তথা হইতে আমরা গিলে ফল সংগ্রহ করিয়া সঙ্গে আনিয়াছিলাম। কাপড় কুচি দেওয়ার জন্য গৃহস্থেরা এবং দরজীগণ এই ফল সর্বত্র ব্যবহার করিয়া থাকে। গ্রামের লোকেরা ধান্যের গোলায় পোকামাকড়ের আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য কয়েকটি তেতুলের বীজ ও তৎসহ আরও কয়েকটি গিলে ফলও রাখিয়া দেয়। বনের মধ্যে বেত গাছ খুব দীর্ঘ ও মোটা হয়। বেত সাংসারিক জীবনে অনেক আবশ্যকীয় কার্যে ব্যবহৃত হয়। এতদ্ব্যতীত খালের তীরে হরগোজার কাটা, উন্মুক্ত স্থানে খড়, কাশবন ও তুলাটেপারী এবং বালুচরে বুনো ঝাউগাছ জন্মিয়া থাকে। কোন কোন স্থানে বুনো নেবু গাছও দেখা যায়। এতদ্ব্যতীত কন্টিকেরী ও অন্যান্য বহু প্রকারের মূল্যবান ওষধি ও লতা সুন্দরবনে পাওয়া যায়। বাওয়ালীদের অসুখ হইলে উহা ব্যবহার করিয়া থাকে। কন্টিকেরী কণ্টকাকীর্ণ গাছ। উহা শুকাইয়া ঔষধ প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত হয়। এই ধরণের আরও কত আবশ্যকীয় লতাপাতা জঙ্গলে পড়িয়া আছে, অনেকে উহার খবর রাখে না।

বাক্‌ঝাকা গাছ জরাক্রান্ত ব্যক্তিকে ঔষধ হিসাবে খাইতে দেওয়া হয়। লাটিম বা লাট্‌নে গাছে পেন্সিলের কাঠ হয়। বনশশা গাছে উচ্ছের ন্যায় ফল হয় এবং উহা লোকে খায়। বগুলা নামক আর একপ্রকার গাছ আছে। উহাতে বড় বড় ফল হয়। উহাও লোকে খাইয়া থাকে। চাঁন্দা গাছের গায়ে খুব কাঁটা। সুন্দরবনে টক সুন্দরী নামক আর এক প্রকার গাছ আছে। উহাতে জ্বালানী প্রস্তুত হয়। কনেক বাইন ক্ষুদ্র বৃক্ষ এবং উহার পাতা সরু হয়। জানা গাছ খুব বড় হয়। ইহার কাঠের দ্বারা গৃহের সাজ সরঞ্জাম ও জ্বালানী প্রস্তুত হইয়া থাকে। উহার পাতা কাঠাল বৃক্ষের পাতার ন্যায়। কাজ্‌লী লতা, বাগলো লতা, গিলে লতা, কেক্‌চীবন বা কেয়াগাছও সুন্দরবনের সর্বত্র দৃষ্ট হয়। অশ্বত্থ, ক্ষুদে জাম, জিওল ও সড়া প্রভৃতি সুন্দরবনের বৃক্ষ নহে। তবে উহা কোথাও প্রাচীন ভগ্ন অট্টালিকা বা দীঘির নিকট বিদ্যমান থাকিয়া মনুষ্য বসতির সাক্ষ্য দিতেছে। এতদ্ব্যতীত সুন্দরবনে বুজ, বোবই ও চৈতগাছ আছে। বোবই গাছে একপ্রকার বুনো কুল হয় এবং উহা সুন্দরবনের লোকেরা খায়।

গোলগাছ ও হোগলা

জন সাধারণের অত্যাবশ্যকীয় এই গোলগাছ। এগুলি দেখিতে ২।৩ বছরের নারিকেল গাছের ন্যায় এবং তদ্রূপ লম্বা হইয়া থাকে। নদী ও খালের তীরে এবং নূতন চর বা দ্বীপে গোলগাছ প্রচুর জন্মে। জলের পার্শ্বে কর্দমাক্ত স্থানে এবং অল্প জলের মধ্যেই এগুলি জন্মিয়া থাকে। ইহার পাতাগুলি প্রশস্ত ও খুব বড় হয়। উলু খড়ের ন্যায় এই গোলপাতার দ্বারা দক্ষিণ বঙ্গের অধিকাংশ ঘরের ছাউনী হইয়া থাকে। খড়ের চাষ দেশ হইতে এক প্রকার উঠিয়া গিয়াছে। আবার করোগেট টিনও দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য। অন্য কোন উপায় না থাকায় লোকে ঘরে গোলপাতার ছাউনী দেয়। ইহাতে গ্রীষ্মকালে ঘরের মধ্যের হাওয়া শীতল থাকে। কাঠের ন্যায় অসংখ্য নৌকা সুন্দরবন হইতে গোলপাতা কাটিয়া লোকালয়ে বিক্রয় করে। এই গোলগাছে বন বিভাগের প্রচুর আয় হয়। গোলগাছ সুন্দরবনের এক মূল্যবান জাতীয় সম্পদ। গোলগাছ দিয়া বাড়ী ঘিরিবার বেড়া দেওয়া হয় এবং কোন কোন সময় লোকে নৌকার উপর ছাউনী দিয়া থাকে। সুন্দরবনের নদী ও খালের মধ্যে সর্বত্র গোলগাছ পরিলক্ষিত হয়। উহার পাতার রং সবুজ এবং



সুন্দরবনের নদী-তীরের চরে গোল গাছের সারি ।

ডাঁটার রং কাল। পাতা অনেকটা নারিকেলের পাতার ন্যায় তবে মসৃণ। উহার ডাঁটা খুব শক্ত হয়। সুন্দরবন অঞ্চলের অন্যূন শতকরা ৯০ খানা বাসগৃহ গোলপাতার ছাউনিযুক্ত। গোলগাছে তালশাঁসের মত কান্দি হয়। উহার ফল ভক্ষণ করা যায়। ফলগুলির মধ্যে শক্ত তালশাঁসের ন্যায় শাঁস থাকে। উহা তালশাঁসের ন্যায় সুস্বাদু নহে। সুন্দরবনের গোলফল কাটা একেবারেই নিষিদ্ধ, কারণ উহা হইতে অসংখ্য গোলগাছ জন্মে এবং উহার বংশ বৃদ্ধি হয়। বরিশাল ও খুলনার অসংখ্য লোক গোলগাছ সংগ্রহ করিয়া জীবন ধারণ করে। গোল পাতার মূল্য দিন দিন বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে।

খেজুর ও তালগাছের ন্যায় গোলগাছে একপ্রকার মিষ্ট রস হয়। বরিশালের বর্ধাকাটীর বাওয়ালীরা মৃণ্ময়পাত্র বাঁধিয়া গোলগাছ হইতে রস সংগ্রহ করে এবং উক্ত রস জ্বালাইয়া খেজুরের গুড়ের ন্যায় মিষ্টান্ন তৈয়ার করিয়া তাহারা খায়। ইহা সুন্দরবনের বাওয়ালীদের একটি আবিষ্কার। কেহ কেহ বলেন মোঘল যুগে মগেরা যখন সুন্দরবন অঞ্চলের যত্রতত্র লুঁতরাজ করিত, তখন তাহারা গোল গাছ হইতে রস বাহির করিবার পদ্ধতি আবিষ্কার করে।

লবনাক্ত এলাকার নদী ও খাল বাঁধিবার সময় বাঁধের জন্য গোলগাছ দিয়া "মাতা" প্রস্তুত করা হয় এবং নদীর ঢেউ হইতে ভেড়ী রক্ষা করিবার জন্য ঝাপ হিসাবে গোলপাতা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সুন্দরবনে যেরূপ পর্যাপ্ত পরিমাণে গোলপাতা পাওয়া যায়, তদ্রূপ উহার ব্যবহার ও আবশ্যকতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

সুন্দরবনে সাধারণ মানুষের ব্যবহারোপযোগী হোগলা প্রচুর পরিমাণে জন্মে। ইহা সাধারণতঃ পাটগাছের ন্যায় সাত আট হাত লম্বা এবং এক ইঞ্চি প্রশস্ত হয়। ইহা তিনকোণাবিশিষ্ট। হোগলায় বসিবার আসন, নৌকা ও ঘরের ছাউনি, কৃষকের মাথাল এবং বাড়ীঘরের বেড়া, পাটাতন প্রভৃতি নির্মিত হয়। হোগলা এতদঞ্চলের অধিবাসীদের নিকট প্রায় গোলপাতার ন্যায় মহোপকারী। সুন্দরবনের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে হোগলা ও মা'লে জন্মে। মা'লের দ্বারা দেশবাসীর অত্যাবশ্যকীয় পাটী, মাদুর, জায়নামাজ প্রভৃতি প্রস্তুত হয়।

হোগলা সাধারণতঃ নদী ও খালের পার্শ্বে কর্দমাক্ত স্থানে জন্মে। হোগলা ও মা'লে ব্যতীত সুন্দরবনের চরে কোন কোন স্থানে প্রচুর উলুখড় জন্মে। অতি প্রাচীন কাল হইতে ঘরের ছাউনির জন্য উলুখড়ের ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে।

আর্থিক গুরুত্ব

সুন্দরবনের বনজ সম্পদ জাতীয় অর্থনীতিক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে সুন্দরবনের কাঠের দ্বারা অসংখ্য গৃহস্থের জ্বালানী প্রস্তুত হয় এবং এতদঞ্চলে হর্ম্যরাজি নির্মাণের জন্য কাঁচা ইট পোড়াইয়া পাকা করা হয়। চেয়ার, বেঞ্চ, টেবিল, আলমারি, বাক্স প্রভৃতি নিত্যপ্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ইহা দ্বারা প্রস্তুত হইয়া জাতির অশেষ কল্যান সাধন করিতেছে। সুন্দরবনের কাঠ না হইলে কোঠাবাড়ী হইতে আরম্ভ করিয়া দরিদ্রের কুটীর পর্যন্ত নির্মাণ করিতে সাধ্যাতীত ব্যয় হইত। কাঠের দ্বারা ঘরবাড়ীর অত্যাবশ্যকীয় খুঁটি ও সাজসরঞ্জাম প্রস্তুত হইয়া থাকে। নদী পথে নৌকাই একমাত্র বাহন বলিলে অত্যুক্তি হয় না এবং উহাও বহুলাংশে সুন্দরবনের কাঠ দ্বারা নির্মিত হয়। শুধু নৌকা নহে, কাঠ দ্বারা নৌকা এবং নদী ও খালের উপর সাঁকো নির্মিত হয় এবং বৈদ্যুতিক তার চলাচলের থামরূপে ব্যবহৃত হয়। সুন্দরবন অঞ্চলে সর্বত্র কাঠের ব্যবসায়ের দ্বারা অসংখ্য লোক জীবিকা নির্বাহ করে। বাওয়ালীরা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ কুঠারের সাহায্যে ধরাশায়ী করে এবং নৌকা বোঝাই করিয়া শহর ও বাজারে আনিয়া বিক্রয় করে। বড়দল, চাঁদখালী, গড়ইখালী, রামপাল, মোরেলগঞ্জ, খুলনা, রাজাপুর, সিংহের চর, পিরোজপুর, ঝালকাঠী, বরিশাল, বড়দিয়া, গোপালগঞ্জ প্রভৃতি বন্দরে অসংখ্য কাঠগোলা ও কাঠের আড়ৎ সুন্দরবনের কাঠের দ্বারা ব্যবসায় চালাইতেছে। অসংখ্য সুতার মিস্ত্রী আসবাব প্রস্তুতের কার্যে দিবারাত্র লিপ্ত থাকে। দেশের সর্বত্র করাতিরা বড় বড় বৃক্ষ চেরাই করিয়া গৃহের খুঁটি ও সাজসরঞ্জামের কাঠ প্রস্তুত করে। অনেকগুলি যন্ত্রচালিত করাতকল বড় বড় বন্দরে কার্যে লিপ্ত আছে। সুন্দরবনের জ্বালানী ও অন্যান্য কাঠ বোঝাই হইয়া অসংখ্য নৌকা ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে নীত হইয়া তথাকার জনসাধারণের চাহিদা মিটাইতেছে।

সুন্দরবনের কাঠে প্রচুর কাগজ খুলনার পেপার মিলে প্রস্তুত হইতেছে, সেকথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। এই সমস্ত কারণে এই মূল্যবান বনজ সম্পদ আমাদের জাতীয় জীবনে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে।

এতদঞ্চলে কাঠের পাটাতন, ছাদ, জানালা, দরজা এমন কি জানালার শিক ও এই কাঠের দ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে। ধান ভানিবার জন্য গৃহস্থের অত্যাবশ্যকীয় ঢেঁকি এই কাঠ দ্বারা প্রস্তুত হইয়া জনসাধারণের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতেছে। দালানের কড়ি, বর্গা, জানালা দরজার চৌকাঠ, মটরবাস, লঞ্চ ও নৌকার ছাউনি প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে এই কাঠ কাজে লাগিতেছে। কাঠের ন্যায় গোলগাছও এক অতীব মূল্যবান বনজ সম্পদ। একদিকে যেমন বনজ সম্পদ হইতে সরকারের আয় বাড়িতেছে, অন্যদিকে তেমনই ইহা দ্বারা দেশবাসীর অশেষ কল্যাণ সাধিত হইতেছে। অর্থনীতি ক্ষেত্রে কাঠের গুরুত্ব অপরিসীম।

কোন কোন বৃক্ষের বাকল হইতে নানা প্রকার রং প্রস্তুত হইতেছে, সে কথা পূর্বেই বলিয়াছি। ভবিষ্যতে বৃক্ষের শিকড়, বাকল, পাতা এবং ফল ও ফুল হইতে হয়ত বহু প্রকার নূতন নূতন তথ্যের সন্ধান মিলিবে এবং মানুষের আবশ্যকীয় খাদ্য, ঔষধ ও অন্যান্য তৈজষপত্র প্রস্তুত হইবে। বৈজ্ঞানিক উপায়ে গবেষণা চলিতে থাকিলে বনজ সম্পদের দ্বারা দেশবাসীর আরও অধিক কল্যাণ সাধিত হইতে পারে।



সুন্দরবনের জীবজন্তু ও অন্যান্য সম্পদ

॥ নয় ॥

সুন্দরবনের সর্বত্র স্থল ও জলভাগে অসংখ্য জীবজন্তু বাস করে। নিবিড় অরণ্যানী ও বিশালকায় নদনদী, "ডাঙ্গায় বাঘ — জলে কুমীর" প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর জন্য সুন্দরবনকে ভীষণতায় পরিণত করিয়াছে। এই সমস্ত বিষয় শ্রবণ করিলে অনেকের মনে সুন্দরবন সম্পর্কে ভীতির সঞ্চার হয় এবং উহার রোমাঞ্চকর ও লোমহর্ষণ কাহিনী শুনিতে উৎসাহ ও ঔৎসুক্য জন্মে।

ব্যাঘ্র

সুন্দরবনের জীবজন্তুর মধ্যে ব্যাঘ্রের নামই সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য দেশের ব্যাঘ্র অপেক্ষা সুন্দরবনের ব্যাঘ্র অত্যধিক বলশালী ও হিংস্র। এই ধরণের ভীমমূর্তিধারী ব্যাঘ্র বিশ্বের আর কোথাও নাই। তন্নিমিত্ত ইউরোপীয় ভ্রমণকারীগণ ইহাকে রয়াল বেঙ্গল ব্যাঘ্র (Royal Bengal tiger) নামে অভিহিত করিয়াছেন। ব্যাঘ্রের প্রতাপ এত অধিক যে উহার ভয়ে সুন্দরবনের অন্যান্য সমস্ত প্রাণী এবং মানুষ সর্বদা ভীত ও সন্ত্রস্ত থাকে। জঙ্গলের লোকেরা ইহাকে বড় শিয়াল ও বড় মিয়া বলিয়া থাকে। হিন্দুরা ব্যাঘ্রকে বড় মামা, বড় দাদা এবং কেহ কেহ গাজী ঠাকুরও বলে। ব্যাঘ্রের কথা শ্রবণে অনেক অশিক্ষিত হিন্দু শক্তিশালী এই জন্তুর প্রতি ভীতিপূর্ণ নমস্কার জানায়। আবার কেহ কেহ বিরক্তির সহিত ইহাকে ভেতড়ও বলে। বাওয়ালীরা উহার ভয়ে অনেক সময় বাঘ বা ব্যাঘ্র নাম উচ্চারণ করেনা। সুন্দরবনের বাঘের গাত্র হরিদ্রা বর্ণের এবং কাল ডোরাযুক্ত। কোন কোন বাঘের গায়ে লম্বা কাল ডোরা বা গোলাকার চিহ্ন দেখা যায়। গোলাকার ফোটাযুক্ত বাঘকে গুলবাঘ বলা হয়। এ গুলি সুন্দরবনে কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। সুন্দরবনের ব্যাঘ্র ৮ হাত পর্যন্ত দীর্ঘ এবং ৩'বা৪' ফুট উঁচু হয়। ইহাদের সম্মুখের পদদ্বয় মোটা ও অতিমাত্রায় বলশালী হয়। বড় বড় ব্যাঘ্রে, মহিষ, গরু প্রভৃতি বৃহৎকায় জন্তু সহজে স্কন্ধের উপর ফেলিয়া লইয়া যাইতে সক্ষম হয়। বাঘের মস্তক বৃহৎ ও গোলাকৃতি এবং চক্ষুদ্বয়



বিশ্বের সর্বাপেক্ষা হিংস্র ও ভয়ঙ্কর জানোয়ার—সুন্দরবনের রয়াল বেঙ্গল বাঘ

বেশ বড় ও অত্যুজ্জ্বল। এহেন ভয়ংকর ও সুতীব্র চাহণী পৃথিবীর অন্য কোন জন্তুর মধ্যে দৃষ্ট হয়না। বিড়ালের আকৃতি ব্যাঘ্রের ন্যায়, সেজন্য এদেশে বিড়ালকে "বাঘের মাসী" বলা হইয়া থাকে। কিন্তু বিড়ালের প্রকৃতি শান্ত এবং বাঘের প্রকৃতি হিংস্র। রয়াল বাঘ অতিমাত্রায় রক্ত পিপাসু, হিংস্র এবং শিকারের সময় ভয়ংকর মূর্তি ধারণ করে। জীবজন্তু শিকারের পর ব্যাঘ্র প্রথম উহার স্কন্ধ হইতে রক্তপান করে। বাঘের মধ্যে কোন কোনটি নরখাদক। যে সমস্ত বাঘ একবার মানুষের রক্তের স্বাদ পাইয়াছে তাহারা যে কোন অবস্থায় মানুষ আক্রমণ করিতে দ্বিধাবোধ করেনা। মানুষ দেখা মাত্র ইহাদের উগ্র নেশা চড়িয়া যায় এবং ইহারাই মনুষ্য শিকারে দক্ষ। তজ্জন্য লোকে এই প্রকার বাঘকে নরখাদক বলে। সাধারণ ব্যাঘ্র অপেক্ষা নরখাদক অত্যধিক ভয়ংকর ও হিংস্র এবং ইহাদের ভয়ে ঝানু শিকারী পর্যন্ত শিহরিয়া উঠে। ইহাদের সম্পর্কে পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। সুন্দরবনের হ'দো, হেন্তাল ও বলাসুন্দরী বৃক্ষের নীচে লুক্কায়িত থাকিয়া ব্যাঘ্রে শিকার করিয়া থাকে। শিকারের সুযোগ পাইবামাত্র সে ভীম বিক্রমে উহার উপর লাফাইয়া পড়ে। বাঘিনী ২ হইতে ৫টি পর্যন্ত ছানা প্রসব করে এবং প্রসবের পর ছানাগুলিকে লুকাইয়া রাখে। বাঘে দেখিতে পাইলে ছানাগুলি খাইয়া ফেলে। বাঘিনী কিছুতেই তাহার বাচ্চা অন্যকে খাইতে দেয় না। বাচ্চা প্রসবের পর বাঘের পেট খালি হয় এবং অন্য কোন খাদ্য না পাইলে স্বীয় বাচ্চা কদাচিত ভক্ষণ করে। ইহা এই সময়কার বিশেষ ব্যতিক্রম ব্যাপার। এই সময় বাঘিনী বাচ্চাকে জিহ্বা দিয়া চাটিতে চাটিতে বিশেষ আস্বাদ পায় এবং ক্ষুধার যন্ত্রনায় বাচ্চা ভক্ষণ করে। ব্যাঘ্রের তেজব্যঞ্জক ও ভয়াবহ মূর্তির জন্য উহাকে সাধারণে সুন্দরবনের রাজা বলিয়া থাকে। সুন্দরবনে সচরাচর বাঘের ডাক শ্রুত হয় না। অমাবস্যা ও পূর্ণিমার সময় বাঘ ও বাঘিনীর ডাক শুনা যায়।

সুন্দরবনে ব্যাঘ্রের প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক। ব্যাঘ্রের অবস্থানের জন্য চোর ডাকাতেরা সুন্দরবনের সম্পদ আহরণ করিতে ভয় পায়। ব্যাঘ্র না থাকিলে মানুষে এতদিন হরিণের বংশ ধ্বংস করিয়া দিত। ব্যাঘ্রের আক্রমণ ভয়ে কেহ জঙ্গলের মধ্যে স্বাধীনভাবে ঘুরিয়া শিকার করিতে সাহস পায় না। সেজন্য বনবিভাগ ও ব্যাঘ্রকুলকে ধ্বংস করিতে দেয় না। ব্যাঘ্র, সর্প, বন্যবরাহ প্রভৃতি

ধ্বংস হইলে সুন্দরবনের সম্পদ রক্ষিত হইবেনা। এই সমস্ত জন্তুরও আবশ্যকতা আছে। প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য সুন্দরবনে উহাদের অবস্থানের গুরুত্ব অপরিসীম। বর্তমানে ব্যাঘ্রকুল ধ্বংস নিষিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। ব্যাঘ্রকে শুধু ভক্ষক বলিলে ভুল হইবে, উহা সুন্দরবনের রক্ষকও বটে। গবাদি পশুর কোন একটি বিশেষ অসুখ হইলে সুন্দরবনের লোকেরা বাঘের দন্ত বা উহার মস্তকের হাড় ঘসিয়া কলাপাতার মোড়ক করিয়া খাওয়াইয়া দেয়। উহাতে অসুখ আরাম হয় বলিয়া শুনা যায় বাঘে বানর, শুকর ও হরিণ ধরিয়া খাইয়া থাকে। ইহারা মৎস্য ও কাঁকড়া খায়। সুন্দরবনে পূর্বে চিতাবাঘ ছিল এখন উহা মোটেই দেখা যায় না।

বাঘের চামড়া বহু প্রয়োজনে লাগে। উহার দ্বারা জুতা ইত্যাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। বাঘের পশম, গোঁফ, কেশর, দাঁত ও হাড় দ্বারা অনেক আবশ্যকীয় দ্রব্য প্রস্তুত হয়। উহার মাংস ও জিহ্বায় মূল্যবান ঔষধ প্রস্তুত হইতে পারে বলিয়া স্থানীয় লোকের বিশ্বাস। বাঘ জীবিত ও মৃত উভয় অবস্থায় মানুষের উপকারে আসে। ইহা মানব জাতির মহাশত্রু এবং মহোপকারীও বটে। মগ জাতীয় লোকেরা বাঘের মাংস খাইয়া থাকে। নীলকমল, ভেদাখালী, কটকা, ঝাপা, মবাধূলি, ছাপড়াখালী, ত্রিকোন দ্বীপ, কাঠেশ্বর, ডিঙ্গিমারী, বৈকীরি, চুনকুড়ি, পুষ্পকাটী প্রভৃতি জঙ্গলে ব্যাঘ্রের আধিক্য দেখা যায়। সুন্দরবনের নরখাদক বা মানুষ খেঁকো বাঘ (Man eaters of Sundarbans) ও ব্যাঘ্র শিকার পদ্ধতি প্রভৃতি বিষয় পরবর্তী দুইটি অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচিত হইয়াছে।

হরিণ

হরিণ সুন্দরবনের এক মনোরম ও প্রিয়দর্শন জন্তু এবং মূল্যবান জাতীয় সম্পদ। বনানীর সর্বত্রই ইহারা বসবাস করে। সুন্দরবনে হরিণের গমনাগমনের পথ আছে, এবং এই জন্তু চলিবার সময় পদচিহ্ন রাখিয়া যায়। হরিণ দলে দলে চলিয়া আহার সংগ্রহ করে। ইহারা খুব আরামপ্রিয়। এই সৌখিন জন্তু কর্দমাক্ত স্থান মোটেই পছন্দ করেনা। তবে বাধ্য হইয়া উহাদের এই কষ্ট সহ্য করিতে হয়। পায়ে কাদা লাগিলে উহারা বিরক্তি বোধ করে এবং ঝাড়া দিয়া



ঘন সবুজ সুন্দরবনের একটি মনোরম দৃশ্য



সুন্দরবনের প্রিয়দর্শন-জন্তু ডোরা হরিণ

কাদা ফেলিতে থাকে। পৃথিবীতে ইহার ন্যায় ক্ষিপ্রগতিবিশিষ্ট জন্তু আর আছে কিনা সন্দেহ। সুযোগ পাইলেই বাঘে হরিণ ধরিয়া খায়। কিন্তু বাঘের আগমন সংবাদ পাইবামাত্রই হরিণ তীর বেগে দৌড় দেয় এবং দৌড় প্রতিযোগিতায় ব্যাঘ্র হরিণের নিকট পরাজয় স্বীকার করে। অতিমাত্রায় হুশিয়ার এই জন্তু। উহা খুব চঞ্চল এবং সর্বদা সতর্কতার সহিত চলাফেরা করে। বাদা অঞ্চলের লোকেরা বলে, ব্যাঘ্র ২০ হাত আর হরিণ ২১ হাত পর্যন্ত এক লম্ফ দিয়া যাইতে পারে। এই জন্যই সম্ভবতঃ হরিণকে সহসা ব্যাঘ্রে ধরিতে পারেনা। শিঙ্গেল হরিণ দ্রুত দৌড়াইবার সময় বৃক্ষলতার সঙ্গে যাহাতে শিঙ জড়াইয়া না যায় সেইজন্য মাথা ও শিঙ পশ্চাতে পিঠের উপর ফেলিয়া রাখে। হরিণের পদগুলি সরু ও দীর্ঘ। তজ্জন্য উহারা দ্রুত দৌড়াইতে পারে। হরিণের চক্ষু অতীব সুন্দর এবং রং রক্তাভ হরিদ্রাবর্ণ। ইহাদের গাত্রে সাদা সাদা ডোরা। সুন্দরবনে এই ধরণের ডোরাযুক্ত হরিণই অত্যধিক। কিছু কিছু কুকুরে হরিণও সুন্দরবনে আছে। এ গুলির রং খেঁকশিয়ালের বর্ণের ন্যায় এবং দন্ত কুকুরের ন্যায়। কাল ও সাদা হরিণ কদাচিৎ সুন্দরবনে দৃষ্ট হয়। সাদা হরিণের গায়ে কাল ডোরা দেখা যায়। শরণখোলা রেঞ্জের কোন কোন জঙ্গলের হরিণ খুব হৃষ্টপুষ্ট এবং ঈষৎ কাল বর্ণের।

হরিণের মাংস সর্বজাতীয় লোকে খায়। এদেশের লোকেরা হরিণের মাংস পাইলে খুব আদর করিয়া ভক্ষণ করে। তবে উহা খাসী ছাগলের ন্যায় সুস্বাদু নহে। মাংসের বর্ণ গাঢ় লাল এবং চর্বি খুব কম। একটি হরিণে একমণ পর্যন্ত মাংস হইয়া থাকে। মৃগয়া শিকার পৃথিবীর প্রায় অধিকাংশ দেশে সুপরিচিত। পুরাকালে বিভিন্ন দেশের রাজা মহারাজারা পাত্রমিত্র সহ মৃগয়া শিকারে যাইতেন। সে কথা বিভিন্ন জাতির গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে।

হরিণ সুন্দরবনের বৃক্ষের পাতা ও ফল খায়। ওড়া, কেওড়া, গোল, ধোন্দল, গেউয়া প্রভৃতি বৃক্ষের ফল হরিণেরা যত্নের সহিত ভক্ষণ করে। এই সমস্ত ফল জোয়ারের জলে দূরে নীত হয় এবং জঙ্গল মধ্যে পড়িয়া থাকে। দলে দলে হরিণ আসিয়া উহা ভক্ষণ করে। কেওড়ার পাতা ও ফল হরিণের সুখাদ্য। বানরেরা হরিণের জন্য ডাল ভাঙ্গিয়া ফল ও পাতা খাইবার নিমিত্ত নিম্নে ফেলিয়া

দেয়। বানরের সঙ্গে হরিণের সখ্যতা অত্যধিক। ব্যাঘ্র দেখিলে উহারা বিশিষ্ট ধরনের একপ্রকার শব্দ করে এবং এইরূপ বিপদসংকেত পাইবামাত্র হরিণেরা তথা হইতে পলায়ন করে। সুন্দরবনের নিকটবর্তী লোকালয়ে আসিয়া সময় সময় হরিণে ক্ষেত হইতে ধান্য খাইয়া যায়। কৃষকেরা তাড়া করিলে ইহারা ক্ষিপ্র গতিতে জঙ্গলাভ্যন্তরে পলায়ন করে। সুযোগমত আবার হরিণের বাচ্চা তাহাদের হাতে ধরা পড়ে।

ধনাঢ্য লোকে অর্থ ব্যয় করিয়া হরিণের বাচ্চা পুষিয়া থাকে। কিন্তু শিঙ উঠলে উহা শিশুদিগকে আক্রমণ করিয়া ঘায়েল করে। বড় শিঙওয়ালা হরিণকে শিঙ্গেল বলে। শিকারীর নিকট হরিণ খুবই লোভনীয় জন্তু। সুন্দরবনে হরিণ শিকার সহজ এবং দুরূহ বটে। হরিণ এত সজাগ যে গুলী করারও সুযোগ দেয়না। মানুষের গন্ধ পাইলে হরিণ তীরবেগে ছুটিতে থাকে। শিকারীর গা ঘেসিয়া বাতাস প্রবাহিত হইলে হরিণে বুঝিতে পারে। সেইজন্য শিকারীকে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিতে হয়। ধূমপান করিলে হরিণ বুঝিতে পারে, শিকারী উহার পশ্চাতে। দূর হইতে শিকারী ধূমপান করিলেও উহা হরিণের নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করে। সেইজন্য শিকারীরা শিকারের সময় ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া ধূমপান করিতে পারেনা। ব্যাঘ্র অপেক্ষা হরিণের ঘ্রাণশক্তি অধিকতর প্রখর। মানুষের বুদ্ধি কৌশলের নিকট এহেন হুশিয়ার প্রাণীদেরও মতিভ্রম ঘটে।

এদেশে বিভিন্ন প্রকারে হরিণ শিকার করা হয়। বহুকাল পূর্ব হইতে এদেশে 'টোপ' শিকার প্রচলিত ছিল। সাগর বা নদী সৈকতে বা জঙ্গলস্থ খোলা ময়দানে গর্ত খুঁড়িয়া উহার মধ্যে বসিয়া মাথার উপর বৃক্ষপত্র ও ডালপালা চাপা দিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা শিকারের আশায় বসিয়া থাকিতে হয়। কষ্টকর ও অসুবিধাজনক বিধায় 'টোপ' শিকারের চলন এখন দেখা যায়না।

শিকারীরা বৃক্ষের ডালে চড়িয়া হরিণ শিকার করিয়া থাকে। তাহারা বৃক্ষের উঁচু ডালে আরোহণ করিয়া ধূর্ততার সহিত বানরের ন্যায় কিচির মিচির শব্দ করিতে থাকে। উঁচু ডাল হইতে পাতা ও ফল হরিণকে খাইতে দেওয়া হয়। বানর হরিণ জাতির বন্ধু। মানুষের নকল শব্দকে বন্ধুর আহবান মনে করিয়া উহারা বৃক্ষতলে আসে। হরিণ উপরে তাকাইতে অক্ষম সেইজন্য

এবম্প্রকার সুযোগে শিকারীরা হরিণ শিকার করে। ইহাকে "গাছাল" শিকার বলা হয়। কৌশলে শিকারীরা এইভাবে হরিণের মতিভ্রম ঘটাইয়া উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে। শিকারীরা কোন কোন সময় বানরে বানরে ঝগড়ার অবিকল নকল করিয়া হরিণ ডাকিয়া আনে। সুন্দরবনের অধিবাসীদের মধ্যে এই ধরণের শিকার পদ্ধতি বিশেষভাবে প্রচলিত আছে। হরিণ চলার পথে যে পায়ের দাগ রাখিয়া যায়, উহাকে পোট, পাড়া বা খোঁচ বলা হয়। গাছাল শিকার ব্যতীত আরও কয়েক প্রকার শিকার পদ্ধতি আছে। সুন্দরবনের নদীতে চলিতে চলিতে নৌকা পথে নৈশ অন্ধকারে টর্চের আলোতে শিকার করাকে 'বাওন' শিকার বলে। কর্দমাক্ত স্থানে জঙ্গল মধ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া পদব্রজে শিকারকে 'মাঠাল' শিকার বলা হয়। কুকুরের সাহায্যে হরিণ শিকার করার প্রথা পূর্বে ছিল, এখনও শুনা যায়। কেহ কেহ কুকুরের সাহায্যে মধ্যে মধ্যে হরিণ শিকার করে। শুনা যায় কুকুরে স্পর্শ করিলে হরিণ নড়িতে পারেনা। আবার কুকুরের কামড়ে হরিণ মরিয়াও যায়। শিকারী জঙ্গলের মধ্যে কুকুর ছাড়িয়া দেয়। দূর জঙ্গলে হরিণ দেখিলে কুকুরে আসিয়া সংবাদ দেয়। ডুমরীয়ার এসেম সেখ ও মেহের সেখ পূর্বে কুকুরের সাহায্যে হরিণ শিকার করিত। প্রায় ৪০ বছর পূর্বের কথা। বন বিভাগের রেঞ্জার তেজেন ঘোষ গুলী করিয়া এসেমের শিকারী কুকুরকে জঙ্গল মধ্যে মারিয়া ফেলেন। এসেম ক্রুদ্ধ হইয়া রেঞ্জারের মস্তক লক্ষ্য করিয়া বন্দুকের গুলি ছুড়িতে গেলে তাঁহার ভ্রাতা মেহের শেখ ঠেকাইতে যায়। গুলী মস্তকে না লাগিয়া রেঞ্জারের হ্যাটে বিদ্ধ হয়। ফৌজদারী মোকদ্দমায় নরহত্যা করিতে উদ্যোগী হওয়ার অপরাধে এসেমের তিন বৎসর কারাদণ্ড হয়।

গুপ্ত বা চোরা শিকারীরা গ্রামাঞ্চলে হরিণের মাংস বিক্রয় করিয়া থাকে। অন্যান্য শিকারীরাও আইন লঙ্ঘন করিয়া যত্রতত্র হরিণ শিকার করিয়া আত্মতৃপ্তি লাভ করে। এইভাবে অহরহ সুন্দরবন সম্পদের অপচয় হইতেছে। কি উচ্চ পদস্থ, কি নিম্ন পদস্থ, সরকারী ও বেসরকারী ব্যক্তিদের মধ্যে এই ধরণের অনাচার সর্বদা পরিলক্ষিত হয়। অনেক সময় বিনা আদেশে দুর্বৃত্তেরা বে-পাশী বন্দুকসহ সুন্দরবনে ডাকাতি ও হরিণ শিকার উভয় কার্য সম্পাদন করে। ইহারা রাষ্ট্র ও সমাজের দুষমন।

হরিণের শিঙ এক ফুটের অধিক লম্বা হয় এবং উহার শাখা প্রশাখা হইয়া থাকে। ইহাই হরিণ শিঙের বৈশিষ্ট। যে হরিণের শিঙ চামড়া বেষ্টিত, উহাকে "ভেলভেট" বলে। স্ত্রী হরিণের শিঙ গজায় না। কেবল মাত্র পুরুষ হরিণের শিঙ হয়। শিঙয়ের তারতম্য অনুসারে উহাকে কাঠ শিঙেল, কাল শিঙেল, বুটো শিঙেল ও খোর শিঙেল বলা হইয়া থাকে। শিকারীরা সাধারণতঃ স্ত্রী ও গর্ভবতী হরিণকে শিকার করেনা। কর্তৃপক্ষ সুন্দরবন হইতে বিশেষ অনুমতি ভিন্ন হরিণ শিকার একেবারেই নিষিদ্ধ করিয়াছে। হরিণের নিরাপত্তার জন্য সুন্দরবনে কয়েকটি ঘের পৃথকভাবে রাখা হইয়াছে। উহাকে পশুপক্ষীর নিরাপদ আবাসভূমি (Sanctuary) বলা হয়। ঝাপা, নীলকমল, বায়লা-কয়লা, দুবলার ট্যাক, বিবির মাদে, আমবাড়ীয়া প্রভৃতি জঙ্গলে প্রচুর হরিণ পাওয়া যায়।

হরিণের শুধু মাংস নহে, উহার চামড়ার দ্বারাও মানুষের উপকার হয়। এই জন্তুর চামড়ায় সুন্দর জুতা প্রস্তুত হয় এবং লোকে উহা জায়নামাজ রূপে ব্যবহার করে। হিন্দুরা হরিণের চামড়া বিছাইয়া পূজার আসন করিয়া থাকে। হরিণের শিঙ দ্বারা সুন্দর ছড়ি প্রস্তুত হয়। উহার মস্তক ও শিঙের সাহায্যে সুতার মিস্ত্রীরা কাঠ দিয়া নকল হরিণের মস্তক প্রস্তুত করে। হরিণ পৃথিবীর মধ্যে একটি সুন্দর জন্তু এবং আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের বিশেষ প্রিয়। মানুষ ইহাকে অত্যন্ত আদর করে। কবি এই সৌন্দর্যশালী জন্তুর মনের কথা ব্যক্ত করিয়াছেন।

"বনের হরিণ বলে আমি কার বা ধার ধারি,
আপনার মাংস দিয়া জগৎ কর্‌লাম বৈরী।"

"সুন্দরবনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য" অধ্যায়ে হরিণ সম্পর্কে আরও বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে।

বানর ও বন্যবরাহ

সুন্দরবনের জন্তুর মধ্যে বানর তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়া আছে। বানরের আকৃতি ও প্রকৃতি সকলের জানা আছে। সুন্দরবনের মধ্যে ঝাঁকে ঝাঁকে বানর অবস্থান করে। ইহারা হরিণের পৃষ্টপোষক বলিয়া গর্বানুভব

করিয়া থাকে। নিজেরা খাইবার সময় হরিণকে ডাল ভাঙ্গিয়া বৃক্ষের পাতা ও ফল খাইতে দেয়। বানরেরা কোন কোন সময় হরিণের পিঠে চড়িয়া বেড়ায় এবং আনন্দ উপভোগ করে। সুন্দরবন অঞ্চলের লোকেরা কৌশলে জাল ফেলিয়া এবং তাড়া করিয়া বানর ধরিয়া থাকে এবং বন বিভাগের আদেশপত্র লইয়া অসংখ্য বানর ঢাকা ও অন্যত্র বিক্রয় করে। শিকারের সময় ক্রোধান্বিত বানর মানুষের হাত কামড়াইয়া দেয়। বানর বনবিভাগের অত্যন্ত বুদ্ধিমান জীব। ব্যাঘ্র দর্শনে ইহারা শুধু হরিণকে বিপদ সংকেত দিয় সরাইয়া দেয়না, মানুষকেও বিশেষ সাবধান করিয়া দেয়। দূরে ব্যাঘ্র দেখিলে বানরেরা ধপাস্ করিয়া বৃক্ষের ডাল হইতে মাটিতে পড়ে এবং নানারূপ অঙ্গভঙ্গি করে। কাঠুরিয়া ও শিকারীরা "বিপদ সংকেত" বুঝিতে পারিয়া সাবধানতা অবলম্বন করে।

বন্য বরাহ বা বুনো শূকর সুন্দরবনের সর্বত্র বাস করে। ইহাদিগকে সুযোগ পাইলে বাঘে ধরিয়া খায়। বন্য বরাহের শক্তি খুব বেশী এবং অনেক সময় ইহাদিগকে শিকার করিতে বাঘের গলদঘর্ম হইয়া যায়। শূকরগুলি প্রায় তিনহাত লম্বা হয় এবং একহাত আন্দাজ উঁচু হয়। ইহাদের বর্ণ রক্তাভ কৃষ্ণবর্ণ; ঘাড়, বুক ও পেটের লোম গোড়ার দিকে কাল এবং অগ্রভাগ শ্বেতবর্ণের হয়। সুন্দরবনের শূকরের মস্তক প্রকাণ্ড ও দাঁত খুব বড় ও প্রখর হয়। শূকরের একটি দন্ত ৬" বা ৭" ইঞ্চি হইয়া থাকে।

অন্যান্য জন্তু

সুন্দরবনের অন্যান্য জন্তুর মধ্যে "উদ্" বা ধাড়ে, সজারু, বনবিড়াল প্রভৃতি দৃষ্টিগোচর হয়। সজারুর গায়ে লম্বা কাঁটা থাকে। উদ বা ধাড়ে পোষ মানিলে উহার দ্বারা জেলেদের মৎস্য ধরায় বিশেষ সাহায্য করে সুন্দরবনে শৃগাল নাই। সম্ভবতঃ কর্দমাক্ত স্থান শৃগালের পক্ষে বাসের অনুপযোগী। ব্যাঘ্রের দাপটেও শৃগালকুল সেখানে থাকা নিরাপদ মনে করে না। পার্বত্য চট্টগ্রাম জঙ্গলের বাইসন বা বন্য গরুও সুন্দরবনে নাই। সুন্দরবনে কোথাও গণ্ডার নাই বলিয়া সকলেই জানে কিন্তু কেহ কেহ বলেন এখনও গভীর জঙ্গলের মধ্যে কোথাও গণ্ডার থাকিতে পারে। তবে একথা সত্য যে সুন্দরবনে পূর্বে বহু গণ্ডার ছিল. এবং কি কারণে এখন গণ্ডার দৃষ্ট হয়না তাহা অনেকেই বলিতে পারে না।

সুন্দরবন অঞ্চলে শ্যামনগর থানার অন্তর্গত হরিণগর গ্রামে প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে পুকুর খননের সময় মৌলভী এফাজতুল্লা সরদারের বাড়ীতে একটি বড় গণ্ডারের কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছিল। উহা এখনও সেই বাড়ীতে রক্ষিত আছে। উক্ত থানার শ্রীফলকাঠি গ্রামে গণ্ডারের কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে। ধূমঘাটে দিঘী খননের সময় ছয়টি গণ্ডারের কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছিল। প্রায় ১০০ বৎসর পূর্বে বৃদ্ধ লোকেরা শ্রীফলকাঠি ও খেগড়াঘাটের জঙ্গলে সচক্ষে গণ্ডার দেখিয়াছে। গণ্ডারের শিঙ অতীব মূল্যবান। সাধারণতঃ ইহারা তৃনভোজী। সুন্দরবনে মহিষ, গরু, ও হস্তী নাই। তবে বাগেরহাট অঞ্চলের সুন্দরবনে যথেষ্ট পরিমাণে বন্য মহিষ পাওয়া যাইত। মানসিংহ কতৃক ১৫৯০ খৃষ্টাব্দে পাঠান বিদ্রোহ দমনের পর তাঁহাকে সুন্দরবন অঞ্চলে ফতেহাবাদ সরকারের জায়গীর প্রদত্ত হয়। আইন-ই-আকবরী গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে এই অঞ্চলে তখন বহু হস্তী ও অন্যান্য বন্য জন্তু পাওয়া যাইত। সজারু এবং চিতাবাঘও সুন্দরবনে পাওয়া যাইত। বনাঞ্চলের লোকেরা পূর্বে গণ্ডার ও মহিষ শিকার করিত এবং উহার মাংস ভক্ষণ করিত। লোকে বুনো মহিষকে বয়ার বলিত এবং গ্রামের মেয়েরা হরিণ শিকারের ন্যায় বয়ার ও গণ্ডার শিকারের গল্প করিত। গণ্ডারকে "গাড়া" বলা হইত। রামপাল থানার "গাডা মারা" নামে একটি গ্রাম আছে। গণ্ডার হরিণের ন্যায় অনেকগুলি বাচ্চা প্রসব করে না। কথিত আছে যে গণ্ডার দ্বাদশ বৎসরেরর মধ্যে মাত্র একটি বাচ্চা প্রসব করে। গণ্ডারের প্রাচুর্যের জন্য সম্ভবতঃ নদীর নাম হইয়াছে গাড়া নদী। বিভারীজ সাহেব বাকেরগঞ্জের দক্ষিণে কুকুরী মুকুরী দ্বীপে শুকর ও বন্য মহিষ দেখিয়াছেন। তখন সেখানে হরিণ ছিলনা। গণ্ডার সম্পর্কে আলেকজাণ্ডার হ্যমিলটন বলেন যে ১৭২৭ খৃষ্টাব্দে বহু সংখ্যক গণ্ডার সুন্দরবনে ছিল। তিনি বলিয়াছেন যে গণ্ডার সাংঘাতিক হিংস্র জন্তু। ইহা অন্য জন্তুর মাংস সহ চামড়াও ভক্ষণ করিয়া ফেলে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মালঞ্চ ও রায়মঙ্গল নদীর মোহনার সন্নিকটে অসংখ্য গণ্ডার ছিল। দেশী শিকারীদের হাতে পড়িয়া গণ্ডার ও বন্য মহিষের বংশ ধ্বংস হইয়াছে। গ্যাণ্ডারখালীর জঙ্গল একটি বাঘের আড্ডা এবং ভয়সঙ্কুল স্থান। কেহ কেহ বলেন, এখানে এককালে বহু গণ্ডার পাওয়া যাইত। সেইজন্য জঙ্গলের নাম হইয়াছে গণ্ডারখালী বা গ্যাণ্ডারখালী।

সুন্দরবনের সর্প ও তারকেল

সুন্দরবনের সর্প ভয়ঙ্কর জীব। যেমন বাঘের ভয়, সর্পের ভয় প্রায় সেইরূপ। তবে জঙ্গলের মধ্যে সর্প অপেক্ষা বাঘ আগেই দেখা যায় এবং সাবধানতা অবলম্বন করা হয়। সর্প অতর্কিতে মানুষকে আক্রমণ করে। তবে সুন্দরবনের বাঘের আক্রমণের ন্যায় সাপের ভয় ততোধিক নহে। সুন্দরবনে যত্রতত্র সর্প আছে। বন্দুক দ্বারা অনেক সময় সর্প মারা যায় না। ইহারা কোন কোন সময় লেজ দ্বারা বৃক্ষের ডাল জড়াইয়া অধোমুখে ঝুলিয়া থাকে এবং কোন জন্তু গেলে উহাকে সহজেই আক্রমণ করিতে পারে। সুন্দরবনে বহুল পরিমাণে বিষাক্ত সর্প আছে। বড় বড় সর্পের শক্তি অসীম। উহারা বড় বড় জন্তু পেচাইয়া উপড়াইয়া ফেলিতে সক্ষম হয়। ব্যাঘ্রেরা পর্যন্ত সর্পকে বিশেষ ভয় করে। সর্প দংশনে ব্যাঘ্রও নিহত হয়।

সর্প সাধারণতঃ দুই প্রকার — বিষহীন ও বিষাক্ত। বিষধর সর্পকে তিনভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে — চৌপাশা, বোড়া এবং বীজজড়ী। কেউটা, গোখুরা, আইরাজ ও কানড়; এই চারি প্রকার সর্পই চৌপাশা শ্রেণীভুক্ত। ইহাদের প্রত্যেকের আবার প্রকারভেদ আছে। কেউটা আবার কাল কেউটা, পদ্ম কেউটা, বাঁশবুনে কেউটা প্রভৃতি। গোখুরা ৫ প্রকার — কালী গোখুরা, পদ্ম গোখুরা, খয়ে গোখুরা, হলদে গোখুরা ও নাগরাজ গোখুরা। আইরাজ অনেক প্রকার — তন্মধ্যে দুধরাজ, পাতরাজ, ভীমরাজ, শঙ্খচূর প্রসিদ্ধ। শঙ্খরাজ সর্পের বিষ সর্বাপেক্ষা সাংঘাতিক। কানড়েরও এইরূপ শ্রেণী বিভাগ আছে। কেউটা সাপের মস্তকে পদ্ম বা গোলাকার চিহ্ন আছে এবং গোখুরার মস্তকে "U" চিহ্ন আছে। কেউটা, গোখুরা ও আইরাজের ফণা আছে। কিন্তু কানড়ের ফণা হয়না। প্রত্যেকটি সর্পে সাংঘাতিক বিষ আছে। ইহাদের আঘাতে মানুষ অধিক সময় বাঁচিতে পারেনা। বহু গবেষণার পরও আজ পর্যন্ত সর্পাঘাতের কোন বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা বা ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই। গ্রাম্য ওঝারা নানা প্রকার মন্ত্র, দোয়া, তাবিজ ও বৃক্ষের শিকড় বা লতা দ্বারা কোন কোন সময় সর্পাঘাতের চিকিৎসা করিয়া থাকে। তবে উহা নির্ভরযোগ্য নহে। আমাদের দেশের লোকালয়ে কেউটা ও গোখুরা সাপ দৃষ্ট হয়। আইরাজ সর্প সুন্দরবনেই অধিক।

কেউটা সর্পের দংশনে শরীরে কন্‌কনে্‌ যন্ত্রণা হয় এবং আহত ব্যক্তি যন্ত্রণায় হাত পা ছুড়িতে থাকে। উহার মুখে ফেণা উঠে এবং বিষের ক্রিয়ায় সর্বশরীর নীলবর্ণ হইয়া যায়। ইহাবা জলাভূমিতে মানুষকে কামড়ায়। গোখুরার আঘাতে শরীরে অত্যধিক জ্বালা যন্ত্রণা হয়। ইহারা কখনও জলে কামড়ায় না। ইহাদের বিষে আক্রান্ত ব্যক্তির শরীর নীলবর্ণ হইয়া যায় এবং গুরুতর আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে মরিয়া যায়। আইরাজ ও কানড় প্রায়ই দৃষ্টিগোচর হয়না।

বোড়া (পাইথন) সর্প আকারে খুব বড় হয়। উহার প্রকার ভেদ আছে, তন্মধ্যে চন্দ্রবোড়াই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। ইহাবা অন্য সর্প ভক্ষণ করিয়া থাকে। এই সর্পকে ভয়াবহতার জন্য অজগর নাম দেওয়া হইয়াছে। ইহা শিকার করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হয়না। ইহাবা একই পথ দিয়া যাতায়াত করে। দড়ি দিয়া ফাঁসি প্রস্তুত করতঃ উহাদের গমন পথে পাতিয়া রাখিলে আটকাইয়া যায়। এই সমস্ত সর্প লম্বায় প্রায় ২৫ ফুট এবং ওজনে প্রায় পাঁচমণ পর্যন্ত হইয়া থাকে।

শঙ্খচূর সর্পের ন্যায় ভয়ংকর সর্প আব নাই। উহা দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ। হিংসা ও ক্রোধ উহার সর্বদেহে জড়িত। ছোবল মারিবার সময় শুধুমাত্র লেজের উপর দাঁড়াইয়া প্রায় মানুষের সমান উচু হইয়া থাকে। ফণা বিস্তার করিয়া এই সর্প যখন ফোঁস ফোঁস শব্দ করিতে থাকে, তখন ইহার সম্মুখে পড়িলে আর রক্ষা নাই।

হরিণবোড়া সর্প আকাবে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং হরিণ ও ছাগলের ন্যায় জন্তু আস্ত গিলিয়া খাইতে পারে। বীজজড়ি সর্পেব কালনাগিনী, রুদ্রকাল, মহাকাল প্রভৃতি প্রকার ভেদ আছে। শঙ্খরাজ সাপ খুব বড়, ফণাধারী সাপের ন্যায় ছোবল মারিবার জন্য যখন উচু হইয়া উঠে তখন ইহাদের গাত্রে কয়েকটি ভাজ পড়ে। উহা দেখিতে অতীব সুন্দব।

বাকাল সাপের তিনটি শিরা আছে। সেই জন্য উহা দেখিতে বিশেষ ধরণের। কালনাগিনীর কাল গায়ে লাল ফুলের চিহ্ন থাকে। উদয়কাল সর্প বহুরূপী। উহাতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকার বর্ণ পরিলক্ষিত হয়। যতবড় বিষধর সর্প হউক না কেন সাপুড়েরা উহার বিষদাঁত ভাঙ্গিয়া বশে আনয়ন করে। সুন্দরবন হইতে আদেশপত্র লইয়া লোকে বড় বড় সর্প ধরিয়া শহরে লইয়া আসে।

বৃহৎকায় কাঠের বাক্সের মধ্যে ফেলিয়া বাঁশের সাহয্যে ঘাড়ে করিয়া নৌকা হইতে উহা তীরে নীত হয়। এই সমস্ত সর্প ধরিয়া শিকারীরা পুরস্কার প্রাপ্ত হয় এবং বিক্রয় করিয়া অর্থ উপার্জন করে। বিগত ১৯৬১ সালে সুন্দরবনের সন্নিকটে এক গ্রামে একটি ২১ ফুট বোড়া সর্প ধরা পড়িয়াছিল। সম্প্রতি (আগষ্ট, ১৯৬৬) সুন্দরবনে একটি সাড়ে চার মণ ওজনের বোড়া সাপ ধরা পড়িয়াছে।

ব্যাঘ্রের ন্যায় সর্প মানব জাতির মহাশত্রু। কিন্তু শুনা যায়, উহারও যথেষ্ট গুণ আছে। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, বিষাক্ত সর্পের অবস্থান দেশের আবহাওয়ার পক্ষে মঙ্গলকর। দেশে সর্পকুল না থাকিলে বনে জঙ্গলে চোর, ডাকাত লুক্কায়িত থাকিয়া মানুষের সর্বনাশ করিত। সর্পের চামড়া মূল্যবান। উহা দ্বারা জুতা ইত্যাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। সাপুড়িয়ারা বড় বড় সর্প ধরিয়া আনিয়া গ্রামে খেলা করিয়া আয় উপার্জন করে এবং অবসর সময়ে গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই সাপের খেলা দেখিয়া চিত্তবিনোদন করিয়া থাকে।

দেশের প্রায় সর্বত্র সর্পকুল বাস করে। এদেশের লোকেরা সর্প, ব্যাঘ্র, কুমীর প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর সহিত যুদ্ধ করিয়া বাঁচিয়া আছে। কবি বলিয়াছেন;

> "বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আমরা বাঁচিয়া আছি
> আমরা হেলায় নাগেরে খেলায়, নাগেরই মাথায় নাচি"।

এদেশে একটা জোর প্রবাদ আছে, "বাঘের দেখা, (আর) সাপের লেখা"। আমাদের দেশে সর্প সম্পর্কে অনেক কাহিনী আছে। রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী অঞ্চলে অসংখ্য সাপ আছে। সেখানকার লোকেরা বলে যে জনৈক সাপুড়িয়া অসংখ্য সাপ লইয়া নৌকাযোগে অন্যত্র যাইবার সময় নদীতে নৌকাসহ ডুবিয়া যায়। সাপুড়িয়া অর্থের মায়ায় বৃহত্তম সাপটির লেজ ধরিয়া থাকে এবং সমস্ত সর্প ঐ সর্পের চতুর্দিকে ঘুরিতে থাকে। পরে সাপুড়িয়া বড় সাপটিকে ছাড়িয়া দিলে সমস্ত সাপ একযোগে মহানন্দা নদীর পূর্ব তীরের জঙ্গলে প্রবেশ করে। তখন হইতে ঐ অঞ্চলে সাপের আধিক্য বাড়িয়া যায়। গল্পটি কতদূর সত্য জানিনা।

পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র বিভিন্ন প্রকার সর্প বিরাজমান। পাহাড়িয়া অঞ্চলেও যথেষ্ট সর্প আছে। কিছুদিন পূর্বে আসামের এক জঙ্গলে একটি

বিরাটকায় পাইথন বৃক্ষে জড়াইয়া থাকে। তথাকার লোকেরা বৃক্ষটির দুইদিক ছেদন করিয়া সর্পটিকে সেই অবস্থায় শহরে লইয়া আসে। একবার খুলনা শহরে এক দ্বিতল গৃহের কামরায় দুইটি সর্প প্রবেশ করে। সর্প দুইটি যখন ফোঁস ফোঁস শব্দ করিতেছিল তখন ঘুমন্ত লোকটি জাগিয়া উঠে এবং সতর্কতার সহিত বাহিরে গিয়া প্রতিবেশীদের জানায়। পরে সর্প দুইটিকে গুলী করিয়া মারা হয়। রাত্রে ঘরের মধ্যে বিষধর সর্প প্রবেশ করিয়া মানুষ দংশন করিবার ঘটনা বিরল নহে। চৌকির নীচে কেউটা সাপের ফোঁস ফোঁস শব্দে নিদ্রাভঙ্গ এবং অনুরূপ ভয়াবহ বিপদের কথাও শ্রুত হয়। আমাদের এক বন্ধুর সহিত একটি সর্পের চাক্ষুষ সাক্ষাৎ হয়। সুন্দরবনের নিকটবর্তী ধানের জমিতে ভেড়ীর উপর দিয়া চলিবার সময় সর্পটি অকস্মাৎ ফণা বিস্তার করিয়া উক্ত বন্ধুর সমান উঁচু হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। সে কি ভীষণ অবস্থা! উভয়ই পরস্পর মুখোমুখী, উভয়ের চক্ষু উভয়ের দিকে নিক্ষিপ্ত। কিন্তু আক্রমণ করিবার কোন অস্ত্র নাই। কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকার পর সৌভাগ্যক্রমে সর্পটি স্বীয় গর্তের মধ্যে অন্তর্ধান হয়।

সর্প ভয়ংকর জীব। কিন্তু সুযোগ পাইয়াও অনেক সময় উহারা মানুষকে ছোবল মারে না। গাত্রে স্পর্শ বা আঘাত লাগিলে উহারা মানুষ দংশন করিয়া থাকে। এইরূপ আকস্মিক আক্রমণে সবসময় মানুষের মৃত্যু হয়না। জানিয়া শুনিয়া সর্পে আঘাত করিলে, মানুষ বিষে জর্জরিত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করে।

একদা সুন্দরবন অঞ্চলে একটি লোক বিষধর সর্প ধরিয়া উহার বিষ দাঁত ভাঙ্গিয়া দেয় এবং সর্পটিকে লইয়া কিছুক্ষণ খেলা করিতে থাকে। হঠাৎ একদিন খবর পাওয়া গেল ঐ সাপের কামড়ে লোকটির মৃত্যু হইয়াছে। বিষদাঁত ফেলিয়া দিলেও নাকি পুনরায় অমাবস্যা বা পূর্ণিমার কোন এক তিথিতে নূতন বিষ দাঁত গজায়। এদেশে একটি প্রবাদ আছে যে, সাপুড়িয়াকে সাপের হাতেই প্রাণ দিতে হয়। কিছুদিন আগে লাহোরের জনৈক চিত্র তারকা স্যুটিংএর সময় সর্পাঘাতে প্রাণত্যাগ করে।

সুন্দরবনের লোকেরা বিপদে পড়িলেও উহা প্রতিহত করিবার উপায়ও জানে। সুন্দরী, কেওড়া প্রভৃতি বৃক্ষে পরগাছা জন্মিয়া থাকে এবং উহার গোড়ায় 'চিলে' নামক একপ্রকার পদার্থ পাওয়া যায়। নৌকার ছিদ্র দিয়া পানি

প্রবেশ বন্ধ করিতে হইলে নৌকার তলদেশে ঐ চিলে যেলিয়া দেওয়া হয়। উহা ছিদ্রের মধ্যে প্রবেশ করিলে পানি প্রবেশ বন্ধ হইয়া যায়। একদা জনৈক ব্যক্তি চিলে সংগ্রহ করিবার জন্য বৃক্ষে আরোহণ করে এবং উহা ভাঙ্গিবার সময় একটি বিষাক্ত সর্প অকস্মাৎ ফণা বিস্তার করিয়া তাহার হস্তে ছোবল মারে। তৎক্ষণাৎ সঙ্গীরা তাহার হাতের বাহুর দিকে জোরে কাপড় বাঁধিয়া দেয়। তাহাতে শরীরের মধ্যে সর্পবিষ প্রবেশ করিতে পারে না। সর্পের বিষ হৃদপিণ্ডে পৌছিলে আক্রান্ত ব্যক্তি প্রাণত্যাগ করে। উক্ত লোকটির হস্তখানার সর্বত্র বিষে কালিমাময় হইয়া যায়। তাহার বন্ধন না খুলিয়া হাসপাতালে আনা হয়। বিষ বাহির করায় লোকটি বাঁচিয়া যায়, কিন্তু চিরদিনের জন্য হস্তখানা নিষ্কর্মা হইয়া পড়ে।

বিষহীন সর্পের মধ্যে ধোড়াই প্রধান। ইহাদের মধ্যে দাঁড়াশ, ময়াল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ময়াল সাপের শক্তি ভয়ংকর। উহা লেজ দ্বারা মানুষের হাড়গোড় ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দেয়। শঙ্খনী বা সানী সাপের দুইদিকেই মুখ থাকে। উহার লেজ হয়না। ইহারা অন্য সাপ ধরিয়া খায়। ইহাও বিষাক্ত সাপের অন্তর্গত। লাউডোব সাপ আঙ্গুলের ন্যায় মোটা এবং দেড় হাত লম্বা হয়। উহার বর্ণ সবুজ। এই সর্প গোলগাছ ও অন্যান্য বৃক্ষের বর্ণের সহিত মিশিয়া থাকে। বিষহীন সর্প প্রায়ই মানুষ কামড়ায় না এবং কামড়াইলেও মানুষ মরেনা। সুন্দরবনের গোলগাছে আর এক প্রকার মাথা মোটা সাপ থাকে। উহা মানুষ কামড়ায় না।

গুইসাপ বা তাবকেল সর্পের আকৃতিবিশিষ্ট না হইলেও উহাকে সর্প-শ্রেণীভুক্ত করা হয়। সুন্দরবনে অসংখ্য গুইসাপ আছে। বহুলোক ইহা ফাঁসী দিয়া বা স্বহস্তে শিকার করিয়া জীবন ধারণ করে। গুইসাপের চামড়ার মূল্য অত্যধিক এবং উহা দেশ বিদেশে রপ্তানি হয়। গুইসাপের চামড়ায় জুতা ও অন্যান্য জিনিষ প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই চামড়া প্রচুর পরিমাণে জাপানে রপ্তানি হয় এবং উহার ব্যবসায়ের দ্বারা অনেকে বিশেষ লাভবান হইয়া থাকে। গুই সর্প বিশেষ উপকারী জীব। ইহা মানুষ দংশন করে না এবং বিষাক্ত সর্প দংশন করিলে উহা ধরিয়া ভক্ষণ করে। সম্প্রতি গুই সাপ শিকার নিষিদ্ধ হইয়াছে। সুন্দরবনের

লোকে ইহাকে 'তারকেল' বলে। উত্তর অঞ্চলের লোকেরা ইহাকে গুড়গুড়েল বা 'ঘোড়েল' এবং বরিশালের লোকেরা 'গুইল' বলে। ইহাকে রামগুই বা রামগদীও বলা হয়। গুই সাপের চামড়া খুলিয়া ফেলিলেও কয়েক ঘণ্টা বাঁচিয়া থাকে।

বৃহৎকায় সর্প বা ব্যাঘ্র যখন জঙ্গলের মধ্য দিয়া চলাফেরা করে, তখন শালিক ও অন্যান্য পক্ষী কিচির মিচির শব্দ করিয়া সকলকে হুশিয়ার করিয়া দেয়।

সুন্দরবনের অতিকায় অজগর সম্পর্কে অনেক সত্য মিথ্যা ও অতিরঞ্জিত গল্প এদেশে প্রচলিত আছে। কথিত আছে যে একদা একদল কাঠুরিয়া কার্য সমাপনান্তে জঙ্গলের মধ্যে বিশ্রামালাপ করিতেছিল। সেইস্থানে তাহারা একটি লম্বা পুরাতন বৃক্ষ পতিত অবস্থায় দেখিতে পায়। উহার এক প্রান্ত নদীর মধ্যে অন্যপ্রান্ত জঙ্গলে প্রবেশ করিয়াছিল। কেহ কেহ উহার উপর বসিয়া গল্প করিতেছিল। তাহাদের মধ্যে একজন হুকায় ধূমপান করিয়া কল্কের আগুন বৃক্ষের উপর রাখিবামাত্র উহা নড়িয়া উঠে এবং ধীরে ধীরে নদীর মধ্যে চলিয়া যায়। সকলে ইহাকে একটি বহুকালের পুরাতন সর্প বলিয়া বুঝিতে পারে। বহুদিন ধরিয়া একই স্থানে পড়িয়া থাকার জন্য উহার শরীরে ময়লা জমিয়া গিয়াছিল। সেইজন্য কেহই উহা সাপ বলিয়া ধরিতে পারে নাই। এই গল্প শ্রবণ করিলে আরব্য উপন্যাসে বর্ণিত সিন্দবাদ নাবিকের জাহাজ হইতে দ্বীপে অবতরণ এবং তিমি মৎস্যের কাহিনী মনে পড়িয়া যায়। গল্পটি আজগুবি মনে হয়। তবে একেবারে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। সর্প ও ব্যাঘ্র সম্পর্কে এই ধরনের অসংখ্য রোমাঞ্চকর কাহিনী এতদঞ্চলে শ্রুত হয়।

অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা বলেন যে সর্পে যখন কর্ণ দিয়া শ্রবণ করে তখন চক্ষু দিয়া দেখিতে পারে না এবং চক্ষু দিয়া দেখিলে কর্ণে শ্রবণ করিতে পারে না। চক্ষু এবং কর্ণের একই ইন্দ্র বলিয়া সাপুড়িয়াগণ বাঁশী বাজাইয়া সর্প ধরিয়া থাকে। কথিত আছে যে বিষাক্ত সর্পে মানুষ দংশন করিলে সেই ব্যক্তি যদি সর্পকে স্বীয় দন্তের দ্বারা কামড়াইয়া দিতে পারে তবে সে বাঁচিয়া যাইবে এবং সর্প মরিয়া যাইবে। ইহা কতদূর সত্য জানি না।

গুইসাপ ও বিষাক্ত সর্প সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলিয়া অত্র প্রসঙ্গ শেষ

করিব। সুন্দরবনের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের কেহ কেহ গুইসাপ শিকারে অভ্যস্ত। ব্যাঘ্র ও হরিণ শিকারে আগ্নেয়াস্ত্র প্রয়োজন হয়। কিন্তু গুইসাপ ধরিতে উহার কোন আবশ্যকতা নাই। বহু দরিদ্র লোক অভাবের তাড়নায় গোপনে জঙ্গলে প্রবেশ করিয়া গুইসাপ শিকার করে। এক একটি দলে কোন কোন সময়ে ৩০।৪০জন লোক থাকে। বিগত ইংরাজী ১৯৫০-৫২ সালের দুর্ভিক্ষের সময় অনেক লোকে বানর, গুইসাপ ও হরিণ ধরিয়া জীবিকা অর্জন করিত। একদলে প্রায় শতাধিক লোক জঙ্গলে প্রবেশ করিয়া গুইসাপ ও হরিণ তাড়া করিত। মানুষের চিৎকারে জঙ্গলের হিংস্র পশুরাও সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িত। একই সঙ্গে বহু লোকের হৈ হল্লায় ব্যাঘ্রও ভীত হইয়া অন্য জঙ্গলে পলায়ন করিত। তাড়া পাইয়া হরিণেরা দলে দলে নদীতে ঝাপাইয়া পড়িত এবং হাঙ্গর কুমীরের ভয় না করিয়া লোকে হরিণ ধরিয়া বাড়ীতে আনিয়া গো-শাবকের ন্যায় গোয়ালে বাঁধিয়া রাখিয়া পরে বিক্রয় করিত। গুইসাপ ধরার পদ্ধতি আরও বিপজ্জনক। এক দলভুক্ত লোকেরা জঙ্গলের একাংশ ঘিরিয়া গুইসাপ তাড়া করিয়াছে, জঙ্গলের প্রান্তে আসিয়া দেখা গেল কয়েকটি গুইসাপ ধরা পড়িয়াছে। সকলে একত্রিত হইয়া দেখিল তাহাদের একজন নাই। ঐ ব্যক্তির খোঁজ করা হইতে লাগিল। যে লাইনে তাহার যাইবার কথা ছিল সেই লাইন ধরিয়া অগ্রসর হইয়া দেখা গেল লোকটি প্রকাণ্ড বৃক্ষের ফাঁপার মধ্যে মাথা ও দেহ প্রবেশ করাইয়া দিয়াছে। এই প্রকার ফাঁপা বা গর্তকে সুন্দরবনের লোকে 'ঢোড়' বলিয়া থাকে। এমতাবস্থায় লোকটির শুধু পা দুইখানার শেষভাগ দৃষ্টিগোচর হইতেছে। তাড়া পাইয়া শিকারীদের ভয়ে গুইসাপ ঐ বৃক্ষের ফাঁপায় ঢুকিয়া যায় এবং শিকারের নেশায় লোকে ঐ বৃহৎকায় ফাঁপার মধ্যে প্রবেশ করিয়া হস্ত দ্বারা গুইসাপ ধরিতে চেষ্টা করে। ঐ অবস্থায় লোকে গুইসাপের লেজ ধরিয়া থাকে কিন্তু বাহির হইবার উপায় নাই। পদদ্বয় টানিয়াও তাহাকে বাহির করা একেবারেই অসম্ভব। উহাতে তাহার দেহের চামড়া ছিঁড়িয়া যাইবে। এমতাবস্থায় সকলে মিলিয়া কুঠার দ্বারা বৃক্ষ ছেদন করিয়া মানুষ বাহির করিবার চেষ্টা করে। ছেদন করিয়া অনেক সময় লোক বাহির করা যায়, আবার কদাচিৎ মানুষের বুকে বা মস্তকে কুঠারাঘাত লাগিয়া জীবনলীলা সাঙ্গ হয়। এইভাবে

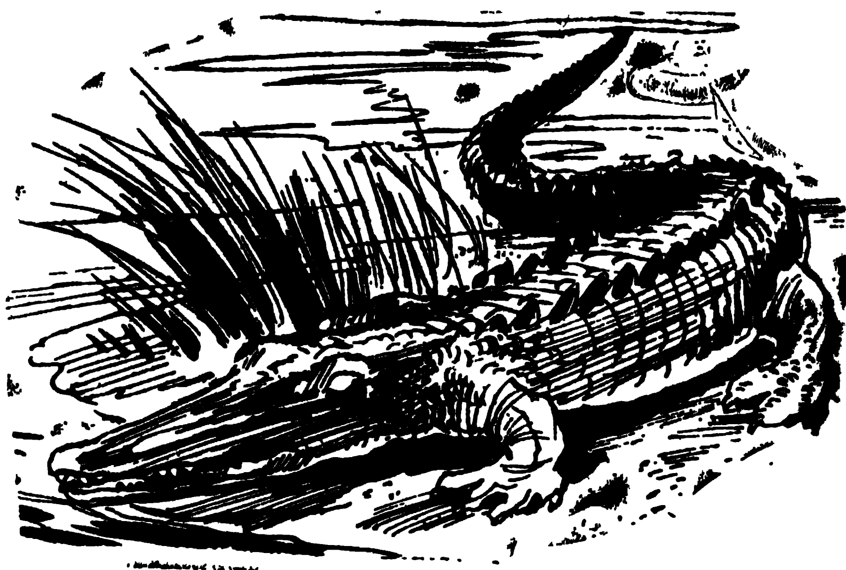
কুঠারাঘাত বুকে বা মস্তকে লাগিয়া কোন কোন হতভাগার জীবন শেষ হইয়া গিয়াছে। এই ধরণের মর্মন্তুদ ঘটনা সুন্দরবনে সংঘটিত হয়।

শিকারীরা গুইসাপ ধরাব সময় নেশার ঝোকে যখন ঢোড়ের মধ্যে হস্ত প্রবেশ করাইয়া দেয় তখন কোন কোন সময় গর্তের মধো লুক্কায়িত বিষাক্ত সর্পের কামড়ে মানুষ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। সুন্দববনের দরিদ্র লোকেরা রুজী রুটির সন্ধানে এইভাবে কোন কোন সময় জীবনপাত করিয়া থাকে।

একদা সুন্দববন অঞ্চলেব জনৈক গুইসাপ শিকারী বিনা প্রবেশ পত্রে গুইসাপ ধরিতে গিয়া বৃক্ষেব ঢোড়েব মধ্যে স্বীয় হস্ত চালাইয়া দেয়। অকস্মাৎ একটি বিষাক্ত সর্পে তাহাব বাম হস্তের মধ্যাঙ্গুলি কামড়াইয়া দেয়। লোবটি বিষের যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতে থাকে। সে সঙ্গীদের উক্ত আঙ্গুলটি কাটিয়া দিতে বলে। কিন্তু কেহই তাহাতে রাজী হয় না। তৎক্ষণাৎ উক্ত লোকটি নিজে আঙ্গুলটি বৃক্ষের উপর রাখিয়া দা দিয়া কাটিয়া জীবন বক্ষা করে। আমরা এই দুঃসাহসী লোকটিব সহিত সাক্ষাৎ কবিতে চাঁদনীমুখো গ্রামে যাই। ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল ঃ "পেটেব জ্বালায় বিনা আদেশ পত্রে জঙ্গলে প্রবেশ করিয়াছিলাম। আঙ্গুলেব বিষাক্ত অংশ কাটিয়া ফেলিয়া জীবন রক্ষা করি। অনোন্যপায় হইয়া উপস্থিত বুদ্ধিমত এই কার্য করি। আমি মারা গেলে সঙ্গীদের আমার জীবনের কৈফিয়ত দিতে হইত।" সুন্দরবনে একশ্রেণীর লোক এই ভাবে জীবন বিপন্ন করিয়া রুজী রুটির সন্ধানে বন হইতে বনান্তরে ঘুরিয়া বেড়ায়। বৈচিত্রময় ইহাদেব জীবন কাহিনী। ইহারা অসীম সাহসী ও দুর্জয়।

জলজন্তু — কুমীর

সুন্দরবনের সমস্ত নদী ও খালে অসংখ্য কুমীর বাস করে। এই জলজন্তু অতিমাত্রায় শক্তিশালী এবং হিংস্র। বড় কুমীর লেজসহ ২০´ ফুট পর্যন্ত দীর্ঘ হইয়া থাকে। ব্যাঘ্রের ন্যায় এই জন্তু শিকারে বিশেষ কষ্ট স্বীকার করিতে হয় না। কুমীর ও হাঙ্গরের ভয়ে সুন্দরবন ও উহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে কোথাও নদী বা খালে নামিয়া স্নান করা বা সাঁতার দেওয়া একরূপ অসম্ভব। জীবজন্তু বা মানুষ নদী ও খালে অবতরণ করিলে কুমীর ও হাঙ্গরে আক্রমণ করে। ব্যাঘ্রে ভীমবেগে নদী সাঁতরাইয়া পার হয়। ঐ অবস্থায় কুমীর উহাদের



কুমীর—১২০



হাঙ্গরে আক্রান্ত মানুষ—১২৪

আক্রমণ করিতে পারে না। কুমীর শিকারী জন্তু। অনেক সময় নৌকার উপর হইতে লম্ফ দিয়া মানুষ শিকার করিয়া নদীর মধ্যে ফেলিয়া ভক্ষণ করে। সুন্দরবন অঞ্চলে একদল ব্যবসায়ী অর্থোপার্জনের জন্য কুমীর শিকার করিয়া থাকে। তাহারা বন বিভাগ হইতে আদেশপত্র লইয়া সুন্দরবনের নদীতে আলোর সাহায্যে রাত্রের অন্ধকারে কুমীর শিকার করে। শিকারীদের প্রতাপে কুমীরের বংশ ধ্বংস হইতে চলিয়াছে। বর্তমানে কুমীর শিকার নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। কুমীরের দন্ত ও চামড়া মূল্যবান পদার্থ। উহার তৈল ও চর্বি বহু উপকারী কাজে লাগে। কুমীরের জিহ্বা নাই। উহার লেজে সাংঘাতিক শক্তি ধারণ করে। লেজের সাহায্যে কুমীরে শিকার সংগ্রহ করে।

ব্যাঘ্র অপেক্ষা কুমীর শিকার সহজ। নৈশ অন্ধকারে আলো দেখিলেই কুমীর দাঁড়াইয়া যায়, একটুও নড়িতে পারে না। এমতাবস্থায় লৌহ নির্মিত এক প্রকার প্রখর অস্ত্রের আঘাত করিলে কুমীর যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতে থাকে। উক্ত অস্ত্রের সঙ্গে শক্ত দড়ি বাঁধিয়া ছাড়িয়া দিতে হয় এবং কিছুক্ষণ ছুটাছুটির পর কুমীর ক্লান্ত হইয়া মরিয়া যায়। সুন্দরবন অঞ্চলে ঐ অস্ত্রকে চবক বলে। অনেক সময় প্রথম চবকের আঘাতের পর আরও দুই তিনটি আঘাত করা হয়। পরে শিকারী দড়ি টানিয়া কুমীরকে নিকটে আনিয়া কুঠার দ্বারা স্কন্ধে আঘাত করিয়া মারিয়া ফেলে। কোন কোন স্থানে কুমীরের গাত্রে অস্ত্রাঘাত করিয়া দড়ির সহিত কলাগাছ বাঁধিয়া ভাসাইয়া দেওয়া হয়। পার্শ্বেই নৌকারোহণে শিকারী পাহারা দিতে থাকে এবং কুমীর মরিয়া গেলে ধরিয়া উঠায়। লৌহ নির্মিত অস্ত্রের অগ্রভাগে হলুদ মিশ্রিত করিয়া দিলে, উহাতে বিষের ন্যায় যন্ত্রণা উঠিয়া কুমীরের জীবনলীলা সাঙ্গ হয়। কুমীর এক অদ্ভুত জন্তু। নদীর মধ্যে অথবা কর্দমাক্ত স্থানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া সে মৃতের ন্যায় পড়িয়া থাকে। এইভাবে ওত পাতিয়া সে শিকার ধরে। উহার গতি ক্ষিপ্র এবং দূর হইতে নদী তীরে যেখানে মানুষে স্নান করে সেখানে আসিয়া হঠাৎ মানুষ ধরিয়া লইয়া যায় এবং নিঃশঙ্ক চিত্তে উদরস্থ করিয়া থাকে। কোন কোন সময় কুমীরের পেটের মধ্যে নারীদের ব্যবহৃত মূল্যবান গহনাপত্র পাওয়া গিয়াছে। অনেক সময় কুমীরে গবাদি পশু ধরিয়া ভক্ষণ করে।

কুমীরের আয়ুষ্কাল সম্পর্কে প্রাণী বিজ্ঞানীরা আজ পর্যন্ত কোন সঠিক তথ্য দিতে পারেন নাই — দেওয়াও দুষ্কর। তবে শুনা যায় একটি কুমীরের আয়ু ২০০ শত বৎসর পর্যন্ত হইয়া থাকে। কুমীর উভচর প্রাণী। তবে স্থলভাগ অপেক্ষা জলস্থলীতে উহার গতি ক্ষিপ্র। কুমীরের চক্ষুদ্বয় মস্তকের উপরিভাগে অবস্থিত। শুধু চক্ষু দুইটি ভাসাইয়া সে দূর হইতে শিকারের সন্ধান করিতে পারে। কুমীরের পক্ষে উহা বিশেষ সুবিধা। কুমীরের দন্তগুলি অত্যন্ত ধারাল। এই জন্তু যখন মুখ বন্ধ করে, তখন এক পাটীর দাঁত অন্য পাটীর দাঁতের ফাঁক দিয়া ঢুকিয়া যায়। সাধারণ কুমীরের ডিম তারতম্য অনুসারে হাঁস বা মুরগীর ডিমের ন্যায় হইয়া থাকে। একটি স্ত্রী কুমীর প্রায় ৫০টি পর্যন্ত ডিম পাড়িয়া থাকে। ইহারা নদী বা সমুদ্র তীরবর্তী স্থানে ডিম পাড়ে। ডিম তা দেওয়ার কয়েকদিন পরে খোসার মধ্য হইতে বাচ্চা বাহির হইয়া নদীতে সাঁতার খেলে। এইসব বাচ্চার আর কোন প্রকার যত্ন লইতে হয় না। স্ত্রী ও পুরুষ উভয় জাতীয় কুমীর স্বীয় বাচ্চা ধরিয়া উদরস্থ করে। সম্ভবতঃ সেইজন্য কুমীরের সংখ্যা আশানুরূপ বাড়িতে পারে না। কুমীরের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার একমাত্র উপায় উহার দুই চক্ষে অঙ্গুলি প্রবেশ করাইয়া দেওয়া। এইরূপ প্রক্রিয়ার দ্বারা কোন কোন লোক কুমীরের আক্রমণ হইতে রক্ষা পায়।

কুমীর ও ব্যাঘ্রের ন্যায় নরখাদকে পরিণত হয়। একবার মানব রক্ত পান করিলে, উহার হিংস্র স্বভাব অতিমাত্রায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। মানুষ খেঁকো কুমীর দূর হইতে শিকারের প্রতি লক্ষ্য করে। বড় বড় নৌকার মাঝিরা চৌকির উপর উচ্চ স্থান হইতে হা'ল চালনা করিয়া নৌকার গতি নিয়ন্ত্রণ করে। শিকারী কুমীর দূর হইতে উহা লক্ষ্য করিয়া অতীব সন্তর্পণে হা'লের নিকট যাইয়া ভীষণ জোরে ধাক্কা দেয়। অকস্মাৎ ধাক্কায় মাঝি নদীতে পড়িয়া গেলে কুমীর তাহাকে উদরস্থ করে। সুন্দরবনের নদীতে এই ধরণের ঘটনা শ্রুত হয়। কোন কোন সময় কুমীর শক্তিশালী লেজের সাহায্যে নৌকার উপর হইতে মানুষ শিকার করে। একবার সুন্দরবনের কোন নদীতে নৌকার উপর একজন বাওয়ালী মল ত্যাগ করিতেছিল। কুমীর দূর হইতে উহা লক্ষ্য করিয়া লেজ দ্বারা ঐ বাওয়ালীকে নদী মধ্যে টানিয়া লইয়া ভক্ষণ করে।

পূর্বেই বলিয়াছি ব্যাঘ্রের শক্তির নিকট কুমীর দুর্বল। কিন্তু উহারও ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে। এ সম্পর্কে সুন্দরবনে কয়েক বৎসর পূর্বে একটি মজাদার ঘটনা ঘটিয়াছিল।

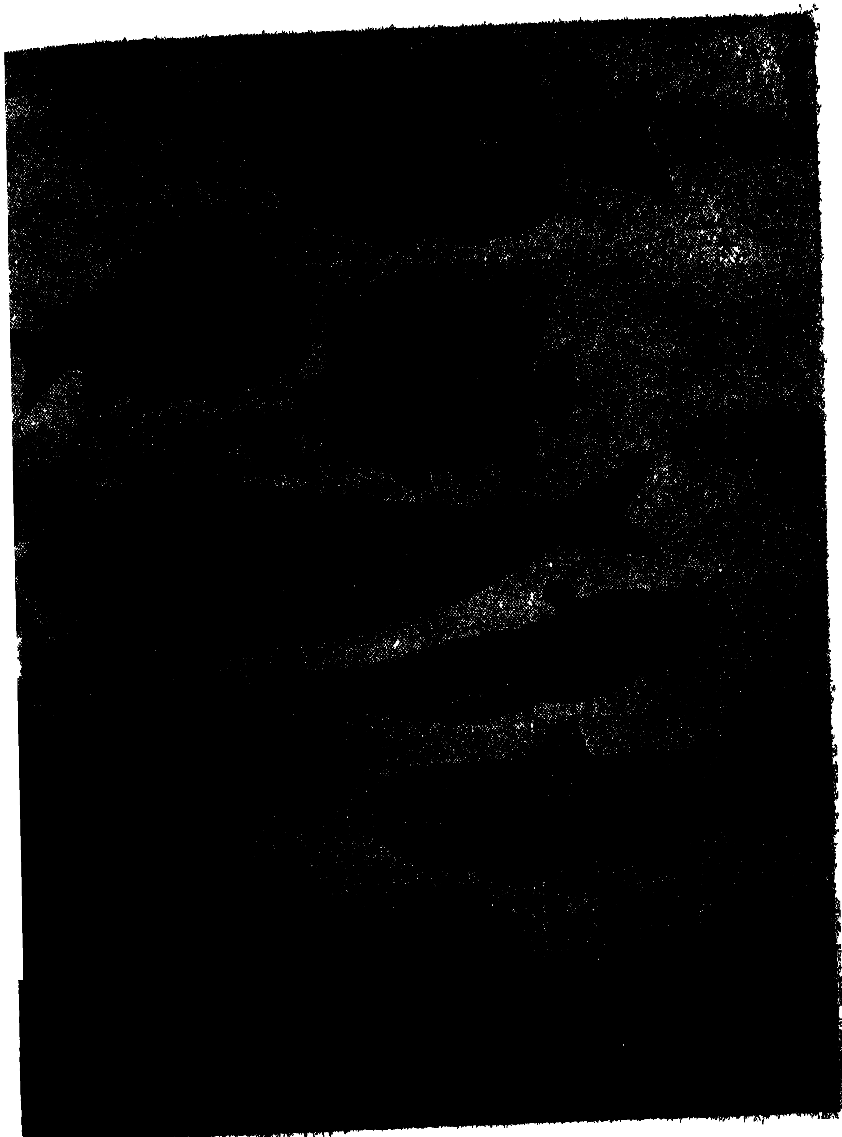
শ্যামনগর থানার দক্ষিণে হরিনগর গ্রাম। সুন্দরবনের প্রান্ত সীমায় এই গ্রাম অবস্থিত। হরিনগর গ্রামের লোকেরা বাড়ীতে বসিয়া ব্যাঘ্রের ডাক ও হরিণের চিৎকার শ্রবণ করে। ব্যাঘ্র হরিণের নিকট এই সীমানা কিছুই নয়। দিবারাত্র হরিণ ও ব্যাঘ্রকুল লোকালয়ের শব্দ ও কোলাহল শুনিয়া থাকে। যাহা হউক, হরিনগরের এক খালে মৎস্য ধরিবার জন্য স্থানীয় লোকেরা বাঁধ নির্মাণ করিয়া উহার উপরে উচ্চে একটি টোঙ বা কুঁড়েঘর বাঁধে। রাত্রিতে ঐ সুউচ্চ টোঙের উপর তিনজন লোক বাঁধ ও মৎস্য ধরিবার যন্ত্রপাতি পাহারা দিত। দক্ষিণ দিকে সুন্দরবনের একটি মানুষ খেঁকো ব্যাঘ্র ঐ ব্যক্তিদের আক্রমণ করিবার জন্য ওত পাতিয়া থাকে। ব্যাঘ্র সম্ভবতঃ কয়েকরাত্রি ধরিয়া সুযোগ খুঁজিতেছিল। কিন্তু সুউচ্চ টোঙের উপর কি ভাবেই বা সে মানুষ শিকার করিবে? অবশেষে ব্যাঘ্রটি নররক্তের নেশায় একেবারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠে। এদিকে টোঙের নীচে খালের মধ্যে একটি মানুষ খেঁকো কুমীর মানুষ ধরিবার জন্য সুযোগ খুঁজিতেছিল। ব্যাঘ্র ও কুমীর উভয়ের উদ্দেশ্য মনুষ্য শিকার। টোঙের লোকেরা ঘুণাক্ষরেও ব্যাঘ্র ও কুমীরের এহেন ভয়াবহ ষড়যন্ত্রের বিষয় জানিতে পারে নাই। তাহারা নিশ্চিন্তে শুইয়া নিশি যাপন করিতেছে। এমন সময় ব্যাঘ্রটি অসম্ভবকে সম্ভব করিবার আশায় হিংস্র লালসার বশবর্তী হইয়া টোঙের মানুষ লক্ষ্য করিয়া ভীমবেগে লম্ফ প্রদান করিল। সৌভাগ্যক্রমে ব্যাঘ্রটি বিফল মনোরথ হইয়া বাঁধের পার্শ্বে ধপাস্ করিয়া জলের মধ্যে পড়িয়া গেল। এহেন সুযোগে মানুষ খেঁকো কুমীর তৎক্ষণাৎ ভীষণ জোরে ব্যাঘ্রের পা কামড়াইয়া ধরিল। বহু চেষ্টা করিয়াও ব্যাঘ্রটি কুমীরের সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইল। উহার পা কিছুতেই কুমীরের মুখ হইতে ছাড়াইতে পারিল না। দুইটি ভীষণ জন্তুর এই যুদ্ধের শব্দে চারিদিক হইতে লোকজন আসিয়া পড়িল। তাহারা কুঠার দ্বারা ব্যাঘ্রটিকে আঘাত করিয়া ধরাশায়ী করিল। অতি লোভের জন্য ব্যাঘ্রটি এইভাবে প্রাণ হারাইল। কুমীরটিকে লোকে মারিতে পারিল না।

গল্পটি সত্য এবং বিশ্বস্ত সূত্রে জানিয়া লিপিবদ্ধ করিলাম। "জলে কুমীর আর ডাঙ্গায় বাঘ" কথার তাৎপর্য এখানে বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

ব্যাঘ্র, কুমীর ও সর্পের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াও মানুষের বাঁচিয়া থাকিতে হয়। সুন্দরবন অঞ্চলের অধিবাসীদের কুমীর ও ব্যাঘ্রকে ভয় করিলে চলে না। হিংস্র জন্তুর সহিত যুদ্ধ করিয়া জীবন ধারণ করা তাহাদের দুঃখ এবং আনন্দ। কখনও জয় আবার কখনও পরাজয়। এই জন্য বাদা অঞ্চলের অধিবাসীরা দুঃসাহসী ও দুর্জ্জয়।

হাঙ্গর

হাঙ্গর বা কামট সুন্দরবনের এক ভয়াবহ জলজন্তু। কুমীরের পরেই জলাভূমিতে ইহাদের প্রাধান্য। তবে এই জন্তু কুমীর অপেক্ষা অধিকতর হিংস্র। সুন্দরবনের নদীনালায় অসংখ্য হাঙ্গর থাকে। অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সহিত হাঙ্গরে মানুষ আক্রমণ করিয়া হস্তপদ ও শরীরের অন্যান্য অংশ কর্তন করিয়া লইয়া যায়। নদীতে হাঙ্গরে মানুষ আক্রমণ করিবার পর অনেক সময় রক্ত ভাসিয়া উঠিতে দেখা যায়। ব্যাঘ্র ও কুমীর অপেক্ষা হাঙ্গরের দন্ত অধিকতর প্রখর। উহার দাঁত এতদূর ধারাল যে, কর্তন করিবার সময় কোন প্রকার শব্দ হয় না। বড় বড় হাঙ্গর ৭।৮ হাত পর্যন্ত দীর্ঘ হয়। ইহার গালের উপর দুই পাটি এবং নীচে একপাটি দন্ত আছে। সমস্ত দন্তগুলি মসৃণ মাংসপেশীর দ্বারা আবৃত। তজ্জন্য এই জন্তু যখন কাহারও গাত্রে মুখ দেয়, তখন সে কিছুই বুঝিতে পারে না। পরে চাপ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুতীক্ষ্ণ দন্তরাজি বহির্গত হইয়া মানুষকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলে। সুন্দরবন অঞ্চলে এখনও অনেক লোক জীবিত আছে, যাহাদের হস্তপদ হাঙ্গরে কর্তন করিয়া ভক্ষণ করিয়াছে। হাঙ্গর দেখিতে অনেকটা বড় পাঙাশ মৎস্যের ন্যায়। এতদঞ্চলে ধীবরদের বেড় জালে অনেক সময় হাঙ্গর ও কুম্ভীর ধরা পড়িয়া থাকে। হাঙ্গরে মূল্যবান তৈলও প্রস্তুত হয়। এদেশের লোকেরা উহাকে কামটের তেল বলে। সম্প্রতি কুমিল্লা মৎস্য বিভাগীয় গবেষণাগারে হাঙ্গরের তৈলের উৎকর্ষ বিধানে দুইটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করিয়াছে। এই গবেষণাগার দীর্ঘকাল হইতে বঙ্গোপসাগরে প্রাপ্ত হাঙ্গরের জৈব উপাদান হইতে রাসায়নিক ভেষজ প্রস্তুত করিয়া আসিতেছে। এই নয়া উদ্ভাবনীর



সুন্দরবনস্থ নদীতে নানা প্রকার মৎস্য

(১) ভেকো (২) হাঙরে (৩) পায়রা (৪) পাঙাশ (৫) কাইন বা কাঁন

(৬) ভোলা (৭) ভাঙান (৮) তপসী।

একটি হইতেছে "শার্কলিভার অয়েল ক্যাপসুলের" উৎকর্ষ বিধান এবং দ্বিতীয় সাফল্য হইতেছে "শার্কলিভার অয়েল কনসেনট্রেট।

পূর্ব পাকিস্তানের সুন্দরবন অঞ্চলে হাঙ্গর পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। ইহা যেমন মানব জাতির মহা শত্রু, তেমনই মহোপকারী। এদেশের বিশেষ আবহাওয়ায় পরিবর্ধিত ও বয়োপ্রাপ্ত হাঙ্গোরের জৈব উপাদান হইতে গঠিত বলিয়া উপরোক্ত ভেষজ ও ক্যাপসুল হজমশক্তির বিশেষ সহায়ক বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। চাক্‌মা জাতীয় লোকের নিকট হাঙ্গরের শুঁটকী অতি উপাদেয় খাদ্য। চট্টগ্রামের মগজাতীয় লোকেরা হাঙ্গর শিকার করিয়া উহা শুকাইয়া অন্যত্র রপ্তানী করে এবং যথেষ্ট লাভবান হইয়া থাকে। হাঙ্গরের পাখ্‌নার " সুপ " চীনাদের নিকট মহামূল্যবান খাদ্য

অন্যান্য জলজন্তু

শোষ বা শিশু সুন্দরবনের নদীতে প্রচুর, উহারা প্রায়ই জলের মধ্য হইতে মস্তক উঁচু করিয়া নিশ্বাস গ্রহণ করে। উহারা মৎস্য ধরিয়া ভক্ষণ করে। নদী ও খালের মুখে যেখানে মৎস্যের যাতায়াত অধিক সেখানেই উহাদের আধিক্য দেখা যায়। কুমীর ও হাঙ্গরে ইহাদের ন্যায় মৎস্য ভক্ষণ করিয়া জীবণ ধারণ করে।

সুন্দরবনের মৎস্য

বৃক্ষরাজির ন্যায় সুন্দরবনের মৎস্য এক অমূল্য সম্পদ। পূর্ব পাকিস্তান-বাসীর নিকট মাছ একটি বিশেষ আবশ্যকীয় খাদ্য। সুন্দরবনের প্রত্যেক নদীতে ও খালে এবং সুন্দরবন সংলগ্ন সাগরে পর্যাপ্ত পরিমাণে মৎস্য পাওয়া যায়। অসংখ্য লোক মৎস্য ধরিয়া জীবণ ধারণ করে। মৎস্যের ব্যবসায়েও বহুসংখ্যক লোক সর্বদা নিযুক্ত থাকে। ধীবরগণ ব্যতীত অন্যান্য জাতীয় লোকেরাও মৎস্য ধরার কার্যে বৎসরের সব সময়ে নিযুক্ত থাকে। বহু সংখ্যক নৌকা ও অসংখ্য জাল ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি মৎস্য ধরার কার্যে সর্বদা ব্যবহৃত হয়। সুন্দরবনের মৎস্য একটি বিশেষ জাতীয় সম্পদ। এই মৎস্য দেশ বিদেশে নৌকা ও জাহাজে রপ্তানী হইয়া থাকে। দুবলা দ্বীপ হইতে চট্টগ্রামের জেলেরা লক্ষাধিক মণ শুঁট্‌কী চট্টগ্রাম ও বার্মায় রপ্তানী করে। ভারতেও বহুল পরিমাণে মৎস্য রপ্তানী হইয়া থাকে। অধুনা বাজুয়া "কোল্ড ষ্টোরেজ" হইতে চিংড়ী মৎস্য আমেরিকায়

রপ্তানী হইতেছে। ভারত ও আমেরিকা ও অন্যান্য দেশ হইতে মৎস্য রপ্তানী বাবদ সরকারের যথেষ্ট বৈদেশিক মুদ্রা আয় হইয়া থাকে। সরকার মৎস্য হইতে যথেষ্ট অর্থ কর হিসাবে আদায় করিয়া থাকে। দরিদ্র এবং ক্ষুদ্র মৎস্যজীবিদের নিকট হইতে এই কর আদায় রহিত করা উচিৎ।

সুন্দরবনের মৎস্যের মধ্যে পাঙাশ, ভেটকী, পার্শে, ভাঙ্গান, ছিলিন্দে এবং গলদা চিংড়ী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কইভোলা সর্বাপেক্ষা বৃহৎ মৎস্য। উহার একটির ওজন প্রায় ২০ মণ পর্যন্ত হইয়া থাকে। এই ধরনের একটা মৎস্য কয়েক বৎসর পূর্বে গোড়ইখালীর নিকট শিবসা নদীতে বেড় জালে ধরা পড়িয়াছিল। উহার ওজন প্রায় ১৫ মণ। জেলেরা গ্রাম্য লোকের সাহায্যে এই মৎস্য তীরে আনয়ন করিতে সমর্থ হয়। চাকোলও নাম করা মৎস্য।

মুল্লে একপ্রকার বড় মৎস্য। উহার লেজ পাঁচ ছয় ফুট পর্যন্ত লম্বা এবং উহার দ্বারা শক্ত ও মজবুত ছড়ি প্রস্তুত হয়। লেজ দ্বারা অশ্বের চাবুকও প্রস্তুত করা হইয়া থাকে।

পাঙাশ মাছ খুব বড় হয় এবং উহা খাইতে সুস্বাদু। এই মাছ যত বড় হইবে উহার স্বাদ ততই বৃদ্ধি পাইবে। গ্রামাঞ্চল ও শহরের লোকেরা ইহা খুব তৃপ্তির সহিত আহার করে। পাঙাশ মৎস্য ওজনে প্রায় একমণ হয়।

ভেটকি বা ভেকট ছোট বড় সর্ব প্রকারের হয়। বড় জাতীয় মৎস্যের মধ্যে ভেট্কি খুব বিখ্যাত। ইহা ওজনে এক মণের অধিক হইয়া থাকে। ভেট্কি মাছ নদী ও খালে সর্বত্র প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। ছোট ভেট্কিকে পাতাড়ী মাছ বলে।

গলদা চিংড়ি শহরের লোকের অতি উপাদেয় খাদ্য। গ্রাম্য লোকেরা উহাকে গল্লা চিংড়ি বলে। এই মৎস্যের মাথায় একখানি করাত থাকে এবং উহার মস্তিষ্কে সুস্বাদু মগজ থাকে। এই মৎস্যের রক্ত নাই বলিলে চলে। পারশে ও ভাঙ্গান মাছ সুস্বাদু। ভাঙ্গান শোল মাছের ন্যায়। সেইজন্য লোকে উহাকে সুন্দরবনের শোল বলে। ছিলিন্দে মাছ খুব বড় হয় এবং উহা সুস্বাদু ও মূল্যবান। ছিলিন্দে আকারে পাঙাশের ন্যায় বৃহৎকায় হইয়া থাকে। চিল



হাঙর জাতীয় ও বিচিত্র ধরণের মৎস্য—১২৭

মৎস্য শুটকী করিলে অবিকল চিল পক্ষীর ন্যায় দেখায়। উহার সরু লেজ আছে। ঐ লেজ ২ হাত পর্যন্ত লম্বা হয়।

সুন্দরবনের মৎস্য ধরিবার জন্য নানাপ্রকার জাল ও সরঞ্জাম ব্যবহৃত হয়। তন্মধ্যে খেপলা জাল, কোমর, পাটাজাল, চরপাটা, ভাসানজাল, আটনজাল, বাছাড়ীজাল, খালপাটা ও বঁড়শি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

গলদা ব্যতীত চিংড়ি মৎস্যের আরও প্রকার ভেদ আছে। গলদা অপেক্ষা ছোট চিংড়িকে বাগ্‌দা বলে। ইহার মূল্য গলদা হইতে কম। এই শ্রেণীর চিংড়ি বহুল পরিমাণে বিদেশে রপ্তানী হয়। বাগ্‌দা চিংড়ি সুন্দরবনের নিকটবর্তী অঞ্চলে অধিক পরিমাণে জন্মে। এতদ্ব্যতীত ছট্‌কা ও ঘুষো চিংড়ি নামক আরও দুই প্রকার চিংড়ি মৎস্য আছে। ঘুষো চিংড়ি ক্ষুদ্রকায় এবং অল্পদামে বিক্রয় হয়।

খরশুল্যা সুন্দরবনের আর এক প্রকার মাছ। উহা নদীতে মাথা উঁচু করিয়া চলাচল করে। ধনী লোকেরা এই মৎস্যের দ্বারা গ্রাম্য পুকুরের শোভা বর্ধন করে। এতদঞ্চলে এই মৎস্যকে খল্লা বা খরুল্লা বলা হইয়া থাকে।

সুন্দরবনের সুস্বাদু দুইটি মৎস্যের নাম যথাক্রমে রেখা ও চিত্রা। রেখা মাছ বহুলাংশে কই মৎস্যের ন্যায় এবং উহার গায়ে কালো কালো ডোরা আছে। চিত্রা মৎস্য গোলাকার। উহা কয়েক প্রকারের হইয়া থাকে। সুন্দরবনের নদী নালায় দাঁতনে, রুচো, রূপচাঁদা, গাগ্‌রা, সাহারা গাগ্‌রা, ছোট গাগ্‌রা, ভেদ, মুল্লে, ভোলা, জাবা ও খয়রা প্রভৃতি সর্বত্র পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। কা'ন মাছ মাগুর মৎস্য অপেক্ষা অনেক বড় হয়। মাগুরের আকৃতি বলিয়া উহাকে কা'ন মাগুর বলা হয়। মুল্লে মৎস্য মুসলমানেরা খায় না। বদরের ছুরি ও কাক্‌ছেল অন্য দুই প্রকারের মৎস্য লোকালয়ে দৃষ্ট হয় না। সুন্দরবনের মৎস্যের অনেক প্রকার বর্ণ হইয়া থাকে। নানাজাতীয় ট্যাংরা, ফ্যাসা, গাং খয়রা ও চাপ্‌লীয়া মাছ সর্বত্র পাওয়া যায়। তপস্যা, সুরমা, করাত, লইট্যা প্রভৃতি বহুপ্রকারের মৎস্য সুন্দরবনের নদীতে ও সমুদ্রে পাওয়া যায়। অন্যান্য মৎস্যের মধ্যে চিরনদাঁতে, কাটাবোল, মরুল্ল বা চাক্‌ল মাছ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আরও বহু প্রকারের মাছ সুন্দরবনের নদী নালা ও সমুদ্রে পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে কোন কোন মাছের লেজ ও পাখ্‌না আছে, উহারা বৃক্ষে আরোহণ করিতে পারে। অন্য এক প্রকার মৎস্য কিছুদূর উড়িয়া যাইতে পারে।

কচ্ছপ ও কাক্ড়া মৎস্যশ্রেণীভুক্ত নহে। বহু হিন্দুর নিকট উহা প্রিয় খাদ্য। সুন্দরবনের পক্ষীকুল সর্বদা মৎস্য শিকার করিয়া ভক্ষণ করে। সুন্দরবনের মৎস্যজীবিদের মধ্যে চট্টগ্রামের কৈবর্ত সমাজ বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। এই সমাজের লোকেরা দুব্লা দ্বীপে বসতি স্থাপন করিয়া বহু নৌকা লইয়া সমুদ্রে মৎস্য ধরিয়া থাকে। তাঁহারা দুব্লা দ্বীপে পৌঁছিয়া প্রতি বৎসর দুইটি পূজার ঘর প্রস্তুত করে। উহার মধ্যে একটি ঘরে তাহারা দেবতার মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করে। আর একটি ঘর গাজীর নামে রাখিয়া দেয়। শেষোক্ত গৃহটিকে গাজীর ঘর বলা হয়। এইখানে তাহারা একটি পাঠা ছাগল দেবতার নামে বলি দেয় এবং আর একটি পাঠা বনদেবীর নামে অরণ্যের মধ্যে ছাড়িয়া দেয়। উক্ত পাঠা ব্যাঘ্রে ভক্ষণ করে অথবা বাওয়ালীরা বা বনকরের কর্মচারীরা ধরিয়া হালাল করতঃ উদরস্থ করে।

মৎস্যজীবিদের মধ্যে ৫০।৬০জন বহরদার বা নেতা থাকে। তাহাদের প্রত্যেকের অধীনে দুই শ্রেণীর লোক থাকে। এক শ্রেণীর লোকেরা গভীর সমুদ্রে মৎস্য ধরিতে যায়। ইহারা কৈবর্ত সমাজের লোক। অন্যদল নৌকা বোঝাই মৎস্য বাছাই (Sorting) করে। এই বাছাইকে উহারা "দলভাঙ্গা বলে। এই দলের লোকেরা মৎস্য শুকাইবার কার্য করিয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে অনেক মুসলমানও আছে। জ্বালানী ও অন্যান্য সুবিধার জন্য মাথাপিছু প্রতি বৎসর বনবিভাগকে ৪. টাকা কর দিতে হয়।

'কোণা' জালই উহাদের মৎস্য ধরিবার প্রধান সরঞ্জাম। ধীবরেরা গরাণ বৃক্ষের বাকল জলে মিশ্রিত করিয়া আগুনে জ্বালাইয়া এক প্রকার রং প্রস্তুত করে এবং উহার দ্বারা জাল ট্যানিং করিয়া থাকে। উহাতে জাল খুব শক্ত ও দীর্ঘস্থায়ী হয়। প্রতি বৎসর প্রায় লক্ষাধিক মণ শুট্‌কী মৎস্য ও হাঙ্গরের শুট্‌কী সুন্দরবন হইতে চট্টগ্রাম ও অন্যত্র রপ্তানী হয়।

মোরাদিয়া ও মানিকদিয়া খাল হইতে অসংখ্য নৌকা সমুদ্রে মৎস্য ধরে। ঐ সমস্ত নৌকা সমুদ্র হইতে মৎস্য বোঝাই করিয়া তীরে আনয়ন করে। উহা রৌদ্র ও বাতাসে শুকান হয়। জালের ন্যায় দড়ির সাহায্যে বিশিষ্ট উপায়ে মৎস্য শুকান হইয়া থাকে। ঐ সমস্ত স্থান মৎস্য পচানির গন্ধে ভরপুর হইয়া



সুন্দরবনের কয়েকটি অভিনব পক্ষী

(১) বালি হাঁস (২) মদনটাক (মদনা) (৩) ভীমরাজ (৪) কাগ

(৫) বাটাং (৬) কুকড়োবাটাং

যায়। দর্শকদের পক্ষে উহার তীব্র গন্ধে তথায় চলাচল দুষ্কর হইয়া পড়ে। কিন্তু মৎস্যজীবিদেব উহা সহ্য হইয়া গিয়াছে। অনেকগুলি ব্যবসায়ী নেতা অগ্রিম টাকা দিয়া চট্টগ্রাম হইতে মজুর আনয়ন করে। ঐ মজুরেরা নৌকা চালায় এবং মৎস্য ধরে। সমুদ্রের মধ্যে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে বড় বড় নৌকা যখন পালের সাহায্যে একত্রে যাতায়াত করে তখন উহার দৃশ্য সুন্দর দেখায়। মাছের সঙ্গে মাঝে মাঝে বিষাক্ত সর্পও সমুদ্রে ধরা পড়ে। সর্প দংশন ও ব্যাঘ্রের আক্রমণে প্রতি বৎসর দুব্‌লা দ্বীপের কিছু লোক প্রাণ হারায়।

দুব্‌লার ট্যাক্‌কে অনেকে মগের ট্যাক বলে। মগজাতীয় লোকেরাও এখানে মৎস্য ধরিয়া থাকে। মৎস্য অপেক্ষা তাহারা হাঙ্গরই অধিক পরিমাণে শিকার করিয়া থাকে। চট্টগ্রাম অঞ্চলের মগ ও চাক্‌মা জাতির লোকের নিকট হাঙ্গরের শুট্‌কী এক উপাদেয় খাদ্য। তাহারা লবন ও কাঁচা লঙ্কার সাহায্যে হাঙ্গরের শুট্‌কীর দ্বারা প্রচুর পরিমাণ ভাত খাইয়া থাকে। মগেরা হাঙ্গর ধরিয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করে। হাঙ্গরের কলিজা মূল্যবান খাদ্য। একটি বৃহৎকায় হাঙ্গরের কলিজা দেড় ফুট দীর্ঘ ও অর্ধ ফুট প্রস্থ এবং প্রায় ৩ সের পর্যন্ত ওজন হইয়া থাকে।

এই ধরনের হাঙ্গর ও মৎস্য ধরিবার কেন্দ্র সুন্দরবন অঞ্চলে আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক। তাহাতে দেশবাসীর বিশেষ উপকার সাধিত হইবে এবং বেকার ও খাদ্য সমস্যার কিছুটা সমাধান হইবে। কক্সবাজারেও একটি মৎস্য ধরিবার অনুরূপ কেন্দ্র আছে। সেখানেও সমুদ্র হইতে এইভাবে মৎস্য ধরা হয়।

মৎস্য ব্যবসায়ের আর্থিক গুরুত্ব অত্যধিক। দেশ বিদেশে এই মৎস্য বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছে। মৎস্য ধরিয়া উহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আরও কয়েকটি কোল্ড ষ্টোরেজ প্রতিষ্ঠার আবশ্যক। বৈজ্ঞানিক উপায়ে চেষ্টা করিলে, জাতীয় তহবিলে মৎস্য ব্যবসায়ের দ্বারা প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন হইবার সম্ভাবনা আছে।

পক্ষী

সুন্দরবনের প্রায় সর্বত্র পক্ষী দৃষ্ট হয়। উহারা গাছে গাছে বাসা বাঁধিয়া বাস করে এবং ঋতুর পরিবর্তনে স্থান হইতে স্থানান্তরে চলিয়া যায়। সুন্দরবনের

বৃহৎ পক্ষীগুলির মধ্যে 'গাড়াপোলা' ও 'মদনটাক' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই দুইটি পক্ষী আকারে খুব বড় হয়। মদ্না বা মদনটাক খুব উঁচু ও লম্বা। উহার ঠোঁট বকের ঠোঁটের ন্যায় এবং উহা প্রায় ২ ফুট পর্যন্ত লম্বা হইয়া থাকে। এই দুইটি পক্ষী অনেকাংশে রাজহংসের ন্যায়। বাঁশকুরাল ও চিল শিকারী পাখী। উহা বিকট শব্দ করে এবং প্রচুর মৎস্য ধরিয়া খায়। নদী তীরে দার্শনিকের ন্যায় বসিয়া বক মৎস্য শিকার করে। কাকও সুন্দরবনের সর্বত্র দৃষ্ট হয়।

লোকালয়ের ন্যায় সুন্দরবনে মাঝে মাঝে বন্য মোরগ-মুরগী দেখিতে পাওয়া যায়। ভোর রাত্রে আমরা সুন্দরবনের মধ্যে মোরগের ডাক শুনিয়াছি। এগুলি খুব দ্রুত গতিতে চলাফেরা করে। তবে লোকালয়ের মুরগীর ন্যায় উহার মাংস সুস্বাদু নহে। বড় কাগ্ খুব বৃহৎ পাখী। উহার বর্ণ নীল। একটি পাখীতে ৭ সের পর্যন্ত মাংস হয়। মাছরাঙ্গা ও মাছাল সর্বত্র দৃষ্ট হয়। উহারা মৎস্য শিকারে বিশেষ পটু। মাছরাঙ্গার মৎস্য শিকার অব্যর্থ।

শামখোল, মানিক, গয়াল, বাটাঙ, করমকুলী সুন্দরবনের মধ্যে ঝাঁকে ঝাকে দলবদ্ধ হইয়া ইহারা আহার সংগ্রহ করে। আবার দলবদ্ধভাবে অন্যত্র উড়িয়া যায়। বাটাঙ ও করমকুলীর মাংস সুস্বাদু। সুন্দরবনের নদীতে বন্যহাঁস, বালিহাঁস, পানকৌড়ি বিভিন্ন প্রকার হাঁসপাখী ও কা'ন পাখী দেখা যায়। ছোট পাখীদের মধ্যে গাঙ্শালিক, টিয়া, হড়েল (ঘুঘু), শ্বেতকাক, দয়েল, কাস্তেচোরা, ফিঙে প্রভৃতি পক্ষী প্রায়ই দৃষ্ট হয়। দুধরাজ, রক্তরাজ এবং ভীমরাজ একই জাতীয় পক্ষী। ভীমরাজ জঙ্গলের সেরা পাখী। ইহারা শিক্ষা দিলে কথা বলিতে পারে। দুধরাজ শ্বেত বর্ণ ছোটপাখী। উহার লেজ খুব লম্বা এবং রক্তরাজও ঠিক ঐরূপ। তবে উহার বর্ণ লাল। এতদ্ব্যতীত বিলবাচ্চ, হট্‌টিডি বা হাটটিমাটিম, রামশালিক বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কুল্যা সুন্দরবনের আর একটি বড় পক্ষী।

পক্ষী মানব জাতির পক্ষে বিশেষ এক উপকারী জীব। লোকে আদর করিয়া পাখী পোষে এবং যত্নের সহিত পক্ষীর মাংস ভক্ষণ করে। পূর্বে পাখীর পালক কলিকাতায় চালান হইয়া তথায় অসংখ্য টুপি প্রস্তুত হইত। পাখীর

ঘাড়ের উপর পয়ার জন্মে। উহা ইউরোপীয়দের টুপির একটি উত্তম ও আবশ্যকীয় বস্তু। ইউরোপে এই পয়ার মূল্যবান পদার্থ। তথাকার নরনারীদের নিকট পাখীর পয়ার ও পালক অত্যন্ত প্রিয়। পূর্বে কলিকাতায় এই পয়ার ভরি হিসাবে বিক্রয় হইত। সুবদী প্রভৃতি অঞ্চল হইতে লোকে পালক ও পয়ার সংগ্রহ করিয়া কলিকাতায় বিক্রয় করিত। বর্তমানে উক্ত ব্যবসায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সুবদীর "পাখীর আলয়" এবং সোনামুখী বাওড়ের পাখীর "আড্ডা" অশ্রুতপূর্ব। এই সম্পর্কে গ্রন্থের অন্যত্র আলোচিত হইয়াছে।

মৌমাছি ও মধু

সুন্দরবনের পশুপক্ষী ও অন্যান্য জীবজন্তুর মধ্যে মৌমাছি সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রকায়। কিন্তু এই অত্যাবশ্যকীয় জীব কঠোর পরিশ্রম করিয়া যে মধু আহরণ করে উহা আমরা তৃপ্তির সহিত পান করি। সুন্দরবনের মধ্যে মৌমাছিরা গুণ গুণ শব্দে ঘুরিয়া বেড়ায়। জঙ্গলের যে সমস্ত বৃক্ষে ফুল হয়, সেখানে মৌমাছিরা গুঞ্জরণ করিয়া এক ফুল হইতে অন্য ফুলে মধু সংগ্রহের জন্য উড়িয়া বেড়ায়। বড় বড় বৃক্ষের উপর অসংখ্য মৌমাছি একত্রিত হইয়া মৌচাক্ সৃষ্টি করে। বৃক্ষ শাখায় এই চাক্ ঝুলিয়া থাকে এবং উহা দেখিতে অতীব সুন্দর। সুন্দরবনের খল্‌সী ও গেউয়া ফুলে প্রচুর মধু থাকে এবং মৌমাছিদের আড্ডা সেখানেই অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়। গভীর জঙ্গলের মধ্যেই অধিকাংশ মৌচাক সৃষ্টি হয় এবং মধু সংগ্রহকারী মৌমাছির দল এই সমস্ত চাকে মধু সঞ্চয় করে। মৌমাছি অতীব কর্মপটু জীব। ইহারা সর্বদাই মধু সংগ্রহে লিপ্ত থাকে। এই জীবের কর্মব্যস্ততা ও সঞ্চয়ী ধর্ম সর্বজন বিদিত। পবিত্র কোরাণেও মৌমাছি সম্পর্কে একটি অধ্যায় লিপিবদ্ধ আছে।

গ্রাম বা শহর অঞ্চলে যে সব মোচাক হয় উহা অপেক্ষা সুন্দরবনের মৌচাক বৃহৎকায় হইয়া থাকে। প্রত্যেকটি মৌচাক হইতে প্রচুর পরিমাণ সুমিষ্ট মধু পাওয়া যায়। বৎসরের সব সময়ে মৌচাকে মধু সঞ্চিত থাকে না। বসন্তের শেষে এবং গ্রীষ্মকালে মৌচাক হইতে সুন্দরবন অঞ্চলের লোকেরা মধু সংগ্রহ করিয়া থাকে। মধু সুন্দরবনের এক বিশিষ্ট সম্পদ। ইহা জগৎবিখ্যাত উপাদেয় খাদ্য। মধুর সাহায্যে ঔষধ ও ঔষধের অনুপান প্রস্তুত হইয়া থাকে।

মধু মানুষের অশেষ উপকার সাধন করে। সুন্দরবনের মধু ব্যবসায়ের উন্নতি কল্পে এতদঞ্চলে শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা একান্ত প্রয়োজন। দেশ বিদেশে মধুর চাহিদা অত্যধিক এবং ইহার দ্বারা জাতীয় আয়ও বৃদ্ধি পাইবে।

সুন্দরবনে যাহারা মধু সংগ্রহ করে তাহাদিগকে মৌয়াল বা মৌয়ালী বলা হইয়া থাকে। ইহারা ছোট ছোট ডিঙ্গি ও বড় বড় নৌকাযোগে সুন্দরবনে প্রবেশ করে এবং ৫ হইতে ১০ জন পর্যন্ত একত্রিত হইয়া লাঠি, দা ও মৃণ্ময়পাত্র সহ মৌচাকের খোঁজে ঘুরিয়া বেড়ায়। মৌমাছিরা ফুল হইতে মধু আহরণ করিয়া কোন্‌দিকে উড়িয়া মৌচাকে উপস্থিত হয় সেদিকে তাহারা ঊর্ধ্বমুখী হইয়া লক্ষ্য করিতে থাকে। এইভাবে তাহারা জঙ্গলের মধ্যে মৌচাকের সন্ধান করে। মৌয়ালগণ গভীর অরণ্যানীর মধ্যে জীবন বিপন্ন করিয়া মধু সংগ্রহ করে। একটি বৃহৎ মৌচাকে প্রচুর মধু ও মোম পাওয়া যায়। মোমও আমাদের বিশেষ উপকারে আসে। এই মোম দ্বারা মানুষের প্রয়োজনীয় কতিপয় জিনিষ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সুন্দরবনের নিকটবর্তী গ্রাম সমূহ হইতে বসন্ত ও গ্রীষ্মের মরসুমে দলেদলে লোক মধু সংগ্রহের জন্য জঙ্গলে প্রবেশ করে। উহারা প্রায়ই দরিদ্র শ্রেণীর লোক। তাহারা মধু সংগ্রহ করিয়া শহর ও বাজারে আনিয়া বিক্রয় করে। ব্যবসায়ীরা মধু অন্যত্র রপ্তানী করিয়া থাকে। বাওয়ালী, মৎস্যজীবি ও অন্যান্য লোক অপেক্ষা মৌয়ালদিগকে সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যায় ব্যাঘ্রে ভক্ষণ করিয়া থাকে। ইহাদের সঙ্গে বন্দুক থাকে না এবং অগম্য ও ভয়াবহ জঙ্গলের মধ্য হইতে উহাদিগকে মধু সংগ্রহ করিতে হয়। মৌচাক কাটার সময় বৃক্ষের উঁচু ডাল হইতে পড়িয়াও মানুষ মরিয়া যায়। এইভাবে তাহারা রুজি রুটির সন্ধানে বন হইতে বনান্তরে জীবন বিপন্ন করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। দুঃখ ও দৈন্য তাহাদের চির সঙ্গী। ব্যাঘ্র ও হরিণ শিকার সৌখিন ও বিত্তশালী লোকের জন্য এবং কাঠ, মৎস্য ও মধু সংগ্রহ দীন দরিদ্রের কার্য। মালঞ্চ প্রভৃতি অঞ্চল এখনও এমন অগম্য ও গভীর জঙ্গল আছে যেখানে আজ পর্যন্ত মধু সংগ্রহের কোন সুব্যবস্থা হয় নাই। তালপাটী, জলবাটা, আশাশুনী, পাবলাতলা, মাদারবাড়ী, কাল্‌কেবাড়ী প্রভৃতি গহীণ অরণ্যে সহসা প্রবেশ করিতে শিকারী বা মৌয়ালরা সাহস পায় না।

অন্যান্য সম্পদ

সুন্দরবনের যত্রতত্র বিভিন্ন প্রকার ঝিনুক আছে। সমুদ্রে বিরাটকায় শঙ্খ ও সামুদ্রিক ঝিনুক প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। ঝিনুক নানা প্রকারের। শঙ্খ ও ঝিনুকের দ্বারা অনেক আবশ্যকীয় জিনিষ প্রস্তুত হইয়া থাকে। বড় শামুককে সুন্দরবনের লোকেরা শুব্দী গুব্দী নাম দিয়াছে। সমুদ্র তীরে এক প্রকার অভিনব পদার্থ পাওয়া যায়। উহাকে লোকে 'জোংড়া' বলিয়া থাকে, উহা গাজরের আকৃতিবিশিষ্ট। জঙ্গ ও জোংড়ার ন্যায় কস্তুরীরও প্রাণ আছে। একটি কস্তুরীর ওজন দুইতিন সের পর্যন্ত হয়। উহার দ্বারা চুন প্রস্তুত হইয়া থাকে। কস্তুরী সরিষার তৈলের সহিত ঘর্ষণ করিয়া মালিশ করিলে বুকের বেদনা প্রশমিত হয়। ঝিনুকের চুন খুব মূল্যবান। সমুদ্রের তরঙ্গমালার সহিত একপ্রকার শক্ত ফেনা থাকে। তরঙ্গাঘাতের সঙ্গে উহা তীরে পড়িয়া শক্ত পদার্থে পরিণত হয়। ইহা সমুদ্র তীরে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। লোকে উহা সংগ্রহ করিয়া গৃহে রাখে এবং অসুখে কাজে লাগায়। শঙ্খ ও ঝিনুকের ন্যায় জোংড়ায়ও সুন্দর চুন প্রস্তুত হইয়া থাকে। একশ্রেণীর লোক এই ব্যবসায়ের দ্বারা জীবন ধারণ করে।

সুন্দরবনের আয়তন একটি ক্ষুদ্রকায় রাজ্যের সমান। এখনও এই জন মানব শূন্য গহীণ অরণ্যে বহু অমূল্য সম্পদ আবিষ্কারের আশা আছে। পাখীর পয়ার, নানা জাতীয় বৃক্ষের বাকল, ফল, শিকড়, পাতা, চুণ প্রস্তুতের উপকরণ, জীবজন্তুর হাড়, শিঙ, চর্বি, চামড়া প্রভৃতি দ্রব্য হইতে বিভিন্ন প্রকার সম্পদ লাভ করিতে হইলে সুন্দরবনাঞ্চলে বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার স্থাপিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। গবেষণা ও প্রচেষ্টা চালাইলে বহু গুপ্তধন মানব জাতির অশেষ কল্যান সাধন করিতে পারে।

রয়াল বেঙ্গল ব্যাঘ্র, নরখাদক ও ব্যাঘ্র শিকার পদ্ধতি

॥ দশ ॥

সুন্দরবনের জীবজন্তু অধ্যায়ে ব্যাঘ্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছি। ইউরোপীয় পর্যটকেরা এই জন্তুকে রয়াল বেঙ্গল বাঘ নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই হিংস্র জন্তুর প্রভাব বনবিভাগের সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়। সুন্দরবনে চিতাবাঘের বংশ ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। এখন শুধু মাত্র রয়াল বেঙ্গল বাঘই সর্বত্র বিরজমান। ব্যাঘ্রের সংখ্যা সুন্দরবনে অত্যধিক ছিল। বর্তমানে উহা বহুলাংশে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে। ব্যাঘ্র জাতির মধ্যে একশ্রেণী আবার মানুষখেঁকো বা নরখাদক। ইহাদের আকৃতি ও প্রকৃতি ভয়ংকর। ইহারা মানব জাতির নিকট এক ভয়াবহ জীব বিশেষ। এই বনে সিংহ নাই, তজ্জন্য উহার গর্জনও শুনা যায় না। পশুর রাজা সিংহকেই বলা হয়, কিন্তু সুন্দরবনে ব্যাঘ্রই পশুরাজ।

যশোরের ইতিবৃত্তের লেখক মিঃ জেম্‌স ওয়েষ্টল্যাণ্ড লিখিয়াছেন: একটি হিংস্র ব্যাঘ্র উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সুন্দরবনের একাংশে নির্ভয়ে বিচরণ করিত। ভ্রমণকারী ও শিকারীরা ব্যাঘ্রটির বিষয় ভালভাবে জানিত। কিন্তু কেহই ইহাকে শিকার করিতে পারে নাই। আমার সুন্দরবন ভ্রমণে আগ্রহ ছিল অত্যধিক। একদিন আমি একখানি অন্য ইংরেজের নৌকায় সুন্দরবনে ভ্রমণ করি। নদী তীরে অবতরণ করিয়া দাড়ি মাঝিদের সঙ্গে জঙ্গলের মধ্য দিয়া পদব্রজে চলিতে থাকি। আমার সহকর্মী ইংরেজ উক্ত ব্যাঘ্রের দিকে গুলি করে, কিন্তু গুলী উহার গাত্রে না লাগিয়া শিকারীকে গুরুতর আঘাত করিয়া ব্যাঘ্রটি পলায়ন করে। আর একজন শিকারী জঙ্গল মধ্যে একদিন উক্ত ব্যাঘ্রটির সহিত কয়েক গজ দূরত্বের মধ্যে সাক্ষাৎ করে। এই ধরনের ভয়সঙ্কুল সাক্ষাৎ তাহার প্রায়ই হইত। সে ব্যাঘ্রটিকে গুলী করা মাত্র তীর বেগে উক্ত স্থান হইতে প্রস্থান করিতে সমর্থ হয়। শেষ পর্যন্ত মোরেলগঞ্জের প্রতিষ্ঠাতা মোরেল সাহেব এই ব্যাঘ্রটিকে হত্যা করে। উক্ত ব্যাঘ্র শিকারের এক অদ্ভুত কাহিনী জানা যায়। মোরেল সাহেব বিরাট এক লৌহ নির্মিত খাঁচা প্রস্তুত করিয়া জঙ্গলের

মধ্যে একস্থানে ঐ খাঁচার মধ্যে লুকাইয়া সুযোগমত উপরোক্ত ব্যাঘ্রের প্রতি গুলী ছুড়িয়া মারেন, উহাতে ব্যাঘ্র গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হয়, এবং সে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। শিকারীর প্রতি ভীষণ ক্রোধ— প্রতিশোধ লইবার জন্য সে লম্ফ দিয়া শিকারীকে লৌহ নির্মিত খাঁচার উপর আক্রমণ করে। কয়েকবার চেষ্টার পর ব্যাঘ্রটি লোহার আঘাতে ক্রামাগত দুর্বল হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

ব্যাঘ্রে অনেক সময় নদীর মধ্যে নৌকায় লম্ফ দিয়া শিকার করিয়া থাকে এবং উহার আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য কাঠুরিয়াগণ ওঝাদের ঝাঁড়ফুক এবং তাবিজ কবজ ধারণ করিয়া সুন্দরবনে প্রবেশ করে। অশিক্ষিত লোকেরা বাউলী বা ওঝা সঙ্গে লইয়া মন্ত্রের দ্বারা বাঘের আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য নানারূপ উপায় উদ্ভাবন করিয়া থাকে। তাহারা বনবিবি ও গাজীর দোহাই দেয় এবং জঙ্গল হইতে সিন্নি মানত আদায় করে। সামাজিক অশিক্ষা ও কুশিক্ষার জন্য এই ধরনের কুসংস্কার একশ্রেণীর লোকের মধ্যে চিরকাল বিদ্যমান থাকিয়া বংশানুক্রমে উহার বিষময় ফল ফলিতেছে। এই ধরনের কুসংস্কার আজিও জঙ্গলে বিদ্যমান। ব্যাঘ্রকুল হইতে রক্ষা পাইবার জন্য কাল্পনিক বনদেবতার সাহায্য কেহ কেহ আশা করিয়া থাকে। পূর্বে যদি কোন স্থান হইতে ব্যাঘ্রে মানুষ ধরিয়া লইয়া যাইত তখন ওঝার কেরামতি বাহির হইয়া পড়িত এবং ব্যাঘ্র আক্রমণের নির্দিষ্ট স্থানে কাঠুরিয়াগণ কাপড়ের লাল ঝাণ্ডা উত্তোলন করিয়া জঙ্গলাগত ব্যক্তিদের হুশিয়ার করিয়া দিত। বর্তমানেও ঐ পদ্ধতি প্রচলিত আছে, অনেক সময় ব্যাঘ্রে আক্রান্ত ব্যক্তির পোষাক পরিচ্ছদও বৃক্ষ শাখায় ঝুলাইয়া আগন্তকদিগকে সাবধান করিয়া দেওয়া হয়।

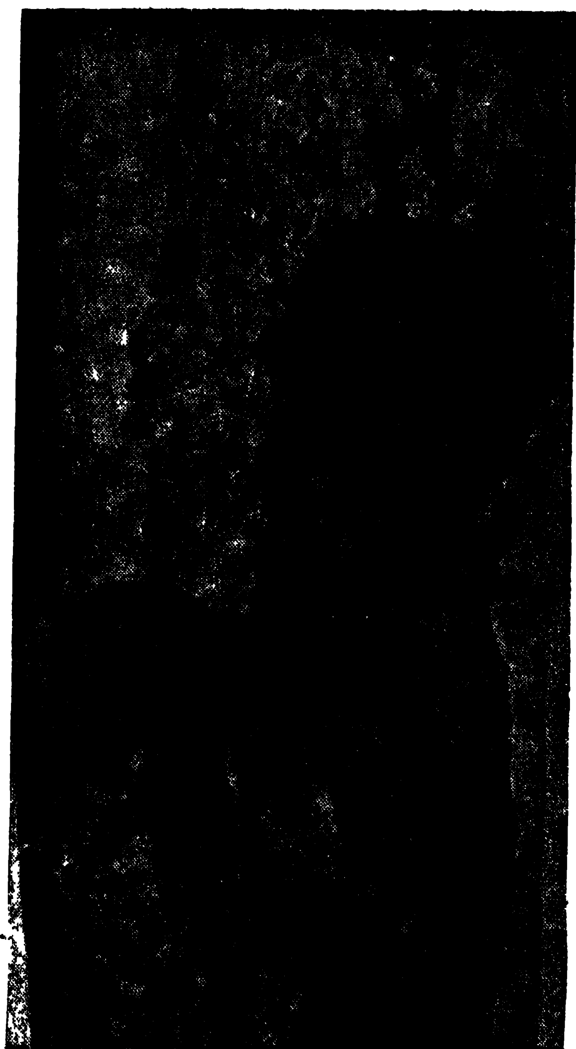
সুন্দরবনের কোন কোন এলাকায় ব্যাঘ্রের উপদ্রব ভীষণভাবে দেখা দেয়। ১৯৬০ সালে মালঞ্চ নদীর পার্শ্বে পুষ্পকাটী ও মাদারবাড়ীয়ার জঙ্গলে ছয়জন বাওয়ালীকে হিংস্র ব্যাঘ্রে আক্রমণ করিয়া উদরস্থ করে। অকস্মাৎ এই অঞ্চলে ব্যাঘ্রের অত্যাচারে মানুষ ভীত ও আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়ে। বনবিভাগ হইতে তখন একজন স্থানীয় শিকারীকে ব্যাঘ্র নিধনের জন্য নিযুক্ত করা হয়। এই শিকারী "কলপাতা" পদ্ধতিতে কয়েকটি ব্যাঘ্র শিকার করে। ঐ বৎসর নীলকোমল অঞ্চলে ছাপড়াখালীর জঙ্গলে কয়েকদিনের মধ্যে ২৬ জনকে ব্যাঘ্রে

ভক্ষণ করে। উহারা অধিকাংশই গোড়ইখালী অঞ্চলের লোক। ইহাতে ভীষণ আতঙ্ক সৃষ্টি হয় এবং জঙ্গলাভ্যন্তরে হাহাকার পড়িয়া যায়।

ঝাপার জঙ্গলে ৫জন লোককে ব্যাঘ্রে আক্রমণ করিয়া মারিয়া ফেলে। সেনাবিভাগের জনৈক অফিসার এবং বনবিভাগের কর্মচারীরা তথায় যাইয়া কয়েকটি অর্ধভুক্ত লাশ উদ্ধার করিয়া ক্যামেরার সাহায্যে উহাদের ছবি তুলিয়া রাখেন। নীলকমল অঞ্চলে চাঁদামারীর খালের পার্শ্ববর্তী জঙ্গলে ১৯৬১ সালে মানুষখেঁকো বাঘের ভীষণ উপদ্রব হয়। পক্ষকালের মধ্যে ৬ জন নিরীহ কাঠুরিয়া এই মানুষখেঁকোদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। দুইজনকে ব্যাঘ্রে মুখে করিয়া জঙ্গলের মধ্যে উধাও হয়। ৩ জনকে গুরুতর ভাবে আহত অবস্থায় সঙ্গীরা উদ্ধার করিয়া চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে প্রেরণ করে। আর একজনের অর্ধভুক্ত লাশ পাওয়া যায়। ঐ লাশ জঙ্গলের মধ্যে নীলকমল বেতার যন্ত্রের পার্শ্বে সঙ্গীরা সমাধিস্থ করে। আড়ো শিবসার তীরে ভুতুমমারীর চরে ব্যাঘ্রে আক্রান্ত অনেকগুলি লাশ সমাধিস্থ করা হইয়াছে। এই সমস্ত সমাধি দর্শনে ভ্রমণকারীদের অন্তর শিহরিয়া উঠে। ঝাপা ও আমবাড়িয়ায় অনুরূপ বহু কবর আছে।

সুন্দরবনে ব্যাঘ্রকুলের যাতায়াতের নিজস্ব পথ আছে। বাঘ যে পথে যাইবে সেই পথ দিয়া ফিরিয়া আসিবে। শিকারের উদ্দেশ্যে ইহারা বন হইতে বনান্তরে এইরূপে ঘুরিয়া বেড়ায়। সুন্দরবনের মালঞ্চ অঞ্চলে এককালে যেখানে গণ্ডারের আধিক্য ছিল, বর্তমানে সেখানে ব্যাঘ্রের আনাগোনা অত্যধিক। সুন্দরবনের মাঝামাঝি এলাকায় পাঠাকাটা, হাজারীর চর, বিছের চর, শেখেরট্যাক এবং গ্যাণ্ডারখালীতে ব্যাঘ্রের সংখ্যা অধিক। এই সমস্ত জঙ্গলে ব্যাঘ্রের পদচিহ্ন অহরহ পরিলক্ষিত হয়। দুবলা দ্বীপের অদূরে ছাপড়াখালী, ঝাপা, কট্‌কা, হিরণ পয়েণ্ট ও আমবাড়িয়ার জঙ্গলে বহুসংখ্যক ব্যাঘ্র বাস করে।

একদা সুন্দরবন ভ্রমনকালে আলকীর সন্নিকটে এক গভীর জঙ্গলে ব্যাঘ্র শিকারে গিয়া আমাদের সঙ্গী ডাঃ তমেজউদ্দিন, মোজাফফর ও মনসুর আহমদ হারাইয়া যায়। মানুষ হারাইয়া গেলে জঙ্গলে 'কু' বা — কুই, দিয়া সন্ধান করিতে হয়। আমি ও নুরউদ্দিন মিঞা কয়েকঘণ্টা ধরিয়া 'কু' দিয়াও আমাদের সঙ্গীদের সন্ধান পাইলাম না। সঙ্গীদের নেশা—ব্যাঘ্রশিকার। উহার জন্য আদেশ



ব্যাঘ্রাক্রান্ত ব্যক্তির উদ্ধারকৃত অর্ধভুক্ত লাশ — ব্যাঘ্রে ঘাড় ভাঙ্গিয়া রক্তপান করিয়াছে।

পত্রও সংগ্রহ করিয়াছেন। আমরা সঙ্গীদের সম্পর্কে নিরাশ হইয়া পড়িতেছি, এমন সময়ে গভীর রাত্রিতে তাঁহাদের সংবাদ পাইলাম। 'কু' দিয়া বা ডাকে নয় — বন্দুক ও রাইফেলের গর্জনে। সে কি ভয়ংকর শব্দ। চারিদিক নিস্তব্ধ, গহীন অরণ্য, কোথাও ঝি ঝি রব নাই। সেই ভীষণ জঙ্গলে আমরা নদীর মধ্যে আর আমাদের সঙ্গীরা ব্যাঘ্রের পিছনে অথবা ব্যাঘ্র তাঁহাদের পিছনে! রাত্রি প্রায় ২ ঘটিকা, আমরা সঙ্গীদের আশু মিলনের আশা ত্যাগ করিয়াছি। ঠিক এমন সময় দিঙ্‌মণ্ডল কাঁপাইয়া বন্দুকের আওয়াজ শুনিয়া নিশ্চিত ভাবিলাম আমাদের সঙ্গের কৃশকায় লোকটিকে ব্যাঘ্রে লইয়া গিয়াছে। ব্যাঘ্রের নেশায় মত্ত ব্যক্তিদের অনেক সময় ব্যাঘ্রে জীবন লীলা সাঙ্গ করে। ব্যাঘ্র শিকার করিলে আবার তাঁহাদের কৃতিত্ব। জয় পরাজয় শিকারীর ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে।

আমাদের উপরোক্ত সঙ্গীদের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে তাঁহাদের সম্পর্কে আরও মন ভারাক্রান্ত হইল। ইতিমধ্যে আমরা স্থির বিশ্বাস করিয়াছি যে আমাদের একজনকে নিশ্চয়ই ব্যাঘ্রে ধরিয়া উদরস্থ করিয়াছে। শহরে ফিরিয়া কি কৈফিয়ত দিব? নিষেধ সত্ত্বেও তাঁহারা গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করিলেন আর খামখেয়ালী করিয়া মূল্যবান জীবন হারালেন! এ কৈফিয়তের কোন জবাব নাই। এইরূপ দুশ্চিন্তা ও আলোচনা করিতে করিতে প্রায় রাত্রিশেষ, এমন সময়ে বীরগণ স্বশরীরে ছোট নৌকাযোগে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। তাঁহাদের আগমনে আমাদের আনন্দের সীমা রহিল না। ভবিষ্যতের জন্য সকলকে হুশিয়ার করিয়া দেওয়া হইল। এইভাবে সুন্দরবনের গহীন অরণ্যে নদীনালার মধ্যদিয়া জোয়ার ভাটার সাহায্যে নৌকাযোগে বন হইতে বনান্তরে ঘুরিতে হইয়াছে।

শিকার একপ্রকার নেশা। হিংস্র ব্যাঘ্র শিকারে আরও ভয়ংকর নেশা। এই নেশা যাহার মস্তকে একবার প্রবেশ করিয়াছে, সে ঘরে বসিয়া থাকিতে পারে না। শিকারীরা ব্যাঘ্র শিকারের জন্য মদমত্ত হইয়া পড়ে। এই দুর্দমনীয় নেশার জন্য কেহ কেহ অতীব সংগোপনে শিকার করিয়া থাকে। শিকারীদের পক্ষে হরিণ শিকার অতীব সহজ। কিন্তু ঝানু ব্যাঘ্র শিকারীরা হরিণ নিকটে পাইলেও শিকার করে না। ইহা অভিজ্ঞ ও দক্ষ শিকারীর ধর্ম। সম্প্রতি ঢাকা হাইকোর্টের জনৈক বিচারপতি সুন্দরবনে ব্যাঘ্র শিকার করিতে আসিয়া এক

সপ্তাহব্যাপী তথায় অবস্থান করেন। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যেও তিনি বা তাঁহার সঙ্গী সুযোগ পাওয়া সত্বেও একটি হরিণ শিকার করেন নাই। দেশে এইরূপ গুণসম্পন্ন ব্যক্তির অভাব।

সুন্দরবনের সর্বত্র ব্যাঘ্রের আতঙ্ক অত্যধিক এবং চিরদিন ধরিয়া এই আতঙ্ক বিদ্যমান আছে। সমস্ত বাঘে যখন তখন মানুষ আক্রমণ করে না। কিন্তু যে ব্যাঘ্র একবার নররক্ত পান করিয়াছে, সে মানুষ দেখিলে আক্রমণের নেশায় মদমত্ত হইয়া উঠে। সাধারণ ব্যাঘ্র ও মানুষখেঁকোর মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্য বিদ্যমান। মানুষখেঁকো বা নরখাদকেরা ভয়ংকর হিংস্র স্বভাবের ভীমমূর্তিধারী। ইহারা অতীব ধূর্ত, চালচলন ও হাবভাব দর্শনে ঝানু শিকারী বা অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা তাহা বুঝিতে পারে। শিকারের সময় নরখাদকের রক্তচক্ষুদ্বয় কি ভয়ংকর রূপ পরিগ্রহ করে? উহাদের আক্রমণ যেন বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত কোন্ স্থলে কি ভাবে আক্রমণ চালাইতে হইবে এবং কখন পশ্চাদপসারণ করিতে হইবে সে চিন্তাশক্তি ও হুশিয়ারী তাহাদের আছে।

শিকারী, ভ্রমণকারী, কাঠুরিয়া প্রভৃতি সর্ব শ্রেণীর মানুষকে জঙ্গলে সর্বদা হুশিয়ার থাকিতে হয়। নিমেষের অসতর্কতার জন্য জীবন বিপন্ন হইতে পারে। শিকারের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই। মুহূর্তমাত্র দেরী বা এক মুহূর্ত পূর্বে নহে ঠিক সময় দেখিয়া শিকারীকে ব্যাঘ্র শিকারের জন্য আঘাত হানিতে হইবে। সামান্য ভুলের মাশুল শিকারীকেই দিতে হয়। ব্যাঘ্রের পাগমার্ক ও উহার অবয়ব দর্শনে ঝানু শিকারী বুঝিতে পারে বাঘ না বাঘিণী, বাচ্চা না বৃদ্ধ, এবং কত বয়সের বা শারীরিক গঠন কিরূপ। বাঘের থাবায় কোন ক্ষতচিহ্ন আছে কিনা বা উহার কোন পা অথবা কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ভাঙ্গা কিনা তাহা উপলব্ধি করা যায়। অভিজ্ঞতার দ্বারা এই সব বিদ্যা আয়ত্বে আসে।

মানুষ খেঁকো ব্যাঘ্র যদি জানিতে পারে, শিকারী তাহার পশ্চাতে তখন সে বিশেষ সতর্কতার সহিত শিকারীর পিছনে ধাওয়া করে। ব্যাঘ্র মানুষের হাতে মারা পড়ে, মানুষও তেমনই ব্যাঘ্রের হাতে জীবনলীলা সাঙ্গ করে। তদানীন্তন এক সরকারী রিপোর্টে জানা যায় যে, ১৯০৫—০৬ খৃষ্টাব্দে সুন্দরবনে ন্যূনপক্ষে ১০১ জন এবং পরবৎসর অর্থাৎ ১৯০৬—০৭ খৃষ্টাব্দে ৮৩ জন লোককে

ব্যাঘ্রে আক্রমণ করিয়া উদরস্থ করে। ব্যাঘ্রকুলকে শিকার করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট হইতে পশর নদীর পূর্ব দিকে প্রতিটি ব্যাঘ্রে ৫০্ টাকা এবং নদীর পশ্চিম দিকের জঙ্গলে অনুরূপ শিকারের জন্য ১০০্ টাকা পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। বর্তমানে উক্ত পুরস্কার সর্বোচ্চ ৫০০্ টাকা। ব্যাঘ্রের তারতম্য অনুসারে এইরূপ পুরস্কার প্রদত্ত হয়। আদেশপত্র ভিন্ন কেহ ব্যাঘ্র বা অন্য কোন জীবজন্তু শিকার করিলে আইনানুসারে তাহাকে ফৌজদারীতে সোপর্দ করা হয়। যখন তখন ব্যাঘ্র শিকারের আদেশপত্র দেওয়া হয় না। বৎসরের কোন কোন সময়ে শিকার একেবারেই নিষিদ্ধ (Closed season)। ব্যাঘ্রকুল ধ্বংস হইলে অচিরাৎ বনজ সম্পদ ও হরিণ ইত্যাদির চিহ্ন লোপ পাইবে। ব্যাঘ্রকুল বনজ সম্পদের রক্ষণাবেক্ষনের জন্য বিশেষ প্রয়োজন। উহাদের সুন্দরবনের রক্ষক ও প্রহরী বলিলে অত্যুক্তি হয় না। প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার্থে সুন্দরবনে ব্যাঘ্র, সর্প ইত্যাদির আবশ্যকতা অনস্বীকার্য।

মানুষ খেঁকো ব্যাঘ্র খোচ্ ধরিয়া চলিতে চলিতে শিকারীর অনুসরণ করে। একদা একটি নরখাদক এইভাবে চলিতে চলিতে শিকারী যে বৃক্ষে আরোহণ করিয়াছে মই দিয়া তথায় উপস্থিত হইয়া তাহার প্রাণ লইতে থাকে। দ্রুত সতর্কতা অবলম্বনের জন্য শিকারী প্রাণে বাঁচিয়া যায়। ত্বরিতবেগে ব্যাঘ্রও জঙ্গলে সরিয়া পড়ে। মানুষ যেমন ব্যাঘ্রকে ভয় করে, ব্যাঘ্রেরও তেমনই মনুষ্য-ভীতি আছে।

সুন্দরবনের নাড়ী নক্ষত্র স্থানীয় প্রবীণ শিকারীর নখদর্পনে। প্রত্যেকটি এলাকা, প্রতিটি বৃক্ষলতা তাহাদের সুপরিচিত। বানরেরা কিচির মিচির সংকেত দিলে সুন্দরবনের অন্যান্য প্রাণীকুল ব্যাঘ্রের আগমন জানিতে পারিয়া পলায়ন করে। বাঘ মানুষ শিকার করিলে উহার রক্ত পানের পূর্বে শিকারের সহিত খেলা করিয়া থাকে। হিংস্র জীবের হিংসা ও লালসাকে উগ্র করার জন্য তাহারা শিকারের সঙ্গে এই ধরণের ক্রীড়া করিয়া থাকে। শিকার মরিয়া গেলেও নখর দিয়া শিকারকে থাবা দিয়া ধরে এবং বিড়ালের ন্যায় নড়াচড়া করিয়া উহার সঙ্গে খেলা করে। ব্যাঘ্র ক্রুদ্ধ হইলে সে মানুষের ঘাড় ভাঙ্গিয়া প্রস্থান করে। কোন কোন সময় মানুষের রক্ত মাংস ভক্ষণ অপেক্ষা প্রতিশোধ লইবার

বাসনা উগ্র থাকে। এমতাবস্থায় বাঘে শিকার করিয়া লাশ ফেলিয়া যায়। শুনা যায় লাশ বাসী হইলে ব্যাঘ্রে ভক্ষণ করে না। জনৈক অভিজ্ঞ শিকারীর বর্ণনায় জানা যায় যে বাঘে মানুষ শিকার করিলে সর্ব প্রথম উহার রক্ত পান করে এবং লাশ রাখিয়া দেয়। পরে সুস্থ হইয়া শিকারের মাংস ভক্ষণ করে। একটি বাঘে সাধারণতঃ একজন মানুষের সমস্ত মাংস খাইতে পারে না বা খায় না, সেইজন্য অনেক সময় মানুষের অর্ধভুক্ত লাশ বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কোন কোন অংশ জঙ্গলে পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়। মধ্যে মধ্যে এই ধরণের অর্ধভুক্ত লাশের সন্ধান করিয়া উদ্ধার করা হয়।

ব্যাঘ্রের লালা বিষাক্ত পদার্থ। একবার জনৈক শিকারী ব্যাঘ্র আক্রমণ করিলে শিকারীর পার্শ্ববর্তী সঙ্গীর গায়ের উপর ব্যাঘ্র পড়িয়া যায়। ব্যাঘ্র ক্রুদ্ধ হইলে অনবরত মুখ দিয়া সাংঘাতিক ভাবে লালা পড়িতে থাকে। সঙ্গীর গাত্র বাঘের লালায় ভরিয়া যায়। এই লালায় খুব দুর্গন্ধ। সাবান দিয়া ভাল করিয়া ধৌত করিলেও উহার দুর্গন্ধ দূরীভূত হয় না। এইরূপ লালা মানুষের গায়ে লাগিলে প্রাণে বাঁচা দুষ্কর। এহেন বিপদেরও ঔষধ সুন্দরবনের অভিজ্ঞ শিকারীরা জানে। ঐরূপ ব্যক্তিকে জল দ্বারা ভালভাবে স্নান করাইয়া মানুষের বিষ্ঠা গায়ে মাখিয়া প্রলেপ দিলে অনেক সময় বাঁচিবার আশা থাকে। পূর্বোক্ত লোকটি লালার বিষে জর্জরিত হইয়া শেষ পর্যন্ত গাত্র পচিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মৃত ব্যাঘ্রের গাত্র হইতেও ভীষণ দুর্গন্ধ বহির্গত হয়।

জঙ্গলে ব্যাঘ্র আছে কিনা অভিজ্ঞ ও সুচতুর শিকারীরা তাহা বুঝিতে পারে। গম্ভীর ও নিস্তব্ধ জঙ্গল। ব্যাঘ্রের অবস্থান থাকিলে সেখানে নিস্তব্ধতার মধ্যে যেন থম্‌থম্‌ করিতে থাকে। নিঝুম নিরালা বনে উহা বিশেষভাবে অন্তরে উপলব্ধি করা যায়। গভীর অরণ্যের বৃক্ষলতা, জীবজন্তু, বিহঙ্গম, আলো, বায়ু প্রভৃতি পারিপার্শ্বিক অবস্থা দর্শনে শিকারীর অন্তরে বাঘের অবস্থানের একটি নিশ্চিত ধারণা জন্মিয়া থাকে। নির্জন বনের মধ্যেও বাঘে বিশেষ করিয়া নরখাদকে বাতাসের সাহায্যে মানুষের অবস্থান বুঝিতে পারে। সেজন্য শিকারীদের বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিতে হয়। এমনভাবে শিকারীরা চলিতে চেষ্টা করে যেন তাহাদের পদশব্দ দূরের কথা, গাত্র ঘেসিয়া যে বায়ু

প্রবাহিত হয়, তাহাও যেন বাঘের নাসারন্ধ্রে প্রবেশ না করে। তজ্জন্য সুন্দরবনের শিকারীরা সাধারণতঃ ধূমপান করিতে পারে না। ধূয়ার গন্ধ পাইলে ব্যাঘ্রকুল সাবধানতা অবলম্বন করে। অভিজ্ঞ ও ঝানু শিকারীরা নৈশ অন্ধকারেও সেইজন্য নির্জনে নিঃসঙ্গ অবস্থায় একাকী শিকারের সন্ধান করে। ব্যাঘ্র শিকারের জন্য শিকারীকে অমানুষিক পরিশ্রম, অনাহার, অনিয়ম, কালক্ষেপ, অর্থক্ষয় এবং অসাধ্য সাধন করিতে হয়। তদুপরি শিকারীদের জীবনাশংকা আছেই।

অধুনা এক অভিনব উপায়ে ব্যাঘ্র শিকারীরা শিকার করিয়া থাকে। গভীর জঙ্গলের মধ্যে শিকারী বৃক্ষে আরোহণ করিয়া সতর্কতার সহিত আসন গ্রহণ করে। অনেক সময় সে কাপড় জড়াইয়া দেহ বৃক্ষের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখে, যাহাতে ঘুমের ঘোরে হঠাৎ নীচে পড়িয়া না যায়। বন্দুকের পাল্লা ঠিকমত মাপিয়া একটি ছাগলের ছানা নিকটেই বাঁধিয়া রাখা হয়। ছাগল ছানার ডাক শুনিয়া সময় সময় ব্যাঘ্র আসিয়া উহাকে আক্রমণ করে এবং সেই সুযোগে শিকারী গুলীবিদ্ধ করিয়া ব্যাঘ্র শিকার করিয়া থাকে।

ব্যাঘ্র শিকারীরা দিবারাত্র সর্বসময়ে শিকার অন্বেষণ করে। নৈশ অন্ধকারে বাঘের দুই চক্ষু জ্বল জ্বল করিয়া জ্বলিতে থাকে। উহার উপর টর্চের আলো পড়িলে ব্যাঘ্র সেই স্থানে দাঁড়াইয়া থাকে এবং একটুও নড়িতে পারে না। এমতাবস্থায় শিকার সহজে হস্তগত হয়। টর্চের আলো বাঘের চক্ষুদ্বয়ের উপর হইতে অপসারিত হওয়া মাত্র সে পলায়ন করিয়া থাকে। নৈশ অন্ধকারে হরিণেরও অনুরূপ অবস্থা হয়।

সুন্দরবনের মানুষখেঁকো বাঘ সম্পর্কে তৎকালীন বনবিভাগের ডেপুটী কনজারভেটর স্যার হেনরী ফ্যারিংটন লিখিয়াছেন, "সুন্দরবনের স্থানীয় শিকারীরা সাধারণতঃ গাদা বন্দুক ব্যবহার করে এবং অনেক সময়ে ক্ষুদ্রকায় ছিটা দ্বারা গুলী করিয়া থাকে। ঐ গুলী গাত্রে লাগিলেও বাঘ মরে না। পক্ষান্তরে ব্যাঘ্র অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। সুন্দরবনের হরিণকুলকে একপ্রকার শেষ করিয়া দেওয়ার জন্যও ব্যাঘ্রের মনুষ্য ভক্ষণের প্রবৃত্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। হরিণ দুষ্প্রাপ্য হইলে ব্যাঘ্রের নররক্ত পানের তৃষ্ণা উগ্র হয়। বাঘ সাধারণতঃ অন্য খাদ্য

পাইলে মনুষ্য ভক্ষণ হইতে বিরত থাকে।" তিনি আরও বলিয়াছেন "প্রকৃত নরখাদকও হরিণ পাইলে সচরাচর মনুষ্য আক্রমণ করে না। যে সমস্ত জঙ্গলে স্থানীয় শিকারীদের আনাগোনা অত্যধিক সেখানকার নরখাদকেরা অতিমাত্রায় হিংস্র হইয়া পড়ে।"

প্রায় দুই শতাব্দী ধরিয়া মানুষখেঁকো ব্যাঘ্রের দাপট ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইউরোপীয় পর্যটক বার্নীয়ার সুন্দরবনের ব্যাঘ্র সম্পর্কে লিখিয়াছেন যে নিশা যাপনকালে নদী তীরে বিশেষ সাবধানতার সহিত বৃক্ষে নৌকা বাঁধিয়া রাখিতে হয়। দড়ি লম্বা করিয়া বা নোঙ্গর ফেলিয়া তীরভূমি হইতে কিছুদূরে নৌকা রাখিতে হয়। অনেক সময়ে তীরবর্তী নৌকা হইতে ব্যাঘ্রে লম্ফ দিয়া মানুষ ধরিয়া লইয়া যায়। ঘুমন্ত অবস্থায় মানুষকে এই হিংস্র জন্তু আক্রমণ করিয়া থাকে। দেশীয় কাঠুরিয়াদের নিকট হইতে শুনিয়া বার্নীয়ার তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্তে এই সমস্ত বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি নৌকার মাঝিদের নিকট শুনিয়াছেন যে নৌকার মধ্যে যে মানুষটি নাদুসনুদুস এবং সর্বাপেক্ষা স্থূলকায় তাহাকেই ব্যাঘ্রে মুখে করিয়া লইয়া যায়। গল্পের শেষাংশ সঠিক নহে এবং অতিরঞ্জিত বলিয়া মনে করি। দিনের বেলায় মানুষ যখন জঙ্গলে কার্যরত থাকে, তখন কোন কোন সময়ে ব্যাঘ্রে কাহারও প্রতি লক্ষ্য করিয়া থাকে। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, ব্যাঘ্রে যাহাকেই লক্ষ্য করে তাহাকেই পরে আক্রমণ করিয়া থাকে।

বার্নীয়ার সম্রাট শাহ্ জাহানের রাজত্বকালে পাক ভারত পর্যটন করেন। তাঁহার বিবরণী লিখিত হইয়াছিল এখন হইতে প্রায় তিনশত বৎসর পূর্বে। এই ধরনের ঘটনা এখনও ঘটিয়া থাকে। আমরা সরূপকাটীর জনৈক বৃদ্ধ বাওয়ালী সর্দারের বর্ণনায় জানিয়াছি যে, কয়েকবৎসর পূর্বে এক রাত্রিতে বাওয়ালীরা সংখ্যায় ৭ জন এক বড় নৌকায় দরজা বন্ধ করিয়া ঘুমাইতেছিল। গভীর রাত্রিতে জঙ্গল হইতে ব্যাঘ্র নৌকার উপর লম্ফ দিয়া ভীষণ ধাক্কায় দরজা ভাঙ্গিয়া একজনকে মুখে করিয়া আবার লম্ফ দিয়া জঙ্গলের মধ্যে চলিয়া যায়। বিগত ইং ১৯৬০ সালের প্রথম দিকে শেখের খালের উত্তর তীরে জনৈক ব্যক্তি গোল গাছ কাটিতেছিল। একটি ব্যাঘ্র হঠাৎ আসিয়া লোকটির মস্তকে এক থাপ্পড় মারে। ইহাতে সে মাটিতে পড়িয়া যায়। পার্শ্ববর্তী সঙ্গীয়া এমন সময়

দা, কুঠার সহ আসিয়া পড়িলে ব্যাঘ্রটি পলায়ন করে। সকলে ধরাধরি করিয়া তাহাকে চিকিৎসার জন্য গোড়ইখালী বাজারে লইয়া আসে। সে মস্তকে সামান্য আঘাত পাইয়াছিল, কিন্তু ব্যাণ্ডেজ করার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার মৃত্যু হয়। বাঘের নখও বিষাক্ত সেজন্য সম্ভবত: বিষে জর্জরিত হইয়া লোকটির মৃত্যু ঘটে। ব্যাঘ্রটি কেন তাহাকে থাপ্পড় মারিল? উহাকে সে সহজেই ধরিয়া লইয়া যাইতে পারিত। পূর্বেই বলিয়াছি শিকারের পূর্বে বাঘে অনেক সময় শিকারের সহিত ক্রীড়া করিয়া থাকে। বাঘে মানুষ আক্রমণের পূর্বে এইরূপ থাপ্পড় মারিয়া থাকে। এইরূপ আক্রমণে মানুষ পড়িয়া যায়। তখন সে সহজে কামড়াইয়া ধরিয়া প্রস্থান করে। ইহাই ব্যাঘ্রের মনুষ্য আক্রমণ পদ্ধতি।

সুসভ্য মানব জাতির জীবনে যেরূপ প্রেমের স্পন্দন অনুভূত হয়। জঙ্গলের হিংস্র জন্তুরও তদ্রূপ পাশবিক প্রেমভাব জাগিয়া থাকে। যৌন বিজ্ঞানীরা বলেন, ঋতুর পরিবর্তনে এবং চন্দ্রের গতির সঙ্গে কোন কোন নির্ধারিত সময় যৌনক্ষুধা মানুষের অন্তরে কমবেশী প্রবল হইয়া থাকে। বাংলা দেশের বসন্তকাল প্রকৃতির এক অভিনব অবদান। ঋতুরাজ হিসাবে বসন্তের আদর এ দেশে সর্বাধিক। বৃক্ষের ডালে ডালে কোকিলের কুহুতানে হৃদয় মন আন্দোলিত হয়। দক্ষিণের ঝিরি ঝিরি বাতাস অন্তরে অপরূপ আনন্দ দান করে। বৎসরের এই সময় অর্থাৎ শীতের শেষে এবং বসন্ত সমাগমে ব্যাঘ্রের ডাক শ্রুত হয় অত্যধিক। বাঘিনীর সহিত বাঘ সবসময় একত্রে থাকে না। যে যাহার মত খাদ্য অনুসন্ধান করিয়া স্বাধীনভাবে জঙ্গলে ঘোরাফেরা করে। বাঘ বাঘিনীর মিলন আকাঙ্খায় ব্যাকুল হইয়া ডাকিতে আরম্ভ করে। উভয়ে খেলাধুলা ও আমোদ প্রমোদ করিবার জন্য পাগলপ্রায় হইয়া উঠে। বাঘিনীর সাক্ষাৎ পাইবার উদগ্র নেশায় বাঘ বন হইতে বনান্তরে ছুটিয়া বেড়ায়। বাঘ যে পথে চলিবে সেই পথের পদ চিহ্ন ধরিয়া আবার বরাবর সেই পথ দিয়া ফিরিয়া আসিবে। এই পদ চিহ্নকে শিকারীরা পাগমার্ক বলে। বাঘের এইরূপ চলাচলের পথে শিকারীরা "কলপাতা" পদ্ধতিতে শিকার করিয়া থাকে।

সুন্দরবনে "কলপাতা" শিকার বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছে। ব্যাঘ্রের চলাচল পথে শিকারী গুলী পুরিয়া বন্দুক রাখিয়া দিবে। একটি ঠেকাঠির উপর মাপমত উঁচু করিয়া বন্দুকের অগ্রভাগ রাখিবে। শিকারীদের নিকট হইতে

জানা যায় যে বাঘের থাবার চিহ্নের মাপ ধরিয়া প্রমাণ মত উঁচু করিয়া বন্দুক রাখিতে হয়। ট্রিগারের সঙ্গে কাল সুতা বাঁধিয়া পথের উপর আড়াআড়ি ভাবে একটু উঁচু করিয়া টানা দিয়া রাখিবে। ব্যাঘ্র সেইপথে ফিরিবার সময় পায়ে সুতার টান লাগিলেই বন্দুক আওয়াজ হইয়া যাইবে। কল্‌পাতা পদ্ধতিতে সর্বদা কৃতকার্য হওয়া যায় না বলিয়া অনেকের ধারনা, কিন্তু তাহা ঠিক নহে। এই ধরনের ব্যাঘ্র শিকার পদ্ধতি বর্তমানে প্রচলিত আছে এবং অধিকাংশ শিকারী এই পন্থায় ব্যাঘ্র শিকার করে। সামনাসামনি ব্যাঘ্র শিকার অপেক্ষা ইহা অধিকতর সহজ। কল্‌পাতা শিকারে মাপঝোপ ভুল হইলে শিকার পড়ে না। আওয়াজের পর শিকারীরা অন্য একটি বন্দুক হস্তে ব্যাঘ্র পড়িয়াছে কিনা খোঁজ করে। এই সময় শিকারী আহত ব্যাঘ্র শিকার করে বা দৈবাৎ ব্যাঘ্রেও শিকারীকে আক্রমণ করিয়া থাকে।

পূর্বেই বলিয়াছি, শিকারী সাধারণতঃ জঙ্গলের মধ্যে ব্যাঘ্রের পদচিহ্ন ধরিয়া অনুসরণ করিতে থাকে। সম্মুখের পদদ্বয়ের দূরত্ব দেখিয়া শিকারীরা বুঝিতে পারে ব্যাঘ্র ছোট না বড়। বহু চেষ্টা করিয়াও বাঘ পাওয়া যায় না। আবার অকস্মাৎ বাঘের সঙ্গে দেখা হইয়া যায়।

গহীন অরণ্যে পুরাতন বাড়ীর ভগ্নাবশেষ অন্যান্য স্থানের চেয়ে অপেক্ষাকৃত সুউচ্চ ভূমি। এই সমস্ত স্থানে বাঘের আনাগোনা খুব বেশী। আমরা একদিন সূর্যাস্তের প্রাক্কালে শেখের খালের মধ্যে নৌকা রাখিয়া প্রায় দেড় মাইল পদব্রজে কালীবাড়ী, দুর্গ ও বহু ইমারতের ভগ্নাবশেষ দেখিতে যাই। আমাদের সঙ্গী শিকারীরা মধ্য পথে গিয়া শব্দ করিতে নিষেধ করে। কেননা তাহারা ব্যাঘ্র শিকার করিবে। আর আমরা চাই প্রত্নতাত্ত্বিক বিষয় সমূহের সন্ধান লইতে। তাহাদের নেশা ব্যাঘ্র শিকার। আমরা চাই কোন প্রকার ঐ রূপ ভয়াবহ স্থানে ব্যাঘ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ না হয়। আমরা কয়েকজন শব্দ করিতে বলি, তাহারা বাঁধা দেয়। অবশেষে আমাদেরই জয় হইল। একজন সুন্দরী বৃক্ষে কুঠার দ্বারা আঘাত করায় বন মধ্যে বিকট শব্দ প্রতিধ্বনিত হইল। আমাদের সঙ্গী একজন ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল। এই আওয়াজে মন্দিরের মধ্যে ও পার্শ্ববর্তী স্থানে যে বাঘ ছিল সরিয়া পড়িল। আমরা সেখানে যাইয়া সদ্যাগত ব্যাঘ্রের অসংখ্য পদচিহ্ন দেখিলাম। আমাদের শিকারী ডাক্তার সাহেব আফসোস্ করিতে

লাগিলেন। আমরা উহা হাসিয়া উড়াইয়া দিলাম। এই স্থানটি দুর্গম ও শ্বাপদসঙ্কুল জঙ্গল। সেইজন্য ঝানু শিকারীরাও এখানে আসিতে ভয় পায়। বনবিভাগের সাহসী কর্মচারীরাও সচরাচর এখানে প্রবেশ করে না। এখানে হো'দো ও হেন্তাল বৃক্ষ অত্যধিক। এইরূপ জঙ্গলই ব্যাঘ্রের আবাসভূমি।

একবার এক শিকারী বাঘের ছানা শিকার করিয়াছে। বাঘিনীর বাচ্চার প্রতি খুব দরদ। শিকারী বাচ্চা সহ নৌকায় চম্পট দিয়াছে। নদীর মধ্যখানে আসিয়া দেখিতে পাইল বাঘিনী হিংস্র দৃষ্টিতে তাকাইতেছে। উহার চক্ষু দিয়া যেন আগুনের স্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছে। বলিষ্ঠ বাহুর মাংসপেশীগুলি ক্রোধান্মত্ত অবস্থায় ফুলিতেছে। গায়ের লোমরাশি খাড়া হইয়াছে। চোখের উপর কাল ভ্রুদ্বয় উঠানামা করিতেছে। করুণ ও আবেগময়ী গর্জনের সঙ্গে মুখ দিয়া অবিরল ধারে লালা নির্গত হইতেছে। স্বচক্ষে এহেন অবস্থা দর্শন না করিলে এরূপ ভয়াবহ অবস্থা কল্পনা করা দুষ্কর।

বাচ্চার প্রতি ব্যাঘ্রের লেশ মাত্র দয়া নাই। স্ত্রী ও পুরুষ কুমীর উহাদের বাচ্চা খাইয়া ফেলে। ব্যাঘ্র বাচ্চা সামনে পাইলে নিশ্চিন্তমনে উদরস্থ করে। কিন্তু বাঘিনীর মমতা মায়ের ন্যায়। বাঘিনী বাচ্চাকে নয়নের সম্মুখে রাখে এবং খুব সতর্কতার সহিত উহাকে পাহারা দেয়। ব্যাঘ্র আসিলে বাঘিনী বাচ্চাকে সরাইয়া রাখে এবং উহাকে পথ ভুলাইয়া অন্যত্র সরাইয়া দিয়া আবার স্বীয় বাচ্চার নিকট ফিরিয়া আসে। প্রবীণ শিকারীরা কখনও বাঘের বাচ্চাকে শিকার করে না। বাচ্চা শিকারীকে বাঘিনী জীবন দিয়া আক্রমণ করিবার চেষ্টা করে। শুনা যায় কোন কোন সময় নৌকায় পড়িয়া বাঘিনী বাচ্চা কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে; আবার বহু মাইলব্যাপী শিকারীর নৌকার পিছনে ধাওয়া করিয়াছে।

সুন্দরবনের নরখাদক সম্পর্কে অসংখ্য চাঞ্চল্যকর কাহিনী শ্রুত হয়। ব্যাঘ্রে একবার নররক্ত পান করিলে উহার লোভ অতিমাত্রায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। পাগল হইয়া সে মানুষের সন্ধানে ছুটাছুটি করে। বনবিভাগের জনৈক অভিজ্ঞ কর্মচারী বলিয়াছেন যে মানুষের রক্ত পানের পর ব্যাঘ্রের ধীশক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সে তখন অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করে। এই ধরনের নরখাদক শিকার অতীব কঠিন। এই সমস্ত ব্যাঘ্র দিনের বেলায় কোন লোককে জঙ্গলের মধ্যে নিরিখ

করিলে রাত্রে তাহাকে অত্যন্ত সাবধানতার সহিত আক্রমণ করিবেই। দেহে গুলী লাগিলে উহাদের কিছু হয়না। মস্তকের গুলীতেও বাঘ কোন কোন সময় আপাততঃ বাঁচিয়া যায়। অবশ্য পরে মারা যায়। গুলী করা বাঘ পলায়ন করিলে অত্যন্ত সাবধানতার সহিত শিকারী সাধারণত খোঁচ বা পাগমার্গ দেখিয়া উক্ত ব্যাঘ্রের পিছনে ধাওয়া করে। অনেক দূরে যাইয়া প্রবীণ শিকারী বুঝিতে পারে বাঘ চক্র দিয়া চলিতেছে। এই সময় অসাবধানতা অবলম্বন করিলে জীবনের সমূহ বিপদ আছে। চক্রদান অভিজ্ঞ নরখাদকের এক অভিনব কৌশল। সাধারণ বাঘ এসব জানে না। অভিজ্ঞ শিকারীর ন্যায় মানুষখেঁকো বাঘে এই বিদ্যা আয়ত্ব করে। বাঘ যদি জানিতে পারে শিকারী পিছনে ধাওয়া করিয়াছে, তখন সে পার্শ্ববর্তী কোন জায়গায় লুকাইয়া ওত পাতিয়া থাকে না। এইরূপ করিলে ঝানু শিকারী খুব সাবধানতার সহিত খোঁচ অনুসরণ করিয়া সামনা সামনি বাঘকে গুলী বিদ্ধ করিতে পারিবে। সেইজন্য মানুষখেঁকো বিছুদূর ব্যাপী বৃত্তাকারে ঘুরিতে থাকে। গভীর অরণ্যানীর মধ্যে সহসা দিক্ হারাইবার সম্ভাবনা বেশী। সাধারণ শিকারীর পক্ষে সে সোজা না গোলাকারে চলিতে থাকে বোঝা মুশকিল। শিকারের নেশায় সে কোন্ দিকে যায় খেয়াল করিতে পারেনা। সুন্দরবনের চতুর্দিকে একই গাছ, একই দৃশ্য, তদুপরি যদি সূর্য মাথার উপর আসে তাহা হইলে দিক্ ভ্রম হইবার সম্ভাবনা আরও অধিক। নরখাদক এই সুযোগ পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করে। সে একটি চক্র ঘুরিয়া শিকারীর পিছনে পড়িয়া যায়। শিকারী ভাবে বাঘ তাহার সম্মুখ দিয়া চলিতেছে। কিন্তু বাঘ ততক্ষণে তাহার পিছন হইতে অতর্কিতে ঘাড়ের উপর লাফাইয়া পড়ে। বাঘের চক্র দেওয়ার বিষয় অভিজ্ঞ শিকারী বুঝিতে পারে।

সুন্দরবনের সীমান্তে ঐতিহাসিক বেতকাশী গ্রাম। উহার পার্শ্ববর্তী গ্রামের এক বৃদ্ধের নিকট হইতে জানা যায় যে, তাহারা একখানি নৌকাযোগে জঙ্গলের মধ্যে অবস্থিত নদীতে মৎস্য ধরিতে যায়। এই বৃদ্ধের জীবনে বিভিন্ন সময় তাহারই সম্মুখে চার ব্যক্তিকে ব্যাঘ্রে ধরিয়া উদরস্থ করিয়াছে, তবুও বৃদ্ধ মৎস্য শিকার বন্ধ করে নাই। একদা মর্জাত নদীর তীরে কেওড়াসুতীর জঙ্গলে তাহারা ৪ জনে মৎস্য ধরিতে যায়। শীতের রাত্রি ৪ জনে পরপর কাঁথা গাত্রে দিয়া শয়ন করিয়াছে। প্রথম তিনজন বাদ দিয়া শেষোক্ত ব্যক্তিকে অকস্মাৎ ব্যাঘ্রে আক্রমণ

করে এবং উহার হিংস্র থাবায় গুরুতর আঘাত পাইয়া নাড়ীভূঁড়ি বাহির হইয়া যায়। ব্যাঘ্র দন্ত দ্বারা ঐ ব্যক্তির গাত্রের কাঁথা লইয়া চলিয়া যায়। উক্ত ব্যক্তি নিমেষের মধ্যে প্রাণত্যাগ করে। এখন প্রশ্ন — ব্যাঘ্রে প্রথম তিনজনকে আক্রমণ না করিয়া শেষোক্ত ব্যক্তিকে কেন আক্রমণ করিল? শিকারীরা যেমন ব্যাঘ্রের অনুসরণ করে, তেমন মানুষ খেঁকোরা শিকারের জন্য মানুষের গতিবিধি অতীব সন্তর্পনে আড়ালে থাকিয়া লক্ষ্য করে। পূর্বাহ্নে সে যাহাকে লক্ষ্য করিবে তাহাকেই আক্রমণ করিবে, অন্য কাহাকেও নহে। উহাদের হিংস্র লালসা কোন ব্যক্তি বিশেষের উপর আপতিত হয় এবং যে কোন প্রকারে তাহাকে হত্যা করা ব্যাঘ্রের নেশা হইয়া দাঁড়ায়। সেইজন্য বাঘ স্বীয় লক্ষীভূত ব্যক্তির প্রাণ হরণ করিয়া থাকে।

ব্যাঘ্রও শিকারীর ন্যায় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করে। একদা বাওয়ালীদের এক নৌকায় একজন জ্বরাক্রান্ত হয়। ঐ লোকটিকে দিবাভাগে বৃক্ষ ছেদন করার সময় ব্যাঘ্রে লক্ষ্য করিয়াছে। সঙ্গীরা সন্ধ্যার পর মস্তকে জল ঢালিয়া তাহার শুশ্রূষা করিতেছিল। এমন সময় ব্যাঘ্র অতীব সন্তর্পনে নৌকায় প্রবেশ করিয়া খোলের নীচে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। সুযোগমত জ্বরাক্রান্ত ব্যক্তির উপর পতিত হইয়া উহাকে আক্রমণ করে এবং স্কন্ধ কামড়াইয়া ধরিয়া জঙ্গলের মধ্যে উধাও হয়। এই ধরণের দুর্ঘটনার কথা মধ্যে মধ্যে শ্রুত হয়।

ব্যাঘ্র অতীব হুশিয়ার জন্তু। কাঠুরিয়ার কুঠারাঘাতের শব্দের সহিত শব্দ মিলাইয়া পা ফেলিতে ফেলিতে ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়। কোন কোন সময় কাঠুরিয়াকে এমনই সতর্কতার সহিত আক্রমণ করে যে সে ঘুণাক্ষরেও ব্যাঘ্রের উপস্থিতি বুঝিতে পারেনা।

চাঁদপাই রেঞ্জে একটি ব্যাঘ্র একদল কাঠুরিয়ার মধ্যে একজনকে পূর্ব হইতে নিরিখ্ করিয়া অনুসরণ করিতে থাকে। ব্যাঘ্রটি অন্য পারে ছিল। উহার এক মাত্র লক্ষ্য উক্ত লোকটি। সুযোগ পাইয়াও সে অন্য কাহাকে আক্রমণ করিল না। অতঃপর ব্যাঘ্রটি পূর্বোক্ত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া খাল পার হইবার জন্য লম্ফ দিয়া খালের মধ্যে কর্দমাক্ত স্থানে পড়িয়া গেল। সে পূর্ব স্থানে ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় লম্ফ প্রদান করিল। কিন্তু এবারও কাদার মধ্যে

নিপতিত হইল। পূর্বস্থানে গিয়া বাঘ গোঙাইতে লাগিল এবং মুখ দিয়া অবিরল ধারে লালা নিঃসৃত হইতেছিল। বাঘের ভীম গর্জনে বনস্থলী প্রকম্পিত হইল। ব্যাঘ্রটি এইভাবে আরও কয়েক বার লম্ফ দিয়া বিফল মনোরথ হইল। ব্যাঘ্রের আক্রোশ ও লক্ষ্য সেই ব্যক্তি। শিকারের নেশা চাপিলে এই হিংস্র জন্তু অধিকতর হিংস্র হয়। ইহার ক্রোধ অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় ধূমায়িত হইতে থাকে। গোঙানির সঙ্গে সঙ্গে উক্ত ব্যাঘ্রটির মুখ দিয়া প্রচুর পরিমাণ লালা নির্গত হয়। উহার পরিমাণ প্রায় এক কলসীপূর্ণ হইবে। খালের প্রতিবন্ধকতার জন্য লোকটি প্রাণে বাঁচিয়া গেল।

সুন্দরবনের ব্যাঘ্রে অতি সহজে মানুষ উদরস্থ করিয়া থাকে। বেশী দিনের কথা নয়। কয়েক বৎসর পূর্বে এক গায়ের দুইজন—পিতা ও পুত্র শরণখোলা ফরেষ্ট অফিস হইতে আদেশ পত্র লইয়া টাইগার পয়েণ্টে উলুখড় সংগ্রহ করিতে যায়। ফিরিবার পথে একটি বৃহৎকায় মৃন্ময়পাত্রে ১২ ফুট লম্বা একটি বোড়া (পাইথন) সর্প ধরিয়া আনে। বৃদ্ধ কৃষক বেআইনীভাবে সর্প ধরিয়াছে, সেজন্য তাহাকে ফৌজদারীতে সোপর্দ হইতে হইবে। সেই ভয়ে সে প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতে লাগিল, "আমি এই সর্প ধরার বিষয় কিছুই জানিনা। অন্য একটি লোক ধরিয়া এই মৃন্ময় পাত্রে আমার সঙ্গে পাঠাইয়াছে। আমি যদি মিথ্যা কথা বলি তবে যেন আমাকে ব্যাঘ্রের মুখে জীবন দিতে হয়। লোকটি দায় পড়িয়া মিথ্যা বলিয়াছিল। উক্ত সর্পটি তখন একটি বৃহৎ কাঠের খাঁচার মধ্যে পুরিয়া লাহোর চিড়িয়াখানায় প্রেরিত হয়। পিতা ও পুত্র খড় সংগ্রহের জন্য পুনরায় জঙ্গলে গেল। কয়েকদিন পরে দেখা গেল পুত্রটি একা ফিরিয়া আসিয়াছে এবং নৌকায় বসিয়া পাগলের ন্যায় প্রলাপ বকিতেছে। জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল, তাঁহার পিতাকে জঙ্গলের মধ্যে খড় কাটিবার সময় বাঘে খাইয়াছে। মিথ্যা প্রতিজ্ঞার ফল উক্ত লোকটি হাতে নাতে পাইয়াছিল।

সুন্দরবনের ব্যাঘ্র ও উহার শিকার পদ্ধতি সম্পর্কে বহু অভিজ্ঞ বনবিভাগের কর্মচারী ও স্থানীয় শিকারীদের নিকট হইতে বহু মূল্যবান তথ্য অবগত হইয়াছি। একদা জনৈক কর্মচারী মোটর লঞ্চ যোগে শিবসা নদীর মধ্যদিয়া যাইতেছিলেন। এমন সময় একটি বাঘিনী সাঁতরাইয়া নদী পার হইতেছিল। এ সুযোগে তিনি ব্যাঘ্রের মস্তকে গুলী করিয়া উহাকে শিকার করেন। ব্যাঘ্রটি যখন নদী মধ্যে

ব্যাঘ্র-দন্তের আক্রমণ চিহ্ন—১৪৯

ডুবিয়া যাইতেছিল, সেই সময় দড়ি বাঁধিয়া উহাকে লঞ্চের উপর উঠান হয়। এই হিংস্র জন্তুটির দৈর্ঘ্য ছিল ৯´ ফুট ৯´´ ইঞ্চি। এই ধরণের সহজ শিকারের কথা আর শুনা যায় নাই।

উপরোক্ত অফিসারের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, ব্যাঘ্র গুলী করিলে বন্দুকের আওয়াজ অনুসরণ করে। গুলী বিদ্ধ হইলে, সে উদগ্র নেশায় পাগল-প্রায় হইয়া উঠে। দেহের সমস্ত শক্তি দিয়া সে শিকারীকে আক্রমণ করিবার চেষ্টা করে। বাঘের প্রতিহিংসাবৃত্তি তখন চরম আকার ধারণ করে। গুলীর আঘাতে ব্যাঘ্র না পড়িলে শিকারী জীবন আশঙ্কা প্রবল হইয়া পড়ে। তিনি বর্ণনা করিয়াছেন যে একদা সুপতি ফরেষ্ট অফিসে বাওয়ালীরা সংবাদ দিল যে অদূরে একটি ব্যাঘ্র ঘুমন্ত অবস্থায় পড়িয়া আছে। তৎক্ষণাৎ কার্তুজ ও বন্দুকসহ তাঁহারা ডিঙ্গি নৌকায় ব্যাঘ্র শিকারে যাত্রা করেন। তাঁহারা দেখিতে পাইলেন ব্যাঘ্রটি নদীতীরে লম্বালম্বিভাবে শুইয়া আছে। সঙ্গী ভদ্রলোক গুলী করিলেন, কিন্তু উহাতে বাঘ পড়িল না। পরন্তু সে তীরবেগে শিকারীর দিকে ছুটিয়া আসিল। শিকারীরা নদীর মধ্যে, সেজন্য ব্যাঘ্রটি তীর পর্যন্ত আসিয়া ফিরিয়া গেল। ব্যাঘ্র আক্রান্ত হইলে কি প্রকারে সোজা তীরবেগে শিকারীকে আক্রমণ করে, তাঁহারা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন।

অন্য আর এক বর্ণনায় জানা যায়, এই হিংস্র জন্তু সাংঘাতিক প্রতিহিংসাপরায়ণ। প্রতিহিংসা বা আক্রোশ হইলে সে মারমুখো হইয়া উঠে। হয় নিজে মরে না হয় শিকারের স্কন্ধ হইতে রক্তপান করিয়া প্রতিহিংসা নিবৃত্তি করে। এ সম্পর্কে একটি কাহিনী তিনি স্বীয় অভিজ্ঞতা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

একদা দুইজন কাঠুরিয়া জঙ্গলে প্রবেশ করায় উহাদের মধ্যে একজনকে ব্যাঘ্রে নজর করিয়াছে। ঐ ব্যক্তিকে ব্যাঘ্রে আক্রমণ করে। আক্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গী একটু দূরে ছিল। সে দুর্দমনীয় সাহসের সহিত কুঠার দ্বারা হিংস্র জন্তুটিকে আক্রমণ করে। আক্রান্ত ব্যক্তিকে ব্যাঘ্রে কামড় দেয়। ব্যাঘ্রে শুধু কামড় দিলে মানুষ মরে না, ঝট্‌কানি না দেওয়া পর্যন্ত। কুঠারের আঘাতে ব্যাঘ্রটি তখন সরিয়া পড়ে। হংসরাজ নদীর তীরে ধোন্ধল কুপ অফিসে ঐ দুইটি লোক আসিয়া এই ঘটনা বর্ণনা করে। প্রাথমিক চিকিৎসার পর ব্যাঘ্রাহত লোকটিকে

হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। ইতিমধ্যে ব্যাঘ্রটি উহাদের নৌকা অনুসরণ করিতে করিতে দেড় মাইল দূরবর্তী কুপ অফিসের পিছনে অতীব সংগোপনে বৃক্ষের নীচে বসিয়া সেই দুইটি লোককে আক্রমণ করিবার সুযোগ খুঁজিতে থাকে। বাপ্‌রে বাপ! কি সাংঘাতিক জিদ! প্রতিটি কুপ অফিসের পিছনে প্রায়ই একটি খাল থাকে এবং তথায় লোকে নৌকা রাখে। পূর্বোক্ত দুই ব্যক্তির নৌকাও সেইস্থানে রাখিয়াছে। ইতিমধ্যে ব্যাঘ্রটি ভয়ংকর রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। হিংস্র লালসায় সে উগ্রমূর্তি ধারণ করিয়াছে। শিকার হস্তচ্যুত হওয়া এবং কুঠারাঘাতের প্রতিশোধ লইবার জন্য উন্মাদ হইয়া উঠিয়াছে। ব্যাঘ্রটি মর্মে মর্মে নিজেকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত মনে করিতেছে। এমতাবস্থায় ব্যাঘটিকে একজন বোটম্যান বৃক্ষতলে দেখিতে পাইয়া কুপ অফিসের সুউচ্চ টোঙের উপর হইতে গুলী চালনা করে। মস্তকের আঘাতে উহার ব্যাঘ্রলীলা সাঙ্গ হয়। পরিক্ষা করিয়া দেখা গেল, কুঠার আঘাত প্রাপ্ত সেই ব্যাঘ্রটি।

খুলনার কৃতি সন্তান মরহুম জালালউদ্দীন হাসেমী। একদা এক নরখাদক তাঁহার একখানি পা কামড়াইয়া ধরে। দেহ হইতে পদখানি পৃথক হইয়া যায়। পরে আজীবন তিনি একপায়ে ভর করিয়া লাঠির সাহায্যে চলাফেরা করিয়াছেন। হাসেমী সাহেব বলিতেন :

"এক ঠ্যাং দিয়েছি বাঘের মুখে :
আর এক ঠ্যাং দিব ইংরেজের মুখে"।

স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় ইংরেজ জাতির অমানুষিক অত্যাচারের প্রতিবাদে তিনি এই কথা বলিতেন।

বাঘে-মানুষে যুদ্ধ

॥ এগার ॥

সুন্দরবনের নিকটবর্তী গ্রামের অধিবাসী, শিকারী, বাওয়ালী, মধু সংগ্রহকারী মৌয়াল প্রভৃতি মানুষ চিরদিন ব্যাঘ্রেব সহিত যুদ্ধ করিয়া জীবন ধাবণ করে। কথায় বলে, "ডাঙ্গায় বাঘ, জলে কুমীর।" শুধু কুমীর ও ব্যাঘ্র নহে, হাঙ্গর, বিষাক্ত সর্পও মানব জাতির ভয়াবহ শত্রু। ব্যাঘ্রের ন্যায় মানুষের মহাশত্রু সুন্দরবনে আর নাই। এই হিংস্র জন্তুর সহিত চিরদিন মানুষ যুঝিয়া আসিতেছে। সুন্দরবনের মানুষ কি ভাবে বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করে এবং শিকারের সময় ব্যাঘ্রে কিভাবে মানুষ লইয়া খেলা করে সে সম্পর্কে আমরা কতিপয় জাজ্জ্বল্যমান ঘটনার উল্লেখ কবিব। বাঘে মানুষ শিকার করিয়া থাকে। এইরূপ বাঘ ও মানুষের মধ্যে ভয়াবহ যুদ্ধই আমাদের আলোচ্য বিষয়।

বাকেবগঞ্জ ও খুলনা জিলার সীমান্তে সুপতি ফরেষ্ট ষ্টেশন। কয়েক বৎসর পূর্বে এই এলাকাব অধীন ৫ নম্বর ঘেরে ব্যাঘ্রের ভয়ানক উপদ্রব হয়। সেই জন্য মধু সংগ্রহকারী মৌয়ালদের উক্ত জঙ্গলে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিয়া দেওয়া হইত। একদল মৌয়াল—সংখ্যায় পাঁচ জন। তাহারা মনে করিল যে ঐ জঙ্গলে যখন অন্য কেহ যায় নাই, তখন প্রচুর মধু তথায় পাওয়া যাইবে ব্যাঘ্রভীতি তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া অতি লোভের বশবর্তী হইয়া তাহারা মধু সংগ্রহের জন্য সেই জঙ্গলে প্রবেশ করে। জঙ্গল মধ্যে তাহাদের একজনকে ব্যাঘ্রে আক্রমণ করিয়া মস্তকের পিছনে ও কপালে দুইপাটী দাঁত বসাইয়া দেয়। ব্যাঘ্রের হিংস্র কামড় ও ঝট্‌কানিতে মস্তকের খুলি ভাঙ্গিয়া সে তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সঙ্গী চারিজন সজোরে লাঠি দ্বারা আঘাত করিতে থাকায় মৃতের লাশ ফেলিয়া ব্যাঘ্রটি আর একজনকে আক্রমণ করিল। পুনরায় সকলে লাঠি দ্বারা ব্যাঘ্রের সঙ্গে অসীম সাহসের সহিত যুদ্ধ করিয়া দ্বিতীয় লোকটিকে বাঁচাইতে সক্ষম হইল। এইভাবে বীরত্বের সহিত এহেন হিংস্র জন্তুর সঙ্গে সম্মুখ সমরে যুদ্ধ করিয়া তাহারা মৃত সঙ্গীর লাশ উদ্ধার করিতে সক্ষম হইয়াছিল। এই ধরনের বাঘে মানুষে লড়াই সুন্দরবনে বিরল নহে।

কপোতাক্ষী ও খোলপেটুয়া নদীর সঙ্গমস্থলে ঘড়িলাল পুলিশ ক্যাম্প এবং উহার দক্ষিণে গোলখালী ও আংটীহারা গ্রাম। ইহার দক্ষিণে কোন লোকালয় নাই। শুধু বন আর বন। ইহার পশ্চিমে নদী এবং নদী তীরে সুন্দরবন এবং ব্যাঘ্রের লীলাভূমি। এতদঞ্চলের কোন কোন গ্রাম শুধু ক্ষুদ্র একটি খালের দ্বারা সুন্দরবন ও লোকালয়ের সীমা নির্দেশ করিতেছে। এই সমস্ত সীমান্ত গ্রামে কোন কোন সময়ে ব্যাঘ্র আসিয়া গরু, ছাগল ধরিয়া লইয়া যায়। খবর পাইলে জনগণ দলবদ্ধ হইয়া লাঠি ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া ব্যাঘ্র আক্রমণ করে। এপারে মানুষ, ওপারে বাঘ, মাঝে একটি ক্ষুদ্র খাল। বাঘের সঙ্গে লড়াই করিয়া ইহারা জীবন ধারণ করে। বিপদের মধ্যে চিরদিন বসবাস করিলেও ইহাদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার হয় না।

খোলপেটুয়ার পূর্বতীরে চাঁদনীমুখো গ্রাম, পশ্চিম তীরে গভীর অরণ্যানী। কোন কোন সময়ে গ্রামে বাঘ আসিয়া থাকে। প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বের ঘটনা। বুড়ীগোয়ালিনী অফিসের পার্শ্বস্থ জঙ্গলে একটি ব্যাঘ্রে তিন ব্যক্তিকে আক্রমণ করিয়া ভক্ষণ করে। অকস্মাৎ ঐ ব্যাঘ্রটি উক্ত গ্রামে প্রবেশ করিয়া একটি গো-বৎস আক্রমণ করে। এই সংবাদে গ্রামের লোকেরা ছুটিয়া ব্যাঘ্রটিকে তাড়া করিয়া আক্রমণ করে। চরের উপরিস্থিত জঙ্গলে ব্যাঘ্রটি লুকাইয়া থাকে। নদী তীরের ভেড়ীর উপর দাঁড়াইয়া ১৮টি গুলী করা হয়। অসংখ্য লোকে এই দৃশ্য দেখিতে থাকে। ঘন বৃক্ষাদির জন্য গুলী বাঘের গাত্রে লাগে না। সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইলে শিকারী মেহের শেখ বৃক্ষে আরোহণ করিয়া আসন গ্রহণ করে। ইতিমধ্যে ৫। ৬ জন লোক লাঠি দ্বারা ব্যাঘ্রকে আক্রমণ করে। তন্মধ্যে ৩ জনকে ব্যাঘ্রে আক্রমণ করিয়া আঘাত করে। আক্রান্ত ব্যক্তিদের একজন তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। শেষ পর্যন্ত মেহের শেখ গুলী করিয়া ব্যাঘ্রটিকে মারিয়া ফেলে।

সুন্দরবনের সন্নিকটে ঝানু শিকারী ডাক্তার তমিজউদ্দীনের বাড়ী। গ্রামের নাম গোড়ইখালী। মাঝখানে একটি বিল — এপারে লোকালয় এবং অন্যপারে ব্যাঘ্র ও হরিণের লীলাক্ষেত্র গভীর বনানী। এই শিকারী জীবনে কয়েকবার বাঘের হাতে পড়িয়াছেন এবং তাঁহার হাতেও কয়েকটি হিংস্র ব্যাঘ্র মারা

পড়িয়াছে। ব্যাঘ্রভীতি তাঁহার অন্তরে নাই। হিংস্র জন্তুর নাম শুনিলে শিকারী আনন্দে নাচিয়া উঠেন। শিকারের নেশা তাঁহাকে পাগল করিয়া তুলিয়াছে। তিনি শিকারের একটি চাক্ষুষ বর্ণনা দিয়াছেন।

"ইং ১৯৬০সালের আগষ্ট মাস। শিবসা নদীর পূর্ব তীরে বিখ্যাত শেখের ট্যাকের জঙ্গল। ইহার উত্তর পার্শ্বে বাদিয়ার খাল। উহার দক্ষিণ তীরে আমি একটি বন্য মুরগী লক্ষ্য করিয়া গুলী ছুড়িবার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকি। এমন সময় খালের পার্শ্বে রঙীন কম্বল গায়ে কেহ শুইয়া আছে মনে হইল। অচিরাৎ বুঝিতে পারিলাম একটি ব্যাঘ্র শায়িত অবস্থায়। কাল বিলম্ব না করিয়া ব্যাঘ্রটিকে গুলী করিলাম। গুলীর আঘাতে সে ভীষণ গোঁ গোঁ শব্দে চিৎকার দিল। এই হিংস্র চিৎকারে যেন সমগ্র বনভূমি প্রকম্পিত হইল। বাঘের গোঙানি আর হিংস্র চাহনি মিলিয়া এক ভয়াবহ মূর্তি ধারণ করিল। তৎক্ষণাৎ দ্বিতীয়বার গুলী করায় বাঘ পড়িয়া গেল। ব্যাঘ্র মৃত জানিয়া উহার সন্নিকটে গিয়া বন্দুকের অগ্রভাগ দ্বারা উহার দেহে ধাক্কা মারি। সেই ধাকায় ব্যাঘ্রটি গর্জন করিয়া আমাকে আক্রমণ করে। আমিও বন্দুক দ্বারা সাহসের সহিত উহা প্রতিহত করি। সৌভাগ্যক্রমে আগ্নেয়াস্ত্র হইতে আপনা আপনি গুলী হইয়া বাঘের গাত্রে আঘাত লাগিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। আজিও সেই ভীম গর্জন, সেই ভয়াবহ মূর্তি, হিংস্র চাহনি, সেই গোঙানি এবং সেই আক্রমণের কথা মনে করিলে আমি শিহরিয়া উঠি। ব্যাঘ্রের আলোচনা করিলে সেই ভয়াবহ দৃশ্যের কথা অন্তরে জাগরূক হয়। এ জীবনে সে দৃশ্য ভুলিবার নহে।" শিকারী ব্যাঘ্রের মস্তক শুকাইয়া সযত্নে গৃহে রাখিয়া দিয়াছেন এবং উহার দন্তগুলির দ্বারা একখানি সৌখিন ছড়ি প্রস্তুত করিয়াছেন।

উক্ত শিকারীর বর্ণনা হইতে জানা যায় যে — তিনি একদা ব্যাঘ্র শিকারের জন্য ভদ্রানদীর তীরে বাইনতলা দোয়ানের মুখে জনৈক সঙ্গীসহ বৃক্ষে আরোহণ করিতে উদ্যত এমন সময় অকস্মাৎ ব্যাঘ্রের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হয়। ব্যাঘ্রের সন্ধান করিবার পূর্বেই ব্যাঘ্র তাঁহাদিগকে সন্ধান করিয়াছে। ব্যাঘ্র দর্শনে সঙ্গীর অবস্থা আশঙ্কাজনক। সে কুমীর হাঙ্গরের আক্রমণ ভুলিয়া নদী মধ্যে ঝম্প দিয়া কোন প্রকারে সাঁতরাইয়া প্রাণ রক্ষা করিল। "বন্ধুর পশ্চাৎ অপসারণে

আমিও বিব্রত হইয়া পড়ি এবং একটু ঘুরিয়া গোলগাছের পিছনে দাঁড়াইয়া দুর্জয় সাহসে ভর করিয়া বন্দুক তুলিয়া ব্যাঘ্রের দিকে লক্ষ্য করি। এতদর্শনে উক্ত হিংস্র জন্তুটি ভীষণ বেগে স্বীয় লেজ ঘুরাইতে থাকে এবং ভীম রবে বার বার গোঙানি দেয়। ব্যাঘ্রের মুখ দিয়া লালা নিঃসৃত হইতে থাকে। সে কি বিকট মূর্তি! উহার হিংস্র চাহনিতে আমিও সন্ত্রস্ত হইয়া পড়ি। বৃক্ষশ্রেণী মধ্যে গুলী করাও সম্ভব নয়। গুলী করিলেও রক্ষা ছিল না। আমি ব্যাঘ্রের গর্জনে ভীত এবং ব্যাঘ্র বন্দুক দর্শনে সন্ত্রস্ত। অনোন্যপায় হইয়া আমিও বন্দুক সহ নদীতে পড়িয়া কোন প্রকারে প্রাণ বাঁচাইতে সক্ষম হই।

আরজান সর্দার নামক জনৈক বৃদ্ধ শিকারীর বাড়ী পাইকগাছা থানার অন্তর্গত চৌকুনী গ্রাম। অভাবের তাড়নায় আরজান স্বীয় গ্রাম ত্যাগ করিয়া শিবসা নদীর পূর্ব তীরে সুতারখালী গ্রামে বসবাস করিতেছে। আরজান আজিও জীবিত আছে। এই দুর্জয় শিকারী সম্পর্কে অনেক কাহিনী শুনা যায়। একদা উক্ত শিকারী ব্যাঘ্র শিকারের উদ্দেশ্যে মৃত্তিকার হাঁড়ি এবং বেত সহ জঙ্গলে প্রবেশ করে। আরজান কৃত্রিম উপায়ে ব্যাঘ্রের ন্যায় গর্জন করিতে আরম্ভ করিল। কয়েক মিনিট অন্তর এই কৃত্রিম গর্জন চলিতে থাকে। আরজানের কৌশলে ব্যাঘ্র আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু কেমন করিয়া সে গুলী করিবে? সে দেখিল ব্যাঘ্রটি ছটফট করিতেছে এবং উহার সর্বাঙ্গ দুলিতেছে। বাঘ প্রমত্ত পাগল, এক নিমেষও অপেক্ষা করিতে পারিতেছে না। ব্যাঘ্রকে রুখিবার ক্ষমতা আরজানের নাই। পক্ষান্তরে উহাকে গুলীবিদ্ধ করিতে না পারিলে শিকারীর রক্ষা নাই। হিংস্র ব্যাঘ্র তাহাকে শেষ করিয়া দিবে। আরজান হাঁড়ি টানিয়া ব্যাঘ্রের ন্যায় আওয়াজ তুলিল। বাঘ বাঘিনীর সাক্ষাতের জন্য উন্মত্ত। সে খালের মধ্যে ঝাপাইয়া পড়িল। আরজান হাঁড়িতে আবার টান দিল। বাঘও তাহার দিকে আগাইয়া আসিল। শিকারী এবার স্বীয় মুখ দিয়া গর্জন করিতে আরম্ভ করিল এবং বন্দুক উঁচু করিয়া ধরিল। ব্যাঘ্র মাত্র ১০ হাত দূরে। সে মদমত্ত অবস্থায় শিকারীর দিকে তাকায়। বীরত্বের সহিত আরজান গুলীবিদ্ধ করিয়া ব্যাঘ্রটিকে মারিয়া কৃতিত্ব অর্জন করে।

অন্য আর একটি ঘটনা হইতে জানা যায় যে, আরজান তাহার এক সঙ্গীকে লইয়া জঙ্গলের মধ্যে ব্যাঘ্রের সাক্ষাৎ পাইয়াছে। বাঘ অন্যূন ১২ হাত দূরে।

শিকারীকে দেখিবামাত্র বাঘ দুই বাহুর উপর দাঁড়াইয়া উঁচু হইয়া উঠিয়াছে। শিকারী ও ব্যাঘ্র একে অন্যের দিকে তাকাইতেছে। উভয়ই হতভম্ব এবং উভয়েরই চক্ষু হিংস্র হইয়া উঠিয়াছে। শিকারী বীর বিক্রমে পলকহীন নেত্রে বাঘের দিকে তাকাইয়া আছে। ব্যাঘ্রের গোঙানির সঙ্গে সঙ্গে শিকারী জোরে গালাগালি করিতেছে। হিংস্র জন্তুর মুখ দিয়া লালা নির্গত হইতেছে। বাঘ গজ্ গজ্ শব্দ করিতেছে। বাঘ যেমন গোঁ গোঁ শব্দ করে শিকারীও অবিকল সেইরূপ শব্দ করে। বাঘ গোঁ গোঁ শব্দ করিতে করিতে বীভৎস ভাবে গাঁক্ করিয়া উঠে। শিকারীও তেমনি গাঁক্ করিয়া উঠে। শিকারী গুলী করা সমীচীন মনে করিল না। ব্যাঘ্র ও শিকারী শ্রান্ত ক্লান্ত অবস্থায় ভিন্নমুখী হইয়া প্রস্থান করিল।

সুন্দরবনের পার্শ্বেই বিখ্যাত শিকারী চিকন গাজীর বাড়ী। অমাবস্যার সময় স্রোতাবেগ অত্যধিক। নদীতে কানায় কানায় জোয়ারের জল — ভরা ভাদরের ভরা নদী। খাল নালার অবস্থাও তদরূপ। বহুদিন আগের কথা— শিকারী চিকন গাজী একটি গাদার বন্দুক হস্তে তেতুল তলার খাল অতিক্রম করিয়া জঙ্গলে প্রবেশ করিয়াছে। সম্মুখে অসংখ্য হ'দো গাছের ঝোপ, যাহার নীচে ব্যাঘ্র লুক্কায়িত থাকে। নিঝুম নিরালা বন, চারিদিকে যেন থমথম করিতেছে। জঙ্গলের পারিপার্শ্বিক অবস্থা দর্শনে শিকারীর অন্তরে এক অভাবনীয় ভাবের উদয় হইল। সে মনে করিল এই খানেই ব্যাঘ্র লুক্কায়িত আছে ব্যাঘ্রের কথা মনে করিয়া তাহার অন্তরে ভীতির সঞ্চার হইল। আজ তাহার নছিব মন্দ। গাদার বন্দুকে ব্যাঘ্র শিকার দুরূহ ব্যাপার। সে দ্রুত এক বৃক্ষ শাখায় আরোহণ করিয়া আসন গ্রহণ করিল। দেখিতে পাইল নিকটেই একটি বাঘ ওত পাতিয়া শুইয়া আছে এবং মধ্যে মধ্যে মস্তক নড়াইতেছে। শিকারী ভীত ও সন্ত্রস্ত— চিন্তায় তাহার অন্তর ব্যাকুল। বিশেষ চিন্তা গাদার বন্দুক এবং গুলী যদি ঠিকমত না লাগে! শক্ত ডাল হইতে সে বৃক্ষের পাতা নড়াইয়া শব্দ করিল। ইহাতে ব্যাঘ্র মুখ তুলিয়া দাঁড়াইবা মাত্র শিকারীর অব্যর্থ গুলী উহার কপালে লাগিয়া গেল। লৌহ নির্মিত খেপলা জালের কাঠির দ্বারা সে গুলী করিয়াছিল। গুলীর আঘাতে ব্যাঘ্রটি ভীষণ গর্জন করিয়া লম্ফ প্রদান করিল। ইহাতে যেন

চারিদিকের জঙ্গল প্রকম্পিত হইল। দেখা গেল গুলী কপালে লাগিয়া স্কন্ধের পার্শ্ব দিয়া বাহির হইয়াছে এবং উহার ব্যাঘ্রলীলা সাঙ্গ হইয়া গিয়াছে।

সুন্দরবনের সংলগ্ন অসংখ্য গ্রাম আছে। একদিকে সুন্দরবন অন্যদিকে লোকালয়। এই সমস্ত গ্রামের লোকে ঘরে বসিয়া সুন্দরবনের ব্যাঘ্র ও হরিণের ডাক শুনিতে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে! অনুরূপভাবে ব্যাঘ্র ও হরিণে জঙ্গলের মধ্য হইতে জনকোলাহল শুনিয়া থাকে। কোন কোন সময় গ্রামে ঢুকিয়া ব্যাঘ্রে গবাদি পশু আক্রমণ করিয়া ধরিয়া লইয়া যায়। জনৈক বিখ্যাত শিকারীর বর্ণনায় জানা যায় যে, সে একদিন দুইজন সঙ্গী সহ গভীর অরণ্যে প্রবেশ করে। অকস্মাৎ তাহারা একজোড়া বৃহৎকায় বাঘের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। সঙ্গীদ্বয় ব্যাঘ্র দর্শনে ভীত হইয়া একে অন্যকে জড়াইয়া বিকট চীৎকারে বনভূমি কাঁপাইয়া তুলিতেছিল। ব্যাঘ্র দুইটি শিকারীর দিকে হিংস্র চাহনি এবং শিকারীও ব্যাঘ্রদ্বয়ের দিকে তেমনই ভাবে একনেত্রে তাকাইয়া আছে! সে দৃশ্য ভুলিবার নহে। শিকারী দুর্জয় সাহসের সহিত ব্যাঘ্রদ্বয়কে আক্রমণ করিতে উদ্যত এমন সময় উহারা ভীষণভাবে গোঁ গোঁ শব্দ করিতে করিতে অরণ্যানীর মধ্যে অন্তর্হিত হইল।

মেহের গাজী সুন্দরবনের দুর্জয় শিকারী। গাবুরা ১০ নং সোরা গ্রামে তাহার বাড়ী। সুন্দরবন খ্যাত শিকারী বংশে মেহেরের জন্ম। জঙ্গলের সন্নিকটে বাড়ী, জঙ্গলই তাহার কর্মক্ষেত্র এবং জঙ্গলেই তাঁহার মৃত্যু। চাঞ্চল্যকর ও ভয়াবহ কাহিনীর সহিত মেহেরের জীবন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। মেহের আজীবন ব্যাঘ্রের সঙ্গে লড়াই করিয়াছে। বহু ব্যাঘ্রের ব্যাঘ্রলীলা সাঙ্গ করিয়াছে। বিভিন্ন সময় ব্যাঘ্রের আক্রমণ হইতে নিজেকে বাঁচাইয়াছে। শেষ পর্যন্ত সে ব্যাঘ্রের হাতে প্রাণ দিয়াছে।

মেহেরের পিতাও খ্যাতনামা শিকারী ছিল। নাম কিনু গাজী। ব্যাঘ্রভীতি যেখানে দেখা দিত কিনু গাজী সেখানেই উপস্থিত হইত। কিনু গাজীরা চারি ভাই। অন্য ভাইদের নাম ইস্‌মাইল গাজী, পাচু গাজী ও ঝড়ু গাজী। তাহারা প্রত্যেকেই ব্যাঘ্র শিকারে দক্ষ। ইতিহাসে আমরা সাধারণতঃ রাজা, মহারাজা, বীর যোদ্ধা ও সমাজের উচ্চস্তরের ব্যক্তিদের কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া থাকি।







সুন্দরবনের ব্যাঘ্র শিকারীত্রয় :—

উপরে :— মেহের গাজী, মরহুম (বাঘে মুখের ডান দিক খাইয়াছে)।

নীচে, বামে :— হাল আমলের সেরা ব্যাঘ্র শিকারী পচাবদী গাজী।

ডাইনে :—নিজামদি গাজী (বাঘে বাম হস্ত খাইয়াছে)।

এই একটি দীন দরিদ্র পরিবার সুন্দরবনের অধিবাসী। বাড়ীতে কুড়ে ঘর সেখানেও আরামে থাকা জোটেনা। সর্বদা এই বংশের সন্তানেরা গহীন অরণ্যে ঘুরিয়া বেড়ায়। ইহাদের জীবনেতিহাস যেমন চাঞ্চল্যকর ও ভয়াবহ তেমনই মধুর। গরীব হইয়াও মানুষ অভ্যাসক্রমে কতদূর দুর্জয় ও সাহসী হইতে পারে তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ ইহাদের জীবনালেখ্য। চমকপ্রদ গল্প বা কাহিনী নহে — উহা নিখুঁত ইতিহাস। সুন্দরবনের ইতিহাস পুস্তকে এইরূপ একটি বংশের কতিপয় বীর সন্তানের কথা সংযোজন করা প্রয়োজন বোধ করিয়াছি। ইহাদের বাড়ীতে গিয়াছি। গ্রামে বসিয়া দিবারাত্র ইহাদের ভয়াবহ ব্যাঘ্র শিকারের কাহিনী শুনিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছি। স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তির নিকট হইতে সেগুলি যাচাই করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছি। এখন একে একে সে ইতিহাস অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করিব।

কিনু গাজীর দুই পুত্র — মেহের গাজী ও নিজামদি। উভয় ভ্রাতা ঝানু শিকারী, প্রত্যেকে ৫০টির অধিক ব্যাঘ্র শিকারের গৌরব অর্জন করিয়াছে। সুন্দরবনের এবম্প্রকার পেশাদার শিকারীর সংখ্যা বিরল। মেহেরের পুত্র হাল জামানার সেরা শিকারী পচাব্দী গাজী। পচাব্দীর ভাই হাসেমও শিকারী। উভয় ভ্রাতা সরকার কর্তৃক ব্যাঘ্র শিকারের জন্য নিযুক্ত হইয়াছে। বার মাসের অধিকাংশ সময় তাহারা জঙ্গলে থাকে। মেহের, নিজামদি ও পচাব্দী এই তিনজন প্রধান শিকারীর বিষয়ই আমরা বর্ণনা করিব।

মেহের জীবনে অসংখ্য ব্যাঘ্র শিকার করিয়া কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছে। বন বিভাগের কর্মচারী ও জন সাধারণের নিকট সে সুপরিচিত। দুঃসাহসী মেহের জীবনে বহুবার সরকার হইতে তাহার কৃতিত্বের পুরস্কার লাভ করিয়াছে। কল্‌পাতা শিকারের কথা পূর্বেই বলিয়াছি। মেহের এই পদ্ধতিতে শিকারে দক্ষ। কপোতাক্ষ ফরেষ্ট ষ্টেশনের পার্শ্বে আংটিহারা গ্রামের দক্ষিণে সিংগের গভীর জঙ্গল। ১৩৫২ সাল। বাঘের অত্যাচার সবেমাত্র শুরু হইয়াছে। গ্রামে ঢুকিয়া বাঘে ছাগল ও কুকুর ইত্যাদি ধরিয়া লইয়া যায়। অবশেষে মেহেরের ডাক পড়ে। দুইদিন কল্‌পাতিয়া বাঘ পড়েনা। শেষ দিনে পুনরায় মেহের জঙ্গলে প্রবেশ করিয়া কল্‌পাতিয়া অপেক্ষা করিতে থাকে। মেহেরের সঙ্গী তাহার সুযোগ্য ভ্রাতা নিজামদী ও পুত্র পচাব্দী গাজী ছিল। গভীর রাত্রিতে গুলীর শব্দ

শ্রুত হইল। অনুমিত হইল গুলীর আঘাতে ব্যাঘ্র পড়িয়াছে। প্রকৃত পক্ষে বাঘের সামনের পায়ে গুলী লাগিয়াছিল। কিন্তু বাঘ মরে নাই। সে ক্ষিপ্ত হইয়া শিকারীকে আক্রমণ করিবার সুযোগ খুঁজিতেছিল। গুলী খেঁকো বাঘ শিকারীকে আক্রমণ করিবাব জন্য মদমত্ত হইয়া উঠে। হিংস্র জন্তুর হিংস্র স্বভাব ক্রমাগত বর্ধিত হইতে থাকে। জঙ্গলের তিন প্রধান তিন ঘণ্টা পরে শেষ রাত্রিতে শিকারের স্থানে উপস্থিত হইয়া আহত ব্যাঘ্রটি খুঁজিতে লাগিল। শিকারীদের দর্শনে ব্যাঘ্রটি দৌড় দিল। শিকারীবাও ব্যাঘ্রের পিছন পিছন কর্দমাক্ত ও জঙ্গলময় স্থানের উপর দিয়া দৌড়াইতে লাগিল। এই সময় ধূর্ত ব্যাঘ্র চক্রদিয়াছে। ঝানু শিকারীগণ বুঝিয়াও ভাল করিয়া বুঝিতে পারিল না।

এই চক্র নরখাদকের এক অভিনব কৌশল তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। চক্র দিবার পর মানুষ খেঁকো বাঘ শিকারীর পশ্চাতে পড়ে। আবার অধিকতর ধূর্ত বাঘ চক্র না দিয়া অতীব কৌশলে সোজা গিয়া শিকারীর পিছনে পড়ে। এই অবস্থায় শিকারীকে মহাবিপদে পতিত হইতে হয়। অনেক সময় ঝানু শিকারীও বুঝিতে পারে না ব্যাঘ্র তাহার পিছনে লাগিয়াছে। তেমনই ধূর্ত ব্যাঘ্রও বুঝিতে পারেনা শিকারী উহার পশ্চাতে। বুদ্ধি-কৌশল ও দক্ষতায় একে অন্যের সহিত সর্বদা প্রতিযোগিতা করিয়া থাকে। অস্ত্রধারী ও ঝানু শিকারীদের নিকট ব্যাঘ্রভীতি নাই বলিলে চলে। আবার কত নিরীহ লোকে বাঘের হাতে প্রাণ দিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। আমাদের বিশ্বাস গড়পড়তা যত ব্যাঘ্র প্রতি বৎসর মানুষের হস্তে মরে তদপেক্ষা অধিক সংখ্যক মানুষ ব্যাঘ্রের হাতে মারা পড়ে।

যাহা হউক হ'দো গাছেব জঙ্গলে ব্যাঘ্রটি লুকাইয়া থাকে। তিনজনে ব্যাঘ্রের খোঁজে ব্যস্ত এমন সময় অকস্মাৎ লুকায়িত ব্যাঘ্রটি লম্ফ দিয়া মেহেরকে আক্রমণ করিয়া তাহার মুখমণ্ডলের ডানদিক উপড়াইয়া দেয়। মস্তক হইতে ঠোট পর্যন্ত বক্রভাবে মেহেরের মুখমণ্ডলের অন্যূন এক তৃতীয়াংশ বাঘের কামড়ে শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। মেহের ও নিজামদীর হাতে দুইটি বন্দুক এবং পচান্দীর হাতে লাঠি। দুঃসাহসী মেহের এহেন ভয়ংকর অবস্থার মধ্যে বিন্দুমাত্র বিচলিত বা জ্ঞান হারায় নাই ! দুর্জয় সাহসে ভর করিয়া পুত্র পচান্দীকে বলিতে থাকে "আমি মরিব না, তুই নিজামদীকে দেখ।" ইতিমধ্যে ক্ষিপ্ত ব্যাঘ্রে

নিজামদীকে আক্রমণ করিয়াছে। ঝানু শিকারীরা জানে যে, দেহে বা মস্তকে বাঘে কামড়াইলে মানুষের জীবনের আশঙ্কা অত্যধিক। কিন্তু হস্ত পদ কামড়াইলেও মানুষ বাঁচিয়া যায়। নিজামদী উপস্থিত বুদ্ধি দ্বারা ব্যাঘ্রের প্রাথমিক আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য বামহস্তের বনুই আগাইয়া দেয়। মুহূর্ত মধ্যে হিংস্র ব্যাঘ্র তাহার হস্তে গুরুতর কামড় দিয়া সরিয়া পড়ে। বাঘের কামড়ে নিজামদীর বাম হাতখানা দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। সৌভাগ্যক্রমে সে জীবনে বাঁচিয়া যায়। নিজামদী এখনও বাঁচিয়া আছে এবং বাম হস্ত খণ্ডিত হইবার পরও সে একহস্তে একাকী বন হইতে বনান্তরে ঘুরিয়া ব্যাঘ্র শিকার করিয়া কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছে।

বাঘের আক্রমণে মেহেরের কয়েকটি দাঁত ও চোয়ালের একাংশ উড়িয়া যায়। ডান পার্শ্বের কয়েকটি দাঁত উপড়াইয়া গেলেও দুইটি মাড়ির দাঁত বাঁচিয়া যায়। তাহার ঠোঁটের একাংশও বাঘে লইয়া যায়। সৌভাগ্যক্রমে চিকিৎসার পর মেহের কোন প্রকারে জীবন রক্ষা পায়। কিন্তু সে প্রায় অচল হইয়া পড়ে। গাল হা করিয়া কিছু খাইতে পারিত না। ছোট ছেলে মেয়েরা ভাত চট্‌কাইয়া চামচ দ্বারা তাহার গালে প্রবেশ করাইয়া খাওয়াইত। মুখ দিয়া লালা পড়িত। সে ভালভাবে কথা বলিতে পারিত না। তাহার চক্ষুদ্বয় কোনক্রমে রক্ষা পাইয়াছিল। ১৩৫৭ সাল পর্যন্ত মেহের যতদিন বাঁচিয়াছিল, উহার মধ্যেও সে ব্যাঘ্র শিকারে নিরস্ত হয় নাই। আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধব কত অনুরোধ করিয়াছে "মেহের ভাই ! তুমি আর ব্যাঘ্র শিকারে যাইওনা — এভাবে এখন বনে গেলে তোমার আর রক্ষা নাই।" মেহেরের স্ত্রী কত অনুরোধ করিয়াছে। সে তাহা কখনও ভ্রূক্ষেপ করে নাই। বন বিভাগের সাহেবরা বলিতেন: "মেহের ব্যাঘ্র শিকার ছাড়িয়া দাও, জীবনে কত বাঘ মারিয়াছ, ইহাতেও তোমার তৃপ্তি হয় নাই ? তুমি জঙ্গলে আসা বন্ধ কর।" মেহের বলিত; "আমাকে তো বাঘেই খেয়েছে আমি বাঘের বংশ ধ্বংশ করিয়া ছাড়িব।" উপরোক্ত দুর্ঘটনার পরও মেহের সাতটি বাঘ শিকার করিয়াছে। মেহেরের মুখ বিকৃত হইয়া গিয়াছিল। সেই অবস্থায় বাঘ শিকারের পর সে খুলনা শহরে আসিয়া হাসিমুখে পুরস্কার লইয়া যাইত। বিচিত্র মেহেরের জীবনালেখ্য।

মেহেরের চাচা ইস্‌মাইল ও বিখ্যাত ব্যাঘ্র শিকারী। দুই ভ্রাতুষ্পুত্রকে ব্যাঘ্রে গুরুতর আক্রমণ করিয়া অঙ্গহানি করিয়া দিয়াছে জানিতে পারিয়া ইস্‌মাইলের চোখে নিদ্রা নাই। সে ইহার প্রতিশোধ কি করিয়া লইবে? ইস্‌মাইল বীরের ন্যায় হুংকার দিয়া বলিল "কেয়ছা বাঘ না দেখিয়া ছাড়িবনা"। গ্রামবাসীরা তাহাকে জঙ্গলে যাইতে নিষেধ করিল। কিন্তু ইসমাইল সে নিষেধ কর্ণপাত করিল না। সে বন্দুকসহ পূর্বোক্ত সিংগের জঙ্গলে প্রবেশ করিয়া ব্যাঘ্র শিকারের জন্য কল পাতিতে যায়। এমন সময় হঠাৎ ব্যাঘ্র তাহাকে আক্রমণ করিয়া মারিয়া ফেলে। ইসমাইল এইভাবে বাঘের হাতে প্রাণ বিসর্জন দেয়।

বিশ বছর আগের কথা। উপরোক্ত ঘটনার কয়েক বৎসর পূর্বে ব্যাঘ্র শিকারের জন্য ব্যাঘ্র-শিকারী মেহের তিনজন সঙ্গীসহ পাঙাশিয়ার জঙ্গলে প্রবেশ করিয়া খালের মধ্যে নৌকাপরি নিশাযাপন করেন। কার্তিক মাস, শীত তেমন পড়ে নাই। শেষ রাত্রিতে বাঘের ডাক শুরু হয়। মেহের বৃক্ষের উঁচু ডালে আরোহণ করিয়া কৃত্রিম উপায়ে ব্যাঘ্রের ভঙ্গিতে ডাকিতে আরম্ভ করে। ডাক শুনিয়া ব্যাঘ্র নিকটে আসে। কিন্তু ব্যাঘ্রে মানুষের ঘ্রাণ পাইয়া চলিয়া যায়। বৃক্ষ হইতে মেহের নৌকায় চলিয়া আসে। শিকারী আবার জঙ্গলে প্রবেশ করে। খুঁজিতে খুঁজিতে ব্যাঘ্র মাত্র কয়েক হাত দূরে দৃষ্টিগোচর হয়।

মেহের কাল বিলম্ব না করিয়া বাঘের দিকে গুলী ছুড়িয়া মারে। বাঘ ভীম গর্জনে মেহেরের উপর পতিত হয়। ব্যাঘ্র হা-হা করার সঙ্গে সঙ্গে মেহের বন্দুকের ব্যারেল উহার গালে ঢুকাইয়া দেয়। মেহের দুর্দমনীয় সাহসের সহিত বামহস্তে বন্দুকের ব্যারেল চাপিয়া ধরে এবং দক্ষিণ হস্ত দিয়া ব্যাঘ্রের মাজা ধরিয়া অনবরত ঘুরাইতে থাকে। সঙ্গীরা ভীষণ চিৎকার দিলে ব্যাঘ্র লম্ফ দিয়া ছুটিয়া পালায়। মেহের বাঘের ধাকায় নদীর মধ্যে পড়িয়া যায়।

শিকারের নেশায় মেহের পাগল। ব্যাঘ্র শিকার না করিয়া বাড়ী ফিরিবে না। কি করিয়া সে গ্রামে মুখ দেখাইবে? জিদী মেহের ব্যাঘ্র শিকারে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ— এ প্রতিজ্ঞা সে ভঙ্গ করিতে পারে না। পরদিন মেহের অন্য একটি বাঘের সন্ধান পায়। গুলী করা মাত্র ব্যাঘ্রটি দৌড় দেয়। মেহের ব্যাঘ্রের পিছনে ধাওয়া করে এবং পরপর আরও তিনবার গুলী ছুড়িয়া মারে। এইভাবে ক্রমাগত

সে কয়েকদিন ঐ ব্যাঘ্রের অনুসরণ করিতে থাকে। সাধারণ গাদার বন্দুক। উহা দ্বারা তাড়া করিলে, ব্যাঘ্রে তাহাকে তাড়া করে। শিকারী সঙ্গীদের লইয়া নৌকায় ফিরিয়া আসে। পরদিন গভীর জঙ্গলে ব্যাঘ্রের অনুসন্ধানে মেহের ব্যস্ত, এমন সময় একটি ব্যাঘ্র হা-হা করিতে করিতে তাহাকে আক্রমণ করে। অনোন্যপায় হইয়া মেহের বন্দুকের কুঁদো ব্যাঘ্রের গালের মধ্যে পুরিয়া দিয়া নৌকায় ফিরিয়া আসে। একটু পরেই ব্যাঘ্রটি বন্দুক উগরাইয়া ফেলিয়া দেয়। কিছু পরে মেহের বন্দুক কুড়াইয়া আবার ঠিক করিয়া রাখে। ইতিমধ্যে নৌকার চাউল ফুরাইয়া গিয়াছে। এক সের চাউল দ্বারা ৪ জন লোক চার দিন কাটাইয়াছে। সকলেই প্রায় অনাহারী। জিদী মেহের ব্যাঘ্র না মারিয়া বাড়ী ফিরিবে না। সেই সময় মেহেরের পিতা বিনু গাজী জীবিত ছিল। বৃদ্ধ বিনু গাজী সংবাদ পাইয়া পুত্রের সহিত যোগ দেয়। অতঃপর তেরটি গুলী করার পর পিতা ও পুত্রের হস্তে ব্যাঘ্রটি নিহত হয়।

সুন্দরবনের যেখানে ব্যাঘ্রের উপদ্রব দেখা দিত সেখানে দুর্জয় ব্যাঘ্র শিকারী মেহেরের ডাক পড়িত। বনবিভাগ হইতে মেহেরকে বন্দুক ও কার্তুজ সরবরাহ করা হইত। একবার মেহের সরকারী ও নিজস্ব বন্দুকসহ ডিঙ্গিমারীর জঙ্গলে যায়। মেহের এখন বার্ধক্যে পতিত হইয়াছে। ১৩৫৭সাল, মৃত্যুর মাত্র কয়েক মাস পূর্বের কথা। এই সময় আত্মীয় স্বজনেরা তাহার মৃত্যু সন্নিকটে বুঝিতে পারিয়া ব্যাঘ্র শিকারে আর তাহাকে সাহায্য করে না। ক্রোধে ও ক্ষোভে বৃদ্ধ শিকারী গজ্ গজ্ করিতে থাকে। ব্যাঘ্র শিকারের সঙ্গী হিসাবে কেহই সাড়া দেয় না। শেষ পর্যন্ত মেহের ১০।১২ বৎসরের দুইটি শিশুকে সঙ্গে লইয়া জঙ্গলে প্রবেশ করে। যে নেশা তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে, আমরণ তাহা অটুট থাকিবে। জরাজীর্ণ বৃদ্ধকে নৌকা হইতে হাত ধরিয়া জঙ্গলে উঠান হয়। বৃদ্ধ একটি মাত্র চোখে সামান্য দেখিতে পায় — ব্যাঘ্রের চলাপথের পাগ্ মার্ক। শিকারী সেখানে বন্দুক পাতিয়া রাখে। গভীর নিশীথে বন্দুকের আওয়াজ শ্রুত হয়। ভোরবেলা তাহারা যাইয়া দেখে একটি বৃহৎকায় বাঘিনী মরিয়া পড়িয়া আছে। অতঃপর সকলে ধরাধরি করিয়া ঐ বাঘিনীকে নৌকায় আনিয়া রাখে।

একটু পরে জোড়া বাঘের অন্যটি বাঘিনীর খোঁজে ডাকিতে আরম্ভ করে। ব্যাঘ্রের আগমন শুনিয়া মেহের আনন্দ ও নেশায় নাচিয়া উঠে এবং তৎক্ষণাৎ

তীরে অবতরণ করিয়া বাঘ যেদিকে ডাকিতেছিল, মেহের সেদিককার জঙ্গলে অগ্রসর হইতে থাকে। শেষ পর্যন্ত বাঘ পাওয়া গেল না। নিশা সমাগমে মেহের দুইটি শিশুকে সঙ্গে লইয়া হ্যারিকেনের আলোর সাহায্যে বাঘের চলা-পথে কলপাতিয়া রাখিয়া আসে। বাঘ যে পথ দিয়া যায়, সেইপথ দিয়া আবার ফিরিয়া আসে এবং সেই চলাপথেই কলপাতা পদ্ধতিতে শিকারের সহজ উপায়। জরাজীর্ণ মেহের কল পাতার সঙ্গে সঙ্গে হাঁড়ীতে মুখ দিয়া কৃত্রিম উপায়ে বাঘের ডাক শুরু করে। সঙ্গে সঙ্গে বাঘও ডাকিতে ডাকিতে বন্দুকের নিকটবর্তী হয়। মেহের বাঘের আগমন জানিতে পারিয়া নৌকায় আরোহণ করে এবং নদীর মধ্যে নৌকায় বসিয়া অতীব সতর্কতার সহিত অপেক্ষা করিতে থাকে। কিছুক্ষণ পরে বন্দুকের আওয়াজ হয়। ব্যাঘ্রের গায়ে গুলী লাগে। কিন্তু বাঘ মরে নাই। পাগ মার্ক দেখিতে দেখিতে মেহের ব্যাঘ্রের অনুসরণ করে। খালের পাড় দিয়া কিছু দূর গিয়া শিকারী দেখিতে পায়, ব্যাঘ্র শুইয়া আছে। গুলী খেঁকো ব্যাঘ্র শিকারী দর্শনে ভীষণভাবে গোঁ, গোঁ করিয়া উঠে। গোঁ, গোঁ করিবার পর গাঁক্ করিয়া মেহেরকে আক্রমণ করে। মেহের লম্ফ দিয়া খালের কাদার মধ্যে পড়িয়া যায়।

সুন্দরবনের সে কাদা যাহারা না দেখিয়াছে, তাহাদের পক্ষে বুঝা মুশকিল। এই কাদায় নামা মাত্র পদদ্বয় প্রায় এক ফুট বসিয়া যায়। কাদা হইতে পা পৃথক করিতে বেশ কষ্ট হয়। সুন্দরবনের কাদা সহজেই ছাড়ান যায় না। সেইজন্য রসিক লোকে উহাকে প্রেম কাদা বলিয়া উপহাস করে। খালের কাদায় মেহেরের সর্বাঙ্গ ভরিয়া যায়, পিছনের ছেলেটি ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া নৌকায় উঠিয়া পড়ে। শিশু দুইটি নৌকায় ক্রন্দন করিতেছে। এমন সময় মেহের কর্দমাক্ত অবস্থায় আসিয়া উহাদিগকে গালি বর্ষণ করে। সে নৌকা লইয়া পুনরায় সেখানে যায়। খালের পার্শ্ব দিয়া বৃদ্ধ শিকারী হাটিতে থাকে। তাহার চলা পথে কাদার চট্ পট্ শব্দ হয়। ক্রোধান্ধ ব্যাঘ্র হা হা করিতে করিতে লম্ফ দিয়া খালের কাদার মধ্যে পড়িয়া যায়। বাঘের পা কাদায় আটকাইয়া গিয়াছে। সে ক্রোধে পাগলপ্রায়। মানব রক্তের নেশায় ব্যাঘ্র ছুটাছুটি করিতে থাকে। ব্যাঘ্রে কাদা ছিটকাইতেছে। মেহের কাদার মধ্যে গুলী করিয়া দেয়।

মেহেরের গায়েও কাদা এবং কাদার মধ্যে পড়িয়া সেও নড়িতে পারিতেছে না। শিকারী ও শিকারের অবস্থা কর্দম নিপতিত গর্দভের ন্যায়। এই ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে পিছনের ছেলেটি মেহেরকে ধরিয়া টানাটানি করিতেছে। সেই অবস্থায় মেহের পুনরায় গুলী করিয়া দেয়। ব্যাঘ্রে সর্বশক্তি দিয়া শিকারীকে আক্রমণ করে। মেহের ব্যাঘ্রের গলার মধ্যে দুর্জয় সাহসের সহিত বন্দুকের ব্যারেল প্রবেশ করাইয়া দেয়। ভাগ্যক্রমে বন্দুকে গুলী পোরা ছিল তাহাতে আওয়াজ হইয়া যায়। ব্যাঘ্র মানুষের এই দ্বন্দ্বযুদ্ধে জরাজীর্ণ মেহের জয়লাভ করে। গুলীর আঘাতে বাঘ শেষ পর্যন্ত মরিয়া যায়। জোড়া বাঘ অর্থাৎ বাঘ ও বাঘিনীকে মারিয়া মেহেরের সে কি আনন্দ! জীবন যুদ্ধে মেহের আজ জয়ী। নিহত ব্যাঘ্রদ্বয়কে শিকারী বনকরের অফিসে উপস্থিত করে। সকলে আশ্চর্যান্বিত হইয়া, শতমুখে মেহেরের প্রশংসা করিতে থাকে। সর্বত্র ধন্য ধন্য পড়িয়া যায়।

উপরোক্ত ঘটনার এক সপ্তাহ পরে ডিঙ্গিমারীর জঙ্গলে মেহের আর একটি মানুষ খেঁকো ব্যাঘ্রকে কল পাতিয়া শিকার করে। এই সময়ের মধ্যে মেহেরের একটি চক্ষু একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং তখন সে প্রায় অন্ধ। ১৩৫৭ সালের ঘটনা। উপরোক্ত তিনটি ব্যাঘ্র শিকারের জন্য ১২০০্ টাকা পুরস্কার পাইয়া মেহের আনন্দে আত্মহারা হইয়া পড়ে। তাহার প্রশংসা সর্বত্র বিস্তার লাভ করে। আর কিছুদিন বাঁচিয়া থাকিতে মেহেরের বড় সাধ হয়। ব্যাঘ্রকুল ধ্বংস করিতে সে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় অন্য।

মেহেরের আয়ুষ্কাল ফুরাইয়া আসিতেছে। বয়স প্রায় ৭০ বৎসর। ব্যাঘ্র শিকারের উন্মাদনা যৌবনের চেয়ে বার্ধক্যে কিছুমাত্র হ্রাস পায় নাই। পচাব্দী ব্যাঘ্র শিকারের পাশ পাইয়াছে। ছেলে ব্যাঘ্র শিকারে যাইতেছে শুনিয়া মেহের মহাখাপ্পা। হাতে পাইলে তাহাকে ধরিয়া মারে আর কি! ছেলে বলে, "বাপ তুমি মরণ কালে আর বাঘ মেরো না। এ বুড়ো বয়সে শিকারে গেলে লোকে তোমাকে নিন্দে করবে। তোমার পাগলামীর জন্য সমাজে আমরা মুখ দেখাতে পারব না। অন্তিমকালে এ নেশা ত্যাগ কর।" বৃদ্ধকে কিছুতেই থামান যায় না। মেহের ছেলের কাছে আসিয়া জোরপূর্বক ব্যাঘ্র শিকারের পাশ কাড়িয়া লয়। পিতৃভক্তির জন্য পচাব্দীও কিছু বলিতে পারে না। কিন্তু গ্রামের কেহই এবার মেহেরের সঙ্গে যাইতে রাজী হয় না।

আংটীহারা গ্রামের মাদার শেখ। শতাধিক মাইল দূরে সুপতি ফরেষ্ট ষ্টেশনের নিকট ব্যাঘ্র শিকারের জন্য সে একদিন কল পাতিয়া রাখে। মেহেরও শেষ ব্যাঘ্র শিকারের জন্য ঐ জঙ্গলে উপস্থিত ছিল। গভীর রাত্রে বন্দুকের আওয়াজ শ্রুত হয়। ভোরবেলা জরাজীর্ণ মেহের ও মাদার সেই ব্যাঘ্র খুঁজিতে আরম্ভ করে। দুপুর পর্যন্ত অনুসন্ধানের পর অবশেষে বন্দুক হস্তে মাদার খুঁজিতে খুঁজিতে একেবারে ব্যাঘ্রের সন্নিকটে উপস্থিত। ব্যাঘ্রের গায়ের সঙ্গে মাদারের পা স্পর্শ করিয়াছে এমন সময় হিংস্র ব্যাঘ্রের আক্রমণে মাদারের মাথার খুলি উড়িয়া সঙ্গে সঙ্গে তাহার জীবন-প্রদীপ নিভিয়া যায়। এই সময় বৃদ্ধ শিকারী মেহের মাদারের হাতের বন্দুক ধরিতে যায়, অমনি মানুষ খেঁকো ব্যাঘ্র তাহার হস্ত কামড়াইয়া দেয়। সকলে ধরাধরি করিয়া বৃদ্ধকে নৌকায় আনিয়া প্রাথমিক চিকিৎসার পর বাড়ীতে লইয়া আসে। ব্যাঘ্রের দাঁতের বিষে বৃদ্ধ শিকারীর হাতখানা পচিয়া যায়। বাড়ী পৌঁছিবার দুইদিন পরে শেষ পর্যন্ত এই দুর্জয় শিকারী মৃত্যুর কোলে চলিয়া পড়ে। মরণকালে মেহের পচাব্দীকে বলিয়া গিয়াছিল, "তুমি ব্যতীত আমাকে আক্রমণকারী বাঘ দুইটিকে অন্য কেহই মারিতে পারিবে না। তোমার উপর এ কাজের ভার দিয়া আমি পরকাল যাত্রা করিতেছি।" আজীবন বহু ব্যাঘ্র শিকারের পর জীবন সায়াহ্নে বাঘের হাতেই মেহেরের জীবন প্রদীপ নির্বাপিত হয়। এদেশের লোকেরা বলে সাপুড়ে সাপের হাতে মরে আর বাঘুড়ে মারা পড়ে বাঘের হাতে।

মেহেরের ভ্রাতা নিজামদী — তাহার বাম হস্ত ব্যাঘ্রে খাইয়াছে। গভীর অরণ্যানীর মধ্যে সেও দক্ষিণ হস্তে বন্দুক ধরিয়া একাকী ব্যাঘ্র শিকার করিতে পারে। সে কথা পূর্বেই বলিয়াছি। বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া ভ্রাতা মেহেরের ন্যায় কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছে। এক হস্ত পঙ্গু হইবার পর লোকে মনে করিয়াছিল, নিজামদী আর শিকার করিতে পারিবে না। বাঘের সহিত তাহার খেলা শেষ হইয়াছে। নিজামদীর বৃদ্ধাবস্থা — এখনও সে শিকারে অভ্যস্ত। নিজামদী গ্রাম্য ব্যক্তিদের মোকাবেলা আমাদের ব্যাঘ্র শিকারের কাহিনী শুনাইয়াছে। উহার কয়েকটি এখানে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

—"বিশ বৎসর আগের কথা, যমুনা নদীর পার্শ্বে, তিনজন সঙ্গীসহ একটি গাদার বন্দুক লইয়া ব্যাঘ্র শিকারের জন্য জঙ্গলে প্রবেশ করি। আমিও জনৈক

সঙ্গী দ্বিপ্রহরের সময় বাঘের ডাক শুনিয়া কল পাতিয়া রাখিয়া বাঘের ন্যায় কৃত্রিম উপায়ে ডাকিতে আরম্ভ করি। রাত্রি দশ ঘটিকার সময় বন্দুকের আওয়াজ হয়। ভোরবেলা যাইয়া দেখি বাঘের দুইখানা পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। বাঘ লাফ দেয়, আবার পড়িয়া যায়। বৃহৎকায় বাঘ, আমরা নিকটবর্তী হইতে পারিতেছি না। ঘন বৃক্ষের জন্য গুলী করাও সম্ভব হইতেছে না। সেদিন ফিরিয়া আসি। পর দিন সকালে আমি ও মহিম গাজী বাঘের সন্ধানে উক্ত জঙ্গলে প্রবেশ করি। মনে করিলাম ইতিমধ্যেই বাঘ ক্লান্ত হইয়া পড়িবে। বাঘের পদাচিহ্ন ধরিয়া যাইতে যাইতে দেখিতে পাইলাম ব্যাঘ্রটি ঘুরিতেছে এবং অতীব সংগোপনে আমাদের দিকে তাকাইতেছে। বাঘ আঠার প্রকার সুরে ডাকিতে পারে। সে তখন মানুষের ন্যায় শিস দিতেছে। মাত্র একপায়ের চলা পথ। ঘন বৃক্ষরাজির জন্য দক্ষিণে বামে যাইবার উপায় নাই। অমি বলিলাম মানুষে ঐ প্রকার শিস দেয়। সঙ্গী বলিল পাখী, আমি পুনরায় বলিলাম, পাখী নয় বড় শিয়াল। বাঘ আমাদিগকে ভয় দেওয়ার জন্য দাঁতে দাঁত দিয়া ঠক্ ঠক্ শব্দ করিতেছে। মানুষ খেঁকো বাঘের এ এক অভিনব চাতুরী। বাঘ দেখা যাইতেছে না। আমরা ভয়ে চিন্তিত হইয়া পড়ি। বাঘের দন্ত ঘর্ষণের শব্দ শ্রুত হইল। আমরা বসিয়া লক্ষ্য করিতেছি, এমন সময় বাঘ আমাকে লম্ফ দিয়া আক্রমণ করিতেছে। লাফ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুখ একটু ঘুরাইলেই গুলী ছুড়ি। আমার সঙ্গী বাঘকে তাড়া করিলে সে আমার গায়ের উপর আসিয়া পড়ে। আমরা দুইজনেই বাঘের পেটের তলে পড়িয়া গিয়াছি। কি ভয়ংকর অবস্থা। বাঘটি সঙ্গীর মস্তকে কামড়াইয়া ঝট্‌কানি দিয়া লম্ফ প্রদান করিল এবং পার্শ্বে পড়িয়া সঙ্গে সঙ্গে তাহার জীবন লীলা সাঙ্গ হইল। বাঘের দেহ আমার গায়ের উপর। বন্দুক দিয়া আঘাত করিলে বাঘের একটি দাঁত ভাঙ্গিয়া যায়। গভীর জঙ্গলে আমি একা মানুষ খেঁকো বাঘের সঙ্গে যুঝিতেছি। এই ভয়াবহ বিপদের কথা কল্পনা করিলে এখনও শরীর শিহরিয়া উঠে। আমি অতি কষ্টে সঙ্গীকে ধরি এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঘ্রকে গুলী করি। অতঃপর সঙ্গীর লাশ ঘাড়ে করিয়া বন্দুক সহ নৌকার দিকে যাইতে থাকি। গুলী খাইয়া বাঘ আমার পথে আসিয়া প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। অনোন্যপায় হইয়া লাশ রাখিয়া একা নৌকায় যাই। চিন্তা করিতে লাগিলাম

যদি নৌকার লোকে আমার গাত্রে রক্তমাখা দেখিতে পায় তবে কিছুতেই লাশ আনিতে উপরে যাইবে না।

রক্ত ঢাকা দেওয়ার জন্য আমি গাত্রে কাদা মাখাইলাম। বাঘের গোঙানিতে নৌকার সঙ্গীরা ভয়ে সরিয়া গিয়াছে। আমি তাহাদের ডাকিতে লাগিলাম। বাঁকের মাথায় গিয়া উহাদের সাক্ষাৎ পাই। কর্দমাক্ত ও রক্তাক্ত দেহ দেখিলে উাহারা ভয়ে নৌকা ভিড়াইবে না সেইজন্য গাছের আড়ালে দাঁড়াইয়াছিলাম। তাহারা জিজ্ঞাসা কবিল, "গায়ে কাদা কেন? তোমার সঙ্গী কই?" আমি বলিলাম: "আমি বাঘ মারিয়াছি। সে লোক সেখানেই আছে, চল বাঘ লইয়া আসি। তখন তাহারা আমাকে ভাত খাইতে বলিল। বাদা বনের লোকেরা বলে রান্না ভাত না খাইয়া জঙ্গলে যাওয়া নিষেধ। ইহাতে বিপদ আসিতে পাবে। আমি বলিলাম: "তোমরা খাও। কিন্তু আমিও খাই না, ওরাও খায় না। আমার অন্তর চাপা দুঃখ ও যন্ত্রণায় ফাটিয়া যাইতেছে। মর্ম বেদনায় মন ভারাক্রান্ত ও অস্থির। আমি না কাঁদিয়া পারিলাম না। তাহারা সঙ্গীর মৃত্যুর খবর জানিয়া গেল। সঙ্গীরা বলিল: "আমরা যাইতে পারিব না। বিপদ আমার। লোকে বলিবে জঙ্গলে লইয়া গিয়া সঙ্গীকে খুন করিয়া রাখিয়া আসিয়াছে। এই ধরনের প্রকৃত ঘটনাও সুন্দরবনে ঘটিয়া থাকে। আঠারবাকীর দোয়ানে — দুইখানা গোলকাটা নৌকাব মাঝিদের পাইয়া বলিলাম "বাঘ মারিয়াছি, উহাকে আনিতে যাইতে হইবে। আমি নিরুপায় অবস্থায় তাহাদের জুলুম করিয়া বন্দুকের ভয় দেখাইয়া সঙ্গে লইলাম। যাইয়া দেখি বাঘও সেখানে পড়িয়া মরিয়া গিয়াছে। সঙ্গীর লাশ ও মরা বাঘ লইয়া নৌকায় আসিলাম। ফরেষ্ট অফিস হইতে লাশ দাফন করার হুকুম হইল। এই ব্যাঘ্র শিকারে আমি ২০০৲ টাকা পুরস্কার পাই।"

একবার নিজামদী, মেহের ও অন্য আর একজন সঙ্গীসহ সুবলা নদীর তীরে এক জঙ্গলে ব্যাঘ্র শিকারের জন্য প্রবেশ করে। প্রায় ২৫বৎসর পূর্বের কথা — হিন্দুস্তানের সীমান্তে এই জঙ্গল অবস্থিত। সমুদ্র তীরের এই জঙ্গলে ২৫ জন লোককে এক মাসের মধ্যে ব্যাঘ্রে ভক্ষণ করিয়াছে। প্রবাদ এখানে মানুষ জঙ্গলে প্রবেশ করিলে আর ফিরিবার কোন আশা নাই। মানুষ খেঁকো

বাঘের এইরূপ ভয়াবহ উপদ্রব অশ্রুতপূর্ব। সমগ্র এলাকা ভীত ও সন্ত্রস্ত। ভ্রাতৃদ্বয় এই ব্যাঘ্র শিকারে নিমন্ত্রিত হইয়াছে। নৌকার শব্দ পাইলে মানব রক্তের নেশায় বাঘ ছুটিয়া আসিবে। সূর্যাস্তেব প্রাক্কালে বর্ষাব পানি ঝরঝর করিয়া পড়িতেছে। ক্ষুদ্র নৌকা, খাদ্যেবও অভাব পড়িয়াছে। শিকারীদের অন্তরে কি এক ভাবের উদয় হইল। তাহাদেব অন্তব ভারাক্রান্ত হইয়া পড়ে। চাবিদিক নিঝুম অথচ থম্‌থম্‌। নিকটেই ব্যাঘ্রের উপস্থিতি অনুমিত হইল। অতঃপব তাহারা সতর্কতাব সহিত নৌকায় আসন গ্রহণ কবে। একটি ব্যাঘ্র নদী পার হইবাব জন্য ঝাপ দিয়া কিছু দূব গিয়া আবাব ফিরিয়া আসিল। শিকাবীরা মনে কবিল হরিণ। ইতিমধ্যে বাঘ শিকারীদের দেখিতে পাইয়াছে এবং তাহাদেব ধরিবাব জন্য নৌকার সোজা অগ্রসব হইতেছে। এইবার নিশ্চিত বাঘ বুঝিতে পারিয়া শিকারীরা বন্দুক ধরিল। বাঘ দুলিতেছে, সে লম্ফ দিয়া লোক শিকাব কবিবে। মেহেব ও নিজামদী একই সঙ্গে গুলী করিল। গুলীতে বাঘেব পিঠের হাড় ভাঙ্গিয়া গেল। উন্মত্ত বাঘ এত জোরে মাটি ছিটকাইল যে, তাহাতে সেখানে একটি বড় গর্ত হইযা গেল। গর্তের মধ্যে বাঘ দেখা গেল না। সেজন্য পুনবায় গুলী করা হইল না। বাঘের হাড় ভাঙ্গিয়া মটাস মটাস শব্দ হইতেছে।

সেখানেই শিকাবীরা নিশাযাপন কবিল। পুবস্কাবেব খ্যাতি ও ব্যাঘ্র শিকাবের নেশা। শিকারীবা ভোরবেলা সেখানে গিয়া দেখে বাঘ নাই। সে হাতা দিয়া দেহকে জঙ্গলে টানিয়া লইয়া গিয়াছে। বড় দাগ ধরিয়া শিকাবীরা চলিতে লাগিল। বাঘ শুইয়া আছে দেখা গেল। ঘন বৃক্ষের জন্য গুলী করা সম্ভব হইল না। বাঘও শিকাবীদেব দেখিয়াছে। নিজামদি বলিল তাড়া কবিয়া বাঘ মারিতে হইবে। বাঘ শ্রান্ত ও ক্লান্ত — মারিমাবি কবিয়াও মারা হয় না। গুলী ব্যর্থ হইলে শিকারীদেব রক্ষা নাই। হঠাৎ পিঠের হাড় জোড়া লাগায় বাঘ জোরে অগ্রসর হইতে লাগিল। বাঘ আবার লাফাইতেছে। ক্লান্ত শিকারীরা বিশ্রামের জন্য নৌকায় ফিরিয়া আসে। পরদিন সেই স্থানে গিয়া শিকারীরা দেখিতে পায় বাঘের হাড় আবার খুলিয়া গিয়াছে, হাড় মটাস মটাস করিতে লাগিল। বিশ হাত দূরে বাঘ দেখা যাইতেছে। বাঘ দৌড় দিলে শিকারীরা পিছু ধাওয়া করিল। গুলী লাগিয়া বাঘ পড়িয়া গেল। আর এক গুলী খাইয়া বাঘ ছটফট করিতে লাগিল। ব্যাঘ্রের দেহ রক্তাক্ত হইল।

শিকারীদের একজন বাঘের দিকে যাইতেছিল; তখন বাঘ তাহাকে তাড়া করিল। এইবার মরণোম্মুখ বাঘ মহাবিক্রমে শিকারীদের আক্রমণ করিল। কিন্তু ইতিমধ্যেই সে যন্ত্রণায় শুইয়া পড়িয়াছে। বাঘের গোঙানিতে জঙ্গল প্রকম্পিত হইতেছে। উহার শরীরে আর শক্তি নাই। নিজামদি ও মেহেরের গুলীতে উহার ব্যাঘ্রলীলা শেষ হইয়া গেল।

পচাব্দীর পরিচয় ইতিপূর্বে দিয়াছি — সুযোগ্য পিতার সুযোগ্য পুত্র বটে। তাহার বয়স ৪৫বৎসরের কিছু বেশী। বাল্যবেলা হইতে বাপ ও চাচার সঙ্গে জঙ্গলে যাতায়াতে অভ্যস্ত। সে প্রায় বিশ বৎসর ধরিয়া স্বাধীনভাবে একাকী বাঘ মারিয়া আসিতেছে। রায়মঙ্গল হইতে সুপতি অর্থাৎ পশ্চিম হইতে পূর্ব সীমা পর্যন্ত জঙ্গলের প্রতিটি স্থান, নদীনালা, গভীর জঙ্গল, বৃক্ষলতা সবই তাহার নখাগ্রে। সে বন বিভাগের বি, এম বা বোটম্যান। বোটম্যানের চাকুরি নাম মাত্র। বাঘ শিকারের জন্যই তাহাকে রাখা হইয়াছে। বাওয়ালী বা মৌয়ালদের উপর যেখানেই ব্যাঘ্রের আক্রমণ হয় সেই জঙ্গলে ব্যাঘ্র শিকারের জন্য তাহাকে প্রেরণ করা হয়। ব্যাঘ্র শিকারে সে সিদ্ধহস্ত। এ পর্যন্ত এই অল্প বয়সে সে সর্বমোট পঞ্চাশটির অধিক বাঘ শিকার করিয়া কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছে। প্রতিটি বাঘ শিকারের সার্টিফিকেট তাহার কাছে সযত্নে রক্ষিত আছে। শিকারের অদ্ভুত কৌশল জানে পচাব্দী।

দরিদ্র পরিবার, পেটের দায়ে পচাব্দী চাকরি করে। বউ কিছুতে জঙ্গলে যাইতে দিতে চায় না। সে তাহাকে বলে ঃ "গ্রামের অন্যান্য লোকের যে ভাবে সাংসার চলে আমারও সেই ভাবে চলিবে। তুমি আর বাঘ মারিতে জঙ্গলে যাইও না।" মাও স্ত্রীর সঙ্গে যোগ দিয়া পচাব্দীকে নিষেধ করে। সে তাহা ভ্রূক্ষেপ করে না। ব্যাঘ্র শিকারের নেশা তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে। সুতরাং তাহার এই পেশা ত্যাগ করা দুষ্কর। বাপ চাচাকে বাঘে খাইয়াছে। দাদা ইস্মাইল বাঘের পেটে গিয়াছে। সে ভয়ে পচাব্দী ভীত নহে। তবে বি, এম; এর চাকুরি — নদীর উপর বার মাস অবস্থান করিতে হয়। লোকালয়ের সঙ্গে সম্পর্ক থাকে না। নদী খালের মধ্যে দিয়া বন হইতে বনান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। সে চাকুররি উপর মঝে মাঝে বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়ে। শিকারী হিসাবে

পচাব্দী বংশের নাম রক্ষা করিয়া আসিতেছে। নিজামদী বৃদ্ধ, সেই জন্য পচাব্দীর উপরেই অধিক চাপ আসে। উপরওয়ালারা আসিলে পচাব্দীর ডাক পড়ে। কোন কোন সময় পচাব্দী বাঘ শিকার করে, অন্যে নাম কিনিয়া লয়। রাধানাথ শিকদারের কাঞ্চনজঙ্ঘা আবিষ্কারের ন্যায়।

পচাব্দীর শিকার কৌশল ও দক্ষতা পিতৃদত্ত। দিনের পর দিন তাহার ব্যাঘ্র শিকারের কাহিনী শুনিয়াছি। লোকটি সৎ ও সাদাসিধে— বজ্জাতির ধার সে ধাবে না। কথার ভিতর কোন অলংকার নাই। আস্তে আস্তে মোলায়েম ভাষায় কথা বলে। বাজে কথার ধার ধারে না। কথার চেয়ে কাজ বেশী করে। তাহার বাড়ীতে গিয়াছি। সে খুলনায় আসিয়া আমাদের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে অবস্থান করিয়া জঙ্গলের অসংখ্য কাহিনী শুনাইয়াছে। পচাব্দীর ফটো অনেকে আনিয়াছে। অথচ কেহই তাহাকে একটি ফটো দেয় নাই। তাহার ইচ্ছা সে একটি ফটো সংগ্রহ করে। আমরা তাহাকে কয়েকটি ফটো দিয়াছি। ফটো পাইয়া পচাব্দীর সে কি আনন্দ!

ব্যাঘ্রের বিভিন্ন প্রকার কৌশল ও ছলচাতুরী পচাব্দীর জানা আছে। কলপাতা শিকারে সে বিশেষ দক্ষ। সাধারণতঃ বাঘের উচ্চতার তারতম্য অনুসারে ২৪″, ২৫″ বা ২৬″ উঁচু করিয়া বন্দুক পাতিতে হয়। এমনই দক্ষ যে পাগ্‌মার্ক দেখিলে সে বাঘের আকৃতি অর্থাৎ উচ্চতা ও দৈর্ঘ ঠিক ভাবে ধরিয়া লইতে পারে। পচাব্দী হাঁড়ি মুখে দিয়া কৃত্রিম উপায়ে প্রকৃত বাঘের ন্যায় ডাকিতে পারে। সে এই পদ্ধতিতে দুই তিন মাইল দূর হইতে বাঘ ডাকিয়া নিকটে আনিতে পারে। কোন জঙ্গলে বাঘ আছে, অবস্থা দেখিয়া সে তাহা বলিতে পারে। আজীবন অভিজ্ঞতার দ্বারা সে এই বিদ্যা অর্জন করিয়াছে। পচাব্দীর জীবনের বড় কৃতিত্ব সে মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে পাঁচটি ব্যাঘ্র শিকার করিয়াছিল। সুন্দরবনের কোন শিকারী এইরূপ কৃতিত্ব অর্জন করিতে পারে নাই। পচাব্দীর বর্ণনা হইতে জানা যায় যে বাঘের সাক্ষাৎ লাভের আশায় সে কৃত্রিম উপায়ে বাঘিনীর ন্যায় ডাকিয়া থাকে। তখন বাঘ এইরূপ স্থানে আসিয়া বাঘিনীর সহিত মিলন নেশায় ভীষণভাবে গোঙাইতে থাকে এবং পাগলের ন্যায় ছুটাছুটি করে! যে সমস্ত বাঘ আপনা আপনি ডাকে

তাহারাও ঐরূপ পাগলের ন্যায় ছুটাছুটি করিয়া থাকে। অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় বাঘ অত্যধিক ডাকিয়া থাকে। সাধারণতঃ আশ্বিন, কার্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসে বাঘ ডাকে। বসন্তকালেও বাঘের ডাক শ্রুত হয়। উপরোক্ত সময়ই ব্যাঘ্র শিকারের উপযুক্ত। পচাব্দী বলে যে হরিণেরা শিকারী ও ব্যাঘ্র — উভয়কেই সমান ভয় করে। বানরেরা হরিণের বন্ধু। শিকারী বা বাঘ দেখিলে বানরে হরিণের গালে চড় মারে এবং বিশেষ ধরণের একপ্রকার শব্দ করে। ইহাতে হরিণে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করে।

পচাব্দী শিকারের খুঁটিনাটি সবকিছু আয়ত্বে আনিয়াছে। ধূর্ত ব্যাঘ্রে যদি বুঝিতে পারে যে তাহাকে শিকারের জন্য কলপাতা হইয়াছে, তবে সেই ব্যাঘ্র এত হুশিয়ার হয় যে কলপাতার কাছে গিয়া বৃক্ষের ডাল ভাঙ্গিয়া মুখে করিয়া উহা দ্বারা সূতা টানিয়া লইবে এবং তাহাতেই বন্দুকের গুলী হইয়া যাইবে। অথচ বাঘের গায়ে লাগিবে না। কোন কোন সময় বাঘ দাঁত দিয়া সূতা ধরিয়া বন্দুক ভাঙ্গিয়া সেখানে বসিয়া থাকে। অধিকতর ধূর্ত বাঘ দাঁত দিয়া বন্দুকের ট্রিগার নড়াইয়া দেয় এবং তাহাতেই বন্দুকের আওয়াজ হইয়া যায়। ব্যাঘ্র সেই স্থানে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে এবং শিকারীকে সুবিধা পাইলে আক্রমণ করিয়া খতম করে। সুন্দরবনের সর্বত্র কাদার উপর দিয়া ব্যাঘ্র এমন সতর্কতার সহিত চলাফেরা করে যে মোটেই কোন শব্দ হয় না। কিন্তু মানুষ চলার সময় চট্‌পট্‌ শব্দ হইতে থাকে। কোন প্রকার দৈবাৎ শব্দ হইলে বাঘ স্বীয় পায়ে দংশন করে। নিজ ভুলের মাশুল সে নিজের উপর দিয়া আদায় করে।

পচাব্দীর মতে বাঘ মরিবার পূর্ব পর্যন্ত সে মরিয়া হইয়া শিকারীকে মারিবার চেষ্টা করে। মরিয়া গেলেও বাঘের মুখ শিকারীর দিকে থাকে। ব্যাঘ্রের ঘুম সাংঘাতিক। শিকারীরা কখনও ঘুমন্ত ব্যাঘ্রকে শিকার করে না। কারণ উহার গুলী ব্যর্থ হইবার সম্ভাবনা খুব বেশী। সেইজন্য শিকারীরা বৃক্ষে আঘাত হানিয়া শব্দ করিয়া বাঘের ঘুম ভাঙ্গাইয়া পরে গুলী করে। শিকারীরা ব্যাঘ্রকে মুখোমুখী গুলী করে না। মুখ একটু ঘুরাইলেই গুলী করিয়া থাকে।

সিংগের জঙ্গলের ব্যাঘ্রটি পচাব্দীর পিতা ও চাচাকে গুরুতর জখম করে এবং দাদা ইসমাইলকে ভক্ষণ করার পর স্থানীয় লোকেরা ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া

পড়ে। চতুর্দিক এমনভাবে আতঙ্কিত হয় যে কেহই সে জঙ্গলে প্রবেশ করে না। সুপতির যে জঙ্গলে মাদার সেখ ও মেহেরকে ব্যাঘ্রে আক্রমণ করে সেখানেও অনুরূপ অবস্থা বিরাজমান। দুর্জয় শিকারী মেহেরের মৃত্যুতে সর্বত্র ভীতির সঞ্চার হইয়াছে। মরণকালে মেহের পচাব্দীকে বলিয়া গিয়াছিল :— "তুমি ভিন্ন অন্য কেহ এই ব্যাঘ্র দুইটিকে মারিতে পারিবে না।" সে কথা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। পচাব্দী আল্লার নাম স্মরণ করত জঙ্গলে প্রবেশ করিয়া উপায় স্থির করিতে থাকে। সিংগের জঙ্গলস্থ বাঘের গুলীর আঘাত বিফল হইলে গ্রামে ঢুকিয়া গরু, কুকুর, ছাগল ইত্যাদি আক্রমণ করিত। নররক্ত পানকারী বাঘই মানুষ খেঁকো হইয়া যায়। একবার বাঘে গরু বা মানুষের রক্ত পান করিলে সে অভ্যাস ত্যাগ করিতে পারে না। পচাব্দী দুর্জয় সাহসে ভর করিয়া পিতৃহন্তার প্রতিশোধ লইবার মানসে সিংগের জঙ্গলে গিয়া কল পাতিয়া আসে। রাত্রিতে বন্দুকের আওয়াজ শ্রুত হয়। সকালে যাইয়া দেখে বাঘ মরিয়া রহিয়াছে এবং উহার গায়ে পূর্বেকার গুলীর ক্ষত চিহ্ন। পচাব্দী পিতৃ আদেশ পালন করিয়া পিতৃহন্তার প্রতিশোধ লইয়াছে।

পূর্ব বর্ণিত সুপতির বাঘ মারিতেও পচাব্দীর ডাক পড়ে। সে সেখানে গিয়া ঐ বাঘকে মারিবার জন্য ১৫ হাত উচ্চ একটি মঞ্চ প্রস্তুত করিয়া তথায় অতীব সন্তর্পনে অপেক্ষা করে। পচাব্দী দুই দিন মঞ্চোপরি বসিয়া হাড়িতে কৃত্রিম উপায়ে ব্যাঘ্রের ন্যায় ডাকিতে থাকে। মুখে হাড়ি দিয়া ডাকিতে ডাকিতে ব্যাঘ্রটি সেইস্থানে আসিয়া পড়িবামাত্র উহাকে গুলী করিয়া মারা হয়। উহারও গায়ে পূর্বেকার গুলীর চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। সমগ্র সুন্দরবন এলাকায় পচাব্দীর খ্যাতি ছড়াইয়া পড়ে। যোগ্য পিতার যোগ্য পুত্র বটে। পিতৃহত্যার প্রতিশোধ লইতে পারিয়া পচাব্দীর আনন্দ আর ধরে না। সে আজ তৃপ্ত।

সুন্দরবন এক মনোরম দেশ! দেশ বিদেশ হইতে কত পর্যটক সুন্দরবন পরিদর্শন করিয়া থাকে, তাহার ইয়ত্তা নাই। জার্মান, ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড, জাপান, কানাডা, আমেরিকা, ইরান, তুরস্ক প্রভৃতি দেশের গণ্যমান্য লোকেরা সুন্দরবনে আসিয়া শিকার করেন। পাশ্চাত্যের লোকেরা সাধারণতঃ সুউচ্চ মঞ্চ প্রস্তুত করিয়া সস্ত্রীক ও দলবল সহ একত্রিত হইয়া শিকার করিয়া থাকে। বিদেশীয়

পর্যটকগণ আসিলে পচাব্দী ও নিজামদীর ডাক পড়ে। বেশী দিনের কথা নয়। শরণখোলা রেঞ্জের অন্তর্গত শেলা নদীর তীরে হরমল জঙ্গল। জনৈক শিকারী এক সুউচ্চ মঞ্চে বসিয়া কিছু দূরে ছাগল বাঁধিয়া অপেক্ষা করিতে থাকে। ছাগলের ডাক শুনিয়া বাঘ আসিয়াছে। কিন্তু কি আশ্চর্য সে ছাগল খায় না। বাঘে মানুষের গন্ধ পাইয়াছে, ধূমপানের গন্ধ উহার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিয়াছে। বাঘ চুপি চুপি অতীব সতর্কতার সহিত মানুষ খাইবার জন্য মই দিয়া উঠিয়া সেই মঞ্চের নিকটবর্তী হইয়াছে। শিকারীরা সেই মঞ্চ হইতে বন্দুকের কুদো দিয়া বাঘের আক্রমণ প্রতিহত করিতে সমর্থ হয়। আঘাত প্রাপ্ত বাঘ দ্রুত সেই মই দিয়া নীচে সরিয়া যায়। কেহই উহাকে গুলী করিতে পারে না। গভীর নিশিথে ছাগলের ডাক শুনিয়া পুনরায় বাঘ আসে। তিন চারিটি গুলী করার পরও বাঘ পড়ে না। বাঘের কামড়ে ছাগল ছানা মারা যায়। ভোর বেলা বাঘে ছাগল খাইতে আসে। তখন গুলী করিয়া বাঘটিকে মারা হয়। এই ঘটনার পর গেউয়া গাছ মার্কা দেওয়ার সময় বেতমুড়ীর জঙ্গলে একজন বাওয়ালীকে বাঘে লইয়া যায়। পচাব্দী সেই জঙ্গলে একে একে তিনটি বাঘ শিকার করিয়া কৃতিত্ব অর্জন করে। ঐ তিনটির মধ্যে একটি বাঘিনী ছিল। বাঘিনীকে গুলী করার পর শিকারী অপেক্ষা করিতে থাকে। একটু পরে দেখা গেল বাঘিনীর লাশ একটি বাঘ আসিয়া কিয়দংশ ভক্ষণ করিয়াছে। ঝানু শিকারী পচাব্দী বৃক্ষের উঁচু ডালে বসিয়া গুলী করিয়া উক্ত বাঘকে শিকার করে। পরপর চারিটি বাঘ মারায় সুন্দরবনে পচাব্দীর ধন্য ধন্য পড়িয়া যায়। ইহা বিস্ময়কর বীরত্ব কাহিনী, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

কয়েক বৎসর পূর্ব পাকিস্তানের জি, ও, সি, মেজর জেনারেল ওমরাহ্ খান সদলবলে সুন্দরবনে ব্যাঘ্র শিকারে গিয়াছিলেন। পচাব্দীও সঙ্গে যায়। গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করিলে অকস্মাৎ একটি নরখাদক শিকারীদের আক্রমণ করে। মোটর লঞ্চের সারেঙ উহার পেটের তলে পড়িয়া যায়। ব্যাঘ্রটি পূর্ব হইতেই তাহাকে লক্ষ্য করিয়াছিল। কি ভয়ংকর অবস্থা! লোকটির জীবনের আশা নাই। সকলেই ভীত ও সন্ত্রস্ত। এমন ভয়াবহ আক্রমণ যে সকলকেই বাঘে খাইয়া ফেলিবে বলিয়া আশঙ্কা হইল। জঙ্গলের এহেন ভয়ংকর অবস্থা একমাত্র ভুক্তভোগীরাই কল্পনা করিতে পারে। পচাব্দী দুর্জয় সাহসে ভর

করিয়া গুলী ছুড়িয়া মারে। তাহার অবধারিত গুলীর আঘাতে ব্যাঘ্রটি তৎক্ষণাৎ মরিয়া যায়। এমন সতর্কতার সহিত গুলী করা হইয়াছিল যে উহা অন্য কাহারও গায়ে লাগে নাই। জঙ্গলব্যাপী পচাব্দীর সুখ্যাতি পড়িয়া যায়। ওমরাহ্ খান পচাব্দীকে সঙ্গে করিয়া যশোরে মিলিটারী ক্যাম্পে লইয়া যান। উচ্চ পদস্থ কর্মচারীগণ পচাব্দীর বীরত্বের কাহিনী শুনিয়া সকলেই তাহার সহিত করমর্দন করেন। দরিদ্র শিকারীর আনন্দ আর ধরে না। পচাব্দী মনে করিল তাহার জীবন ধন্য হইয়াছে কবাচির উষ্ট্র চালক বশির ভাগ্যক্রমে সম্মান পায়। আর পচাব্দী জীবনপাত করিয়া কৃতিত্ব অর্জন করে। ওমরাহ্ খানের অনুমোদনক্রমে খুলনার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট কৃতিত্বের চিহ্ন স্বরূপ তাহাকে একটি দো-নালা বন্দুক পুরস্কার দেন।

সম্প্রতি পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর জনাব আঃ মোনায়েম খান সুন্দরবন পরিদর্শনে আসিতেছেন। পূর্বে পচাব্দীকে আনিয়া খুলনা শহরে রাখা হইল। পচাব্দীর আশা এইবার কিছু পুরস্কার পাইতে পারে। পচাব্দীর বর্ণনায় জানা যায় গভর্ণরের সুন্দরবন ভ্রমণকালে সে সর্বদা তাঁহার সহিত ছিল। তাঁহার সুখ দুঃখের কাহিনী গভর্ণরকে শুনাইয়াছে। গভর্ণর পচাব্দীকে সঙ্গে করিয়া ঢাকায় লইয়া যান এবং টেলিভিশান কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দেন। এইবার এই বন্য ব্যাঘ্র শিকারীকে দেখা গেল টেলিভিশানের পর্দায়। পচাব্দী টেলিভিশানে দেখাইল কেমন করিয়া ব্যাঘ্র শিকার করিতে হয় — কেমন করিয়া বাঘে ডাকে ইত্যাদি। বাঘের ডাক অনুকরনে পচাব্দীর সর্বত্র ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল। খুলনায় ফিরিয়া এই দুর্জয় শিকারী টেলিভিশানের বিষয় আমাদের নিকট সবিস্তারে বর্ণনা করে। সে সার্টিফিকেট খানা সযত্নে রাখিয়া দিয়াছে। রোমাঞ্চকর কাহিনীর নায়ক পচাব্দী — দেশে বিদেশে এইভাবে তাহার খ্যাতি বিস্তার লাভ করিয়াছে। ধন্য তাহার বন্য জীবন।

দুবলার দ্বীপ বা দুবলার ট্যাকে বাসা করিয়া চট্টগ্রামের লোকেরা মৎস্য ধরে। সুন্দরবনের লোকেরা ইহাকে জেলের ট্যাকও বলে তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। এক সময়ে এখানে বাঘের ভীষণ উৎপাত শুরু হয়। এই সংবাদে সরকারের তরফ হইতে পচাব্দীকে সেখানে প্রেরণ করা হয়। দিনের বেলা পচাব্দী জঙ্গলে কল পাতিয়া অপেক্ষা করিতে থাকে। শিকারী একটি বন্দুক

হাতে করিয়া পরদিন জঙ্গলে প্রবেশ করে। দুইজন সঙ্গীকে নৌকায় রাখিয়া পচাব্দী জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করে ; এমন সময় বৃহৎকায় একটি বাঘ হিংস্রভাবে হা হা, করিয়া তাহাকে আক্রমণ করিতে আসে। সে কি ভয়ংকর চাহনি! এহেন ভীমমূর্তি দেখিয়া সঙ্গীরা নদীমধ্যে নৌকা ভাসাইয়া দেয়। পচাব্দীর দুর্ভাগ্য — বন্দুকের কলকব্জার গোলযোগে কিছুতেই আওয়াজ হয় না। বাঘ লম্ফ দিয়া মাত্র ৫।৭ হাত দূরে আসিয়া পড়িল। পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়াও গুলী হইল না। পচাব্দী বাঘকে ভয় দেওয়ার জন্য কৃত্রিম উপায়ে অতীব সাহসের সহিত বন্দুক নড়াইতে থাকে। দুর্জয় শিকারী — এহেন অবস্থার মধ্যে প্রায় বেহুশ হইয়া পড়িল। পিছনে তাকাইয়া দেখে সঙ্গীরা তাহাকে ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছে। পচাব্দী আল্লা, আল্লা করিয়া ধুকিতে থাকে। জীবনের ক্ষীণ আশাটুকু পর্যন্ত তিরোহিত হইয়াছে। বাঘের আক্রমণ আজ সে কি করিয়া প্রতিহত করিবে ? কোন মতেই তাহার নিস্তার নাই। পচাব্দী গুলী পুরিতে থাকে এবং একটু একটু করিয়া অতীব সতর্কতার সহিত পিছু হাটিতে থাকে। এই ভাবে সে প্রায় এক রশি হটিয়া যায়। বাঘও আর নড়ে না। পচাব্দী বন্দুক ফেলিয়া খালের মধ্যে ঝম্প প্রদান করিয়া জীবন রক্ষা করার চেষ্টা করে। এদিকে খবর হইয়াছে যে দুর্জয় শিকারীকে বাঘে ভক্ষণ করিয়াছে। কিছুক্ষণ পরে পচাব্দী নৌকার সন্ধান পায়। নৌকায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া একটি বন্দুক সহ সেই বাঘকে শিকারের জন্য পুনরায় সে জঙ্গলে প্রবেশ করে। কিন্তু এবার সে বাঘটিকে দেখিতে পাইল না। হিংস্র জন্তুর সে চাহনি, সে গোঙানি এবং মুখ দিয়া লালা নিঃসৃত হইতে দেখিলে কে ভীত ও সন্ত্রস্ত না হইয়া পারে ? পচাব্দী সে কথা মনে করিয়া এখনও শিহরিয়া উঠে। জীবনের ভয় সকলেরই আছে। এ সুন্দর ভুবনে কি কেহ সহজে মরিতে ইচ্ছা করে ?

পচাব্দী পুষ্পকাটীর জঙ্গলে বোটম্যানের চাকুরিতে কার্যরত ছিল। একদিন বাওয়ালীরা খবর দিল বাঘ তাহাদের নৌকায় উঠিবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু মাঝিদের সতর্কতার জন্য বাঘ নৌকায় উঠিতে পারে নাই। পচাব্দী একজন সঙ্গী লইয়া বন্দুকসহ বৃক্ষে আরোহণ করিয়া বানরের ন্যায় শব্দ করিতে থাকে। বাওয়ালীরা বৃক্ষে আঘাত করিলে যেরূপ শব্দ হয় পচাব্দীও সেইরূপ শব্দ করিতে

থাকে যাহাতে বাঘে বাওয়ালী ভাবিয়া তথায় আসিবে। দেড় ঘণ্টা পর একটি বাঘ তথায় আসিয়া দেড় রশি দূরে দাঁড়ায়। বাঘ শিকারীকে দেখিয়া বৃক্ষের উপর লক্ষ্য করিতেছে। কিন্তু শিকারী বাঘ দেখিতে পায় নাই। শিকারী পরে বাঘ দেখিতে পায়। কিন্তু তথা হইতে গুলী করা খুব অসুবিধা। অবশেষে সুযোগ আসিল, বাঘের বৃহৎকায় চক্ষু সামনাসামনি গুলী করা যায় না। মস্তক একটু ঘুরান মাত্র পচাব্দী বন্দুকের গুলী ছুড়িয়া মারিল। গুলীর আঘাতে বাঘ উন্মত্ত হইয়াছে। সে ক্রোধান্মত্ত অবস্থায় কামড় দিয়া বৃক্ষের বাকল ছিড়িয়া ফেলিল। পরে নিজের হস্তপদ জোরে কামড়াইতে লাগিল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় গুলী করা হইল। চতুর্থ ও শেষ গুলী করার সঙ্গে সঙ্গে পচাব্দীর দোনালা বন্দুকের বাম ব্যাবেল ফাটিয়া যায়। বাঘেরও ব্যাঘ্রলীলা সাঙ্গ হয়।

সুন্দরবনের এই দুর্ধর্ষ শিকারী এখন রূপকথার নায়ক। মধ্যে মধ্যে খবরের কাগজের পাতায় তাঁহার বীরত্বের সংবাদ প্রকাশিত হয়। তাহার সম্পর্কে এ বৎসর (ইং ১৯৬৬) যে সব খবর প্রকাশিত হয় উহার মধ্যে দুই একটি নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল ঃ ।

পঞ্চাশতম নরখাদক ব্যাঘ্র শিকার

"বুড়ী গোয়ালনী ফরেষ্ট রেঞ্জ অফিস (সুন্দরবন), ২রা এপ্রিল— গত দুইমাসে ২৩ জন মানুষ মারার পর গত সপ্তাহে একটি নরখাদক রয়েল বেঙ্গল টাইগার শিকারীর গুলীতে মারা পড়িয়াছে। বাঘটি শিকার করিয়াছেন স্থানীয় শিকারী পচাব্দী গাজী। ইহা পচাব্দী গাজীর অর্ধশততম রয়েল বেঙ্গল টাইগার শিকার। এ-বৎসর ইতিপূর্বে পচাব্দী আরও দুইটি নরখাদক রয়েল বেঙ্গল টাইগার শিকার করিয়াছেন। নিহত বাঘটিকে এই রেঞ্জ অফিসে আনার পর মাপিয়া দেখা যায় যে, লেজসহ উহার দৈর্ঘ্য পৌনে বারো ফুট।

নরখাদকটি চলতি মওসুমে এই রেঞ্জের কয়েকটি লাটে এমনই তাণ্ডবলীলা সৃষ্টি করে যে, বাঘের ভয়ে বাওয়ালীরা জঙ্গলে কাঠ ও গোলপাতা কাটা বন্ধ করিয়া দেয়। ফলে ঐ এলাকায় বনবিভাগের আয় প্রায় সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইয়া যায়। বাঘটি রাত্রে বাওয়ালীদের নৌকায় হানা দিয়া নিদ্রিত অবস্থায় কয়েকজনকে ধরিয়া লইয়া যায়। দিনের বেলাতেও বাঘটি কাঠ ও গোলপাতা

সংগ্রহকারী বাওয়ালী দলের উপর অতর্কিতভাবে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া মানুষ ধরিতে আরম্ভ করে। এইভাবে ক্রমাগত মানুষ মারিতে মারিতে বাঘটি দুঃসাহসী ও নরমাংসলোলুপ হইয়া উঠে এবং জঙ্গলে বাওয়ালীদের কুঠারের শব্দ পাইলেই সেই দিকে যাইয়া শিকার ধরিতে থাকে। শেষের দিকে বাঘটির দৌরাত্ম্য এতই বৃদ্ধি পায় যে, আতঙ্কিত বাওয়ালীরা জঙ্গলে যাওয়া ত্যাগ করে। এই সংবাদদাতা গত মাসের প্রথম দিকে সুন্দরবনের উক্ত অঞ্চলে গমন করিলে গোল পাতা সংগ্রহকারী বাওয়ালীরা নরখাদকটিকে অবিলম্বে মারার ব্যবস্থা করিয়া তাহাদের জান বাঁচাইবার জন্য অনুরোধ করে। সে সময় পর্যন্ত বাঘটির হাতে প্রায় বিশ জন প্রাণ দিয়াছে বলিয়া তাহারা জানায়। বনবিভাগ বাওয়ালীদের নিরাপত্তা বিধান ও নিজেদের আয় বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বাঘটিকে শিকার করার জন্য সচেষ্ট হইলেও ধূর্ত শ্বাপদ বহুদিন তাঁহাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিয়া নিজের দাপট অব্যাহত রাখে। বাঘটি ৭।৮ মাইল দূরে যাইয়া এবং অনেক সময় অলক্ষ্যে বাওয়ালীদের অনুসরণ করিয়া শিকার ধরিতে থাকে।

গত মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে সুন্দরবন সফরকারী জার্মান টেলিভিশান দল নরখাদক বাঘটির কাহিনী শুনিয়া এই রেঞ্জে আগমন করেন। তাঁহাদের সহিত কয়েকজন অভিজ্ঞ শিকারীও ছিলেন। কিন্তু সুচতুর বাঘটি তাঁহাদের দৃষ্টি এড়াইয়াও শিকার ধরিতে থাকে। ইতিমধ্যে বন বিভাগও বাঘটিকে মারার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। খুলনার ডিভিশনাল ফরেষ্ট অফিসার জনাব এ, আলীম এবং বুড়ী গোয়ালনীর রেঞ্জ অফিসার জনাব এস, এ, হাকিম বাঘটিকে সন্ধান ও শিকারের জন্য বিভিন্ন স্থান হইতে দক্ষ শিকারী দল আনয়নের ব্যবস্থা করেন। তাঁহাদের তলবক্রমে পচাব্দীও বাঘের সন্ধানে গমন করেন। কিন্তু দুর্গম জঙ্গলে বাঘের থাবার চিহ্ন অনুসরণ করিয়া একাদিক্রমে ৮।১০ দিনের সন্ধানে নর মাংসলোলুপ প্রাণীকে প্রলুব্ধ করার জন্য নানা প্রকার কৌশল অবলম্বন করা সত্ত্বেও পচাব্দী যখন প্রায় হতাশ হইয়া ফিরিতেছিলেন, সেই সময় অর্থাৎ গত মাসের শেষ সপ্তাহে বাঘটি আঠারোবেকী এলাকায় ৪৮ নং লাটে তাহার ২৩তম শিকার ধরিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে পচাব্দী উক্ত স্থানে গমন করেন। পরদিন জঙ্গলের মধ্যে নিহত ব্যক্তির লাশটি

অর্ধভুক্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। অভিজ্ঞ শিকারী পচাব্দী বুঝিতে পারেন যে, বাঘটি তাহার শিকারের অবশিষ্টাংশ ভক্ষণের জন্য আবার লাশের নিকটে আসিবে। সুতরাং অদূরে একটি ঝোপের মধ্যে লুকাইয়া থাকিয়া তিনি লাশটিকে পাহারা দিতে থাকেন। এইভাবে প্রায় ৮।১০ ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর পচাব্দী বাঘটির আগমন সংকেত বুঝিতে পারিয়া বন্দুকের লক্ষ্য ঠিক রাখিয়া রুদ্ধ নিঃশ্বাসে অপেক্ষা করিতে থাকেন। বাঘটি বিড়ালের ন্যায় নিঃশব্দে লাশটির দিকে অগ্রসর হইতে থাকার সময় বন্দুকের পাল্লার মধ্যে আসিলে পচাব্দী ঝোপের ভিতর হইতে পর পর দুইটি গুলী ছোঁড়েন। তাঁহার অব্যর্থ লক্ষ্যে নরখাদক বাঘটি সঙ্গে সঙ্গে ভূতলশায়ী হইয়া শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে।

বাঘটি নিহত হওয়ার পর সঙ্গে সঙ্গে উক্ত সংবাদ রেঞ্জ অফিসে এবং সেখান হইতে রেডিওগ্রামে খুলনাস্থ ডিভিশনাল অফিসে জানাইয়া দেওয়া হয়। খুলনার ডি, এফ, ও নরখাদকের শিকারী পচাব্দীকে যথাযথভাবে পুরস্কার দিবেন বলিয়া জানাইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত খুলনা বিভাগের কমিশনার জনাব আবুল এহসানও তাঁহাকে নগদ পুরস্কার দানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, পচাব্দীর পিতা মেহেরালী গাজীও বিখ্যাত শিকারী ছিলেন। তিনি নিজের জীবনে ৫৩টি রয়েল বেঙ্গল টাইগার শিকার করার পর শেষ পর্যন্ত বাঘের হাতেই প্রাণ দেন।"

রোমাঞ্চকর কাহিনীর নায়ক পচাব্দী

"খুলনা, ২৪শে এপ্রিল। পচাব্দী নামটি সুন্দরবনের গল্পকথার নায়কে পরিণত হইয়াছে। বস্তুত, এই নামটি সুন্দরবনের রয়্যাল টাইগারের নিকটও আতঙ্কের কারণ।

পচাব্দী গাজী সম্প্রতি সুন্দরবনের বুড়ী গোয়ালিনী রেঞ্জে একটি বারো ফুট দীর্ঘ বাঘ মারিয়াছেন। খুলনা বিভাগীয় বন অফিসার জনাব এ, আলীম বলেন যে, সুন্দরবনের ইতিহাসে এ পর্যন্ত যতগুলি বাঘ মারা হইয়াছে ইহা তার মধ্যে দীর্ঘতম। তিনি আরও বলেন যে, ইহা বিশ্বের অন্যতম দীর্ঘ বাঘ।

গত দুইমাস ধরিয়া এই মানুষ খেঁকো বাঘটি সুন্দরবন এলাকায় আতঙ্ক সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছিল এবং এ পর্যন্ত বাঘটি ২১ জনের প্রাণনাশ করিয়াছে। এই বাঘটিকেই পচাব্দী গাজী মারিয়াছেন।

পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক এই বীর শিকারীর বীরত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ খুলনার বিভাগীয় কমিশনার জনাব আবুল এহসান গত সন্ধ্যায় তাঁহাকে আড়াই শত টাকা পুরস্কার দান করেন। পচাব্দী বাঘ শিকারী পরিবারেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার পিতা ও পিতামহও বাঘ মারিতেন, আর সেই বাঘের ছাল বিক্রয় করিয়াও সরকারের নিকট হইতে পুরস্কার লাভ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেন। একদিন এমনি বাঘ শিকার করিতে যাইয়া গাজীর পিতা, পিতামহ ও পিতৃব্য প্রাণ হারাইয়াছেন।

পচাব্দী গাজী এক্ষণে খুলনা বন কর্তৃপক্ষের অধীনে বোটম্যানের চাকুরী করিতেছেন এবং মাসে মাত্র ৮০্ টাকা করিয়া বেতন পাইয়া থাকেন। তিনি ৫৫ সাল হইতে এই কাজই করিতেছেন। তিনি ইতিমধ্যেই ৫০টি বাঘ মারিতে সক্ষম হইয়াছেন। তাঁহার পিতা বাঘের হাতে প্রাণ হারানোর পূর্বে ৫৬টি বাঘকে মারিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

পচাব্দী ব্যক্তিগত জীবনে অত্যন্ত বিনম্র স্বভাবের। বিস্ময়ের কথা. পচাব্দী আর বাঘ মারিবেন না বলিয়া এই সংবাদ দাতাকে জানাইয়াছেন। তিনি বলেন, তিনি স্বপ্নে দেখিয়াছেন যে এবার শিকারে গেলে বাঘের হাতে তাঁহার প্রাণ যাইবে। তাঁহার পিতা, পিতামহ ও পিতৃব্য সকলেই মৃত্যুর পূর্বে অনুরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, কিন্তু বিশ্বাস করেন নাই। তিনি তাই আর ভাগ্য পরীক্ষা করিতে চাহেন না।"

বাঘে মানুষের যুদ্ধ সম্পর্কে আরও দুই একটি চমকপ্রদ ঘটনা বর্ণনা করিয়া আমরা এ প্রসঙ্গ শেষ করিব।

কালীগঞ্জ থানার অন্তর্গত গড়াইমহাল গ্রামে বিখ্যাত শিকারী জয়নদ্দি মিস্ত্রীর বাড়ী। জীবনে সে ৯৬টি বাঘ মারিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। তন্মধ্যে একটি অতি বৃহৎ, লেজসহ ১১ হাত লম্বা। এইরূপ বৃহৎকার বাঘের কথা পূর্বে শুনা যায় নাই। শিকারী পরবর্তী বাঘ মারিবার জন্য জঙ্গলে কল পাতিয়া রাখে।

শেষ রাত্রিতে বন্দুকের আওয়াজ শ্রুত হয়। শিকারী সাধারণতঃ আওয়াজের কিছুক্ষণ পরে জঙ্গলে প্রবেশ করে। কিন্তু জয়নদ্দি শিকারের নেশায় একটুও দেরী সহ্য করিল না। সে অন্য একটি বন্দুকে গুলী পুরিয়া জঙ্গলে প্রবেশ করে। সঙ্গে তার ভ্রাতুষ্পুত্র উভয়ই বাঘ দেখিয়াছে। গুলীতে জানোয়ারের সামনের পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং অবিরলধারে উহার মুখ দিয় লালা পড়িতেছে। প্রথম গুলী বাঘের গায়ে লাগিল না। দ্বিতীয় গুলী বাঘের গাত্র স্পর্শ করা মাত্র ভীমবেগে শিকারীকে আক্রমণ করিয়া তাহার শরীর কামড়াইয়া ধরিয়াছে। এমতাবস্থায় শিকারী ভ্রাতুষ্পুত্রক গুলী পুরিয়া দিতে বলিল, কি দুর্জয় সাহস! ভ্রাতুষ্পুত্র দা দিয়া বাঘকে সজোরে কোপাইতে লাগিল। কিন্তু বাঘ শিকারীকে কিছুতেই ছাড়ে না। জয়নদ্দি বাঘের মুখে থাকিয়াও কৌশলে বন্দুকের ব্যারেল উহার গালে পুরিয়া দিল। ভ্রাতুষ্পুত্র একেবারে বেহুশ। বাঘও হাঁ ছাড়িয়া দিবার পর মরিয়া গেল। কি অসীম সাহস! সাধারণ লোকের পক্ষে এহেন অবস্থা কল্পনাতীত। বাড়ীতে আসিয়া তিনদিন পরে বীর শিকারী মৃত্যুমুখে পতিত হইল। মরণকালে শুধু বলিত: "আমাকে বাঘে ধরলো, ওবে বাঘে ধরলো।" এইভাবে প্রলাপ বকিতে বকিতে সে মরিয়া গেল। তাহার বড় সাধ ছিল ১০০ বাঘ মারিয়া কৃতিত্ব অর্জন করিবে। কিন্তু সেঞ্চুরী করিতে তিনটি বাকী রহিয়া গেল।

বনাঞ্চলে জয়নদ্দি মিস্ত্রীর খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িয়াছিল সন্দেহ নাই। তবে ৯৭টি বাঘ শিকারের কাহিনী অতিরঞ্জিত। সুন্দরবনের বাঘ শিকারের ইতিহাসে পচাব্দীর পিতা মেহের গাজীই সর্বাপেক্ষা দুর্জয় শিকারী। তাহার সম্পর্কেও একশত বাঘ শিকারের কথা জানা যায় নাই। সামান্য একটি মাত্র বাঘ শিকার নিঃসন্দেহে দুঃসাহসিক কার্য এবং বীরত্বের কথা। পচাব্দী ৫০টি এবং তাহার পিতা মেহের ৫৫টি বাঘ শিকার করিয়া পিতাপুত্রে যে অভিনব রেকর্ড সৃষ্টি করিয়াছে তাহা বনাঞ্চলের ইতিহাসে এক রোমাঞ্চময় অধ্যায়।

শেষ চাঞ্চল্যকর কাহিনী — শ্যামনগর থানার অধীন সুন্দরবন সংলগ্ন এক গ্রাম। এই গ্রামের দুই সহোদর ভ্রাতা খ্যাতনামা শিকারী। উভয়ে যুবক, ভবিষ্যতের আশায় বুক বাঁধিয়া তাহারা বনে জঙ্গলে শিকার করিয়া বেড়ায়। একে অন্যকে ভক্তি ও স্নেহ করে প্রচুর। প্রায় সর্বদা দুই ভাই একত্রে বসবাস

করে। একত্রে চলাফেরা করে। ভ্রাতৃস্নেহ দর্শনে তাহাদিগকে লোকে বলে, যেন রাম লক্ষ্মণ।

একদিন জ্যেষ্ঠ্য ভ্রাতা তিনজন সঙ্গীসহ শিকারের জন্য জঙ্গলে প্রবেশ করিয়াছে। অকস্মাৎ ব্যাঘ্রে আক্রমণ করিয়া তাহাকে ধরিয়া লইয়া যায়। সঙ্গীরা আসিয়া বাড়ীতে তাহাব এই অপমৃত্যুর সংবাদ দেয়। অন্য ভ্রাতা এহেন মর্মন্তুদ সংবাদে পাগলপ্রায়। প্রতিশোধ গ্রহণ মানসে সে বীরনাদে হুংকার ছাড়িয়া জঙ্গলে যাত্রা করে। সে এই প্রতিজ্ঞা করে যে ভ্রাতাকে ব্যাঘ্রের কবল হইতে ছিনাইয়া আনিতে না পারিলে গ্রামে ফিরিবে না। কেমন করিয়া লোকের কাছে মুখ দেখাইবে? কি কঠিন প্রতিজ্ঞা! ইহাও কি সম্ভব? জঙ্গলে প্রবেশ করিয়া সে সঙ্গীদের বলিল, কোন স্থান হইতে আমার প্রাণের ভাইকে ব্যাঘ্রে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে; সেই স্থান আমাকে দেখাইয়া দাও।" যথা স্থানে গিয়া সে একাকী জঙ্গলের মধ্যে অগ্রসর হইতে লাগিল।

নিঝুম নিরালা বন, চারিদিকে থমথম ভাব মনে হইল। লোকটির সঙ্গে কেহই নাই। একদিকে ভ্রাতার মৃত্যুর হৃদয় বিদাবক খবর, অন্যদিকে প্রতিশোধ গ্রহণের উদগ্র নেশা। লোকটি কণ্টকময় জংলী-পথ অতিক্রম করিয়া এক প্রকাণ্ড ময়দানে উপস্থিত হইল। ময়দানের পার্শ্বে গভীর জঙ্গল। পশুপক্ষীরও কোন শব্দ নাই। চারিদিক নিস্তব্ধ অথচ থমথমে। দেখা গেল, ভাইয়ের লাশ সেখানে পড়িয়া আছে। অতঃপর সে বন্দুক হস্তে এক সুউচ্চ বৃক্ষে আরোহণ করিয়া আসন গ্রহণ করিল। কিছুক্ষণ পরেই উক্ত লাশ ভক্ষণ করিবার জন্য ব্যাঘ্রটি সেখানে আসিল। ইতিমধ্যে ব্যাঘ্রের নাসারন্ধ্রে মানুষের গন্ধ প্রবেশ করিয়াছে। ব্যাঘ্রটি ইতস্ততঃ করিয়া মনে করিল যে উহা সেই মরা মানুষের গন্ধ। মানুষের ন্যায় বাঘেরও মতিভ্রম ঘটিয়া থাকে। ব্যাঘ্রটি লাশ মুখে করিয়া উর্ধে তুলিয়া মাটিতে ফেলিয়া ক্রীড়া করিতে থাকে।

দিনমণি অস্তাচলে গিয়াছে। সন্ধ্যার অন্ধকার একটু একটু করিয়া ঘনীভূত হইয়া আসিতেছে। এমন সময় গভীর অরণ্যানীর নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া বন্দুক ডাকিয়া উঠে। শব্দ এমন ভাবে প্রতিধ্বনিত হইল যে সমগ্র বনানী

কাঁপিয়া উঠিল। গুলী খাইয়া ব্যাঘ্রটি ধপাস করিয়া পড়িয়া যায়। একটি মাত্র বুলেটের আঘাতে সেই ভয়াবহ হিংস্র জন্তুর জীবন প্রদীপ নিভিয়া যায়।

অসম সাহসী বীর শিকারী ভ্রাতৃহন্তার প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়া ভ্রাতৃশোক লাঘব করে। শিকারী তৎক্ষণাৎ ব্যাঘ্রটির মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করত প্রিয়তম ভ্রাতার লাশ স্কন্ধে করিয়া বাড়ীতে প্রত্যাগমন করে। দেশের সর্বত্র হৈ চৈ পড়িয়া যায়। চারি দিকেই দুর্জয় সাহসের খ্যাতি মুহূর্ত মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে। এই সংবাদে দেশের মানুষ আশ্চর্যান্বিত হইয়া ধন্য ধন্য করিতে থাকে। সত্যই বাদা অঞ্চলের মানুষ দুঃসাহসী ও দুর্জয়।



সুন্দরবনের ইতিহাস

দ্বিতীয় খণ্ড

ঐতিহাসিক

প্রাচীন ও মধ্যযুগ

সুন্দরবনের ইতিহাস

দ্বিতীয় খণ্ড

।। এক ।।

আদিম যুগ

যে ভূ খণ্ড লইয়া ভারত বিভাগের পর পূর্ব পাকিস্তান প্রদেশ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে উহারই অধিকাংশ স্থান পুরা কালে বঙ্গ নামে অভিহিত হইত। বঙ্গ দেশের অবস্থান অতীব প্রাচীন কাল হইতে বিদ্যমান আছে। আদিম হিন্দু ও বৌদ্ধ-জৈন যুগের ইতিহাস নাই বলিলে চলে। আমাদের নিকট যে ইতিহাসের টুকিটাকি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে তাহার অধিকাংশই পণ্ডিতগণের গবেষণার ফল। হিন্দুদের অতি প্রাচীন ধর্ম গ্রন্থ বেদ। বেদ চারিভাগে বিভক্ত :— ঋক, যজু, সাম ও অথর্ব। উক্ত ধর্মগ্রন্থে এই বৈদিক যুগের কিছু কিছু ইতিহাসের আভাস পাওয়া যায়, তাহারই নির্যাস লইয়া এদেশের প্রাচীন কালীন ইতিহাস লিখিত হইয়াছে। শুধু পাক ভারত উপ মহাদেশের এহেন অবস্থা নহে সমগ্র পৃথিবীর বিভিন্ন সভ্যদেশের আদি ইতিহাস উদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই। ইতিহাস লেখায় সেকালের লোক অভ্যস্ত ছিল না এবং মানুষ এখনকার মত সুসভ্য ছিল না। আলোচ্য প্রসঙ্গে আমরা সুন্দরবন অঞ্চল ; অর্থাৎ অতি প্রাচীন কালে যে সব স্থান জুড়িয়া সুন্দরবন ছিল সেই বাকেরগঞ্জ, যশোর ও খুলনা জিলার প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধার করিয়া পাঠকগণের নিকট উহা পরিবেশন করিতে চেষ্টা করিব। ইহা দক্ষিণ বঙ্গ এবং বহুলাংশে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানেরই ইতিহাস।

বঙ্গদেশে সর্ব প্রথম অনার্য জাতির বসবাস ছিল। গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের প্রারম্ভেই আমরা বলিয়াছি যে কোন এক অজ্ঞাত অতীত কালে গাঙ্গেয় বদ্বীপের সর্বত্র অতল সমুদ্র ছিল এবং গঙ্গা নদীর দ্বারা হিমালয় হইতে জল আনীত হইয়া যুগ যুগ ধরিয়া চর ও দ্বীপ গঠিত হইয়াছে। গঙ্গার শাখা পদ্মা ও ভাগীরথীর মধ্যভাগই এই গাঙ্গেয় বদ্বীপ এবং এই বদ্বীপের পরবর্তী রাজনৈতিক নাম হইয়াছিল বাগ্‌ড়ী। উহার পূর্বে এই স্থান প্রাচীন বঙ্গের অধীন ছিল।

বদ্বীপ গঠনের পর সম্ভবতঃ আদিম যুগের লোকেরা ও অনার্যগণ বিভিন্ন দিক হইতে আসিয়া এতদঞ্চল আবাদ করিয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া এই অনার্যগণ এতদঞ্চলে মনুষ্য বসতি গড়িয়া তুলিয়াছিল। কয়েক সহস্র বৎসব পূর্বে এই ধরণের বসতি গড়িয়া উঠিয়াছিল ইতিহাস তাহা সঠিকভাবে নির্ণয় কবিতে পারে নাই।

গঙ্গা ও পদ্মার সঙ্গম স্থলে প্রাচীনকালে বহু দ্বীপের উৎপত্তি হইয়াছিল। এই সমস্ত দ্বীপের মধ্যে নিম্নভাগ হইতে অনেক নদীও উৎপত্তি হইয়াছিল। ক্রমান্বয়ে ভাগীবথীর পূর্বে ও পদ্মাব দক্ষিণ দিকে চর ও দ্বীপেব সৃষ্টি হইতে থাকে। হিমালয়ের গাত্র ধৌত কবিয়া তুষার নিঃসৃত জলরাশি পর্বতরেণু বহন করিয়া সাগর পানে ছুটিতে থাকে এবং মৃত্তিকা ও বালির সমন্বয়ে এক প্রকার পলি মাটি নদী তীরবর্তী প্রদেশ উঁচু করিয়া চলিয়া যায়। এইরূপ দ্বীপ গঠনের পর ভূমি ক্রমশঃ কোথাও জঙ্গলাকীর্ণ হইত এবং কোথাও লোক বসতি গড়িয়া উঠিত। এইভাবে পদ্মা ও ভাগীরথীর মধ্যবর্তী স্থানে ত্রিকোণাকৃতি ভূমি খণ্ড আসমুদ্র বিস্তারিত হইয়া পড়ে। ইহাকেই প্রাচীনকালীন বব্দ্বীপ এবং আমরা উহাকে বদ্বীপ বলিয়া থাকি। এই বক্ দ্বীপই বৌদ্ধ আমলে বগ্‌দি নামে পরিচিত ছিল এবং সেন রাজগণের সময় এই প্রদেশের নাম হয় বাগ্‌দি বা বাগ্‌ড়ি। বাগ্‌দির প্রাচীন কালীন অসভ্য বাসিন্দাদেরই বাগ্‌দি নামে আখ্যাত করা হইত। এদতঞ্চলে এখনও বাগ্‌দি জাতির বসবাস আছে। কানিংহাম বলেন যে এতদঞ্চলের অর্থাৎ গাঙ্গেয় বদ্বীপের নাম ছিল ব্যাঘ্রতাতী। এখানকার জঙ্গলময় স্থানে ব্যাঘ্রের উপদ্রব ছিল অত্যধিক সেজন্য গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের বদ্বীপকে ব্যাঘ্রতাতী বলা হইত। সেন আমলে এই ব্যাঘ্রতাতী শব্দ হইতে বাগ্‌ড়ী বা বাগ্‌দি নামের উৎপত্তি হয়।

গাঙ্গেয় বদ্বীপের আকৃতি পূর্বে এত বিস্তৃত ও প্রশস্ত ছিল না। ইহার অধিকাংশ স্থানই কাননাবৃত ছিল। "পাণিনির মহাভাষ্য পতঞ্জলী প্রাচীন আর্যাবর্তের সীমা নির্দেশ করিতে গিয়া উহার পূর্বভাগে কালক বনের উল্লেখ করিয়াছেন। এই কালক বনই বোধ হয় সুন্দরবন।" বাংলার পুরাবৃত্তের লেখক পরেশ নাথ বন্দোপাধ্যায় এইরূপ অনুমান করিয়াছেন। একথা সত্য যে

গঙ্গা নদীর মোহনার পার্শ্বে সমুদ্র তীরবর্তী স্থান সমূহ জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। এই জঙ্গলের নাম কালকবন হইতে পাবে। বঙ্গের প্রায় সমস্ত দক্ষিণ ভূভাগ গঙ্গার শাখা নদীসমূহের মোহনায় পূর্ণ এবং সেইজন্যই দক্ষিণাংশ কাননাবৃত। এই সমস্ত নদীর মোহনা যত দূর সাগরে প্রবেশ করিয়াছে জঙ্গলও তত দূর সরিয়া গিয়াছে। বনের উত্তর ভাগেও ক্রমান্বয়ে জন বসতি গড়িয়া দক্ষিণ দিকে সরিয়াছে এবং এখনও সময় সময় এইরূপ অপসারণ হইয়া থাকে। গাঙ্গেয় বদ্বীপের সর্বত্রই অসংখ্য দ্বীপ ছিল এবং ঐ সমস্ত দ্বীপ ক্রমান্বয়ে সীমারেখা পরিবর্তন করিয়া একে অন্যের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে এ বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে।

আমাদের আলোচ্য সুন্দরবন ও উহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল এক কালে কতিপয় দ্বীপের সমষ্টি ছিল। সাতক্ষীরা ও খুলনা সদরেব বুড়ন বা বৃদ্ধদ্বীপ ছিল। চন্দ্রদ্বীপ দক্ষিণ বাকেরগঞ্জ ও খুলনার পূর্বাংশ জুড়িয়া বিস্তৃত ছিল। যশোরের মহেশপুর প্রভৃতি স্থান জুড়িয়া সূর্যদ্বীপ ছিল এবং সেন রাজত্বের আমলে ধীবর বংশীয় সূর্য নামক এক ধীবর ইহার শাসনকর্তা ছিলেন। সেইজন্য এই দ্বীপের নাম হইয়াছিল সূর্যদ্বীপ। আমাদের দেশের ধীবরেরা সূর্য রাজার স্বগোত্র বলিয়া রাজবংশী আখ্যা গ্রহণ করিয়াছে। সূর্যদ্বীপেব উত্তরে নবদ্বীপ, জয়দ্বীপ ও নবদ্বীপের মধ্যস্থলে সম্ভবতঃ যশোব জিলার উত্তরাংশ ছিল। আদিস্যূর চন্দ্রদ্বীপ জয় কবিয়াছিলেন। বাক্‌লার অধিপতি দনুজমর্দন দেব এই রাজ্যের রাজা ছিলেন। চন্দ্রদ্বীপের পশ্চিমে মধুদ্বীপ এবং উহার পশ্চিমে রঙ্গদ্বীপ। সম্ভবতঃ বাগেরহাটের মধুদিয়া ও রাংদিয়া পরগনায় এই তুইটি দ্বীপের অবস্থান ছিল। বৃদ্ধদ্বীপের দক্ষিণে বহির্দ্বীপ বা বর্তমান বাহিরদিয়া। এখনও সুন্দরবনের মধ্যে এই ধরনের অসংখ্য দ্বীপ দৃষ্টিগোচর হয়। বর্তমানে সুন্দরবনের উত্তরে যশোর খুলনা ও বাকেরগঞ্জ জিলার সর্বত্র এই ধরনের অসংখ্য দ্বীপের সমষ্টি ছিল, উপরোক্ত বিবরণ হইতে ইহাই সপ্রমাণিত হয়।

বৈদিক যুগের গ্রন্থসমূহে বঙ্গদেশের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। উহা হইতে জানা যায় যে বঙ্গ, মগধ ও চের বলিয়া তিনটি দেশ ছিল এবং এই তিন দেশের অধিবাসীগণ তুর্বল ও অসভ্য ছিল। তাহারা অখাদ্য ও কুখাদ্য খাইয়া

জীবন ধারণ করিত। ঐত্রেয় আরণ্যক গ্রন্থে লিখিত আছে যে, এতদঞ্চলের লোকেরা খাদ্য দ্রব্যের কোন বিচার করিত না এবং যাহা পাইত তাহাই খাইত। তাহারা অনেক সন্তান সন্ততি জন্ম দিত। গোপাল হালদার বলেন যে বঙ্গদেশ তখন নানা জাতি উপ-জাতির বাসভূমি ছিল। রাঢ়, সুহ্ম, পুণ্ড্র, বঙ্গ প্রভৃতি প্রাচীন শব্দগুলি বিশেষ জাতি বা উপজাতিকে বুঝাইত। বরেন্দ্র বা বরেন্দ্রী এবং বঙ্গ বলিতে বিশেষভাবে বর্তমান পূর্ব পাকিস্তানকে বুঝাইত। আবার সমতট, হরিকেল প্রভৃতি সেই পূর্ব পাকিস্তানের দক্ষিণ দিককার এক একটি ভাগের নাম। ইহার মধ্যে গৌড় ও বঙ্গ শব্দ দুইটি সুপ্রাচীন এবং পাণিনিতেও উহার উল্লেখ আছে। "বঙ্গ মগধের" উল্লেখ আছে ঐত্তরেয় আরণ্যকেও। কিন্তু সমস্ত বাংলা দেশের সাধারন নাম 'বাঙলা' মুসলমান তুর্ক বিজেতারই দান।" ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার বলেনঃ— "গৌড় রাষ্ট্রের অধীন অধুনা উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গ এবং বঙ্গের অধীন অধুনা দক্ষিণ ও পূর্ব বঙ্গ ছিল।" দক্ষিণ রাঢ়, উত্তর রাঢ় বাংলা, তাম্রলিপ্তি পৌণ্ড্রবর্ধন সবই প্রাচীন নাম। গৌড়পুর, পুণ্ড্রনগর, পুণ্ড্রবর্ধন তাম্রলিপ্তি, সোমপুর, বসুবিহার, বর্ধমান, পুষ্কর্ণ, প্রভৃতি এদেশের প্রাচীন শহর। ইদিলপুর, চন্দ্রদ্বীপ বা ইন্দ্রদ্বীপ যশোর বা মুরলী ও প্রাচীন স্থান। আমাদের আলোচ্য সুন্দরবনাঞ্চল বা বাকেরগঞ্জ, যশোর-খুলনা প্রাচীন বঙ্গের অধীন ছিল বলিয়াই অনুমিত হয়।

রঘু বংশে লিখিত আছে যে এ দেশের লোকেরা নৌকায় বাস করিত এবং ধান্যের চাষাবাদ করিত। খুলনা গেজেটিয়ার প্রণেতা মিঃ ওমালী বলেন যে তখন এদেশের লোকেরা অসভ্য ছিল। ধর্মজ্ঞান বলিতে তাহাদের কিছুই ছিল না। এই সময় বঙ্গদেশের পার্শ্বেই অঙ্গ দেশের নাম শ্রুত হয়। খুব সম্ভব মহাভারতের যুগে আর্যগণ পশ্চিম উত্তর এশিয়া হইতে এদেশে আসিয়া বসতি স্থাপন করিত, সেই সমস্ত স্থান কালে তীর্থ ভূমিতে পরিণত হয়। কিন্তু আর্যগণ অনার্যদের সংস্পর্শে আসিয়া এদেশের আবহাওয়া ও সমাজের প্রভাবে বিশেষ ভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছিল। এই ভাবে বঙ্গে আর্য ধর্মের প্রভাব অচিরেই লোপ পাইয়াছিল। ক্ষত্রিয়গণ রাজ্য জয় করত এদেশে বসবাস করিয়া অনার্যদের উপর কর্তৃত্ব করিত। উভয় জাতির সঙ্গে আবার অনেক সময় যুদ্ধ বিগ্রহের ফলে দেশে অসংখ্য লোক ক্ষয় হইত। এই ভাবে রাজ্য মধ্যে

সময় সময় অশান্তি বিরাজ করিত। রাজ্য শাসনের পদ্ধতি ও সুশৃঙ্খলাবদ্ধ ছিল না। "জোর যার মুল্লুক তার"—এই নীতি তৎকালে অতিমাত্রায় প্রবল ছিল।

ব্রাহ্মণেরা তখন এদেশে আসিত না। ধর্মীয় গোড়ামির জন্য সম্ভবতঃ তাহারা এদেশীয় লোকদের সংস্পর্শে আসা সমীচীন মনে করে নাই অথবা এদেশে আসিলে প্রভুত্ব বিস্তার করিতে বিঘ্ন জন্মিতে পারে সেইজন্য তাহারা ক্ষত্রিয়দের ন্যায় এদেশে আসে নাই। গঙ্গা নদীর প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে বসতি গড়িয়া উঠিয়াছিল। মহাভারতের ন্যায় রামায়ণেও বঙ্গ রাজ্যের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। রামায়ণের যুগে মিথিলা, পৌণ্ড্রবর্ধন, অঙ্গ, মগধ, কোশল প্রভৃতি দেশের অস্তিত্ব ছিল বলিয়া জানা যায়। আরও জানা যায় যে বঙ্গের অধিবাসীদের তখন নৌ-শক্তি ছিল এবং তাহারা কিছুটা যুদ্ধবিদ্যাও অর্জন করিয়াছিল।

পরবর্তী কালে ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যে বঙ্গের অধিবাসীদিগকে দাস্য বলা হইয়াছে। মহাভারতে সমুদ্র তীরবর্তী বঙ্গের অধিবাসীদের ম্লেচ্ছ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। উত্তর ভারতীয়েরা বঙ্গকে 'পাণ্ডব বর্জিত' দেশ বলিত। ভগবৎ পুরাণে রাঢ় বা সুহ্মবাসীদিগকে পাপী বলা হইয়াছে। এদেশের অধিবাসীরা কিরাত, হুণ, অন্ধ্র, পুলিন্দ, পুক্কাকাস, আভির, যবন এবং খাসাস নামে অভিহিত হইত। ভাগীরথী ও নিম্ন গঙ্গা পবিত্র স্থান ছিল। গঙ্গারিডিদের ৪০০০ যুদ্ধ হস্তী দেশ রক্ষার জন্য মোতায়েন থাকিত। ডিওডোরাস বলিয়াছেন যে গঙ্গারিডি ও অন্যান্য প্রতিবেশী রাজারা দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডারের আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য (খৃঃ পূর্ব ৩২১—৩২৭) ২০০০০০ অশ্ব, ৮০০০০ পদাতিক, ৮০০০ সজ্জিত যুদ্ধরথ এবং ৬০০০ হস্তী সহ অপেক্ষা করিতে থাকে।

হিন্দু জাতির মহাগ্রন্থ রামায়ণে সগর দ্বীপের নাম পাওয়া যায়। সেখানে কপিলেশ্বর সাধুর আশ্রম ছিল বলিয়া বর্ণিত আছে। সেই সাধুর নামে এখানে একটি মন্দির আছে। প্রতি বৎসর পৌষ মাসে মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে এখানে বিরাট মেলা হয়। গঙ্গার এক শাখার নাম ভাগীরথী। উহা যে স্থানে সাগরের সহিত মিশিয়াছে সেই স্থানের নাম সগর দ্বীপ। এই সগর দ্বীপ চিরদিন ধরিয়া হিন্দু জাতির একটি পবিত্র তীর্থ ক্ষেত্র হিসাবে খ্যাত। মহাভারতীয় যুগে বঙ্গে

আর্যদের বসতি ও সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল বলিয়া উল্লেখ আছে। এই সময় বঙ্গ দেশে কোন একচ্ছত্র অধিপতি ছিল না এবং এই রাজ্য নানা খণ্ডে বিভক্ত ছিল। সম্ভবতঃ এদেশ তখন পূর্ব বঙ্গ, পশ্চিম বঙ্গ বা রাঢ়, দাক্ষিণ বঙ্গ এবং বরেন্দ্র প্রভৃতি নামে বিভক্ত ছিল। সমুদ্র সেন পূর্ব বঙ্গে, পশ্চিম বঙ্গে চন্দ্র সেন এবং রাঢ়ে তাম্রলিপ্ত রাজা শাসক ছিলেন বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। মেদিনীপুর জিলার তমলুক বা তাম্রলিপ্ত, তাম্রলিপ্ত রাজার রাজধানী ছিল।

সাধু কপিলেশ্বরের নাম প্রাচীন কাল অবধি শ্রুত হইয়া আসিতেছে। কেহ কেহ বলেন তিনি স্বদেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ করেন এবং বঙ্গের দক্ষিণে সুন্দরবনের মধ্যে আশ্রম নির্মাণ করেন। এই প্রাচীন স্থান সাধুর নামানুসারে তদীয় পীঠস্থান কপিলমুনি নামে খ্যাত। কপিলমুনি খুলনা জিলার একটি প্রসিদ্ধ ব্যবসায় কেন্দ্র। কপিলমুনিতে একটি বৌদ্ধ আশ্রম ছিল বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। কপোতাক্ষী নদীর তীরে এই প্রাচীন স্থান এখনও উহার পূর্ব গৌরব রক্ষা করিয়া চলিতেছে। দক্ষিণ খুলনার আমাদী ও বেতকাশী এবং বাগেরহাটের উত্তরে পানিঘাটও প্রাচীন স্থান। প্রাচীনকালে জঙ্গল মধ্যে এই সমস্ত জনপল্লী গড়িয়া উঠিয়াছিল। পানিঘাট গ্রামে মৃত্তিকার নিম্নে বা জঙ্গলের মধ্যে একটি অষ্টাদশভূজা মহিষমর্দিনী মূর্তি পাওয়া গিয়াছিল। কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন যে এই দেব মূর্তি অতীব প্রাচীন এবং আদিম যুগ হইতেই বিদ্যমান আছে। এই মূর্তি সম্পর্কে এদেশে হিন্দুদের মধ্যে কয়েকটি কাহিনী প্রচলিত আছে, কিন্তু উহার মূলে কোন ঐতিহাসিক সত্যের সন্ধান পাওয়া যায় না।

বিগত ইং ১৯৬১ সালের মে মাসের ভয়াবহ ঝড়ে চিতলমারী গ্রামের সন্নিকটে খড়মখালিতে একটি অতিকায় বট বৃক্ষ উৎপাটিত হয়। উহার নিম্নে মাটির তলদেশ হইতে একটি মূর্তি বাহির হইয়া পড়ে। কোন্ কালে ঐ হিন্দু দেব মূর্তি স্থাপিত হইয়াছিল উহার সঠিক তথ্য নির্ণয় করা ভার। পানিঘাট সম্পর্কে জনাব আবদুল করিম বিশ্ববাণী পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। উহাতে তিনি বলিয়াছেন যে পানিঘাট হইতে পশরের পার্শ্ববর্তী কুড়ানতলা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগ এককালে জলমগ্ন ছিল। পানিঘাট হইতে কুড়ানতলা

পর্যন্ত পারাপারের ব্যবস্থা ছিল কিন্তু ঐ জলময় স্থান অতিক্রম করিতে খেয়া নৌকায় একদিন সময় লাগিত। জনাব আবদুল করিম বলিয়াছেন যে বর্তমান পুরোহিতদের পূর্ব পুরুষ রাজীব লোচন চক্রবর্তী সেন রাজগণের রাজত্ব কালে পানিঘাটের এই মূর্তি নদী গর্ভ হইতে উদ্ধার করেন। ইহা কষ্টি পাথরের উপর খোদিত মূর্তি। পানিঘাটে কে কবে এই এই দেব মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন সঠিকভাবে বলা দুষ্কর। খড়মখালির প্রতিমূর্তি প্রস্তর নির্মিত চতুর্ভূ্জ বিষ্ণু মূর্তি। উহাতে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম খোদিত আছে।

খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে বুদ্ধদেবের আবির্ভাব হয়। তিনি গয়ার নিকট নিরঞ্জনা নদীতীরে সিদ্ধিলাভ করেন। এইজন্য উক্ত স্থানের সন্নিকটে বিহারের অন্তর্গত পাটলিপুত্র, নালন্দা প্রভৃতি অঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্ম সর্ব প্রথম বিস্তার লাভ করিয়াছিল। এই স্থান হইতে বঙ্গদেশ খুবই নিকটবর্তী। হিউয়েন সাঙের বিবরণীতে দেখা যায় যে স্বয়ং বুদ্ধদেব এ দেশে আসিয়া স্বীয় মত প্রচার করিয়াছিলেন। এই সমস্ত বিবরণ হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে দক্ষিণ বঙ্গে সুন্দরবন পর্যন্ত বৌদ্ধ ধর্ম বিস্তার লাভ করিয়াছিল। বুদ্ধদেবের বাণী বঙ্গদেশ হইয়া ব্রহ্ম ও সিংহলে গিয়াছিল। সম্ভবতঃ সুন্দরবন অঞ্চলে এই সময় বৌদ্ধদের বসতি অধিক পরিমাণে বিদ্যমান ছিল। দীঘি খননের সময় পীর খানজাহান আলি মৃত্তিকার নিম্নে যে বুদ্ধ মূর্তি পাইয়াছিলেন তাহা প্রমাণ করাইয়া দেয় যে এতদঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্ম বিস্তৃত ছিল। ভরতভয়না ও আগ্রার স্তূপ এবং বার-বাজারের বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল ছিল বলিয়া অনুমিত হইয়াছে।

যীশু খৃষ্টের জন্মের প্রায় ছয়শত বৎসর পূর্বে সম্ভবতঃ এদেশে আর্য সভ্যতার পত্তন হয়। উহার পূর্ব হইতে এতদঞ্চলে অনার্যগণ ও আদিম অধিবাসীরা সমুদ্র তীরে ও সুন্দরবনাঞ্চলে বসবাস করিত। রাহুল সংস্কৃত্যায়ন রচিত "ভোলগা থেকে গঙ্গা" নামক গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে আর্যজাতির আগমনের পূর্বে শুধু অনার্য জাতির বসবাস ছিল না। তাঁহার লেখনী হইতে জানা যায় যে প্রাক্ আর্যগণ এদেশে আর্য জাতির বহু পূর্বে সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছিল। এই প্রাক্ আর্য সভ্যতার বিষয় আমাদের নূতন ভাবে প্রকাশ করিতে হইবে। প্রাক্ আর্যগণ যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শী ছিল এবং ন্যায় অন্যায়

পার্থক্য করিবার ক্ষমতা রাখিত। সভ্য জাতিগুলির মধ্যে দামিল, নিষাদ ও কিরাত জাতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিরাত জাতি ব্যবসা-বাণিজ্য করিত। তাহারা পর্বত গাত্রে বাস করিত এবং ওষধি প্রভৃতি দ্রব্যের পরিবর্তে কাপড়, মাদুর ও চামড়া দেশে আমদানী করিত। নিষাদেরা গ্রামে বসবাস করিত এবং তাহাদের শাসন কর্তাকে "স্থপতি" বলিত। এই সব জাতির লোকেরা লৌহ, তাম্র, পিতল ও কাঁসার ব্যবহার জানিত। তাহারা কৃষিকার্য করিয়া ধান ও অন্যান্য ফসল উৎপন্ন করিত। প্রাক্ আর্যদের মধ্যে দামিলগণ সর্বাপেক্ষা অধিক সুসভ্য ছিল। তাহারা এদেশে সর্ব প্রথম নারিকেল, সুপারী প্রভৃতি ফলবান বৃক্ষের চাষ আবাদের প্রবর্তন করে এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে সবুজ বাগিচা প্রতিষ্ঠিত করে। তাহারা শহরের পত্তন করিয়া সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছিল। নিষাদ জাতীয় লোককে "নাগ" এবং পরে কোল ও ভিল বলা হইত। কিরাতেরা সম্ভবতঃ মোঙ্গলীয় বা ভোটচীনা গোষ্ঠীয় উপজাতি। চাকমা, গারো, কোচ, মেস প্রভৃতি লোকেরা এই জাতীয়। রাহুল সংস্কৃত্যায়ন বলিয়াছেন: "এই দামিল জাতি চাষবাস ও শিল্প কার্যে বেশ দক্ষ হয়ে উঠেছিল। তারা ক্রমশঃ গ্রামের পর গ্রাম স্থাপন করতে লাগিল, এক গ্রামের লোকেরা আসতে লাগল অন্য গ্রামে এবং তারা একে অপরের সঙ্গে শিল্প ও কৃষি বিনিময় করে নিজেদের জীবন যাত্রা আরও সহজ করে নিল।" ধীরে ধীরে কিরাতও নিষাদ জাতির লোকেরা দামিলদের পদানত হয় এবং সকলে একত্রিত হইয়া এক নূতন সংস্কৃতি গড়িয়াছিল। দামিল ও নিষাদ জাতির অবনতির সময়ে অন্য আর এক জাতি এই দুই জাতির শীর্ষ স্থানে অধিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহারা আর্য জাতি নামে সুপরিচিত। ইহাদের শরীরের রং গৌর বর্ণ এবং ইহাদের সোনালী কেশ বিশেষ গর্বের বস্তু ছিল। ক্রমে ক্রমে আর্যগণ প্রত্যেক ক্রিয়া কর্মে এবং ব্যবহারিক জীবনে ও তাহাদের আধিপত্য বিস্তার করিতে লাগিল। গ্রাম, নদী, বৃক্ষলতা এবং ফুলের পুরাতন নামগুলি পরিবর্তন করিয়া তাহাদের ভাষায় নূতন নামকরণ করিতে আরম্ভ করিল।

পাকভারতে আর্যদের সর্বাপেক্ষা বড় দান তাহাদের আনীত অশ্ব, একমাত্র এই সুন্দর জন্তুর উপর নির্ভর করিয়া মুষ্টিমেয় আর্যগণ নিষাদ ও দামিল

ও দুঃসাহসী কিরাত জাতিকে পদানত করিতে সক্ষম হইয়াছিল। এই সময় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা দেশব্যাপী বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ইহার পর ও দামিলগণ বৈশ্য ও গৃহপতি হিসাবে বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। ভাষা ও কৃষ্টি অনুকরণ করিয়া তাহারা আর্যদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা চালাইত।

পুণ্ড্র নামক এক অনার্য জাতির নাম শুনা যায়। অধ্যাপক সতীশ চন্দ্র বলিয়াছেন "আর্যাধিকারের পূর্বে পুণ্ড্র প্রভৃতি অনার্য জাতিগণ সমুদ্র কূলবর্তী বঙ্গের অধিবাসী ছিল। এখনও সমুদ্রতীর হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তরে পদ্মা পর্যন্ত এদেশে বহুসংখ্যক পঁড়ো বা পোদ জাতীয় লোকের বাস আছে। পঁড়ো বা পোদ পুণ্ড্র শব্দের অপভাষা। ইহা ব্যতীত চণ্ডাল বা চন্দালগণ বরেন্দ্র হইতে আসিয়া উপবঙ্গের নানা স্থানে বসতি করিয়াছে। তাহারা এখন নমঃশূদ্র বলিয়া আত্মপরিচয় দেয়।" মিঃ ফকাস পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্রদিগকে আদিম (Aboriginals) জাতির অন্তর্ভুক্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। দক্ষিণ ও মধ্য বঙ্গে এবং বিশেষ করিয়া এই দুইটি প্রাচীন জাতির আবাসস্থল সম্পর্কে "সুন্দরবনের পুরাকালীন জনপদ" অধ্যায়ে আলোচনা করিয়াছি। এতদঞ্চলে দেখা যায় — এই দুই জাতি বিল অঞ্চলে বহুলাংশে বাস করে। তাহারা জঙ্গল কাটিয়া নিম্ন ভূভাগকে উন্নত করিয়া অসংখ্য জন বসতি গড়িয়া তুলিয়াছে, সে বিষয় কোন সন্দেহ নাই। মুসলমান ও ব্রাহ্মণ কায়েস্থের বহু পূর্ব হইতে এই দুইটি প্রধান জাতি এদেশের স্থায়ী বাসিন্দা ছিল। এদেশকে ধনধান্যে ও বৃক্ষলতায় পরিপূর্ণ করিয়া তাহারা সুন্দর মনুষ্য বাস ভূমিতে পরিণত করিয়াছে। এই জাতিদ্বয়ের দান অপরিসীম।

মহারাজ অশোকের শিলা লিপিতে রাষ্ট্রকূট জাতির উল্লেখ আছে। সম্ভবতঃ এই রাষ্ট্রকূট নাম হইতে রাঢ় নামের উৎপত্তি হইয়াছে। গ্রীক দূত মৌর্য রাজ চন্দ্রগুপ্তের সময় এদেশে আগমন করেন। তিনি স্বকীয় বিবরণীতে গঙ্গারিডি রাজ্যের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা সম্ভবতঃ গঙ্গারাঢ়ী বা গঙ্গারাষ্ট্র শব্দের বিকৃত নাম। মেগাস্থিনিস বলিয়াছেন যে গঙ্গারাঢ়ীয় দিগের হস্তী সৈন্যের ভয়ে এই রাজ্য অন্য রাজ্যের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইত। তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে দিগ্বিজয়ী আলেকজান্দার এদেশের প্রতাপের কথা শুনিয়া গঙ্গা তীর হইতে

অন্যত্র প্রস্থান করেন। প্লিনি বলিয়াছেন যে গঙ্গা সঙ্গমের পার্শ্বে এক দ্বীপে মোলঙ্গী জাতীয় লোক বাস করিত। কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন যে, বুড়ন, বাক্‌লা ও সন্দীপ লইয়া এই দ্বীপটি গঠিত হইয়াছিল। লবনাক্ত সমুদ্রের পার্শ্ববর্তী প্রদেশে প্রাচীন কালে লবন প্রস্তুত হইত। লবন প্রস্তুতের জন্য এক প্রকার মৃন্ময় পাত্র ব্যবহৃত হইত, তাহাকে মোলঙ্গা বলা হইত এবং লবন প্রস্তুতকারীকে লোকে মলঙ্গী বলিত। এখনও এতদ্‌প্রদেশে মলঙ্গী উপাধিধারী লোকের বসবাস আছে। যাহারা কাগজ প্রস্তুত করিত তাহাদিগকে কাগজী বলা হইত। এ সম্পর্কে গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে আলোচনা করিয়াছি।

বুদ্ধদেবের আমলে বিজয় সিংহ গঙ্গা তীর হইতে তাম্রপর্ণী দ্বীপে গিয়া সিংহল রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। তদবধি এই রাজ্যের নাম হইয়াছে সিংহল। "মহাবংশ" নামক ঐতিহাসিক গ্রন্থে এই কাহিনী বর্ণিত আছে। বঙ্গদেশ হইতেই সিংহলে বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার ও প্রসার হইয়াছিল। সম্ভবতঃ সুন্দরবন অঞ্চলের সমুদ্র তীর হইতে সিংহলে ব্যবসায় বানিজ্য চলিত।

খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে আর্যগণ এদেশে আসিতে আরম্ভ করে। প্রথমে ক্ষত্রিয়দের আগমণ, পরে বৈশ্য এবং সর্ব শেষে আসে ব্রাহ্মণগণ। ক্ষত্রিয়দের যুদ্ধ বিদ্যা, বৈশ্যদের ভেষজবিদ্যা ও ব্যবসায় বানিজ্য এবং ব্রাহ্মণদের ধর্ম চর্চার কাজ ছিল। এই সময় এদেশে জৈন ধর্মেরও আবির্ভাব হইয়াছিল। বৌদ্ধ ধর্মের পূর্বে এদেশে জৈন ধর্ম প্রচারিত হয়। জৈনদের গ্রন্থে নেমীনাথ কর্তৃক অঙ্গ, বঙ্গ প্রভৃতি দেশে জৈন ধর্ম প্রচারের উল্লেখ আছে। জৈন গুরু মহাবীর বা বর্ধমানের নামানুসারে রাঢ় অঞ্চলে বর্ধমান জিলার নামকরণ হয় বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। পুরানে বঙ্গ দেশের সহিত জৈনদের সম্পর্কের উল্লেখ আছে। জৈন ধর্মের সহিত বৌদ্ধ ধর্মের সংঘর্ষের কথাও শ্রুত হয়। মহাবীর জিন যে ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন, বৌদ্ধ ধর্মের ন্যায় তাহা এদেশের মাটিতে শিকড় প্রবেশ করাইতে পারে নাই। তবে ভারতের রাজপুতনা অঞ্চলে অসংখ্য জৈনের বসবাস আছে।

বুদ্ধ ধর্মের ন্যায় জৈন ধর্মও পূর্ব ভারতীয় ধর্ম। এই ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা মহাবীর বৈশালিতে জন্মগ্রহণ করেন এবং মগধ (বিহার) ও চাম্পায় ধর্মীয় জীবন

অতিবাহিত করেন। জৈন মতাবলম্বীরা গুপ্তযুগের পূর্বে নির্গ্রন্থ নামে অভিহিত হইত। নির্গ্রন্থ সমাজ পৌণ্ড্রবর্ধন বিস্তার লাভ করে। কথিত আছে যে মহারাজ অশোক নির্গ্রন্থ ধর্মের পদতলে বুদ্ধের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া ক্রোধান্বিত হন এবং পাটলিপুত্র (পাটনা) নগরীতে তাহাদের ধ্বংস সাধন করেন। এই গল্প কতদূর সত্য সে সম্পর্কে কেহ কেহ সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে উত্তর ও দক্ষিণ বঙ্গে জৈন ধর্ম প্রচারিত হয়। বিখ্যাত জৈন গুরু পার্শ্ব নাথের নামানুসারে পরেশনাথ পাহাড়ের নামকরণ হইয়াছে। পাহাড়পুরে পঞ্চম শতকে প্রতিষ্ঠিত জৈন বিহারের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। হুয়েন সাঙের বিবরণীতে জানা যায় যে নির্গ্রন্থগণ উত্তর দক্ষিণ ও পূর্ব বঙ্গে সপ্তম শতকে প্রাধান্য লাভ করে। পৌণ্ড্রবর্ধন ও সমতটে অসংখ্য দিগম্বর নির্গ্রন্থদের দেখা যাইত। পরে ইহাদের জৈন বলা হইত। পাল ও সেন রাজত্ব কালে তাঁহারা অবধূত সম্প্রদায়ের সহিত মিশিয়া যায়। অষ্টম শতকে বঙ্গদেশ হইতে জৈন ধর্মের শেষ চিহ্ন প্রায় মুছিয়া যায়।

বৈশ্য, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তখন বৌদ্ধ ধর্মের প্রবল প্রতাপে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ এক প্রকার নির্জীব হইয়া পড়ে। হুয়েন সাঙের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে স্বয়ং বুদ্ধদেব কর্ণসুবর্ণ, সমতট প্রভৃতি স্থানে আগমন করিয়াছিলেন এবং সমতটের রাজধানীর উপকণ্ঠে সপ্ত দিবস পর্যন্ত স্বীয় ধর্মের মহিমা প্রচার করেন। পরে এইস্থানে মহারাজ অশোকের সময় একটি স্তূপ নির্মিত হয়। চৈনিক পরিব্রাজক উহা সচক্ষে দর্শন করেন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

হুয়েন সাঙের বিবরণীতে মানুষের জীবন যাপন প্রণালী সম্পর্কে অনেক তথ্য জ্ঞাত হওয়া যায়। সমতটের লোকেরা খুব কষ্ট সহিষ্ণু ছিল। এখনও সে প্রমাণ পাওয়া যায়। তাম্রলিপ্তির অধিবাসীরা কষ্ট সহিষ্ণু ও সাহসী ছিল এবং দ্রুততার সহিত কার্য সম্পাদন করিত। কর্ণসুবর্ণের লোক সৎ ও ভদ্র ছিল। এদেশের অধিবাসীরা অতিমাত্রায় বিদ্যানুরাগী ছিল। জ্ঞানার্জনের জন্য ছাত্রেরা তখন কাশ্মীরে যাইত। হুয়েনসাঙ আরও বলেন যে গৌড়ের লোকেরা ঝগড়া বিবাদ করিত। ইতসিঙ বলিয়াছেন যে তাম্রলিপ্তির বৌদ্ধ বিহারের অধিবাসীদের

নৈতিক চরিত্র উন্নত ছিল। ব্রাহ্মণ হত্যা, মদ্যপান, চুরি, পাশব অত্যাচার অতীব জঘন্য পাপ রূপে গণ্য হইত এবং ঐ সমস্ত অপরাধের জন্য কঠোর শাস্তি দেওয়া হইত। সততা, ন্যায়নীতি, পবিত্রতা দানশীলতা এবং দয়াই ছিল মানব ধর্ম। জন সাধারণ ক্ষুদ্রকায় ধুতি পরিধান করিত। নারীদের এখনকার ন্যায় অলঙ্কার ব্যবহার করিতে দেখা যাইত। হুয়ানচোংটেন ও অন্যান্য পরিব্রাজকদের বিবরণী হইতে জানা যায় যে সপ্তম শতকে পূর্ব বঙ্গ বৌদ্ধ ধর্মে ভরিয়া যায়। এই সময় সোমপুর (পাহাড়পুর) শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ কেন্দ্রে পরিণত হয়। দেবকোট ফুল্লহারি, সান্নগর, জগডালা, বিক্রমপুরী প্রভৃতি বিহারের নাম শ্রুত হয়। রাজা ধর্মপালের অধীনে হরি ভদ্র নামক পণ্ডিত তাঁহার বিখ্যাত টিকা অভিসামলঙ্কর রচনা করেন।

বৌদ্ধ সাহিত্যে জানা যায় যে এই ধর্ম প্রচারের পূর্ব সীমা ছিল রাজমহলের সন্নিকটে কাজনগলা বা পৌণ্ড্রবর্ধন পর্যন্ত। ডক্টর রমেশ চন্দ্র মজুমদার বলেন যে সম্ভবতঃ অশোকের পূর্বে বঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার হয়। নাগার্জুনী কোণ্ডা শিলালিপি হইতে জানা যায় যে দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতকে বঙ্গে বৌদ্ধ ধর্ম প্রাধান্য লাভ করে। সিংহলী ভিক্ষুরা যে সমস্ত প্রধান প্রধান দেশে ধর্ম প্রচার করেন উহার তালিকায় বঙ্গের নাম বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। গুপ্ত সাম্রাজ্যের আমলে বঙ্গে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারিত হয়। পঞ্চম শতকে ফাহিয়েন তমলুকে ২২টী সংঘারাম ও অসংখ্য ভিক্ষু দেখিয়া ছিলেন। ষষ্ঠ শতকে গুপ্ত রাজ কর্তৃক মহাযান সংঘারামের জন্য জমি দান করিতে দেখা যায়। এই সময় রুদ্র দত্ত ও আচার্য শান্তিদেব নামক দুইজন বৌদ্ধ ভিক্ষুর নাম শ্রুত হয়। ষষ্ঠ শতকের প্রারম্ভে সুদূর পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গে বৌদ্ধ ধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

বুদ্ধদেব বিম্বিসারের পুত্র অজাতশত্রুর সময় নির্বান লাভ করেন। অজাতশত্রুর পর শূদ্র রাজ মহানন্দের রাজত্বকালে আলেকজান্দার ভারত আক্রমণ করেন। মহানন্দের এক পুত্রের নাম চন্দ্রগুপ্ত। চন্দ্রগুপ্ত মহানন্দের মুরা নাম্নী জনৈক দাসীর গর্ভজাত বলিয়া মৌর্য নামে খ্যাত। চন্দ্রগুপ্ত জৈন মতের সমর্থক ছিলেন এবং ব্রাহ্মণদিগকে বৃষল আখ্যায় লাঞ্ছিত করিয়াছিলেন। চন্দ্রগুপ্তের পুত্র বিন্দুসার এবং বিন্দুসারের সুযোগ্য পুত্র অশোক। মহারাজ

অশোক বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করিয়া উহার সেবায় সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন। এতদঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের যে প্রভাব বিস্তার হইয়াছিল তাহা বহুলাংশে অশোকেরই কৃতিত্ব। সুন্দরবন অঞ্চলে যে সমস্ত বুদ্ধ মূর্তি ও স্তূপের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে তাহার প্রায় সমস্তই মহারাজ অশোকের সময় স্থাপিত হইয়া থাকিবে।

সুবিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে পাক ভারতে আগমন করেন। তিনি বৌদ্ধ মতাবলম্বী ছিলেন এবং ঐ ধর্মের তীর্থ স্থানগুলি পরিদর্শন মানসে এদেশ ভ্রমণ করেন। ঐতিহাসিকগণের নিকট এই ভ্রমণ বৃত্তান্ত মূল্যবান উপাদান। বৌদ্ধ ধর্মের তীর্থস্থান দর্শন এবং শাস্ত্র গ্রন্থাদি সংগ্রহ করাই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। হিউয়েন সাঙ গোবি মরুভূমি, সমরখন্দ, তাসখন্দ, খোটান, ইয়ারখন্দ প্রভৃতি বিখ্যাত শহর অতিক্রম করিয়া পাকভারতে আগমন করেন। তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্ত চিত্তাকর্ষক এবং নানা মূল্যবান তথ্যে পূর্ণ।

হিউয়েন সাঙের বর্ণনায় জানা যায় যে ভারতবর্ষের নাম ছিল ইন্দু রাজ্য বা চন্দ্রের দেশ। চীনা ভাষায় চাঁদকে বলে ইনটু। তিনি বৌদ্ধ ধর্মের প্রধান কেন্দ্র নালন্দায় দশহাজার ছাত্র ও শ্রমণ দেখিতে পাইয়াছিলেন। তিনি তাম্রলিপ্ত, সমতট, কামরূপ প্রভৃতি দেশ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। ফিরিবার সময় সিন্ধুনদের এক দুর্ঘটনায় তাঁহার বহু মূল্যবান পুস্তক নষ্ট হইয়া যায়। তিনি নিজেও কোন প্রকারে জীবন রক্ষা পান। তাঁহার সম্পর্কে একটি মজার গল্প শুনা যায়। তিনি লিখিয়াছেন যে এদেশে অসুখ-বিসুখ হইলে লোকে সাত দিন উপবাস করে এবং ঐ সময়ের মধ্যে অসুখ আরাম হইয়া যায়। ঔষধ খাওয়ার রীতি বিশেষ প্রচলিত ছিল না। অসুখ নিরাময় না হইলে ঔষধ ব্যবহার করা হইত।

বৌদ্ধধর্ম প্রচারের কেন্দ্র ছিল বৌদ্ধ বিহার সমূহ। প্রাথমিক অবস্থায় বিহারগুলি বৌদ্ধ ভিক্ষুদের বর্ষাকালীন আবাস স্থল ছিল। প্রত্যেক বিহারে বহু কক্ষ পাশাপাশি থাকিত। প্রাচীন মন্দির স্থাপত্যের একটি চিত্তাকর্ষক নিদর্শন বগুড়া মহাস্থান গড়ের আবিষ্কৃত গোকুলের মন্দির। ইহার উপরিভাগ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। মন্দিরটি ধাপে ধাপে উঁচু হইয়া উঠিয়াছিল। শীর্ষদেশে একটি সুন্দর চূড়া ছিল। মহাস্থান গড়ের উত্তরাংশে করতোয়া নদী তীরে গোবিন্দ

ভিটায় অনুরূপ পদ্ধতিতে মন্দির নির্মিত হইয়াছিল। এই সমস্ত স্তূপ ও মন্দির ষষ্ঠ ও সপ্তম শতকে নির্মিত হয়।

কানিংহাম গাঙ্গেয় বদ্বীপ, বাগড়ী এবং সমতটকে অভিন্ন রাজ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। প্রাচীন কালে বঙ্গদেশ — বঙ্গ, বাঢ়, বাগড়ী ও বরেন্দ্র এই চারিভাগে বিভক্ত ছিল। ইহার পূর্বে সমতট নাম দেখিতে পাওয়া যায়। সমতট প্রদেশ কামরূপ ও নেপালের পাশাপাশি অবস্থিত, ইহা সমুদ্র গুপ্তের এলাহাবাদ স্তম্ভের শিলালিপিতে উল্লেখ আছে। বরাহ মিহিরের ভৌগলিক বৃত্তান্তে সমতটের উল্লেখ আছে। ইউয়েন সাঙ এই প্রদেশকে নীচ, আর্দ্র সমুদ্র তীরবর্তী দেশ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এখানকার অধিবাসীরা ক্ষুদ্রকায় ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি-সম্পন্ন এবং কৃষ্ণবর্ণের ছিল। চৈনিক পরিব্রাজক সমতটকে চক্রাকৃতি এবং উহার বেষ্টন ৩০০০ লী বা ৫০০ মাইল বর্ণনা করিয়াছেন। রাজধানীর বেষ্টন ২০ লী বা সাড়ে তিন মাইল। কানিংহাম সমতটের রাজধানী মূরলী বা বর্তমান যশোর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কামরূপ ও তমলুক হইতে দূরত্ব মাপিয়া তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। অধ্যাপক সতীশচন্দ্র সমতটের রাজধানী বার বাজার স্থির করিরাছেন। গাঙ্গেয় বদ্বীপ যে সমতট তাহা বহু কাল যাবৎ ঐতিহাসিকগণ কতৃক গৃহীত হইয়া আসিতেছে। আরও বলা হইয়াছে যে এখানে ত্রিশটি বৌদ্ধ সংঘারাম ছিল।

সতীশ বাবু তদীয় যশোর খুলনার ইতিহাসে গাঙ্গেয় বদ্বীপকে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সমতট বলিয়াছেন। এ সম্পর্কে তিনি হুয়েনসাঙ বর্ণিত ত্রিশটি বৌদ্ধ সংঘারামেরও স্থান নির্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার অমানুষিক পরিশ্রমের ফলে সমতট ও তন্মধ্যস্থ সংঘারামের স্থান নির্দেশের সমস্ত গবেষণাও অনুসন্ধান ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে।

যুগের পরিবর্তনে এবং ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের ফলে পূর্ব বর্ণিত সমতটের স্থান পরিবর্তিত হইয়াছে। বাগড়ী বা গাঙ্গেয় বদ্বীপ এবং সমতট পৃথক রাজ্য। মিঃ নলিনী কান্ত ভট্টশালী কুমিল্লায় আবিষ্কৃত নর্তেশ্বর মূর্তির খোদিত লিপি এবং বাঘাউড়া গ্রামের বিষ্ণু মূর্তির খোদিত লিপি হইতে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে সমতট বর্তমান কুমিল্লার প্রাচীন নাম। নর্তেশ্বর মূর্তি লহরচন্দ্র নামক জনৈক

রাজার রাজত্বকালে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মিঃ ভট্টাশালীর মতে কুমিল্লা ও নোয়াখালী অঞ্চল লইয়া সমতট রাজ্য গঠিত হইয়াছিল। ফার্গাসন সমতটের রাজধানী সোনারগাঁও বা সুবর্ণগ্রাম, ওয়াটার্স সাহেব ফরিদপুরের দক্ষিণে এবং রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় কুমিল্লা বর্ণনা করিয়াছেন। হিউয়েন সাঙের বৃত্তান্তে উল্লেখ আছে যে এই রাজ্যের উত্তর পূর্বে শি — লি — চা — টা — লো বা শ্রীহট্ট দেশ অবস্থিত ছিল। সমতটের শেষ বাউণ্ডারী নিম্নরূপ নির্ধারিত হইয়াছে :

উত্তর-পূর্বে = গারো, খাসিয়া পর্বত ও ত্রিপুরা রাজ্য।

পশ্চিমে = ব্রহ্মপুত্র নদী।

দক্ষিণে = বঙ্গোপসাগর

কুমিল্লা শহরের ১২ মাইল পশ্চিমে কারমান্তা বা বাদ্‌কামটা নামক স্থানকে সমতটের রাজধানী বলা হইয়াছে। রাজা মহিপালের বাঘাউড়া বিষ্ণুমূর্তি ও দামোদর দেবের তাম্রলিপি (১২৩৪খৃঃ) হইতে এ বিষয় পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। স্যার যদুনাথ বলেন যে ত্রিপুরা ব্যতীত মধ্য বাংলার একাংশ সমতটের অন্তর্গত ছিল। লোকনাথে প্রাপ্ত মূর্তির খোদিত লিপি হইতে জানা যায় যে কুমিল্লা জিলার চাম্পিতলা সমতটের অন্তর্গত এবং গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধীন ছিল। গৌড়ের ইতিহাস প্রণেতা রজনী চক্রবর্তী বলেন যে সমতট রাজ্যের মধ্যে রায়পুর ব্রজযোগিনী, মঠবাড়ী, জম্বুসর, সুবর্ণগ্রাম, বেজীনীসার, রাজাসন, যোগডিহা প্রভৃতি স্থানে বৌদ্ধসংঘারাম ছিল। এই সমস্ত স্থানের একটিও গাঙ্গেয় বদ্বীপের মধ্যে নাই। বৃহৎ সংহিতা অনুসারে ইহা বঙ্গ দেশ হইতে পৃথক। আশ্‌রাফপুর প্লেট হইতে জানা যায় যে রাজভট্ট এই দেশের অন্যতম রাজা ছিলেন।

সমতট সম্পর্কে শেষ এবং সর্বাপেক্ষা নির্ভর যোগ্য প্রমাণ মিলিয়াছে বাঘাউড়া গ্রামের এই নারায়ণ মূর্তি হইতে। ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মহাকুমার বাঘাউড়া গ্রামে নারায়ণ মূর্তি আবিষ্কৃত হয়। উহা মহিপালের রাজ্যের তৃতীয়াঙ্কে লোকদত্ত নামক বৈষ্ণব মতাবলম্বী জনৈক বণিক্ প্রতিষ্ঠা করেন। উহাতে কুমিল্লা ও নোয়াখালী অঞ্চলকে সমতট বলা হইয়াছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত এবং ডক্টর আব্দুল করিম সম্পাদিত বাংলার ইতিহাসের অতিরিক্ত সংসোধনীতে সমতটের অবস্থান সম্পর্কে আরও জাজ্বল্যমান প্রমাণ পাওয়া

গিয়াছে। সম্প্রতি কালে কুমিল্লা জেলার নারায়ণপুর গ্রামে আবিষ্কৃত একটি গণেশ মূর্তির উৎকীর্ণ লিপি হইতে জানা যায় যে ঐ মূর্তি মহারাজাধিরাজ মহীপালের রাজত্ব কালে সমতটের অধীন বিলাকাণ্ডক গ্রামের বুদ্ধ মিত্র নামক জনৈক ব্যবসায়ী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। ডঃ ডি, সি, সরকার ১৯৪৩ সালের ২৫শে এপ্রিল তারিখে উহার সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার করেন। তিনি বাঘাউড়ার নারায়ণ মূর্তির বিলাকিণ্ডক গ্রামের সহিত উহাকে একই গ্রাম বলিয়া সনাক্ত করিয়াছেন। ইহার দ্বারা সমতট সম্পর্কে বাঘাউড়ার পূর্ণ সমর্থন পাওয়া যায়। উপরোক্ত অনুসন্ধানের ফলে গাঙ্গেয় বদ্বীপ যে প্রাচীন সমতট রাজ্য নহে তাহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে।

গাঙ্গেয় বদ্বীপ বা বাগ্‌ড়ীতে ত্রিশটি বৌদ্ধ সংঘারামের কথা ভুল প্রমাণিত হইয়াছে। এখন প্রশ্ন এই যে তাহা হইলে গাঙ্গেয় বদ্বীপের কি নাম ছিল? এ প্রশ্নের উত্তর আমরা অন্যত্র দিয়াছি। এতদঞ্চলের প্রাচীন নাম ছিল বঙ্গ এবং সেন রাজগণের সময় উহার নাম হইয়াছিল বাগ্‌ড়ী। বল্লাল সেনের সময় রাজধানী রামপালে স্থানান্তরিত হওয়ায় ঐ অঞ্চলের পরবর্তী নামও হইয়াছিল বঙ্গ (পূর্ববঙ্গ)।

গাঙ্গেয় বদ্বীপ ও প্রাচীন সমতট রাজ্য (পূর্ব দক্ষিণ বঙ্গ) পাশাপাশি অবস্থিত ছিল। হিউয়েন সাঙ সিন্ধু হইতে তমলুক এবং তথা হইতে সমতট ও কামরূপ ভ্রমণ করিয়াছিলেন। ইহাতে সহজেই প্রমাণিত হয় যে তিনি গাঙ্গেয় বদ্বীপও ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং এখানে কিছু দিন অবস্থান তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক ও সম্ভব ছিল। এখানে কিছু সংখ্যক বৌদ্ধ সংঘারামও ছিল।

সে যুগে সমতট ও এতদঞ্চলের অবস্থান ও আবহাওয়া একই রূপ ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। প্রাচীন বাংলার একটি অংশের নাম ছিল ব্যাঘ্রতাতী (Vyaghratati)। এখানকার জঙ্গলময় স্থানে রয়াল বেঙ্গল বাঘের উপদ্রব ছিল বলিয়া গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের বদ্বীপকে ব্যাঘ্রতাতী (Tiger coast) বলা হইত।

ভাগীরথী ও পদ্মার মধ্যবর্তী ভূভাগ, ব্রহ্মপুত্র নদীর নিম্ন ভাগ এবং মেঘনার নিকটবর্তী স্থান এক কালে বঙ্গ নামে কথিত হইত। এই অঞ্চলকে টলেমী

গঙ্গারেজিয়া এবং পণ্ডিত কালীদাস বঙ্গভূমি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সমতট ইহার পূর্ব দিকে অবস্থিত ছিল। নীহার রঞ্জন রায় তদীয় "বাংলার ইতিহাস" গ্রন্থে বলিয়াছেন: "ঐতরেয় আরণ্যক গ্রন্থে বোধ হয় সর্বপ্রথম বঙ্গের নাম দেখা যায়। বৃহৎ সংহিতায় উপবঙ্গ নামে একটি জনপদের উল্লেখ আছে। আনুমানিক ষোড়শ সপ্তদশ শতকে রচিত দিগ্বিজয় প্রকাশ নামক গ্রন্থে উপবঙ্গ বলিতে যশোর ও তৎসংলগ্ন কয়েকটি কাননময় বা জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলের দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে।" বরাহ মিহিরের বৃহৎ সংহিতায় যশোর ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলকে উপবঙ্গ বলা হইয়াছে।

দিগ্বিজয় প্রকাশে আছে "উপবঙ্গে যশোরাদ্যাঃ দেশঃ কানন সংযুক্তা।" আনুমানিক অষ্টম শতকে রচিত আর্যমঞ্জুশ্রী মূলকল্প গ্রন্থে বঙ্গ, সমতট ও হরিকেল (শ্রীহট্ট) এই তিনটি স্বতন্ত্র কিন্তু প্রতিবেশী জনপদ বলিয়া ইঙ্গিত করা হইয়াছে। হিউয়েন সাঙের সময় শ্রীহট্ট বা সিলেট জিলার পর্বত সংলগ্ন স্থানে সমুদ্র উপকূল ছিল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা পুরাকালে একটি বৃহৎ হ্রদ ছিল, সমুদ্র নহে। সামস সিরাজ আফিফ রচিত তারিখ-ই-ফিরোজশাহী গ্রন্থে নিম্ন আর্দ্র অঞ্চলকে ভাটিদেশ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। যেখানে নদী নালায় নিয়মিত ভাটা হয় সেই স্থানকে ভাটি বলা হইয়াছে। গাঙ্গেয় বদ্বীপের দক্ষিণ ভাগই ভাটি অঞ্চল। বাকেরগঞ্জ ও খুলনা যশোহরাঞ্চলকে ভাটি দেশ বলা হইত। আবুল ফজল তদীয় আইনী আকবরী গ্রন্থে সুবা বাংলার পূর্বদিককে ভাটি বলিতেন। বাংলাবাদ নামক স্থান রামসিদ্ধির দক্ষিণে অবস্থিত ছিল। বাকেরগঞ্জ জিলার গৌরনদীর সন্নিকটে প্রাচীন বাংলাবাদ নামক স্থান অবস্থিত ছিল।

বাংলা দেশের অতি প্রাচীন নাম 'বাং' বা 'বাঙ্গ' (Bang)। এই বাঙ্গে পুরাকালের শাসকেরা স্থানে স্থানে ঢিপি বা জাঙাল নির্মাণ করিতেন। এই ঢিপি (Mounds) ১০ হাত উচ্চ এবং ২০ হাত প্রশস্ত হইত। সম্ভবতঃ বহিরাক্রমণ হইতে দেশকে সুরক্ষিত করার জন্য বিশেষ বিশেষ স্থানে মৃত্তিকা দ্বারা ক্ষুদ্র পাহাড়ের ন্যায় দুর্গ প্রাচীর প্রস্তুত করা হইত। আল বা আলি শব্দের অর্থ বাঁধ। এই সমস্ত বাঁধের পার্শ্বস্থ খাল নালায় মনুষ্য যাতায়াতের জন্য সাঁকো

নির্মিত হইত। বাঙ্গ+আল=বাঙ্গাল এবং এই বাঙ্গাল শব্দ হইতে বাঙ্গলা এবং উহা হইতে 'বঙ্গ' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। আবুল ফজল ও অন্যান্য সমস্ত ঐতিহাসিক এই মত সমর্থন করেন। ইংরেজ লেখকগণ এদেশকে বেঙ্গল বলিয়াছেন। অধুনা বঙ্গদেশ, বাঙলা, বাঙ্গালী, বাঙ্গাল, বাংলা দেশ, বঙ্গভূমি প্রভৃতি নাম ব্যবহৃত হয়। মাণিক রাজার গানে ভাটি ও বাঙ্গাল উভয় শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। ভাটি হইতে অইলা বাঙ্গাল লম্বা লম্বা দাড়ী। অন্য একটি বাংলা কবিতায় আছে — কাঁদেরে বাঙ্গাল ভাই — বাফৈ বাফৈ। পশ্চিম বঙ্গের কোন অংশই কস্মিনকালেও প্রাচীন বঙ্গ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। উহার প্রায় সমস্ত স্থানই রাঢ়ের এবং কিয়দংশ বাগড়ী ও বরেন্দ্র ভূমির অন্তর্গত ছিল। প্রায় সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানই প্রাচীন বঙ্গের অধীন ছিল। কেহ কেহ গাঙ্গেয় বদ্বীপের পূর্ব দিককে প্রকৃত বঙ্গ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। হেমচন্দ্রের অভিধান চিন্তামণি এবং যশোধরের জয়মঙ্গলে ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব দিকের স্থানকে বঙ্গ বলা হইত। এই মতে হরিকেল এবং সিলেটই পূর্ব বঙ্গ ছিল। কিন্তু ইহা সঠিক বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। বিক্রমপুর বঙ্গের নামও শ্রুত হয়। ফরিদপুরের কোটালিপাড়া বাকেরগঞ্জের ইদিলপুর প্রভৃতি স্থান বিক্রমপুর বঙ্গের অধীন ছিল।

আদিম যুগের ইতিহাস নাই বলিলেও চলে। যতটুকু পাওয়া যায় তাহা অনুসন্ধানের ফল এবং অনুমান মাত্র। জৈন যুগের ইতিহাস অনুরূপ। বৌদ্ধ যুগের ইতিহাস কালের কুয়াশা ভেদ করিয়া এখনও কোনরূপে বাঁচিয়া আছে। প্রকৃত পক্ষে খৃষ্টপূর্ব ৩২৬ অব্দের পূর্বে বঙ্গদেশের কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না।



বৌদ্ধ ও হিন্দু রাজত্বের শেষ — পাল ও সেন বংশ।

॥ দুই ॥

অশোকের মৃত্যুর পর অতি অল্পদিনের মধ্যে মৌর্য রাজত্ব লোপ পায়। পরবর্তী প্রায় পাঁচ শতাব্দী ধরিয়া পাক-ভারত নানা রাজ্যে বিভক্ত হইয়া সুঙ্গ, কণ্ব ও অন্ধ্র প্রভৃতি রাজন্যবর্গের দ্বারা শাসিত হয়। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর প্রথমে মগধের গুপ্ত রাজগণ রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন। এই সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্ত। এই চন্দ্রগুপ্তের সহিত চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য বা তাহার পৌত্র অশোকের কোনই সম্পর্ক ছিল না। মৌর্য বংশের পতনের প্রায় পাঁচ শত বর্ষ পরে গুপ্ত বংশের আবির্ভাব। গুপ্ত নৃপতিগণ সকলেই খ্যাতনামা বীর ও যোদ্ধা ছিলেন এবং তাঁহারা পাক-ভারতে হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু কৃষ্টির পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর তদীয় সুযোগ্য পুত্র সমুদ্র গুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি বহু রাজ্য জয় করেন। হরিসেন বিরচিত প্রশস্তিতে সমুদ্র গুপ্তের রাজ্য জয়ের কথা আছে। উহা হইতে জানা যায় যে তিনি সমতট, ডবাক, নেপাল প্রভৃতি রাজ্য জয় করিয়াছিলেন। এই সময় রাজশাহী, বগুড়া ও দিনাজপুর লইয়া ডবাক রাজ্য গঠিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন যে ডবাক হইতে ঢাকা নামের উৎপত্তি হইয়াছে। ঐতিহাসিক মিন হাজ-ই-সিরাজ তাহার প্রসিদ্ধ ইতিহাস গ্রন্থ "তবকাত ই-নাসিরীতে" সমতটকে সনকট্ ও সাঁকট বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সমুদ্র গুপ্তের পুত্র ২য় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য উপাধি গ্রহণ করেন। ইনিই প্রসিদ্ধ নবরত্ন সভার নায়ক ছিলেন। কথিত আছে মহাকবি কালিদাস, বরাহ মিহির প্রভৃতি পণ্ডিতগণ তাহার রাজসভা অলঙ্কৃত করেন। পণ্ডিত জওহর লাল নেহেরু তদীয় বিশ্ব ইতিহাস (Glimpses on World History) গ্রন্থে বলিয়াছেন যে গুপ্ত সম্রাটদের আমলে হিন্দু সভ্যতার চরম উন্নতির যুগ। বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি তাঁহাদের সুনজর ছিল না, তজ্জন্য বৌদ্ধদের অশেষ অবনতি ঘটিয়াছিল। ক্ষত্রিয় ও উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা ছিল হিন্দু ধর্মের পক্ষপাতী আর বৌদ্ধ ধর্ম ছিল জনগণের ধর্ম।

সম্ভবতঃ রাজ শক্তির প্রভাব এবং ব্রাহ্মণদের অত্যাচারে বৌদ্ধরা এদেশ হইতে নিশ্চিহ্ন হইতে আরম্ভ করে। এই বংশের রাজত্বের শেষ দিকে হুণগণ পাক-ভারত আক্রমণ করেন। এই সময় মালবের যশধর্মদেব এক বিরাট রাজ্যের অধীশ্বর হন। তাঁহারও উপাধি ছিল বিক্রমাদিত্য। তিনি পূর্ব বঙ্গ হইতে কলিঙ্গ পর্যন্ত জয় করিয়াছিলেন। সমুদ্রগুপ্তের সময় তৎকালীন বঙ্গদেশ গুপ্ত সাম্রাজ্য ভুক্ত হয়। দিল্লীর কুতুব মিনারের সন্নিকটে মেহের আউলীর শিলালিপি হইতে জানা যায় যে রাঢ়ের রাজা চন্দ্র বর্মনকে বঙ্গের রাজন্যবর্গ একযোগে বাঁধা দিয়াছিল।

ইংরেজ আমলে পুকুর খনন কালে যশোর জিলার উত্তরাংশে মধুমতী নদীর সন্নিকটে মোহাম্মদপুরে কয়েকটি মুদ্রা পাওয়া যায়। যশোরের তৎকালীন জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট মুদ্রাগুলি কলিকাতাস্থ এশিয়াটিক সোসাইটিতে প্রেরণ করেন। মুদ্রাগুলি গুপ্ত রাজবংশীয় চন্দ্রগুপ্ত, কুমারগুপ্ত, ও স্কন্ধগুপ্ত কর্তৃক প্রচলিত মুদ্রার ন্যায়। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মুদ্রাগুলি সম্পর্কে বলিয়াছেন যে উহার একটি রাজা শশাঙ্কের, দ্বিতীয়টি কোন গুপ্ত নৃপতির এবং তৃতীয়টি সম্পর্কে এখনও কিছু স্থির করা যায় নাই। এই মুদ্রাগুলি প্রাপ্তিতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে ঐ সময় সুন্দরবনাঞ্চল গুপ্ত রাজগণ ও শশাঙ্কের রাজ্যের অধীন ছিল। গৌড়ের অধিপতি শশাঙ্ক কর্ণসুবর্ণে রাজধানী স্থাপন করিয়া বঙ্গদেশ অধিকার করেন। শশাঙ্ক বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বীদের উপর অত্যাচার করেন এবং তাহাদের পবিত্র তীর্থক্ষেত্র ও বুদ্ধগয়ার বোধিদ্রুম উৎপাটিত করিয়া তথায় শিবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি রাজ্যের সর্বত্র হিন্দু ধর্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করেন। শশাঙ্কের অত্যাচার কাহিনী ঐতিহাসিকগণ এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন।

শশাঙ্কই গৌড়ের সর্বপ্রথম স্বাধীন ঐতিহাসিক হিন্দু নরপতি যিনি দেশের বাহিরেও আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজধানী ছিল কর্ণ সুবর্ণে। শশাঙ্ক সম্ভবতঃ সমতট অধিকার করেন নাই। আর্য মঞ্জুশ্রী মূলকল্প গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে হর্ষবর্ধনের সঙ্গে শশাঙ্কের দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। তাঁহার রাজ্য কামরূপের বৌদ্ধরাজ ভাস্কর বর্মণ এবং হর্ষবর্ধন কর্তৃক আক্রান্ত হয়। শশাঙ্ক বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া গোপনে রাজ্যবর্ধনকে

নিহত করেন। মৃত্যুকালে শুধু মগধ তাঁহার শাসনাধীন ছিল। গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য, সমাচার দেব এবং শশাঙ্ক অতীব কষ্টে যে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন পরবর্তীকালে তথায় ধ্বংস ও অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল।

মগধেব বিখ্যাত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে শীলভদ্র নামক জনৈক বাঙ্গালী পণ্ডিত উহাব সর্বাধিনায়ক ছিলেন। হিউয়েন সাঙ্ পাঁচ বৎসব যাবৎ নালন্দায় অবস্থান কবেন। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে কুষাণ সম্রাট কণিষ্ক এক মহাসম্মেলনে বৌদ্ধ ধর্মের সহিত হিন্দু ধর্মেব এক সমন্বয় সাধন কবেন, তদবধি বুদ্ধদেব হিন্দুদিগেব দশ অবতারেব অন্তর্গত হইয়া পড়েন। শশাঙ্ক শৈব মতাবলম্বী ছিলেন। তিনি বৌদ্ধ মত নিষ্প্রভ করিয়া শৈব মত প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহাব রাজত্বকালে সম্ভবতঃ দক্ষিণ বঙ্গের নানাস্থানে হিন্দু ধর্মেব প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছিল এবং এই সময় হিন্দু ধর্মের অত্যাচাবে অসংখ্য বৌদ্ধ হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়।

উপরোক্ত ঘটনাবলীতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে এই সময় বহুদিন ধবিয়া হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের সংঘর্ষ চলিয়াছিল। কোন কোন সময় উভয় ধর্মেব সমন্বয় সাধিত হইলেও তাহা অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই এবং এইজন্য দেশব্যাপী অবাজকতার সৃষ্টি হইতেছিল। পরবর্তীকালে মুসলমান আক্রমণকারীরা ইহার সুযোগ গ্রহণ কবিয়াছিল। হর্ষবর্ধণের মৃত্যুব পর দেশব্যাপী অরাজকতার বন্যা বহিয়া যায়। এই সময় জয়ন্ত গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করিয়া গৌড় দেশ শাসন করিতে থাকেন। "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস" প্রণেতা নগেন্দ্রনাথ বসু বলেন যে, জয়ন্তই পঞ্চ গৌড়েশ্বব হইয়া আদিশূব উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি সম্ভবতঃ ঢাকা জিলার অন্তর্গত রামপালে স্বীয় বাজধানী স্থাপন করেন। আদিশূব স্বীয় জামাতা জয়াপীড়ের সাহায্যে বিশেষ ধুমধাম করিয়া কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থকে বঙ্গদেশে আনয়ন করেন।

আদিশূরের সময় দেশ নানাদিক হইতে আক্রান্ত হয়। গুর্জর রাষ্ট্রকুটগণ এই সময় গৌড় আক্রমণ করেন। এই বিপদকালে প্রজা সাধারণ দেশে শান্তি স্থাপন করিবার জন্য পালবংশীয় গোপালকে

পাটলিপুত্রের সিংহাসনারোহণে সহায়তা করেন। পাল ও শূর বংশীয়েরা এই সময় বিভিন্ন স্থানে রাজত্ব করি'তন। গোপাল সমুদ্র পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। সুন্দরবন অঞ্চল ও তদীয় রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। দেবপাল এই রাজবংশের সর্বাপেক্ষা প্রতাপশালী রাজা ছিলেন। এই সময় শূর বংশীয়েরা বঙ্গ হইতে দক্ষিণ রাঢ়ে বিতাড়িত হন। পাল বংশীয় রাজন্যবর্গ সকলেই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন এবং তাঁহারা বৌদ্ধ ধর্মের বিস্তৃত সাধন করিয়াছেন। মহীপাল এই বংশের অন্যতম রাজা। তিনি পরহিতার্থে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

অষ্টম শতকের মাঝামাঝি পালবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। এই বংশের রাজারা ৪০০ বৎসরের অধিককাল রাজত্ব করেন। একালের প্রকৃত ইতিহাস বহুলাংশে পাওয়া যায়। ধর্মপাল (৭৭০-৮১০ খৃঃ), দেবপাল (৮১০-৮৫০ খৃঃ) নারায়ণপাল, রাজ্যপাল, দ্বিতীয় গোপাল, দ্বিতীয় বিগ্রহপাল এবং মহীপাল প্রথম এবং এই বংশের প্রধান রাজবর্গ। দেবপালের পরেই মহীপাল এই বংশের শ্রেষ্ঠ নরপতি। পরবর্তী রাজাদের নাম, দ্বিতীয় মহীপাল, দ্বিতীয় সূত্রপাল, রামপাল, মদনপাল প্রভৃতি। সম্রাট রাজেন্দ্রপালের সেনাপতির আক্রমণ দুই বৎসর (১০২১-১০২৩) পর্যন্ত চলিয়াছিল। প্রথম ধর্মপালকে পরাজিত করিবার পূর্বে তিনি উড়িষ্যা (Oddavisay) জয় করেন। তিনি বঙ্গদেশ, দণ্ডভুক্তি (Tandabutti), দক্ষিণ রাঢ় (Takkanladam) উত্তর রাঢ় (Uttiraladam) আক্রমণ করেন। মহীপালের পূর্বে তিনি বঙ্গের রাজা গোবিন্দ্রচন্দ্রকে পরাজিত করেন।

এই সময় দস্যু তস্করের অত্যাচারে দেশ ভরিয়া যায়। নদনদী বিধৌত দক্ষিণবঙ্গে রাজ্যশাসন ছিল না বলিলেই চলে। "জোর যার মুল্লুক তার" এই নীতিই প্রবল ছিল। ইহার পর গোপচন্দ্র নামক এক ব্যক্তি দক্ষিণ বঙ্গের রাজা হন। পরবর্তীকালে তাঁহার রাজ্য গৌড়বঙ্গ নামে পরিচিত হয়। তিনি সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করিয়া দেশ ত্যাগ করিলে তাঁহার পুত্র ভবচন্দ্র রাজা হন। তাঁহার মন্ত্রীর নাম ছিল গবচন্দ্র। এই দুইটি নাম হইতে এদেশে "হবুচন্দ্র রাজার গবুচন্দ্র মন্ত্রী" এক উপাখ্যানে পরিণত

হইয়াছে। পাকভারতে কোন সরকার বা উহার মন্ত্রী সভাকে সমালোচনা করার সময়ে "হবুচন্দ্র রাজাব গবুচন্দ্র মন্ত্রী সভা" বলিয়া উপহাস করা হইয়া থাকে। এই অরাজকতার যুগে যশোরের উত্তরে ও পশ্চিমে কৈবর্তগণ রাজত্ব করিতেন। তালা থানার অন্তর্গত ধানদিয়াব নিকটে এক তিওর রাজা রাজত্ব করিতেন বলিয়া জানা যায়। সেখানে এখনও দুর্গ, গড় ও দীঘিব চিহ্ন আছে। এই স্থানকে নয়াপাড়া মণিঘব এবং গড়দানীও বলা হয়। বথিত আছে যে এখানে ছয় বুড়ির ছয়টা দীঘি ছিল। অবশ্য এখনও অনেকগুলি দীঘির নিদর্শন আছে। তিওর বংশেব জনৈক রাজা বড় পুকুবে ডুবিয়া মারা যান বলিয়া প্রবাদ আছে। লোকে বলে এখানে অনেক ধনবত্ন পোতা আছে। সেই জন্য এই স্থানের অন্যনাম হইয়াছিল ধনপোতাব দানা বা দানা মণিঘর। মণিঘর বা মানিকহাবে সোনা পাওয়া যাইত বলিয়া প্রবাদ আছে। গড়ের ডাঙ্গিতে এজন্য সেখানে একত্র চাষাবাদ করিত না বলিয়া শুনা যায়।

বিদ্যানন্দকাটীতেও কোন বাজ বাড়ীব শেষ চিহ্ন এখনও বিদ্যমান। চুকনগবের নিকটবর্তী যশোর জেলার কেশবপুব থানার অন্তর্গত ভবতভয়না নামক একটি গ্রাম আছে। এখানে একটি ইষ্টক স্তূপ দৃষ্ট হয়। স্থানীয় লোকেরা বলে উহা ভরত রাজাব বাড়ী ছিল। এখানে প্রাচীন কালের বহু দেবমূর্তি পাওয়া গিয়াছে। প্রায় ৩০´ ফুট উঁচু মৃত্তিকার ঢিপি এখনও প্রাচীনত্বেব সাক্ষ্য দিতেছে। যে কালে ভরতভয়নায় বসতি ছিল সেই সময় ইহার দক্ষিণে অসংখ্য নদীনালা ও সুন্দরবন ছিল।

সাতক্ষীরা থানার অধীন বাবুলীয়া গ্রামে গণবাজার কীর্তি চিহ্ন সমূহ অদ্যাপি বিদ্যমান। সেখানে বহু দীঘিকা ও পুরাতন বাড়ীর চিহ্ন এখনও পরিলক্ষিত হয়। স্থানীয় বয়োবৃদ্ধ লোকেরা বলেন এই গ্রামে ছয় বুড়ির ছয়টা পুকুর ছিল এবং বিশালাকায় এলাকা জুড়িয়া জলাশয় গুলির জলস্থলী বিস্তৃত ছিল। গণরাজারাও সম্ভবতঃ সেই যুগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বাবুলীয়ার গণ রাজাদের রাজধানীতে মৃত্তিকার নিম্নে ইষ্টক নির্মিত বাড়ীর নিদর্শন আছে। প্রবাদ আছে যে রাজবাড়ী হইতে সুড়ঙ্গপথে নৌখালি খালে বা 'নেহার দোহায়' যাতায়াত করা যাইত। একটি মাত্র দীঘিতে ৯০ বিঘা জলকর এবং

উহার প্রায় ১৬ বিঘা জমিতে ফসল ফলে। গণরাজাদের পরিখাবেষ্টিত রাজ-বাড়ীর ভগ্নাবশেষ আছে। প্রাচীন বুড়নদ্বীপের পশ্চিমাংশে গণরাজাদের রাজধানীর নিদর্শন আজিও পরিদৃষ্ট হয়।

সিঙ্গীয়ার নিকটে নয়াবাড়ী গ্রামে পাতালভেদী নামক এক রাজা ছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে। তাঁহার বাড়ীর ভগ্নাবশেষ এখনও দৃষ্ট হয়। কথিত আছে যে এই রাজা মৃত্তিকার নিম্নে গড় খনন করিয়া তথায় বাস করিতেন এবং নিকটবর্তী নদী পর্যন্ত যাতায়াতেব সুড়ঙ্গ পথ ছিল। এখনও লোকে এই সুড়ঙ্গ দেখাইয়া দেয়। এই জন্য সম্ভবতঃ রাজার নাম হইয়াছিল পাতালভেদী। এ কথা নিছক প্রবাদ বাক্য বলিয়া মনে করি। সেইজন্য ইহাকে আমবা ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না।

পালবংশের শেষ রাজা মহীপালের পবে এদেশে বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিপত্তি খর্ব হইয়া পড়ে। সেন রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে জাতবর্মণ, হরিবর্মণ, শ্যামলবর্মণ, ভোজবর্মণ কিছুকাল পূর্ববঙ্গে রাজত্ব করেন। তাঁহারা সেনরাজগণ কর্তৃক বিতাড়িত হন। সেনদের আদি বাসভূমি ছিল কর্ণাটে। পুরাণে বর্ণিত বিখ্যাত বীর সেনের বংশে সামন্তসেন জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহাবা কর্ণাট ক্ষত্রিয়। মহীপালের রাজত্বকালে সামন্তসেন সুবর্ণরেখা নদী তীরে একটি ক্ষুদ্ররাজ্য স্থাপন করেন। তাঁহার পুত্র হেমন্ত সেন একজন প্রসিদ্ধ যোদ্ধা ছিলেন। হেমন্ত সেনের সুযোগ্য পুত্র বিজয় সেন পদ্মা নদীর উত্তবে বরেন্দ্র অঞ্চলে আসিয়া এক রাজ্য স্থাপন করেন। বিজয় সেন যখন বরেন্দ্র দেশ জয় করেন সেই সময় পাল রাজগণের সহিত তাঁহার যুদ্ধ বিগ্রহ সংঘটিত হইয়াছিল। এই যুদ্ধের পর পাল রাজ মগধে চলিয়া যাইতে বাধ্য হন এবং তথায় তিনি কিছুকাল রাজত্ব করেন। বিজয়সেন ১০৯৬ —১১৫৮ খৃঃ পর্যন্ত দীর্ঘদিন রাজত্ব করেন।

বিজয়সেন গোঁড়া হিন্দু ছিলেন। তিনি আদৌ পরধর্মে সহিষ্ণু ছিলেন না। তাঁহার ক্রোধবহ্নি বৌদ্ধ ধর্ম ধ্বংসের কার্যে নিয়োজিত হইয়াছিল। শশাঙ্কের পর বৌদ্ধ ধর্মের উপর এইরূপ মারণাস্ত্র আর কেহ নিক্ষেপ করিতে পারেন নাই। বিজয় সেনের আমলে দক্ষিণ প্রদেশ বা সুন্দরবন অঞ্চল বৌদ্ধধর্ম অধ্যুষিত রাজ্য ছিল। কিন্তু হিন্দু ধর্মের প্রতাপে উহা লয় প্রাপ্ত হইতে থাকে।

সেনরাজগণের সময় — পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে বৌদ্ধধর্মের অশেষ ক্ষতি সাধিত হয়। বৌদ্ধ নির্বাণের দ প্রচার করেন নাগার্জুন। এই মতবাদ বজ্রযান, সহযান, ও কালচক্র যানে বিভক্ত হইয়া যায়। বৌদ্ধগুরুদের তৎকালে অত্যন্ত সম্মান করা হইত। দেহের অসংখ্য শিরা উপশিরার জ্ঞানলাভকে যোগশাস্ত্র বলা হইত। ইহার তিনটি প্রধান বিষয় হইতেছে ললনা, রসনা এবং অবধুতি। যে, সমস্ত বৌদ্ধমূর্তি বঙ্গে আবিষ্কৃত হইয়াছে উহার অধিকাংশই নবম এবং কিয়দংশ দ্বাদশ শতকে নির্মিত। মৎস্যেন্দ্র নাথ প্রসিদ্ধ নাথ পন্থীদের প্রতিষ্ঠাতা। ডঃ শহীদুল্লাহ বলেন মীননাথ সম্ভবতঃ মৎস্যেন্দ্র নাথের অন্য নাম। গোরক্ষ নাথ তাঁহার শিষ্য। তাঁহাদের শিক্ষায় এদেশে অসংখ্য গান বাংলায় রচিত হইয়া বঙ্গ ভাষার আদি ইতিহাস সৃষ্টি করিয়াছে। সিদ্ধাচার্য মতবাদ হইতে নাথপন্থী-দের উৎপত্তি। অবধূতগণ সন্ন্যাসী ছিলেন। বঙ্গে সহজিয়া মতের প্রভাব বিস্তৃত হয়। ময়নামতীতে প্রাপ্ত শিলালিপিতে সহজ ধর্মস্য—কমস্য লেখা আছে। নদী, চক্র, শক্তি ইহাদের মূল মন্ত্র। বৈষ্ণবগণ তাঁহাদের কোন ক্ষতি করিতে পারে নাই। দুঃখের বিষয় এককালীন বঙ্গের বৃহত্তম ধর্ম শেষ পর্যন্ত লয় প্রাপ্ত হয়।

জৈন ধর্ম এদেশে বৌদ্ধ ধর্মের ন্যায় বিস্তার লাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু বৌদ্ধ ধর্ম দেশীয় জনসাধারণের প্রিয় ধর্ম ছিল। শশাঙ্কের অত্যাচার ও ও ধর্মান্তিকরণের পরও যাহারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিল, বিজয় সেনের প্রকোপে তাহারাও স্বধর্ম ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে এতদঞ্চলে বৌদ্ধ জাতির একচ্ছত্র বাসভূমি এবং হিন্দু রাজগণ কর্তৃক উহাদের ধর্মান্তিকরণ ও বৌদ্ধ ধর্মের বিলোপ সাধন সম্পর্কে আরও বহু তথ্যের বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

বিজয় সেন বীর যোদ্ধা ছিলেন। তিনি স্বীয় বাহুবলে কামরূপ (আসাম) এবং কলিঙ্গ (উড়িষ্যা) দেশ পদানত করেন এবং মিথিলার অধিপতি নান্যদেবকে পরাজিত ও কারারুদ্ধ করেন। বরেন্দ্র প্রদেশের অন্তর্গত বিজয়পুরে তাহার রাজধানী ছিল। রাজশাহীশহরে প্রতিষ্ঠিত বরেন্দ্র অনুসন্ধানসমিতি (Varendra Research Sceiety) কর্তৃক গোদাগাড়ী থানার অন্তর্গত বিজয় নগর বিজয় সেনের রাজধানী ছিল বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

বিজয় সেনের কয়টি পুত্র-সন্তান ছিল জানা যায় না। তাঁহার দুই স্ত্রী ছিল। এক স্ত্রীর গর্ভে স্বনাম ধন্য বল্লাল সেন এবং অন্য স্ত্রীর দুইটি পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করে। সিংহাসন লইয়া ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে কোন গোলযোগ হইয়াছিল কিনা জানা যায় না। সেন রাজগণের পূর্বে দেশের সর্বত্র অরাজকতা বিস্তার করিত। ধর্ম বিপ্লব এবং সুন্দরবনের প্রাকৃতিক বিপ্লব সমগ্র দেশকে একেবারে বিপর্যস্ত করিয়াছিল।

সেন রাজগণের সময় দেশে এক প্রকার শান্তি স্থাপিত হয়। হিন্দুরাজগণের প্রতাপে বৌদ্ধ ধর্ম সম্পূর্ণ রূপে পরাজয় বরণ করে। ঢাকা জিলার অন্তর্গত রামপালে বল্লালের রাজধানী ছিল। বৌদ্ধরাজ রামপাল এই নগরীর প্রতিষ্ঠাতা। বিজয়সেনের মৃত্যুর পর বল্লাল সেন ১১১৯ খৃষ্টাব্দে সিংহাসন লাভ করেন। তিনি প্রায় ৫০ বৎসর রাজত্ব করেন। বল্লাল যে সময় মিথিলার বিরুদ্ধে যুদ্ধে রত সেই সময় রামপালে লক্ষ্মণ সেন জন্মগ্রহণ করেন। পুত্রের জন্ম ও মিথিলা বিজয়—এই দুই ঘটনাকে চিরস্মরণীয় করিবার জন্য বল্লাল একটি নূতন সনের প্রবর্তন করেন এবং পুত্রের নামানুসারে উহার নামকরণ করেন লক্ষ্মণ সম্বৎ বা লসং। এই সন মিথিলায় এখনও প্রচলিত আছে। বল্লাল সেন ক্রমান্বয়ে মিথিলা, বঙ্গ, রাঢ়, বরেন্দ্র ও বাগড়ী জয় করেন। এই পাঁচটি রাজ্যে তিনি শাসন কার্যের সুবিধার্থে প্রতিনিধি মনোনয়ন করেন। বল্লালসেন শুধু রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন না, সমাজ ব্যবস্থার উপরও তাঁহার সর্বময় কর্তৃত্ব ছিল। তিনি হিন্দু সমাজ ব্যবস্থায় জাতিভেদের ভিত্তি দৃঢ় করেন এবং গুণানুসারে ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও অন্যান্য জাতির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করিয়া কৌলিন্যের মর্যাদা দান করেন। বল্লালের রাজত্বকালে ব্রাহ্মণ ধর্মের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং বৌদ্ধ ধর্মের শেষ চিহ্ন লুপ্তপ্রায় হইয়া পড়ে। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের প্রতি তিনি অশেষ অত্যাচার করিয়াছিলেন।

বল্লালের রাজত্বকালেই লক্ষ্মণ সেন পূর্ব বঙ্গে রাজ প্রতিনিধিরূপে কার্য করিতেন। বল্লাল একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি এক নীচ জাতীয় মহিলার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন। লক্ষ্মণ সেন পিতার এহেন কার্যের তীব্র প্রতিবাদ করিলে উক্ত রমণীর কুমন্ত্রণায় বল্লাল পুত্রকে নির্বাসিত করেন। কিছুদিন চলিয়া গেলে এক দিন বর্ষাকালে বল্লাল ভোজন

উদ্দেশ্যে অন্দরমহলে প্রবেশ করেন এবং দেখিতে পান যে প্রাচীর গাত্রে একটি শ্লোক লিখিত আছে। বল্লাল বুঝিতে পারিলেন ইহা তাঁহার বিরহী পুত্র বধুরই মর্মবাণী। তিনি লক্ষ্মণ সেনের কথা মনে করিয়া অনুতাপ করিতে লাগিলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি নাবিকগণকে আহ্বান করিলেন এবং ঘোষণা করিলেন যে তাহাদের মধ্যে যদি কেহ পর দিন সূর্যোদয়ের পূর্বে পুত্র লক্ষ্মণকে আনিয়া দিতে পারিবে তাহাকে স্বীয় রাজ্যের একাংশ পুরস্কার দেওয়া হইবে। সূর্য মাঝি নামক এক ধীবর এহেন গুরু ভার স্কন্ধে গ্রহণ করিল এবং একখানি দ্রুতগামী তরণী ও লোকলস্কর লইয়া তৎক্ষণাৎ যাত্রা করিল। বল্লাল একটি সংস্কৃত শ্লোক পুত্রের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। যথাসময় সূর্যমাঝি লক্ষ্মণ সেনকে রাজধানীতে আনিয়া উপস্থিত করিল। এই অসম্ভব কার্যের পুরস্কার স্বরূপ সূর্যমাঝি একটি দ্বীপের রাজা হইলেন। ঐ দ্বীপ পরে সূর্য দ্বীপ নামে কথিত হয়। যশোরের মহেশপুরে এই প্রাচীন রাজধানীর চিহ্ন এখনও দৃষ্টিগোচর হয়। বল্লাল সেন সুপণ্ডিত ছিলেন। "দান সাগর" ও অদ্ভুত সাগর" তাহার প্রণীত গ্রন্থ বিশেষ প্রসিদ্ধ।

বল্লাল সেনের মৃত্যুর পর লক্ষ্মণ সেন সিংহাসনে আরোহণ করেন। স্বীয় রাজ্যের মধ্যে তাঁহার খুব প্রতিপত্তি ছিল বলিয়া মনে হয় না। সুশৃংখলা, দক্ষতা ও বলবীর্যের অভাবেই শেষ দিকে তিনি রাজ্য হারাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

লক্ষ্মণ সেন সুকবি ও বিদ্যোৎসাহী নরপতি ছিলেন। তিনি মুক্ত হস্তে দান করিতেন। জীবন সায়াহ্নে তিনি শাস্ত্র চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহার রাজসভা পণ্ডিতদের আনাগোনায় ভরপুর ছিল। গীত গোবিন্দ রচয়িতা কবি জয়দেব, পবনদূত প্রণেতা কবি ধোয়ী, কবিশরণ, মহামন্ত্রী উমাপতিধর এবং আর্য সপ্তশতীর গ্রন্থকার গোবর্ধন তাঁহার রাজসভা অলঙ্কৃত করেন। পবনদূত গ্রন্থে সেন রাজগণের রাজধানীর বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

সুন্দরবন প্রদেশ বাগড়ী রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বল্লাল সেনের সমগ্র রাজ্য পাঁচটি প্রধান প্রদেশ বা ভুক্তিতে বিভক্ত ছিল। যথা—বঙ্গ, বরেন্দ্র রাঢ়, বাগড়ী এবং মিথিলা। মিথিলার পূর্ব নাম ছিল তীরভুক্তি। এই

প্রদেশগুলি আবার মণ্ডলিকায় বিভক্ত ছিল। মণ্ডল একটি প্রাচীন শব্দ। মুসলমান আমলে মণ্ডলকে মহল বা জিলা নামে অভিহিত করা হয়।

বল্লাল সেনের রাজধানী রামপালে এখনও সেন রাজগণের রাজধানীর ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। ববেন্দ্রের রাজধানী ছিল গৌড়ের সন্নিকটে পৌণ্ড্রবর্ধন নামক স্থানে। লক্ষ্মণ সেন রাজা হইয়া পৌণ্ড্রবর্ধনের দক্ষিণে গৌড় বা লক্ষণাবতী নগরেব প্রতিষ্ঠা করেন। হিউয়েন সাঙ পৌণ্ড্রবর্ধনকে পুন্নাফাতান্না (Pun-na-fa-tan-na) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। স্থানের দূরত্ব ও মাপ ধরিয়া এম, এস, জুলিয়েন ইহাকে পৌণ্ড্রবর্ধন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সেণ্ট মার্টিন বর্তমান বর্ধমানে উহার স্থান নির্ণয় করিয়াছেন। কানিংহাম বর্তমান পাবনাকে পৌণ্ড্রবর্ধনেব স্থান বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। আমাদের মতে এই দুইটির কোনটিই ঠিক নহে। পৌণ্ড্রবর্ধন খুব সম্ভব বর্তমান রাজশাহী জিলার পশ্চিম সীমান্তবর্তী কোন স্থানে অবস্থিত ছিল। ঐ স্থান গৌড় বা পাণ্ডুয়ার নিকটবর্তী হওয়াই স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়।

বাঢ়েব রাজধানী ছিল সম্ভবতঃ সপ্তগ্রাম বা বীবভূমের অন্তর্গত লাক্ষৌর নামক স্থানে। মিথিলার প্রধান নগর সম্পর্কে ইতিহাস কিছুই বলিতে পারে না। বাগড়ীব রাজধানী কোথায় ছিল তাহাও নির্ণয় করা দুরূহ। তবে উহা সম্ভবতঃ বর্তমান যশোর বা উহার নিকটবর্তী কোন স্থানে ছিল। অধ্যাপক সতীশচন্দ্র বাগড়ীর রাজধানী সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। যশোর জিলার নিকটবর্তী সেখহাটি বা জগন্নাথপুর একটি প্রাচীন স্থান এবং বহু বিবেচনার পর তিনি অনুমান করিয়াছেন যে এই স্থানে বাগড়ীব রাজধানী থাকাই সম্ভব। আমাদের মনে হয় বার বাজার ও মুবলী অতীব প্রাচীন স্থান। ইতিহাসের অসংখ্য কীর্তি চিহ্ন এই দুইটি শহরে বিদ্যমান ছিল। বৌদ্ধ ও হিন্দু আমলে এই দুই স্থানের নাম শ্রুত হয়। গাঙ্গেয় বদ্বীপের অন্যতম প্রধান নদী ভৈরবের তীরেই বার বাজার ও মুরলী অবস্থিত ছিল! সেখহাটীর সন্নিকটে সেকালে ভৈরব নদী প্রবাহিত ছিল কিনা তাহার কোন প্রমাণ আমাদের হাতে নাই, সে জন্য মনে হয় মুরলীতেই বাগড়ীর রাজধানী থাকা স্বাভাবিক।

সেন বংশের রাজত্ব কালে নবদ্বীপে কোন শাসন কেন্দ্র ছিল কিনা সঠিক জানিবার উপায় নাই। তবে এই সময় নবদ্বীপে একটি নগরীর প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল এবং রাজত্বের শেষ দিকে লক্ষ্মণ সেন তথায় অবস্থান করিতেন। অধ্যাপক সতীশচন্দ্র বলেন যে নবদ্বীপে কোন রাজধানী ছিল না এবং দুর্গ ও সেনানিবাস ছিল না। বল্লাল দিঘী ও ভগ্ন স্তূপ একটি তীর্থ স্থানের পরিচয় দেয় মাত্র। যাহা হউক মুসলমান আক্রমণের সময় লক্ষ্মণ সেন নবদ্বীপ বা নদীয়ায় ছিলেন। সপ্তদশ অশ্বারোহীর আগমন সংবাদে ভীত হইয়া লক্ষ্মণ সেন নদীয়া হইতে পলায়ন করিয়া পূর্ব বঙ্গে চলিয়া যান। মুসলমানেরা অতি সহজেই তাঁহার রাজ্য হস্তগত করে। এ বিষয়ের বিস্তৃত ইতিহাস যথাস্থানে বর্ণিত হইবে।

হিন্দু আভিজাত্য, সমাজ ব্যবস্থা ও বৌদ্ধধর্মের মূলচ্ছেদ।

॥ তিন ॥

আলোচ্য প্রসঙ্গে আমবা এক নূতন বিষয়ের অবতাবণা করিব। উহা যুদ্ধ বিগ্রহ, রাজ্যজয় বা বাজ্যশাসন সংক্রান্ত ঘটনাবলী নহে। উহা সেন আমলে এবং বিশেষ কবিয়া হিন্দুরাজ বল্লাল সেনের সৃষ্ট এবং তৎপুত্র লক্ষ্মণ সেন কর্তৃক পরিপুষ্ট হিন্দু আভিজাত্য। ইহা হিন্দু ধর্মেব অস্থি মজ্জায় বিজড়িত। আভিজাত্য বা কৌলিন্য হিন্দু সমাজে এক অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি কবিয়াছে। আবহমান কাল হইতে হিন্দু সমাজে ভেদনীতি প্রথা প্রচলিত ছিল। বল্লাল সেন সেই প্রাচীন প্রথাকে অভিনব ছাঁচে ঢালিয়া উহাকে এক নূতন রূপ প্রদান করেন। এই আভিজাত্যেব ইতিহাস সামাজিক জীবনে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। বাংলা দেশেব প্রাচীন ইতিহাস জানিতে হইলে হিন্দু জাতির বল্লালী আভিজাত্য বা কৌলিন্যেব বিষয় জানা একান্ত আবশ্যক। এই আভিজাত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার পর হিন্দু সমাজে বর্ণ বৈষম্য প্রচণ্ড রূপ পরিগ্রহ করে। জাতি ভেদ প্রথা সমাজ জীবনে প্রবেশ কবিয়া উহা ভয়ংকব আকার ধারণ করে। বল্লালী আভিজাত্যের দ্বারা সমাজ জীবনে যে ঘুণ ধবিয়াছে তাহা দূর করিতে বহু সামাজিক বিপ্লবেব আবশ্যক। পূর্বাপেক্ষা উদার নৈতিক মনোভাব দেখা দিলেও হিন্দু সমাজে এই আভিজাত্য এখন সর্বত্র সমভাবে বিরাজমান।

এককালে রোমে মানুষেব মধ্যে তিনটি শ্রেণী বিভাগ ছিল। সমাজেব উচ্চ স্তরের ব্যক্তিদের প্যাট্রিসিয়ান (Patricians) বলা হইত। তাহারাই সর্ব প্রকার সুযোগ সুবিধা ও নাগরিকত্বের অধিকাব পাইত। ইহারাই ছিল রাজ্যের মহিমান্বিত ব্যক্তি (Dignitaries) আর ব্যবসায়ী বা কৃষক ইত্যাদি সাধারণ লোকদিগকে প্লেবিয়ানস্ (Plebeians) বলা হইত। তাহাদের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা নিম্নমানের ছিল। এতদ্ব্যতীত ক্রীতদাসদিগকে সার্ফস (Serfs) আখ্যা দেওয়া হইয়াছিল। খৃষ্টান জগতে যুগ যুগ ধরিয়া এই ধরণের সামাজিক

বিভেদ প্রচলিত ছিল। সুসভ্য আমেরিকায়ও বর্তমানে কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে বিভেদ প্রথা প্রকট আছে।

ইস্‌লাম ধর্মের অভ্যুদয়ের পূর্বে আরব দেশেও দাসদাসীদিগের অবস্থা অত্যন্ত মর্মবিদারক ছিল। কোন নরনারী বা বালক-বালিকাকে চুরি বা লুণ্ঠন করিয়া আনিতে পারিলে সে বংশানুক্রমে লুণ্ঠনকারীর দাস দাসীতে পরিগণিত হইত। দাসীগণ প্রভুর খেয়াল ও পাশব প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য তাহার প্রত্যেক আদেশ পালন করিতে বাধ্য হইত। প্রভুর ইচ্ছানুক্রমে তাহাদিগকে ছাগ ও মেষের ন্যায় বাজারে বিক্রয় ও বলিদান করা হইত। পশু অপেক্ষা তাহাদিগকে অধিক নির্যাতন ভোগ করিতে হইত। কদর্য খাদ্য ও পোষাক এবং কদর্য বাসস্থানে তাহাদিগকে সন্তুষ্টচিত্তে থাকিতে হইত। সুন্দরী ক্রীতদাসীরা প্রভুর কামাগ্নির ইন্ধনরূপে ব্যবহৃত হইত।

প্রাচীন ভারত ও শাস্ত্রকারদের নিষ্ঠুর শাস্তির ব্যবস্থায় একশ্রেণীর মানুষকে দাস জাতিতে পরিণত করা হইয়াছিল। মনু ও সংহিতকারদের নিম্ন বর্ণিত বিধি হইতে এই ঘৃণ্য সমাজ ব্যবস্থার কথঞ্চিত আভাষ পাওয়া যাইবে।

শূদ্র ক্রীত হউক অথবা অক্রীত হউক, তাহাকে দাসত্ব করিতে হইবে। ব্রাহ্মণের দাস্যকর্ম নির্বাহ করার জন্যই বিধাতা শূদ্রের সৃষ্টি করিয়াছেন। এই দাসগণ যাহাকিছু আয় উপার্জন করিবে, তাহার অধিকারী হইবে তাহাদের স্বামী দ্বিজগণ। ব্রাহ্মণ প্রভু শূদ্রের সমস্ত ধনসম্পদ গ্রহন করিতে, এমনি কি কাড়িয়া লইতেও কমচেষ্টা করিত না। কারণ শূদ্রদাসের স্বত্বাস্পদীভূত কিছুই নাই। উহার যাবতীয় ধন উহার প্রভুর গ্রহনীয়। ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হইয়াছে ঈশ্বরের মুখ হইতে আর শূদ্র সৃষ্টি হইয়াছে তাঁহার পা হইতে। চণ্ডালাদি নীচ জাতীয় লোকদিগের বাসস্থান হইবে গ্রামের বাহিরে। কুকুর ও গর্দভ ব্যতীত অন্য কোন পশু তাহারা পালন করিতে পারিবেনা। তাহারা ভাঙ্গাভাড় ও লোহার অলঙ্কার ব্যবহার করিবে। শববস্ত্র পরিধান এবং লাওয়ারেশ শবগুলি গ্রাম হইতে বাহির করিবে। বৈধ কর্মাদির অনুষ্ঠান কালে ইহাদের দর্শন করাও নিষিদ্ধ। সাধুরা ইহাদিগকে সাক্ষাৎভাবে অন্নদান করিবেনা। দরকার হইলে ভগ্নপাত্রে ভৃত্যের দ্বারা ইহাদিগকে অন্ন দেওয়া যাইতে পারে। শূদ্র যদি

ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণের লোকের প্রতি কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিত, তাহা হইলে তাহার জিহ্বা কাটিয়া দিত এবং বৈধ বাক্য শ্রবণ করিলে তাহার কর্ণে উত্তপ্ত লৌহ শলাকা ঢুকাইয়া দিত। ব্রাহ্মণের সঙ্গে একাসনে বসিলে শূদ্রের পাছা কর্তন করা হইত। শূদ্র যদি ব্রাহ্মণীর অঙ্গ স্পর্শ করে, তাহা হইলে তাহার প্রাণ দণ্ডের ব্যবস্থা হইত।

উপরে যে জঘন্য দাসত্ব প্রথা ও আল্লাহ্‌র মানুষের মধ্যে মানব সৃষ্ট বিভেদের কথা আলোচনা হইল, উহা তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থাকে একেবারে পঙ্গু করিয়া দিয়াছিল। চীন বা পাক-ভারত অপেক্ষা মধ্যপ্রাচ্য ও রোমের অবস্থা অবশ্য অধিক পরিতাপ জনক ছিল। সপ্তম শতাব্দীর প্রথমদিকে ইসলামী সমাধানে না আসা পর্যন্ত এই প্রথা আরব জগতে বিশেষ ভাবে বিদ্যমান ছিল। মহানবী হজরত মোহম্মদ এই জঘন্য দাসত্ব প্রথার মূলে এমন কুঠারাঘাত করেন যে, অচিরাৎ উহার বিলোপ সাধন ঘটে। ইসলামের সাম্য মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্ব জগতে বিস্ময় সৃষ্টি করিয়াছিল।

আবহমান কাল হইতে মানুষে মানুষে ভেদনীতি সর্বত্র প্রবল ছিল। ইস্‌লাম ধর্মের প্রভাব খৃষ্টান জগতেও আলোড়ন উঠিয়াছিল এবং এই ভেদনীতির প্রতাপ বহুলাংশে হ্রাস পাইয়াছিল। প্রাচীন পাক-ভারতে রোম সাম্রাজ্যের ন্যায় বর্বর না হইলেও ভেদনীতি খুবই কঠোর ছিল। পাক ভারতে হিন্দুজাতির মধ্যে আদিম যুগ বা বৈদিক যুগ হইতে বরাবর এই প্রথা প্রবল ছিল। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের আবির্ভাবে এই জাতিভেদ প্রথা বিশেষভাবে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। শেষদিকে বৌদ্ধ ও জৈনদিগকে দমনের পর জাতিভেদ প্রথা নূতনরূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল। এই প্রাচীন কালীন জাতিভেদ প্রথা হইতেই হিন্দু আভিজাত্যের উৎপত্তি।

বঙ্গের বিখ্যাত হিন্দুরাজ বল্লাল সেন হিন্দু সমাজের কৌলিন্য বা আভিজাত্যকে নূতন ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি আদিমযুগের দূর সম্পর্কীয় দৌহিত্র। এদেশে ব্রাহ্মণাচার ও বৈদিক ক্রিয়া-কলাপ বৌদ্ধ ও জৈনদের প্রভাব একপ্রকার লয়প্রাপ্ত হইয়াছিল। হিন্দু সংস্কৃতিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য আদিশূর কনৌজ বা কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। এই পঞ্চ

ব্রাহ্মণ এদেশে আসিয়া আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে মিশিয়া সনাতন ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ধীরে ধীরে ভুলিয়া গেল। কান্যকুব্জের লোকেরা এদেশের লোকদিগকে ম্লেচ্ছ আখ্যা দিয়াছিল। পঞ্চ ব্রাহ্মণ ধীরে ধীরে এদেশের সমাজের সহিত বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করিয়া একেবারে মিশিয়া গেল এবং কালক্রমে তাহাদের গলার উপবীতও অপসারিত হইল। হিন্দু সমাজে ইহাদের বংশধরেরা বরেন্দ্র ব্রাহ্মণ হিসাবে সুপরিচিত। তাহাদের দ্বারা যখন সত্যকার ব্রাহ্মণ্যধর্ম প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হইল না তখন পুনরায় আর একদল ব্রাহ্মণকে এদেশে আনয়ন করিবার চেষ্টা চলিতে লাগিল। আদিশূর বুঝিলেন বিনা যুদ্ধে এবং বিনা কৌশলে ব্রাহ্মণ্যধর্মের শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র কান্যকুব্জ হইতে এই ব্রাহ্মণ আনয়ন সম্ভব নহে। কান্যকুব্জ রাজ "ম্লেচ্ছ দেশে" ব্রাহ্মণ পাঠাইতে একেবারেই অনিচ্ছুক। সেইজন্য আদিশূর উপবীত ধারণ করিয়া গবাদি পশুর পৃষ্ঠে কান্যকুব্জে একদল লোক পাঠাইবার জন্য সচেষ্ট হইলেন। ইহার তাৎপর্য এই যে তথাকার রাজশক্তি গো-দেবতার কোন ক্ষতি করিবে না এবং ব্রাহ্মণ হত্যা হইতে নিবৃত্ত থাকিবে। যখন অনেক চেষ্টার পর কোন লোক পাওয়া গেল না, তখন একদিন আদিশূর দেখিলেন কিরাত সম্প্রদায়ের একদল নওজোয়ান অশ্বপৃষ্ঠে যোদ্ধার বেশে রাজপথ দিয়া যাইতেছে। আদিশূর তাহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় তাহারা বলিল, "আমরা কিরাত জাতি. পাখী শিকার করা আমাদের জাতীয় ব্যবসায় আমরা সেইজন্য জঙ্গলেই অবস্থান করি।" আদিশূর তাহাদিগকে রাজধানীতে অবস্থান করিতে অনুরোধ করায় তাহারা বলিল "আমরা জঙ্গলে অবস্থান করা ভালবাসি। সভ্য সমাজে বসবাস আমাদের পোষায় না।" এইভাবে আলোচনার পর তাহারা রাজ অনুরোধ রক্ষা করিতে স্বীকৃত হইল। আদিশূর তাহাদের দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ গঠন দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, — "তোমাদের জাতির সপ্ত গোত্রের প্রত্যেক গোত্র ১০০ শত করিয়া মোট ৭০০ লোক আমাকে দিতে হইবে। তাহাদের চেহারা সুন্দর এবং বলবান হওয়া চাই,।" কিরাত অন্ত্যজ সম্প্রদায় এবং অনার্য জাতিভুক্ত। সেইজন্য তাহারা রাজার এই প্রস্তাব আনন্দের সহিত গ্রহণ করিল। আদিশূর পছন্দমাফিক ৭০০ শক্তিধর লোক পাইলেন। তিনি তাহাদের কিঞ্চিৎ যুদ্ধবিদ্যা ও লেখাপড়া শিখাইয়া উপবীত ধারণ করাইলেন। অতঃপর তিনি সাতশত বলিষ্ঠ গরুর পৃষ্ঠে

উপবীতধারী এই সাত শত কিরাত সম্প্রদায়ের লোককে বীর ও যোদ্ধৃ বেশে কান্যকুব্জে প্রেরণ করিলেন। যোদ্ধাগণ সেই দেশে উপস্থিত হইয়া সিংহনাদ করিলে কান্যকুব্জ রাজ্যের যুদ্ধমন্ত্রী তাহাদের নিকট আসিয়া সব কিছু শুনিলেন। মন্ত্রীবর বলিলেন, "ম্লেচ্ছ দেশে পাঁচজন ব্রাহ্মণ ইতিপূর্বে দিয়াছি এখন আর দিতে পারিব না।" অনেক বাগ্ বিতণ্ডার পর মন্ত্রীপ্রবর রাজ সমীপে সমস্ত বিষয় বর্ণনা করেন। কান্যকুব্জ রাজ দেখিলেন গো-দেবতা ও ব্রাহ্মণের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হয়। সেইজন্য যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইয়া তিনি স্বীয় রাজ্য হইতে পাঁচজন ব্রাহ্মণ "ম্লেচ্ছ দেশে" প্রেরণ করেন। এবম্প্রকার চেষ্টা ও কৌশল অবলম্বনের পর পাঁচজন ব্রাহ্মণ বঙ্গ দেশে আগমন করেন। কথিত আছে যে আদিশূর এই পঞ্চ ব্রাহ্মণকে সামরিক পোষাক পরিহিত দেখিয়া সম্মান করেন নাই। সেজন্য তাঁহারা বৃক্ষপত্র ও ফুল নিক্ষেপ করিলে উহা বৃক্ষে ফুটিয়া উঠে। এতদ্দর্শনে তিনি তাঁহাদিগকে সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা করেন। তাঁহাদের উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে দেশে নূতন হাওয়া প্রবাহিত হইল। আদিশূর রামপালে রাজধানী স্থাপন করিয়া স্বীয় জামাতা জয়াপীড়ের সাহায্যে যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। এই পঞ্চ ব্রাহ্মণের সঙ্গে পাঁচজন কায়স্থও আসিয়াছিলেন। কথিত আছে যে যাগ-যজ্ঞানুষ্ঠানের পর এই পঞ্চ ব্রাহ্মণ স্বদেশে ফিরিয়া গেলে তাঁহাদের স্ত্রীপুত্র এবং আত্মীয় স্বজন তাঁহাদিগকে সমাজে গ্রহণ করে নাই এবং তজ্জন্য তাঁহাদের এদেশে ফিরিয়া আসিয়া বিবাহাদি করিয়া স্থায়ীভাবে বসবাস করেন।

পূর্বোক্ত সাতশত কিরাত সম্প্রদায়ের লোকও এই সময় ব্রাহ্মণ হইয়া যায় এবং উহাদের বংশধরেরা "সাতশতী" আখ্যা প্রাপ্ত হয়। কেহ কেহ বলেন ইহারা সরস্বতী নদী তীরবর্তী ব্রাহ্মণ সেইজন্য উহাদিগকে সরস্বতী বা সাতশতী বলা হইত। ইহাদের ব্রাহ্মণ শ্রেণীভুক্ত হওয়ার মূলে কান্যকুব্জ রাজের শুভেচ্ছা ছিল। কথিত আছে, রাজা বীরসিংহ সাত শত কিরাতকে ব্রাহ্মণ হিসাবে গ্রহণ করেন এবং তাহাদিগকে এক রাজকীয় প্রীতিভোজে আপ্যায়িত করেন। আদিশূর ও তাহাদের ব্রাহ্মণ হিসাবে অগ্রাধিকার দিয়াছিলেন।

দ্বাদশ শতকের প্রথমদিকে বল্লাল সেন সিংহাসনে আরোহণ করেন। আদিশূরের সময়কার ব্রাহ্মণ্য ধর্মের তখন বিশেষ অবনতি ঘটিয়াছিল। ধর্মের

পতনোন্মুখ অবস্থা দর্শনে দেশে যাহাতে পুনরায় বিদ্যা ব্রাহ্মণ্য লোপ না পায়, তজ্জন্য বল্লাল সেন কৌলিন্য সংস্থাপন ও কুল রক্ষার বিধি প্রনয়ণ করেন। কালক্রমে এই আভিজাত্য সমাজে বর্ধিত হইয়া দেশব্যাপী এক প্রবল কুলীন সমাজের সৃষ্টি করে। এই সময় বঙ্গদেশে ইতর-ভদ্র, মহৎ-ক্ষুদ্র, ব্রাহ্মণ-শূদ্র, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য প্রভৃতি সামাজিক ভেদনীতি নব আকারে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাই সেন রাজগণের বিশিষ্ট ও অভিনব অবদান। হিন্দু রাজত্ব ধূলির সহিত মিশিয়া গেলেও হিন্দু আভিজাত্য সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বদ্ধমূল হইয়া আছে। এই আভিজাত্যের ব্যবস্থা এখনও দেশব্যাপী বিদ্যমান থাকিয়া সমাজকে চালিত করিয়া যাইতেছে। হিন্দু সমাজের ধনবল, জনবল, বিদ্যাবল ,রাজশক্তি সব কিছুই আভিজাত্যের চরণতলে অবনত হয়। সমাজের কুলগ্রন্থ, ঘটকদিগের প্রকাশিত পুঁথি এবং প্রবাদ বাক্য হইতে এই কৌলিন্য সংস্থাপনের প্রমাণ পাওয় যায়। অবশ্য ইহার মধ্যে বহু ঘটনা অতিরঞ্জিত হইতে পারে। হিন্দু যুগের সঠিক ইতিহাস না থাকায় এ বিষয় অনেক মতবিরোধ দেখা দিয়াছে। কেহ কেহ বলেন সেন রাজগণের যে সমস্ত তাম্রলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে উহাতে কৌলিন্য স্থাপনের কথা নাই। সতীশবাবু তাঁহার যশোর খুলনার ইতিহাসে বলিয়াছেন, "বল্লালের ইতিহাস বাদ দিলে বঙ্গীয় হিন্দুর ইতিহাসের কিছু থাকেনা - আর সেই বল্লালী ইতিহাসের নির্যাস আভিজাত্য।" সুন্দরবন অঞ্চলও তখন বঙ্গের অধীন এবং এতৎ প্রদেশেও এই আভিজাত্যের ঢেউ খেলিয়া হিন্দু সমাজ জীবনে এক আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা সহজেই অনুমেয়।

আদিশূর আনীত ব্রাহ্মণ বরেন্দ্র ও রাঢ় এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। কথিত আছে, পরবর্তী কালে কিছু সংখ্যক বৈদিক ব্রাহ্মণও এদেশে আসিয়াছিল। পূর্ব হইতে যে সকল ব্রাহ্মণ এদেশে ছিল তাহারা পূর্বোক্ত সাত শত ব্রাহ্মণ বংশধরের সঙ্গে "সাতশতী" বলিয়া পরিচিত। সুন্দরবন প্রদেশে রাঢ়ী ব্রাহ্মণদিগের প্রভাব বেশী। এখানে দুই চার ঘর বৈদিক এবং অসংখ্য সাতশতী ব্রাহ্মণ বসবাস করে। ব্রাহ্মণদের ন্যায় কায়স্থদের মধ্যেও শ্রেণী বিভাগ ছিল। আদিশূরের সময় হইতে কায়স্থগণ উত্তর রাঢ়ী, দক্ষিণ রাঢ়ী, বারেন্দ্র ও বঙ্গজ এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়ে। সুন্দরবন অঞ্চলে দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থই অধিক। রাজা প্রতাপাদিত্য

"বঙ্গজ" শ্রেণীর কায়স্থ ছিলেন এবং তাঁহার সময় বহুসংখ্যক বঙ্গজ কায়স্থ এদেশে আসিয়া বসবাস করেন। বল্লাল সেনের সময় হইতে বৈদ্যগণ রাঢ়ী ও বঙ্গজ এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হয়।

আদিশূরের দ্বিতীয়বারের আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণের সন্তান সন্ততি বল্লাল সেনের সময় ছাপ্পান্ন ঘরে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। উহারা ছাপ্পান্নটি ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে বসবাস স্থাপন করিয়াছিল। উক্ত গ্রাম সমূহের নামানুসারে তাঁহাদিগকে গ্রামী বা গাঁঞি আখ্যায় আখ্যায়িত করা হইয়াছিল।

"পঞ্চগোত্র ছাপ্পান্ন গাঁঞি, তাছাড়া বামন নাই।
যদি থাকে দু'এক ঘর, তা' সে সাতশতী আর পরাশর।"

অবশ্য এই কবিতার তাৎপর্য ও সঠিক বলিয়া মনে হয় না। কারণ উক্ত পঞ্চ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা অন্যান্য ব্রাহ্মণদের সংখ্যা বরাবরই অধিক ছিল এবং ঘটনা পরম্পরায় তাহাই প্রমাণিত হইয়াছে।

যাহা হউক বল্লাল সেন উক্ত ছাপ্পান্ন গ্রামের ব্রাহ্মণদিগকে আহবান করিয়া কুললক্ষণ অনুযায়ী তাহাদিগকে বিচার করেন। উহাদের মধ্যে যাহারা বরেন্দ্র অঞ্চলে বাস করিতেছিলেন তাহারা মূলতঃ ছাপ্পান্ন গাঁঞিভুক্ত হইলেও নিজেদের পার্থক্য নির্দেশ করেন। ইহাদের গাঁঞি সংখ্যা এক শত আসিয়া দাঁড়ায়। যাহা হউক ব্রাহ্মণগণ রাঢ়ী ও বরেন্দ্র এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া যায়। বল্লাল রাঢ়ীদিগের মধ্যে বন্দ্য, মুখটি' চট্ট, পতিতুণ্ড, গাঙ্গুলী! কাঞ্জীলাল, কুন্দ ও ঘোষাল এই অষ্ট গ্রামী ব্রাহ্মণদিগকে সর্বোতভাবে কুললক্ষণ অনুযায়ী কুলীন আখ্যা দেন। অন্য চৌদ্দ গ্রামী ব্রাহ্মণদিগকে গৌণ কুলীন এবং বাকী চব্বিশ গাঁঞিভুক্ত ব্রাহ্মণদিগকে শ্রোত্রীয় খেতাব প্রদান করেন। বল্লাল পুনরায় প্রথোমক্ত অষ্টম গাঁঞিভুক্ত কুলীনের মধ্যে উনিশ জনকে বিশেষভাবে সংকৃত করেন। এই সম্মানিত কুলীনগণ রাজার নিকট হইতে দান গ্রহণ করিতে পারিতেন না। স্বীয় গুণানুসারে তাঁহারা যথেষ্ট ভূমি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

কথিত আছে, বল্লাল সেন ব্যক্তি চরিত্র ও সামাজিক কার্যকলাপের প্রতি দৃষ্টি রাখিবার জন্য কতিপয় লোককে ঘটক নির্বাচিত করিয়া তাহাদের বৃত্তির ব্যবস্থা করেন। নছবনামা বা বংশাবলী রক্ষণ, সমাজের দোষগুণ কীর্তন এবং

আভিজাত্য সম্পর্কে মান নিরূপণ তাহাদের ব্যবসায় হইয়াছিল। লক্ষ্মণ সেনের সময় তদীয় পিতার প্রতিষ্ঠিত এই আভিজাত্য বংশগত হইয়া দাঁড়ায়। কুলীন ব্যক্তিদের মধ্যে সামাজিক কুল মর্যাদা লইয়া নানা বিভ্রাট উপস্থিত হইলে লক্ষ্মণ সেন দুইবার কুলীনদিগের পরীক্ষা করিয়া সমীকরণ করেন। এই সমীকরণের ফলে ২১ জন কুলীন সমতুল্য বলিয়া গণ্য হয়। এই সময় ইহাও স্থির হয় যে সমপর্যায় কুলীনে দান গ্রহণই কর্তব্য এবং উহার অন্যথা হইলে কৌলিন্যের হ্রাস বৃদ্ধি হইবে। দনুজ মর্দনের রাজত্ব কালে কৌলিন্য লইয়া দেশব্যাপী আন্দোলন হয় এবং উহার ফলে তাঁহাকে চারিবার সমীকরণ করিতে হইয়াছিল। রাজ শক্তির দ্বারাই এই ভাবে কৌলিন্যের প্রতিষ্ঠ স্থায়ী রূপ ধারণ করে। কুলীনের বংশে জন্ম অথচ দুই-তিন পুরুষের মধ্যে যথারীতি আদান প্রদান করিতে পারে নাই, তাহারা বংশজ বলিয়া পরিচিত হয়। শ্রোত্রী ব্রাহ্মণ গুণের তারতম্য অনুসারে নানা শাখায় বিভক্ত হইয়া যায়। পরবর্তীকালে রাঢ়ীয় কুলীনদের মধ্যে দেবীবর ঘটকের মেল বন্ধনের দ্বারা এই পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন সাধিত হয় এবং উহা ব্রাহ্মণ সমাজে তুমুল বিপ্লব আনয়ন করে।

বল্লাল সেন কায়স্থ, বৈদ্য ও অন্যান্য জাতির মধ্যেও কুল প্রথা প্রচলিত করিয়াছিলেন। আদিশূর বৈদ্য রাজা ছিলেন এবং সেন রাজগণের পূর্ব পুরুষের সঙ্গে তাঁহার বংশের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন সেন রাজগণ ক্ষত্রিয় ছিলেন। এ বিষয় সতীশবাবু নুলোপঞ্চাননের এক শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন,

> "বিশেষতঃ রাজা হ'লে নাহি থাকে জ্ঞান।
> রাজায় রাজায় বিভা, সবাই ক্ষত্রিয়।
> পিতৃমাতৃ এক পক্ষ ; রাজন্য গোত্রীয়।।"

বৈদ্যরাজগণ কায়স্থকে ক্ষত্রিয় বলিয়াই জানিতেন। তাঁহাদের অধীনে ক্ষত্রিয়গণ উচ্চপদে সমাসীন ছিলেন। কান্যকুব্জ হইতে আগত পুরুষোত্তম দত্তের বংশধর নারায়ণ দত্ত, বটুদাস ও শ্রীধর দাস উচ্চ রাজকার্যে নিযুক্ত ছিলেন। লক্ষ্মণ সেন তাহাদিগকে বিশেষ সম্মান করিতেন। কায়স্থ ও বৈদ্যদের মধ্যে এদেশে একবার ভীষণ মসি যুদ্ধ চলিয়াছিল। বৈদ্য পক্ষে উমেশ চন্দ্র বিদ্যারত্ন

এবং কায়স্থ পক্ষে নগেন্দ্রনাথ বসু একদা স্ব স্ব আভিজাত্য লইয়া আলোচনার জন্য এক তর্ক সভায় মিলিত হন। বিদ্যারত্ন মহাশয় "বল্লাল মোহমুদ্গর" পুস্তকে কায়স্থ জাতির উপর অশেষ গালি বর্ষণ করিয়াছেন। এই বৈদ্য-কায়স্থ দ্বন্দ্ব বহু দিন চলিয়াছিল। বর্তমানে উহার তীব্রতা হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। বল্লাল সেন নিজে নীচ জাতীয় স্ত্রী গ্রহণ করায় লক্ষ্মণ সেন পিতার প্রতি ক্রুদ্ধ ভাবাপন্ন হইয়া ক্ষমতাশালী বৈদ্যদিগেকে উপবীত ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে বাস করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। এখনও বল্লালী বৈদ্য ও লক্ষ্মণসেনী বৈদ্য বলিয়া দুইটি শ্রেণী বিভাগ আছে। এই দুই শ্রেণী আবার রাঢ়ী ও বঙ্গজ বৈদ্য বলিয়া খ্যাত। রাঢ়ী-দের অন্য শাখা পঞ্চকোটী। রাঢ়ী ও পঞ্চকোটী বৈদ্যগণ উপবীতধারী। বৈদ্যগণের মধ্যে সিদ্ধ বা মুখ্য, সাধ্য এবং কষ্ট এই তিনপ্রকার কুল বিদ্যমান থাকে। যাহারা আচার ভ্রষ্ট হইয়া শ্রীহট্ট ও অন্যাত্র বাস করিয়াছে তাহারা কষ্ট। মুখ্য কুলীনের মধ্যে আট জনে কৌলিন্য পান। ইহাদের মধ্যে দুহী, শিয়াল, বিনায়ক ও গৈয়ী "সেন" উপাধিযুক্ত ছিলেন। চায়ু ও পন্থের উপাধি ছিল দাস এবং ত্রিপুর ও কায়ুর উপাধি ছিল গুপ্ত। কথিত আছে দুহীর পুত্র হিঙ্গু এবং বিনায়কের প্রপৌত্র অন্য আর এক হিঙ্গু যথাক্রমে খুলনা জিলার পয়োগ্রাম ও সেনহাটীতে আসিয়া বাস করেন। সম্ভবতঃ তুর্ক আফগান আমলের মধ্যভাগে এতদঞ্চলে বৈদ্যদের বসবাস আরম্ভ হয় এবং তথা হইতে ষষ্ঠদশ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে কালিয়া, মূলঘর প্রভৃতি স্থানে বিস্তার লাভ করে।

কায়স্থ সমাজ ও কুল লক্ষ্মণ অনুযায়ী শ্রেণী বিভক্ত হয়। তাহাদের মধ্যে চারি শ্রেণীর লোকেরা বল্লালের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া উত্তর রাঢী ও বরেন্দ্রগণ কুল-মর্যাদা গ্রহণ করে নাই। দক্ষিণ রাঢ়ী ও বঙ্গজগণ বল্লালী আভিজাত্য গ্রহণ করে এবং এই দুই শেণীর কায়স্থই সুন্দরবন অঞ্চলের অধিবাসী। ইহার মধ্যে আবার দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থই অধিক। পরবর্তীকালে দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ সমাজের সমীকরণ হইয়াছে। আদিশূরের সময় গৌতম গোত্রীয় দশরথ বসু, সৌকালীন গৌত্রীয় মকরন্দ ঘোষ, বিশ্বমিত্র গৌত্রীয় কালীদাস মিত্র পুরুষোত্তম দত্ত ও বিরাট গুহ পঞ্চ ব্রাহ্মণের সঙ্গে এদেশে আসেন। ইহাদের মধ্যে ঘোষ, বসু ও মিত্র দক্ষিণ রাঢ়ে কৌলিন্য পান এবং গুহ বঙ্গে কুলীন হইয়াছিলেন। দত্ত বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া ব্রাহ্মণের ভৃত্যত্ব অস্বীকার করেন। এজন্য তাহাকে কৌলিন্য

দেওয়া হয় নাই। এই গোত্রের অনেকেই উচ্চ রাজপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, সে জন্য কৌলিন্যের প্রতি তাহাদের কোন মোহ ছিল না। প্রবাদ আছে যে দত্ত বংশের নারায়ণ দত্ত স্বীয় গোত্রের মর্যাদা রক্ষার্থে স্বগর্বে ঘোষণা করিয়াছিলেন ঃ

"দত্ত কা'রো ভৃত্য নয়, শুন মহাশয়
সঙ্গে মাত্র আসিয়াছি এই পরিচয়।"

এবং এইজন্য ইহার উত্তরে বলা হইয়াছে ঃ—

"ঘোষ বসু মিত্র কুলের অধিকারী
অভিমানে বালির দত্ত যান গড়াগড়ি।"

ঘোষ, বসু, মিত্র ব্যতীত দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থদের সকলেই মৌলিক। ইহারা সিদ্ধ এবং সাধ্য — দুই ভাগে বিভক্ত। দেব, দত্ত, কর, পালিত, সেন, সিংহ, দাস এবং গুহ — ইহারা সিদ্ধ মৌলিক বা আটঘরে কায়স্থ। আদিত্য, চন্দ্র, সোম, রাহা, নাগ, বিষ্ণু, ব্রহ্মা প্রভৃতি ৭২ ঘর সাধ্য মৌলিক এবং উহাদের অন্য নাম "বাহাত্তরে" কায়স্থ। কুলীনেরা অনেক সময় ঘোষ ঠাকুর, বসু ঠাকুর ইত্যাদি উপাধি গ্রহণ করিতেন। পূর্বোক্ত পঞ্চ কায়স্থের ছয়জন বংশধর মুখ্য কুলীন আখ্যা পায় এবং তাহাদের সন্তান সন্ততি নয় শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। ইহাকে নবরঙ্গ কুল বলে। ইহাদের মধ্যে পাঁচটি মূল ও চারটি শাখাকুল। মুখ্য কুলীনেরা আবার তিনভাগে বিভক্ত — প্রকৃত, সহজ ও কোমল। বঙ্গজ কায়স্থগণের মধ্যে বসু, ঘোষ ও গুহ এই তিনজন কুলীন। অবশিষ্ট সকলেই মৌলিক। কুলভঙ্গ হইলে তাহাকে কুলজ বা বংশজ বলা হয়।

ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেন যে পূর্বে জাতিভেদ প্রথা ছিল এবং এদেশের সকলেই নিম্ন শ্রেণীর লোক ছিল। ইহাদের মধ্যে তাতী, গন্ধবণিক, নাপিত, গোপ (লেখক),কর্মকার, তালিক (পান শুপারী বিক্রেতা), কুম্ভকার, কংশবণিক, শাঙ্খিরা (শাঁখারী) দাস (কৃষক), বারুজীবি,মোদক (মিষ্টান্নবিক্রেতা), মালাকার (পুষ্পবিক্রেতা), সুতার, রাজপুত এবং তাম্বুল উত্তম জাতীয় লোক। তক্ষন (সুতার মিস্ত্রী), রজক, স্বর্ণকার, স্বর্ণবণিক, আভিরা (গোয়ালা), তৈল-কারক, ধীবর, শাণ্ডিকা (মদ্য ব্যবসায়ী), নাট (নর্তকী), শবর বা শবরা, ছেকরা, জালিক (জেলে) মধ্যম জাতিভুক্ত। মালেকরাহী (মাল) কুধবা, চণ্ডাল, বরুদা,

বাউরী), তক্ষা (সুতার), কর্মকার, ঘাটজীবি (পাটনী), দোলবাহী (বেহারা), মাল্লা (মালো), অধম জাতীয় লোক বলিয়া পরিগণিত ছিল।

বল্লাল সেন অন্যান্য জাতিদের লইয়াও আভিজাত্যের মান নির্ণয় করেন।

"গোপীমালী তথা তৈলী তন্ত্রী মোদক বারুজী
কুলালঃ কর্মকারশ্চ নাপিতো নবশায়কাঃ"

(পরাশর সংহিতা)

"গোপমালী চ তাম্বূলী কাংসার তন্ত্রী শাঙ্খিকাঃ।
কুলালঃ কর্মকারশ্চ নাপিতো নবশায়কাঃ ॥
তৈলিকো গান্ধীকো বৈদ্যঃ সৎ শূদ্রাশ্চ প্রকীর্তিতা।
সচ্ছূদ্রা নাস্তো সর্ব্বেসাং কায়স্থ উত্তমঃ স্মৃতঃ ॥"

(বল্লাল চরিত)

প্রথম দুই পঙ্‌ক্তির বঙ্গানুবাদ নিম্নে দেওয়া হইল :—

"তিলীমালী তাম্বূলী, গোপ নাপিত গোছালী
কামার কুমার পুঁটুলি, এই নব শাখাবলী।"

গোয়ালা মালাকর, তিলী, তাম্বুল ব্যবসায়ী বা বারুজীবি, তন্তুবায়, নাপিত' মোদক, কুরী, কর্মকার, কুম্ভকার, শঙ্খবণিক (শাঁখারী) কংস বণিক (কাঁশারী ও গন্ধবণিক প্রভৃতি জাতি এই নয় শাখার অন্তর্গত। ইহাদের জল আচরণীয় এবং উহারা বশ্য হইতে উদ্ভূত। গোছালী বারুজীবিদের আর এক নাম। যাহারা বরজ প্রস্তুত করিয়া পান উৎপন্ন করে তাহাদিগকে বরজিয়া বা বারুজীবি বলা হয়। আর যাহারা সেই পান বিক্রয় করে তাহাদিগকে তাম্বুলী বলা হয়। যাহারা নিজেদের প্রস্তুত দ্রব্যাদি পুঁটলি বা পোটলা বাঁধিয়া বিক্রয় করিত, তাহারা পুঁটুলি বলিয়া পরিচিত। শাঁখারী, কাঁসারী গন্ধবণিক ও ময়রা এই শ্রেণীভুক্ত।

বল্লাল সেন যোগীদের প্রতি রুষ্ট হইয়া তাহাদের উপর যথেষ্ট অত্যাচার করেন। তিনি কৈবর্তদিগকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেন — দাস ও নাবিক।

দাস বা কৃষি ব্যবসায়ীরা চাষের কার্য করিত এবং নাবিক বা মৎস্য ব্যবসায়ীরা (ধীবর বা মালো) মৎস্য ধরিয়া জীবন ধারণ করে। উহারা চণ্ডাল জাতীয় মৎস্য ব্যবসায়ী হইতে পৃথক।

উপরে বর্ণিত বল্লালী কৌলিন্য ও তৎকালীন হিন্দু আভিজাত্য বা সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস প্রণেতা নগেন্দ্রনাথ বসু বলিয়াছেন: "বঙ্গের কতিপয় পণ্ডিত কুলজী ইতিহাসের সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা ইহার কোন ব্যাখ্যা প্রকাশ করেন নাই। ডক্টর রমেশ চন্দ্র মজুমদার কুলজী ইতিহাসকে একরূপ অবিশ্বাস করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন যে মুলোপঞ্চালনের গোষ্ঠি কথা, হরি মিশ্রের কারিকা, ধনঞ্জয়ের কুল প্রদীপ, এড়োমিশ্র, কুলপঞ্জিকা প্রভৃতি কুলজী সাহিত্যের বিষয়বস্তু সঠিক নহে। কুলজী সাহিত্যের অধিকাংশই পাণ্ডুলিপি আকারে থাকায় উহা একরূপ দুষ্প্রাপ্য এবং উহা ইচ্ছাকৃতভাবে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হইয়াছে। তিনি পঞ্চ ব্রাহ্মণের আখ্যানকেও অনৈতিহাসিক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কুলজী সাহিত্যে অবশ্য তৎকালীন সামাজিক অবস্থা জ্ঞাত হওয়া যায়, কিন্তু উহাও অতিরঞ্জিত। কয়েকটি নামকরা বংশীয় কুলজী সঠিক এবং অধিকাংশই ভ্রমপূর্ণ। ডঃ মজুমদার এতদূর বলিয়াছেন যে বঙ্গের ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ কান্যকুব্জগোত্র নহে।

এইক্ষণ আমাদের বিচার্য — নমশূদ্র বা পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয়দের সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা বল্লাল বা তৎপুত্র লক্ষ্মণ সেন গ্রহণ করিয়াছিলেন কিনা? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া শক্ত, তবুও আমরা উহার সমাধান করিবার চেষ্টা করিব।

নমশূদ্র ও পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয়গণ এ দেশের আদিম অধিবাসী। ইহারা কেহ কেহ আর্য সম্প্রদায় হইতে উদ্ভূত বলিয়া দাবী করিয়া থাকে। কিন্তু হিন্দু শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করিলে ইহাই প্রতীত হয় যে, উত্তর পশ্চিম এশিয়া হইতে আর্যগণ এদেশে আগমন করিবার পূর্ব হইতেই নমশূদ্র ও পৌণ্ড্র জাতি বসবাস করিত। শূদ্রগণ উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুর নিকট অস্পৃশ্য এবং এই অস্পৃশ্যতাই বিরাট হিন্দু সমাজকে দুর্বল ও পঙ্গু করিয়া ফেলিয়াছে। মহাত্মা গান্ধী শূদ্র ও অন্যান্য অস্পৃশ্য জাতিকে হরিজন আখ্যা দিয়াছেন এবং অস্পৃশ্যতা দূরীকরণার্থে তিনি আজীবন সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন। হিন্দু সমাজ ব্যবস্থায় যে ভেদনীতি মজ্জাগত হইয়া

গিয়াছে, তাহা দেশের অকল্যানই সাধন করিয়াছে, সে বিষয় কোন মতভেদ থাকিতে পারে না। সৃষ্টি কর্তার সৃষ্ট মানব পরস্পর ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ হওয়াই স্বভাবধর্ম। উহার ব্যতিক্রম যে কোন অবস্থায় বরদাস্ত করা উচিত নহে। বল্লালের কৌলিন্য প্রথা দেশমধ্যে আপত্তিকর ভেদনীতি প্রবর্তন করিয়া হিন্দু সমাজের সর্বনাশ সাধন করিরাছে। অনেক সময় দেখা যায় জাতীয় স্বার্থ অপেক্ষা এই কৌলিন্যকেই লোকে অগ্রাধিকার দিয়া থাকে। সৎকর্ম ও মানব জাতির কল্যাণের চিন্তা না করিয়া কে বড় কে ছোট এই সব ব্যাপার লইয়া সময় নষ্ট করা হয়। এই ভেদনীতির ফলে এবং আত্মকলহের জন্য এদেশে মুসলমান শাসনের সুফল ফলিয়াছিল। এক শ্রেণীর হিন্দুকে যেমন তথাকথিত কুলীন সমাজ ঘৃণার চক্ষে দেখিত তদ্রুপ মুসলমান ধর্মকেও তাহারা সুনজরে দেখে নাই। মুসলমান দিগকে যবন, ম্লেচ্ছ প্রভৃতি আখ্যায় আখ্যায়িত করা হইয়াছে। হিন্দু মুসলমানদের এই ভেদনীতি ইংরেজ শাসনের সহায়ক হইয়াছিল। অন্তরে মুসলিম বিদ্বেষ থাকিলেও হিন্দু সমাজের সেরা ব্যক্তিগণ মুসলমান বাদশাহ্ ও নবাবগণের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করিয়া নিজদিগকে ধন্য মনে করিতেন। বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ লেখকগণের মুসলীম বিদ্বেষমূলক উক্তি সমূহ মূলতঃ পাকিস্তান সৃষ্টির অন্যতম কারণ। বহু প্রবীণ, সম্ভ্রান্ত ও উচ্চ শিক্ষিত হিন্দু একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে হিন্দু সমাজের মুসলীম বিদ্বেষের কারণ পাকিস্তান আন্দোলনের বিশেষ সহায়ক হইয়াছিল।

নমশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় এই দুইটি শক্তিকে দূরে রাখিয়া হিন্দু সমাজ মারাত্মক ভুল করিয়াছে। প্রবাদ আছে যে বল্লাল সেন কৌলিন্য বিতরণের সময় এই দুই জাতিকে আহ্বান করিয়াছিলেন। এই জাতীয় লোকেরা সম্ভবতঃ বল্লালের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া তাঁহার সহিত অসহযোগিতা আরম্ভ করে। ফলে এই দুই সমাজের লোকেরা গৌড়মণ্ডল হইতে সরিয়া পড়ে। সেন আমলে পৌণ্ড্র বা পোদ সম্প্রদায়ের লোকেরা বর্তমান উত্তর বঙ্গেই বাস করিত বলিয়া মনে হয়, কারণ ঐ অঞ্চল এক সময় পৌণ্ড্র নামে অভিহিত ছিল। পৌণ্ড্রক শব্দ হইতেই পৌণ্ড্র এবং উহা হইতে পোদ নাম দাঁড়াইয়াছে। হিন্দু শাস্ত্রে আর্য পৌণ্ড্র ও অনার্য পৌণ্ড্র দুইটি শ্রেণী বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়।

"শ্রী ধর্মমঙ্গল" বাংলা কাব্যের গ্রন্থকার গণরাম চক্রবর্ত্তী তদীয় গ্রন্থে বলিয়াছেন :—

"করিয়া আসন গড়িল নিশান,
সম্মানে বসান পদ্ম।
স্বধর্ম মণ্ডিত বিধর্ম খণ্ডিত
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বৈদ্য ॥

ষোড়শ শতাব্দীর রচনা এই কাব্য। প্রবাসী ও সাপ্তাহিক 'বঙ্গবাসী' পত্রিকা পদ্মকে পোদ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে এবং উহাদিগকে আর্য পৌণ্ড্রক (Aryan Poundrakas) বলিয়া অভিহিত করিয়াছে। The cultivating Pods পুস্তকের লেখক শ্রী মহেন্দ্রনাথ করণ বলেন যে, পোদেরা ম্লেচ্ছ বা অন্ত্যজ জাতি হইতে উদ্ভূত নহে। ব্যাস মুনি লিখিত ব্যাসসংহিতা গ্রন্থের ১০—১২ শ্লোকে আছে ঃ—

"বর্দ্ধকী নাপিতো গোপ আশাপঃ কুম্ভকারকঃ
বণিক-কিরাত কায়স্থ-মালাকার কুটুম্বিনঃ।
বরটো মেদ-চণ্ডাল দাস শ্বপচ কোলকা ॥"

অর্থাৎ নাপিত, গোপ, কায়স্থ, আশাপ, কুম্ভকার, বণিক, কিরাত, মালাকার, কুটুম্বি, শপচ, চণ্ডাল, মেদস প্রভৃতি অন্ত্যজ বা নিম্ন শ্রেণীর মিশ্রিত জাতি। উক্ত শ্লোকের শেষদিকে আরও আছে যে এই সমস্ত জাতির কাহাকেও দর্শন করিলে সূর্য দর্শনে শুদ্ধ হইতে হইবে এবং স্পর্শ করিলে স্নান করিতে হইবে।

অগ্নিপুরাণে কায়স্থদের লিপিকার বলা হইয়াছে। পৌণ্ড্র জাতি দাবি করে যে এই তালিকায় তাহাদের নাম না থাকায় প্রমাণিত হয় যে তাহারা নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু নহে। মহাভারতের আদি ও শান্তি পর্বে এবং শ্রীমদ্ভগবতে অনার্য পৌণ্ড্রদের উল্লেখ আছে। মহেন্দ্রনাথ করণ বলেন যে এই অনার্য পৌণ্ড্রগণ দক্ষিণ ভারতের অধিবাসী এবং উহারা অন্ধ্র ও পুলিন্দ্র প্রভৃতি নামে অভিহিত হয়। এদেশে পৌণ্ড্রগণ রাঢ়ী ও দক্ষিণ রাঢ়ী, বঙ্গজ ও ওড্র এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। বিগত সমস্ত আদমশুমারীতে পৌণ্ড্রদিগকে তপশিলী বা অনুন্নত হিন্দু বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। মহেন্দ্র বাবু বলেন যে আর্য পৌণ্ড্রগণ পরশুরামের অত্যাচারে ভীত হইয়া আত্মগোপন করিয়া থাকে এবং

ক্রমে ক্রমে তাহারা ধর্মকর্ম ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। অতঃপর বৌদ্ধ ধর্ম প্রসারের সময় তাহারা সকলেই ঐ ধর্ম গ্রহণ করে। পুনরায় হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করিয়া তাহারা ব্রাহ্মণদের কোপানলে পতিত হয় এবং শূদ্র জাতির ন্যায় ব্যবহার পাইতে থাকে। এই সময় পৌণ্ড্রগণ ব্রাত্যক্ষত্রিয় নামে অভিহিত হয়। পৌণ্ড্রদের পুলিন্দ বলিলে ভুল করা হইবে। পুলিন্দ জাতির লোকেরা পালকীর উড়িয়া বেহারা ও কুলীদের ন্যায় এদেশে আসিয়া পূজা পার্বণে ঢোল বাজাইত। কবি কঙ্কণ মুকুন্দরাম তদীয় চণ্ডিতে বলিয়াছেন :

"পুলিন্দ কিরাত কোল
হাটেতে বাজায় ঢোল।"

ঐ যুগে পুলিন্দ, কিরাত এবং কোলগণ হাটে বাজারে ঢোল বাজাইয়া জীবিকা উপার্জন করিত। কিন্তু পৌণ্ড্র বা পোদ সমাজের কাহাকেও ঐ ধরণের ব্যবসায় করিতে কোন দিন দেখা বা শুনা যায় নাই। বর্তমানেও উহার কোনরূপ চিহ্ন পোদদের মধ্যে কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না। আদিকাল হইতেই তাহাদের একমাত্র ব্যবসায় কৃষি এবং বর্তমানে কৃষিকার্যই এ জাতির প্রধান ব্যবসায়। রামেশ্বর ভট্টাচার্য প্রণীত "শিব সংকীর্তনে" পার্বতী কর্তৃক ভূমি কর্ষনের জন্য অনুরুদ্ধ হইয়া শিব বলিতেছেন :

"বল বিলক্ষণ কিন্তু শুন শৈলসূতা
দেবতার পোদ বৃত্তি বড়ই লঘুতা ॥
ভিক্ষা দুঃখে সুখে আছি আকিঞ্চন পণে
চাষ চষে বিস্তর উদ্বেগ পাব মনে ॥
শুনিতে সুন্দর চাষ আয়াস বিস্তর
সকল সম্পূর্ণ যার নাহি তার ডর ॥"

ইহাতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে পোদগণের চিরাচরিত পেশা কৃষিকার্য। পুরাকালে এই কার্য বিশেষ সম্মানিত ছিল। বর্তমানে অন্যায় ভাবে কৃষক বা চাষাকে কেহ কেহ তাচ্ছিল্য করিয়া থাকে। আর্যগণ কৃষিকার্যের জন্য সমাজে বিশেষ আদৃত হয়। আর্য শব্দের অর্থ কৃষক।

বাংলার পুরাবৃত্ত গ্রন্থে আছে, "পালি শব্দ পুলিন্দ শব্দের অপভ্রংশ বলিয়া বোধ হয়।" সাওতাল পরগণার মারপালি, কুমারপালি, ধাঙ্গড়পালি এবং কোচ জাতীয় লোকেরা পুলিন্দ ব' পালি শ্রেণীভুক্ত। অতএব পোদগণ যে পুলিন্দ নহে তাহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পাবে।

উচ্চ শ্রেণীর শূদ্রদেব আচার ব্যবহার ধর্মনীতি ও সমাজ ব্যবস্থার সহিত পোদ সমাজের বিশেষ মিল দেখিতে পাওয়া যায়। কেবল মাত্র চড়কপূজা ও উপনয়ন গ্রহণে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। পৌণ্ড্রগণ দ্রাবিড়, যবন, পল্লব, কিরাত প্রভৃতি সকলেই ক্ষত্রিয় জাতির অন্তর্ভুক্ত। ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক ধর্মকর্ম না করাইবার জন্যই এ সমস্ত জাতির লোকেরা শূদ্রের পর্যায়ে পরিগণিত হয়। মহাভারতের অনুশাসন পর্বে বর্ণিত আছে ;

"মেকলা দ্রবিড়া লাটাঃ পৌণ্ড্রা কোণ্ব শিরাস্তথা।
শৌণ্ডিকা দরদা দার্বাশ্চৌরাঃ শবরা বর্বরা॥
কিরাত যবনাশ্চৈব তাস্তা ক্ষত্রিয় জাতঃ।
বৃষলত্ব মনুপ্রাপ্তা ব্রাহ্মণা না মমর্ষনাৎ॥"

বঙ্গানুবাদ ঃ— মেকল, দ্রাবিড়, লাট, পৌণ্ড্রা, কাণ্বাশিরা, শৌণ্ডিকা, দরদ, শবর, বর্বর, কিরাত, যবন প্রভৃতি জাতি প্রথমে সকলেই ক্ষত্রিয় শ্রেণীভুক্ত ছিল। পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণ বর্জিত দেশে বসবাস করার জন্য আচার ভ্রষ্ট হওয়ায় তাহারা শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

যাহা হউক এই পৌণ্ড্র ও শূদ্রগণ বল্লালী অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন তাহারা বিদ্রোহ করিয়া রাজধানীর পার্শ্ববর্তী স্থান ত্যাগ করিয়া জঙ্গলে পলায়ন করিয়াছিল এবং অনেকেই সুন্দরবনে বসতি গড়িয়া তুলিয়াছিল। সেন রাজগণের প্রতিপত্তি ছিল পূর্ব ও উত্তর বঙ্গে। গৌড় ও রামপালেই তাহাদের আধিপত্য প্রবল ছিল। শূদ্র ও পোদগণ এ দেশের আদিম অধিবাসী হইলেও পরে প্রায় সকলেই বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল। ঢাকা গেজেটিয়ার প্রণেতা মিঃ য়্যালেন বলেন যে উত্তরবঙ্গ হইতে পাল রাজগণকে বিতাড়িত করিয়া বিজয় সেন বঙ্গদেশ হইতে বৌদ্ধধর্মের শেষ চিহ্ন নির্মূল করিবার জন্য মারণাস্ত্র নিক্ষেপ করেন। তাহার সময় বৌদ্ধধর্মের নাম নিশানা

পর্যন্ত বঙ্গদেশ হইতে বিলুপ্ত হয়। সুন্দরবন অঞ্চলের লোকেরা এককালে যে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিল তাহা সহজেই অনুমেয়।

নমশূদ্র ও পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয়দের মধ্যে প্রবাদ বাক্যে জানা যায় যে এই দুই সমাজের লোকেরা হিন্দু রাজার নিকট মস্তক অবনত করে নাই। ইহার যথেষ্ট তাৎপর্য আছে বলিয়া মনে করি। গৌড় মণ্ডল বা উত্তর বঙ্গের কোথাও এই দুই জাতির বসতি নাই বলিলে চলে। দক্ষিণ বঙ্গের সর্বত্র বিশেষ করিয়া যশোর, খুলনা, ফরিদপুর ও বাকেরগঞ্জ জিলায় ইহাদের বসতি সর্বত্র বিদ্যমান। ফরিদপুর ও যশোরে পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় নাই বলিলেই চলে। খুলনা ও চব্বিশ পরগনায় ইহাদের সংখ্যা অত্যধিক। এই দুই জাতি এতদঞ্চল আবাদ করিয়া এবং বিল অঞ্চল উঁচু করিয়া বাসগৃহ নির্মাণ করত সুন্দর বসতি গড়িয়া তুলিয়াছিল। নমশূদ্র সমাজের মধ্যে ক্ষাত্র শক্তির প্রাবল্য দৃষ্ট হয়। পক্ষান্তরে পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় সমাজের লোকেরা অতীব নিরীহ। বল্লাল সেন ব্রাহ্মণ, কায়স্থ এবং অন্যান্য কয়েকটি জাতির মধ্যে কৌলিন্য প্রদান সীমাবদ্ধ রাখেন। উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুরা তখন দেশের সর্বেসর্বা ছিল। চরিত্রের সৎগুণরাজি, বিদ্যা ও বুদ্ধি এই কৌলিন্য দানের মাপকাঠি ছিল না। সেইজন্য অন্যান্য হিন্দুরাও এই কৌলিন্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছিল।

খৃঃ পূর্ব তৃতীয় শতকে মহারাজ অশোক কলিঙ্গ দেশ জয় করেন। এই সময় বঙ্গ ও উড়িষ্যায় বৌদ্ধধর্মের বিস্তারলাভ হইয়াছিল। বঙ্গে সর্বমোট ৩০০ বৌদ্ধ মন্দির, ৭০টি বিহার, ৮০০০ শ্রমণ ছিল বলিয়া জানা যায়। ব্রাহ্মণদের ন্যায় বৌদ্ধ ভিক্ষুরা রাজ পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিতেন। হুয়েনসাঙ কর্ণসুবর্ণের রাজধানীতে জাকজমকপূর্ণ বৌদ্ধকেন্দ্র পরিদর্শন করেন। তিনি তথায় রক্ত মৃত্তিকা (লো-টো-মো-চি) পরিদর্শন করিয়াছিলেন । বাংলার পুরাবৃত্ত নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে, "খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশে বৌদ্ধ ও জৈনদিগের প্রভাব অত্যন্ত প্রবল ছিল। "হুয়েনসাঙ" নামক পুস্তকে ওয়াটার্স সাহেব বলেন "পাল রাজগণ সকলেই বৌদ্ধ ছিলেন এবং তাহারা প্রত্যেকে বঙ্গে বৌদ্ধধর্মের বিস্তার সাধন করেন।" হুয়েনসাঙ কাজনগলায় (রাজমহল) ৬টি, উত্তর বঙ্গে (পৌণ্ড্রবর্ধন) কুড়িটি সংঘারাম এবং মহাযান ও

হীনযান সম্প্রদায়ের তিন সহস্র বৌদ্ধ পুরোহিত, সমতটে ৩০টি সংঘারাম এবং দুই হাজার বৌদ্ধ শ্রমণ, মহাস্তানে (বসু বিহার) ৭০০ শ্রমণ, সমতটে স্থবীর সম্প্রদায়ের ৩০টি সংঘারাম এবং ২০০ ভিক্ষু, তাম্রলিপ্তে দশটি এবং কর্ণ সুবর্ণে আরও দশটি সংঘারাম এবং ১০০০ শ্রমণ দেখিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত আর্যগণ মনে করিত যে এদেশে আসিলে তাহাদের ধর্মহানি ঘটিবে। তীর্থযাত্রা ব্যতীত "ম্লেচ্ছ দেশে" আগমন নিষিদ্ধ ছিল। হিন্দু শাস্ত্রে আছে যে বঙ্গ, কলিঙ্গ প্রভৃতি দেশে আসিলে যজ্ঞ বিশেষের অনুষ্ঠান দ্বারা পরিশুদ্ধি লাভ করিতে হয়। এই সমস্ত কারণে এদেশের পুরাকালীন অধিবাসীরা একযোগে বৌদ্ধধর্মই গ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়। পণ্ডিত আর, কে চক্রবর্তী তাঁহার প্রণীত "গৌড়ের ইতিহাস" পুস্তকে বলিয়াছেন: বৌদ্ধধর্মের প্রাদুর্ভাব সময়ে অনেক ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় বৌদ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন; পুনরায় হিন্দুধর্মের অভ্যুদয়কালে সেই ব্রাহ্মণ-বৌদ্ধ ক্ষত্রিয়-বৌদ্ধদের অনেকে পুনরায় হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিতে থাকেন। যাহারা প্রথমে হিন্দু আচার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে গুণবান ব্যক্তিগণ পূর্ব জাতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; সুচতুর ব্রাহ্মণেরা তাহাদের অনাদর করেন নাই। যাঁহারা পরে হিন্দু হইয়াছিলেন তাহারা আপনাদের পূর্ব জাতি অপেক্ষা নীচভাবে সমাজে পরিগৃহীত হইলেন।"

মুসলীম বিজয়ের প্রাক্-কালে বৌদ্ধদের মানসিক অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা বর্ণনা করিতে গিয়া শ্রী গোপাল হালদার বলিয়াছেন: "বৌদ্ধদের প্রতি ব্রাহ্মণেরা অত্যাচার করাতে নিরঞ্জন রুষ্ট হয়ে ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে দেবতাদের নিয়োজিত করলেন,— দেবতারা এলেন মুসলমান রূপে।" শূন্যপুরাণের কবি বৌদ্ধ —তিনি বলিয়াছেন যে তুর্ক আক্রমণের সময় বৌদ্ধরা হিন্দুদের দ্বারা নিপীড়ন হইত। হিন্দুরা তখন রাজার জাতি। সেইজন্য বিজয়ী তুর্ক যখন হিন্দুর দেব দেউলের উপর অত্যাচার চালাইত তখন এই বৌদ্ধ লেখক তাহাতে ন্যায়ের বিধানই অবলোকন করিতেছিলেন। "সমাজের মধ্যে ব্রাহ্মণ্যবাদী ও বৌদ্ধদের দ্বন্দ যে তুর্ক আক্রমণের পূর্বে তীব্র ছিল, তা একটা সামাজিক সত্য বলে স্বীকৃত।" গোপাল হালদার আরও বলিয়াছেন যে মুসলমান বিজয়ের ফলে শাসক ব্রাহ্মণ সমাজের অবস্থা ক্ষমতাচ্যুত হইবার পর

নিম্নবর্গের কাছাকাছি আসিয়া পড়িল। তাহারা নীচের তলার মানুষের লখিন্দর বেহুলা, কালকেতু ফুল্লরা, ধনপতি-খুল্লনা, চাষীদেবতা শিব, প্রণয়বিলাসী দেবতা শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি উপখ্যানের দিকে আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। অন্যদিকে নীচের তলার মানুষদের পক্ষেও ব্রাহ্মণদের সঙ্গে মেলা মেশার সুযোগ হইল। এই বর্ণসংযোগের ফলে বাঙলার বৌদ্ধধর্ম লোপ পাইল। বৌদ্ধরা হিন্দু সমাজের সঙ্গে মিশিয়া গেল। বর্মা আরাকানের প্রভাবে চট্টগ্রামে কিছু বৌদ্ধ রহিয়া গেল। ১৬শ শতকে নিত্যানন্দ অবশিষ্ঠ নেড়া-নেড়ীদেরও বৈষ্ণবমতে দীক্ষা দিয়াছিলেন।

মহামোহপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁহার "বঙ্গে বৌদ্ধধর্ম" পুস্তকে বলিয়াছেন, "এইরূপে বাংলার অর্ধেক বৌদ্ধ মুসলমান হইয়া গেল এবং অপর অর্ধেক ব্রাহ্মণের শরণাগত হইল। বৌদ্ধদিগের মধ্যে যাহারা তখন নিজের পায়ে দাঁড়াইবার চেষ্টা করিল— মুসলমান ও ব্রাহ্মণ উভয় পক্ষ হইতেই তখন তাহাদের উপর নির্যাতন উপস্থিত হইল; ব্রাহ্মণেরা তাহাদিগকে অনাচরণীয় করিয়া দিলেন। অর্থাৎ বাগ্‌দী, কৈবর্ত, কিরাতের মধ্যে ফেলিয়া দিলেন। আর মুসলমানেরা তাহাদের উপর নানারূপ দৌরাত্ম্য করিতে লাগিল।"

এখনও বাংলার হিন্দু সমাজের মধ্যে বৌদ্ধ সংস্কৃতির নিদর্শন বিদ্যমান আছে। অহিংসাপরায়ণ এবং নিরামিষভোজী হিন্দুগণ বৌদ্ধনীতিই অনুসরণ করিয়া থাকেন। চড়্‌ক ও নীলপূজা এবং শীতলা ও মনসাপূজা বৌদ্ধ আচার হইতে গৃহীত। নমশূদ্র জাতীয় ব্রাহ্মণ না হইলে চড়কপূজা হয় না। চৈত্র সংক্রান্তির সমস্ত আচরণই বৌদ্ধ ধর্মের পুরাতন পদ্ধতি হইতে গৃহীত। ধর্মদেবতা ও কালুরায় পরবর্তী তান্ত্রীক বৌদ্ধমতের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। উপরোক্ত আলোচনা হইতে ইহাই প্রতীত হয় যে হিন্দু রাজশক্তির অত্যাচারে এবং শাস্ত্রের কঠোর ব্যবস্থার ফলে এককালের বৌদ্ধ অধ্যুষিত দেশে হিন্দুধর্মের প্রভাব ও প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। জোরপূর্বক নিরীহ বৌদ্ধদিগকে হিন্দুধর্মে দীক্ষিত করত তাহাদিগকে অস্পৃশ্য করিয়া রাখা হইয়াছিল। হুয়েনসাঙের বিবরণী হইতে জানা যায় যে আর্যমঞ্জুশ্রী মুলকল্প বৌদ্ধধর্মের সর্বোৎকৃষ্ট এবং বিশ্বাসযোগ্য লিখিত দলিল। ইহাতে শশাঙ্ক কর্তৃক বৌদ্ধধর্মের প্রতি অমানুসিক অত্যাচারের কাহিনী

বর্ণিত আছে। আরও বর্ণিত আছে যে উক্ত অত্যাচারেব শাস্তিস্বরূপ শশাঙ্কের দুরারোগ্য ব্যাধি, যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু এবং নরকে তাঁহার স্থান হইবে। হুয়েনসাঙ আরও বলিয়াছেন যে বোধিদ্রুম উৎপাটনের সংবাদ শ্রবণে শশাঙ্ক ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া পড়েন। তাঁহাব দেহে তীব্র ক্ষতচিহ্ন সমূহ বহির্গত হয় এবং মাংস পচিয়া অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। শশাঙ্ক বৌদ্ধধর্মের নিধন কল্পে শুধু পাটলিপুত্রের বোধিদ্রুম উৎপাটন করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, উহার শিকড়, ডালপালা ছেদন কবত অবশিষ্ট সবকিছুই অগ্নিতে ভস্মীভূত করা হয়। বুদ্ধের মূর্তিব স্থানে শিবমূর্তি স্থাপন এবং প্রস্তব নির্মিত বুদ্ধের পদচিহ্ন গঙ্গায় নিক্ষিপ্ত হয়। ওয়াটার্স সাহেব বলেন যে শশাঙ্ক কুশিনগর বৌদ্ধবিহার হইতে বৌদ্ধদেব বহিষ্কার করিয়া দেন। বানভট্ট তাঁহাকে গৌড়-ভূজঙ্গ বলিয়া অভিহিত করিতে ছাড়েন নাই। সেনরাজগণেব সময় সহজপন্থী বৌদ্ধনাথেরা হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। নিম্নস্তরের হিন্দুবা ধর্মঠাকুরের পূজা দিত। কৃষ্ণদাস কবিবাজ বলেন যে চৈতন্যবাদ বৌদ্ধধর্মকে পরাজিত করে এবং বৌদ্ধগণ কৃষ্ণের বন্দনা করিত। নিত্যানন্দ একবার ক্রোধে অগ্নিশর্মা হইয়া বৌদ্ধধর্মের প্রতি নিদারুণ অত্যাচার করেন। বৈষ্ণব সমাজ বুদ্ধকে বিষ্ণুর নবম অবতার বলিতেন। বৌদ্ধধর্মেব ক্ষয়িষ্ণু অবস্থায় শুধু তান্ত্রিক মতাবলম্বীদের বিষয় চর্যা সঙ্গীতে পাওয়া যায়। ডক্টর তরফদাব বলেন যে চৈতন্য পববর্তী কালে তান্ত্রিক মতবাদীরা সহজীয়া বৈষ্ণব ধর্ম নামে পবিচিত হয়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ধর্মদেবতাব পূজারীদিগকে বৌদ্ধ শাখা বলিয়া মনে করেন। ধর্মমঙ্গল কাব্যে ধর্মঠাকুব বা ধর্মদেবতার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। অধ্যাপক সতীশচন্দ্র এ বিষয়ে কি বলিয়াছেন? তিনি হিন্দু সমাজের গোড়া ঐতিহাসিক শাস্ত্রী মহাশয়কে ছাড়াইয়া গিয়া বলিয়াছেন ঃ "বৌদ্ধদিগের উপর মুসলমানের অত্যাচাব অধিক পড়িয়াছিল। কতক নিহত হইত, কতক সর্বস্বান্ত হইয়া মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিত। এই ধর্মপূজক বৌদ্ধগণ পাঠানের হস্তে এমন ভাবে নির্যাতন ভোগ করিতেছিল যে অবশেষে তাহারা প্রাণের দায়ে পাঠানের পথাবলম্বন করিয়া তাহাদের যশোগান করিত। এমন কি তাহারা নবাগত যবনকে ধর্মাবতার বলিয়া গ্রহণ করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই।" তিনি বলিয়াছেন যে মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার বঙ্গ বিজয়ের পূর্বে মগধের মধ্যে

অবস্থিত ওদন্তপুরী বৌদ্ধমঠকে রাজধানী মনে করিয়া উহার ধ্বংশ সাধন করেন। তিনি আরও বলিয়াছেন, "এই তো মাত্র একটি বিহারের কথা, পাঠানেরা এমন যে কত বৌদ্ধমঠ ও সংঘারামের ধ্বংস সাধন করিয়াছিল, তাহার সংখ্যা নাই। যাহারা ব্রাহ্মণ ও রাজ সৈন্যে প্রভেদ বুঝিতে পারে না, বিদ্যা মন্দিরকে রাজপ্রাসাদ বলিয়া ভুল করে। অগ্রে রক্তস্রোত বহাইয়া পরে পরিচয় জিজ্ঞাসা করে; আলেকজান্দ্রিয়ার বিশ্ববিশ্রুত পুস্তকাগারের ধ্বংসকারী মুসলমানের বংশধরগণ ধর্ম প্লাবিত মগধ বঙ্গে আসিয়া কত স্থানে কত কি ভীষণ অত্যাচার করিয়াছিল তাহা বলিবার নহে। এই অত্যাচার যে ঐতিহাসিক সত্য তাহাতে সন্দেহ নাই।" মিথ্যা বা অতিরঞ্জিত বর্ণনার দ্বারা ইতিহাস রচিত হয় না। ইহাতে কলুষিত মনের উলঙ্গ ছবিই ধরা পড়ে। কোন কোন খৃষ্টান ঐতিহাসিক হযরত ওমরের নির্দেশে আলেকজান্দ্রিয়ার বিশ্ব বিশ্রুত লাইব্রেরী ধ্বংস করা হইয়াছিল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং হযরত ওমরের আদেশে সেনাপতি আমর কর্তৃক উহা দ্বারা দীর্ঘ ৬ মাস ধরিয়া জ্বালানীর কার্য করা হয়। কিন্তু উহা আদৌ সত্য নহে। বর্তমানে সমস্ত ঐতিহাসিকেরা একমত যে উক্ত লাইব্রেরী মুসলমান বিজয়ের ছয়শত বৎসর পূর্বে খৃষ্টপূর্ব আটচল্লিশ অব্দে রোম সম্রাট জুলিয়াস সিজার কর্তৃক ভস্মীভূত হইয়াছিল। এ সম্পর্কে বিখ্যাত ঐতিহাসিক ফিলিপ কে হিট্টি বলেন, "এইরূপ মিথ্যা কাহিনীর দ্বারা উপন্যাস লেখা যাইতে পারে। কিন্তু ইতিহাস লেখা অসম্ভব।" সতীশ বাবুর মুসলিম বিদ্বেষ তদীয় পুস্তকের যত্রতত্র পরিদৃষ্ট হয়। আমরা লেখনী কলঙ্কিত করিয়া ইতিহাস বিকৃত করিতে পারি না।

হিন্দুরাজগণ কর্তৃক নির্মমভাবে বৌদ্ধদের উপর জুলুম ও তাহাদের ধর্মাস্তিকরণ চাপা দেওয়ার জন্য সতীশ বাবু অন্যায় ভাবে মুসলমানদের উপর দোষারোপ করিয়াছেন। পক্ষান্তরে মিঃ মানবেন্দ্র নাথ রায় হ্যাভেল সাহেবের উক্তি তদীয় ইসলামের ঐতিহাসিক অবদান (Historical role of Islam) গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন, "ভারতবর্ষে ইসলামের বিজয় অভিযান বাইরের কারণ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর সমগ্র আর্যাবর্তে যে রাজনৈতিক অধঃপতন দেখা দেয় তা' তার জন্যই সম্ভব হয়েছিল। নবীর সমাজ

ব্যবস্থা প্রত্যেক মুসলমানকে দিয়েছে আত্মিক মর্যাদা, ইসলামকে করেছে রাজনীতির ও সমাজ নীতির মিলন ভূমি আর তাই দিয়েছে তাকে জগৎ শাসনের ভার ··· বৌদ্ধদর্শন ও ব্রাহ্মণ্য মতবাদের গোড়ামির সংঘর্ষ যখন উত্তর ভারতের একটা রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব বিক্ষোভকে সৃষ্টি করল সেই সঙ্কট কালেই ইসলাম সঞ্চয় করেছে তার চূড়ান্ত রাজনৈতিক শক্তি। শূদ্রকে এ দিয়েছে মুক্ত মানবের অধিকার আর দিয়েছে ব্রাহ্মণদের উপরেও প্রভুত্ব করার ক্ষমতা।" মিঃ রায় উপসংহারে বলিয়াছেন, "এইটুকু যোগ করিলেই হবে যে মুসলিম বিজয়ের দ্বারা, সমাজ দেহে যে আঘাত লাগলো তাতেই সম্ভব হলো কবির, নানক, তুকারাম ও চৈতন্য প্রমুখ সমাজ সংস্কারকের আবির্ভাব। আর অনেকটা তারই জন্য তাঁরা ব্রাহ্মণ্য গোড়ামির বিরুদ্ধে বহুজন সমর্থিত একটা বিপ্লবও দাঁড় করিয়ে দিয়ে গেলেন।"

বৌদ্ধধর্ম ও উহার বহু আচার পদ্ধতি এখনও এ দেশে প্রচলিত আছে। যোগী, কপালী প্রভৃতি জাতির লোকেরা বৌদ্ধ মতাবলম্বী ছিল বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয়গণও বৌদ্ধ ছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। সুবর্ণ বণিকদের ন্যায় যোগী জাতিকে বল্লালের কোপানলে পতিত হইতে হইয়াছিল। যোগীরা নাথ সম্প্রদায়ভুক্ত যোগী বা সন্ন্যাস মতাবলম্বী ছিল। ইহারা প্রকাশ্যভাবে বৌদ্ধ ছিল এবং জাতি বিচার জানিত না। বল্লাল তাহাদিগকে নির্যাতন করিয়া দেশ হইতে বিতাড়িত করেন। সুন্দরবন অঞ্চলে বর্তমানে বহু যোগী জাতির বসবাস আছে।

হুয়েন সাঙের পর সেঙ্গুচী নামক একজন চৈনিক পরিব্রাজক সমুদ্র পথে এ দেশে আগমন করেন। তিনি রাজভট নামক একজন রাজাকে রাজত্ব করিতে দেখিয়াছিলেন। তিনি অসংখ্য বৌদ্ধ মূর্তি নির্মাণ করেন। বুদ্ধদেবের সম্মানার্থে তিনি মধ্যে মধ্যে শোভাযাত্রা বাহির করিতেন। ইহার প্রায় ২৫ বৎসর পরে ইৎসিং নামক আর একজন পর্যাটক পাক ভারতে আসেন। তাঁহার বিবরণীতে জানা যায় যে হর্ষভট্ট নামক একজন রাজা ছিলেন। তিনি বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ও বৌদ্ধ জাতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহার সময় বৌদ্ধ প্রভাব এদেশে চরমে

পৌঁছিয়াছিল। এই সমস্ত ঐতিহাসিক তথ্য হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে সুন্দরবন অঞ্চলও বৌদ্ধ অধ্যুষিত দেশ ছিল এবং হিন্দু রাজশক্তির অত্যাচারে তাহারা স্বীয় ধর্ম ত্যাগ করিয়া হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

মুসলমানদের বঙ্গবিজয় ও তুর্ক-আফগান আমল

"মোহাম্মদ খিলজি"

।। চার ।।

মুসলমান আক্রমণের পূর্বে বঙ্গদেশ পাঁচভাগে বিভক্ত ছিল ঃ— (১) রাঢ় অঞ্চল — গঙ্গার দক্ষিণ ও হুগলী নদীর পশ্চিম ভাগ : (২) বাগড়ী— গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদীর বদ্বীপ (৩) বঙ্গ—বদ্বীপের পূর্বদিকের স্থান সমূহ ; (৪) বরেন্দ্র— গঙ্গা বা পদ্মার উত্তর, মহানন্দার পূর্ব এবং করতোয়া নদীর পশ্চিম দিক ; (৫) মিথিলা —মহানন্দর পশ্চিমদিকে অবস্থিত দেশ। মোহাম্মদ-বিন্-বখতিয়ার মিথিলার দক্ষিণ পূর্ব অংশ ; বরেন্দ্র, রাঢের উত্তর অঞ্চল এবং বাগড়ীর পশ্চিম-উত্তর দিকের জিলা সমূহ জয় করিয়াছিলেন। এই সুবিস্তীর্ণ অঞ্চল বহুদিন মুসলমানদের অধিকারে ছিল এবং তখন এই দেশ 'লক্ষ্মণাবতী' নামে অভিহিত হইত পরে বঙ্গ অর্থাৎ পূর্ববঙ্গ এবং রাঢ প্রদেশের দক্ষিণ অঞ্চল এবং ছোটনাগপুর ও ঝাড়খণ্ড মুসলীম অধিকারভুক্ত হয়।

এখন আমরা মুসলমানদের বঙ্গদেশ বিজয়ের কথা বর্ণনা করিব। বঙ্গ বিজয়ী বীরের নাম অধিকাংশ ঐতিহাসিক সঠিক ভাবে লিখিতে পারেন নাই। ইংরেজ আমলের প্রায় সমস্ত ইতিহাসে বঙ্গ বিজেতাকে বখ্‌তিয়ার খিলজি নামে অভিহিত করা হইয়াছে। অধ্যাপক সতীশচন্দ্র মোহাম্মদ-ই-বখতিয়ার এবং স্যার যদুনাথ সরকার মোহাম্মদ বখতিয়ার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ঐতিহাসিক রাখাল দাস ব্যানার্জী ইখ্‌তিয়ার উদ্দীন মোহাম্মদ বখ্‌তিয়ার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আমাদের দেশের অনেকেরই ধারনা এই বীরের নাম বখ্‌তিয়ার খিলজি। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সর্বপ্রথম বঙ্গ বিজয়ী আফগান বীরের পুর্ণ নাম হইতেছে মালিক ইখ্‌তিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বিন-বখ্‌তিয়ার খিলজী। তিনি বখ্‌তিয়ার খিলজীর পুত্র এবং আরবের চির প্রচলিত রীতি অনুসারে স্বীয় নামের সহিত পিতৃনাম যোগ করিয়াছেন। আমরা সংক্ষেপে তাঁহাকে মোহাম্মদ খিলজী বলিয়া বর্ণনা করিব।

পাক-ভারতের সর্বপ্রথম আক্রমণকারী গজনীর সুলতান মাহ্‌মুদ। সপ্তদশ বার তিনি এই দেশ আক্রমণ করেন। কিন্তু তাঁহার আক্রমণে উত্তর ভারতের অধিকাংশ স্থান মুসলীম অধিকারে আসে। তাঁহার সুযোগ্য সেনাপতি কুতুবউদ্দিন আইবেক ১১৯৩ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে দিল্লী জয় করিয়া তথায় রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি পাক ভারতে তুর্ক-আফগান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। বঙ্গ বিজয়ী বীর মোহাম্মদ খিলজী তাঁহারই অধীনস্থ সেনানায়ক। তিনি গজনী ও সিস্তানের মধ্যবর্তী—গরমশী অঞ্চলের খলজ্‌ জাতীয় আফ্‌গান। জীবিকা অর্জনের জন্য মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া গজ্‌নীতে মঈজুদ্দিন মোহাম্মদ-বিন-শামের নিকট আসিয়াছিলেন। গজনীর কর্মাধ্যক্ষ দেহের খর্বতার জন্য তাঁহাকে সৈন্য শ্রেণীভুক্ত করেন নাই। অতঃপর তিনি চাকুরীর উদ্দেশ্যে দিল্লী উপস্থিত হন এবং তথায় কোন সুবিধা না পাইয়া বদাউনে গমন করেন। সিপাহ্‌সালার ইজারুদ্দীন হাসান মোহাম্মদ খিলজীকে নাগাওয়ারের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। পরে তিনি বিহার ও মগধ জয় করিয়া বহু ধনরত্ন লাভ করেন এবং তথা হইতে পর বৎসর লক্ষ্মনাবতী আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। ইতিপূর্বে তিনি মগধের বৌদ্ধ সংস্কৃতি কেন্দ্র ওদন্ত-পুরি আক্রমন করিয়া তথা হইতে বহু মূল্যবান দ্রব্য আনিয়া সম্রাট কুতুবউদ্দীনকে উপঢৌকন প্রদান করেন।

দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে মোহাম্মদ খিলজী সপ্তদশ অশ্বারোহী সহ নদীয়া আক্রমণ করেন। এডওয়ার্ড টমাস্‌ নদীয়া আক্রমণের তারিখ ১২০২-১২০৩ খৃষ্টাব্দ এবং ষ্টুয়ার্ট ১২০৩-১২০৪ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মি: র‍্যাভার্টি ১১৯৩ এবং যদুনাথ সরকার ১২০১ খৃষ্টাব্দ স্থির করিয়াছেন। ব্লকম্যান বিশেষ বিবেচনার পর বঙ্গাধিকারের তারিখ ১১৯৭-১১৯৮ খৃষ্টাব্দ বলিয়া স্থির করিয়াছেন। বর্তমান সময়ের অধিকাংশ ঐতিহাসিক শেষোক্ত তারিখই সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। গৌড়ের শেষ হিন্দু নরপতি লক্ষ্মনসেন এই সময় নবদ্বীপ বা নদীয়ায় অবস্থান করিতেছিলেন। বিচক্ষণ সেনানায়ক বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে নদীয়া আক্রমণ সুবিধাজনক। নদীয়া ও সুরক্ষিত ছিল বলিয়া মনে হয় না। সম্ভবতঃ নদীয়া তখন দেশের

দ্বিতীয় বা উপরাজধানী ছিল। লক্ষ্মণসেনের বৃদ্ধাবস্থা এবং তাঁহার নদীয়ায় উপস্থিতির জন্য মুসলীম সেনাপতি গৌড় আক্রমণ না করিয়া নদীয়া আক্রমণ করেন। দেশ ব্যাপি এই সময় মৎস্য-ন্যায় বা অরাজকতা বিরাজ করিতেছিল। আশীতিপর বৃদ্ধ রাজা রাজ্যশাসনের অনুপযুক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। হিন্দু সমাজের কৌলিন্য প্রদানে দেশের অসংখ্য অধিবাসী সেন রাজত্বের বিরুদ্ধে ছিলেন। বৌদ্ধ ও হিন্দু সংঘর্ষের জের তখনও দেশ মধ্যে বিদ্যমান ছিল। সুশৃংখল শাসন পদ্ধতি দেশে বিদ্যমান ছিলনা বলিলেই চলে। রাজধানী গৌড় ভয়াবহ ষড়যন্ত্র ও অন্তর্বিরোধের লীলাক্ষেত্র ছিল। ষড়যন্ত্রকারীরা সম্ভবতঃ সেনাপতিকে পূর্ব হইতেই গোপনে এই আক্রমণের জন্য আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। জাতীয় অবনতি ও বিশ্বাসঘাতকতাই আক্রমণকারীদের মহাসুযোগ। আফ্গান সেনাপতি সেই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিতে বিন্দুমাত্র ত্রুটি করেন নাই। তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ছিল, শক্তিশালী সেনাদল ছিল এবং লক্ষ্মণ সেন ও তথা বঙ্গদেশের হাল হকিকত পূর্ব হইতেই বিস্তারিত জানা ছিল। ইখ্তিয়ার-উদ্দিন মোহম্মদ বিন-বখ্তিয়ার দেশের এই চরম দুর্দিনে সুশিক্ষিত ও সুদক্ষ একদল অশ্বারোহী সৈন্যদলসহ দ্রুতগতিতে নদীয়া সীমান্তে উপনীত হন। নদীয়া আক্রমণের সময় তাঁহার সহিত অষ্টাদশ অশ্বারোহীর অধিক সৈন্য ছিল না। ইহা স্যার উল্সে হেগের সুচিন্তিত অভিমত। তাঁহার অবশিষ্ট সৈন্যদল নদীয়া সীমান্তে অবস্থান করিতেছিল। লক্ষ্মণ সেন প্রথমে রাজধানী ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন নাই। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে এই ক্ষুদ্র অশ্বারোহীদল আক্রমণকারী নহে এবং তাহারা সম্ভবতঃ নদীয়া শহরের উপর দিয়া অন্যত্র প্রস্থান করিবে। সেইজন্য লক্ষ্মণ সেন তাহাদিগকে নগরাভ্যন্তরে প্রবেশের অনুমতি দিয়াছিলেন। কিন্তু এই ক্ষুদ্র সেনাদল রক্ষীদের ভূতলশায়ী করিয়া রাজপ্রাসাদের দ্বারে উপস্থিত হইয়াছিলেন। রাজা হিন্দুনীতি অনুসারে সামান্য পরিধেয় সহ অর্ধ উলঙ্গ অবস্থায় (Half naked state in which a Hindu of high caste is obliged to eat. – Camb. History of India) খাদ্য ভক্ষণ করিতেছিলেন এবং এই সময় অতর্কিত আক্রমণে ভীত হইয়া তিনি নৌকাযোগে নদীয়া ত্যাগ করেন। বিজয়োল্লাসের পর সৈন্যদল

বিশ্রাম করিতে করিতে তাহাদের অবশিষ্ট সৈন্য আসিয়া এই দলে যোগ দিলে নদীয়া লুণ্ঠিত হয়।

তবাকাত-ই-নাসিরীর লেখক মিনহজি-ই-সিরাজ তদীয় গ্রন্থে বঙ্গবিজয়ের ইতিহাস সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন। এই ইতিহাস বঙ্গবিজয়ের কিছুকাল পরেই লিখিত হয় এবং উহাই আমাদের প্রধান প্রমাণ্য গ্রন্থ। মিন্‌হাজ বলিয়াছেন, "মোহাম্মদ সৈন্য সামন্ত জঙ্গলে লুক্কায়িত রাখিয়া সপ্তদশ অশ্বারোহী সহ নদীয়া রাজধানীতে উপনীত হন। নগর-রক্ষীদের ধরাশায়ী করিয়া সেনাপতি রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করেন এবং তখন পশ্চাদ্‌ভাগ হইতে বৃদ্ধ রাজা 'লছমনিয়া' (লক্ষ্মণ সেন) পূর্ববঙ্গে বা জগন্নাথে পলায়ন করেন।" মিঃ ষ্টুয়ার্ট সপ্তদশ অশ্বারোহী, স্যার যদুনাথ সরকার উনবিংশ অশ্বারোহী এবং নদীয়া গেজেটিয়ার প্রণেতা মিঃ গ্যারেট অষ্টাদশ অশ্বারোহীর কথা উল্লেখ করিয়াছেন। "খিলজী সেনাপতির অকস্মাৎ আক্রমণেও অস্ত্রের ঝন্‌ঝনানীতে ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া লক্ষ্মণ সেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়েন। রাজা সমস্ত ধন-সম্পদ রাজ-কর্মচারী এবং সৈন্যসামন্ত নবদ্বীপে (নদীয়া) ফেলিয়া নগ্নপদে পশ্চাদ্দ্বার দিয়া নৌকাযোগে কামরূপের দিকে পলায়ন করেন।" (মিন্‌হাজ)

মনমোহন চক্রবর্তী কর্তৃক এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় বঙ্গবিজয়কে এক সন্দেহজনক অধ্যায় বলিয়া আখ্যায়িত করা হইয়াছে। তিনি উক্ত ঘটনাকে অতিরঞ্জিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অধ্যাপক সতীশচন্দ্র বলেন, "...কিন্তু এ অলৌকিক দিগ্বীজয় কাহিনী বিশ্বাসযোগ্য নহে —।" বঙ্কিমচন্দ্র অভিশাপ দিয়া বলিয়াছেন — "সপ্তদশ অশ্বারোহী লইয়া বখ্‌তিয়ার খিল্‌জী বাংলা জয় করিয়াছিলেন, একথা যে বাঙ্গালীতে বিশ্বাস করে, সে কুলাঙ্গার।" প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক রাখাল দাস বন্দোপাধ্যায় বা অন্য কেহ এই ধরণের বিরূপ সমালোচনা করেন নাই। নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক ও সমসাময়িক গ্রন্থের সারাংশ লইয়া আমরা নদীয়ার বিজয় কাহিনী বর্ণনা করিয়াছি। দেশের আভ্যন্তরীণ দুরবস্থা, আত্মকলহ, হিংসাবিদ্বেষ, রাজার বৃদ্ধাবস্থা, অমাত্যবর্গের ষড়যন্ত্র প্রভৃতি ঘটনাচক্র ইহাই প্রমাণ করিয়া দেয় যে খিল্‌জী সেনাপতির পক্ষে সপ্তদশ অশ্বারোহী দ্বারা নদীয়া জয় করা খুবই স্বাভাবিক এবং উহা অতি সহজেই

সম্ভবপর হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র এবং অধ্যাপক সতীশচন্দ্র প্রমুখ লেখকের উক্তি আবেগ বা উচ্ছ্বাস ভিন্ন অন্য কিছু নহে। আবেগভরে কোন ঐতিহাসিক সত্য উড়াইয়া দিয়া লাভ কি ? আমরা ইহা দ্বারা অযথা তর্কের বেড়াজাল সৃষ্টি করিয়া কাহারও অন্তরে ব্যথা দিতে চাহি না।

কোন্ সময় কি ভাবে গৌড় বা লক্ষ্মণাবতী অধিকৃত হইয়াছিল, সে সম্পর্কে রাখাল বাবু বলেন: "মুসলমান ঐতিহাসিকগণ এই বিষয়ে নীরব। হিন্দুর রচিত ইতিহাস নাই এবং শিলালিপি ও তাম্রশাসনে এ বিষয়ের উল্লেখ নাই।" কেহ কেহ বলেন লক্ষ্মণসেনেব পুত্র কেশব সেন গৌড় হইতে দুই বৎসর কাল যুদ্ধ চালাইয়া শেষ দিকে পূর্ববঙ্গে পলায়ন কবেন এবং গৌড় মুসলমানদের অধিকারে আসে। কিন্তু এ বিষয়ের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। কেম্ব্রিজ ইতিহাস লেখক বলেন যে নদীয়া বিজয়ের পব মোহাম্মদ বিন বখ্‌তিয়ার গৌড়ে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করেন এবং বঙ্গের শাসনকর্তারূপে তথায় স্কুল, কলেজ, সরাইখানা ও মস্‌জিদ নির্মাণ কবেন।

উপরোক্ত বর্ণনা ও আলোচনা হইতে ইহাই সপ্রমাণিত হয় যে মোহাম্মদ খিল্‌জী সপ্তদশ বা অষ্টাদশ অশ্বাবোহী সহ অকস্মাৎ আক্রমণ করত নদীয়া পদানত কবেন। এই ক্ষুদ্র সেনাদল তাঁহার মূল আক্রমণ বাহিনীর পূর্বে নদীয়া পৌঁছিয়াছিল সে বিষয় পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। বঙ্গ বিজয়ের গৌরব এই বীরগণেরই প্রাপ্য। সমস্ত নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক এ বিষয়ে একমত। অবশিষ্ট সেনাদল যাহারা পশ্চাদ্ভাগে ছিল, পূর্বোক্ত সৈন্যদের সহিত মিলিত হইয়া নদীয়া বিজয় পর্ব শেষ করে। ইহার অব্যবহিত পরে খিলজী সেনাপতি গৌড় অধিকার করিয়া তথায় রাজধানী স্থাপন করেন। তিনি পরে সিলেট, কামরূপ প্রভৃতি স্থান জয় করিয়াছিলেন। কিছুকাল পরে দেবকোটে তিনি দেহত্যাগ করেন এবং বিহারে সমাধিস্থ হন।

এই অলৌকিক বিজয় কাহিনী সম্পর্কে যাহারা সন্দিহান তাঁহারা ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়া এ বিষয় প্রণিধান করিলে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারিবেন। ঐতিহাসিকের কাছে কোন জাতিভেদ নাই; বিচারের নিক্তিতে তাঁহাকে প্রতিটি বিষয় যাচাই করিতে হইবে। স্বজাতির গৌরব-গাঁথার অতিরঞ্জন

এবং বিরুদ্ধ আদর্শ ভাবাপন্ন সমাজের সত্য তথ্য গোপনের স্থায় অপরাধ ঐতিহাসিকের পক্ষে গুরুতর। রমেশ চন্দ্র মজুমদার, এইচ, সি, রায় চৌধুরী এবং কালীকিঙ্কর দত্ত প্রণীত সম্প্রতি লণ্ডন হইতে প্রকাশিত ভারতের ইতিহাস (Advanced History of India) পুস্তকে লক্ষ্মণ সেনের পরাজয়ের বিষয় নিম্নোক্ত ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে, "সেন রাজগণ মুসলমান আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে অসমর্থ হন। রায় লক্ষ্মণীয়া বা লক্ষ্মণ সেন মালিক ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ খিলজীর প্রাথমিক আক্রমণে পলায়ন করিতে বাধ্য হন।" স্যার যদুনাথ সরকার ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তকে (History of Bengal; Vol. II) বলিয়াছেন, "১২০১ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে মোহাম্মদ বখতিয়ার একদল বিদেশী অশ্বারোহীসহ ঝাড়খণ্ডের জঙ্গল ও পর্বত অতিক্রম করিয়া নদীয়া শহরের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন। সংখ্যায় তাহারা উনিশ জন। এই যোদ্ধৃদল বণিকের বেশে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিল এবং বিনা বাধায় নগরাভ্যন্তরে প্রবেশ করতঃ প্রাসাদ দ্বারে অসি উন্মিলিত করে। মহারাজ লক্ষ্মণ সেন মধ্যাহ্ন ভোজনে রত ছিলেন, এমন সময় রাজপ্রাসাদের তোরণদ্বারে একটি ভীষণ শব্দ শ্রুত হয়। অবশিষ্ট সৈন্যগণ আসিয়া মালিক বখতিয়ারের সঙ্গে যোগদান করিলে নদীয়া বিজয় সুসম্পন্ন হয়।" ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার বাংলার ইতিহাসে প্রায় অনুরূপভাবে বলিয়াছেনঃ হিন্দু শক্তি ধ্বংসের প্রাক-কালে বখতিয়ার বঙ্গদেশ আক্রমণ করেন। লক্ষ্মণ সেনের রাজ্য রক্ষার কি ব্যবস্থা ছিল জানা যায় না। সম্ভবতঃ রাজমহল পাহাড়ের মধ্য দিয়া সৈন্য মোতায়েন ছিল। ঝাড়খণ্ডের মধ্য দিয়া বিপথে বখতিয়ার নদীয়ায় উপস্থিত হন। ব্যস্ততার জন্য তাঁহার সঙ্গে মাত্র ১৮ জন অশ্বারোহী ছিল। মোহাম্মদ ধীরে ধীরে রাজধানীতে উপস্থিত হন। ইতিমধ্যে অবশিষ্ট সৈন্য আসিয়া পড়ে এবং যুক্ত আক্রমণে নদীয়া বিজিত হয়। রাজপুরীর মধ্যে ভীষণ চীৎকারের শব্দ শ্রুত হয়। রাজা পূর্ববঙ্গে চলিয়া যান। বখতিয়ার বিনা বাধায় নদীয়া পদানত করেন।"

পরবর্তী শাসকগণ

তুর্ক আফ্‌গান আমলের প্রথম দিকে সুন্দরবন অঞ্চলে মুসলমানেরা আগমন করিয়াছিল কিনা জানা যায় না। বাগ্‌ড়ীর উত্তরাংশ বহুদিন ধরিয়া

মুসলীম অধিকারে ছিল। সম্ভবতঃ এই সময়ে সুন্দরবন প্রদেশে জলপ্লাবন ও নিমজ্জন হেতু বাগড়ীর দক্ষিণাংশের অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। কেহ কেহ অনুমান করেন যে কেশব সেন বা অন্য কেহ এতদঞ্চলে মুসলমানদের আড়ালে থাকিয়া রাজ্য শাসন করিতেন। মুসলমান অধিকারের পর উত্তরাঞ্চলে শাসনকার্য ভালভাবে চলিয়াছিল। কিন্তু দক্ষিণবঙ্গে বা সুন্দরবন প্রদেশে সর্বত্র অরাজকতা বিদ্যমান ছিল। ভয়াবহ হিংস্র জন্তুর উৎপাতও কম ছিল না। এই যুগ সন্ধিক্ষণে এতদঞ্চলের অধিবাসীরা বিশেষ কষ্টে কালাতিপাত করিয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়।

কোন কোন ঐতিহাসিক তুর্ক-আফ্গানদিগকে পাঠান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। 'পাঠান' শব্দটি এদেশে জনপ্রিয়তা অর্জন করিলেও উহা সঠিক নহে। তুর্ক-আফ্গান আমলে বঙ্গদেশ শাসনের এক সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আমরা এখানে দিতেছি। যদিও আমরা সমগ্র বঙ্গের ইতিহাস লিখিতেছি না, তথাপি আমাদের সুন্দরবন অঞ্চল প্রকৃত পক্ষে তৎকালীন বঙ্গদেশের একাংশ ছিল। সেজন্য উহার ইতিহাস ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সমগ্র বঙ্গের ইতিহাস মোটামুটি না জানিলে সুন্দরবন অঞ্চলের ইতিহাস হৃদয়ঙ্গম করা সুকঠিন। তদ্ব্যতীত বঙ্গের শ্রেষ্ঠ স্বাধীন নরপতি হোসেন শাহ্, তৎপুত্র নসরৎ শাহ্ এবং দনুজ মর্দন দেবের ইতিহাস বাকেরগঞ্জ ও যশোর খুলনার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত। সেজন্য আমরা পাঠক বর্গকে এক নজরে সমগ্র বঙ্গের ইতিহাসের দিকে লইয়া যাইতেছি। এই ইতিহাস যেমন যুদ্ধবিগ্রহে পূর্ণ তেমনই চিত্তাকর্ষক কাহিনীর সহিত জড়িত।

তবাকাত্-ই-আকবরী, তবাকাত্-ই-নাসিরী ও রিয়াজুস্ সালাতীন প্রভৃতি সমস্ত ঐতিহাসিক গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে মোহাম্মদ খিলজী গৌড়ের শাসরকর্তা হিসাবে নিজ নামে মুদ্রাঙ্কন করাইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর সম্রাট কুতুবউদ্দীন, আলীমর্দান খিল্জীকে লক্ষ্মণাবতীর শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সুলতানের মৃত্যুর পর আলীমর্দান স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়া সুলতান আলাউদ্দীন নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নিষ্ঠুর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া একদল খল্জ্ জাতীয় আমীর হাসাম-উদ্দীন ইয়জকে লক্ষ্মণাবতীর শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। তিনি স্বাধীনতা ঘোষনা করিয়া গিয়াসউদ্দীন নাম

ধারণ করেন এবং নির্বিবাদে প্রায় পঞ্চদশ বর্ষকাল রাজত্ব করেন। গিয়াসউদ্দীন প্রচুর উপঢৌকন দিয়া সুলতান ইলতুত্‌মিসের শুভেচ্ছা ও সমর্থন লাভ করিয়াছিলেন। গিয়াসউদ্দীন যুবরাজ নাসিরুদ্দীন কর্তৃক পরাজিত ও নিহত হন। গিয়াসউদ্দীনের সময় গঙ্গার পশ্চিমাংশ রাঢ় এবং পূর্বাংশ বরেন্দ্র নামে পরিচিত ছিল। তিনি গৌড় হইতে পশ্চিমে রাঢ় দেশে লখ্‌নৌর নগর এবং দেবকোট পর্যন্ত একটি প্রকাণ্ড রাজপথ নির্মাণ করিয়াছিলেন। মিন্‌হাজ বলেন, গিয়াসউদ্দীন প্রিয়দর্শন ও দয়ালু শাসনকর্তা ছিলেন এবং রাজ্যমধ্যে বহু মসজিদ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। তিনি অতিশয় দানশীল নরপতি ছিলেন এবং উলেমা ফকির ও সৈয়দদিগকে বৃত্তি দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্ব বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। রাজনগর (উড়িষ্যা), সুবর্ণগ্রাম (পূর্ববঙ্গ), কামরূপ ও তিব্বতের নরপতিরা তাহাকে কর প্রদান করিতেন।

যুবরাজ নাসিরুদ্দীনের অকস্মাৎ মৃত্যুতে তৎপুত্র ইখ্‌তিয়ার উদ্দীন বলাকা লক্ষ্মণাবতী অধিকার করেন। ইহার পর গৌড়ের সিংহাসনে বহু পরিবর্তন সাধিত হইয়া আলাউদ্দীন জানী কিছুদিন শাসন করিবার পর পদচ্যুত হন এবং সঈফ্‌উদ্দীন ইবক্ লক্ষ্মণাবতীর শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। সঈফ্‌উদ্দীনের মৃত্যুর পর মালিক ইজ্জুদ্দীন তোগ্রল তোঘান খাঁ লক্ষ্মণাবতীর শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। তিনি ৬৪১ হিঃ মওলানা মিনহাজ-উস-সিরাজকে সঙ্গে করিয়া জাজ্‌নগর আক্রমণ করত কটাসিনী দুর্গ অধিকার করেন। রিয়াজুস সালাতীনে বর্ণিত আছে যে ১২৪৪ খৃষ্টাব্দে মোঙ্গল সরদার চেঙ্গিস খাঁর ত্রিশ সহস্র সৈন্য লক্ষ্মণাবতী আক্রমণ করিয়াছিল। কিন্তু অন্যান্য ইতিহাস লেখক এ বিষয়ে নীরব। দাস বংশের রাজত্বকালে বহু ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহের মধ্যে গিয়াসউদ্দীন বলবান স্বীয় কনিষ্ঠ পুত্র নাসিরুদ্দীন বগ্‌ড়া খানকে লক্ষণাবতীর শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই সময় হইতে খিল্‌জী ও তোগলক বংশের রাজত্বকাল পর্যন্ত গৌড়ে প্রায়ই বিদ্রোহ লাগিয়া থাকিত। দিল্লীর সুলতানগণ তজ্জন্য সর্বদা ব্যতিব্যস্ত থাকিতেন। এজন্য গৌড়ের বদনাম হইয়াছিল বলগকপুর বা বিদ্রোহী নগর। মোবারক শাহের রাজত্বকালে উত্তর আফ্রিকার ট্যাঞ্জিয়ারের অধিবাসী সুপ্রসিদ্ধ দেশ পর্যটক ইব্‌নে-বতুত সপ্তগ্রামে আসিয়াছিলেন। তিনি এই আমলের

বিদ্রোহের বহু কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ইবনে বতুতা সুলতান মহম্মদ-বিন-তুগলকের অধীনে কাজী বা বিচারকের পদে সমাসীন ছিলেন। সুদীর্ঘ বত্রিশ বৎসর তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করেন এবং সর্বশুদ্ধ পচাত্তর হাজার মাইল পথ ভ্রমণ করিয়াছিলেন। এই ভ্রমণ বৃত্তান্ত 'রিহালা' নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্ত পাক-ভারত ইতিহাসের এক চিত্তাকর্ষক অধ্যায়।

ইলিয়াস শাহী বংশের অভ্যুত্থানের পূর্বে রোকন উদ্দিন কায়কাউস, সামসুদ্দিন ফিরোজ শাহ, শাহাবুদ্দিন, তদীয় ভ্রাতা গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর, বাহরাম খান, তাতার খান ও আলাউদ্দিন আলী শাহ পর্যায়ক্রমে গৌড়ের শাসনকর্তা ছিলেন।

"ইলিয়াস শাহী বংশ"

হাজী ইলিয়াস নামক জনৈক আমীর এই সময় গৌড় দরবারে উচ্চ রাজপদে সমাসীন ছিলেন। তিনি খোজাগণের সাহায্যে আলী শাহকে হত্যা করিয়া সামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ উপাধি গ্রহণ করিয়া গৌড়ের মসনদে আরোহণ করেন। তাঁহার সময় 'জাজ-নগর' ও 'সুবর্ণগ্রাম' গৌড়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং তিনি ধীরে ধীরে বারানসী পর্যন্ত স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। দিল্লীর সম্রাট ফিরোজ শাহ তোঘলোক সিংহাসনে আরোহণ করিবার এক বৎসর পরেই ইলিয়াস শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন। সম্রাট গৌড়ে পৌছিলে সামসুদ্দিন ইলিয়াস 'একডালা' দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ফিরোজ শাহ তাঁহাকে পরজিত করিয়া পাণ্ডুয়া অধিকার করত ইলিয়াস শাহের পুত্রকে বন্দী করিয়াছিলেন। বিশেষ চেষ্টা করিয়াও ফিরোজ তোঘলোক ইলিয়াস শাহকে বন্দী করিতে পারেন নাই। ফিরোজ শাহ প্রায় এক বৎসর গৌড় অভিযানে লিপ্ত থাকেন। কথিত আছে যে এই যুদ্ধে এক লক্ষ আশী হাজার সৈন্য নিহত হইয়াছিল। অতঃপর বর্ষা সমাগমে ফিরোজ সামসুদ্দীন ইলিয়াসের সঙ্গে সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ হন এবং সমস্ত বন্দীদের মুক্ত করিয়া দেন। ফিরোজ শাহ যে স্থানে শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন উহার নাম হয় ফিরোজপুরাবাদ। ফিরোজ শাহ অতঃপর

বাংলার স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। সামসুদ্দীন ইলিয়াস বঙ্গের স্বাধীন শ্রেষ্ঠতম নবপতি। তাঁহার তীক্ষ্মবুদ্ধি ও রণদক্ষতার জন্য তিনি বঙ্গদেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

ইলিয়াস শাহের মৃত্যুর পর তৎপুত্র সেকন্দর শাহ উপাধি গ্রহণ করিয়া সিংহাসন আরোহণ করেন। দ্বিতীয়বার দিল্লীর সম্রাট ফিরোজ গৌড় আক্রমণ করিলে সেকন্দাব পিতার ন্যায় 'একডালা' দুর্গ মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ কবেন। পরে উভয়ের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হইয়া সেকন্দাব সুবর্ণ গ্রামের রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তখন হইতেই ইলিয়াস শাহেব বংশধরেরা নির্বিবাদে বহুদিন যাবত বিস্তৃত গৌড় বঙ্গে রাজত্ব করিয়াছিলেন। সেকন্দার দিল্লীর সুলতানকে চল্লিশটি হস্তী ও অন্যান্য বহুমূল্য উপঢৌকন প্রদান করিয়াছিলেন। সেকন্দার শাহের আদেশে পাণ্ডুয়াব সুপ্রসিদ্ধ 'আদীনা মসজিদের' নির্মাণ কার্য আরম্ভ হয়। সম্ভাবতঃ সঈফ উদ্দীন হামজার সময় উহাব নির্মাণ কার্য সমাপ্ত হইয়াছিল। এই মসজিদের দৈর্ঘ পাঁচ শত ফুট এবং প্রস্থে তিনশত ফুট। এইরূপ বিশালকায় মসজিদ পাক-ভারত উপমহাদেশে আর নাই। সেকন্দার শাহ সপ্তগ্রামে, পূর্ববঙ্গের 'মোয়াজ্জামাবাদে' এব' কামরূপ প্রভৃতি স্থানে মুদ্রাঙ্কন করিয়াছিলেন। কামরূপের মুদ্রায় ইহার অপব নাম 'চাউলীস্থান (তণ্ডুলের দেশ) লিখিত আছে। তাঁহার সময় খ্যাতনামা দরবেশ শাহ জালাল সিলেটে শুভাগমন করেন। সমগ্র বঙ্গদেশের জরীপ কার্য, রাজস্ব নির্ণয় এবং রাজ্যে দৃঢ় শাসন প্রবর্তনে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। আজিও তাঁহার প্রবর্তিত মাপকাঠিকে 'সেকন্দারী গজ' বলা হয়। তিনি অতিশয় সাধু প্রকৃতির লোক এবং পাঁচ পীরের অন্যতম হিসাবে খ্যাতিলাভ করেন।

সেকন্দার শাহের মৃত্যুর পর তৎপুত্র গিয়াসউদ্দীন আযম শাহ গৌড় বঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ করেন। সেকন্দার শাহের দুই স্ত্রীর গর্ভে সতেরটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। প্রথম স্ত্রীর গর্ভে সতেরটি পুত্র এবং দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভে গিয়াসউদ্দীন জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ভ্রাতাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুণী-জ্ঞানী ছিলেন। প্রথম স্ত্রী স্বামীর নিকট গিয়াসউদ্দীনের বিরুদ্ধে এক গুরুতর অভিযোগ আনয়ন করিলে সেকন্দার তাহাকে 'বিশ্বাসঘাতিনী'ও অস্থিরমনা

নারী বলিয়া অভিযোগের উত্তর দেন। গিয়াসউদ্দীন বিমাতার ষড়যন্ত্রের কথা জানিতে পারিয়া পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং সোনারগাঁ হইতে পাণ্ডুয়া আক্রমণ করেন। সৈন্যগণ তাঁহার আদেশ অমান্য করিয়া সেকন্দরকে গুরুতরভাবে আহত করেন। গিয়াসউদ্দিন এই সংবাদ পাইয়া পিতৃ-চরণে লুণ্ঠিত হইয়া পড়েন এবং ক্ষমা ও স্নেহাশীষ লাভ করেন। কথিত আছে যে তিনি তাঁহার সমস্ত বৈমাত্রেয় ভ্রাতাদের চক্ষু উৎপাটিত করিয়া তাহাদের মাতার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। এ সব সত্ত্বেও তিনি সুবিচারক হিসাবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন।

গিয়াসউদ্দিন অতিশয় ধর্মভীরু রাজা ছিলেন। গোলাম হোসেন প্রণীত 'রিয়াজুস-সালাতীনে' তাঁহার ধর্মনিষ্ঠা ও ন্যায় বিচারের একটি চমৎপ্রদ কাহিনীর বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। সুলতান গিয়াসউদ্দিন একদা মৃগয়াকালে জনৈক বিধবার একমাত্র পুত্রকে শরবিদ্ধ করিয়া নিহত করেন। বিধবা কাজীর নিকট অভিযোগ করিলে তিনি আইন অনুযায়ী বাদশাহকে গ্রেফতার করার জন্য একজন পুলিশ কর্মচারী প্রেরণ করেন। বাদশাহের সাক্ষাৎ না পাইয়া কর্মচারী অসময়ে আজান দিয়া তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে সে এই সুযোগে বাদশাহের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিল, "বাদশাহ নামদার কাজীর হুকুম, অপরাধী হিসাবে আপনাকে ধরিয়া লইয়া যাইবার জন্য এই আদেশ পত্র।" কথিত আছে যে সুলতান স্বীয় বস্ত্রমধ্যে একটি ক্ষুদ্র তরবারি লুকাইয়া বিচারালয়ে উপস্থিত হন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল যে কাজী যদি বাদশাহের ভয়ে (বাদশাহের বিরুদ্ধে) সুবিচার করিতে ভীত হন, তবে সেই তরবারি দ্বারা কাজীর মস্তক ছেদন করিবেন। কাজীও মসনদের নিম্নে একটি চাবুক লুক্কায়িত অবস্থায় রাখিয়াছিলেন। কেহ যদি আইনের বিধান হইতে বিচলিত হয়, তাহাকে তিনি চাবুকের আঘাতে শায়েস্তা করিবেন। বাদশাহ কাজীর এহেন ন্যায় বিচার ও সাহসিকতায় যারপরনাই আনন্দিত হইয়াছিলেন। গিয়াসউদ্দিন বলিয়াছিলেন, "হে বিচারক! তুমি তোমার কর্তব্য সম্পাদন করিয়াছ। তুমি যদি বিচার কার্যে বিন্দুমাত্র অন্যায় করিতে, তবে এই তরবারির আঘাতে তোমার মস্তক ছেদন করিতাম।" কাজী তদুত্তরে বাদশাকে বলিলেন, "হে ন্যায়

বিচারক বাদশাহ ! আপনি বিচারকের আদেশ শিরোধার্য করিয়া আইনের মর্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। অন্যথায় এই চাবুকের দ্বারা আপনার পৃষ্ঠদেশে আঘাত হানিতাম।" কাজীর অসম সাহসিকতায় পরম পরিতুষ্ট হইয়া বাদশাহ তাহাকে বহু মূল্যবান পুরস্কার প্রদান করেন। স্যার উলসে হেগ এই ঘটনাকে ইংল্যাণ্ডের রাজা হেনরী ও বিচারক গ্যাস কুইনের কাহিনীর সহিত তুলনা করিয়াছেন। লাহোর হাইকোর্টের বিচারপতি মাননীয় মিঃ শব্বির আহম্মদ ও বিখ্যাত স্নেলসন মামলায় বিচারাসন হইতে তাঁহার রায়ে অনুরূপ একটি মন্তব্য করিয়াছিলেন।

গিয়াসউদ্দিন ইরাণের মহাকবি হাফিজের নিকট তাঁহার দরবারে উপস্থিত হইবার আমন্ত্রণ জানান। উত্তরে মরমী কবি হাফিজ একটি কবিতা লিখিয়া সুলতানের নিকট প্রেরণ করেন। ১৪০৮ খৃষ্টাব্দে চীন সম্রাট 'জুঙ্গলো' তাঁহার দরবারে রাজদূত প্রেরণ করেন।

গিয়াসউদ্দিন আযম শাহের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র সঈফউদ্দিন হামজা শাহ গৌড় বঙ্গের অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার উপাধি ছিল সুলতান-উস-সালাতীন বা রাজাধিরাজ। সঈফউদ্দিনের মৃত্যুর পর তৎপুত্র দ্বিতীয় সামসুদ্দিন কিছুকাল রাজত্ব করেন।

"হিন্দু শক্তির পুনরুত্থান"

ইলিয়াস শাহী বংশের পতনের পর পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জনৈক হিন্দু জমিদার গৌড় বঙ্গ অধিকার করিয়াছিলেন। ফার্সী ইতিহাসে তিনি কান্স বা কংশ এবং বাংলা ভাষায় রাজা গণেশ বলিয়া পরিচিত। গণেশ ভাতুরিয়া পরগণার রাজা বা জমিদার ছিলেন। তিনি বরেন্দ্র কুল শাস্ত্র অনুসারে ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং কায়স্থ কুল পঞ্জিকায় তাঁহাকে কায়স্থ বলা হইয়াছে। গণেশ পাণ্ডুয়ার খ্যাতনামা আউলিয়া সেখ নূর কুতুব-উল-আলমের একজন ভক্ত ছিলেন। তিনি আফগান আমীরদের জায়গীর ও উপযুক্ত ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে রাজা গণেশের চক্রান্তে গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ নিহত হইয়াছিলেন।

গণেশের মৃত্যুর পর তৎপুত্র যদু নুর-কুতুব-উল-আলমের নিকট ইস্‌লাম গ্রহণ পূর্বক জালালউদ্দীন মাহ্‌মুদ শাহ্‌ উপাধি গ্রহণ করিয়া গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তারিখ-ই-ফিরিশ্‌তা অনুসারে যদুর নাম ছিল জয়মল্ল বা জিৎ-মল্ল। গণেশ মুসলমানদের উপর যেরূপ অত্যাচার করিয়াছিলেন তদ্রূপভাবে যদু (জালাল উদ্দীন) হিন্দুদের উপর অত্যাচার করিয়া পিতৃ কার্যের প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজত্বের শেষ দিকে গণেশ মুসলমান ধর্মের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন। মৃত্যুর পর তাঁহাকে মুসলমান হিসাবে দাফন করা হইবে, না হিন্দুমতে শবদাহ করা হইবে তাহা লইয়া এক সমস্যা উপস্থিত হইয়াছিল।

জালালউদ্দীন ফিরোজাবাদ হইতে নিজ নামে মুদ্রাঙ্কন করাইয়াছিলেন। গণেশ গৌড় বঙ্গে হিন্দু-সংস্কৃতি ও বঙ্গ ভাষার উন্নতির সূচনা করিয়াছিলেন। গণেশও যদুর পর দনুজ মর্দন দেব ও মহেন্দ্র দেব হিন্দু সংস্কৃতির পুনর্জীবন দান করেন। পরবর্তী অধ্যায়ে দনুজ মর্দন দেব সম্পর্কে সবিস্তারে আলোচনা করা হইবে।

"ইলিয়াস শাহী বংশের পুনরুত্থান"

পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে হাজী ইলিয়াসের বংশধরগণ পুনরায় গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করেন। প্রায় অর্ধ শতাব্দী পর্যন্ত এই বংশের রাজত্ব চলিয়াছিল। এই সময় গৌড়ের দুর্গ এবং কতিপয় ইমারত নির্মিত হইয়াছিল। মুর্শিদাবাদে দুইটি মস্‌জিদ, গৌড়ের বিখ্যাত তাঁতিপাড়া ও লোটন মসজিদ, পাণ্ডুয়ার সোনা মসজিদ, সপ্ত গ্রামের তিনটি মস্‌জিদ এবং রাজ্যের সর্বত্র বহু সুরম্য হর্ম নির্মিত হইয়াছিল। ইলিয়াস শাহী বংশের মুদ্রায় মাহমুদাবাদ, ও ফতেহাবাদ (ফরিদপুর) নাম দেখা যায়। প্রথমোক্ত স্থান এখনো আবিষ্কৃত হয় নাই। রোকনউদ্দীন বরবক্‌শাহ এই বংশের খ্যাতনামা নৃপতি। তিনি সুবিচারক এবং সুপণ্ডিত ছিলেন। বরবক্‌শাহের রাজত্বকালে সুন্দরবন অঞ্চলে হিন্দুরাজগণের আধিপত্য লুপ্ত হইয়াছিল। চট্রগ্রাম তাঁহার রাজ্যের অধীন ছিল এবং কবি আলাওলের দরগায় আবিষ্কৃত একখানি শিলালিপিতে জানা যায়

যে ঐ সময় চট্টগ্রামে একটি মস্‌জিদ নির্মিত হইয়াছিল। বরবক শাহের পিতা সুলতান নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহের রাজত্বকালে খানজাহান আলী খলিফাতাবাদ শহরের প্রতিষ্ঠা করেন।

পিতার মৃত্যুর পর বরবক শাহের পুত্র সামসউদ্দীন ইউসুফ্‌ শাহ গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার রাজত্বকালে শ্রীহট্ট মুসলমানগণ কর্তৃক বিজিত হইয়াছিল। সিলেটের শেষ হিন্দু রাজা গৌড়গবিন্দ তাহার সময় বা তৎপূর্বে সেকন্দার শাহের রাজত্বকালে পরাজিত হইয়াছিলেন। সামসুদ্দীন ইউসুফ শাহের মৃত্যুর পর দ্বিতীয় সেকন্দার শাহ নামক ইলিয়াস শাহী বংশের এক ব্যক্তি গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন। দ্বিতীয় সেকন্দারের পর এই বংশের ফতে শাহ্‌ গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন।

ইলিয়াস শাহী বংশের রাজত্বকালে আফ্রিকা হইতে আনীত খোজা ক্রীতদাসগণ রাজ্যে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে। রাখালবাবু বলিয়াছেন, "অযথা হাব্‌সী-প্রীতি ইলিয়াস-শাহী বংশের অধঃপতনের একমাত্র কারণ।" হাবসীগণ অনেক সময় বাদশাহ অপেক্ষা অধিকতর পরাক্রান্ত হইয়া উঠিত। পর্দা প্রথা রক্ষার্থে এবং প্রাসাদ রক্ষী হিসাবে এই সমস্ত ক্লীব ক্রীতদাস আনীত হইয়াছিল। কিন্তু পরে ইহার বিষময় প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছিল। আহমদ শাহ্‌কে হত্যা করিয়া ক্রীতদাস নাসির খাঁ যখন গৌড়ের পবিত্র সিংহাসন কলঙ্কিত করিয়াছিল, তখন আমীর ওমরাহ ও সৈন্যগণ সেই দিবসই তাহার রক্তে গৌড়-সিংহাসনের কালিমা ধৌত করিয়াছিল। কিন্তু ফতেহ্‌ শাহ ক্রীতদাস কর্তৃক নিহত হইলে কেহই প্রতিবাদ করে নাই। এইভাবে কিছুদিন যাবত হাবসীদের রাজত্ব চলিয়াছিল। এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা মালিক আদিল-সুলতান সঈফ্‌উদ্দীন ফিরোজ শাহ্‌। তিনি সুবিচারক ও দানশীল ছিলেন। ফিরোজ শাহ্‌ গোড়নগরে একটি মস্‌জিদ, একটি দীঘি এবং একটি মীনার (ফিরোজ মীনার) নির্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পর আরও কয়েকজন হাবসী ক্রীতদাস রাজ্যারোহণ করেন। অবশেষে সিদী বদর দেওয়ানা সামসুদ্দীন মোজাফ্‌ফর শাহ উপাধি গ্রহণ করিয়া গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। এই সময় রাজ্য মধ্যে অরাজকতা বিস্তার লাভ করিয়াছিল। বহুদিন যাবত হাব্‌সী

শাসনে অমাত্যগণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। অতঃপর সামস্‌উদ্দীন মোজাফ্‌ফর শাহের মৃত্যুর পর গৌড়ের প্রধান অমাত্য ও সুধীবর্গ একত্রিত হইয়া মন্ত্রী প্রবর সৈয়দ হোসেনকে রাজ সিংহাসনে অভিসিক্ত করেন। ইলিয়াস শাহের পর ইনিই বাংলার শ্রেষ্ঠতম স্বাধীন সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহ্‌। এই বংশের ইতিবৃত্ত অন্যত্র বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হইবে।

গৌড়ের স্বাধীনতার শেষ পর্যায়

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে শের খান গৌড়ে ফরিদউদ্দীন আবুল মোজাফ্‌ফর শের শাহ্‌ উপাধি গ্রহণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি এক বৎসর গৌড়ে অবস্থান করিয়া বিশৃঙ্খল রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। শের শাহের গৌড় ত্যাগের পর বাংলা দেশ কয়েক খণ্ডে বিভক্ত হইয়া যায়। শের শাহের পুত্র ইস্‌লাম শাহের সময়ে মিয়া সোলেমান কর্‌রানি মগধের শাসনকর্তা ছিলেন। মোগল সম্রাট হুমায়ুন গৌড় জয় করিয়া তিনমাস কাল তথায় অবস্থান করেন। গৌড়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া হুমায়ুন এই নগরীর নামকরণ করেন 'জান্নাতাবাদ'। সম্রাট আকবর পর্যন্ত প্রায় সমস্ত নৃপতিগণই বঙ্গের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিলেন। সোলেমান কর্‌রানির পুত্র দাউদ গৌড়বঙ্গের শেষ স্বাধীন সুলতান। সিংহাসনে আরোহণ করিয়া দাউদ সম্রাট আকবরের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করেন নাই। ক্ষুব্ধ হইয়া আকবর বাংলা বিজয়ের জন্য রাজা তোডরমল্লকে প্রেরণ করেন। যুদ্ধে দাউদ পরাজিত হইয়া রাজধানী হইতে সপ্তগ্রামে পলায়ন করেন। সুবর্ণরেখা নদীর তীরে 'মোগলমারী' গ্রামে দাউদ খাঁর সহিত মোগল সেনাপতিদ্বয় খান খানান মুনীম খান ও তোডরমল্লের যুদ্ধ হইয়াছিল। দাউদ খাঁ আত্মসমর্পন করিয়া সন্ধি স্থাপন করেন (মার্চ, ১৫৭৫ খৃঃ)।

মুনীম খাঁর মৃত্যু সংবাদে দাউদ পুনরায় গৌড় অধিকারের চেষ্টা করেন। সম্রাট আকবর খাজা জাহান ও তোডরমল্লকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইহার পর সম্রাট নিজে ফতেহ্‌পুর সিক্রি হইতে সসৈন্যে গৌড় অভিমুখে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে আবদুল্লাহ্‌ খাঁ দাউদের ছিন্নশির উপহার দিলে আকবর রাজধানী

আগ্রায় প্রত্যাবর্তন করেন। দাউদ খাঁ কর্‌রানি গৌড়রাষ্ট্রের শেষ স্বাধীন নরপতি। তাঁহার মৃত্যুর পর গৌড়বঙ্গ বিশাল মোঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়া পড়ে এবং সম্রাটের অধীন একটি প্রদেশরূপে শাসিত হইতে থাকে। গৌড়বঙ্গে তুর্ক-আফগান শাসনের এই খানেই যবনিকাপাত হয়। এই যুগসন্ধিক্ষণে রাজধানী গৌড় যখন অরক্ষিত ছিল, সেই সুযোগে রাজা প্রতাপাদিত্যের পিতা বিক্রমাদিত্য তদীয় ভ্রাতা বসন্তরায়ের সহযোগিতায় বিপুল ধন-ভাণ্ডার আনিয়া সুন্দরবন অঞ্চলে যশোহর রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন।

যশোহর রাজ্য

তুর্ক-আফগান রাজত্বের পতনকালে সুন্দরবনের প্রান্ত সীমায় যশোহর রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। বর্তমান যশোর টাউন এবং প্রাচীন যশোহর রাজ্য পৃথক স্থান। এই যশোহর রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ প্রতাপাদিত্যের পিতা বিক্রমাদিত্য এবং খুল্লতাত বসন্ত রায়। গৌড়ের শেষ স্বাধীন সুলতান দায়ূদ খাঁর রাজত্বের শেষদিকে সম্ভবতঃ ১৫৭৪ খৃঃ যশোহর রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। মোঘলদের আক্রমণ ও অত্যাচার ভয়ে যখন গৌড়ের আমীর ওমরাহগণ ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া উদ্বেগাকুল মুহূর্ত অতিবাহিত করিতেছিলেন সেই সুযোগে বসন্ত রায় ও বিক্রমাদিত্য অপরিমিত ধনরত্ন নৌকাযোগে যশোহরে প্রেরণ করিয়াছিলেন সে সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে কোন মতবিরোধ নাই। মোঘলদের দ্বারা লুণ্ঠিত হইবার ভয়ে বহু ধনদৌলত ও অলঙ্কারাদি বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায়ের হস্তে গচ্ছিত রাখা হয়। এই সময় বহু পাঠানও বনাঞ্চলে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

হিন্দু-বৌদ্ধ রাজাদের রাজধানী গৌড়। তুর্ক-আফাগণ সুলতানগণও প্রায় তিনশত বৎসর ধরিয়া এখানে সগৌরবে রাজত্ব করেন। পূর্ব ভারতের সমস্ত ধনসম্পদ এখানেই পুঞ্জিভূত হইয়াছিল। হোসেনশাহী আমল এবং ইলিয়াস শাহের রাজত্বকাল গৌড়ের সুবর্ণযুগের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। কালচক্রের আবর্তনে রাজ প্রাসাদ পেচকের আবাসস্থলে পরিণত হয় এবং হিংস্র জন্তুর আবাসভূমি গহীন জঙ্গলে রাজধানী স্থাপিত হয়। বিচক্ষণ বসন্তরায় গৌড়ের বিশৃঙ্খলার সুযোগ পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। যশোহর বা যশোর নাম

বসন্তরায়ের পূর্ব হইতেই ছিল বলিয়া কেহ কেহ বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু উহার কোন সঠিক ইতিহাস পাওয়া যায় না।

যাহা হউক বিক্রমাদিত্য ও তদীয় খুল্লতাত পুত্র বসন্ত রায় সুন্দরবনের গহীন অরণ্যানীর পার্শ্বে বনজঙ্গল কাটাইয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। এমন একটি স্থানের নাম হইয়াছিল বসন্তপুর। ইহার সন্নিকটে গড় ও রাজধানী স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। ঐ স্থানের নাম গড় মুকুন্দপুর। এখনও সে স্থানে প্রাচীন গড়ের চিহ্ন আছে, তবে রাজবাটীর কোন চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় না। কথিত আছে যে গৌড়ের যশঃ হরণ করিয়া নবরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় উহার নাম হয় যশোহর (যশঃ হরণকারী)। ইহাকে অনেকে সংক্ষেপে যশোর রাজ্যও বলিয়া থাকেন।

যশোর রাজ্যের সীমানা চতুর্দিকে কোন্ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল সঠিক জানা যায় না। তবে খুলনা জিলার দক্ষিণাংশ এবং যশোর-২৪পরগণার একাংশ জুড়িয়া এই রাজ্য বিস্তৃত ছিল। বসন্ত রায় তোডরমল্লের সহযোগিতায় মোঘল সম্রাট আকবরের নিকট হইতে সনদ বা অনুমতি পত্র লাভ করিয়াছিলেন। এই ঘটনা ১৫৭৭ খৃঃ সংঘটিত হইয়াছিল। এই সময় হইতে বিক্রমাদিত্য ও বসন্ত রায় রাজত্ব আরম্ভ করেন। নামে বিক্রমাদিত্য রাজা হইলেও প্রকৃতপক্ষে বিচক্ষণ বসন্ত রায় রাজ্যের সর্বেসর্বা ছিলেন। অবশ্য দুই ভ্রাতার মধ্যে অকৃত্রিম স্নেহবন্ধন ছিল। বসন্তরায় রাজকার্যে সুদক্ষ ছিলেন, তন্নিমিত্ত গৌড় সরকারের অধীন কর্মচারী বা রাজস্ব সচিব পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বঙ্গদেশ এবং অন্যত্র প্রায়ই সামন্ত রাজগণ রাজস্ব দিতেন না এবং কোন কোন সময় বিদ্রোহ ঘোষণা করিতেন। কিন্তু এই দুই ভ্রাতা বুদ্ধিমত্তাগুণে মোঘলদের বশ্যতা স্বীকার করিয়া রাজ্যের প্রায় সর্বেসর্বা হইয়া উঠিয়াছিলেন।

বসন্তরায় বঙ্গের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু আত্মীয় স্বজনকে আনিয়া এক বিরাট জনপদের সৃষ্টি করেন এবং সেই সময় হইতে "যশোর সমাজ" নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে। মুকুন্দপুরের সন্নিকটে ড্যামরেলী নামক স্থানে একটি নবরত্ন মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয়। যশোহর রাজ্যের সহিত প্রতিবেশী রাজাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল।

বিক্রমাদিত্যের পর মহারাজ প্রতাপাদিত্য পৈতৃক সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি বারভূঞার অন্যতম প্রধান ভূঞা। প্রতাপাদিত্য চঞ্চল ও উদ্ধত প্রকৃতির শাসক ছিলেন। তাঁহার বিপুলকায় দেহ ছিল। প্রথম জীবনে মল্লযুদ্ধে এবং তরবারি চালনায় তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি সুন্দরবনের ব্যাঘ্র, বন্যবরাহ, গণ্ডার প্রভৃতি শিকার করিয়া বিশেষ দক্ষতা লাভ করেন। পরবর্তীকালে যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শিতার জন্য খ্যাতিলাভ করেন। রাজ্যারোহণের অল্পকাল মধ্যেই তিনি পিতৃনীতি ত্যাগ করেন। অপত্য স্নেহে পালিত প্রতাপের পরিণতি উদ্ধত যুবক নবাব সিরাজদ্দৌলার ন্যায়ই বিয়োগান্ত হইয়াছিল। তিনি স্বাধীন রাজার ন্যায় রাজকার্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। বাহুবল ও বীরত্ব থাকিলেও তাঁহার বিচক্ষণতা ছিল না। তিনি নির্মমভাবে পিতৃব্য ও গুরু বসন্তরায়কে হত্যা করিয়া স্বীয় চরিত্রে যে কলঙ্ক কালিমা লেপন করিয়াছিলেন, প্রতাপভক্ত বহু ঐতিহাসিক শত চেষ্টার পরও সে কালিমা মুছিতে পারেন নাই। বিবাহ রাত্রে স্বীয় জামাতাকে হত্যা করিতে উদ্যত হওয়া প্রতাপ জীবনের কলঙ্ক। সে বিষয় যথাস্থানে বর্ণিত হইবে। যাহা হউক প্রতাপের বীরত্ব কাহিনী সর্বজন বিদিত ছিল। তিনি হিন্দু রাজশক্তি পুনরুদ্ধারের জন্য জীবনপাত করিয়া গিয়াছেন। কথিত আছে যে জঙ্গল পরিষ্কার করার সময় ইষ্টক মধ্যে যশোরেশ্বরী দেহমূর্ত্তি পাওয়া যায়। ঐ মূর্ত্তি যে ঘরে রাখা হয় উহা যশোরেশ্বরী মন্দির নামে খ্যাত। যশোর রাজ্যের প্রধান কেন্দ্র ঈশ্বরীপুর বা যশোরেশ্বরীপুরে আজিও সেই মন্দির বিদ্যমান। সরকার কর্তৃক মন্দিরটি সুন্দরভাবে নূতন করিয়া সংস্কার করা হইয়াছে। মহারাজ প্রতাপাদিত্যের এই একটিমাত্র কীর্তি এখনও কালের আঘাত সহিয়া টিকিয়া আছে।

প্রতাপের অসংখ্য সৈন্য সামান্ত শত্রুর আক্রমণ হইতে দেশরক্ষা করিত। ফ্রেডারিক ডুদলী, রডা এবং খাজা কামাল প্রভৃতি বীরগণ বিভিন্ন বিভাগের অধিনায়ক ছিলেন। বীর পাঠান, কৌশলী পর্তুগীজ এবং দেশীয় বীর সন্তানদের লইয়া তাঁহার সেনাদল গঠিত হইয়াছিল। প্রতাপকে পরাজিত করিতে মানসিংহ,

ইসলাম খাঁ প্রভৃতি সেনানায়কদের বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল। প্রতাপের বীরত্ব গাঁথায় কবির ভাষা মুখর ছিল :

যশোর নগর ধাম প্রতাপ আদিত্য নাম
মহারাজ বঙ্গজ কায়েস্থ।
নাহি মানে পাদশায় কেহ নাহি আটে তায়
ভয়ে যত ভূপতি দ্বারস্থ।"

মহারাজ প্রতাপাদিত্যের প্রতাপ মোঘল সৈন্যদের হস্তে বিধ্বস্ত হয়। তাঁহার পরাজয়ের পর তাঁহাকে লোহার খাঁচায় বন্দী করিয়া রাজধানী আগ্রায় যাওয়ার পর তাঁহার জীবনলীলা সাঙ্গ হয়। প্রতাপাদিত্যের রাজ্য সরাসরি মোঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের করায়ত্ব হয়। এইখানেই বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায় প্রতিষ্ঠিত যশোর রাজ্যের বিলুপ্তি ঘটে। যে সমস্ত হিন্দু রাজা ও রাজকর্মচারী প্রতাপের বিরুদ্ধে মোঘল সেনাপতিকে সাহায্য করিয়াছিলেন। পরে তাঁহাদের মধ্যে প্রতাপের রাজ্য ভাগ করিয়া তাঁহাদিগকে পুরস্কৃত করা হইয়াছিল। মহারাজ প্রতাপাদিত্যের ইতিহাস যশোর-খুলনা ও বাকেরগঞ্জের ইতিহাসের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এ বিষয়ের ধারাবাহিক বিবরণ পরবর্তী খণ্ডে যথাস্থানে প্রদত্ত হইবে।

দনুজ মর্দন ও চন্দ্রদ্বীপ রাজ্য

।। পাঁচ ।।

পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে রাজা গণেশের মৃত্যুর পর যখন রাজ্যমধ্যে গোলযোগ চলিতেছিল, সেই সময় দনুজ মর্দন দেব নামক অন্য এক হিন্দু রাজা বাকেরগঞ্জ জিলার অন্তর্গত সুন্দরবন অঞ্চলের সন্নিকটে চন্দ্রদ্বীপে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করেন। বর্তমান বাগেরহাট মহকুমার পূর্ব দক্ষিণ অংশ তাঁহার রাজ্যের অধীন ছিল। দনুজ মর্দন দেবের যে মুদ্রা আবিস্কৃত হইয়াছে, তাহা বঙ্গাক্ষরে লিখিত। ইহার পূর্বে বাংলা ভাষায় কোন মুদ্রা পাওয়া যায় নাই। পাণ্ডুয়ার নিকটবর্তী একস্থানে হল কর্ষণের সময় অনুরূপ দুইটি মুদ্রা পাওয়া যায়। উক্ত মুদ্রার একটি মহেন্দ্র দেব নামীয় এবং অপরটি দনুজ মর্দন দেবের। উভয় মুদ্রা গোলাকৃতি। মহেন্দ্র দেবের মুদ্রার প্রথম পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, "শ্রী শ্রী মন্মহেন্দ্র" এবং দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, "শ্রী চণ্ডীচরণ পরায়ণ, পাণ্ডুনগর শকাব্দ ( ) ৩৩৬।"

রাজা দনুজ মর্দন দেবের মুদ্রার ওজন প্রায় ১৬৭ গ্রেণ, পরিধি পৌনে চার ইঞ্চি। প্রথম পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, "শ্রী শ্রী দনুজ মর্দন দেব," এবং দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়, "শ্রী চণ্ডীচরণ পরায়ণ, পাণ্ডুনগর শকাব্দ ( ) ৩৩৯।" সুন্দরবন অঞ্চলে খোলপেটুয়া নদীর তীরে একটি কবর খননকালে ১৯১১ খৃষ্টাব্দে দনুজ মর্দনের একটি মুদ্রা পাওয়া যায়। উক্ত মুদ্রা গোলাকৃতি। ওজন ১৬০ গ্রেণ। প্রথম পৃষ্ঠায় বাংলা অক্ষরে "শ্রী দনুজ মর্দন দেব," দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় "শ্রী চণ্ডীচরণ পরায়ণ শকাব্দ ১৩৩৯ চন্দ্র দ্ব ( ) প।" ১৩৩৯ শকাব্দ অথবা ১৪১৭ খৃষ্টাব্দ হইবে। পূর্বোক্ত দুইটি মুদ্রায় ১ সহস্রাংকটি কাটিয়া গিয়াছে। অতএব মহেন্দ্র দেবের মুদ্রায় ৩৩৬ শকাব্দ স্থলে ১৩৩৬ শকাব্দ এবং দনুজ মর্দনের অপর মুদ্রায় ৩৩৯ স্থলে ১৩৩৯ শকাব্দ বা ১৪১৪ খৃষ্টাব্দ হইবে। উপরোক্ত তিনটি মুদ্রা হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে মহেন্দ্র দেবের পর দনুজ মর্দন দেব পাণ্ডুয়ার রাজ সিংহাসনে আরোহণ করেন। ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় বলেন যে যদু মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিলে দনুজ মর্দন দেব প্রাচীন

আর্য ধর্মের বিলুপ্তির সম্ভাবনা দেখিয়া স্বয়ং স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন। হিন্দু ধর্মের পূর্ব নাম আর্য ধর্ম। 'হিন্দু ধর্ম' বলিয়া কোন শব্দ চতুর্বেদের কোথাও নাই। বেদে ঈশ্বর একেমেবাদ্বিতীয়াং — অর্থাৎ বৈদিক যুগের হিন্দুগণ একেশ্বরবাদী ছিলেন। বিভিন্ন প্রকার দেব দেবীর নাম ও উহার পূজা-অর্চনা মহাগ্রন্থ বেদের কুত্রাপি লিখিত নাই। 'হিন্দু' শব্দ আরব ও পারস্যবাসীদের দান। তাঁহারা সিন্ধুনদী তীরে অবস্থিত অধিবাসীদিগকে হিন্দু বলিত। 'স' স্থলে তাহারা 'হ' উচ্চারণ করিত এবং সেইজন্য 'সিন্ধু' শব্দ 'হিন্দুতে' পরিণত হইয়াছে।

যাহা হউক যদুর রাজত্বের শেষদিকে সম্ভবতঃ দনুজ মর্দন দেব তাঁহাকে পাণ্ডুয়া নগর হইতে বিতাড়িত করিয়া স্বাধীনতার চিহ্ন স্বরূপ নিজনামে মুদ্রাঙ্কন করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর পরে পুরুষপুর হইতে কামরূপ পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল অর্যাবর্তে মুসলমান রাজগণ কর্তৃক বিজিত কোন জনপদে বা দেশে কোন হিন্দু রাজা নিজ নামে পাক-ভারতীয় অক্ষরে মুদ্রাঙ্কন করিতে সাহসী হন নাই। দনুজ মর্দন ও মহেন্দ্রের নাম স্বাধীন হিন্দুরাজা হিসাবে ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

দনুজ মর্দনের মুদ্রায় ইহাই প্রমাণিত হয় যে তিনি রাজ্যারোণের অল্পদিন পরেই পাণ্ডুনগর ত্যাগ করিয়া চন্দ্রদ্বীপে নূতন রাজ্য স্থাপন করত মুদ্রা প্রচার করেন। গৌড় ও পাণ্ডুয়ায় তখন রাজ্যারোহণ ব্যাপারে ভয়াবহ ষড়যন্ত্র ও নরহত্যা চলিত। সম্ভবতঃ এইরূপ সংকট এড়াইবার জন্য তিনি সুন্দরবন অঞ্চলে আগমন করেন। মিঃ ষ্টেপেলটন দনুজমর্দন দেবের বহু রজত মুদ্রা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এই মুদ্রাগুলিতেও উপরোক্ত কথা লিখিত আছে।

মহেন্দ্র ও দনুজমর্দন উভয়েই 'দেব' উপাধিধারী কায়স্থ এবং 'শ্রীচণ্ডীচরণ পরায়ণ' উপাধি ভূষিত শাক্ত হিন্দু। এই দনুজমর্দন কে? এবং কোথা হইতে চন্দ্রদ্বীপে আসিলেন? এ সম্পর্কে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন, "বল্লাল সেনের কায়স্থ জাতীয় উপপত্নীর পুত্র কালুরায়কে তিনি চন্দ্রদ্বীপে করদ রাজা নিযুক্ত করেন। দনুজদমন রায় তাঁহার বংশধর।" এখানে দনুজদমন ও দনুজ মর্দনকে অভিন্ন ব্যক্তি বলা হইয়াছে। কিন্তু এই মতের পোষকতায় কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই।

অন্যসূত্র হইতে জানা যায় যে লক্ষ্মণ সেনের পৌত্র দনুজমাধব বহুদিন যাবত পূর্ববঙ্গে রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই দনুজ মাধবকে বিভিন্ন ঐতিহাসিকেরা দনুজ, ধিনুজ রায়, দনৌজা প্রভৃতি নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন। আবুল ফজল তাঁহাকে 'নৌজা' এবং জিয়াউদ্দীন বারানী তাঁহাকে 'দনুজ রায়' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। দনুজমর্দন এবং দনুজদমন বা দনুজমাধব একই ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন নাম। এই মতানুসারে বিক্রমপুরের দনুজ মাধব এবং চন্দ্রদ্বীপের দনুজমর্দন অভিন্ন ব্যক্তি। বিশ্বরূপের মৃত্যুর পর দনুজমাধব পূর্ববঙ্গে রাজত্ব করেন। ১২৮০ খৃঃ অব্দে তাঁহার রাজত্বকালে সুলতান গিয়াসউদ্দীন বলবন বঙ্গের বিদ্রোহী শাসনকর্তা মুঘীসউদ্দীন তোগরোলকে দমন করিতে সসৈন্যে বঙ্গে আগমন করেন। দনুজমাধব এই অভিযানে সুলতান গিয়াসউদ্দীন বলবনকে সাহায্য করেন এবং উভয়ের মধ্যে এক সন্ধি স্থাপিত হইয়াছিল। পূর্ববঙ্গে মুসলীম রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে দনুজ মাধব চন্দ্রদ্বীপে আসিয়া স্বীয় গুরু চন্দ্রশেখরের নির্দেশ অনুসারে নবোত্থিত দ্বীপে এক রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন এবং গুরুভক্তির নিদর্শনস্বরূপ উহার নামকরণ করেন চন্দ্রদ্বীপ। ঐতিহাসিক ষ্টুয়ার্ট ও ইলিয়ট্ এই মতের পরিপোষকতা করেন। তাঁহাদের মতে চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশীয়গণ এই দনুজ মাধবের বংশধর। আইন-ই-আকবরীতে দেখা যায় যে আকবরের রাজত্বের ২৯ বৎসরে অর্থাৎ ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দে চন্দ্রদ্বীপে (বাক্‌লায়) যে জলপ্লাবন হয় তখন এই বংশের পরমানন্দ রায় অল্প বয়স্ক যুবক। অধ্যাপক সতীশচন্দ্র এই মতের বিরোধী। তাঁহার সুচিন্তিত মতানুসারে দনুজমর্দন দেব ১৪১৭ খৃষ্টাব্দে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। পূর্বে আলোচিত মুদ্রাত্রয় ইহাই প্রমাণ করিয়া দিয়াছে যে দনুজমাধব ১২৮০ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর সম্রাট গিয়াসউদ্দীন বলবনকে সাহায্য করিয়াছেন। তিনি আরো ১৩৭ বৎসর বাঁচিয়া থাকিয়া চন্দ্রদ্বীপ হইতে যে মুদ্রা প্রচলন করিতে পারেন না তাহা অতি সহজেই উপলব্ধি করা যায়। এ স্থলে বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত মুদ্রার সাক্ষ্যই গ্রহণযোগ্য প্রমাণ।

উপরোক্ত আলোচনা হইতে ইহাই সপ্রমাণিত হয় যে বিক্রমপুরের দনুজমাধব এবং চন্দ্রদ্বীপের দনুজমর্দন একই ব্যক্তি নহেন। এখন এই দনুজমর্দন দেবের প্রকৃত পরিচয় জানিতে হইবে। দেব বংশের ইতিবৃত্ত সম্বলিত একখানি

কুলগ্রন্থ হইতে জানা যায় যে তৎকালে ঐ বংশের লোকেরা রাজকার্যে নিযুক্ত থাকিতেন। এইজন্য রাজবংশের সহিত তাঁহাদের বংশীয় ইতিহাসেরও সম্পর্ক ছিল। এই বংশের লোকেরা বহুকাল পূর্বে হরিদ্বার হইতে আসিয়া কর্ণসুবর্ণে বসবাস করেন। তাঁহারা ক্ষাত্রজ কায়স্থ, দ্বিজ ও ক্ষত্রিয় কুলসম্ভব। পরে তাঁহারা সপ্তগোত্রে বিভক্ত হইয়া পড়েন। "তন্মধ্যে শাণ্ডিল্য দেবগণ কুল নায়ক ছিলেন। তাঁহারা কণ্টকদ্বীপে এক রাজ্য স্থাপন করেন। এই শাণ্ডিল্য দেব কুলে শূবদেব জন্মগ্রহণ করেন; তৎপুত্র দনুজারি। পাঠান রাজত্বকালে তিনি দেব রাজগণের সামন্তস্বরূপ বহুদিন ধরিয়া পাঠানদিগের সহিত যুদ্ধ করেন। তিনি বন্দ্য বংশীয় মকরন্দের পুত্র দাশরথিকে কণ্টকদ্বীপে স্থাপন করেন ও তাঁহার পাঁচ পুত্রকে পাঁচ খানি গ্রাম দান করেন এবং চণ্ডীপরায়ণ বন্দ্য বংশের শিষ্য হওয়ায় দেব বংশীয়েরা "শ্রীশ্রী চণ্ডীচরণ পরায়ণ" উপাধি গ্রহণ করেন। দনুজারির পুত্র হরিদেব কণ্টকদ্বীপ হইতে পাণ্ডুনগরে গমন করেন। হরিদেবের পুত্রের নাম নারায়ণ এবং নারায়ণের দুই পুত্রের নাম পুরন্দর ও পুরুজিৎ। তন্মধ্যে পুরন্দর সন্ন্যাসী হন। পুরুজিতের আদিত্য নামে মহাতপা পুত্র জন্মে; আদিত্যের দুই পুত্র — শ্রীশ্রী চণ্ডীপরায়ণ দেবেন্দ্র ও ক্ষীতিন্দ্র। দেবেন্দ্রের পুত্র সুপ্রসিদ্ধ মহেন্দ্র। তাঁহার সম্পর্কে একটি সংস্কৃত শ্লোক পাওয়া যায়ঃ—

"যবনাঞ্চ দূরীকৃত্য কংসবুলং নিহত্যা।
পাণ্ডুয়ায়ং দেবরাজ্য মনে নৈব প্রতিষ্ঠিতম্।।"

অর্থাৎ তিনি (মহেন্দ্রদেব) যবন বা মুসলমানদিগকে বিতাড়িত করেন এবং কংসকুল (রাজা গনেশ বা কংস নারায়ণের বংশধর) ধ্বংস করিয়া পাণ্ডুয়ায় দেব বংশীয় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। যবন শব্দের তাৎপর্য ও উৎপত্তির বিষয় উপলব্ধি করিতে এখানে রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতাংশ উল্লেখ করিতেছি ঃ—

"কেহ নাহি জানে, কার আহবানে কত মানুষের ধারা
দুর্বার স্রোতে এল কোথা হতে সমুদ্রে হোল হারা।
হেথায় আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন।
শক হুনদল পাঠান মোগল একদেহে হল লীন।"

উত্তর পশ্চিম সীমান্তের খাইবার গিরিপথ দিয়া যে সমস্ত জাতি অতি প্রাচীন কালে পাক-ভারতে আগমন করিয়াছিল কবিতাটিতে তাহার আভাষ দেওয়া হইয়াছে। আর্যদের আদিম বাসভূমি ভল্‌গা নদীর তীরে ও মধ্য এশিয়ায়। এদেশে আর্য জাতির আগমনের পূর্বে এবং পরে বহু জাতির আগমন ইতিহাসে বর্ণিত হইয়াছে। কবিতাটিতে গ্রীক জাতির নাম বাদ পড়িয়াছে। এই জাতির সভ্যতা অতি প্রাচীন। দিগ্বিজয়ী আলেকজান্দারের পাক-ভারত আক্রমণের কাহিনী সর্বজনবিদিত। তাঁহার পূর্বেও গ্রীকেরা এদেশে আগমন করিয়াছিল। গ্রীসের অন্যতম জাতীয় লোকেরা বহির্বিশ্বে 'আইওনিয়ন' বলিয়া সুপরিচিত। প্রাচীন এশিয়া মাইনরের সমুদ্রতটে আইওনীয়া নামে একটি শহর ছিল, সেখানে থেলিস প্রমুখ প্রাচীন বিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক জন্মগ্রহণ করেন। তন্নিমিত্ত প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকদিগকে "আইওনিক মতবাদী" বলা হইয়াছে। পাক-ভারতে সর্বপ্রথম তাহারা "ইয়াভান" নামে কথিত হইতে থাকে। 'আইওনিয়ন' শব্দ হইতে 'ইয়াভান' ও "ইউনান" শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। খৃষ্টানদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেলেও ইয়াভান শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়। এই 'ইয়াভান' শব্দ হইতে সংস্কৃত যবনানী বা যবনাঞ্চ এবং তাহা হইতে বাংলা যবন শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। প্রাচীন পাক-ভারতে পানিণী সর্বপ্রথম গ্রীক্ ও পারসিক রাজকর্মচারীদিগকে যবনানী (Yavanani) এই নামে আখ্যায়িত করেন। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার একমাত্র গ্রীকদিগকে (Yavanas = Greeks) যবন বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। রাহুল সংস্কৃত্যায়ন তদীয় গ্রন্থ "ভোলগা থেকে গঙ্গায়" বলিয়াছেন, "যবনেরা যেমন ভারতবর্ষে লুণ্ঠনকারী হিসাবে এসেছিল, তেমনি যবনদের অনুসরণ করে শকেরাও এসেছিল ভারতবর্ষকে লুঠ করতে।" ইহা হইতে সহজেই উপলব্ধি করা যায় যে যবন শব্দের দ্বারা গ্রীকদিগকেই বুঝাইত। যবন শব্দ যখন এইভাবে সর্বত্র ব্যবহৃত হইত তখন পাক-ভারতে মুসলমানদের নাম গন্ধও ছিল না। গ্রীক আগমনের পূর্বেও এ দেশের নীচ জাতীয় লোকদিগকে যবন, আভির প্রভৃতি নামে আখ্যায়িত করা হইত।

আমাদের দেশের ইউনান দাওয়াখানার 'ইউনানী' শব্দ ও 'আইওনিয়ন' একই অর্থবোধক। যবনদের আগমনের পর মধ্য এশিয়ার শকহুন জাতীয়

লোকেরা এদেশে আগমন করে। ব্যাকৃটি্রয়াবাসীদের পর তুর্কি ও যাযাবর জাতির একটি শাখা এদেশে আগমন করে। শকেরা ব্যাকৃটি্রয়া, পার্থিয়া প্রভৃতি রাজ্য পদদলিত করিয়া পাঞ্জাব, রাজপুতানা ও কাথিওয়াড়ে রাজ্য স্থাপন করে। কালক্রমে উহারা যাযাবর জাতির রীতিনীতি ত্যাগ করে। শক্‌দের পর হুনগণ এদেশে উপদ্রব করে। ইহারা মধ্য এশিয়ার এক বর্বর জাতি শ্বেতহুন নামে পরিচিত। হুনদের পরাজয়ের পর অন্যান্য জাতীয় লোকেরা এদেশে বসবাস স্থাপন করিয়া আর্যদের সঙ্গে মিশিয়া যায়। এই শক হুন জাতিকেও এদেশের লোকেরা 'যবন' বলিয়া অভিহিত করিত। পাঠান (তুর্ক-আফগান) ও মোঘলদিগকেও এদেশীয় লোকেরা অন্যান্য বহিরাগতদের সঙ্গে 'যবন' বলিত। শেষ পর্যন্ত সমস্ত মুসলমান ধর্মাবলম্বীদেরই এতদ্দেশীয় হিন্দুগণ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে যবন ও ম্লেচ্ছ আখ্যায় আখ্যায়িত করিয়াছিল।

মোঙ্গল সর্দার বর্বর চেঙ্গিস্ খাঁ মধ্য এশিয়ার মোঙ্গল জাতি। তিনি মুসলমান ছিলেন না। চেঙ্গিসের ধর্ম ছিল শাম ধর্ম—নীল আকাশের আরাধনা। বাগদাদের সভ্যতা ধ্বংসকারী হালাকু খাঁ ও চীন সম্রাট কুবলাই খান মোঙ্গল জাতীয় লোক এবং অমুসলমান। পাক ভারতে যে সমস্ত বিদেশী খাইবার গিরিপথ ও আরব সাগর হইয়া আগমন করিয়াছিল, পরবর্তীকালে গড়ে সকলকেই এদেশীয় লোকেরা যবন বলিত। অন্যান্য সমস্ত প্রাচীন জাতিরা মুসলমানদের ন্যায় এদেশে পৃথক জাতীয় অস্তিত্ব স্থাপন করিতে পারে নাই। সেইজন্য আক্রোশ বশতঃ এতদ্দেশীয় অমুসলীম লেখকেরা মুসলমানদিগকে যবন বা বিধর্মী বলিয়া অভিহিত করিত। ইহা যবন শব্দের অপ-প্রয়োগ ছাড়া অন্য কিছু নহে। খ্যাতনামা সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্রের হস্তে পড়িয়া উহার কদর্থ ব্যবহৃত হইয়া সাম্প্রদায়িক উগ্রতা বৃদ্ধি করে। ইহাই 'যবন' শব্দের ইতিকথা।

'ম্লেচ্ছ' শব্দ যবনের ন্যায় বহু পূর্বে এদেশে প্রচলিত ছিল। বঙ্গের আদিম অধিবাসীদিগকে ম্লেচ্ছ আখ্যা দেওয়া হইয়াছিল এবং উত্তর ভারতের ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ প্রাচীন কাল হইতে বঙ্গের অধিবাসীদিগকে ম্লেচ্ছ বলিয়া অভিহিত করিত এবং বঙ্গদেশকে পাণ্ডবর্জিত বা ম্লেচ্ছদেশ বলিত। সর্বপ্রথম আর্যজাতির লোকেরা যাযাবর তুর্কজাতির লোকদিগকে 'ম্লেষ্ট' বা ম্লেচ্ছ আখ্যা দিয়াছিল। ম্লেষ্ট শব্দের অর্থ দুর্বোধ্য। তুর্কজাতির ভাষা আর্যগণ বুঝিতে পারিত না এবং

এইভাবে যে সমস্ত জাতির ভাষা বুঝিতে পারিত না তাহাদের সকলকেই ম্লেচ্ছ বলা হইত। পরবর্তীকালে ম্লেচ্ছ শব্দ ঘৃণ্য ও তাচ্ছিল্য সহকারে যত্রতত্র ব্যবহৃত হইত। দনুজমর্দনদেব প্রসঙ্গে যবন কথাটি আসিয়া পড়ায় উহার সঙ্গে ম্লেচ্ছ শব্দেরও ব্যাখ্যা দেওয়া হইল।

ঐতিহাসিক রাখাল দাস বন্দোপাধ্যায় বলেন, "রাজা গণেশ বা কংস নারায়ণের মৃত্যুর পর যদু স্বধর্ম পরিত্যাগ করিলে মহেন্দ্র দেব বিদ্রোহী হইয়া পাণ্ডু নগরে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন ও স্বনামে মুদ্রাঙ্কণ করেন।" রাজা মহেন্দ্র দেব কিছুদিন রাজত্ব করার পর দুষ্ট ঘাতক কর্তৃক নিহত হইলে তৎপুত্র দনুজমর্দন পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। এই সময় গৌড় ও পাণ্ডুয়া ভয়াবহ ষড়যন্ত্রের কেন্দ্রস্থল ছিল। ইতিমধ্যে মুসলমানেরা প্রায় দুই শতাব্দী যাবত দোর্দণ্ড প্রতাপে গৌড় শাসন করিয়াছে। প্রাচীন হিন্দু রাজ্যের অবসানে এ দেশের প্রাচীন অধিবাসীরা মুসলমানদিগকে মনে প্রাণে গ্রহণ করিতে পারে নাই। ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে কোন জাতির অবস্থা যখন চরম সংকটে উপনীত হয় তখনই বিজেতার দল আমন্ত্রিত হইয়া বা সেই দেশের আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার সুযোগে উক্ত দেশ আক্রমণ করে। প্রথম দিকে নব শাসকেরা প্রজাগণ কর্তৃক বিশেষভাবে অভিনন্দিত হয়। ক্রমশঃ বিজিত দেশের অধিবাসীদের মনের অবস্থা পরিবর্তীত হইতে থাকে এবং বিজেতা শাসক শ্রেণীর উপর বিদ্বেষভাব প্রকটিত হয়। এখানে আমরা দেখিতে পাই যে রাজা গণেশের পূর্বে কোন হিন্দু জমিদার বা প্রধান স্বাধীন সুলতানদের বিরোধিতা করিতে সাহসী হন নাই ; রাজা গণেশ মুসলমানদের বিশেষ সমীহ করিয়া রাজ্য পরিচালনা করিতেন। তৎপুত্র যদু স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করিয়া রাজ্য শাসন করেন কিন্তু মহেন্দ্র দেবের সিংহাসন কণ্টকাকীর্ণ ছিল, তাহার অকাল মৃত্যুই উহার অকাট্য প্রমাণ। দনুজমর্দন দেব পাণ্ডু নগরে স্বীয় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় অক্ষম হইয়া রাজধানী ত্যাগ করেন। কি অবস্থার মধ্যে তাঁহাকে পাণ্ডুয়া ত্যাগ করিতে হইয়াছিল তাহার কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। সে যুগে মধ্যে মধ্যে হিন্দু সামন্ত রাজগণ বিদ্রোহী হইয়া রাজদণ্ড হস্তগত করিতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু মুসলমানদের বিক্রম তাঁহাদের সর্বপ্রকার চেষ্টা ধূলিসাৎ করিয়া দিত। গণেশ কিছুকাল হিন্দু সংস্কৃতি ও সভ্যতার পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন কিন্তু তৎপুত্র

জালালউদ্দীন (যদু) পিতৃনীতির বিপরীত কাজ করিতে আরম্ভ করেন। মহেন্দ্র দেব সুখে রাজত্ব করিতে পারেন নাই। তৎপুত্র দনুজমর্দন সম্ভবতঃ ভয়সঙ্কুল অবস্থার মধ্যে রাজ্যারোহণ করিয়া পাণ্ডুয়া হইতে তিনি বড় একটি রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া একটি ক্ষুদ্র রাজ্য গঠন করিয়া তুষ্ট থাকেন। ইহাই দনুজ মর্দন দেব কর্তৃক চন্দ্রদ্বীপ রাজ্য প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত। প্রবাদ আছে যে বন্দ্যবংশীয় চন্দ্রাচার্য দনুজমর্দনের গুরু ছিলেন। গুরুর আদেশে তিনি সুন্দরবনের সমুদ্রোপকূলের এক দ্বীপে আসিয়া বসবাস করেন এবং তথায় একটি রাজ্য স্থাপন করেন। গুরুভক্তির নিদর্শন হিসাবে এই রাজ্যের নামকরণ হয় চন্দ্রদ্বীপ। দনুজমর্দন চন্দ্রদ্বীপ হইতেও স্বীয় নামে মুদ্রাঙ্কণ করেন। তিনি স্বাধীন রাজাই ছিলেন অন্যথা স্বীয় নামে মুদ্রাঙ্কন করিতে পারিতেন না। ঐতিহাসিক নীহার রঞ্জন রায় বলেন যে চন্দ্রদ্বীপ নাম বহু পূর্ব হইতেই ছিল। চন্দ্রাচার্যের সঙ্গে কোন সম্পর্ক ছিলনা।

ঐতিহাসিক রাখালবাবু বলিয়াছেন যে গণেশ বা যদু যাহা করিতে পারেন নাই অথবা করিতে ভরসা করেন নাই দনুজমর্দন দেব তাহা সহজেই সম্পাদন করিয়াছিলেন। রিয়াজুস্ সালাতীন, তারিখ-ই ফিরিশ্তা বা তবাকাত-ই-আকবরীতে বা হিন্দুর পুরাণে তাঁহার নাম নাই। কায়স্থকুল পঞ্জিকা হইতে জানা যায় যে তিনি কায়স্থ ছিলেন। চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশ সম্বন্ধে আদিলপুর বা ইদিলপুরের ঘটকগণের কারিকা ও কতিপয় রজতমুদ্রা ব্যতীত দনুজমর্দনের অস্তিত্বের অন্য কোন নিদর্শন আবিষ্কৃত হয় নাই।

ঐতিহাসিক নীহার রঞ্জন রায় তদীয় পুস্তকে (বাংলার ইতিহাস-আদিপর্ব) বলিয়াছেন: "এইমাত্র আমরা শ্রীচন্দ্রের রামপাল লিপিতে ত্রৈলক্য চন্দ্রদেবের প্রসঙ্গে চন্দ্রদ্বীপের উল্লেখ দেখিয়াছি। ১০১৫ খৃষ্টাব্দের একটি পাণ্ডুলিপিতেও চন্দ্রদ্বীপের তারামূর্তি ও মন্দিরের ইঙ্গিত আছে। বিশ্বরূপ সেনের সাহিত্য পরিষদ লিপিতেও বোধ হয় চন্দ্রদ্বীপের উল্লেখ আছে (ত্রয়োদশ শতক)। এই চন্দ্রদ্বীপের ঘাঘরকাটি পাটক নিশ্চয় ঘাঘর নদীর তীরবর্তী ঘাঘরকাটি নামক

কোন গ্রাম (বরিশাল জেলার ঝালকাটী প্রভৃতি কাটি প্রদত্ত নাম লক্ষ্যণীয়)। এই ঘাঘর নদীর তীরেই ফুল্লশ্রী গ্রামে মনসার পাচালীর কবি বিজয়গুপ্তের বাসভূমি (পঞ্চদশ শতক)।

"পশ্চিমে ঘাঘব নদী পূবে ঘণ্টেশ্বব
মধ্যে ফুল্লশ্রী গ্রাম পতিত নগর।"

যাহা হউক মধ্যযুগে চন্দ্রদ্বীপ বঙ্গের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ স্থান বলিয়া পরিগণিত ছিল। ঐতিহাসিক আবুল ফজল তদীয় বিখ্যাত গ্রন্থ আইন-ই-আকবরীতে বাক্‌লা পরগণাও চন্দ্রদ্বীপকে একই স্থান বলিয়া নির্ধারিত করিয়াছেন। উপরোক্ত মতে চন্দ্রদ্বীপ নাম এবং ঐ স্থান বহুপূর্ব হইতে বিদ্যমান ছিল। চন্দ্রাচার্যের নামানুসারে চন্দ্রদ্বীপ নাম হয় নাই।

চন্দ্রদ্বীপের অন্তর্গত কচুয়া নামক স্থানে দনুজমর্দন দেব রাজধানী স্থাপন করেন। কচুয়ার কমলা সাগর দীঘি সেকালে দেশের প্রসিদ্ধ জলাশয় ছিল। দনুজমর্দনের রাজ্য বাকেরগঞ্জ জিলার দক্ষিণাংশ ও খুলনা জিলার পূর্বাঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র রমাবল্লভও এই বংশের আরও কতিপয় নৃপতি রাজত্ব করেন। এই বংশের সপ্তম অধস্তন পুরুষ রাজা কন্দর্প নারায়ণ রায়। তিনি মাধব পাশায় রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। ইনি বঙ্গের বিখ্যাত বারভূঞার অন্যতম ভূঞা। তাঁহার সুযোগ্য পুত্র রাজা রামচন্দ্র রায় মহারাজ প্রতাপাদিত্যেব জামাতা।

খানজাহান আলী

।। ছয় ।।

পূর্ব পরিচয়

প্রচলিত একটি প্রবাদ হইতে জানা যায় যে খানজাহান আলী পারস্য দেশীয় মুসলমান। তিনি দিল্লীর সুলতান মোহাম্মদ বিন তোগলকের সময় পাক ভারতে আগমন করেন। কথিত আছে যে তিনি পূর্ব হইতে সম্রাটের অভিভাবকরূপে কার্য করিয়া আসিতেছিলেন। স্বীয় প্রতিভাবলে তিনি দিল্লীর সম্রাট মোহাম্মদ বিন তোগলকের মন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। উক্ত প্রবাদে আরও জানা যায় যে তিনি এগার জন আউলিয়া ও ষাট হাজার সৈন্যসহ দিল্লী হইতে বঙ্গদেশে ধর্মপ্রচারের জন্য আগমন করিয়াছিলেন।

অনুরূপ আর এক প্রবাদ হইতে জানা যায় যে তিনি ইমন দেশীয় সওদাগর। ব্যবসায়ের জন্য আত্মীয় পরিজনসহ দিল্লীতে আগমন করেন। পরে তিনি দিল্লীর রাজ সরকারে চাকুরী প্রাপ্ত হন এবং স্বীয় প্রতিভাবলে মোহাম্মদ বিন তোগলকের প্রধান মন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। প্রধান মন্ত্রী থাকা কালে তিনি কতিপয় বিদ্রোহ দমন করেন এবং জৌনপুরে আসিয়া আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করেন। জৌনপুরেই তাঁহার মনের অবস্থা পরিবর্তিত হয়। তিনি সেখানে মস্‌জিদ নির্মাণ করেন। রাজদরবারের ভয়াবহ ষড়যন্ত্র, অত্যাচার, জুলুম, ধ্বংসাত্মক কার্য, শাসক শ্রেণীর দাম্ভিকতা, নরহত্যা এবং যুদ্ধবিগ্রহ দর্শনে তাঁহার মনের অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। কথিত আছে তিনি পবিত্র শবে কদরের রাত্রে দিব্যজ্ঞান লাভ করেন। অসংখ্য লোক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তখন হইতে তাঁহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হইয়া পড়ে মানব সেবা ও তাহাদের আত্মিক ও জাগতিক মঙ্গল সাধন, পবিত্র ইসলাম ধর্ম প্রচার, রাজ দরবার হইতে দূরে অবস্থান এবং সাধনায় আত্মনিয়োগ। এহেন মানসিক পরিবর্তনের ফলে তিনি কতিপয় শিষ্যসহ জৌনপুর ত্যাগ করিয়া বঙ্গদেশে আগমন করেন।

উপরোক্ত দুইটি প্রবাদ অনুসারে খানজাহান মোহাম্মদ বিন তোগলকের মন্ত্রী ছিলেন। কেহ কেহ এই মতের পোষকতা করেন। এহেন প্রবল জনশ্রুতির ঐতিহাসিক মূল্য কতখানি তাহাই আমাদের বিচার্য। মোহাম্মদ বিন তোগলকের পূর্ব নাম উলুঘ খান। বঙ্গদেশ ও অন্যান্য স্থানের বিদ্রোহ দমন করিয়া গিয়াসউদ্দিন তোগলক যখন দিল্লী ফিরিয়া আসিতেছিলেন সেই সময় উলুঘ খান পিতার রাজকীয় অভ্যর্থনার জন্য তোগলকাবাদে একটি শাহী মঞ্চ নির্মাণ করেন। তোগলক শাহের সঙ্গে খাজা নিযামউদ্দিন আউলিয়ার সদ্ভাব ছিল না। এই মহাত্মা তাঁহার দিল্লী প্রত্যাগমন কালে বলিয়াছিলেন "হনুজ দিল্লী দূরস্ত' অর্থাৎ দিল্লী বহুদূরে। যাহা হউক অভ্যর্থনা মঞ্চ নির্মাণ করিতে উলুঘ খান মালিকজাদা ওরফে আহাম্মদ বিন আয়াজের সাহায্য গ্রহণ করেন। ইনি রাজকীয় হর্মরাজির ইন্‌সপেক্টর পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তাঁহারই ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে উলুঘ খানের নির্দেশে এই মঞ্চ নির্মিত হইয়াছিল। যথাসময় অভ্যর্থনা শেষ হইবার পূর্বে তোগলক শাহ মঞ্চোপরি চাপা পড়িয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন, সে কথা ইতিহাস পাঠকগণ জানেন। পিতার মৃত্যুর পর উলুঘ খান মহাসমারোহে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহন করেন এবং আহাম্মদ বিন আয়াজকে "খাজাজাহান" উপাধিতে ভূষিত করিয়া মন্ত্রীপদে অধিষ্ঠিত করেন। ১৩২৫ খৃষ্টাব্দে মোহাম্মদ বিন তোগলক সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ১৩৫১ খৃষ্টাব্দে ২০শে মার্চ মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই সময়ের মধ্যে খাজা জাহান ব্যতীত খানজাহান নামীয় অন্য কেহ তাঁহার মন্ত্রী ছিলেন না। এই খাজা জাহান ঐ বৎসর ২৫শে আগষ্ট তারিখে ফিরোজ তোগলকের রাজত্বের প্রারম্ভে মৃত্যুমুখে পতিত হন। খলিফাতাবাদের মাজার লিপিতে উলুঘ খানেআজম খানজাহান লিখিত আছে। উলুঘ তুর্কী শব্দ। উহা হইতে বুঝা যায় যে তাঁহার পূর্বপুরুষ তুর্কীস্তানের অধিবাসী ছিলেন। খানেআজম খানজাহান ছিল তাঁহার উপাধি। তাঁহার আবির্ভাব কালে বঙ্গদেশ স্বাধীন ছিল। তিনি নাসিরউদ্দিন মাহ্‌মুদ শাহের সমসাময়িক এবং তাঁহার নিকট হইতে উপাধি গ্রহণ করেন। "আলী" শব্দ তাঁহার নামের শেষে পরবর্তীকালে যুক্ত হইয়াছে।

বাগেরহাটে মহাত্মা খানজাহান আলীর কবরগাত্রে তাঁহার মৃত্যু তারিখ দেওয়া আছে ৮৬৩ হিজরী বা ১৪৫৯ সাল। মিঃ জেমস ওয়েষ্টল্যাণ্ড ১৪৫৮ সাল

বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কবরের দেওয়া মৃত্যু তারিখ বিশ্বাস্য এবং গ্রহণযোগ্য। খানজাহান বৃদ্ধাবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার আয়ুষ্কাল ১০০ বৎসরের কিছু অধিক হইলেও তিনি মোহাম্মদ বিন তোগলকের সমসাময়িক হইতে পারেন না। অতএব মন্ত্রী খাজা জাহান এবং আমাদের খানজাহান সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যক্তি। পূর্বোক্ত প্রবাদের কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই। খানজাহান মোহাম্মদ বিন তোগলকের বহু পরে এদেশে আগমন করেন।

খানজাহান সম্পর্কে এ পর্যন্ত কেহ কোন ধারাবাহিক ইতিহাস লিখিয়াছেন কিনা জানি না। যাঁহারা কিছু লিখিয়াছেন তাঁহাদের লেখনীব বিষয়ও আমরা যথাসাধ্য আলোচনা করিব। জনাব মোতাহারুল হক ও ডাঃ আবুল কাসেম দুইটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। মরহুম কবি গোলাম মোস্তফা ১৩২৬ সালে সওগাত পত্রিকায় খানজাহান সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। উক্ত প্রবন্ধে তিনি সতীশবাবুর যশোর-খুলনার ইতিহাসে খানজাহান সম্পর্কে বহু অলীক কাহিনীর অবতারণা করায় তাহার বিশেষ সমালোচনা করিয়াছেন। ইহাতে সতীশ বাবু উষ্মা প্রকাশ করিয়াছিলেন। বশিরুদ্দিন একখানি পুঁথি লিখিয়াছেন। আর একখানি পুঁথিতে খানজাহানের নাম কেশর খাঁ এবং তাঁহার মাতার নাম আঙ্গিয়া বিবি বলা হইয়াছে। আরও অনেকে পুঁথির ভাষায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছেন। পুঁথিগুলি অসম্ভব ও অযৌক্তিক গল্পে পূর্ণ। সেজন্য উহার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন মনে করি।

খানজাহানের পূর্ব পরিচয় সম্পর্কে খুলনা গেজেটিয়ার প্রণেতা মিঃ ওমালী আই, সি, এস, এক গল্পের অবতারণা করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, "তিনি দিল্লীর সুলতান বা বঙ্গের রাজার নিকট হইতে জায়গীর প্রাপ্ত হইয়া যশোর অঞ্চলে আগমন করিয়াছিলেন। জনশ্রুতি আছে যে তিনি সম্রাট আকবরের অন্যতম সভাসদ ছিলেন। কথিত আছে যে জনৈক সন্ন্যাসী সম্রাট আকবরকে একটি মূল্যবান উপহার দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন। গভীর নিশীথে সন্ন্যাসী যখন আগমন করেন, সেই সময় বাদশাহ্ আকবর নিদ্রিত ছিলেন এবং খাঞ্জা আলী তাঁহাকে পাখার বাতাস করিতেছিলেন। সন্ন্যাসী ঘুমন্ত বাদশাহকে বিরক্ত না করিয়া চলিয়া যান। কিন্তু যাইবার প্রাক্কালে তিনি খাঞ্জা আলীকে সেই মূল্যবান উপহার দিয়া যান। সম্রাট আকবর খাঞ্জা আলীর ব্যবহারে

সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ঐ উপহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে আদেশ করেন। সম্রাট তাঁহাকে বসবাসের জন্য প্রচুর অর্থ ও ভূমিদান করিতে স্বীকৃত হন। অতঃপর খাঞ্জা আলী আকবরের শাহী দরবার ত্যাগ করিয়া অসংখ্য অনুচরসহ সুন্দরবন অঞ্চলে আসিয়া জঙ্গল কাটিয়া ভূমি আবাদ করেন।" সম্রাট আকবরের রাজত্বকাল ১৫৫৬-১৬০৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। অতএব এই সময়ে খানজাহান আলীর কার্যকাল একটি অসম্ভব ঘটনা, কারণ তিনি ১৪৪৯ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন এবং ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে ওমালী সাহেবের বর্ণনার কোনই মূল্য দেওয়া যায় না।

সম্প্রতি প্রকাশিত বাংলা একাডেমী পত্রিকায় "ফাতেহাবাদের আউলিয়া কাহিনী" নামে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা প্রায় ৭০ বৎসর পূর্বে একটি উর্দু পাণ্ডুলিপির বঙ্গানুবাদ। প্রাচীনত্বের দরুণ পাণ্ডুলিপিটি স্থানে স্থানে অস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। উহার প্রণেতা সৈয়দ ইনায়েত হোসায়েন বিজভী। এই পুস্তিকায় লিখিত আছে যে হজরত সৈয়দ শাহ্ আলী বাগদাদী পিতার মৃত্যুর পর ইরাক হইতে বাংলা দেশে আগমন করেন। তিনি "৯২৩ হিজরীতে ইন্তেকাল ফরমান। তাঁহার মাজার সম্পর্কে মতানৈক্য বিদ্যমান। অধিকাংশের মতে মাজারটি মোহাম্মদপুর ঝিলের দক্ষিণ-তীরে অবস্থিত। আবার অনেকের মতে ঢাকা শহরের উত্তরদিকে মীরপুরে।" এই উর্দু পুস্তিকায় খানজাহান আলীর নাম লিখিত হইয়াছে। "হজরত শাহ্ পীর খানজাহান আলী (রহঃ)।" আরও বর্ণিত আছে, "পীর শাহ্ খানজাহান আলী ওরফে খাজা আলী কামেল দরবেশ ছিলেন। দিল্লীর দিক্ থেকে জাঁকজমকের সঙ্গে সৈন্যসামন্ত নিয়ে ফাতেহাবাদ পরগণায় হজরত শাহ্ আলী বাগদাদীর খেদমতে উপস্থিত হন। এখানে কিছুকাল থাকার পর শাহ্ আলী বাগদাদীকে নিজের বর্ম দান করে সুন্দরবনের দিকে চলে যান এবং হাবেলী কড়াপুরে বসবাসের বন্দোবস্ত করেন শুনা যায়। পীর সাহেব চট্টগ্রাম গিয়ে হজরত বায়জীদ বোস্তামীর রুহ মোবারকের খেদমতে পাথরের জন্য প্রার্থনা করেন। খোদার দয়ায় তাঁর দোয়া কবুল হয়। সেখান থেকে এক মুঠি পাথর এনে হাবেলী কড়াপুরে খুব বড় এবং উঁচু ষাট গুম্বজের একটি মস্‌জিদ তৈয়ার করেন। এর আশে পাশে ছোট দুইটি মসজিদ ও তালাব খনন করান। সেই তালাবে একটি কুমীর আছে

এর আচরণ প্রায় মানুষের ন্যায়।" পাঁণ্ডুলিপিটি মাত্র ৭০ বৎসরের পুরাতন। এখনও বাগেরহাট অঞ্চলে প্রায় শত বৎসর বয়সের বিশ্বাসযোগ্য কয়েকজন প্রবীন ব্যক্তি জীবিত আছেন। তাঁহাদের নিকট হইতে আমরা খানজাহান সম্পর্কে অনেক বিষয় জানিয়াছি। উক্ত পাণ্ডুলিপিতে মৌলিক গবেষণা নাই বলিয়া মনে করি—দূর অঞ্চল হইতে শুনিয়া লেখা হইয়া থাকিবে। নাম এবং পরিচয় মোটামুটি ঠিক আছে। কড়াপুব স্থলে কাড়াপাড়া বা কস্‌বা হইবে। হজরত বায়জীদ বোস্তামীর প্রসঙ্গ ঐতিহাসিক সত্যের বিপরীত। তিনি খানজাহানের প্রায় ৫০০ বৎসর পূর্বের লোক। পরে এ বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করিব। খানজাহান দিল্লী হইতে সরাসরি ফাতেহাবাদ পরগণায় মহাত্মা শাহ্‌ আলী বাগদাদীর খেদমতে উপস্থিত হন, এরূপ কোন ইতিহাসের সন্ধান পাওয়া যায় না। ইহা সর্ববাদি সম্মত যে বারবাজারেই তাঁহার প্রথম আস্তানা এবং তথা হইতে যদি তিনি ফতেহাবাদ যাইতেন তবে নিশ্চয় পথিপ্রান্তে জলাশয়, রাস্তা বা মসজিদের চিহ্ন থাকিত। বারবাজার হইতে ফতেহাবাদ পর্যন্ত দীর্ঘপথে খানজাহানের কোন কীর্তি চিহ্ন নাই। তদ্ব্যতীত পীর আউলিয়াদের জীবনী লিখিতে গিয়া ভক্তগণ প্রায়ই অতিরঞ্জিত করিয়া ঘটনাবলীর উল্লেখ করিয়া থাকেন। প্রত্যেকে নিজ নিজ পীর বা মোর্শেদকে সর্বাপেক্ষা উচ্চ সম্মান দিয়া থাকেন। উক্ত পাণ্ডুলিপিতে স্পষ্টাক্ষরে লেখা আছে, "শাহ্‌ আলী বাগদাদী ৯২৩ হিজরীতে ইন্তেকাল ফরমান।" খানজাহান আলীর মৃত্যু তারিখ সর্বসম্মতভাবে ৮৬৩ হিজরী অর্থাৎ ৭০ বৎসর পূর্বে। পাণ্ডুলিপির লেখকও ভুলত্রুটির সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। অতএব ফতেহাবাদে খানজাহানের আগমন এবং শাহ্‌ আলী বাগদীকে বর্মদান কথাটির কোন সামঞ্জস্য নাই। উক্ত পাণ্ডুলিপি হইতে অনুসন্ধিৎসু পাঠক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন যে উক্ত বর্মদান ও সাক্ষাৎকারের কাহিনী সঠিক নহে।

সতীশবাবু তদীয় যশোর-খুলনার ইতিহাসে খানজাহানের পরিচয় সম্পর্কে বলিয়াছেন, "এই খাজা জাহান খোজা বা নপুংসক ছিলেন। তাঁহার কোন পুত্রসন্তান ছিল না। তিনি স্বীয় পালিত পুত্র ইব্রাহিমের উপর জৌনপুরের শাসনভার দিয়া ইসলাম ধর্ম প্রচার ও পুণ্য কার্যে শেষ জীবন অতিবাহিত করিবার জন্য পূর্বাঞ্চলে আসেন। ইব্রাহিমের শাসন আরম্ভের পূর্বে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত

হইয়াছিলেন। সেটি অনুমান মাত্র বলিয়া বোধ হয়।··· ··· ···যশোর-খুলনার "খাঞ্জালী পীর" বা খাঁ জাহান আলী এবং জৌনপুর রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা খাজা জাহানকে অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া মনে করি"

মিঃ ওমালী বলেন যে খানজাহানের সময় নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহ্ (১৪৪২-১৪৫৯) বঙ্গের সুলতান ছিলেন। তিনিও প্রফেসার ব্লকম্যানের অভিমত উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে ঢাকায় একটি মস্জিদের দ্বারদেশে একখানি শিলা লিপি হইতে জানা যায় যে উক্ত মসজিদ যিনি নির্মাণ করিয়াছেন তিনি একজন খান। মাহমুদ শাহের রাজত্বকালে তাঁহার উপাধি হইয়াছিল খাজা জাহান।" উক্ত মসজিদের নির্মাণ তারিখ ১৪৫৯ অব্দের ১০ই জুন। ব্লকম্যান অনুমান করিয়াছেন যে এই খাজা জাহান এবং বাগেরহাটের খানজাহান অভিন্ন ব্যক্তি। ইহার পর আর কিছুই জানা যায় না। সতীশবাবু ও ব্লকম্যানের এই মতের সমর্থন করিয়াছেন। তবে তিনি বলিয়াছেন যে এই মাহমুদ শাহ্ বঙ্গেশ্বর নাসিরুদ্দিন মাহমুদ নহেন। তিনি দিল্লীশ্বর মাহমুদ শাহ্ (১৩৯৫-১৪১৪) এবং তিনি তাঁহার সময় খাজা জাহান উপাধি প্রাপ্ত হন।

সতীশবাবু আরও বলিয়াছেন যে খানজাহান বঙ্গে ৫৯ বৎসর অতিবাহিত করেন এবং ৪০ বৎসরের সময় জৌনপুর ত্যাগ করেন। তিনি আরও বলিয়াছেন, "জৌনপুরের সুবিখ্যাত খাজা জাহান ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তিকে তেমন বিনারক্তপাতে দেশ মধ্যে প্রবেশ করিতে হইত না, ইহা নিশ্চিত। যাহা হউক আমরা যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে জৌনপুরের শাসনকর্তা খাজাজাহান ও যশোর-খুলনার খানজাহান আলী একব্যক্তি।"

এখন আমরা উপরোক্ত অভিমতের সত্যাসত্য ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া সবিস্তারে আলোচনা করিয়া স্থির সিদ্ধান্তে পৌছিতে চেষ্টা করিব। যে কয়েকজন ঐতিহাসিক খানজাহানের জীবনী লিখিয়াছেন, সতীশবাবু তাঁহাদের অন্যতম এবং এ বিষয় তিনি যথেষ্ট পরিশ্রমও করিয়াছেন। সতীশবাবুর পুস্তকের অনুকরণে সোনাতলা গ্রাম নিবাসী পশুপতি চট্টোপাধ্যায় এবং সাতক্ষীরার আবুল হোসেন (ভ্রমর)ও খানজাহান আলীর সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতেও উভয়ে জৌনপুরের প্রতিষ্ঠাতা খাজা জাহান এবং বাগেরহাটের খানজাহানকে

অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহারা আরও বলিয়াছেন যে ১৩৯৮ সালে যখন তৈমুরলঙ দিল্লী আক্রমণ করেন, সেই সময় দেশব্যাপী ভীষণ গোলযোগ উপস্থিত হয়। এই সময় খাজাজাহান মালিক-উস-শর্ক দিল্লী ত্যাগ করিয়া বঙ্গে আগমন করেন।

বদাউনী ও অন্যান্য নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা যায় যে দ্বিতীয় মাহমুদ তোগলোকের সময় মালিক সারোয়ার নামে একজন অমাত্য রাজদরবারে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন। মালিক সারোয়ার নপুংসক ছিলেন। স্বীয় ক্ষমতাবলে তিনি মন্ত্রীপদে অবিষ্ঠিত হন। তিনি ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে নাসিরুদ্দিন মাহমুদকে দিল্লীর মস্‌নদে অধিষ্ঠিত করেন। এই সময় তিনি পূর্ব প্রদেশের শাসনভার গ্রহণ করেন এবং মালিক-উস-শর্ক উপাধিতে ভূষিত হন। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে খাজা জাহান দিল্লীর কর্তৃত্ব অস্বীকার করিয়া জৌনপুরের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। সমস্ত ঐতিহাসিকের মতে এই খাজা জাহান ১৩৯৯ খৃষ্টাব্দে জৌনপুরে মৃত্যুমুখে পতিত হন। উড়িষ্যার শাসনকর্তা ও গৌড়ের সুলতান তাঁহার প্রাধন্য স্বীকার করিয়াছিলেন। তিনি আতাবেক ই-আজম উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় পালিত পুত্র মালিক করণফুল "মোবারক শাহ্ শর্বী" উপাধি গ্রহণ করিয়া রাজ্যারোহণ করেন। মোবারকের মৃত্যুর পর তদীয় ভ্রাতা ইব্রাহিম সগৌরবে দীর্ঘ ৩০ বৎসর যাবৎ জৌনপুর রাজ্য শাসন করেন। তিনি জৌনপুরের ঐতিহাসিক অটলা মস্‌জিদ নির্মাণ করিয়াছিলেন। বদাউনী ও অন্যান্য ঐতিহাসিক একবাক্যে খাজা জাহানের মৃত্যু সংবাদ স্পষ্ট ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। পাক ভারতের নির্ভর যোগ্য ইতিহাস গ্রন্থে (Advanced History of India এবং Cambridge History of India) উক্ত খাজা জাহানের মৃত্যুর কথা লিপিবদ্ধ আছে। জৌনপুর শহরেও খাজা জাহানের সমাধি বিদ্যমান। তাঁহার জৌনপুর ত্যাগ ও যশোর-খুলনায় আগমন কোন ইতিহাস পুস্তকে লিখিত নাই। এখন কেমন করিয়া জৌনপুর রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা খাজা জাহান এবং বাগেরহাটের খান জাহানকে অভিন্ন ব্যক্তি বলিতে পারি? সমসাময়িক ইতিহাস গ্রন্থে দেখা যায় যে উভয়ে ভিন্ন ব্যক্তি। সাল তারিখের

সঙ্গে কিছুটা সামঞ্জস্য থাকিলেও উভয়ে পৃথক ব্যক্তি তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। জৌনপুরের সঙ্গে বাগেরহাটের খানজাহানের কোন প্রকার সম্পর্ক স্থাপন করা অসম্ভব বলিয়া মনে করি। সতীশ বাবু প্রমুখ ঐতিহাসিকের তথ্য ভুল প্রমাণিত হইয়াছে।

প্রফেসার ব্লকম্যান ও ওমালী সাহেব ঢাকা মস্‌জিদ গাত্রে যে খাজা জাহানের কথা উল্লেখ করিরাছেন, তিনি গৌড় সুলতান নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহের কোন অধীনস্থ শাসক। এতদ্ব্যতীত বাগেরহাটের খানজাহানের কোন সম্পর্ক ঢাকার সহিত ছিল কিনা জানা যায় না। মস্‌জিদের নির্মাণ কর্তা জনৈক খাঁ, খাজা জাহান উপাধিধারী হইতে পারেন। কিন্তু এই খাজা জাহান ও বাগেরহাটের খান জাহান অভিন্ন ব্যক্তি নহেন। ঢাকার মস্‌জিদ নির্মাতার নাম খাজাজাহান, উলুঘ খানজাহান নহে। কবর গাত্রে খান জাহানের মৃত্যু তারিখ ৮৬৩ হিজরী জিলহজ্জ মাস (১৪৫৯ খৃষ্টাব্দ) লিখিত আছে। ঢাকার মস্‌জিদে ৮৬৩ হিজরী সাবান মাস দেওয়া আছে। এই ব্যবধান মাত্র তিন মাসের। এই তিন মাসের মধ্যে ঢাকা হইতে খুলনায় গিয়া সুন্দরবন আবাদ একেবারেই অসম্ভব। পূর্বোক্ত মসজিদটি ঢাকা শহরের গির্দী কিল্লা মহল্লায় পাগলা গারদের পশ্চিমে নাসওয়ালা গলিতে অবস্থিত। পুরাতন মস্‌জিদের স্থলে বর্তমানে একটি নূতন মসজিদ নির্মিত হইয়াছে। মিঃ সামসুদ্দিন আহম্মদ লিখিত পুস্তকে (Inscriptions of Bengal) ইহার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া আছে।

"কালাল্লাহু তায়ালা অ আন্নাল মাছজেদা লিল্লাহে ফালা তাদ্‌উ মা আল্লাহে আহাদা এছ্‌তাহ্‌কামা হাজাল বাবা অবানা ফি আইয়ামে খেলাফাতাল খলিফাতোল মোছ্‌তায়ান নাছেরউদ্দ্‌নীয়া ওয়াদীন আবুল মোজফফার মাহমুদ শাহ্‌ আছ ছোলতান খাল্লাদা মুলকাহুল মোছতায়ান আল মোখাতেবো বে-খেতাবে খাজা জাহান ছানাহু অলীল আফাতের রাহমান ফি একলিমে হাদ্দে মোবারকাবাদ আছমাহুল্লাহ্‌ এলা ইয়াও মেত্তানাদ অজালেকা কানা ফি এশরিনা মেন শাবান্ন ছানাতো ছালাছা আছেত্তিনা অছামানীয়াতো মেন হেজরাতে ছোনানে ছাল্লুল্লাহো আলায়হে অ আলেহী আজমাঈন।

বঙ্গানুবাদ :— "মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্ বলিয়াছেন, "নিশ্চয় সমস্ত মস্জিদ আল্লার, তাঁহার শরিক করিও না। এই তোরণ আল্লার খলিফার সময় দৃঢ়ভাবে নির্মিত হয় যাঁহার সাহায্য লোকে প্রত্যাশা করে। নাসিরুদ্দুনীয়া ওয়াদীন আবুল মোজাফফর মাহ্মুদ শাহ্ রাজা। আল্লাহ্ তাঁহার রাজত্ব দীর্ঘস্থায়ী করুন। জনৈক খাজা জাহান কর্তৃক ইহা নির্মিত হয়। মোবারকাবাদের সীমান্ত প্রদেশে আল্লাহ্ তাঁহাকে বিপদ হইতে রক্ষা করুন। আল্লাহ্ রোজ-কেয়ামত পর্যন্ত ইহা রক্ষা করুন। ৮৬৩ হিজরী (ইং ১৪৫৯) ২০শে সাবান তারিখ। আল্লাহ্র অনুগ্রহ তাঁহার এবং তদীয় বংশধরের উপর বর্ষিত হউক।" বর্তমানে এই লিখন "প্রস্তর খণ্ড" সহ ঢাকা মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। অধ্যাপক দানীর সঙ্গে আমরা এই প্রস্তরখণ্ডের লিপি পাঠ করিয়া বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। প্রফেসার ব্লকম্যান অনুসন্ধিৎসু লেখক। ঐতিহাসিক গবেষনায় তাঁহার দক্ষতা প্রশংসনীয়। কিন্তু এ বিষয় তাঁহার সহিত আমরা একমত হইতে পারি না। অতএব আমরা স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারি যে ব্লকমান, ওমালী ও সতীশ বাবুর অভিমত সঠিক নহে।

মহাত্মা খানজাহান আলীর সমাধিগাত্রের মৃত্যু তারিখ, তদীয় স্থাপত্য শিল্প ও হর্মরাজি দর্শনে ইহাই প্রতীত হয় যে তোগলোক বংশের রাজত্ব কালে তিনি বঙ্গে আগমন করিয়াছিলেন। আমরা তুর্ক-আফ্গান আমলে কয়েকজন খানজাহানের বিষয় জানিতে পারিয়াছি। প্রথম খানজাহান হোসেন খান, পিতা খানজাহান। ইনি সুলতান বাহ্লুল লোদীর অমাত্য ছিলেন। তিনি খান-ই-জাহান লোদী নামে পরিচিত। দ্বিতীয় সুলতান সেকন্দার লোদীর এক পুত্রের নাম ছিল খান জাহান লোদী। তৃতীয় — রাপরীর শাসন কর্তা ছিলেন খান জাহান লোহানী। চতুর্থ— খান জাহান মালিক সরোয়ার-উল-মুল্ক সৈয়দ বংশের খ্যাতনামা অমাত্য ছিলেন। বেরার ও বিদরে খান জাহান নামীয় আরও দুইজন শাসনকর্তা ছিলেন।

কবর গাত্রে লিখিত আছে যে বাগেরহাটের খানজাহান আলীর রাজকীয় উপাধি ছিল "খানে আজম।" সৈয়দ বংশের সুলতান মোবারক শাহের অন্যতম আমীর সৈয়দ সুলতানের পুত্র সৈয়দ খানের উপাধিও ছিল

"খানে আজম।" সুলতান সেকন্দর লোদীর আমীর অন্য আর এক খানে আজম মেওয়াটের শাসনকর্তা ছিলেন। এই সমস্ত "খান জাহান" ও "খানে আজমের" সহিত আমাদের খান জাহানের কোন সম্পর্ক স্থাপন করা একেবারেই অসম্ভব।

এখন আমরা তোগলোক আমলে কয়েকজন খানজাহান সম্পর্কে আলোচনা করিব। প্রথমে খানজাহান মালিক কাবুল বা খানজাহান মক্‌বুল। ইনি ফিরোজ তোগলোকের মন্ত্রী ছিলেন। ফিরোজ শাহ্ যখন গৌড়ের সুলতান সামসুদ্দিন ইলিয়াসের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন তখন তিনি প্রধান মন্ত্রী খান জাহান মক্‌বুলকে দিল্লী নগরীর ভার অর্পণ করিয়া যান। ১৩৭০ খৃষ্টাব্দে মন্ত্রীপ্রবর মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তৎপুত্র জোনা শাহ্ পিতার স্থলাভিষিক্ত হইয়া খানজাহান উপাধি প্রাপ্ত হন। দ্বিতীয় খানজাহান স্বীয় অসাধারণ বুদ্ধি কৌশলের জন্য রাজ্যের সর্বেসর্বা হইয়া উঠেন। এমন কি তিনি শাহ্জাদা মোহাম্মদের বিরুদ্ধে বড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। শাহ্জাদা একদা অতীব সংগোপনে পিতৃসকাশে উপস্থিত হইয়া মন্ত্রীর বিরুদ্ধে সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া দেন। অতঃপর শাহজাদা খানজাহানকে হত্যা করিয়া তাহার মস্তক মোহাম্মদ শাহের নিকট প্রেরণ করেন (১৩৮৭ খৃষ্টাব্দ)। বদাউনীর মতে ফিরোজ তোগলোকের দৌহিত্র তোগলোক শাহের সময় ১৩৮৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে নিহত করিয়া তাঁহার মস্তক ঝুলাইয়া রাখা হয়। তৃতীয় খানজাহান মালিক ফিরোজ আলী ইব্‌নে মালিক তাজ্‌উদ্দিন ও মন্ত্রী ছিলেন। তাহার বিস্তারিত পরিচয় আমাদের জানা নাই।

উপরে আমরা যে প্রথম ও দ্বিতীয় খানজাহানের কথা উল্লেখ করিলাম— পিতাপুত্র উভয়ে ফিরোজ তোগলোকের স্বনামধন্য মন্ত্রী ছিলেন। দ্বিতীয় খানজাহান মন্ত্রী হিসাবে সর্বময় কর্তৃত্ব করিতেন। তিনি বিপুল সম্পদের অধিকারী ছিলেন। পিতার সময় হইতে তাঁহাদের বিপুল অর্থ সঞ্চিত হইয়াছিল। কথিত আছে যে প্রথম খানজাহানের সময় হইতে ফিরোজ শাহ্ এই বংশের উপর বংশানুক্রমে খানজাহান উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। তাহা হইলে দ্বিতীয় খানজাহান নিষ্ঠুরভাবে নিহত হইবার পরও তাঁহার

পুত্র খানজাহান উপাধি গ্রহণ করিতে পারেন। বদাউনীর মতে দ্বিতীয় খানজাহানের মৃত্যু তারিখ ১৩৮৯ খৃষ্টাব্দ। এই সময় সম্ভবতঃ রাজদরবারের ষড়যন্ত্র ও ভীষণ গোলযোগের মধ্যে দ্বিতীয় খানজাহানের জনৈক পুত্র বংশানুক্রমে সঞ্চিত বিপুল ধনরাশি সহ কতিপয় বিশ্বস্ত বন্ধু-বান্ধব সমভিব্যাহারে বঙ্গদেশে আগমন করিয়াছিলেন। দিল্লী হইতে বঙ্গদেশ পর্যন্ত তখন রেল লাইন বা ষ্টীমার তো দূরের কথা দ্রুত আগমনের কোন উপায় ছিল না। সেইজন্য বিপুল ধনভাণ্ডারসহ কেহ মহানগরী ত্যাগ করিলে অরাজকতা ও গোলযোগের মধ্যে সহসা খোঁজ খবর লওয়া সম্ভবপর ছিল না।

কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে খানজাহান দিল্লীর সম্রাটের আদেশে মহানগরী হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন। মওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ এই মত সমর্থন করেন। বাবু গৌর দাস বসাক বলিয়াছেন: "খানজাহান দিল্লীর রাজদরবার হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন। পরে তাঁহাকে তহশীলদার বা রাজস্ব বিভাগের শাসক করিয়া বাগেরহাটে প্রেরণ করা হয়। পক্ষান্তরে মিঃ ব্লকম্যান বলেন যে দিল্লীর সম্রাট খানজাহানকে দূরদেশ বিজয়ের জন্য প্রেরণ করেন। তিনি অদ্ভুতকর্মা পুরুষ ছিলেন এবং বহু অসাধ্য কার্যে সিদ্ধিলাভ করেন।

খানজাহান যে বিপুল ধনভাণ্ডারসহ এদেশে আসিয়াছিলেন তাহা সহজেই অনুমেয়। তিনি ফিরোজ শাহের মন্ত্রী খানজাহানের বংশধর হওয়াই সম্ভব। কথিত আছে তাঁহার সহিত ষাট হাজার সৈন্য ছিল। এই সংখ্যা অতিরঞ্জিত বলিয়া মনে হয়। তবে বারবাজার হইতে বাগেরহাট পর্যন্ত পথিমধ্যে প্রকাণ্ড জলাশয় সমূহ ও রাজপথ খনন করিতে বিপুল ধনরাশির প্রয়োজন হইয়াছিল। আমাদের মনে হয় তিনি এত বিপুল অর্থ ও স্বর্ণরৌপ্য সঙ্গে আনিয়াছিলেন যে জনহিতার্থে মুক্ত হস্তে দান করিয়া যাইতেন। সেই সময় দিল্লীর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন ছিল। তৈমুরের আক্রমণের পূর্বে বা প্রাক্কালে রাজধানী দিল্লী ভয়াবহ ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহের লীলাভূমি ছিল। ফিরোজ শাহের দীর্ঘ শাসনের পর সিংহাসন লইয়া ভীষণ গোলযোগ চলিয়াছিল। পাঁচ বৎসরের মধ্যে পর পর এই বংশের পাঁচ ব্যক্তি সিংহাসন আরোহণ করিয়াছিলেন। নির্জীব মাহমুদ তোগলোকের সময় রাজ্যের সর্বত্র অরাজকতা বিস্তার করিতেছিল। ইত্যবসরে যদি কেহ বিপুল ধনরাশি সহ

মহানগরী দিল্লী ত্যাগ করেন কে তাঁহার খোঁজ রাখিবে? খোঁজ রাখিবার আবশ্যকতাই বা কোথায়? গোপনে বা প্রকাশ্যে এই ধরণের প্রস্থান সম্ভবপর ছিল। খানজাহান এমন এক মুহূর্তে কতিপয় বিশ্বস্ত আত্মীয় ও সঙ্গীসহ দিল্লী ত্যাগ করিয়া আসেন। দিল্লী হইতে পদব্রজে আসিতে আসিতে তিনি পথিমধ্যে অসংখ্য শিষ্য সংগ্রহ করেন। সমস্ত সঙ্গী ও সৈন্যদের তিনি দিল্লী হইতে আনয়ন করেন নাই এবং উহা সম্ভবও ছিল না। দিনের পর দিন সুদূর দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া অবশেষে বারবাজারে আসিয়া আস্তানা করিয়া বিশ্রাম গ্রহণ করেন। তখনকার দিনে বঙ্গদেশ হইতে খানজাহানের পৌঁছা সংবাদ দিল্লীতে পৌঁছিতে বহুদিন লাগিত। এতদ্ব্যতীত গৌড়ের সুলতান তখন স্বাধীন ছিলেন। বঙ্গদেশ তখন দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করে নাই। কাজেই স্বাধীন গৌড় সুলতানের আদেশ লইয়া খানজাহান বাগেরহাট অঞ্চলে সুন্দরবন আবাদ করার জন্য এবং ইসমাম প্রচারার্থে আগমন করেন।

খানজাহান বাজদরবারেব ভয়াবহ ষড়যন্ত্র, বিদ্রোহ ও সংসার ধর্মে বিতৃষ্ণ হইয়া নির্জন স্থানে থাকিয়া ধর্ম প্রচারে এবং মানব সেবায় আত্মনিয়োগ করিবার জন্য সুন্দরবন অঞ্চলে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব পরিচয় অস্পষ্ট। তিনি নিজেও স্বীয় পরিচয় প্রকাশ করেন নাই। তিনি নিশ্চয় কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারের ধর্মপ্রাণ ও বিজ্ঞ সন্তান। অন্তরে অহমিকা উপস্থিত বা কার্যসিদ্ধিব অন্তরায় হয় মনে করিয়া সম্ভবতঃ তিনি নিজ পরিচয় প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার সমাধি গাত্রের খেদিত লিপি হইতে জানা যায় যে তিনি এক জন প্রবাসী এবং ধর্মের জন্য স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। তিনি আল্লার দাস এবং হজরত মোহাম্মদের বংশধরেব ভক্ত। তাঁহার নাম উলুঘ খান জাহান, খানে আজম। তিনি এগারো জন আউলিয়াসহ যে স্থানে অবতরণ করিয়াছিলেন তদনুসারে সেই স্থানের নাম হইয়াছিল বারবাজার, সে কথা পূর্বেই বলিয়াছি। এই বারবাজার যশোর শহর হইতে এগারো মাইল উত্তর পশ্চিম দিকে অবস্থিত প্রাচীন স্থান। এই স্থান হইতে খানজাহান তাঁহার বিরাট কর্মক্ষেত্রে নামিয়া পড়েন।

হজরত খানজাহান দিল্লী নগরী হইতে আগমন করেন বা তিনি বঙ্গদেশেই পূর্ব হইতে ছিলেন এ বিষয় লইয়া অধ্যাপক ডক্টর এম, এ, করিম এবং ডক্টর

আবদুল কাদের কয়েকটি প্রবন্ধ ১৯৫৭ সালে ইংরাজী দৈনিক "পাকিস্তান অবজার্ভারে" লিখিয়াছিলেন। ডক্টর করিম বলিয়াছেন খানজাহান বঙ্গদেশেই ছিলেন। দিল্লী হইতে আসেন নাই। ডক্টর আবদুল কাদের বলেন যে তিনি দিল্লী হইতে আগমন করিয়াছিলেন। খানজাহান আমাদের নিকট এক অভিনব ও বৈচিত্রময় ইতিহাস রাখিয়া গিয়াছেন। খ্যাতনামা রাজা বা বাদশাহ হইলে দেশের সমসাময়িক ইতিহাসে তাঁহার পরিচয় পাওয়া যাইত। ডক্টর আবদুল কাদের ও ডক্টর আবদুল করিম উভয়ের প্রবন্ধে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা আছে। কিন্তু দৈনিক পাকিস্তান অবজার্ভারে আনোয়ার হোসেন বিগত ১০ই অক্টোবর ১৯৬৫ সালে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধে সতীশবাবুর অনুকরণ করা হইয়াছে। ইহাতে খানজাহান বিশাল রাজ্যের অধিপতি এবং তাঁহার বহু অলৌকিক গুণাবলীর বিষয় অতিরঞ্জিত করিয়া লেখা হইয়াছে। ডক্টর এম, এ, করিমের মতে খানজাহান মাহমুদ শাহের অধীনস্থ কর্মচারী এবং গৌড় সুলতানের নিকট হইতে তিনি উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সৈয়দ মুর্তজা আলী খানজাহান সম্পর্কে ১৪ই নভেম্বর ১৯৬৩ সালে মর্ণিং নিউজ পত্রিকায় এবং ২৫শে মে ১৯৬২ সালে লাহোরের পাকিস্তান টাইমসে দুইটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তাঁহার মতে খানজাহান দিল্লীর সুলতানের কর্মচারী ছিলেন এবং দিল্লীর অরাজকতার সুযোগে তিনি বঙ্গে আসিয়া ইসলাম প্রচার ও রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি আরও বলেন যে খানজাহান নির্মিত মসজিদের স্থাপত্য রীতি তোগলকদের ন্যায়, তাহাতেও অনুমিত হয় তিনি দিল্লী হইতে আগমন করিয়াছিলেন।

বারবাজার আগমন ও যশোর অঞ্চলের কীর্তিরাজি

খানজাহান অন্যত্র না গিয়া বারবাজার অবস্থান করিলেন কেন? এই স্থানে তখন একটি শহর ছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। বারবাজার হিন্দু ও বৌদ্ধ আমলে—এই দুই জাতির শাসনকেন্দ্র ছিল বলিয়া অনেকে অনুমান করিয়াছেন। কেহ কেহ অনুমান করেন যে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে লিখিত গ্রীক ইতিহাস (Periplus of the Erythrean Sea) পেরিপ্লাসে বর্ণিত গঙ্গারিডি রাজ্যের রাজধানী বারবাজারেই অবস্থিত ছিল। খৃষ্টপূর্ব প্রথম

শতাব্দীতে ভাৰ্জিল তাঁহার জার্জিকাস নামক কাব্যে লিখিয়া গিয়াছেন যে তিনি জন্মভূমি মণ্টুয়া নগরীতে ফিরিয়া একটি মর্মর মন্দির স্থাপন করিয়া তাহার শীর্ষদেশে স্বর্ণ ও গজদন্তে গঙ্গারিডিদিগের বীরত্বের কথা খোদিত করিবেন। ইহা হইতে এদেশীয় লোকের শৌর্যবীর্যের কথা প্রতীয়মান হয়।

বারবাজার অঞ্চলে এখনও বহু দীঘি (লোকে বলে ছয় বুড়ি ছয়টা অর্থাৎ একশত ছাব্বিশটি) বিদ্যমান থাকিয়া উহার প্রাচীনত্বের সাক্ষ্য বহন করিয়া আসিতেছে। প্রত্যেকটি পুকুরে পাকা ঘাট ছিল। অনেকগুলি পুকুর এখনও প্রায় পূর্বাবস্থায় আছে। হিন্দু, বৌদ্ধ ও মুসলমান আমলে প্রায় দশ বর্গমাইল জুড়িয়া এই শহর বিস্তৃত ছিল। শহরের উত্তরদিকে খোসালপুর ও পিরোজপুর গ্রামদ্বয়, পূর্বে বাদুড়গাছা ও পিরোজপুর, দক্ষিণে ভৈরব নদী এবং পশ্চিমে সাতগাছি গ্রাম। এখনও স্থানে স্থানে মরাখাল ও নদীর চিহ্ন আছে। কথিত আছে যে সুবিদপুর গ্রামে সমসনদীর মধ্যে চাঁদ সওদাগরের দুইখানি বাণিজ্যপোত নিমজ্জিত হয়। এখনও জাহাজের ন্যায় মৃত্তিকার আকৃতি দেখিয়া লোকে চাঁদ সওদাগরের স্মৃতি চিহ্ন বহন করিয়া আসিতেছে। গাজী কালুর ঐতিহাসিক বিরাট নগর এখানকার বেলাট দৌলাতপুর মৌজা। এই শহরের সর্বত্র স্তূপ দেখা যায়। এখনও প্রায় ২০।২১টি স্তূপ দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে জোড় বাংলা স্তূপ সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। সর্বত্র ইষ্টক, মৃত্তিকা খুড়িলে প্রচুর ইট পাওয়া যায়। অনেক সময় মৃত্তিকার নিম্নে বিভিন্ন প্রকার মৃন্ময় পাত্র, থালা-বাসন, লোহার অলঙ্কার এবং মুসলমান আমলের মুদ্রা পাওয়া যায়। সাধু সন্ন্যাসীদের ব্যবহারের একটি বড় লোহার চিম্‌টা কয়েক বৎসর পূর্বে পাওয়া গিয়াছিল। অনেক স্থানে ইটের জন্য হলকর্ষণ অসম্ভব হইয়া পড়ে। বারবাজার হইতে সাত মাইল পশ্চিমে ধোপাদী গ্রামে বলু দেওয়ানের দরগা আছে। বেলাট দৌলতপুরে নামাজগায় পূর্বে ঈদের নামাজ হইত।

শ্রীরাম রাজার গড়বেষ্টিত রাজবাড়ীর দক্ষিণ দিকে বিরাট দিঘি তাঁহার কীর্তি অদ্যাপী রক্ষা করিতেছে। এই প্রাচীন শহরের যেখানে সেখানে প্রস্তর পড়িয়া আছে। অনেকগুলি প্রস্তর ও প্রস্তরখণ্ড পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি উহা বাগেরহাটের খানজাহান আলীর পাথরের ন্যায়। প্রায় তিরিশ বৎসর পূর্বে

হলকর্ষণের সময় একটি কামানের নল পাওয়া গিয়াছিল। জলাশয়ের মধ্যে রাণীমাতার দীঘি, সওদাগরের দীঘি (সম্ভবতঃ চাঁদ সওদাগর নামীয় দীঘি), শ্রীরাম রাজার দীঘি, ভাইবোনের দীঘি, খোন্দকারের দীঘি, গোড়ার পুকুর, চাল ধোয়ানীর পুকুর, পাঁচ পীরের দীঘি, বেড় দীঘি, গলাকাটার দীঘি, বিশ্বাসের দীঘি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বেড়দীঘির মধ্যে একসময় বাড়ী ছিল। পীর পুকুরের পার্শ্বে পূর্বে মেলা বসিত। খোন্দকারের দীঘির পার্শ্বে ছিলেখানা বা অস্ত্রাগার ছিল। এই দীঘির পার্শ্বে দরগা ও মাজার আছে। বারবাজারের সর্বত্র এবং বিশেষ করিয়া পথিপার্শ্বে মানুষের অগণিত অস্থি দৃষ্ট হয়। মৃত্তিকার নিম্নে প্রায় সর্বত্র মানুষের অখণ্ড কঙ্কাল ও হাড় পাওয়া যায়। ইহাতে সহজেই অনুমান করা যায় যে এক সময় এই শহরে অসংখ্য লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং শহরটি মানুষ অভাবে জঙ্গলকীর্ণ হইয়া পড়ে। গভর্ণমেণ্ট হইতে বারবাজারে খনন কার্য চালাইলে পাহাড়পুর বা মহাস্থানের ন্যায় প্রাচীন ইতিহাসের উদ্ধার সাধন হইতে পারে

বারবাজার অতীব প্রাচীন স্থান তাহা পূর্বোক্ত আলোচনা হইতে সপ্রমাণিত হইয়াছে। ইহার একাংশের নাম ছাপাই নগর ছিল। গাজী কালুর প্রসঙ্গে আমরা এ বিষয়ে আরও আলোচনা করিব। খানজাহান বারবাজার আসিয়া অনেকগুলি দীঘি ও মসজিদের প্রতিষ্ঠা করেন। বারবাজারের জরাজীর্ণ ঐতিহাসিক মসজিদটি এখনও খাণজাহানের কীর্তি ঘোষণা করিতেছে। খানজাহান নামীয় কোন দীঘি না থাকিলেও উহার কয়েকটি যে তিনি খনন করাইয়াছিলেন তাহা সহজেই অনুমেয়। বারবাজরের মসজিদটি এক গুম্বজ বিশিষ্ট এবং উহা বাগেরহাটের পশ্চিমে রণবিজয়পুরে ফকির বাড়ীতে অবস্থিত খানজাহানের অন্যতম মসজিদের আকৃতিবিশিষ্ট। মসজিদটির উপরে একটি প্রকাণ্ড ছিদ্র হইয়া গিয়াছে। উহা হইতে বারিপাত নিবারণও সম্ভব নহে। মসজিদের দেওয়ালগাত্রের প্রসস্ততা ৪½' ফুট। পূর্বে এই মসজিদ পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল। ১৩৩৪ সালে ফুরফুরার মরহুম পীর মাওলানা আবুবকর সিদ্দিকী সাহেব এখানে আসিয়া এই মসজিদে নামাজ পড়া শুরু করিয়া দেন। মসজিদের ভিত্তি ও নামাজের স্থান বসিয়া গিয়াছে। কেহ কেহ এই মসজিদের গুম্বজ দেখিয়া উহাকে মন্দির বলিয়া সন্দেহ করিয়াছিলেন। কিন্তু বাগেরহাটে

খানজাহানের স্থাপত্য শিল্প যাহারা লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহারা সহজেই বুঝিতে পারিবেন, ইহা কোন মন্দির নহে, খানজাহানের কীর্তি। সতীশবাবুও ইহাকে খানজাহানের মসজিদ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

খানজাহান বারবাজারে অবস্থান করিবার পর এই স্থান মুসলমানে ভরিয়া যায়। পার্শ্ববর্তী গ্রাম সমূহের নাম যথাক্রমে রহমতপুর, মুরাদগড়, দৌলতপুর, সাদিকপুর, হাসিলবাগ, এনায়েতপুর। ইহা হইতে সহজেই অনুমান করা যায় যে এক কালে এই অঞ্চল মুসলমান অধ্যুষিত এলাকা ছিল। বারবাজারে আসিয়া খানজাহান অসংখ্য শিষ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

মুরলী হইতে বেদকাশী

বারবাজারে কিছুকাল অবস্থানের পর খানজাহান সদলবলে ভৈরবতীর বহিয়া মুরলী উপস্থিত হন। মুরলী অতীব প্রাচীন স্থান সে বিষয় ইতিপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। মুরলী এবং বারবাজারে বৌদ্ধ সংঘারাম ছিল বলিয়া অনুমতি হইয়াছে। খানজাহান এই স্থানের নাম করেন মুরলী কসবা। কসবা ফার্সী শব্দ, উহার অর্থ শহর। মুরলী বর্তমান যশোর শহরের সংলগ্ন উপশহর। মুরলীতে মধ্যযুগে সৈন্যবাহিনীর জন্য মৃত্তিকা গর্ভে কেল্লা ছিল। সে নিদর্শন এখন নাই। এখনও লোকে সেখানকার বসতবাটীকে কেল্লাবাটী বলিয়া থাকে। প্রাচীন আমলের শিব মন্দির ও কালীবাড়ী আছে। হাজী মহসীন প্রতিষ্ঠিত ইমামবাড়া এখানেই অবস্থিত।

যশোরে খানজাহান দীর্ঘদিন অবস্থান করেন নাই। তাঁহার দুইজন প্রধান শিষ্য ইসলাম প্রচারের জন্য এখানে থাকিয়া যান। তাঁহাদের নাম বাহ্‌রাম শাহ বা বোরহানুদ্দিন এবং গরীব শাহ্। তাঁহাদের সম্বন্ধে একটি প্রবাদ আছে যে তাঁহারা মুরলীতে অনুচরবর্গের খাদ্য প্রস্তুতের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। যথাসময় মুরলীতে পৌছিয়া তাঁহারা খাদ্য প্রস্তুতের চেষ্টা করেন। কিন্তু সময়মত খাদ্য প্রস্তুত না হওয়ায় খানজাহান এখানে অবস্থান না করিয়া চলিয়া যান। তিনি গরীব শাহ্ ও বাহরাম শাহ্‌কে ঐখানেই রাখিয়া যান। প্রেসিডেন্সী বিভাগের প্রাচীন মনুমেন্টের তালিকায় গল্পটি লিখিত আছে। কিন্তু উহার কোন





উপরে : পীর গরীব শাহের মাজার ও স্মৃতি সৌধ, পুরাতন কসবা—[illegible]

নীচে : পীর [illegible]দ্দীনের মাজার— যশোর টাউন—.

ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে বলিয়া মনে করি না। যাহা হউক খানজাহান ভৈরব তীরে প্রাচীন মুরলীতে একটি ইসলাম প্রচারের কেন্দ্র সংস্থাপন করেন। ক্রমে ঐ স্থান শহরে পরিণত হয়। উহাই মুরলী কসবা। পুরাতন কসবাও ঐ সময়কার শহর। গরীব শাহ্ ও বোরহান শাহ লোকদিগকে ইসলামের আদর্শ বুঝাইয়া দিতেন। লোকে তাঁহাদিগকে বিশেষভাবে শ্রদ্ধা করিত। এই দুই মহাত্মার মাজার যশোর শহরে বিদ্যমান থাকিয়া তাঁহদের পুণ্য স্মৃতি রক্ষা করিতেছে।

যশোর শহরে অবস্থিত পুলিশ অফিসের পার্শ্ব দিয়া যে রাস্তা পশ্চিমদিকে প্রায় এক মাইল গিয়াছে উহারই পার্শ্বে বোরহানউদ্দীনের সমাধি। পূর্বে এই স্থান জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। জনৈক খাদেম জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া একটি নূতন মসজিদ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। জঙ্গলের মধ্য হইতে পাকা কবরটি আবিষ্কৃত হইয়াছে। কবরের পূর্ব পার্শ্বের প্রকাণ্ড দীঘি বোরহান শাহ্ কর্তৃক খনিত হইয়াছিল। দীঘির পশ্চিম তীরে একখানি কৃষ্ণ প্রস্তর পড়িয়া আছে। কলেজের কয়েকজন ছাত্র আমাদিগকে বলিল যে উহা পীর সাহেবের পাথর, কেহই উহা নাড়াইতে পারে না। যেখানেই প্রাচীন কীর্তি সেখানেই এই ধরণের আজগুবি গল্প শুনা যায়। বর্তমানে এই কবরের পার্শ্ববর্তী স্থান সাধারণের গোরস্থানে পরিণত হইয়াছে।

যশোর শহরের পুরাতন কসবা অঞ্চলে ফৌজদারী কোর্টের উত্তরে ভৈরব তীরে গরীব শাহের মাজারের উপর এক গুম্বজ বিশিষ্ট ক্ষুদ্র মসজিদের ন্যায় একটি স্মৃতি সৌধ আছে। সমাধিগাত্র মূল্যবান রঙ্গীন বস্ত্রদ্বারা সর্বদা আবৃত থাকে। লোকে গরীব শাহের নামে সিন্নি মানত করে। যশোরের লোকেরা বিশ্বাস করে যে গরীব শাহের মাটিতে অত্যাচার সহ্য হইবে না। স্রোতস্বিনী ভৈরব এককালে তীরভূমি ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে গরীব শাহের মাজার পর্যন্ত পৌঁছিয়াছিল। তবে মাজারটি কোন প্রকারে রক্ষা পাইয়াছে। যশোর জিলার শ্রীপুর থানার নোহাটা গ্রামে গরীব শাহের প্রকৃত কবর অবস্থিত বলিয়া দাবী করা হয়। নোহাটার কয়েক ঘর অধিবাসী গরীব শাহের বংশধর বলিয়া পরিচয় দেয়। সেখানে প্রবাদ আছে যে মৃত্যুকালে গরীব শাহ বলিয়াছেন যে তাঁহার কবরের উপর যেন কোন প্রকার স্মৃতিসৌধ স্থাপিত না হয়। ইহা কতদূর সত্য তাহা জানা যায় নাই।

মুরলী কসবা হইতে খানজাহানের অনুচরবর্গ দুইদিকে বিভক্ত হইয়া পড়ে। একদল কপোতাক্ষ নদী বহিয়া সুদূর সুন্দরবন অঞ্চলে বেতকাশী পর্যন্ত গিয়া ইসলাম প্রচার করিয়াছিল। অন্যদল ভৈরবকূল দিয়া পায়গ্রাম কসবায় পৌঁছিয়াছিল, সে কথা পরে আলোচিত হইবে। এখন দক্ষিণ দিকের বাহিনীর বিষয়ই আমাদের আলোচ্য। সেকালে বারবাজার হইতে মুরলী পর্যন্ত রাস্তা ছিল। উহার নাম হইয়াছিল গাজীর জাঙ্গাল। যশোর হইতে দক্ষিণ ও পূর্ব দুইদিকেই খানজাহান আলী বা খাঞ্জা আলীর রাস্তা বা জাঙ্গাল আরম্ভ হইয়াছিল। পূর্বেই বলিয়াছি খানজাহানের অসংখ্য শিষ্য ও অনুচর জুটিয়াছিল। তাহারা সকলেই সৈন্য শ্রেণীভুক্ত ছিল। এই সৈন্যদল বসিয়া বসিয়া রাজকোষ শূন্য করিত না। তাহারা সর্বদা কায়িক পরিশ্রম করিয়া রাস্তা ও মসজিদ নির্মাণ এবং জলাশয় খনন কার্যে লিপ্ত থাকিয়া সময়ের সদ্ব্যবহার করিত। তাহাদের প্রত্যেকের এক একখানি কোদাল ছিল। খানজাহান যে অদ্ভুতকর্মা পুরুষ ছিলেন, ইহা তাহার জ্বলন্ত নিদর্শন।

খানজাহানের যে বাহিনী যশোর হইতে সুন্দরবনের দিকে প্রেরিত হইয়াছিল তাহার নেতা ছিলেন বোরহান খাঁ বা বুড়ো খাঁ। তাঁহার সুযোগ্য পুত্রের নাম ফতে খাঁ। পিতাপুত্র উভয়ে ধর্মপ্রাণ ও কর্মনিপুণ সৈনিক ছিলেন। তাঁহারা পথিমধ্যে মসজিদ নির্মাণ, জলাশয় খনন, জঙ্গল কর্তন ও ইসলাম প্রচার করিতে করিতে সুদূর সুন্দরবনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। যশোর হইতে সর্বপ্রথম তাঁহারা খানপুরে উপস্থিত হইয়া তথাকার বহু অধিবাসীকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন। খানপুর হইতে অনুচরবর্গ বিদ্যানন্দ কাটীতে আস্তানা স্থাপন করে। এখানে তাহারা একটি প্রকাণ্ড দীঘি খনন করে। সেই আমলের বহু কীর্তিমালার ধ্বংসাবশেষ এখনও এতদঞ্চলে বিদ্যমান। বিদ্যানন্দ কাটীর দীঘির দৈর্ঘ্য ১৬০০ হাত এবং প্রস্থ প্রায় ৭০০ হাত। প্রতি বৎসর এখানে খান জাহানের নামে মেলা বসিয়া থাকে। খানজাহান এতদঞ্চলে পীর বলিয়া খ্যাত। বিদ্যানন্দকাটী অঞ্চলে খানজাহানের নাম অক্ষয় হইয়া রহিয়াছে। এই স্থানের নিকটবর্তী সরফ আবাদ = সরফাবাজ ও মীর্জাপুরে কয়েকটি দীঘি খানজাহানের অনুচরবর্গ জনসাধারণের জলকষ্ট নিবারণের জন্য খনন করে। লবনাক্ত পল্ললময় দেশে ইহাই তখন ছিল প্রথম ও প্রধান সমস্যা।

ত্রিমোহিনীর সন্নিকটে গোপালপুরে খানজাহানের জনৈক শিষ্য একটি মসজিদ নির্মাণ করিয়াছিলেন। উহা অদ্যাপি বিদ্যমান। গোপালপুর হইতে দক্ষিণ দিকে কপোতাক্ষের কুলে মেহেরপুর গ্রামে পীর মেহের উদ্দীনের সমাধি সৌধ দৃষ্টিগোচর হয়। এই গোরস্থানের পার্শ্বে পীর সাহেবের সর্প ও হাতীর গোরস্থান আছে বলিয়া কথিত হয়। উহাও ইষ্টক নির্মিত বেদীর দ্বারা চিহ্নিত। উত্তর দিকে একটি পাকা ইন্দিরা আছে। মেহেরপুর হইতে দক্ষিণ দিকে তালা থানার অন্তর্গত মাগুরা গ্রামে পীর জঈনউদ্দীন শাহ (পীর জয়ন্তী, হিন্দুদের বিকৃত নাম) নামক এক সাধকের দরগা দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা খানজাহানের অনুচর নহেন। পীর জয়ন্তী এতদঞ্চলে বিশেষ সম্মানিত এবং লোকে তাঁহাকে বড় পীর সাহেব বলিয়া সম্মান করে। অনেকে অবশ্য তাঁহাকে খানজাহানের সঙ্গী বলিয়া জানেন। কপোতাক্ষ বহিয়া আরও কিছুদূর অগ্রসর হইলে সুজনশাহ গ্রামে সুজন শাহের আস্তানা দৃষ্টিপথে পতিত হয়। সুজনশাহ গ্রামে তাঁহার বসতবাটীর চিহ্ন ও বিরাটকায় দীঘি আছে। তিনি খানজাহানের অনেক পরে এখানে আসেন। তাঁহার প্রকৃত নাম শাহ সুজাউদ্দীন।

খানপুর ও বিদ্যানন্দকাটি হইতে খানজাহানের অনুচরবর্গ রাস্তা প্রস্তুত করিতে করিতে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন। এখনও সেই প্রাচীন রাস্তার স্থান লোকে দেখাইয়া থাকে। এই রাস্তা যশোর হইতে আরম্ভ হইয়া খানপুর, কেশবপুর, বিদ্যানন্দকাটি হইয়া মাগুরাঘোনা, ডাঙ্গানলতা, ভায়ড়া, তালা, কপিলমুনি ও সরল হইয়া শিবসা নদী অতিক্রম করিয়াছে। শিবসা নদী পার হইয়া এই রাস্তা আমাদী ও মসজিদকুড়ে মিশিয়াছে। কথিত আছে যে এই রাস্তা তৎকালে সুন্দরবনের অন্তর্গত বেদকাশী নামক স্থানে শেষ হইয়াছিল। কপোতাক্ষ নদীর পার্শ্ব দিয়া এই রাস্তা প্রস্তুত হইয়াছিল। পথের দুইদিকে বহু কীর্তি চিহ্ন আজিও বিদ্যমান।

খানজাহানের শিষ্যবর্গ বা সমসাময়িক ধর্মপ্রচারকেরা তালা থানার আটারই গ্রামে তিন গুম্বজ বিশিষ্ট একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। উহাতে আরবী লিপি খোদিত আছে। আজিও উহার পাঠোদ্ধার হয় নাই। ঐ গ্রামে হাজী দীঘি নামে একটি প্রাচীন জলাশয় বিদ্যমান। একটি প্রাচীন বৃহৎকায় ভিটি এবং

কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভিটি আছে। এগুলি প্রাচীনকালীন বসতবাটীর চিহ্ন, মৃত্তিকা খুড়িলে ইট পাওয়া যায়। এখানে পাকা রাস্তার চিহ্নও মধ্যে মধ্যে পরিদৃষ্ট হয়।

খানজাহানের শিষ্যবর্গ তালা থানার ডাঙ্গা নলতা গ্রামে কয়েকটি বসতবাটী স্থাপন করিয়াছিলেন। ঐ গ্রামে তিনটি ইটের প্রকাণ্ড ভিটা আজিও বিদ্যমান। ঐ থানার ভায়ড়া গ্রামে বিরাটকায় দীঘি আছে। সাধারণ লোকে বলে জিন পরীতে এই দীঘি খনন করিয়াছে। জলকষ্ট নিবারণের জন্য বারইহাটি গ্রামে অনেকগুলি জলাশয় খনিত হয়। লোকে বলে এখানে সাত গণ্ডা অর্থাৎ ২৮টি পুকুর ছিল। পাইকগাছা থানার সোলায়মানপুরে বোরহানুদ্দীন নামীয় একটি দীঘি ও মসজিদ ছিল। দীঘির মধ্যে কয়েকখানা প্রস্তর আছে। দরগা মহলে পীর মিয়াউদ্দীন সাহেবের মাজার। ইনি খানজাহানের শিষ্য কিনা জানি না। কাশিমনগরে অনেকগুলি ভিটা আছে। উহাকে লোকে 'দমদমার' ভিটা বলে। খানজাহানের শিষ্যগণ সরলগ্রামে একটি প্রকাণ্ড জলাশয় খনন করে। সম্প্রতি উক্ত জলাশয়ের সংস্কার হইয়াছে। প্রবাদ আছে যে সরল খাঁ এই দীঘি খননের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। লোকের বিশ্বাস ইহার জল সেবন করিলে রোগ নিরাময় হইয়া থাকে। লস্করবেড় নামক গ্রামে একটি প্রকাণ্ড দীঘি খনিত হইয়াছিল। এইভাবে জলাশয় খনন, রাস্তা, মসজিদ ও বসতবাটি নির্মাণ করিতে করিতে খানজাহানের অনুচরবর্গ আমাদি গ্রামে উপস্থিত হন।

আমাদি প্রাচীন স্থান। এখানে বোরহান খাঁ ও ফতে খাঁর প্রধান কেন্দ্র ছিল। ধর্মপ্রচারের সঙ্গে সঙ্গে পিতাপুত্রে শাসনকার্যও পরিচালনা করিতেন। তখনকার দিনে সুদূর সুন্দরবন অঞ্চলে কোন সুশৃঙ্খলিত সরকার না থাকিলেও খানজাহানের শিষ্যবর্গ খলিফাতাবাদ হইতে গুরুর আদেশ লইয়া বিচারকার্য ও জমি পত্তন করিতেন। কপোতাক্ষীর তীরে আজিও লোকে বুড়ো খাঁ ও ফতে খাঁর সমাধিস্থল দেখাইয়া থাকে। বুড়ো খাঁর সমাধি নদীর স্রোতের সহিত যুদ্ধ করিয়া এখনও টিকিয়া আছে। এই সমাধির উপর এখনও দুইশত বৎসরের একটি চাঁপাফুলের গাছ শোভা পাইতেছে। এই সমাধিস্থলের সন্নিকটে তাঁহাদের গড়বেষ্টিত বাড়ী ও আস্তানা ছিল। গড় ও বাড়ীর ভগ্নাবশেষ নাই বলিলেই

চলে। আমাদীতে জমিদার খনিত একটি প্রকাণ্ড দীঘি আছে। মিঃ জেমস ওয়েষ্টল্যাণ্ড বলিয়াছেন যে এইস্থানে বুড়ো খাঁ ও ফতে খাঁ একটী প্রকাণ্ড দীঘি খনন করিয়াছিলেন। উহা নদীগর্ভে বিলীন হইয়াছে। পরবর্তীকালে উহা 'হাতিবান্ধার দীঘি' নামে পরিচিত হয়। সতীশ বাবু বলিয়াছেন যে, এখানে প্রাচীনকাল হইতে চতুর্ভূজা চামুণ্ডা মূর্তি পরিমালা দেবী প্রতিষ্ঠিত আছে। হিন্দুজাতির নিকট ইহা এক অভিনব তীর্থক্ষেত্রবিশেষ।

আমাদি গ্রামে বুড়ো খাঁর কর্মকেন্দ্রে প্রত্যেক শ্রেণীতে তিনটি করিয়া একটি নবগুম্বজ বিশিষ্ট মস্‌জিদ নির্মিত হয়। জেমস্ ওয়েষ্টল্যাণ্ড ও অধ্যাপক দানী লিখিয়াছেন যে এই মসজিদ তিন গুম্বজ বিশিষ্ট, কিন্তু তাহা ঠিক নহে না দেখিয়া লিখিলে এইরূপ ভুলের সম্ভাবনা থাকে। পরে এই স্থান লোক অভাবে জনশূন্য হইয়া জঙ্গলে পরিণত হয়। বহুকাল পরে পুনরায় এখানে লোকে জঙ্গল কাটিয়া বসতি স্থাপন করে। পরে একটি প্রকাণ্ড মৃত্তিকার স্তূপ খুঁড়িয়া লোকে এই মস্‌জিদ আবিষ্কার করে। তখন হইতে এই গ্রামের নাম হয় মস্‌জিদকুড়। এই মস্‌জিদ সুন্দরবন অঞ্চলের একটি প্রধান এবং প্রাচীন স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন। মসজিদের ভিতরকার মাপ ৪০´ X ৪০´ ফুট এবং দেওয়ালের ভিত্তি ৭ ফুট প্রশস্ত। মসজিদের চতুষ্কোণে কয়েকটি মিনার আছে। ইহার পশ্চিমদিকের প্রাচীর গাত্রে তিনটি মিহরাব আছে। অধুনা মসজিদের পশ্চিমদিকে অনেকগুলি ডালিম গাছ উহার শোভা বর্ধন করিতেছে। মস্‌জিদকুড় গ্রামের মধ্যে মৃত্তিকা খনন করিলে প্রাচীনকালীন ইষ্টক পাওয়া যায়। এক সময় মৃত্তিকার নিম্নে কয়েকঝুড়ি কড়ি পাওয়া গিয়াছিল। বুড়োখাঁর সময়ের খনিত চাল ধোয়া ও ডাল ধোয়া নামীয় দীঘিদ্বয় মজিয়া গিয়াছে। বুড়োখাঁর প্রকৃত নাম ছিল বোরহান খাঁ। সম্ভবতঃ বয়োবৃদ্ধ অবস্থায় লোকে পূর্বোক্ত নাম দিয়া থাকিবে। লোকমুখে বোরহান নাম একেবারেই চাপা পড়িয়া গিয়াছে

সুদূর সুন্দরবন অঞ্চলে অবস্থিত এই মস্‌জিদের উপর বর্তমানে সরকারের নজর পড়িয়াছে। বুড়োখাঁ একজন ধর্মপ্রাণ ও নিষ্ঠাবান লোক ছিলেন। তিনি ইসলাম প্রচারের জন্য সুদূর বিদেশে প্রবাসী হইয়া স্বীয় জীব উৎসর্গ করিয়া

গিয়াছেন। লোকে তাঁহাকে পরম শ্রদ্ধা করিত। স্বীয় গুরুকে দর্শন মানসে তিনি মধ্যে মধ্যে বাগেরহাটে যাইতেন। খানজাহানের দরবারে তাঁহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। বাগেরহাটে আজিও বুড়োখাঁ নামীয় দীঘি তাঁহার কীর্তি ঘোষণা করিতেছে। কথিত আছে যে ঈশ্বরীপুরেও বুড়োখাঁর আস্তানা ছিল।

বুড়োখাঁর জনৈক প্রধান সহকর্মীর নাম ছিল খালেস খাঁ। তিনি এদেশে খালাস খাঁ নামে সুপরিচিত। তিনি বেতকাশীতে একটি প্রকাণ্ড দীঘি খনন করিয়া লোকের জলকষ্ট নিবারণ করিয়াছিলেন। সুন্দরবন অঞ্চলে পানীয় জলের অভাব অত্যধিক। সর্বত্র লবনাক্ত জল। দূরদূরান্ত হইতে অসংখ্য লোক এই বেতকাশীর দীঘির জল লইয়া সেবন করিয়া থাকে। আজিও বহু হাটবাজারে গ্রীষ্মকালে এই জল বিক্রয় করিয়া বহু দরিদ্র লোক জীবন ধারণ করে। খনন কারীর নামানুসারে এই দীঘির নাম হইয়াছিল খালাস খাঁর দীঘি। সতীশ বাবু এই দীঘির নাম কালী-খালাস খাঁ দীঘি বলিয়াছেন কিন্তু তাহা ঠিক নহে। সতীশ বাবু সুসাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্রের একজন শিষ্য বলিয়া মনে হয়। হিন্দুজাতির গৌরব কাহিনী সর্বত্র অতিরঞ্জিত করিয়া লিখিতে তিনি একটুও দ্বিধাবোধ করেন নাই। পক্ষান্তরে মুসলমানের ইতিহাস লিখিতে তিনি অতিমাত্রায় কার্পণ্য করিয়াছেন। কোন ঐতিহাসিকের পক্ষে এহেন ত্রুটী মারাত্মক। খালেস খাঁ নামের সহিত "কালী" নামের কোন সম্পর্ক নাই।

খানজাহান আলী

॥ সাত ॥

পায়গ্রাম কসবা, খলিফাতাবাদ নগরীর প্রতিষ্ঠা, পরবর্তী কীর্তিরাজি

মুরলী হইতে খানজাহান তাঁহার একটি বাহিনীকে সুন্দরবনের দিকে প্রেরণ করেন এবং নিজে অন্য আর একদল সঙ্গী সমভিব্যাহারে ভৈরবতীর বহিয়া পূর্বদিকে অগ্রসর হইতে থাকেন। তাঁহার চলাপথ তদীয় কীর্তিরাজির দ্বারা সর্বত্র চিহ্নিত হইয়া আছে। তাঁহার এই সমস্ত কীর্তিকে এদেশের লোক সংক্ষেপে খাঞ্জেলী, খাঞ্জাই বা খাঞ্জে কীর্তি আখ্যায় আখ্যায়িত করিয়াছে। বসিরহাট অঞ্চলে খাঞ্জেলী রাস্তার প্রবাদ আছে। দেবহাটা থানার "খাঞ্জে" নামক গ্রাম আজিও তাঁহার কীর্তি রক্ষা করিতেছে। এই গ্রামে এক বেল বৃক্ষের নিম্নে তাঁহার নামীয় একটি দরগা আছে। কেহ কেহ বলেন বসিরহাট ও দেবহাটা অঞ্চলে তাঁহার শিষ্যগণ ইসলাম প্রচার করিয়াছিলেন। খানজাহানের কীর্তিরাজিকে লোকে খাঞ্জালী দীঘি, খাঞ্জাই রাস্তা, খাঞ্জালী মসজিদ ও খাঞ্জালী দরগা বলিয়া থাকে। এদেশের লোকেরা তাঁহাকে খাঞ্জালী পীর বলিয়া পরম শ্রদ্ধা করে।

খানজাহান যে জনহিতার্থে মুক্ত হস্তে ব্যয় করিতেন তাহা তদীয় কির্তীরাজি হইতে সহজেই অনুমেয়। জঙ্গলাকীর্ণ অনাবাদী ভূমিকে তিনি সুসজ্জিত করিয়া মানুষের বসবাস ও যাতায়াতের পথ সুগম করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। হিংস্র ব্যঘ্র, বন্যবরাহ ও অন্যান্য বন্য জন্তুর আবাসভূমির মধ্যে তিনি শহর ও নগর গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার জনসেবামূলক কার্যে মুগ্ধ হইয়া লোকে তাঁহাকে পরম শ্রদ্ধা করিত। নিষ্কর্মা সৈন্যগণকে তিনি কর্ম দিয়াছিলেন। বিনা রক্তপাতে তিনি সুন্দরবন অঞ্চল জয় করিয়া তথায় শান্তি ও সাম্যের রাজত্ব প্রতিষ্টা করিয়াছিলেন। এতদ্দর্শনে অসংখ্য অমুসলমান তাঁহার চরণতলে আসিয়া ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল।

রাস্তা নির্মাণ করিতে করিতে খানজাহানের সৈন্যগণ অগ্রসর হইত। পথিমধ্যে স্থানে স্থানে খানজাহানের অনুচরবর্গ বিশ্রাম ও আহারাদি সমাধান করিত। ইত্যবসরে সঙ্গীদল বড় বড় দীঘি খনন করিয়া ফেলিত। কথিত আছে যে এক রাত্রিতে এক একটি পুকুর খনিত হইত। দৈব শক্তির বলে খানজাহান জিন-পরীর সাহায্যে এই সমস্ত দীঘি খনন করিতেন বলিয়া যে প্রবাদ আছে তাহা ঠিক নহে। সাধারণ মানুষের কায়িক পরিশ্রমের দ্বারাই স্বাভাবিক দ্রুততার সহিত রাস্তা ও মসজিদ নির্মাণ এবং দীঘি খনন কার্য সমাপন হইত।

মুরলী বা যশোর হইতে তাহার সুদীর্ঘ রাস্তা আঁকিয়া বাঁকিয়া ভৈরবতীর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। ভৈরব তীরেই তিনি চারিটি নগরীর পত্তন করিয়াছিলেন। প্রথম বারবাজার—এই নামের সঙ্গে কসবা শব্দের যোগ দেখা যায় না। দ্বিতীয় মুরলী কসবা (বর্তমান যশোর শহরের সংলগ্ন) এবং তৃতীয় পায়গ্রাম কসবা—যশোর হইতে প্রায় বিশ মাইল পূর্ব দক্ষিণে অবস্থিত। পায়গাঁও ফার্সি শব্দ। উহার অর্থ সুসংবাদ এবং এই পায়গাঁও হইতে পায়গা বা পায়গ্রাম নাম হইয়াছে। পায়গ্রামে কসবা বা কসবায়ে পায়গাঁও অর্থে সুসংবাদ দানের শহর বুঝায়। ফুলতলা হইতে প্রায় চারিমাইল উত্তরে এই নগরী অবস্থিত ছিল। খলিফাতে আবাদের বর্তমান নাম বাগেরহাট। পর্তুগীজ মানচিত্রে ইহাকে কুইপিটাভাজ (কুইপিট = খলিফাত, আভাজ = আবাদ) বলা হইয়াছে। খুলনা শহর হইতে ইহা রেলপথে মাত্র কুড়ি মাইল পূর্ব দিকে অবস্থিত। বারবাজার ও মুরলীর কথা পূর্বে বলিয়াছি। এখন আমরা পায়গা বা পায়গ্রাম কসবা ও তন্নিকটবর্তী স্থান সমূহে খানজাহান আলীর কার্যকাহিনী বর্ণনা করিব।

যশোর হইতে চারি মাইল পূর্ব দক্ষিণ কোণে রামনগর গ্রামে খানজাহান একটি প্রকাণ্ড দীঘি খনন করেন। ট্রেন হইতে রেল লাইনের উত্তরদিকে এই দীঘি দৃষ্টিপথে পতিত হয়। উহা যশোর খুলনা রাস্তার পার্শ্বেই অবস্থিত। এই দীঘি খুব গভীর এবং এখানে বার মাসই জল থাকে। বর্তমানে উহা শাহবাটীর দীঘি নামে সুপরিচিত। রাস্তার পার্শ্বে মনোরম স্থানে অবস্থিত বলিয়া দীঘির পাড়ে ফুলের বাগিচা প্রস্তুত করা হইয়াছে। উহার চতুর্দিক এখন প্রাচীর

বেষ্টিত। ইহা বর্তমানে যশোর খুলনার বনভোজন কেন্দ্ররূপে (Picnic Corner) ব্যবহৃত হইতেছে। সম্প্রতি এই দীঘি সংস্কার করার সময়ে মৃত্তিকার নীচে অশ্বের হাড় ও প্রাচীনকালীন বহু জিনিষ-পত্র পাওয়া গিয়াছে।

শাহবাটীর দীঘির কার্য সমপনান্তে খানজাহান সিঙ্গিয়া প্রভৃতি স্থান ঘুরিয়া পায়গ্রাম কসবায় সদলবলে আগমন করেন। তিনি যে স্থানে সর্বপ্রথম আস্তানা করিয়াছিলেন সেই স্থানের নাম হয় খাঞ্জেপুর—আজিও সে নাম আছে। এইখানে তিনি একটি শহরের পত্তন করেন এবং নদী তীরে তাঁহার বাসস্থান, দরবার গৃহ ও মসজিদ নির্মিত হইয়াছিল। পায়গ্রাম কসবা হাই স্কুলের সংলগ্ন আজিও তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। পাকা মসজিদের ভগ্নাবশেষের উপর এখন টিনের ঘরের মসজিদে লোকে নামাজ পড়ে। এই গ্রামের মধ্য দিয়া একটি রাস্তা নির্মিত হইয়াছিল, এখনও সে রাস্তা আছে। এই রাস্তার উত্তর দিকের নাম হয় উত্তর ডিহি এবং দক্ষিণ ভাগকে দক্ষিণ ডিহি বলা হইত। উত্তর ডিহি নদীর তীরে অবস্থিত, তথায় খানজাহানের আবাসবাটী ও দরবার গৃহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বাগেরহাটের ন্যায় এখানকার খানজাহান আলীর কীর্তিরাজি কালের আঘাত সহিয়া টিকিয়া থাকিতে পারে নাই। আজিও এই গ্রামে তাঁহার খনিত সানের পুকুর, আঁধার পুকুর ও দুধ পুকুরের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। সানের পুকুরের মধ্যে পূর্বে পুরাকালীন ইট পাওয়া যাইত। এই গ্রামের চতুর্দিকে রাস্তা জালের ন্যায় বিস্তারিত ছিল। এখনও সেই সমস্ত রাস্তার চিহ্ন আছে। তবে এখানে ঘনবসতি না থাকায় বৃক্ষলতা ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। কয়েকটি জরাজীর্ণ তেঁতুলগাছ এই গ্রামের প্রাচীনত্বের সাক্ষ্য দিতেছে।

নদীতীরে যেখানে দরবার গৃহ, মসজিদ ইত্যাদি ছিল উহা ভাঙ্গিয়া একটি বিরাট ইটের টিপিতে পরিণত হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন যে ইংরেজ আমলে জনৈক নীলকুঠিয়াল ইহার ইষ্টক লইয়া কুঠি নির্মাণ করিয়াছিলেন। এই স্থানের পার্শ্বেই অধুনা ঈদগাহ্। ইহারই সন্নিকটে একখানি মনোরম প্রস্তর পড়িয়া আছে। তাহাই এখন খাঞ্জালী কীর্তির একটি জ্বলন্ত নিদর্শন। আরও কয়েকখানি প্রস্তর ও অন্যান্য কয়েকটি কীর্তিচিহ্নের কথা এখনও লোকে বলিয়া থাকে। খানজাহানের কতিপয় সঙ্গী এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করেন।

তাঁহাদের বংশধরদের কেহ কেহ এখনও এই গ্রামে বসবাস করিতেছেন। তবে সুখের বিষয় এই যে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি অর্থোপার্জনের জন্য কোন দরগাহ্ প্রতিষ্ঠা করেন নাই।

পীরালী সম্প্রদায়ের উৎপত্তি

পায়গ্রাম কসবায় বিখ্যাত পীর-আলী সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়। যশোর অঞ্চলের একজন ব্রাহ্মণ খানজাহানের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া ইসলাম কবুল করেন। তাঁহার নাম মোহাম্মদ তাহের। তিনি স্বনামধন্য ব্যক্তি। তাঁহার পূর্ণ নাম হইয়াছিল পীর আলী মোহাম্মদ তাহের। এই ব্রাহ্মণ সন্তানের পূর্ব পরিচয় অস্পষ্ট। সতীশবাবু তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন, 'ব্রাহ্মণ পরহিংসা করিতে গিয়া আত্মহিংসাই করিয়াছিলেন। কারণ তিনি ধর্ম বা রাজ্যলাভে অথবা সংস্পর্শ দোষে নিজের জাতিধর্ম বিসর্জন দিয়া মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। তাঁহার পূর্বে কি নাম ছিল জানি না, জানিয়াও বিশেষ কাজ নাই।" বহুদিন অনুসন্ধানের পর জানিতে পারিয়াছি যে এই ব্রাহ্মণ সন্তানের পূর্ব নাম ছিল শ্রীগোবিন্দলাল রায়। তিনি গোবিন্দ ঠাকুর নামেই পরিচিত ছিলেন। ইনি খানজাহানের বিশেষ প্রিয়পাত্র ও প্রধান আমাত্য ছিলেন। খানজাহান বাগেরহাটে অবস্থানকালে তিনি পায়গ্রাম কসবায় তাঁহার প্রতিনিধি হিসাবে রাজস্ব আদায় ও অন্যান্য রাজকার্য পরিচালনা করিতেন। খানজাহান পায়গ্রাম কসবায় কয়েক বৎসর অতিবাহিত করেন—কেহ কেহ বলেন দশ বৎসর, কিন্তু উহা অনুমান মাত্র। পায়গ্রামে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া তিনি স্বহস্তে রাজকার্য পরিচালনা করিতে থাকেন। এই সময় মোহাম্মদ তাহের মন্ত্রী ও অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসাবে সমস্ত কার্যে সাহায্য করিতে থাকেন।

খুলনা জেলার দক্ষিণ-ডিহি প্রাচীন হিন্দুপ্রধান স্থান। সেনহাটি, মূলঘর, কালীয়া প্রভৃতি স্থানের বহুপূর্বে এখানে উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর বসবাস ছিল। এই গ্রামের নাম ছিল পয়োগ্রাম, এখনও এ নাম আছে। এখানকার রায়চৌধুরী বংশের তৎকালে বিশেষ খ্যাতি ছিল। সম্ভবতঃ তুর্ক-আফগান আমলের প্রথম দিকে এই ব্রাহ্মণ-বংশ রাজ সরকার হইতে সম্মান সূচক রায়চৌধুরী উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহারা কনোজাগত ব্রাহ্মণ। ইহাদের পূর্ব পুরুষ গুড় গ্রামের অধিবাসী বলিয়া ইহারা গুড়ী বা গুড়গাঞি ব্রাহ্মণ হিসাবে পরিচিত।

এই বংশের কৃতি সন্তান দক্ষিণা নারায়ন ও নাগর নাথ। কথিত আছে যে দক্ষিণা নারায়ন দক্ষিণ ডিহি এবং নাগর উত্তর ডিহির সম্পত্তি ভাগ করিয়া লইয়াছিলেন। দক্ষিণ ডিহি নামের সহিত দক্ষিণা নারায়নের সম্পর্ক আছে বলিয়া অনেকে মনে করেন। নাগর বেজেরডাঙ্গায় একটি হাট বসাইয়াছিলেন। উহা নাগরের হাট নামে পরিচিত ছিল। খানজাহানের আমলে চৌধুরীগণ সমাজে সম্মানিত ছিলেন। নাগর নিঃসন্তান। ভ্রাতা দক্ষিণা নারায়নের চারি পুত্র ছিল। তাহাদের নাম যথাক্রমে কামদেব, জয়দেব, রতিদেব ও শুকদেব। কামদেব ও জয়দেব এই নবাগত শাসনকর্তার অধীনে উচ্চপদ গ্রহণ করেন। কথিত আছে যে মোহাম্মদ তাহেরের চেষ্টায় তাহারা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং এই ঘটনাই ইতিহাসে পীরালীদের উৎপত্তি বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

পীরালী সম্প্রদায়ের উৎপত্তি সম্পর্কে মিঃ ওমালী বলেন যে খানজাহান একদা রোজার সময় ফুলের ঘ্রাণ লইতে থাকেন। ইহাতে তদীয় হিন্দু কর্মচারী মোহাম্মদ তাহের (তখনও ইসলাম গ্রহণ করেন নাই) বলেন যে "ঘ্রাণেন চার্ধ ভোজনং" অর্থাৎ ঘ্রাণে অর্ধ ভোজন। খানজাহান পরে একদিন খানাপিনার আয়োজন করেন। মাংসের গন্ধে তাহের নাকে কাপড় দিলে খানজাহান বলেন যখন ঘ্রাণে অর্ধভোজন তখন এই খানা ভক্ষণের পর আপনি ইসলাম গ্রহণ করুন। তদনুসারে তাহের ইসলাম গ্রহন করেন। কথিত আছে যে তাহেরের ইসলাম গ্রহনের পূর্বে যে পুত্র সন্তান ছিলেন তিনি হিন্দু থাকিয়া যান। তিনিই সর্ব প্রথম হিন্দু পিরালী এবং তাহেরকে লোকে উপহাসচ্ছলে পীর অলী বলিত। তাঁহাকেই কেন্দ্র করিয়া এদেশে পীরালী গান ও বহু কাহিনী রচিত হয়। ঐকান্তিক ধর্মনিষ্ঠার জন্য শেষ পর্যন্ত তাহের পীর আলী বা পীরালী আখ্যা পান।

পীর আলী মোহাম্মদ তাহেরের কর্ম সাধনায় এদেশের বহু অমুসলমান ইসলাম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিল। এইজন্য তাহাদিগকে "পীর আলী" বা "পীরেলী" মুসলমান বলা হইত। আর যে বংশের লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করিত তাহাদের হিন্দু ভ্রাতা ও আত্মীয়-স্বজন হিন্দু সমাজে সংশ্রব দোষে মুসলমান না হইয়াও সমাজচ্যুত হইল। তাহাদিগকে লোকে পীরালী ব্রাহ্মণ, পীরালী কায়স্থ, প্রভৃতি আখ্যা দিয়াছিল। এইরূপে পীরালী হিন্দু মুসলমান এদেশে ছড়াইয়া পড়িল।

অন্য এক বর্ণনায় জানা যায় যে মোহাম্মদ তাহেরের সঙ্গে জয়দেব ও কামদেবের অন্তরের মিল ছিল না। তাহের মনে মনে তাঁহাদিগকে মুসলমান করিবার চেষ্টা করিতেন। এ সম্পর্কে এতদঞ্চলে একটি গল্প প্রচলিত আছে, উহা কতদূর সত্য জানিনা। গল্পটি বর্ণনা করিতেছি—এক দিন পবিত্র রমজানের সময় মোহাম্মদ তাহের রোজা রাখিয়াছেন। দরবার গৃহে জয়দেব ও কামদেব অন্যান্য কর্মচারীসহ বসিয়া আছেন। এমন সময় একব্যক্তি তাঁহার বাটী হইতে একটি সুগন্ধি নেবু আনিয়া তাহেরকে উপহার দেন। পীর আলী নেবুর ঘ্রাণ লইতেছিলেন। এমন সময় কামদেব বলিলেন, হুজুর, ঘ্রাণে অর্ধ ভোজন—"ঘ্রাণেন চার্ধ ভোজনং"—আপনি গন্ধ শুকিয়া রোজা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন? এই কথার পর পীর আলী ব্রাহ্মণের প্রতি চটিয়া যান। গোপনে পরামর্শ করিয়া স্থির হইল যে একদিন তিনি সমস্ত কর্মচারীদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আহার করাইবেন। নির্ধারিত দিনে কামদেব ও জয়দেব সভাগৃহে উপস্থিত হইলেন। সভাগৃহের প্রাঙ্গনে গো-মাংসের সহিত নানাপ্রকার মসলা দিয়া রন্ধনকার্য ধুমধামের সহিত চলিতেছিল। রান্নার গন্ধে সভাগৃহ ভরপূর। জয়দেব ও কামদেব নাকে কাপড় দিয়া প্রতিরোধ করিতেছিলেন। পীর আলী নাকে কাপড় কেন জিজ্ঞাসা করিলে কামদেব মাংস রন্ধনের কথা উল্লেখ করেন। পীব আলী নেবুর গল্প উল্লেখ করিয়া বলিলেম ঃ—"এখানে গো-মাংস রন্ধন হইতেছে। ইহাতে আপনাদের অর্ধেক ভোজন হইয়া গিয়াছে, সুতরাং আপনারা জাতিচ্যুত হইয়াছেন।" অতঃপর কামদেব ও জয়দেব ঐ মাংস খাইয়া মুসলমান হইয়া গেলেন। পীর আলী তাঁহাদিগকে জামালউদ্দীন ও কামালউদ্দীন খাঁ চৌধুরী উপাধি দিয়া আমাত্য শ্রেণীভুক্ত করিয়া লইলেন। সংশ্রব দোষে অন্য দুই ভ্রাতা শুকদেব ও রতিদেব পীর আলী ব্রাহ্মণ হিসাবে সমাজে পরিচিত হইলেন। ইহাই পীরালী সম্প্রদায়ের উৎপত্তির ইতিকথা। এ সম্পর্কে ঘটকদিগের পুঁথিতে যে বর্ণনা আছে উহার কিয়দংশ পাঠকগণের জ্ঞাতার্থে উদ্ধৃত করিতেছি ঃ

"খানজাহান মহামান পাদশা নফর
যশোর সনন্দ ল'য়ে করিল সফর ॥

তার মুখ্য মহাপাত্র মামুদ তাহির
মারিতে বামুন বেটা হইল হাজির ॥
পূর্বেতে আছিল সেও কুলিনের নাতি ;
মুসলমানী রূপে মজে হারাইল জাতি ।
পীর আলী নাম ধরে পিরাল্যা গ্রামে বাস ;
যে গাঁয়েতে নবদ্বীপের হইল সর্বনাশ ।
সুবিধা পাইয়া তাহির হইল উজীর ।
চৈঙ্গুটিয়া পরগণায় ছাড়িল জিগীর ॥
* * * * * *
আঙ্গিনায় বসে আছে উজীর তাহির
কত প্রজা ল'য়ে ভেট করিছে হাজির ।
রোজার সে দিন পীর উপবাসী ছিল ।
হেন কালে একজন নেবু এনে দিল ॥
গন্ধামোদে চারিদিকে ভরপূর হইল ;
বাহবা বাহবা বলে নাকেতে ধরিল ॥
কামদেব জয়দেব পাত্র দুইজন,
বসেছিল সেইখানে বুদ্ধে বিচক্ষণ ।
কি করেন কি করেন বলিলা তাহিরে,
ঘ্রাণেতে অর্ধেক ভোজন শাস্ত্রের বিচারে ॥
কথায় বিদ্রূপ ভাবি তাহির অস্থির,
গোঁড়ামি ভাঙ্গিতে দোঁহের মনে কৈল স্থির ॥
দিনপরে মজলিস করিল তাহির ;
জয়দেব, কামদেব হইল হাজির ।
দরবারের চারিদিকে ভোজের আয়োজন,
শত শত বক্‌রী আর গোমাংস রন্ধন ॥
পলাণ্ডু লশুন গন্ধে সভা ভরপূর
সেই সভায় ছিল আরো ব্রাহ্মণ প্রচুর ।
নাকে বস্ত্র দিয়া সবে প্রমাদ গণিল,
ফাঁকি দিয়া ছলে কলে কত পলাইল ।

কামদেবে জয়দেবে করি সম্বোধন,
হাসিয়া কহিল ধূর্ত তাহির তখন।
জারিজুরি চৌধুরী আর নাহি খাটে
ঘ্রাণে অর্ধেক ভোজন শাস্ত্রে আছে বটে।
নাকে হাত দিলে আর ফাঁকিত চলে না।
এখন ছেড়ে ঢং আমার সাথে কর খানাপিনা।
উপায় না ভাবিয়া দোঁহে প্রমাদ গণিল,
হিতে বিপরীত দেখি মরমে মরিল।
পাকড়াও পাকড়াও হাঁক দিল পীব ;
থতমত হ'য়ে দোঁহে হইল অস্থির।
দুইজনে ধরি পীব খাওয়াইল গোস্ত
পীরালি হইল তারা হইল জাতিভ্রষ্ট।
কামাল জামাল নাম হইল দোঁহার
ব্রাহ্মণ সমাজে প'ড়ে গেল হাহাকার ॥
তখন ডাকিয়া দোঁহে আলী খাঞ্জাহান।
সিঙ্গিব জায়গীর দিল করিতে বাখান ॥

* * * * * *

ধনেমানে হ'য়ে হীন কুটুম্ব স্বঘর,
সমাজে রহিল ঠেলা সেই বরাবর
পীবালী রহিল পড়ি কুলাচার্য ঘোষে।
রচিল পীরালী কথা নীলকান্ত শেষে ॥"

চৈতন্য সাহিত্যের ন্যায় ঘটকদের পুঁথিতে অনেক বিষয় অতিরঞ্জিত করিয়া বলা হইয়াছে। এখানেও মূল ঘটনাকে অতিরঞ্জিত করা হইয়াছে। যাহা হউক নবদীক্ষিত কামালউদ্দীন ও জামালউদ্দীন প্রচুর সম্পত্তির জায়গীর পাইয়া সিঙ্গিয়া অঞ্চলে বাস করিতে থাকেন। তাঁহাদের ইসলাম গ্রহণ খুব সম্ভব খানজাহানের পায়গ্রাম ত্যাগের পূর্বেই হইয়াছে। কথিত আছে যে খানজাহান তাঁহাদিগকে উচ্চ সম্মানে সম্মানিত করিয়াছিলেন। তিনি বাগেরহাটে

অবস্থানকালে এই দুই ভ্রাতা মধ্যে মধ্যে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাগেরহাট আসিতেন। বাগেরহাটের পশ্চিমে সোনাতলা গ্রামে আজিও কামাল খাঁ নামীয় দীঘি তাঁহার নাম রক্ষা করিতেছে।

ক্রমে ক্রমে পীরালী মুসলমানের সংখ্যা বর্ধিত হইতে লাগিল। সাতক্ষীরা ও যশোর অঞ্চলে এই পীরালীদের বাস আছে। রসুলপুর, পলাশপোল, হাকিমপুর, কুলিয়া, গোদাঘাটা, কোমরপুর, পাথরঘাটা প্রভৃতি গ্রামে বহু সম্ভ্রান্ত পীরালী মুসলমান আছেন। ইঁহারা সাধারণত অন্য মুসলমানদের সহিত বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেন না। তবে বর্তমানে উহার কিছু কিছু ব্যতিক্রম ঘটিতেছে। পীরালীদের মধ্যে এখনও বহু হিন্দু রীতিনীতি প্রচলিত আছে। পিতলের বদনার পরিবর্তে গাড়ু ব্যবহার, কাঁসার থালাবাসনের অবাধ প্রচলন, পীড়ির উপর বসিয়া হিন্দুর ন্যায় আহার গ্রহণ প্রভৃতি প্রথা বিদ্যমান। এই সমস্ত রীতিনীতি আমরা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছি। কোন কোন পীরালীদের বাড়ী মনসা পূজা ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হইত বলিয়া শুনা যায়। মাওলানা মোহাম্মদ আকরাম খান এই পীরালী বংশের কৃতি সন্তান বলিয়া পরিচিত। তাঁহার আত্মীয় স্বজন পীরালী খাঁ বলিয়া পরিচিত। আমি মাওলানা সাহেবের সঙ্গে এই বিষয় আলোচনা করিয়াছি। তাঁহার বংশ পীরালী তাহা তিনি স্বীকার করেন না। তিনি বলেন যে গৌড়ের সুলতান যদু বা জালালউদ্দীনের সময় হইতে তাঁহারা মুসলমান এবং জনৈক আলী খানের বংশধর। হাণ্টার সাহেব বলিয়াছেন, সমস্ত রায়চৌধুরীগণ খান চৌধুরীতে পরিণত হয়। কিন্তু মাওলানা সাহেবের বংশ খান চৌধুরী নহে, শুধু খাঁ উপাধিধারী।

সংশ্রব দোষে রায় চৌধুর বংশের লোকেরা পুত্র কন্যার বিবাহ লইয়া বিড়ম্বিত হইয়া পড়ে। তখন তাহারা প্রতিপত্তি ও অর্থবলে সমাজকে বাধ্য করিবার জন্য চেষ্টা চালাইতে লাগিল। ইহাদের সহিত কলিকাতার ঠাকুর বংশ এবং আরও কতিপয় বংশ সংশ্রব দোষে পতিত হইয়াছিল। কলিকাতার ঠাকুরগণ ভট্টানারায়ণের সন্তান, এবং কুশারী গাঁঞিভুক্ত ব্রাহ্মণ। খুলনা জিলার আলাইপুরের পূর্বদিকে পিঠাভোগে কুশারীদের পূর্ব নিবাস ছিল। পিঠাভোগের কুশারীগণ রায়চৌধুরীদের সহিত আত্মীয়তা করিয়া পীরালী হন। প্রবাদ আছে

যে কবি সম্রাট রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই কুশারী বংশের অন্যতম অধস্তন পুরুষ। রবি বাবুর পূর্ব পুরুষ পঞ্চানন কুশারী খুলনা জিলা ত্যাগ করিয়া কালিঘাটের নিকট গোবিন্দপুরে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। তথাকার কৈবর্ত, জেলে, মালো প্রভৃতি জাতির লোকেরা নবাগত ব্রাহ্মণকে ঠাকুর বলিয়া ডাকিত। তদবধি এই বংশের উপাধি কুশারী হইতে পরিবর্তিত হইয়া ঠাকুরে পরিণত হয়। আজিও পিঠাভোগ গ্রামে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের পূর্ব নিবাস লোকে দেখাইয়া থাকে। এই বংশের জয়রাম আমীন ঠাকুর, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কালীকৃষ্ণ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (কবি সম্রাট), সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর এবং আরও অনেকে দক্ষিণ ডিহির রায় চৌধুরী বংশে বিবাহ করিয়াছিলেন। সংশ্রব দোষে রবিবাবুর শ্বশুর বংশের পূর্ব পুরুষদের বদনাম সমাজে থাকিয়া যায়। পীরালী গানের মাধ্যমে রায় চৌধুরীদিগকে অন্যান্য কুলীন হিন্দুরা ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতে ছাড়ে নাই। তাহারা বলিত :—

"মোসলমানের গোস্তভাতে
জাত গেল তোর পথে পথে
ও-রে পিরেলী বামন।"

দক্ষিণ ডিহিতে রবি বাবুর মাতুলালয় ও শ্বশুর বাড়ী বিদ্যমান। অনেকে রবি বাবুর পূর্ব পুরুষের বাড়ী দক্ষিণ ডিহি বলিয়া জানেন। কিন্তু তাহা ঠিক নহে। অবশ্য দক্ষিণডিহির সহিত রবি বাবুর ও তাঁহার বংশাবলীর ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র ছিল বলিয়া লোকে এইরূপ মনে করিয়া থাকে। রবি বাবুর পূর্ব পুরুষের প্রকৃত বাসভবন পিঠাভোগে, এখনও সে বাড়ী আছে। কেহ কেহ কবি সম্রাটের পূর্ব পুরুষের বাড়ী পিঠাভোগে কিনা সন্দেহ করিয়া থাকেন। কলিকাতা এবং স্থানীয় সম্ভাব্য সমস্ত সূত্র হইতে জানিয়া আমাদের মন্তব্য সন্নিবেশিত করিলাম। রায় চৌধুরী বংশের পূর্ব পুরুষদের সহিত রবি বাবুর যেরূপ রক্ত সম্পর্ক, মওলানা আকরাম খাঁ সাহেবের সম্পর্কও ঠিক ততটুকু। সেইজন্য বিভাগ-পূর্বে কলিকাতার একটি পত্রিকায় বলা হইয়াছিল যে এই দুইজনই একই বংশসম্ভূত। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা ঠিক নহে। রবি বাবু যে খুলনা জিলার পিঠাভোগের কুশারী বংশসম্ভূত উহারই সমর্থনে কয়েক বৎসর

পূর্বে কলিকাতার দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল।

বাসুড়ী ও বাগেরহাট যাত্রা

খানজাহান আলী কিছুকাল পায়গ্রাম অবস্থান করিয়া এই স্থানের শাসনভার তদীয় বন্ধু ও সহকারী মোহাম্মদ তাহেরের উপর ন্যস্ত করিয়া সদলবলে পূর্বাভিমুখে যাত্রা করেন। তাঁহার অভ্যাস মত তিনি পথিমধ্যে রাস্তা ও পুকুর খনন করিয়া চলিতে লাগিলেন। তিনি ভৈরব নদী পার হইয়া উত্তর তীরে অগ্রসর হন। তখন এ নদীর প্রলয় ছিল ভয়ংকর। খানজাহান সম্ভবতঃ উত্তর দিকে যশোরের কোন এক অঞ্চলে যাইতে মনস্থ করিয়াছিলেন। কিন্তু পথকষ্ট ও অন্যরূপ অবস্থা দেখিয়া তিনি কিছুদূর গিয়া সদলবলে প্রত্যাগমন করেন। তিনি সর্বপ্রথম বাসুড়ী গ্রামে আস্তানা করেন। তথায় তিনি একটি বিশালকায় দীঘি খনন করেন। তীরভূমি সহ ৭০ বিঘা জমি জুড়িয়া এই দীঘি বিস্তৃত ছিল। দীঘিটি ক্রমাগত ভরাট হইয়া আসিতেছে। খুলনা অঞ্চলের লোকেরা এই দীঘিতে মৎস্য ধরিতে যায়। দীঘির পাড় অনেক ফলবান বৃক্ষে ভরপূর। এখানে খাঞ্জালী পীর সাহেবের নামে প্রতিবৎসর মেলা বসিয়া থাকে।

খানজাহান আলী বাসুড়ীতে কিছুদিন অবস্থান করিয়া পুনরায় দক্ষিণ দিকে ভৈরব তীর দিয়া ফিরিয়া আসেন। ভৈরব তীরে শুভরাড়া গ্রামে তিনি একটি মসজিদের প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা বাবরাজার মসজিদের ন্যায় এক গুম্বজ বিশিষ্ট। এই মসজিদের চতুষ্কোণে চারিটি সুদৃঢ় মিনার নির্মিত হইয়াছিল। মসজিদে বিভিন্ন প্রকার ইট ও টালী ব্যবহৃত হইয়াছে। বর্তমানে মসজিদটি জরাজীর্ণ অবস্থায় জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। আগাছায় ভরপূর মসজিদের ফটো সংগ্রহ করিতে আমাদের বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল। খানজাহান বিখ্যাত চাঁদ সওদাগর নামীয় চান্দের বিলের মধ্য দিয়া আসিয়াছিলেন। কথিত আছে যে এখানে "সপ্তডিঙ্গা মধুকরের" মালিক চাঁদ সওদাগরের নৌকায় বাওয়ালীরা সুন্দরবনের কাঠ ও মধু সংগ্রহ করিতে যাইত। তৎকালে নেবুখালীর খাল ভৈরবের ন্যায় খরস্রোতা ছিল। চাঁদ সওদাগরের ডিঙ্গাসমূহ পাল তুলিয়া নেবুখালীর তীরে শোভা পাইত। শুভরাড়া গ্রামের মধ্যে সরদার বাড়ীর

পুকুর, পুঁড়ার পুকুর এবং ইষ্টক নির্মিত বাড়ীর ভগ্নাবশেষ আজিও চাঁদ সওদাগরের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। চাঁদ সওদাগর খানজাহানের সমসাময়িক বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন।

শুভরাড়া গ্রামে কিছুদিন অবস্থানের পর খানজাহান রানাগাতী, গোপীনাথপুর এবং নাউলী হইয়া ধূলগ্রামে আগমন করেন। নাউলী হইতে ধূলগ্রাম এবং তথা হইতে বারাকপুর-দিঘলীয়া হইয়া যে রাস্তা নির্মিত হইয়াছিল উহার চিহ্ন অদ্যাপি বিদ্যমান। ধূলগ্রাম হইতে ভৈরবতীর হইয়া খানজাহান সিদ্ধিপাশা গ্রামের মধ্য দিয়া বারাকপুরে উপস্থিত হন। তখন মুজুতখালীর নদী ছিল না। এই স্থানের পূর্ব নাম কি ছিল জানি না। সম্ভবতঃ খানজাহানের সৈন্যগণ এখানে ছাউনী ফেলিয়াছিলেন বলিয়া এইস্থানের নাম হইয়াছিল বারাকপুর। ব্যারাক শব্দের অর্থ শিবির। বারাকপুর হইতে তিনি সদলবলে নদীতীর হইয়া ঘোষগাতী ও দিঘলীয়ার মধ্যে দিয়া রাস্তা নির্মাণ করিতে করিতে বর্তমান দৌলতপুর কলেজের সন্নিকটে নদীর উত্তরতীরে উপস্থিত হন। ভৈরব নদী তখন বর্তমান স্থান হইতে উত্তর পূর্ব দিকে প্রবাহিত ছিল। ইহার আশে পাশে আরও কয়েকটি নদী ছিল। সেনহাটি গ্রামের উত্তর পূর্বে এখনও মরা নদীর চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। ব্রহ্মগাতী গ্রামে খানজাহান দুইটি বৃহৎকায় জলাশয় খনন করেন। যুগ যুগ ধরিয়া জনসাধারণ এই জলাশয়গুলি হইতে উপকৃত হইয়া আসিতেছে। এই দুইটি দীঘির নাম পরে শিমন্ধা ও কালীন্ধা হইয়াছিল। চৈত্র পূর্ণিমায় শিমন্ধার পাড়ে প্রতি বৎসর মেলা বসিয়া থাকে।

খানজাহান পূর্ব হইতে নির্ধারিত স্থানে খাদ্যের ব্যবস্থা রাখার জন্য ফরমায়েশ বা আদেশ করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে সেইজন্য ঐ স্থানের নাম হইয়াছিল ফরমায়েশখানা। তথা হইতে তিনি সেনহাটি ও চন্দনীমহল দিয়া আতাই নদী পার হইয়া সোলপুরের পথে সেনের বাজারে উপনীত হন। এই সেনের বাজার খুলনা শহরের উত্তর পারে অবস্থিত। কেহ কেহ বলেন তিনি খালিশপুর হইয়া পরে সেনের বাজারে গিয়াছিলেন। যাহা হউক খাঞ্জালী রাস্তা সেনের বাজার পর্যন্ত গিয়াছিল। সেন জমিদারী হইতে সেনের বাজার নাম হইয়াছে। উহার পূর্ব নাম তখন কি ছিল জানা নাই। গৌড়ের সেন

রাজবংশের সহিত এই স্থানের যে সম্পর্কের প্রবাদ আছে তাহা ঠিক নহে। এই স্থান হইতে খানজাহান বাগেরহাট যাত্রার প্রস্তুতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ সেনের বাজার তখন লোকালয়ের দক্ষিণ সীমা ছিল এবং ইহার দক্ষিণদিকে সর্বত্র সুন্দরবনে ভরপুর ছিল।

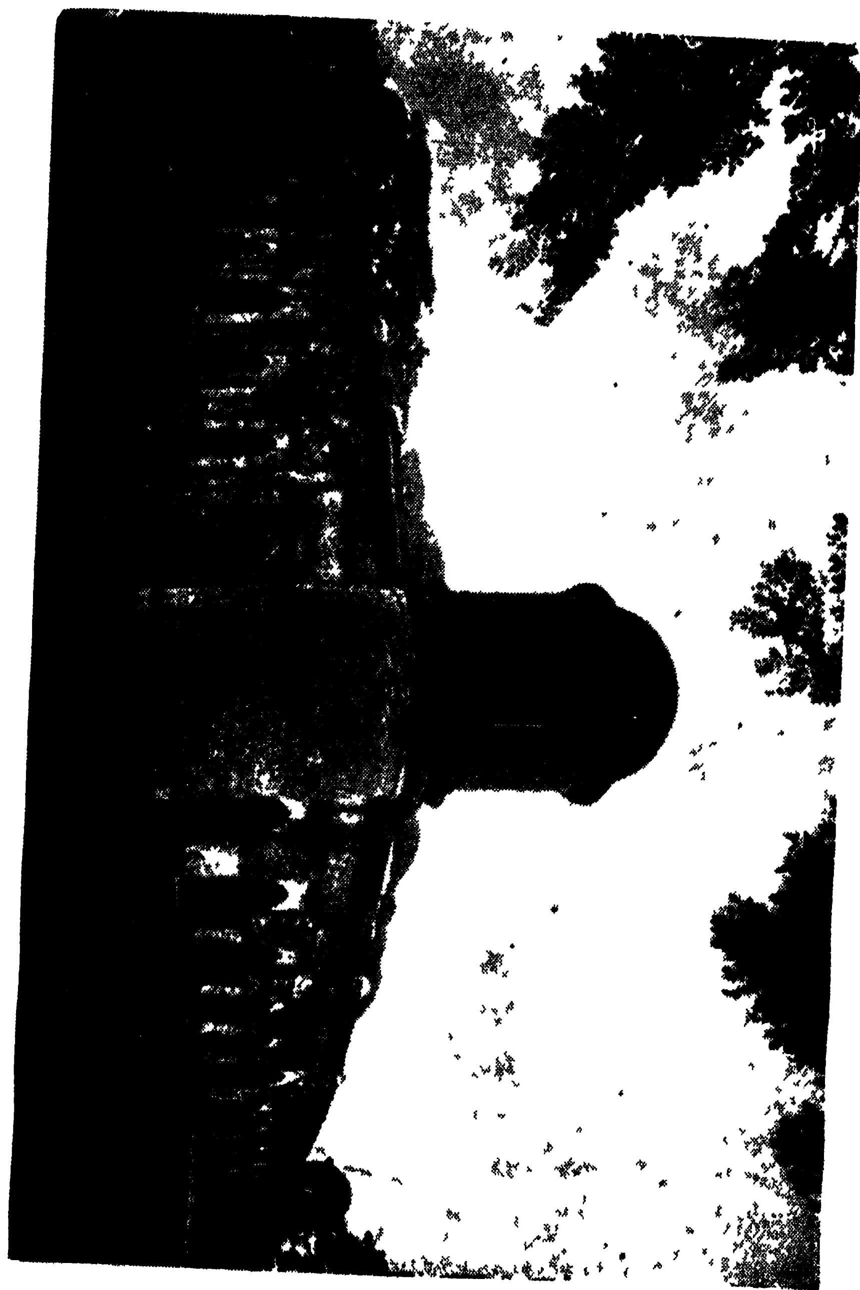
খলিফাতে—আবাদ নগরীর প্রতিষ্ঠা

সেনের বাজারের স্থান পরিবর্তিত হইয়াছে। বর্তমান সেনের বাজার তাহা অপেক্ষা প্রায় দেড় মাইল পূর্বে অবস্থিত ছিল। উহার অপর তীরে অবস্থিত ছিল প্রাচীন খুলনা বা কিসমৎ খুলনা। খানজাহান আলী সেনের বাজার হইতে ভৈরব নদী পার হইয়া তালিমপুর, শ্রীরামপুর, নৈহাটী, সামন্তসেনা প্রভৃতি স্থানের মধ্য দিয়া সোজা সাতসিকা ও আট টাকার পার্শ্ব দিয়া রাংদিয়ায় পৌঁছিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ জমিদারদের নামানুসারে পরে এই স্থানের নাম হইয়াছিল ব্রাহ্মণরাংদিয়া। স্থানীয় লোকেরা বলিয়া থাকে খানজাহান যে স্থানে ব্রাহ্মণদের রাখিয়া দিয়াছিলেন সেই স্থানের নাম হয় ব্রাহ্মণ "রাখ্ দিয়া" বা রাংদিয়া। কিন্তু এইরূপ প্রবাদ একেবারেই ভিত্তিহীন। ইহার পূর্ব নাম ছিল রঙ্গদ্বীপ এবং দিয়া অর্থ দ্বীপ সে কথা গ্রন্থারম্ভেই বলিয়াছি। গুজবের আবর্জনা রাশির মধ্য হইতে প্রকৃত ইতিহাস বাহির করিতে হইবে। গুজব ও কুসংস্কার এক শ্রেণীর মানুষের মজ্জাগত হইয়া গিয়াছে। তাহারা কিছুই চিন্তা না করিয়া গুজবে বিশ্বাস করে এবং উহা চতুর্দিকে ছড়াইতে সাহায্য করিয়া থাকে। কুসংস্কার, গুজব ও অসম্ভব ও অবাস্তব ব্যাপার সমূহকে ঝাড়িয়া প্রকৃত সত্য উদ্ধার করিবার প্রবল ইচ্ছা লইয়াই ইতিহাস লিখিতেছি।

খানজাহান রাংদিয়া ত্যাগ করিয়া মধু দিয়া, আফরা প্রভৃতি গ্রামের মধ্য দিয়া বাদখালীর বিল হইয়া বাগেরহাটের সন্নিকটে প্রাচীন ভৈরব নদী তীরে সুন্দরঘোনা মৌজায় উপস্থিত হন। তিনি যে স্থানে শিবির সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন সেই স্থানের নাম হয় বারাকপুর। তিনি সর্বপ্রথম এইখানে একটি বিশালকায় দীঘি খনন করেন। খুলনার পূর্ব পারে অবস্থিত সামন্তসেনা গ্রাম হইতে বাদখালী পর্যন্ত খানজাহান বিশ মাইল দীর্ঘ পাকা রাস্তা নির্মাণ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে। এখনও কোন কোন স্থানে ঐ রাস্তার চিহ্ন

পরিলক্ষিত হয়। প্রায় অর্ধ শতাব্দী পূর্বে খুলনা জেলা বোর্ড ইঞ্জিনিয়ারের সাহায্যে সেই রাস্তা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। বাদখালীর উত্তর পার্শ্ব দিয়া খানজাহান বারাকপুর আগমন করেন। এখনও এই স্থানে প্রাচীন ভৈরবের চিহ্ন বিদ্যমান। ভৈরব নদ তৎকালে সুন্দরঘোনার উত্তর পর্যন্ত আসিয়া পূর্বদিকে প্রবাহিত ছিল। এই নদীর দক্ষিণ তীরে মনোরম স্থানে খানজাহান তাঁহার শহরের পত্তন করেন। নদী মজিয়া যাইবার পর সেখানে যে গ্রাম সৃষ্টি হয়, উহা মরানদীর উপর অবস্থিত বলিয়া গ্রামের নাম হইয়াছে মর.গা। খানজাহানের শহর পশ্চিমে সায়ড়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এখন সায়েড়ায় উহার কিছু কিছু নিদর্শন আছে। নদীর উত্তর পাড়ে শহরের কিয়দংশ অবস্থিত ছিল বলিয়া প্রবাদ আছে। নদীর কূলে অবস্থিত বলিয়া দুইটি গ্রামের নাম হইয়াছিল কূলীয়াদাইড় এবং জোয়ারের কূল। খানজাহানের সময়ে এখানে কোন যুদ্ধবিগ্রহ সংঘটিত হইয়াছিল কিনা জানা যায় না। রণবিজয়পুর, রণভূম, ফতেপুর, পিলজঙ্গ প্রভৃতি স্থানে যুদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া শুনা যায়। পিলজঙ্গে সম্ভবতঃ হস্তীর সাহায্যে যুদ্ধ হইয়াছিল। এই সমস্ত খণ্ডযুদ্ধ পরবর্তীকালেও হইতে পারে।

খানজাহান সর্বপ্রথম যে বিশালকায় দীঘি খনন করেন উহার নাম ঘোড়াদীঘি। এই দীঘির জলাশয়ের দৈর্ঘ্য ১০০০ হাত এবং প্রস্থে প্রায় ৬০০ শত হাত। এই ঐতিহাসিক দীঘি খানজাহানের একটি চিরস্থায়ী কীর্তি। শত শত বৎসর ধরিয়া এই দীঘি সুপেয় জল সরবরাহ করিয়া স্থানীয় জনসাধারণের জলকষ্ট নিবারণ করিয়াছে। দীঘিতে বারমাস প্রচুর জল থাকে। ইহার গভীরতা কোন কোন স্থানে ২৫´ ফুটের অধিক। এই দীঘির জল স্বচ্ছ এবং এইরূপ সুপেয় ও গভীর জলাশয় এতদঞ্চলে বিরল। আজিও এতদঞ্চলের অধিবাসীরা উহার খনন কর্তার জলদান পুণ্যের কথা ভারস্বরে ঘোষণা করিতেছে। পূর্ব পাকিস্তানের অন্যতম বৃহত্তম এই দীঘি প্রায় সাড়ে পাঁচশত বর্ষ পূর্বে খনিত হইয়াছিল। বৈজ্ঞানিক যুগে অধুনা এই ধরণের দীঘির প্রয়োজনীয়তা পূর্বের ন্যায় বর্তমানে না থাকিলেও বাগেরহাটের পৌরসভা কর্তৃপক্ষ বর্তমান শহরের প্রাণকেন্দ্র হইতে সাড়ে তিন মাইল দূরে অবস্থিত ঘোড়াদীঘি হইতে পাইপের সাহায্যে পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা সম্পন্ন



ষাটগুম্বজ — পূর্ব পাকিস্তানের বৃহত্তম মস্‌জিদ ও দরবারগৃহ — বাগেরহাট

করিয়াছেন। এজন্য দীঘির পূর্বতীরে যন্ত্রপাতি প্রতিষ্ঠাকল্পে একটি ইষ্টক নির্মিত ঘর ও কাষ্ঠ নির্মিত সাঁকোর কার্য সুসম্পন্ন করা হইয়াছে।

ঘোড়াদীঘির নামকরণ সম্পর্কে প্রবাদ আছে যে একটি ঘোড়া এক দৌড়ে যতদূর পর্যন্ত পৌঁছিয়াছিল, ততদীর্ঘ কবিয়া এই দীঘি খনিত হইয়াছিল। ইহার ভিতর কোন সত্য আছে বলিয়া মনে করি না। কেহ কেহ বলেন দীঘি খননের পর খানজাহান অশ্বারোহণ করিয়া চতুর্দিকে ঘুরিয়া পরিদর্শন করিয়াছিলেন, সেইজন্য উহাব নাম হইয়াছে ঘোড়াদীঘি। অন্য মতানুসারে জানা যায় যে এইস্থানে একটি ময়দান ছিল। তথায় সৈন্যদের কুচকাওয়াজ ও ঘোড়দৌড় হইত। ঘোড় দৌড়ের মাঠ বলিয়া উহার নাম হয় ঘোড়াদীঘি। এই দীঘির পূর্বদিকে এখনও ইষ্টক নির্মিত পাকা ঘাট আছে। দীঘির মধ্যে প্রচুর মৎস্য আছে। পূর্বে এই দীঘিতে কয়েকটি কুমীর ছিল, এখন সে কুমীর নাই। ধলাপাড়, কালাপাড় নাম ধরিয়া ডাকিলে কুমীর তীরের সন্নিকটে আসিত।

ষাট গুম্বজ

ঘোড়াদীঘি পূর্ব পশ্চিমে দীর্ঘ। ইহার পূর্ব তীরে খানজাহানের শ্রেষ্ঠতম কীর্তি সুবিখ্যাত ষাট গুম্বজ অট্টালিকা। ইহার ন্যায় বৃহৎকায় ভজনালয় পূর্ব পাকিস্তানে আর নাই। ইহার দৈর্ঘ ১৬০´ ফুট এবং প্রস্থ ১০৮´ ফুট। গৃহের অভ্যন্তরে গুম্বজের উচ্চতা ২২´ ফুট। এই বিশালকায় হর্মের সম্মুখদিকে মধ্যস্থলে একটি বড় খিলান ও উহাব দুই পার্শ্বে পাচটি করিয়া ছোট খিলান আছে। ইহার প্রাচীরের প্রসস্ততা প্রায় ৯´ ফুট। ষাট গুম্বজ ও খানজাহান আলীর সমাধি সৌধ বিশেষ স্থাপত্য বৈচিত্রে ভাস্কর। এ সকল স্থাপত্যের কোণস্থিত গোলাকার গুম্বজের হেলান ভাব, সরল অলঙ্করণ ও কার্ণিশের বক্রতায় তোগলক স্থাপত্য রীতির প্রভাব বিশেষভাবে পরিস্ফুট। ৬০ গুম্বজের অভ্যন্তর ও বহির্ভাগে বিশেষ করিয়া খিলানের উভয় পার্শ্বের ত্রিভুজাকার অংশে ফুল, লতাপাতা, ইত্যাদি পোড়ামাটির অলঙ্করণ আছে। খানজাহান রীতির স্থাপত্যে মাঝে মাঝে বহুবর্ণে রঞ্জিত মীনা করা চাকচিক্যময় টালির ব্যবহারও দেখা যায়। সমস্ত অট্টালিকা পূর্ব পশ্চিমে ৬৬টি প্রস্তর স্তম্ভের উপর সাতটি করিয়া এগার শ্রেণীতে সর্বমোট ৭৭টি গুম্বজ আচ্ছাদিত একটি

আয়তকার স্থাপত্য নিদর্শন । ছাদের উপর উঠিলে সমস্ত গুম্বজগুলি পরিষ্কার ভাবে দেখা যায় । তন্মধ্যে সত্তরটি গুম্বজের উপরিভাগ গোলাকৃতি এবং মধ্যকার এক সারিতে চৌকোণা বিশিষ্ট সাতটি গুম্বজ আছে। এই গুম্বজগুলি বাংলা চৌচালা রীতিতে নির্মিত। মোট দরজার সংখ্যা পচিশটি, পশ্চিমদিকে একটি ক্ষুদ্র দরজা আছে। নামাজ পড়িবার সময় বা দরবারের কার্যকলাপ চলাকালে যখন লোকে ভরিয়া যাইত তখন সম্ভবতঃ খানজাহান এবং প্রধান অমাত্যগণ পশ্চিমদ্বার দিয়া প্রবেশ করিতেন। ইহা সর্বদা সাধারণের নামাজের জন্য ব্যবহৃত হইত না বলিয়া অনুমিত হয়। এই বিশালকায় গৃহের চারি কোণে চারিটি মিনার আছে। উহা ছাদ হইতে কয়েকফুট উচ্চ এবং উহার মধ্যে ক্ষুদ্র কুঠ্‌রী আছে। উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকের মিনারের মধ্যে ঘুরান সিড়ি আছে। ইহার একটিব নাম "আঁধার কোঠা" এবং অন্যটির নাম "শলক কোঠা" বা "রওশন কোঠা"। ইহার সিংহ দরজার পশ্চিমে প্রস্তর কূপের পার্শ্ব দিয়া দক্ষিণ মুখে যাইবার সময় নিজের এগারটি ছায়া দৃষ্টি গোচর হইত বলিয়া সতীশ বাবু বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু ইহাব ভিতর কোন সত্যতা নাই। উপরে উঠিবার সিড়ি দুইটি সংকীর্ণ এবং এখনকার সিড়ির ন্যায় প্রস্তুত নহে। দক্ষিণ দিকের মিনারে উঠিয়া তৎকালে সম্ভবতঃ সমুদ্র পর্যন্ত দেখা যাইত। কেহ কেহ বলেন এই সুউচ্চ মিনারে উঠিয়া খানজাহানের গুপ্তচরগণ বহিশত্রুর গতায়ত পর্যবেক্ষণ করিতেন। স্যার উল্‌সে হেইগ বলেন, "ষাট গুম্বজের চতুষ্কোণের মিনারগুলি তোঘলোক স্থাপত্য শিল্পের জ্বলন্ত নিদর্শন। ইহার আভ্যন্তরীন প্রশস্ত স্থান অতীব সুন্দর। তবে প্রস্তর স্তম্ভের আধিক্যের জন্য উহার সৌন্দর্য কিছুটা ম্লান হইয়াছে।"

ষাট গুম্বজের মিনারে দাঁড়াইয়া মুয়াজ্জিন উচ্চৈস্বরে আজান দিয়া নামাজের জন্য মুছাল্লিদিগকে আহ্বান করিতেন। ইহা যেমন মস্‌জিদ হিসাবে নামাজের জন্য ব্যবহৃত হইত তদ্রূপ উহা খানজাহানের দরবার গৃহ ছিল। দৈনিক এখানে শাসনকার্য পরিচালনার্থে দরবার বসিত। তুর্ক-আফ্‌গান আমলে এদেশে মাদ্রাসা শিক্ষার প্রবর্তন হয়। তখনকারদিনে প্রত্যেক মস্‌জিদে আরবী ফার্সী প্রভৃতি ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইত। এখনও কোন কোন স্থানে সেই পুরাতন রীতি প্রচলিত আছে। এই বিশালকায় গৃহে নামাজ ও সাধারণ

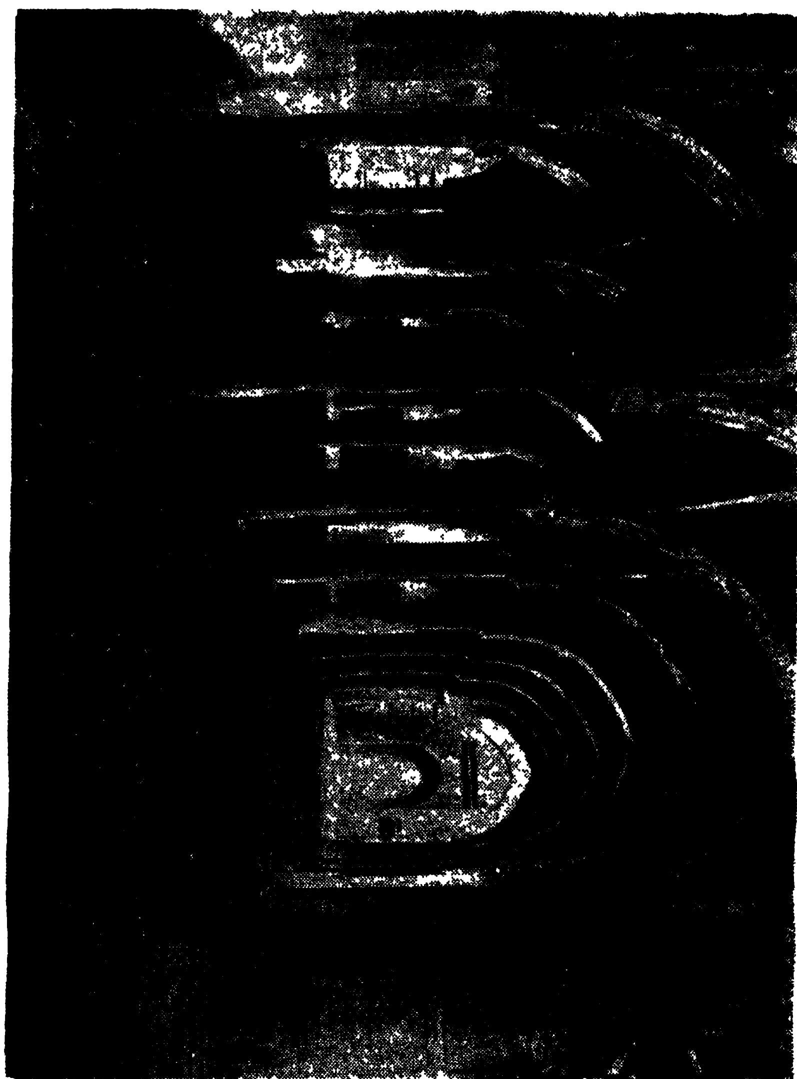
দরবার ব্যতীত মাদ্রাসার কার্যও চলিত বলিয়া অনুমিত হয়। সম্ভবতঃ অসংখ্য ছাত্র এই সুরম্য হর্মে বসিয়া দৈনন্দিন শিক্ষা গ্রহণ করিত। রাজস্ব সংগ্রহ, নানা প্রকার অভিযোগের তদন্ত ও বিচার কার্যও সম্ভবতঃ এখানে বসিয়া চলিত। নামাজের সময় হইলে মুসল্লিরা একত্রিত হইয়া নামাজ আদায় করিত। ষাট গুম্বজ মস্‌জিদের পশ্চিমদিকে ইমামের দাঁড়াইবার জন্য প্রস্তর নির্মিত মেহ্‌রাব ছিল। বর্তমানে কোন মিম্বর নাই। পশ্চিমদিকে একটু বর্ধিত জায়গা ইমামের দাঁড়াইবার স্থান নির্দেশ করিতেছে। এখানে বসিয়া সভাসদগণ রাজকার্য পরিচালনা করিতেন। এইস্থান সুক্ষ্ম কারুকার্যমণ্ডিত ছিল এবং উহার দেওয়াল গাত্রে অসংখ্য লতাপাতা, পদ্মফুল ও অন্যান্য মনোরম নক্সা উৎকীর্ণ ছিল। পাক-ভারত উপমহাদেশে তুর্ক-আফগান স্থাপত্যের মধ্যে ষাটগুম্বজ বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। প্রস্তর বিহীন সুন্দরবন প্রদেশে এই বিশালকায় অট্টালিকা যে মর্মর স্বপ্নের স্থান অধিকার করিয়া আছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। লণ্ডনে প্রকাশিত ইতিহাস গ্রন্থে (Cambridge History of India) ষাটগুম্বজের একটি সুন্দর ফটো দেওয়া হইয়াছে এবং উহার স্থাপত্য শিল্পের ভূয়সী প্রশংসা করা হইয়াছে। বাগেরহাটবাসীরা নিকটবর্তী একটি রেলষ্টেশনের নাম ষাটগুম্বজ রাখিয়া মহাত্মা খানজাহানের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

ষাটগুম্বজ অট্টালিকার গুম্বজ সংখ্যা ষাটটি নহে। উহার সংখ্যা মোট ৭৭টি, মিনারের গুম্বজ চারিটি — সর্বমোট ৮১টি গুম্বজ আছে। কিন্তু তবুও ইহাকে ষাটগুম্বজ বলা হয় কেন? সাতটি সারিবদ্ধ বলিয়া ইহা সাত গুম্বজ এবং তাহা হইতে ষাটগুম্বজ নামও হইতে পারে। তবে মস্‌জিদের গুম্বজগুলি ৬০টি প্রস্তর নির্মিত স্তম্ভের উপর অবস্থিত। এজন্যও ষাটগুম্বজ নাম হইতে পারে। আমাদের মনে হয় ৬০টি খাম্বাজ বা স্তম্ভ হইতে ষাটগুম্বজ নামকরণ হইয়াছে। খাম্বাজ শব্দ সম্ভবতঃ পরবর্তীকালে গুম্বজে পরিণত হইয়াছে।

পূর্বে ষাটগুম্বজ অট্টালিকার চতুর্দিকে প্রাচীর বেষ্টিত ছিল। এখন সে প্রাচীর নাই। উহার দুই পার্শ্বে কর্মচারীদের জন্য গৃহ নির্মিত হইয়াছিল। সে গৃহগুলি নিশ্চিহ্ন হইয়াছে। বহুকাল যাবৎ তত্ত্বাবধান না করার দরুণ এই বিশালকায় হর্ম জঙ্গলে আবৃত হইয়া ভাঙ্গিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল।

ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ার প্রণেতা ডাব্লু ডাব্লু হান্টার বলিয়াছেন যে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ষাটগুম্বজের সর্বত্র জঙ্গলাবৃত হইয়াছিল। উক্ত গেজেটিয়ারে ষাটগুম্বজের একটি ছবি আছে। ইহাতে দেখা যায় যে তৎকালে ষাট গুম্বজের ছাদের ও গুম্বজের উপর বহু আগাছা বাহির হইয়া পড়ায় উহা হালকা জঙ্গলে পূর্ণ ছিল। ষাট গুম্বজের স্থাপত্য শিল্প সম্পর্কে মিঃ ওমালী বলেন যে উহা খানজাহানের সমাধি সৌধের স্থাপত্য শিল্প অপেক্ষা নিম্ন মানের। তিনি ইহাকে দরবার গৃহ বলিয়া বিশ্বাস করেন না। মিঃ ওমালীর মতে ইহা একটি ভজনালয়। উহার পূর্বদিককার সদর তোরণটি এককালে নগরের শোভা বর্ধন করিত। উহাও সুক্ষ্ম কারুকার্যময় ছিল। এখন উহার শেষ অবস্থা। ১৯০৪ সালের প্রাচীন কীর্তিরাজি রক্ষা আইনের দ্বারা এই অট্টালিকা সরকারের তত্ত্বাবধানে আসিয়াছে। উহাব গুম্বজগুলিও সর্বত্র মেরামত হইয়া এখন উহা যত্নের সহিত রক্ষিত হইতেছে। যাটগুম্বজ দেখিবার জন্য আজিও দৈনিক অসংখ্য লোকের ভীড় হয়। প্রতি বৎসর চৈত্র পূর্ণিমায় যে মেলা হয় সেই সময় অগণিত দর্শক এই অট্টালিকা দেখিয়া তৃপ্তিলাভ করে এবং উহার স্থাপত্য শিল্প দর্শনে স্তম্ভিত হইয়া যায়। বিশালকায় জলাশয়, পার্শ্বে বিশালকায় মসজিদ ও দরবার গৃহ উহার নির্মাণ কর্তার অন্তরের বিশালতার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। ষাট গুম্বজের পূর্বদিকে যে হাজারী কাঠালের বৃক্ষটি কালের সাক্ষী হইয়া দণ্ডায়মান ছিল, বিগত ১৯৬১ সালের প্রলয়ঙ্করী ঝটিকায় তাহা ভাঙ্গিয়া যায়। সম্প্রতি উহারই পার্শ্বে প্রত্নতত্ব বিভাগেব বিশ্রামাগার নির্মিত হইয়াছে।

ষাটগুম্বজ খানজাহানের প্রধান সৌধ। ইহা নির্মাণ করিতে কয়েকবৎসর সময় লাগিয়াছিল এবং অসংখ্য দেশী ও বিদেশী রাজমিস্ত্রী নিয়োজিত হইয়াছিল। আজিও তোগলক আবাদে যে সমস্ত সৌধমালা বিদ্যমান আছে উহার স্থাপত্যশিল্প ষাট গুম্বজের স্থাপত্য শিল্পের সহিতও ইহার মিল আছে। কথিত আছে যে খানজাহান জৌনপুর হইতে দক্ষ মিস্ত্রী আনয়ন করিয়া এই সুরম্য হর্মের নির্মাণ কার্য সমাপ্ত করিয়াছিলেন। জৌনপুব তখন স্বাধীন ছিল এবং সম্ভবতঃ জৌনপুর রাজ্যের শাসনকর্তার সহিত তাঁহার ঘনিষ্ট সম্বন্ধ ছিল। কেহ কেহ বলিয়াছেন যে তিনি জৌনপুর হইতেই এদেশে আসিয়াছিলেন। খানজাহান যে জৌনপুরের প্রতিষ্ঠাতা খাজায়েজাহান নহে, তাহা আমরা স্পষ্টাক্ষরে পূর্বে প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছি।



ষাটগুম্বজ অট্টালিকা — (আভ্যন্তরীণ দৃশ্য)

- বাগেরহাট

বসতবাটী নির্মাণ ও অন্যান্য কীর্তি

ষাট গুম্বজ হইতে একটি খাঞ্জালী রাস্তা উত্তরমুখী হইয়া ভৈরব পর্যন্ত এবং অন্য রাস্তা পূর্বদিকে বর্তমান বাগেরহাট শহর পর্যন্ত গিয়াছিল। তৃতীয় রাস্তা দ্বিতীয় রাস্তা হইতে উত্তরমুখী হইয়া নদীতীর দিয়া প্রথম রাস্তার সহিত মিশিয়াছিল। এই শেষোক্ত রাস্তার পশ্চিম পার্শ্বে ভৈরবতীরে খানজাহানের গড়বেষ্টিত বাড়ী ছিল। গড়ের চিহ্ন বর্তমানে নাই বলিলেই চলে। এই খানে স্তূপের আশে পাশে কয়েকখানা প্রকাণ্ড প্রস্তর স্তম্ভ এখনও পড়িয়া আছে। এখানে সোনা মসজিদ নামে একটি মসজিদ ছিল। এখানকার বয়োবৃদ্ধ লোকেরা এই মসজিদের ভগ্নাবশেষ দেখিয়াছেন। বাড়ীর সংলগ্ন এই মসজিদে সম্ভবতঃ খানজাহান দৈনন্দিন নামাজ আদায় করিতেন। বাড়ীর সদর ছিল পূর্ব দিকে এবং নদীতীরে পাকা ঘাট ও খানজাহানের আবাসবাটীর তোরণ ছিল। উহার নিকটেই কোতয়ালী চৌতারা এবং পশ্চিমদিকে একটি ছিলেখানা বা অস্ত্রাগার ছিল। কোতয়াল পুলিশ ও সৈন্যদের সাহায্যে শহরের শান্তি রক্ষা হইত। রাজ্যের প্রধান রক্ষীবাহিনীর প্রধান কেন্দ্রস্থল এইখানেই অবস্থিত ছিল।

খানজাহানের প্রাচীর বেষ্টিত বাড়ীর দেওয়াল এগার হাত উঁচু ও সাত হাত প্রশস্ত ছিল। ইহা এক প্রকার দুর্ভেদ্য ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই প্রাচীরের বেষ্টন সর্বাপেক্ষা অধিক কারণ এইখানেই খানজাহানের নিজস্ব বাড়ী এবং অস্ত্রাগার ছিল। সাধারণে এই বাড়ীকে সোনাবিবির বাড়ী বলে এবং ক্ষুদ্র পুকুরটিকে বিষপুকুর বলে। "বিষ" পুকুর নামের পিছনে যে কোন ঐতিহাসিক সত্য নাই তাহা পরে বলিব। অন্যান্য যে সমস্ত দালান কোঠার দেওয়ালের বেষ্টন সাধারণতঃ চার হইতে পাঁচ হাত তাহাও এখনকার দিনে বিস্ময় সৃষ্টি করে। নদীতীরে খানজাহানের বাড়ীর সংলগ্ন জমিতে এখন পালেরা বাস করে। কথিত আছে তিনি অস্ত্রসস্ত্র, ইষ্টক ও মৃণ্ময়পাত্র প্রস্তুতের জন্য কর্মকার, কুম্ভকার, রাজমিস্ত্রী প্রভৃতি কারিগর সঙ্গে আনিয়াছিলেন। একদা পাল পাড়ার একস্থানে সতেরটি মাজার পাওয়া যায়। এইখানে মৃত্তিকা খনন কালে একটি কবর হইতে খোশবু বাহির হয়, তখন খনন কার্য বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। সম্ভবতঃ কোন সুগন্ধ দ্রব্য কবরের মধ্যে প্রোথিত ছিল। সম্প্রতিকালে

এইস্থানে মরা ভৈরবের খাতের মধ্যে মৎস্য ধরিবার সময় স্থানীয় দুই তিন জন লোক প্রচুর স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কার পায়। শুনা যায় মৎস্যের ভাণ্ড ও গামছা ভর্তি করিয়া দুই ব্যক্তি এই স্বর্ণ ও অলঙ্কার বাড়ীতে লুকাইয়া রাখে। স্থানীয় লোকেরা বাগেরহাটে খবর দিলে তৎকালীন এস, ডি, ও, মিঃ বখতিয়ার আলী পুলিসের সাহায্যে তল্লাশীর পর কিছু স্বর্ণ ও অলঙ্কার উদ্ধার করেন। তাহাও নাকি অনেকে ২।১টি করিয়া লইয়া যায়। বাগেরহাট ট্রেজারীতে উহার কিছু কিছু রক্ষিত ছিল। কেহ কেহ বলেন খানজাহান আলী সোনা পুতিয়া রাখিতেন এবং ইহা সেই কালের লুকায়িত সোনা। আবার কেহ কেহ বলেন উহা হয়ত কোন কালে কেহ রাখিয়া দিয়াছিলেন বা নৌকাডুবির ফলে এইখানে পড়িয়া ছিল। স্বর্ণলঙ্কারের মধ্যে একটি সোনার মুকুট ও কয়েকটি বৃহৎকায় অঙ্গুরী পাওয়া গিয়াছিল। কেহ কেহ বলেন যে ঐ মুকুট ও অঙ্গুরীয় কোন দেবমূর্তির গাত্রে ব্যবহৃত হইত। যাহা হউক এ বিষয় বাগেরহাট অঞ্চলে এমন চটকদার গল্পের সৃষ্টি হইয়াছিল যাহা খুবই অতিরঞ্জিত।

ঘোড়াদীঘি খনন, ষাটগুম্বজ ও স্বীয় বসতবাটী নির্মাণের পর খানজাহান এইখানেই স্থায়ীভাবে শেষ জীবন অতিবাহিত করিতে মনস্থ করেন। তিনি যে অগণিত ধনভাণ্ডার সঙ্গে আনিয়াছিলেন তাহ সহজেই অনুমেয়। তিনি এতদঞ্চলে একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সুন্দরবনের বিভিন্ন স্থানে জঙ্গল আবাদ করিয়া তিনি লোকালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। বাগেরহাটের এ অঞ্চলও জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। প্রাচীনকাল হইতে সম্ভবতঃ এইস্থানে সামান্য বসতি এখানে সেখানে থাকিতে পারে। খানজাহানের বয়সও অধিক হইয়াছিল। সেইজন্য এখানে তিনি মনস্থির করিয়া মসজিদ ও রাস্তা নির্মাণ, দীঘি খনন, ধর্ম চিন্তা ও ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহার যোগ্য শিষ্যও জুটিয়াছিল। যশোরের গরীব শাহ ও বাহরাম শাহের কথা পূর্বেই বলিয়াছি। মোহাম্মদ তাহের, বুড়ো খাঁ, ফতে খাঁ ও খালাস খাঁর কার্য-কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। এখতিয়ার খাঁ, বড় আজম খাঁ, ছোট আজম খাঁ আনোয়ার খাঁ, শাহাদাৎ খাঁ, রেজাই খাঁ, বদর খাঁ, ছুটী খাঁ, কোমর খাঁ, শের খাঁ, দিদার খাঁ, আহম্মদ খাঁ প্রভৃতি তাঁহার প্রধান শিষ্য ছিলেন। ঘোড়াদীঘির পশ্চিমে সায়েড়া

গ্রামে গরীব শাহের দীঘি ও এবাদতখানা ছিল। সায়েড়ায় মসজিদ নির্মাণ ও দীঘি খনিত হইয়াছিল। খানজাহানের শিষ্য বদর খাঁর নামে সিংড়ে গ্রামে বদর দীঘি আছে। বড় আজম খাঁ ও ছোট আজম খাঁ নামীয় দীঘি খাঁরদুয়ার গ্রামে অবস্থিত। বড় আজিম খাঁর নামানুসারে এই গ্রামের নাম খাঁরদুয়ার হইয়াছে। তাঁহারা উভয়েই খানজাহানের নির্মাণ কার্যের ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। খাঁরদুয়ার গ্রামে এখনও লোকে তাঁহাদের বাসস্থান দেখাইয়া থাকে। স্থানীয় লোকে তাঁহাদিগকে গ্রাম্য ভাষায় বড় আজমে ও ছোট আজমে বলিয়া জানে। এখানে বড় আজম খাঁ নামীয় একটী মসজিদ ছিল এবং জঙ্গলের মধ্যে মৃত্তিকার নিম্নে সুড়ঙ্গ ছিল।

খাঁরদুয়ারে হর্ম্যরাজির মালমসলা প্রস্তুত ও সুর্কি ভাঙ্গার কারখানা ছিল। এই কারখানায় সুর্কি ভাঙ্গার জন্য ষাটটি বা একশতটি ঢেকী একই সঙ্গে কার্যরত থাকিত। একটি ঢেকীতে টান দিলে সমস্ত ঢেকী হইতে একই সঙ্গে সুর্কি ভাঙ্গার কাজ চলিত। স্থানীয় প্রবীণ ও বিশ্বস্ত লোকেরা এই ঘটনা তাঁহাদের পুরুষানুক্রমে শুনিয়া আসিতেছেন। এখানে জনশ্রুতির মূল্য আছে বলিয়া মনে করি। খানজাহান গুণী ও জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন, সেজন্য গুণের সমাদর করিতেন। পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের গুণবান লোকদের তিনি খলিফাতাবাদে আনিয়া বসতির ব্যবস্থা করিতেন। কথিত আছে যে ফরিদপুর হইতে তিনি চাঁদ খাঁ ও বাহাদুর খাঁ নামীয় দুই গুণবান ভ্রাতাকে আনিয়া তদীয় শহরে বসতি স্থাপন করাইয়াছিলেন।

সুন্দরঘোনায় ঘোড়দীঘির পূর্ব পার্শ্বে একটি প্রকাণ্ড দীঘি খনিত হইয়াছিল। উহা কোদাল ধোয়ার দীঘি বলিয়া খ্যাত। এই দীঘি প্রায় মজিয়া গিয়াছে। ঐ গ্রামে বখতিয়ার খাঁর দীঘি ও ক'ড়ে মসজিদের সংলগ্ন দীঘি, মীর্জাপুর গ্রামে পাচু দীঘি মহাত্মা খানজাহানের অক্ষয় কীর্তি আজিও লোকমুখে ঘোষিত হইতেছে। তিনি সুন্দরঘোনা গ্রামে শ্বেত পাথরের একটি ছোট মসজিদ নির্মাণ করিয়াছিলেন। উহাকে কড়ে মসজিদ বলা হইত। কেহ কেহ বলেন উহাতে এমন সুন্দরভাবে চুনকাম করা হইয়াছিল যে উহা বহুকাল ধরিয়া সাদা ধবধবে দেখাইত এবং সেইজন্য উহার নাম হইয়াছিল কড়ে মসজিদ। অন্যান্য প্রকাণ্ড দীঘির মধ্যে আহম্মদ খাঁ ও শাহাদত খাঁর দীঘি বিশেষ

উল্লেখযোগ্য। এখ্‌তিয়ার খাঁর দীঘি ৩৮ বিঘা জমি জুড়িয়া বিস্তৃত। এই দীঘিতে এমন দামদল ছিল যে উহার উপর দিয়া মানুষ পদব্রজে যাতায়াত করিতে পারিত। এই দীঘিতে কয়েকটি কুমীর ছিল। দামদল পরিষ্কার করার সময় এবং মৎস্য চাষের জন্য বহু সর্প ও কুমীর বন্দুকের গুলী করিয়া মারিয়া ফেলা হয়। দীঘির মালিকেরা সংস্কারের পর ইহাতে মৎস্য চাষ করিতেছেন। সুন্দরঘোনায় শাহাদাত খাঁর দীঘি বর্তমানে মজিয়া গিয়াছে। উহাতে ধান্য ফসলের আবাদ করা হয়।

যাহা হউক খানজাহান বাগেরহাটে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে উহার নামকরণ করেন খলিফাতে-আবাদ বা প্রতিনিধির কর্মস্থল। ইহার অন্য নাম হাবেলী কসবা অর্থাৎ বাসস্থানের শহর। ইহাই খানজাহানের প্রতিষ্ঠিত শেষ ও বৃহত্তম শহর এবং তদীয় রাজ্যের রাজধানী। সম্প্রতি বাংলা একাডেমী হইতে প্রকাশিত পূর্ব পাকিস্তানের সুফী সাধক পুস্তকের লেখক গোলাম সাক্‌লায়েন বলিয়াছেন যে খানজাহানের রাজধানী ছিল পায়গ্রাম কসবায়। কিন্তু তাহা ঠিক নহে। পায়গ্রাম কসবায় রাজস্ব আদায়ের একটি কেন্দ্র এবং খানজাহান প্রতিষ্ঠিত একটি শহর ছিল। কিন্তু রাজধানী ছিল খলিফাতে—আবাদ বা হাবেলী কসবায়।

প্রতিনিধি অর্থে তিনি দিল্লীর সুলতানের বা বঙ্গের স্বাধীন সুলতানের প্রতিনিধি তাহাই আমাদের বিবেচ্য। দিল্লীর সুলতানের সঙ্গে তাঁহার কোন সম্পর্ক থাকিলে ইতিহাসে তাহা লিপিবদ্ধ থাকাই স্বাভাবিক। ঐতিহাসিক কাশিম ফিরিশতা, জিয়া বারাণী, আবদুল কাদের বদাউনী প্রভৃতি সমসাময়িক লেখকদের গ্রন্থে এ বিষয়ের কোন উল্লেখ নাই। গভীরভাবে তন্নতন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়াও কিছু পাওয়া যায় নাই। দিল্লী নগরীর ষড়যন্ত্র ও বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে তিনি রাজকার্যে বিতৃষ্ণ হইয়া নির্জন বাস, জনহিতৈষণা ও ধর্ম সাধনায় আত্মনিয়োগ করিবার জন্যই এদেশে শুভাগমন করিয়াছিলেন। বাগেরহাট হইতে মহানগরী দিল্লী পর্যন্ত সংবাদ আদান প্রদানেরও কোন ব্যবস্থার কথা আমরা জানি না। খানজাহান প্রথম জীবনে স্বাধীন ভাবেই রাজকার্য পরিচালনা করিতেন। জনগণ সংকটকালে তাঁহার নেতৃত্ব

পাইয়া ধন্য মনে করিয়াছিল। গৌড়ের স্বাধীন সুলতানও ইহাতে কোন আপত্তি করেন নাই। সামসুদ্দিন ইলিয়াস ও তদীয় পুত্র সেকন্দার শাহ দিল্লীর সুলতান ফিরোজ শাহ তোগলকের সহিত যুদ্ধ করিয়া বঙ্গের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। বঙ্গদেশের অভ্যন্তরে বা রাজধানীতে সম্রাটের কোন প্রাধান্য ছিল না। নাসিরুদ্দীন মাহমুদ তখন গৌড়ের স্বাধীন সুলতান। সম্ভবতঃ খানজাহান তাঁহার সহিত সখ্যতা স্থাপন ও রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহারই প্রতিনিধি হিসাবে রাজ্যের নাম খলিফাতাবাদ রাখিয়া শাসন করিতেন। অধ্যাপক ডক্টর দানী বলেন যে খুব সম্ভব খানজাহান গৌড় সুলতানের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন। আধুনিক গবেষণায় ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে যে খানজাহান গৌড়ের সুলতান মাহমুদ শাহের প্রতিনিধি হিসাবে রাজকার্য পরিচালনা করিতেন। কথিত আছে যে তিনি তাঁহাকে একটি সনদ দিয়া সুন্দরবন আবাদের ভারার্পণ করিয়াছিলেন। গৌড়ের সুলতানদের মধ্যে একমাত্র মাহমুদ শাহই খলিফাতোল মোসতায়ান বা আল্লাহর প্রতিনিধি—এই উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঢাকার যে মসজিদের আলোচনা ইতিপূর্বে করিয়াছি, উহাতে এই কথাটি লিখিত আছে। সেইজন্য খানজাহান প্রতিষ্ঠিত শহরের নাম গৌড় সুলতানের উপাধি অনুসারে খলিফাতাবাদ হওয়াই স্বাভাবিক। গৌড়ের সুলতান তখন প্রথম নাসিরুদ্দীন মাহমুদ। খানজাহানের পূর্বে সুন্দরবন অঞ্চল মুসলমান অধিকারে আসিয়াছিল। তাঁহার আগমন সময় হইতে এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে মুসলমান শাসন স্থায়ী হইয়াছিল।

খানজাহান স্বাধীন রাজার ন্যায় চলিতেন না। উহার প্রমাণস্বরূপ বলা যায় যে তিনি স্বনামে কোন মুদ্রাঙ্কন করেন নাই। বাগেরহাট অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ের প্রাচীনকালীন মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু খানজাহানের নামীয় একটি মুদ্রাও আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। বঙ্গের সুলতানের সহিত খানজাহানের যে সখ্যতা ছিল তাহা সপ্রমাণিত হইয়াছে। সমাধি লিপি হইতে জানা যায় যে ১৪৫৯ খৃষ্টাব্দে ২৫শে অক্টোবর খানজাহান ইহধাম ত্যাগ করেন। নাসিরুদ্দীন মাহমুদ ১৪৪২-১৪৬০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। ১৪৫৪ খৃষ্টাব্দে (৮৫৮ হিজরী) আবিষ্কৃত নাসিরুদ্দীনের মুদ্রায় মাহমুদাবাদের

উল্লেখ আছে। উহা যশোর জেলার অন্তর্গত। মাহমুদ শাহের মৃত্যুর পর তৎপুত্র বরবক শাহ সুলতান হইয়াছিলেন। সুন্দরবন সংলগ্ন বরিশালের অন্তর্গত পাটুয়াখালী মহকুমার মীর্জাগঞ্জের সন্নিকটে মসজিদ বাড়ী গ্রামের একটি মসজিদের আরবী লিপি হইতে জানা যায় যে উহা সুলতান বরবক্ শাহের নির্দেশে নির্মিত হইয়াছিল। পটুয়াখালী খলিফাতাবাদের পূর্ব সীমায় অবস্থিত এবং গৌড়ের স্বাধীন সুলতানের রাজ্যাধীন ছিল। সেইজন্য সহজেই সিদ্ধান্ত করা যায় যে খলিফাতাবাদ বা বাগেরহাট অঞ্চল গৌড়ের সুলতানের অধীন ছিল।

অন্যূন চল্লিশ বৎসর ধরিয়া হাবেলী কসবা বনামে খলিফাতে-আবাদ শহর গড়িয়া উঠিয়াছিল। ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে সম্রাট আকবরের সময় রাজা তোডরমল্ল বঙ্গদেশ জরিপ করিয়া যে রাজস্ব তালিকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, উহাতে পরগণা খলিফাতে-আবাদ নামীয় একটি বিভাগ দৃষ্ট হয়। ১৫৭৮ খৃষ্টাব্দে খলিফাতাবাদ ও অন্যান্য ৩৪টি পরগণার রাজস্ব ১,৩৫,০৫৩৲ টাকায় পৌঁছিয়াছিল।

খানজাহান সম্ভবতঃ তিরিশ হইতে চল্লিশ বৎসর কাল পর্যন্ত খলিফাতাবাদ শহরে শেষ জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার তিরোধানের পর এই শহর জনাকীর্ণ ছিল। শহরের প্রাথমিক কার্য সমাপন করিবার পর তিনি রাজদণ্ড হস্তগত করিয়া সুন্দরবন অঞ্চল শাসন করিতে থাকেন। পশ্চিমে সায়েড়া-সদুল্লাপুর হইতে পূর্বে বোটপুর পর্যন্ত এই শহর প্রায় সাত মাইল দীর্ঘ ছিল। দীঘির পাড়, কাড়াপাড়া, সিংড়াই, বাদে কাড়াপাড়া, খাঁর দুয়ার, বোটপুর, ফতেপুর, সোনাতলা, সরাই, মুনিগঞ্জী, রণবিজয়পুর, হরিণখানা, দশানী, কাঠাল, বাগমারা, দরিয়াতালুক, কুলিয়াদাইড়, জোয়ারেরকুল পোলঘাট, রাজাপুর, মরগা, পাটরপাড়া, দেওয়ালবাটী, ফুলতলা, বাবাসাটী, সুন্দরঘোনা, বারাকপুর, নোনাডাঙ্গা, চুনখোলা, মির্জাপুর প্রভৃতি গ্রাম খলিফাতাবাদ শহর ও শহরতলীর অন্তর্গত ছিল। শহরের সর্বত্র ঘন বসতি ও অসংখ্য লোকের বাস ছিল। সর্বত্র অসংখ্য জলাশয়, বসতবাটীর নিদর্শন, মসজিদ, গোরস্থান প্রভৃতি দর্শনে ইহা সহজেই অনুমিত হয়। এখনও যে কোন

স্থান খনন করিলে ইষ্টক ও প্রস্তর পাওয়া যায়। শহরের প্রায় সর্বত্র অসংখ্য মানুষের অস্থি ও কঙ্কাল পাওয়া যায়। প্রবাদ আছে যে খানজাহানের শিষ্য সংখ্যা বর্ধিত হইয়া ৩৬০ জনে পরিণত হইয়াছিল এবং প্রত্যেকের জন্য তিনি একটি করিয়া মোট ৩৬০টি মস্‌জিদ ও ৩৬০টি দীঘি খনন করিয়াছিলেন। এই প্রবাদের মধ্যে কিছুটা অতিরঞ্জিত আছে বলিয়া মনে করি। বার আউলিয়া, ৩৬০ দরবেশ এবং ৩৬০টি দীঘির কথা যশোর-খুলনা ও সিলেট অঞ্চলে শ্রুত হয়। ১২ এবং ৩৬০ কথার বিশেষ তাৎপর্য আছে বলিয়া মনে হয়। বার মাস এবং ৩৬০ দিনে বৎসর ধরার জন্য সম্ভবতঃ কথা দুইটির উৎপত্তি হইয়াছে। সেই প্রকারে পাঁচ পীর কথার উদ্ভব হইয়াছে। তদ্রূপ বারভূঞার নেতা বারজন বা কমবেশী কিনা সঠিকভাবে নির্ণয় করা দুষ্কর হইয়া পড়িয়াছে।

ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের দেশে ইসলাম ধর্ম প্রচার করিয়া যাঁহারা ধন্য হইয়াছেন তাঁহাদের নাম দেশবাসী চিরদিন পরম শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিবে। কিন্তু এই সমস্ত মহাত্মার তিরোধানের পর তদীয় ভক্তগণ বহু অতিরঞ্জিত ও অসম্ভব ঘটনা তাঁহাদের পুণ্য নামের সহিত যোগ করিয়া প্রচার করিয়াছেন। অনেক লেখক এই সমস্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করিয়া পুস্তক রচনা করিয়াছেন। তাঁহারা বিশেষ সঙ্কোচের সহিত সত্য উদ্‌ঘাটনে বিরত রহিয়াছেন। ঐতিহাসিকের কর্তব্য যথাসম্ভব অতিরঞ্জিত ঘটনাকে এড়াইয়া চলা। ৩৬০টি দীঘি ও ৩৬০টি মস্‌জিদের প্রবাদ অতিরঞ্জিত। তবে খানজাহান বহু মসজিদ ও অসংখ্য দীঘি খনন করাইয়াছিলেন। বাগেরহাট অঞ্চলে ২০।২৫টি বড় বড় দীঘি ব্যতীত আরও বহু পুকুর ও জলাশয়ের চিহ্ন আছে। পুকুরগুলি ও গর্ত সমূহ এত নিকটবর্তী অবস্থিত যে উহার সবগুলি জলাশয় বলিয়া মনে হয় না। অনুসন্ধানের পর জানিতে পারিয়াছি যে উহার অনেকগুলি হইতে মাটি তুলিয়া ইষ্টক প্রস্তুত করা হইত। তথায় জলাশয় ও খাতের ন্যায় চিহ্ন রহিয়াছে। বহুস্থানে খাত, গড়খাই ও নদীনালার চিহ্ন আজিও দেখিতে পাওয়া যায়।

যাহা হউক খানজাহানের শহর মরগার খাল ও ভৈরব নদীর উভয় তীর হইতে দক্ষিণে মোস্তফাপুর ও কাড়াপাড়ার বিল পর্যন্ত প্রায় চার মাইল প্রশস্ত ছিল। শহরের সর্বত্র আজিও তাঁহার কীর্তিরাজি দৃষ্টিগোচর হয়। যেখানে

নদী তীরে খানজাহানের আবাসবাটী ও তোরণ ছিল, তথা হইতে রাস্তা মরগার খালের কূল দিয়া উত্তরমুখী হইয়া পূর্ব দিকে গিয়াছিল। ভৈরবের প্রাচীন খাতকে এখন মরগার খাল বলা হয়। ইহারই পশ্চিম তীরে জাহাজ বোঝাই হইয়া দেশ বিদেশ হইতে বাণিজ্য পোত পণ্য সম্ভারের আমদানী ও রপ্তানী কার্য চালাইত এবং শহর নির্মাণের আবশ্যকীয় তৈজসপত্র এই স্থানে অবতরণ করান হইত। এই স্থানের নাম জাহাজঘাটা। এখনও মরগা গ্রামে রাস্তার পার্শ্বে একটি কৃষ্ণ প্রস্তরের স্তম্ভ জাহাজ ঘাটার স্থান নির্দেশ করিতেছে। ঐ প্রস্তরের গাত্রে একটি মূর্তির চিহ্ন আছে। বাগেরহাটে কোন প্রস্তর ছিল না। রাজমহল, গৌড় ও চট্টগ্রাম হইতে এই সমস্ত পাথর নৌকাযোগে আমদানী করা হইত। লোকমুখে প্রবাদ আছে যে প্রস্তর সমূহ পীর খানজাহান আলীর অলৌকিক শক্তির প্রভাবে ভাসিয়া আসিত। একথা শুধু অতিরঞ্জিত নহে, অবিশ্বাস্যও বটে।

খানজাহানের অন্যান্য কীর্তিরাজির বিষয় একে একে বর্ণনা করিতেছি। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত খলিফাতাবাদ নগরী সুরক্ষিত ছিল। প্রত্যেক রাস্তার প্রবেশদ্বারে রক্ষীদের অবস্থানের স্থান আজিও দেখিতে পাওয়া যায়। রক্ষীরা নগরের শান্তিরক্ষা, সাধারণের গতিপথ নির্দেশ, প্রভৃতি কার্য পরিচালনা করিত। ষাটগুম্বজ হইতে বাগেরহাট পর্যন্ত রাস্তার পার্শ্ব দিয়া এখনও বহু দীঘি, অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ ও প্রস্তর খণ্ড দৃষ্টিগোচর হয়। রনবিজয়পুরে ফকির বাড়ীতে একটি পুকুর আছে। তথায় একটি বিরাটকায় এক গুম্বজ বিশিষ্ট মস্‌জিদ জরাজীর্ণ অবস্থায় পড়িয়া আছে। ইহার পূর্বে দরগার রাস্তার পার্শ্বে ঠাণ্ডা পীরের মাজার ও মস্‌জিদ। এই স্থান হইতে ২।৩ রশি দক্ষিণ পূর্বে রণবিজয়পুরে ফকিরের ভিটায় একটি পাকা মাজার সম্প্রতি আবিষ্কার হইয়াছে। ইহারই সন্নিকটে পাগল পীরের মাজার। হিন্দুরা এই মাজারে দুধকলা দিয়া থাকে। কৃষ্ণনগর গ্রামে বড় রাস্তার উত্তর পার্শ্বে হোসেন শাহ্‌ নামীয় দশ গুম্বজ বিশিষ্ট প্রকাণ্ড মস্‌জিদ অবস্থিত। ইহা সম্ভবতঃ হোসেন শাহী বংশের কীর্তি। কাঠাল গ্রামে একজন পীরের মাজার আছে। হিন্দুরা রাত্রে সেখানে আলো জ্বালাইয়া রাখে। কাড়াপাড়া

রাস্তার সঙ্গমস্থলে রক্ষীদের ঘর ছিল এবং উহার উত্তরে একটি পুকুর আছে। বুড়োখাঁর দীঘির পূর্ব-দক্ষিণ কোণে পাকা ইমারতের ভগ্নাবশেষ আছে।

কথিত আছে নুরুল আমীন হাইস্কুলের উত্তরে খানজাহানের মোসাফেরখানা ছিল। তিনি জনহিতার্থে যেরূপ মুক্ত হস্তে দান করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার মোসাফেরখানায় বহু আগন্তুক খানাপিনা করিত তাহা সহজেই অনুমেয়। মোসাফিরখানাকে সবাইখানাও বলা হয়। সবাইখানা হইতে বাগেরহাটের সোরাই বা সরই গ্রামের উৎপত্তি হইয়াছে। এখানে মিঠা পুকুর নামীয় একটি পুকুর ও তৎসংলগ্ন বাড়ী ছিল। এই স্থানে বড় বড় কয়েকখানি প্রস্তর আজিও দৃষ্টিগোচর হয়।

দরগা হইতে পশ্চিমদিকে জিন্দাপীরের মাজার। ইহার পশ্চিম-উত্তরে উঁচু স্থানে রেজাই খাঁ নামীয় ছয় গুম্বজবিশিষ্ট মসজিদটি ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। গুম্বজের কয়েকটি প্রস্তর নির্মিত থাম এখনও পড়িয়া রহিয়াছে। উহার দেওয়ালে আগাছা জন্মিয়া ভগ্ন কায় তরান্বিত করিতেছে। উহার পূর্ব পার্শ্বে উঁচু জায়গায় ইমারতের চিহ্ন আছে। উহাকে লোকে ছিলেখানা বলে। কেহ কেহ বলেন ওখানে কোমর খাঁর বাড়ী ছিল। পুকুরের সংখ্যাধিক্যের কারণ শুধু পানীয় জল ও ইষ্টক প্রস্তুতের জন্য নহে। গৃহ নির্মাণের জায়গা উঁচু করা এবং নিম্ন স্থলকে সমতল করার জন্যও পুকুর খনন করার প্রয়োজন ছিল। যেখানেই প্রাচীন কীর্তি সেখানেই উর্বর মস্তিষ্ক প্রসূত কিছুনা কিছু কুসংস্কার আবিষ্কৃত হয়। ধর্মান্ধতা এই সমস্ত কুসংস্কার সৃষ্টির মূল। এ বিশ্বে ধর্মের নামে যত কুসংস্কার, গ্লানি, রক্তপাত ও পাপকার্য প্রসার লাভ করিয়াছে অধর্মের নামেও তাহা সংঘটিত নয় নাই। রেজাই খাঁ নামীয় মসজিদে কৃষ্ণ প্রস্তরের বড় বড় কয়েকটি থাম আছে। একটি থামে লোকে ভক্তিভরে দুগ্ধ দিয়া থাকে। ঐ পাথরে দুগ্ধ শুষিয়া লয়। এই পাথর সম্পর্কে বহু অলৌকিক কাহিনী শ্রুত হয়। প্রকৃতপক্ষে প্রস্তর খানি ক্ষয়িষ্ণু মসজিদের একখানি স্তম্ভের একাংশ। ইহার মধ্যে অলৌকিকত্ব কিছু থাকা একেবারেই অসম্ভব।

বাগেরহাট শহরে সুলতান নসরৎ শাহ খনিত মিঠাপুকুর ও তাঁহার

ঐতিহাসিক খলিফাতাবাদ টাঁকশালের কথা গ্রন্থের অন্যত্র বর্ণনা করিয়াছি। এই মিঠাপুকুরের ৬।৭ রশি দক্ষিণে দ্বিতীয় ঘোড়াদীঘি নামীয় আর একটি বড় দীঘি ছিল। কেহ কেহ বলেন এই দীঘির অনতিদূরে খানজাহানের যন্ত্রর মন্ত্রর (Ovservatory) ছিল। উহার নির্মাণ কৌশল দেখিয়া এইরূপ অনুমান করা হইয়াছে। বাগমারা গ্রামে আনোয়ার খাঁ নামীয় দীঘি ও মসজিদ আছে। আফ্‌রা, খলসী, উৎকুল, বাদখালী, রামপাল থানার কালেখারবেড় প্রভৃতি গ্রামের দীঘি অদ্যাবধি সুপেয় জল সরবরাহ করিয়া খানজাহান আলীর মহাপুণ্যের কীর্তি তারস্বরে ঘোষণা করিতেছে। রামপাল থানার হুড়কো গ্রামে সুপেয় ঝলমলে দীঘির কথা অন্যত্র বর্ণনা করিয়াছি। উহাও খানজাহান খনিত বলিয়া প্রবাদ আছে।

বাগেরহাট হইতে ষাটগুম্বজ রাস্তার মাঝামাঝি স্থান হইতে দক্ষিণে কাড়াপাড়ার রাস্তার পার্শ্বে বিশালকায় একটি দীঘি খনিত হইয়াছিল। এই দীঘির দৈর্ঘ্য ১৭০০ হাত এবং প্রস্থ প্রায় ৪০০ হাত হইবে। এরূপ সুদীর্ঘ দীঘি এতদঞ্চলে আর নাই। ইহার জল সুপেয় নহে। সেইজন্য সম্ভবতঃ উহার নামকরণ হইয়াছে পচাদীঘি। পচাদীঘির উৎপত্তি ও নামকরণ সম্বন্ধে অনেক কিংবদন্তী এদেশে প্রচলিত আছে। কেহ কেহ অনুমান করেন যে এই দীঘি তৎকালীন নদীর দুই মুখ বাঁধিয়া সামান্য খনন করিয়া দীঘিতে পরিণত করা হইয়াছিল। ইহার পাড় সুউচ্চ নহে, সেইজন্য এরূপ অনুমান করা স্বাভাবিক। বিস্তীর্ণ ভূমি জুড়িয়া এই দীঘি বিস্তারিত। ইহার উত্তরে দশানী গ্রাম। পূর্বে বাদে কাড়াপাড়া, দক্ষিণে ফুলতলা এবং পশ্চিমে দেওয়ালবাড়ী ও ফুলতলা গ্রাম। এই দীঘি ভরাট হইয়া স্থানে স্থানে নলখাগড়ার জঙ্গলে ভরিয়া গিয়াছিল। উহা এখন পরিষ্কার করা হইয়াছে। মৎস্য রক্ষণ ব্যবস্থা এই দীঘিতে আছে। উত্তর ও দক্ষিণে আবাদাযোগ্য ভূমি প্রস্তুত হইয়াছে। খাঞ্জালী দীঘি ও ঘোড়াদীঘির পরই ইহার স্থান। চতুর্থ স্থান অধিকার করিয়াছে এখ্‌তিয়ার খাঁর দীঘি। ইহাও নদীর খাতের মধ্যে খনিত। এই দীঘির পূর্বে এবং পশ্চিমে মরা ভৈরবের প্রাচীন খাতের চিহ্ন বিদ্যমান। তবে ষাটগুম্বজের দীঘি ও খাঞ্জালী দীঘি সর্বত্র মৃত্তিকা খনন করিয়া খনিত। ইহার সুউচ্চ ও বিশালকায়

পাড় দর্শনে তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়। পচাদীঘি সম্পর্কে জনশ্রুতি আছে যে খানজাহানের জনৈক ভাগিনেয় কর্তৃক খনিত হইবার পর অহঙ্কারের সহিত স্বীয় মাতুলকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "আপনার দীঘি অপেক্ষা আমার এই দীঘি বৃহত্তর।" কথিত আছে যে খানজাহান তাহাকে অভিশাপ দিয়া বলিয়াছিলেন যে উহার পানি সুপেয় ও ব্যবহারযোগ্য হইবে না। তখন হইতে উহার পানি অব্যবহার্য হইয়া পড়ে। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই সিদ্ধান্ত করা যায় যে এই প্রবাদ একেবারেই ভিত্তিহীন। পচাদীঘির পানি বর্তমানে বেশ স্বচ্ছ।

বাদামতলা গ্রামে একটি খাঞ্জালী মস্‌জিদ ছিল। শহরের বহু স্থানে এবং বিশেষ করিয়া হাবসীখানা ও মস্‌জিদের সংলগ্ন সর্বত্র পাকা ইন্দিরা ছিল। বহু মস্‌জিদ ও বাড়ীর ইষ্টক স্থানীয় লোকে ভাঙ্গিয়া ব্যক্তিগত কাজে লাগাইয়াছে। চুনোখোলা ও সাবেকডাঙ্গায় দুইটি মস্‌জিদ নির্মিত হয়। প্রথমোক্ত মস্‌জিদ জরাজীর্ণ হইয়া পড়িয়া আছে। কাঠাল গ্রামে একটি পাকা কবর ও মস্‌জিদের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। সোনাতলা গ্রামে শাহ্‌বাজ খাঁ নামীয় দীঘি অদ্যাপি বিদ্যমান। ফকির হাট থানার লালচন্দ্রপুর ও সুভদিয়া গ্রামে দুইটি খাঞ্জালী মস্‌জিদ আছে। প্রায় এক যুগ পূর্বে মৃত্তিকার নিম্নে লালচন্দ্রপুরের মস্‌জিদটি আবিষ্কৃত হয়। এই মস্‌জিদে এখন নিয়মিত নামাজ পড়া হয়। মরগা ও চুনোখোলা গ্রামের দোসীমানায় একটি বিরাটকায় এক গুম্বজবিশিষ্ট মস্‌জিদ নির্মিত হয়। উহা বর্তমানে সরকারী তত্ত্বাবধানে আসিয়াছে। উহাকে লোকে বিবির মস্‌জিদ বলে। এই মস্‌জিদে এখন ওক্তিয়া নামাজ হয়।

দরগার উত্তর পশ্চিমদিকে সম্প্রতি জঙ্গলের মধ্যে একটি এক গম্বজ বিশিষ্ট মস্‌জিদ আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ সমান সমান — ২২´×২২´ ফুট। মস্‌জিদের সংলগ্ন চারিটি বড় এবং চারিটি ক্ষুদ্র কবর পাওয়া গিয়াছে। ইহা একটি এবাদতখানা বা হুজরাখানা ছিল। উহার স্তম্ভের চিহ্ন পরিদৃষ্ট হয়। কোন বিশেষ পরিবারের সমস্ত সদস্যই এই গোরস্থানে শায়িত বলিয়া অনুমিত হয়। বৃহত্তম কবরটির স্তম্ভের মাপ ২০´×১৫´ ফুট। পাগলা পীরের মাজারের সন্নিকটে ৩০টি কবর পাওয়া গিয়াছে। খলিফাতাবাদের সর্বত্র গোরস্থানে ভর্তি।

খানজাহানের সময় অধিকাংশ পাকা ইমারতের ছাদ বহুলাংশে গুম্বজাকৃতি হইত। এবাদতখানা, দরবারগৃহ, বৈঠকখানা ও বাসগৃহের ছাদ চালু ও গুম্বজ আকৃতি দেখিয়া অনেকে মস্‌জিদ মনে করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা ঠিক নহে। অবিরল বারিপাত প্রতিরোধ মানসে সম্ভবতঃ খানজাহান এই ধরনের ছাদের প্রবর্তন করেন।

জিন্দাপীর

হজরত খানজাহান আলীর সমসাময়িক বা পরবর্তী কীর্তিরাজির মধ্যে জিন্দাপীরের সমাধি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চারিটি সুদৃঢ় প্রস্তর স্তম্ভের উপর গুম্বজ নির্মিত। ইহার চতুর্দিকে ইষ্টকের গাঁথুনি। জিন্দাপীরের সমাধি সৌধ প্রাচীন কালীন স্থাপত্য শিল্পের সাক্ষ্য দিতেছে। সমাধির উপর নানা শ্রেণীর লতাপাতা ও আগাছা জন্মাইয়া উহাকে ধ্বংশের দিকে লইয়া গিয়াছিল। বর্তমানে শুধু সমাধি সৌধের নিম্নভাগ ও উহার বৃহৎকায় স্তম্ভের চিহ্ন আছে এবং উহা সযত্নে রক্ষিত হইতেছে। কেহ কেহ বলেন জিন্দাপীরের প্রকৃত নাম আহম্মদ খাঁ, মিঃ ওমালী বলেন জিন্দা ফকির,প্রকৃত নাম আহাম্মদ আলী। কিন্তু তাহা ঠিক নহে। তাঁহার প্রকৃত নাম ছিল সৈয়দ আহম্মদ শাহ্ ওরফে জিন্দাপীর। এই মাজারের পশ্চিম পার্শ্বে এক গুম্বজ বিশিষ্ট একটি এবাদতখানা আছে। পিতার সমাধির উত্তরে স্বীয় পুত্রের সমাধি বিদ্যমান। পরবর্তীকালে এখানে অনেকগুলি কবর আবিষ্কৃত হইয়াছে। বর্তমানে গোরস্থানটির বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। খলিফাতাবাদের কীর্তিরাজির অধিকাংশই খানজাহানের সময় নির্মিত হইয়াছিল। তাঁহার তিরোধানের পর রাজধানীর আরও উন্নতি সাধিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। জিন্দাপীরের গোরস্থানের পার্শ্বে আরও ১৩টি পাকা কবর এবং অসংখ্য কাচা কবর আছে। সবগুলিই তাঁহার বংশধরদের কবর বলিয়া দাবী করা হয়। মাজারের উত্তরে জিন্দাপীর সাহেবের বাসভবন ছিল, সে চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। গোরস্থানের উত্তর ও দক্ষিণদিকের দুইটি দীঘিকে ছোট কোমরা ও বড় কোমরা বলা হয়। উত্তরদিকের দীঘিটি নলখাগড়া ও হাজিবনে পূর্ণ। জিন্দাপীরের কোন ইতিহাস না জানিয়া লেখার জন্ম গোরস্থানে একটি সাইন বোর্ড দেওয়া হইয়াছে। এই গোরস্থানের

জনৈক খাদেম দাবী করেন যে জিন্দাপীর একজন শাসক দরবেশ ছিলেন এবং তিনি খানজাহানের বহু পূর্বে এদেশে আগমন করিয়াছিলেন। এই সমস্ত স্থান তখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপে পূর্ণ ছিল এবং উহার উপরেই জন বসতি গড়িয়া উঠিয়াছিল। পীর সাহেবের বংশধরদের নামে পূর্বে লাখেরাজ ও পীরোত্তর সম্পত্তি ছিল। খানজাহানের সঙ্গে জিন্দাপীরের সম্পর্ক কতটুকু তাহা জানা যায় না।

জিন্দাপীর সম্পর্কে কয়েকটি অলৌকিক গল্প এদেশে প্রচলিত আছে। সিলেটে শাহজালালের সঙ্গে একজন জিন্দাপীর ছিলেন। তাঁহারই নামে তথাকার জিন্দাবাজারের নামকরণ হইয়াছিল। খলিফাতাবাদের জিন্দাপীর সম্পর্কে প্রবাদ আছে যে প্রতি রাত্রিতে তিনি নামাজ বাদ আল্লার অনুগ্রহে সহস্র মুদ্রা প্রাপ্ত হইতেন এবং পরদিন ভোরে উহার সমস্তই দীন দরিদ্রদিগকে দান করিয়া দিতেন। কিছুই সঞ্চয় করিয়া রাখিতেন না। একদা তাঁহার সহধর্মিণী ঐ অর্থ হইতে কিছু সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলেন। ইহার পর সেইরূপ অর্থের সমাগম একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। কথিত আছে যে ইহার কয়েক দিন পরে এই মহাত্মা পবিত্র কোরান হাতে লইয়া উহা পাঠ করিতে করিতে কবরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আর ফিরিয়া আসেন নাই। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন আজিও তিনি কবর মধ্যে জীবিত আছেন এবং কোরান পাঠ করিতেছেন। ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি সে কোরান পাঠ শ্রবণ করিতে পরেন এবং এই জন্যই তাঁহার নামকরণ হইয়াছিল জিন্দাপীর। জিন্দা শব্দের অর্থ জীবিত। এই কাহিনীর ভিতর কোন সত্যতা আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। পবিত্র কোরানে আছে, "প্রত্যেক মানব মরণশীল," অতএব কাহাকে জীবিত থাকার কল্পনা করা শুধু সমীচীন নহে, ধর্ম বিরুদ্ধ কার্যও বটে। অন্যমতে জিন্দাপীর সাধারণ মানুষের ন্যায় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। মৃত্যুর পর সমাধিস্থ করার পূর্বে গায়েবী আওয়াজ হইয়াছিল, "আমাকে সবই দিলে কিন্তু একখানি কোরাণ দিলে না?" তৎক্ষণাৎ কবরের মধ্যে একখানি পবিত্র কোরান আনিয়া দেওয়া হয়। পরে এই ঘটনা অতিরঞ্জিত করিয়া লোকে প্রকাশ করিতে লাগিল যে জিন্দাপীর কোরান হাতে লইয়া জীবন্ত সমাধিস্থ হন এবং এখনও তিনি কোরান পাঠ করিতেছেন।

এ গল্প সরল ও অজ্ঞ পল্লীবাসীর নিকট বাহবা পাইবার যোগ্য কিন্তু ঐতিহাসিকের কাছে ইহার কোনই মূল্য নাই।

রাস্তাঘাট

শুধু মসজিদ ও দীঘি নহে, রাস্তা নির্মাণে খানজাহান বিশেষ দক্ষ ছিলেন। সামন্তসেনা হইতে পিলজঙ্গ পর্যন্ত "হাতীধরার রাস্তা" নামে একটি রাস্তা ছিল। রাস্তার প্রস্তরের আমদানীর জন্য সম্ভবতঃ পাথরঘাটা নাম হইয়াছিল। এখনও ঐ অঞ্চলে খাঞ্জালী রাস্তার চিহ্ন আছে।

ষাট গুম্বজ হইতে পশ্চিমমুখী সামন্তসেনা পর্যন্ত পাকা রাস্তার চিহ্ন এখনও আছে। উহাই খানজাহান আলীর বৃহত্তম পাকা রাস্তা। ষাট গুম্বজের দক্ষিণ পশ্চিমে বিলের মধ্যে ঐ রাস্তা আমরা দেখিয়াছি। উহা বর্তমানে লোকের চলাচলের অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে।

জলাশয় খনন ও হর্মবাজি নির্মাণের ন্যায় খানজাহান রাজপথ নির্মাণে যে দক্ষতা দেখাইয়াছেন তাহা ইতিহাসে বিরল। তিনি জানিতেন যে সুন্দর রাজপথ ব্যতীত যাতায়াতের সুবিধা ও নগরের শোভা বর্ধিত হইতে পারে না। তজ্জন্য তিনি শহর ও শহরতলীর সর্বত্র পাকা রাস্তা নির্মাণ করাইয়াছিলেন। প্রথমে পার্শ্ববর্তী জমি হইতে আধুনিক ধরণে মাটি ফেলিয়া কাচা রাস্তা প্রস্তুত করা হইত। ঐ মাটি বসিয়া গেলে পরে ইটের উপর খোয়া ফেলিয়া রাস্তা করা হইত না। রাস্তা দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য তিনি শুধু ইষ্টক সাজাইয়া রাস্তা নির্মাণ করিতেন। ষাট গুম্বজের আধ মাইল উত্তর-পূর্বে নদী তীরের রাস্তা ৫০০ বৎসর টিকিয়া আছে। বারবাজার হইতে আঁকিয়া বাঁকিয়া বাগেরহাট পর্যন্ত ছিল খানজাহানের দীর্ঘতম রাস্তা। এত দীর্ঘ ও প্রশস্ত রাস্তা সে যুগে আর ছিল না।

আস্ত ইট খাদরী করিয়া পাকা রাস্তা করা হইত। ইটের মাপ সাধারণতঃ ৬″×৪″×২″। পাকা রাস্তা ছয় ফুটের অধিক প্রশস্ত ছিল না। তখনকার দিনে মোটর গাড়ী ও ভারী যানবাহনের প্রচলন ছিল না। সেজন্য অল্প প্রসর রাস্তায় জন সাধারণের চলাচলে কোন অসুবিধা হইত না। ৩ ফুট অন্তর খাদরী করিয়া পাশাপাশি ইট সাজান হইত। আবার যাহাতে ঐ ইট সরিয়া না যাইতে পারে তজ্জন্য লম্বালম্বিভাবে আর এক লাইন ইট খাদরী করিয়া দেওয়া হইত। খাঞ্জালীর



খাঞ্জেলী দীঘি খনন কালে প্রাপ্ত প্রাচীন বুদ্ধ মূর্তি, শিববাড়ী— বাগেরহাট

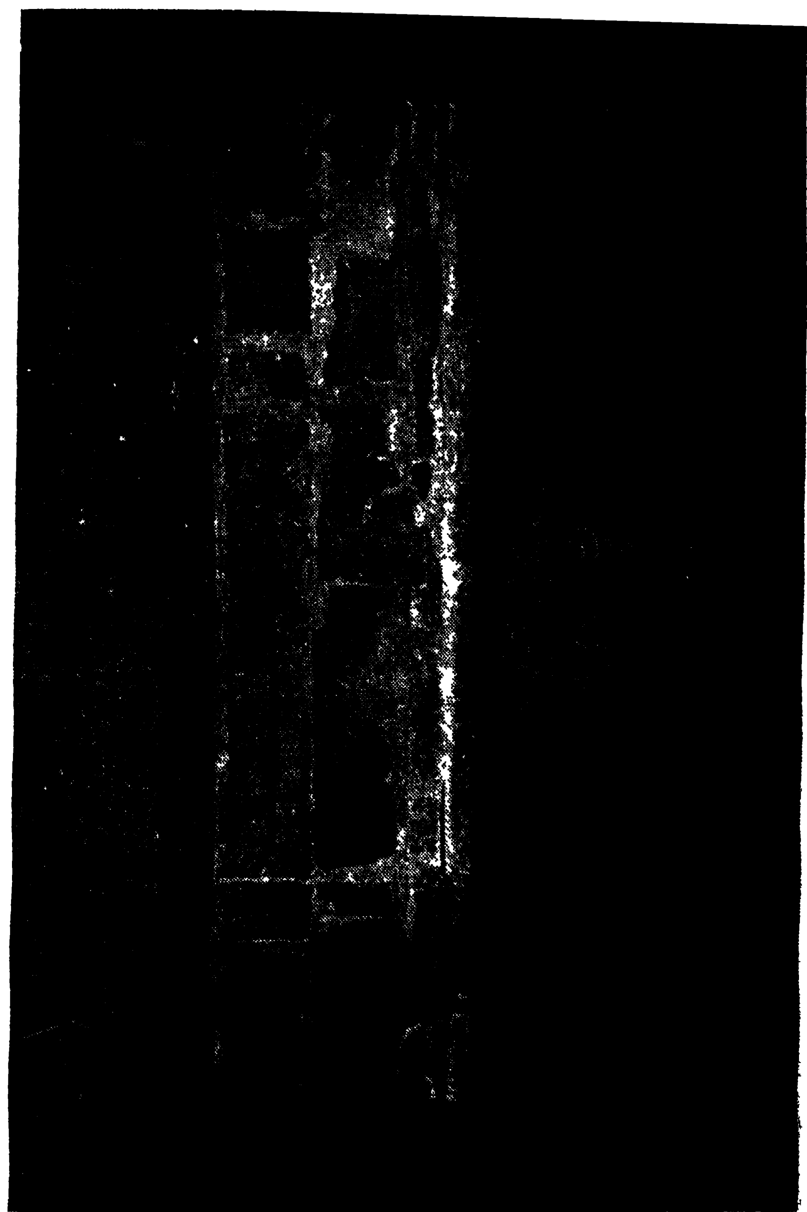
মূল রাস্তা মরা ভৈরব তীরে এখনও বিদ্যমান। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক হর্মরাজির ন্যায় মূল রাস্তার কিয়দংশ রক্ষা করিলে এই কীর্তিটি বিলোপ হইত না। নদীর পূর্ব তীরে বোটপুর, ব্যামোর্তা, জয়গাছি, রঘুনাথপুর হইয়া পাকা রাস্তা বহুদূর গিয়াছিল। এখনও পূর্ব পারের রাস্তা খুঁড়িলে খাঞ্জাই ইট পাওয়া যায়। কথিত আছে খানজাহান চট্টগ্রাম পর্যন্ত জনহিতার্থে রাস্তা নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। এই রাস্তার পরিচয় পাওয়া দুষ্কর। চট্টগ্রামে হযরত বায়েজিদ বোস্তামীর সহিত খানজাহানের কাহিনী সম্পূর্ণ অলীক। সে বিষয় আমরা পরে আলোচনা করিতেছি।

খাঞ্জেলী দীঘি

আমরা খানজাহান আলীর শেষ জীবনের কর্মক্ষেত্র এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত দরগা, মসজিদ, দীঘি প্রভৃতি বিষয় একে একে আলোচনা করিব। বাগেরহাট শহর হইতে ষাটগুম্বজ ও ঘোড়াদীঘির দূরত্ব চার মাইল। এই প্রধান রাস্তা হইতে একটি রাস্তা দক্ষিণমুখী হইয়া দরগায় মিশিয়াছে। খানজাহানের খনিত বৃহত্তম দীঘি এইখানেই অবস্থিত। বহুদিন আগের কথা — পরগনা সম্মেলনে অধ্যক্ষ কামাখ্যাচরণ নাগ সভাপতির আসন হইতে যে ভাষণ দিয়াছিলেন উহা হইতে জানা যায় যে এই দীঘি খানজাহানের মৃত্যুর ৮।৯ বৎসর পূর্বে অর্থাৎ ১৪৫০ খৃষ্টাব্দে খনিত হইয়াছিল। এই বিশালকায় দীঘি খনন করিতে অসংখ্য জনমজুর ও অগণিত অর্থ ব্যয় হইয়াছিল। এই দীঘি খনন করিতে করিতে মৃত্তিকার নিম্নে একটি প্রাচীনকালীন বুদ্ধমূর্তি পাওয়া যায়। আমরা গ্রন্থের অন্যত্র এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছি। বুদ্ধদেবকে লোকে বুদ্ধ ঠাকুর বলিত, সেইজন্য মৃত্তিকার তলদেশে এই ঠাকুর মূর্তি পাওয়া গিয়াছিল বলিয়া এই দীঘির নামকরণ হইয়াছিল "ঠাকুর দীঘি"। সম্ভবতঃ প্রাকৃতিক বিপ্লবে বৌদ্ধ সংস্কৃতি ধ্বংস হইয়া মূর্তিটি মৃত্তিকার নীচে প্রোথিত হইয়াছিল। এই দীঘি সম চৌকোণা বিশিষ্ট অর্থাৎ দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ সমান সমান. এক এক দিকে প্রায় ১১০০ হাত। ইহার জল সুপেয় ও স্বচ্ছ। এমন সুন্দর ও স্বচ্ছ জলাশয় পূর্ব পাকিস্তানে নাই বলিলেই চলে। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে এই দীঘি খনিত হইয়াছিল। যাহাতে পাড়ের ময়লা ও আবর্জনা পড়িয়া দীঘির পানি স্পর্শ

করিয়া উহাকে কলুষিত করিতে না পারে তজ্জন্য দীঘির ভিতরে প্রশস্ত বস্নার প্রস্তুত করা হইয়াছিল। বস্নারের উপর তালগাছ ও অন্যান্যগাছ জন্মিয়াছে। এতৎ প্রদেশে তখন সর্বত্র লবনাক্ত জল, এক ফোটাও পান করা যাইত না। এহেন নিদারুণ অসুবিধা দূরীকরণার্থে খানজাহান সর্বত্র অসংখ্য দীঘিকা খনন করেন।

এই দীঘির নাম সম্পর্কে চিরদিন মতভেদ চলিয়া আসিতেছে। কেহ কেহ বলেন বুদ্ধ ঠাকুরের মূর্তি প্রাপ্তির জন্য ইহার নাম হয় ঠাকুরদীঘি। অন্যমতে খানজাহানকে দেশীয় হিন্দুগণ ভক্তিভরে ঠাকুর বলিত এবং তাঁহারই বিশেষ তত্বাবধানে এই দীঘি খনিত হয় বলিয়া তাহাদের ভক্তিভাজন ঠাকুরের নামানুসারে ঠাকুর দীঘি বলা হইত। আবার কেহ কেহ বলেন পীর আলী মোহাম্মদ তাহের খানজাহানের প্রিয়তম বন্ধু ছিলেন। তিনি পূর্বে ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং খানজাহান তাঁহাকে আদর করিয়া "ঠাকুর" বলিয়া সম্বোধন করিতেন। তাঁহারই স্মৃতি রক্ষার্থে তিনি এই দীঘির নাম ঠাকুর দীঘি রাখিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে জনসাধারণের মধ্যে ঠাকুর দীঘি নাম বিদ্যমান থাকিলেও এই দীঘিকে "খাঞ্জালী দীঘি" এবং ঘোড়াদীঘিকে যাটগুম্বজের দীঘি বলা হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন যে বিগত জিলা জরিপের সময় খাঞ্জালী দীঘির নাম একদল লোকের চেষ্টায় ঠাকুর দীঘিতে পরিবর্তিত হয় এবং তদনুসারে স্থানীয় ঠাকুর দীঘি মৌজার নামকরণ হয়। আমরা এই ঐতিহাসিক দীঘিকে খাঞ্জেলী দীঘি বা "ঠাকুর দীঘি" উভয় নামে অভিহিত করিব। পূর্ব পাকিস্তানের বৃহত্তম দীঘি এবং অবিসংবাদিতভাবে স্বীকৃত যে ইহা খানজাহানের খনিত শেষ দীঘি। যে কোন নামে ইহাকে আখ্যায়িত করিলে হজরত খানজাহানের মহত্বের হ্রাস-বৃদ্ধি হইবে না। দীঘির চারিদিকে পরস্পর মুখোমুখী চারিটি পাকা ঘাট ছিল। এখনও সে ঘাটের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। উত্তরদিকের ঘাট অব্যবহার্য হইয়া পড়িলে ১৩৫০ সালে বাগেরহাটের তৎকালীন এস, ডি, ও, আলী আহম্মদ সাহেবের তত্বাবধানে উহা মেরামত করা হয়। এই বিরাট সিড়ি বাঁধা ঘাটের প্রশস্ততা ৬০´ ফুট এবং সিড়ির সংখ্যা ২৮টি। শত সহস্র লোক এখনও উহার স্বচ্ছ জল পান করিয়া তৃপ্তি লাভ করে। রোগ পীড়া হইলে লোকে দীঘির পানি সেবন



হযরত খানজাহানের রওজা মোবারক—আভ্যন্তরীণ দৃশ্য বাগেরহাট—

করে এবং স্নান করিলে রোগ নিরাময় হয় বলিয়া অনেকে বিশ্বাস করে। এই দীঘি ঘোড়াদীঘির ন্যায় গভীর নহে। ইহাতে এখনও "ধলাপাড় ও কালাপাড়" নামক কুমীরের বংশধরেরা বাস করিতেছে। প্রচুর মৎস্য এই দীঘিতে আছে।

খাঞ্জেলী দরগাহ

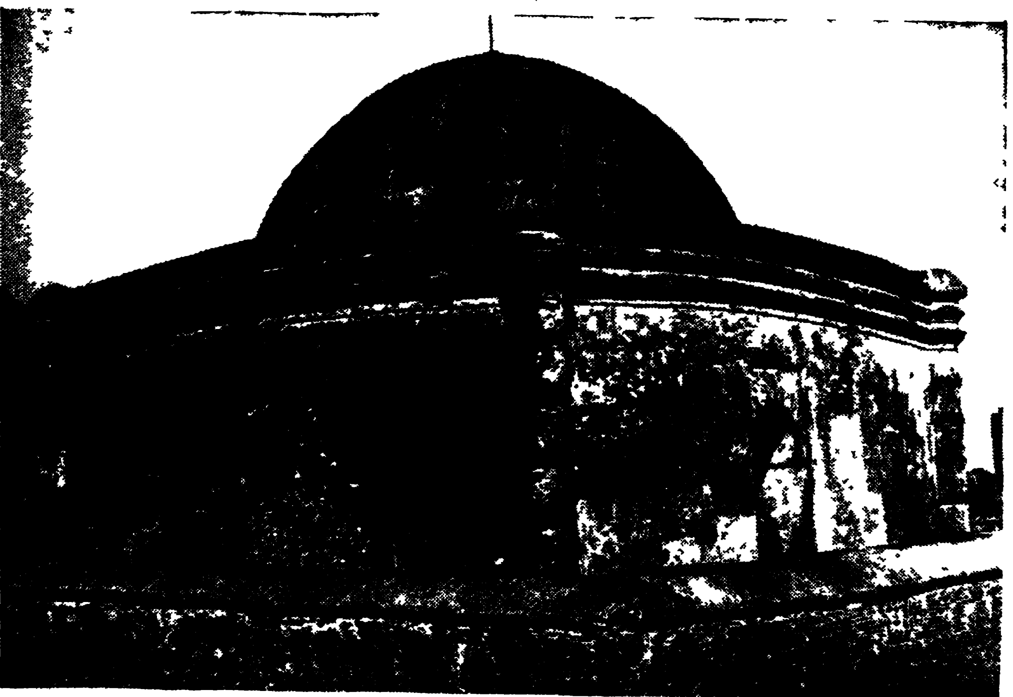
দীঘির উত্তর পাড়ে খানজাহানের সমাধি সৌধ। ইহা এক গুম্বজবিশিষ্ট। পবিত্র মাজারের উপর কিলক চিহ্নের ন্যায় অর্ধচন্দ্রাকৃতি আলোক ছিল। সোনালী বর্ণের এই গোলাকৃতি বস্তুটি সূর্য কিরণের সঙ্গে সঙ্গে বৃত্তাকারে ঘুরিত। ইংরেজ আমলে কেহ উহা অপসারিত করিয়াছে। মাজারের ছাদের দক্ষিণে দুইটি স্তম্ভের উপর দুইটি সোনালী বর্ণের কলসী ছিল। সমাধি সৌধের চতুর্দিক দেওয়ালবেষ্টিত এবং উহার পরিধি চারি হাত। সমাধি সৌধের ভিতরে আরও একটি দেওয়াল আছে উহার বেষ্টন চৌত্রিশ হাত। উহার চারিকোণে চারিটি নাতিদীর্ঘ স্তম্ভ দেওয়ালের সঙ্গে গাঁথা আছে। সুন্দরবন অঞ্চলের দালান কোঠা ৩।৪ হাত পর্যন্ত নোনা ধরিয়া ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। সমাধি সৌধ যাহাতে নোনায় ধ্বংস করিতে না পারে সেজন্য খানজাহান নির্মাণের সময় প্রস্তর দ্বারা উহার দেওয়াল গাত্রে নিম্নের দিকে প্রায় ৪ ফুট পর্যন্ত লেয়ার দিয়াছিলেন। উক্ত প্রস্তরের গাঁথুনি এখনও অটুট রহিয়াছে। ইহার বাহিরের দেওয়াল চতুষ্কোণ। কিন্তু ভিতরের দেওয়াল আটকোণাবিশিষ্ট এবং ২৪´ ফুট দীর্ঘ হইয়া তথা হইতে একটি গোলাকৃতি বৃহৎ গুম্বজ প্রস্তুত হইয়াছিল। ইহার উপর লতা, পাতা, ফুল প্রভৃতি মনোরম কারুকার্য উৎকীর্ণ ছিল। ওমালি সাহেব এই কারুকার্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। কারুকার্যগুলি লোপ পাইলেও গুম্বজের উপরিস্থ জমাট এত মজবুত ও সুদৃশ্য যে অদ্যাপি উহা প্রায় অক্ষত অবস্থায় আছে। মূল্যবান মাল মসলা দ্বারা প্রস্তুত বলিয়া উহা এখনও খুবই মজবুত। ইহার স্থাপত্যসৌন্দর্য স্থায়ী এবং উপভোগ্য। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক এই সৌধটির কোন কোন স্থান মেরামত করা হইয়াছে। কিন্তু উহা প্রাচীন গাঁথুনির সহিত ভালভাবে মিশ খায় নাই।

উত্তর দিক হইতে দীঘি ও দরগায় প্রবেশ করিতে হইলে একটি বিশালকায় তোরণের মধ্য দিয়া আসিতে হয়। এই সুউচ্চ তোরণ দর্শন করিলে আগ্রা,

দিল্লী প্রভৃতি স্থানের তোরণের কথা মনে পড়িয়া যায়। প্রতি তোরণে পাথরের খিলান ছিল। মাজারের বড় দরজা কাঠের ছিল। তৎকালীন পুরাতন কাঠের নমুনা এখনও কিছু কিছু দেখিতে পাওয়া যায়। দরজা বন্ধ করিবার জন্য লোহার পাতে মোড়া বড় কাঠের ঠ্যাস ছিল। বন্ধ করিবার সময় উহার দুই দিকের বড় গর্তের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিতে হয়।

খানজাহানের সমাধি অতীব যত্নের সহিত রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। দৈনিক অসংখ্য লোক তাঁহার কবরগাহ্ জিয়ারত করিয়া থাকে। কবরটি সব সময় মূল্যবান বস্ত্রের দ্বারা আবৃত থাকে। স্থানীয় খাদেমগণ উহা তত্ত্বাবধান করিয়া থাকে। কিছুদিন সরকার (বাগেরহাটের এস, ডি, ও, মারফত) দরগার তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করিয়া সুষ্ঠভাবে চালাইয়াছিল। একটি কমিটির উপর উহার ভার ন্যস্ত ছিল। মৌঃ এ, ওয়াহেদ, ম্যাজিষ্ট্রেট, কমিটীর সেক্রেটারী ছিলেন। বর্তমানে দরগার স্বত্ব লইয়া ওয়াক্ফ কমিশনার, সরকার ও খাদেমদের মধ্যে খুলনার সবজজ আদালতে একটি মামলা চলিতেছে। (১৯৬১ সালের ১০১ নং দেওয়ানী মোকদ্দমা)। এতদ্ব্যতীত ষাটগুম্বজ, ঘোড়দীঘি এবং দরগার সম্পত্তি লইয়া মাননীয় হাইকোর্ট পর্যন্ত অসংখ্য মামলা মোকদ্দমা হইয়া গিয়াছে এবং এখনও চলিতেছে। ইংরেজ আমলে খলিফাতাবাদের বিপুল সম্পত্তি জমিদারগণ দখল করিয়া পত্তনী দিয়াছিলেন।

দরগার খাদেমদের সাধারণে ফকির বলিয়া অভিহিত করে। আলী আহম্মদ সাহেব বলিয়াছেন "তীর্থস্থানে ফকির সাহেবদের পাণ্ডাদের অত্যাচারে তীর্থযাত্রীদিগকে নিঃস্ব ও নির্যাতিত করিবার বিবিধ প্রক্রিয়া তাদের জানা আছে। ধর্মান্ধ যাত্রীদল নির্বিচারে তাদের জুলুম, অত্যাচার সহ্য করে। ছাগল, মুরগী, কুমীরের নামে আত্মসাৎ করে।" স্থানীয় ফকিরেরা খানজাহান আলীর আত্মীয়ের বংশধর বলিয়া দাবী করে। কিন্তু এ কথা সত্য যে তাঁহার নিজের কোন সন্তান সন্ততি ছিল না সেজন্য তিনি কোন উত্তরাধিকার রাখিয়া যান নাই। মিঃ জেমস ওয়েষ্টল্যাণ্ড বলিয়াছেন, "দরগার ফকিরেরা তাঁহার বংশধর বলিয়া দাবী করে। কিন্তু তাঁহাদের কোন ইতিহাস নাই। সেজন্য তাহাদের উত্তরাধিকারত্ব প্রমাণ করা অসম্ভব।" মোকদ্দমা বিচারসাপেক্ষ, সেজন্য আমরা



হযরত খানজাহানের সমাধি সৌধ— বাগেরহাট

এ বিষয় কোন মন্তব্য করিতে চাহি না। তবে ফকিরদের অত্যাচার এখন বিশেষভাবে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। দুঃখের বিষয় অজ্ঞলোকেরা পীরের দরগায় আসিয়া কবরে সেজদা ও কাঁদাকাটি করে এবং আল্লাহ্‌র নিকট আত্ম সমর্পণ না করিয়া মৃত পীর মোর্শেদের নিকট সাহায্য চায়। ইহা মূর্তি পূজার সামিল। ইসলাম ধর্মে এই ধরনের পীরপূজা ও গোরপূজা একেবারেই নিষিদ্ধ।

ধর্মীয় দৈন্যতার জন্য সমাজদেহে অসংখ্য কুসংস্কার বদ্ধমূল হইয়া আছে। কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ পীরপূজা, গোরপূজা ছাড়াও কুমীর পূজায় শরিক হইতেছে। কুমীরে মানতকারীর মুর্গী বা ছাগ খাইলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল বলিয়া অনেকের দৃঢ়বিশ্বাস। কুমীরেরও বহু কেরামতি আছে বলিয়া একদল লোকে জাহির করিয়া ভক্তিতে গদগদ হয়। এ বিষয় আমরা আলেম সমাজের সঙ্গে আলোচনা করিয়াছি। তাহাদের মতে উক্ত কার্যসমূহ ইসলাম-বিরুদ্ধ। জনৈক বিজ্ঞ ধর্মতত্ত্ববিদ স্পষ্টভাষায় বলিয়াছেন - এ ধরণের কার্যকলাপ শেরেকী বা ধর্মদ্রোহী। আমরা ফতোয়া দিতে চাহি না, তবে এ সম্পর্কে আলেম সমাজ জনসাধারণ ও সরকারের দৃষ্টি রাখা একান্ত কর্তব্য মনে করি। দরগার খাদেমদের মধ্যে জনৈক বিজ্ঞ ব্যক্তি এ সম্পর্কে মন্তব্য করিয়াছেন যে সমাজের একদল দুষ্কৃতিকারী, দুর্বলচেতা ও ইসলাম ধর্মের মূলতত্ত্ব সম্পর্কে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরাই কবরে ও কুমীরে অতিমাত্রায় ভক্তি প্রদর্শন করে। এই ধরনের কুসংস্কার অমুসলীমদের মধ্যে অতিমাত্রায় বিরাজমান। কুমীরের তথাকথিত কেরামতি সম্পর্কে পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। আলেমদের চেষ্টায় বর্তমানে কিছু কিছু সুফল ফলিয়াছে। আরবে মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহাব যে আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা, তাহা প্রধানতঃ পীরপূজা ও গোরপূজার বিরুদ্ধে চালিত হইয়াছিল। আজমীর, দিল্লী প্রভৃতি স্থানের দরগাসমূহেও এই ধরণের কুসংস্কার বিদ্যমান। ইহাতে পীর, মোর্শেদ বা মহাত্মাদের আত্মার অবমাননা করা হয় বলিয়া মনে করি। এই সমস্ত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা কর্তব্য।

হজরত খানজাহানের সমাধির পশ্চিম পার্শ্বে তদীয় বন্ধু ও সহকারী মোহাম্মদ তাহেরের সমাধি। ইহার পশ্চিমে এক গুম্বজবিশিষ্ট মসজিদ।

ইহার দেওয়ালের প্রশস্ততা ৭´ ফুটের অধিক। গ্রীষ্মকালেও এই মস্‌জিদের মধ্যে শীতোত্তাপ অনুভূত হয়। মস্‌জিদের বাহিরের দেওয়াল চারি হাত উঁচু। এই মস্‌জিদটি এখনও পূর্বাবস্থায় আছে এবং এখানে ওক্তিয়া ও জুম্মার নামাজ হইয়া থাকে। সমাধি সৌধের দক্ষিণদিকে চারিটি আলো দেওয়ার ঘর আছে। উহাতে বায়ূ প্রবেশ করিতে পারে না। উত্তর পশ্চিম কোণায় তুইটি প্রাচীন কালীন কাঠাল গাছ আজিও কালের সাক্ষী হইয়া জীর্ণাবস্থায় বাঁচিয়া আছে। উহাদের বয়স ৩০০ বৎসরেরও অধিক হইবে। উহাতে অশ্বত্থ বৃক্ষের ন্যায় গুড়ি বাহির হইয়াছে। মস্‌জিদের দক্ষিণ দিকে একটি নিউস্কিম জুনীয়র মাদ্রাসা ১৯২০ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। সম্প্রতি দীঘির উত্তর পাড়ে সিড়ির পূর্বদিকে জনসাধারণ কর্তৃক একটি সুন্দর রেষ্ট হাউজ নির্মিত হইয়াছে। উহার সংলগ্ন উত্তরদিকে বড় প্রাচীরের মধ্যে ছয়টি পাকা কবরের নিদর্শন আছে। এইটি সম্ভবতঃ খাস গোরস্থান ছিল। এই মাজারগুলি খানজাহানের প্রধান শিষ্যদের বলিয়া অনুমিত হয়।

শেষ জীবনের কার্যাবলী

সমাধি সৌধের পূর্বদিকে খানজাহানের বাবুর্চিখানা। উহার এখন শেষ অবস্থা। ইহার ছাদ বহুলাংশে চৌচালা খড়ের ঘরের ন্যায়। দীন দরিদ্রের বন্ধু খানজাহান জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অসংখ্য গরীব তুঃখী, তুস্থ, অসহায় ও আগন্তুকদিগকে তৃপ্তি সহকারে ভোজন করাইতেন। এই ইমারতের উত্তর ও দক্ষিণদিকে একটি করিয়া এবং পূর্বদিকে তিনটি দরজা আছে। মধ্যকার তোরণটি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ। এই রন্ধনশালার মধ্যে জিনিষপত্র রাখার তাকও দেখিতে পাওয়া যায়। বাবুর্চিখানার উত্তরে প্রধান প্রবেশদ্বার ও তোরণ। ইহার উত্তরে প্রশস্ত রাস্তা। এই রাস্তার পশ্চিমদিকে সম্প্রতি ছয়টি পাক কবর আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই কবরগুলির উপর হইতে মৃত্তিকা অপসারণের সময় শাহী আমলের প্রায় শতাধিক রৌপ্যমুদ্রা পাওয়া যায়। উহার একটি ডাঃ মতিয়ার রহমান আমাকে দিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে স্বর্ণ মুদ্রাও ছিল। মুদ্রাগুলির পাঠোদ্ধার একপ্রকার অসম্ভব। দীঘির পাড়ে সর্বত্র মাজার, মৃত্তিকা খুঁড়িলেই অসংখ্য কঙ্কাল পাওয়া যায়। ক্ষুদ্র পথের উপর দিয়া সর্বত্র মনুষ্য অস্থি

দেখিতে পাওয়া যায়। পচাদীঘির পশ্চিম পাড়েও বহু মনুষ্য কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে। এই সমস্ত নিদর্শন নিঃসন্দেহে প্রমাণ করাইয়া দেয় যে খলিফাতে-আবাদ এক সময় ঘনবসতিপূর্ণ জনবহুল শহর ছিল। প্রাচীন মহেঞ্জোদাড়ো শহরে সর্বপ্রথম অসংখ্য মনুষ্য কঙ্কাল ও অস্থি আবিষ্কৃত হওয়ায় শহরের নাম হয় মৃতের টিপি বা মহেঞ্জোদাড়ো। "মহেঞ্জোদাড়ো" সিন্ধি ভাষা, উহার অর্থ মৃতের টিপি। মহেঞ্জোদাড়োর ন্যায় খলিফাতাবাদেও যত্রতত্র মনুষ্য কঙ্কাল ও অস্থি বিদ্যমান। খানজাহানের পূর্বে এখানে শহর ছিল বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। খানজাহানের আগমনকালে সম্ভবতঃ এই স্থান জঙ্গলাকীর্ণ অবস্থায় ছিল এবং তিনি তথায় পুরাতন ভিত্তির উপর নূতন শহরের পত্তন করিয়াছিলেন। এত ঘন বসতিপূর্ণ শহর এবং অসংখ্য মনুষ্য কঙ্কাল বঙ্গের অন্য কোন প্রাচীন শহরে দৃষ্ট হয় না। তজ্জন্য ইহাকে "সমাধির-শহর" (City of Graves) বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

খানজাহানের অসাধারণ শিল্প নৈপুণ্য ছিল। তিনি জানিতেন বাংলা দেশ নদীমাতৃক স্থান। ইহার পলিমাটিতে কোন সৌধ চিরস্থায়ী হয় না। নদীর গতি অস্থায়ী, ভাঙ্গন বেশী। জলবায়ু ও নোনাক্রান্ত দোষে হর্ম্যরাজি অবিকৃত থাকে না। বাংলায় প্রস্তরের সৌধ নির্মাণের জন্য ইষ্টকের প্রয়োজনীয়তা খানজাহান বিশেষভাবে অনুভব করিয়াছিলেন। সৌধরাজি স্থায়ী করার জন্য তিনি মূল্যবান মালমসলা ও প্রস্তর ব্যবহার করিয়াছিলেন। খানজাহান বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে এখানে অত্যধিক বারিপাত হয়। এইজন্য তাঁহার অধিকাংশ হর্ম্যরাজির ছাদ বহুলাংশে চৌচালা গোলপাতা ঘরের ন্যায়। এই ভাবে সহজে জল গড়াইয়া পড়িবার প্রথাতে ছাদ নির্মাণ করা বৃষ্টিপাত বহুল দেশেরই পরম উপযোগী। মিঃ হ্যাভেল তদীয় গ্রন্থে (Ancient and mediaval Architecture cf India) লিখিয়াছেন যে এই প্রকার ছাদ গঠন বাংলার স্থপতি শিল্পদের খেয়ালমাত্র নহে, ইহা দস্তুরমত বৈজ্ঞানিক প্রথায় ও সুপরিকল্পনায় গঠিত।" খানজাহানের সময় নির্মিত অধিকাংশ মস্‌জিদ ও বাসগৃহের ছাদ চতুর্দিকে ঢালু করিয়া নির্মিত হইয়াছিল।

খানজাহানের শেষ জীবনের প্রায় সমস্ত কীর্তিই ঠাকুর দীঘির উত্তর পাড়ে অবস্থিত। পূর্ব পাড়ে বিশেষ কিছুই নাই, মাত্র একটি পাকা ঘাটের চিহ্ন

অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। এই পাড়ে একটি ক্ষীর খেজুর ও দুইটি প্রাচীন আমগাছ এখনও বাঁচিয়া আছে। ক্ষীর খেজুর বৃক্ষটি বকুল বৃক্ষের ন্যায় ঝাপটান এবং উহার পাতা ছাতিয়ান বৃক্ষের পত্রের ন্যায়। প্রবাদ আছে যে এই বৃক্ষটির বয়স ৪০০ বৎসরের অধিক হইবে। যুগে যুগে এই বৃক্ষের বাকল শুকাইয়া মরিয়া আবার নূতন বাকলের সৃষ্টি হয়। সমগ্র পাক-বাংলায় এইরূপ অভিনব ও অশ্রুতপূর্ব ক্ষীর খেজুর বৃক্ষ আর কোথাও নাই। এই বৃক্ষটি সম্ভবতঃ খানজাহানের কোন শিষ্য কোথাও হইতে আনাইয়া দীঘির পাড়ে রোপণ করিয়া উহার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। এই পাড়ে বহু প্রকার ঔষধির গাছ ও লতাপাতা ছিল। কুমীর এই পাড়েই সাধারণতঃ ডিম পাড়ে ও তা দেয়। একজন শিকারী গুইসাপ মনে করিয়া একটি কুমীর মারিয়া ফেলে। ঐ কুমীরকে এই পাড়েই কবরস্থ করা হয়। দক্ষিণ পাড়ে ফকিরদের কয়েকটি বাড়ী ভিন্ন অন্য কিছুই নাই। এখানকার পাকা ঘাট অব্যবহার্য হইয়া পড়িয়াছে।

ঠাকুর দীঘির পশ্চিম দিকে একটি নবগুম্বজ মসজিদ আছে। উহার এক এক সারিতে তিনটি করিয়া গুম্বজ। পশ্চিম দিক ভিন্ন সর্বদিকে তিনটি করিয়া দরজা ছিল। ইটগুলিতে কারুকার্য খোদাই করা আছে। মসজিদের মধ্যকার পিলারের সংখ্যা চারিটি। মসজিদের দেওয়ালের প্রশস্ততা ৮½ ফুট। স্তম্ভগুলি প্রস্তর দ্বারা নির্মিত। এই মসজিদে ওক্তিয়া নামাজ হয়। ইহাও অন্যান্য স্থানের ন্যায় পাকা প্রাচীর বেষ্টিত। জঙ্গলের মধ্যে এই মসজিদটি জরাজীর্ণ অবস্থায় পড়িয়া আছে। উহার সংস্কার আবশ্যক। এই মসজিদে বহু প্রকারের ইট ও সুন্দর প্রস্তর ব্যবহৃত হইয়াছে। ভিতরকার খিলানগুলি মনোরম কারুকার্য খচিত। ইহাতে নানা প্রকার লতাপাতা ও ফুলের ছবি উৎকীর্ণ আছে। মসজিদের চিহ্ন এবং উহার সুন্দর কারুকার্যের নিদর্শন এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। এই মসজিদের পার্শ্বে খানজাহানের কোন নিকট আত্মীয় বা বন্ধুর বাড়ী ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। পাকা বাড়ীর নিদর্শন এখনও আছে। উহার সংলগ্ন পাকা ঘাটও প্রাচীর বেষ্টিত ছিল। পর্দা রক্ষার জন্য সম্ভবতঃ এই ঘাটের সংলগ্ন প্রাচীর দেওয়া হইয়াছিল।

ঠাকুরদীঘির অধিকাংশ স্থানই জঙ্গলাবৃত। ইহার তীরে দাড়াইয়া ভাবুক ব্যক্তি উদ্বেল হইয়া পড়ে। মনে হয় কি বিশাল অন্তকরণ ছিল হযরত

খানজাহান আলীর। জনহিতকর কার্যে তিনি যথা সর্বস্ব দান করিয়া গিয়াছেন। তাই তিনি মরিয়াও অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। কবির ভাষায় বলিতে হয়ঃ—

"এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।"

খানজাহান নির্মিত ষাটগুম্বজ, স্বীয় সমাধিসৌধ, মসজিদ ও বিশালকায় তোরণ সমূহ দর্শনে মানব মনে এই মহাত্মার প্রতি অভাবনীয় ভক্তি জাগরিত হয়। গৌড়ের কয়েকজন স্বাধীন সুলতান ব্যতীত এদেশে কেহই এইরূপ অসংখ্য হর্মরাজি নির্মাণ করেন নাই। দীঘি খননে খানজাহানের সমতুল্য আর কেহ সে যুগে ছিলেন না। পাঁচশত বৎসর পূর্বে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে এই সমস্ত দীঘি খনিত ও সুরম্য হর্ম নির্মিত হইয়াছিল। জাঁকজমক ও শান শওকতের সহিত খানজাহান সদলবলে এখানে অবস্থান করিতেন। নগর-রক্ষী ও সৈন্যগণ রাজধানীর চতুর্দিকে কুচকাওয়াজ করিয়া বেড়াইত। কর্মচারিগণ অফিস আদালতে অহরহ কর্মব্যস্ত থাকিত। কালচক্রের নিষ্পেষণে উহার বিশেষ কোনও চিহ্ন আজ পরিলক্ষিত হয় না। কালের স্রোতে সমস্তই ভাসিয়া গিয়াছে। আছে শুধু ইতিহাস আর করুণ স্মৃতিচিহ্ন। কবি সত্যই বলিয়াছেনঃ—

"ভাসে তার কত ছবি কত পুণ্য কথা
কত বরষের হায় কত শত ব্যথা,"

অদ্যাপি সেই শত বর্ষ পূর্বের কীর্তিগুলি যেন ধ্বংসের অবতাররূপে দণ্ডায়মান রহিয়া খানজাহানের প্রাচীন গৌরব মহিমা জগৎ সমক্ষে বজ্রনির্ঘোষে প্রচার করিতেছে। সুখের বিষয় অনেকগুলি কীর্তিস্তম্ভ গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক প্রাচীন কীর্তি রক্ষা আইনের অন্তর্ভুক্ত হইয়া সযত্নে রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। তৎকালীন বাংলার গভর্ণর লর্ড কার্জনের সময় এই ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়।

এখন প্রশ্ন — এই সমস্ত হর্মরাজি ও রাস্তার ইষ্টক ও প্রস্তর কোথা হইতে আসিল? কেহ কেহ বলেন প্রস্তর সমূহের কিছু কিছু ওখানেই ছিল। তাঁহাদের মতে বাগেরহাট অঞ্চলে খানজাহানের বহুপূর্বে বৌদ্ধধর্মের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। এখানে একটি বৌদ্ধ সংঘারাম ছিল বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। অধ্যাপক সতীশচন্দ্র, অধ্যক্ষ কামাখ্যাচরণ নাগ, অধ্যাপক রণদাকান্ত রায়চৌধুরী,

পশুপতি ভট্টাচার্য প্রমুখ অনেকে বলিয়াছেন যে স্থানীয় হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দির ও স্মৃতিস্তম্ভের ভগ্নাবশেষ হইতে খানজাহান অসংখ্য প্রস্তরখণ্ড সংগ্রহ করিয়া তদীয় হর্মরাজিতে ব্যবহার করিয়াছিলেন। দরগার দীঘি-মধ্যে বৌদ্ধমূর্তি প্রাপ্তি এবং জাহাজঘাটার নির্দেশক প্রস্তর খণ্ডের মূর্তি দর্শনে তাঁহারা এইরূপ সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন। এই যৎসামান্য প্রমাণই তাঁহাদের উপকরণ। জাহাজঘাটার প্রস্তর খণ্ডে খোদিত মূর্তি সম্পর্কে স্থানীয় বিজ্ঞ লোকেরা বলেন যে ঐ প্রস্তরখণ্ড খানজাহানের কোন এক হর্মে ব্যবহৃত হইয়াছিল। উহার ভগ্নাবশেষ হইতে প্রস্তরখণ্ড আনিয়া উহার উপর একটি দেবমূর্তি খোদিত করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত হিন্দু-বৌদ্ধ হর্মরাজির কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। সতীশবাবু হুয়েনসাঙ বর্ণিত সমতটে ৩০টি বৌদ্ধ সংঘারামের মধ্যে বাগেরহাট একটি বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। সমতট এবং গাঙ্গেয় বদ্বীপ পৃথক রাজ্য সেজন্য বৌদ্ধ সংঘারামের কোন নিশ্চয়তা পাওয়া যায় না। খানজাহানের আগমনকালে যত্রতত্র এতদঞ্চলে বৌদ্ধ হিন্দু নিদর্শনের ইতিহাস পাওয়া দুষ্কর। হিন্দু রাজশক্তির অত্যাচারে বৌদ্ধধর্মের বিলুপ্তির সহিত উহার কৃষ্টিরও বিলোপ সম্পর্কে ইতিপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। এখানে এককালে বৌদ্ধ অধ্যুষিত শহর সম্ভবতঃ ছিল। কিন্তু তাহাদের কোন হর্মরাজি ছিল বলিয়া জানা যায় না।

খানজাহান চট্টগ্রাম হইতে প্রস্তর আনাইয়াছিলেন। তবে সমস্ত প্রস্তর চট্টগ্রাম হইতে আনীত হয় নাই। রাজমহল ও উড়িষ্যা হইতেও তিনি প্রস্তর আনয়ন করিয়াছিলেন। স্থানীয় মৃত্তিকা দ্বারা মজুরের সাহায্যে রাশি রাশি ইষ্টক প্রস্তুত হইত। এই ইষ্টক কাঠের ফরমায় ফেলিয়া প্রস্তুত করা হইত না। মৃত্তিকা প্রস্তুত করিয়া যে ভাবে ইচ্ছা সেই ভাবে কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করা হইত। উহাই স্তূপাকৃতি করিয়া পোড়াইলে বিভিন্ন প্রকারের ইষ্টক পাওয়া যাইত। এখনও খলিফাতাবাদে বহু প্রকারের ইষ্টক হর্মরাজির শোভা বর্ধন করিতেছে। ইটের সাধারণ মাপ (১) ১০″×৪″×৬″, (২) ৯″×৪″×২½″, (৩) ১৮″×১২″×২″, ৪) ১৮″×১২″৩″, (৫) ৬″×৪″×১½″, (৬) ১৬″×১৪″×৩⅛″, (৭) ৫″×৫″×১½″, (৮) ৬″×৩″×২″, ইত্যাদি, ক্ষুদ্র ছয় কোণ ও পাঁচ কোণাবিশিষ্ট ইষ্টক পাওয়া যায়। প্রচুর পরিমাণে

নক্সা করা ইটও পাওয়া যায়। সুন্দর কারুকার্য এই সমস্ত ইটে দৃষ্ট হয়। আধুনিক সমতল টালির ন্যায় অসংখ্য টালিও ব্যবহৃত হইত। ইটের প্রকার ভেদ দেখিলেও খানজাহানের অপরূপ শিল্প কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়। চুন, সুর্কী অন্যান্য মাল মসলা এখানে প্রস্তুত হইত। গৌড় অঞ্চল হইতে সম্ভবতঃ খানজাহান মাল মসলা ও রাজমিস্ত্রী সংগ্রহ করিয়াছিলেন। গৌড় পাণ্ডুয়ার হর্ম্মরাজির সহিত খলিফাতাবাদের স্থাপত্য শিল্পের বিশেষ সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়। তোগলোক আমলের দিল্লী ও জৌনপুরের স্থাপত্য নিদর্শনের সহিতও বাগেরহাটের বিশেষ মিল দেখিতে পাওয়া যায়। তোগলোকাবাদের অর্ধ ভগ্ন সৌধরাজি দেখিলে উহার সত্যতা সহজে উপলব্ধি করা যায়। খলিফাতাবাদের হর্ম্মরাজি খানজাহানের অদ্ভুত শিল্প প্রতিভার পরিচায়ক। এই দিক দিয়া তিনি একজন দক্ষ শিল্পী তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে পূর্ণিমার স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না রাতে খানজাহানের দরগায় ধুমধামের সহিত মেলা বসিয়া থাকে। তিন দিন এই মেলা স্থায়ী হয়। অসংখ্য লোক এখানে পীর খানজাহান আলীর কর্মক্ষেত্র দর্শন মানসে জমায়েত হয়। তাহারা সমাধি সৌধ পরিদর্শন করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করে। ইহাকে লোকে খাঞ্জালীর মেলা বলিয়া থাকে। পার্শ্ববর্তী স্থান ও জেলা সমূহ হইতে হাজার হাজার হিন্দু মুসলমান নরনারী ও শিশুরা এই মেলায় অংশ গ্রহণ করে। এক সময় এখানে জুয়া খেলার অবাধ প্রচলন ছিল। উহা বর্তমানে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। তবে এখনও বহু অনাচারের কথা শ্রুত হয়। এখানে অসংখ্য মুরগী, ছাগল ইত্যাদি মানত আসিয়া থাকে। উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ও পুণ্য সঞ্চয় হইবে মনে করিয়া লোকে কুমীরকে মুরগী ও অন্যান্য খাদ্য ভক্ষণ করিতে দেয়।

খানজাহান আলীর মৃত্যুদিবস উপলক্ষ্যে এখানে প্রতি বৎসর ২৫শে অগ্রহায়ণ বিশেষ মিলাদ ও ধর্মানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই সময় সমস্ত কবরগাহ ধৌত করিয়া উহাকে নূতন করিয়া সজ্জিত করা হয়। বহু লোক এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া হযরত খানজাহানের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে আল্লার দরগায় প্রার্থনা করিয়া থাকেন। ঐদিনে ভোজেরও আয়োজন করা হয় এবং দূরদূরান্ত হইতে বহু ভক্ত উহাতে অংশ গ্রহণ করেন।

অন্য আর একটি বিয়ষ আলোচনা করিয়া আমরা অত্র প্রসঙ্গ শেষ করিব। প্রশ্ন উঠিয়াছে-প্রাচীন খলিফাতাবাদ শহরের সৌধরাজির সমস্তই খানজাহান নির্মিত কিনা? কেহ কেহ এ সম্পর্কে আমাদের নিকট সন্দেহ প্রকাশ করিয়া আলোচনায় অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। একাধিক অভিজ্ঞ ও অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তির সুচিন্তিত অভিমত এই যে হর্মরাজির অনেকগুলিই খানজাহান নির্মিত এবং বক্রী সমস্তই তাঁহার পূর্বে বা পরে নির্মিত হইয়া থাকিবে। এই মতানুসারে খানজাহানের পূর্বেও গৌড় সুলতানের অধীন এখানে শহর ছিল। কালের অতলতলে সে সব ইতিহাস বিলুপ্ত হইয়াছে। তবে খলিফাতাবাদ শহরে যে পরিমাণ পৌরানিক কীর্তি আবিষ্কৃত হইতেছে তাহাতে উক্ত মতের স্বপক্ষে কিছু কিছু প্রমাণেরও অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে না। অধুনা কয়েক বৎসর যাবৎ বহু পাকা কবর ও প্রাচীন অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইতেছে এবং ভবিষ্যতে আরও আবিষ্কারের সমূহ সম্ভাবনা বিদ্যমান। এই সমস্ত নিদর্শন এত পুরাতন যে তদ্দর্শনে কেহ কেহ অনুমান করেন যে খানজাহানের পূর্ব হইতে অর্থাৎ তুর্ক-আফগান আমলের প্রারম্ভ হইতে এখানে সম্ভবতঃ শহর প্রতিষ্ঠিত হইয়া কিছু সংখ্যক দীঘি খনিত ও হর্মরাজি নির্মিত হইয়া থাকিবে। খলিফাতাবাদ শহরের যত্রতত্র এত অধিক সংখ্যক কবর এবং মনুষ্য কঙ্কাল ও অস্থি এত প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় যে তাহাতে প্রাচীনত্বের ছাপ দৃষ্ট হয়।

উপরোক্ত বিষয় আমরা গভীর ভাবে বিবেচনা করিয়াছি। সঠিক প্রমাণের অনুপস্থিতিতে আমরা কোন সিদ্ধান্তে পৌছিতে পারি না। দুঃখের বিষয় সমসাময়িক পাক-ভারতের ইতিহাসে খানজাহান সম্পর্কে কিছুই লিখিত নাই। গৌড় সুলতানদের তিনশত বৎসরের ইতিহাস ও খলিফাতাবাদ সম্পর্কে নীরব। একমাত্র নসরত শাহ প্রতিষ্ঠিত খলিফাতাবাদ টাঁকশালের নাম পাওয়া যায়। পরগণা হাবেলী এবং সরকার খলিফাতাবাদ ও পরবর্তী সময়ে সৃষ্টি হইয়াছিল। সে সময়েরও কিছু কিছু কীর্তি খানজাহানের কীর্তিরাজির সহিত মিশ্রিত হইয়া যাইতে পারে। এমতাবস্থায় আলোচ্য বিষয় লইয়া আমরা অগ্রসর হইতে পারিতেছি না। ভবিষ্যতের অনুসন্ধিৎসু ঐতিহাসিকেরা এদিকে অগ্রসর হইলে এ বিষয়ের সমাধান সম্ভব।

খানজাহান আলী

॥ আট ॥

আজগুবি গল্পের ভ্রম খণ্ডন, শেষ জীবন ও সাধনা।

বায়েজীদ বোস্তামী ও খানজাহান।

হযরত বায়েজীদ বোস্তামী ও খানজাহানের সহিত যে সখ্যতা স্থাপিত হইয়াছিল সে কাহিনী সম্পর্কে দেশী-বিদেশী লেখকগণ প্রায় একই বর্ণনা দিয়াছেন। জেমস ওয়েষ্টল্যাণ্ড ও ওমালী এই দুই মনীষীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ার প্রণেতা হাণ্টার সাহেব বলিয়াছেন, খানজাহান চট্টগ্রামে হযরত বায়েজীদ বোস্তামীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন। এদেশে জনশ্রুতি এত প্রবল যে খানজাহান আলী বায়েজীদ বোস্তামীর সমসাময়িক। কথিত আছে যে খলিফাতাবাদ নগরীর জন্য খানজাহান চট্টগ্রাম হইতে প্রস্তর আনয়নের জন্য এই মহাত্মার নিকট লোক পাঠাইয়াছিলেন। ইহাতে তিনি ক্রোধান্বিত হইয়া খানজাহানকে তাচ্ছিল্যের সহিত বলিয়াছিলেন, "দেড় বুড়ীর ভারাণী, তার চাটিগাঁয়ে বরাত।" অর্থাৎ খানজাহান সামান্য ফকির — তাঁহার এতদূর সাহস যে, সে চট্টগ্রামে হযরত বায়েজীদের নিকট প্রস্তর চাহিয়া পাঠায়? আরও কথিত আছে যে শেষ পর্যন্ত তিনি খানজাহানের ধর্মনিষ্ঠা, সাধনা ও ন্যায়পরায়ণতা দর্শনে পরম পরিতুষ্টি লাভ করেন এবং প্রস্তর আনিবার অনুমতি প্রদান করেন। খানজাহান ও তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং তাঁহার সাক্ষাৎ লাভের জন্য মধ্যে মধ্যে চট্টগ্রাম যাইতেন। সতীশ বাবু, ডাঃ আবুল কাসেম ও অন্যান্য সমস্ত লেখকই এই উপাখ্যানকে ইতিহাস হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। সম্প্রতি বাংলা একাডেমী পত্রিকায় "ফতেহাবাদের আউলিয়া কাহিনী" প্রবন্ধে এই উপাখ্যানের কথা আছে। এখন হযরত বায়েজীদ বোস্তামী কে? তাঁহার পরিচয় আমাদের জানিতে হইবে।

শেখ ফরিদউদ্দীন আত্তার প্রণীত বিখ্যাত গ্রন্থ তাজকিরাতুল আউলিয়ায় হযরত বায়েজীদ বোস্তামীর জীবন চরিত ও সাধনার বিষয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

উহাই একমাত্র প্রমাণ্য গ্রন্থ। উক্ত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে, "সুলতান আরেফিন হযরত বায়েজীদ বোস্তামী দরবেশগণের মাথার মণিস্বরূপ ছিলেন। তিনি অতিশয় খোদা প্রেমিক ছিলেন। তাঁহার অসাধারণ কেরামত ও এবাদৎ শক্তি ছিল। তিনি মধ্য এশিয়ার অন্তর্গত বোস্তাম প্রদেশে জন্ম গ্রহণ করেন" ইত্যাদি। শেষ দিকে লিখিত আছে বায়েজীদ বোস্তামী মহানবী হজরত মোহাম্মদের নাতি ইমাম জাফর সাদিকের সমসাময়িক। উক্ত গ্রন্থে ইমাম জাফর সাদিকের সম্পর্কে বর্ণিত আছে: "হযরত জাফর সাদেক হযরত মোহাম্মদের জামাতা হযরত আলীর বংশধর। তিনি আহলে বায়েতের মধ্যে বিখ্যাত দ্বাদশ ইমামের অন্যতম ছিলেন।" ইমাম জাফর ষষ্ঠ ইমাম। তিনি দার্শনিক, আইনজ্ঞ, ধর্মতত্ত্ববিদ পণ্ডিত ছিলেন। বাগদাদের খলিফা হারুনার রশিদের পিতা আল্‌মনসুর। ইমাম জাফর সাদেক তাহারই সমসাময়িক।

খলিফা আল্‌মনসুরের সময় মহাত্মা জাফর সাদেক দেহত্যাগ করেন। ফরিদউদ্দীন আত্তার তাঁহার তাজকেরাতুল আউলিয়া গ্রন্থ প্রণয়ন করেন ষষ্ঠ হিজরীর মাঝামাঝি। অতএব আমরা দেখিতে পাই যে হযরত বায়েজীদ বোস্তামী দ্বিতীয়-তৃতীয় হিজরীর লোক এবং খানজাহান আলী নবম হিজরীতে খলিফাতাবাদে শহর নির্মাণ করিয়াছিলেন। কবরগাত্রে তাঁহার মৃত্যু তারিখ ৮৬৩ হিজরী জিলহজ্জ মাস লিখিত আছে। এই দুই মহাত্মার আবির্ভাবের মাঝখানে গড়পড়তা অনুন ৬০০শত বৎসরের ব্যবধান। সেজন্য কেমন করিয়া উভয়ের সাক্ষাৎ হইতে পারে? ইহা অসম্ভব এবং ঐতিহাসিক সত্যের বিপরীত। অথচ এই অনৈতিহাসিক কিংবদন্তী কয়েক শতাব্দী যাবৎ অবাধভাবে লিখিত ও পঠিত হইয়া আসিতেছে।

চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশিত পুস্তক "হযরত সুলতান বায়জীদ বোস্তামীর (রাঃ) সংক্ষিপ্ত জীবনী।" উক্ত পুস্তকে বর্ণিত আছে, "১৬৪ হিজরী অর্থাৎ ৭৭৭খৃষ্টাব্দে তিনি পারস্যদেশের বোস্তাম নগরে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবকালে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। হিজরী ২৬১সনে অর্থাৎ ৮৭৪ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করেন।" এই পুস্তকের হিসাব ধরিলে হযরত বায়জীদ বোস্তামী এবং খানজাহান আলীর আবির্ভাবের ব্যবধান প্রায় ৬০০ বৎসর হইবে। চট্টগ্রাম

শহর হইতে পাঁচ মাইল উত্তরে জালালাবাদ পাহাড়ের উপর হযরত বায়েজীদ বোস্তামীর দরগাহ অবস্থিত। "তাজকিরাতুল আউলিয়া", "আবেদনামা" বা অন্য কোন পুস্তকে তাঁহার চট্টগ্রাম আগমনের কোনরূপ উল্লেখ নাই। অনেকের মতে তিনি চট্টগ্রামে আসিয়াছিলেন আবার কেহ কেহ বলেন তিনি কখনও চট্টগ্রামে আসেন নাই। শুধু তাঁহার ভক্তগণ কর্তৃক একটি দরগাহ স্থাপিত হইয়াছে। উপরোক্ত পুস্তকে আরও লিখিত আছে যে বায়েজীদ বোস্তামীর মাজার বোস্তাম নগরে অবস্থিত। কথিত আছে যে হযরত বায়েজীদ খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর শেষভাগে চট্টগ্রাম হইতে পাঁচ মাইল উত্তরে নাসিরাবাদ গ্রামের এক পর্বত চূড়ায় সর্বপ্রথম আগমন করিয়া তৎপ্রদেশে ইসলাম ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। ইহা অসম্ভব ঘটনা। অবশ্য নাসিরাবাদের পর্বত চূড়ায় একখণ্ড প্রস্তর এখনও তাঁহার স্মৃতি বহন করিতেছে। এখানে একটি মসজিদ অক্ষত অবস্থায় বিদ্যমান। ইহা বহু পরে নির্মিত হয়। দরগার রক্ষণাবেক্ষনের জন্য একটি "ওয়াক্‌ফ ষ্টেট" আছে। ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া বিচার করিলে দেখা যায় যে হযরত বায়েজীদ বোস্তামীর চট্টগ্রাম আগমনের কাহিনী সঠিক নহে।

যাহা হউক হযরত বায়েজীদ বোস্তামী যে খানজাহান আলীর ছয় শত বৎসর পূর্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন তাহা ঐতিহাসিক সত্য এবং এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। তদ্ব্যতীত দেশীয় প্রবাদ "দেড় বুড়ীর ভারাণী তার চাটিগাঁয়ে বরাত" কথাটি বহু পরে বানোয়াট করা হইয়াছে। এই প্রচলিত গ্রাম্য কথার সহিত খানজাহানের কোনই সম্পর্ক নাই। হযরত খানজাহান ও বায়েজীদ বোস্তামীর নামে এই ধরনের আজগুবি কাহিনী এ দেশে অবাধভাবে লিখিত, পঠিত ও প্রচারিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ পর্যন্ত কেহই ইহার সত্যাসত্য নির্ধারনের কোন প্রকার চেষ্টা করেন নাই। সুখের বিষয় যে পরীক্ষা-নীরিক্ষার পর এই অলীক কাহিনী ধরা পড়ায় সত্যোদ্ঘাটন সম্ভব হইয়াছে।

বিষ পুকুর, সোনাবিবি ও রূপাবিবি উপখ্যান

বিভিন্ন প্রকার কাহিনী ও উদ্ভট গল্প এদেশের প্রকৃত ইতিহাসকে ধামাচাপা দিয়া রাখিয়াছে। বাগেরহাট অঞ্চলে একটি প্রবল জনশ্রুতি আছে যে হজরত খানজাহানের সোনাবিবি ও রূপাবিবি নামক দুই স্ত্রী ছিলেন। তাঁহারা ভৈরবতীরে নির্মিত বাড়ীতে বসবাস করিতেন। অনেকে ইহাকে সোনাবিবির বাড়ী বলে। সতীশ বাবু বলিয়াছেন; "দুই স্ত্রী থাকিলেই ঝগড়া হয়; সোনাবিবি ও রূপাবিবির মধ্যে ঝগড়া হইত। তাহার ফলে একজন বিষ খাইয়া বাটীর পার্শ্ববর্তী পুকুরে ঝাপ দিয়া মরেন ; ঐ পুকুরকে এখনও "বিষপুকুরীয়া" বলে ; অন্য জন মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, ঘোড়াদীঘির পশ্চিম দক্ষিণ কোনে সমাহিত হন। ঐ সমাধিস্থানকে বিবিজানের মস্‌জিদ বলে। খানজাহানের পূর্ব পরিচয় সম্পর্কে আমরা পূর্বে যে আলোচনা করিয়াছি তাহাতে তিনি নপুংসক ছিলেন বলিয়া জানা যায়।" গ্রাম্য পাণ্ডাদের চটকদার সত্যমিথ্যা গালগল্প শ্রবণ করিয়া সম্ভবতঃ সতীশবাবু এই সব অলীক ঘটনার অবতারনা করিয়াছেন। এ বিষয়ে তিনি কোন ঐতিহাসিক সূত্রের বরাতও দেন নাই।

উপরোক্ত কথাগুলির কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। জৌনপুরের খাজায়েজাহান নপুংসক ছিলেন। তিনি এবং বাগেরহাটের খানজাহান ভিন্ন ব্যক্তি। খানজাহান নপুংসক ছিলেন একথা আদৌ সত্য নহে। তাঁহার কোন পুত্র সন্তান ছিল না এ বিষয়ে সকলেই একমত। সোনাবিবি ও রূপাবিবি দুইটি অদ্ভুত নাম। ওমালী সাহেব খানজাহানের সোনাবিবি ও বাঘীবিবি নামে দুই স্ত্রীর কথা বলিয়াছেন এবং বাঘীবিবির কবর ঘোড়াদীঘির পশ্চিমতীরে অবস্থিত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাও ঠিক নহে। কোন কোন লেখক দুইজন পরিচারিকার কথা বলিয়াছেন কিন্তু তাহাও অনৈতিহাসিক। তৎকালীন সম্মানীয় এবং আরবী ফার্সী ভাষায় শিক্ষিত মুস্‌লীম সংস্কৃতির পৃষ্টপোষক কোন বীর শাসকের স্ত্রীর ঐরূপ নাম কিছুতেই হইতে পারে না। পরবর্তী কালে এই আজগুবী নামদ্বয়ের প্রবর্তন হইয়া থাকিবে। খানজাহানের নিজস্ব বাসভবনে সোনা মস্‌জিদ নামে একটি ভজনালয় ছিল। তখনকার দিনে গৌড় পাণ্ডুয়ায়ও সোনালীবর্ণ শোভিত মস্‌জিদের সোনা মস্‌জিদ নাম রাখা

হইত। সম্ভবতঃ সোনা মস্‌জিদ হইতে পরবর্তীকালে সোনাবিবি নামের উৎপত্তি হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে এই নামে কেহই ছিলেন না। খানজাহানের স্ত্রী বা স্ত্রীদের সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। তবে একথা সত্য যে তিনি অতি পবিত্রভাবে জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। তাঁহার এক বা একাধিক স্ত্রী থাকিলেও ইতিহাস তাহার খোঁজ রাখে না। সোনাবিবির বাড়ী, বিবিজানের মস্‌জিদ বা বাঘীবিবির কবর ও বিষপুকুরীয়া বানোয়াট গল্প।

খানজাহানের পূর্ববর্নিত নিজস্ব বাড়ীর সীমানায় বর্তমান রাস্তার পার্শ্বে একটি ছোট পুকুর আছে। ঐ পুকুর এককালে খুব গভীর ছিল। উহাকে স্থানীয় লোকে বিষপুকুরীয়া বলে। প্রবাদ আছে যে খানজাহানের জনৈক স্ত্রী হীরার অঙ্গুরীয়তে মিশ্রিত জহর বা বিষ সেবন করিয়া এই পুকুরে পড়িয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। তজ্জন্য উহার নাম হইয়াছে "বিষপুকুরীয়া"। এই কাহিনী বা পূর্বোক্ত গল্প যে একেবারেই আজগুবী তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়। বিষ খাইয়া আত্মহত্যা করিলে আবার পুকুরে ঝাপ দিয়া মরিবার কথা সামঞ্জস্যপূর্ণ নহে। আমরা এই স্থানটি বিশেষভাবে পরিদর্শন করিয়াছি। এখানে রাজবাড়ী ও মস্‌জিদ ছিল, উহার ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান। পুকুরটি রাজবাড়ীর চৌদেওয়ালের মধ্যে অবস্থিত ছিল তাহার নিদর্শন আছে। উহা অন্দর মহল বা বাড়ীর অভ্যন্তরে অবস্থিত। অনুসন্ধানের পর জানিতে পারিয়াছি যে ফার্সী "বিচ" (বে - ইয়া - চে) শব্দ বিকৃত হইয়া বিষ হইয়া গিয়াছে। ফার্সি বিচ্‌ শব্দের অর্থ ভিতর বা অন্দর মহল এবং পুকুরটিও অন্দর মহলের মধ্যে অবস্থিত এবং সম্ভবতঃ তজ্জন্য উহার নাম ছিল বিচ্‌ পুকুর। সাধারণ গ্রাম্য লোকের হাতে পড়িয়া এই বিচ্‌পুকুর হইতে পরবর্তী কালে বিষপুকুর এবং উহা হইতে বিষপুকুরীয়া শব্দের উদ্ভব হইয়া নানা প্রকার চটকদার গল্পের সৃষ্টি হইয়াছে। গল্পের ভিত্তিতে উপন্যাস লেখা যায় এবং গল্প শুনিয়া উহার সত্যাসত্য যাচাই করিয়া ইতিহাস লিখিতে হয়। সেজন্য গল্প ও ইতিহাস একই বিষয়বস্তু নহে।

কুমীরের কাহিনী

খাঞ্জেলী দীঘিতে ধলাপাড় ও কালাপাড়ের বংশধরেরা এখনও জীবিত আছে। ঘোড়াদীঘিতেও অনুরূপ কয়েকটি কুমীর ছিল। সেখানে এখন কোন কুমীর নাই। এই কুমীরগুলি সম্পর্কে এদেশে বহু কাহিনী প্রচলিত আছে।

কুমীর জল জন্তুদের রাজা। ইহা ভয়ংকর জীব বিশেষ তাহা সকলেরই জানা আছে। প্রবাদ আছে যে খাঞ্জেলী দীঘি খননের সময় গভীর তলদেশেও যখন জল পাওয়া গেল না তখন খানজাহান অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া পুকুরের ভিতর পর্যবেক্ষণ করিতেছিলেন, এমন সময় একজন ধ্যানস্থ দরবেশের সাক্ষাৎ পান। এই দরবেশ খানজাহানের হস্তে একটি জিনিষ দান করেন এবং উপদেশ দেন যে তিনি যেন তীরে উঠিবার পূর্বে উহা খুলিয়া না দেখেন। কিন্তু খানজাহান তীরে আসিবার পূর্বেই উহা খুলিয়া দেখামাত্র পুকুর জলে ভরিয়া যায়। কথিত আছে ইহার পর সঙ্গে সঙ্গে খানজাহানের ঘোড়া দুইটি কুমীরে পরিণত হয়। এই কুমীরদ্বয়ই কালাপাড় ও ধলাপাড় নামে খ্যাতি লাভ করে। আবার কেহ কেহ বলেন খানজাহান স্বীয় অলৌকিক ক্ষমতা বলে দুষ্ট জিন বশীভূত করিয়া কুমীরে পরিণত করিয়াছিলেন। অন্য মতানুসারে জানা যায় যে খানজাহান তাঁহার খনিত দীঘিতে দুইটি কুমীর ছাড়িয়া দিয়া আদেশ করেন যে তাঁহার এই দীঘির পানি কেহ যেন অপবিত্র না করে। তন্নিমিত্ত তিনি প্রহরীস্বরূপ কুমীর-দ্বয়কে দীঘিতে মোতায়েন রাখেন। শেষোক্ত প্রবাদের কিছু তাৎপর্য আছে বলিয়া মনে করি। কেহ কেহ বলেন যাঁহাদের সন্তানাদি থাকে না তাঁহারা আদর করিয়া কুমীর, ব্যাঘ্র ইত্যাদি জন্তু পুষিয়া থাকেন। দীঘির কুমীরকে লোকে আদর যত্ন করে। বাগেরহাট অঞ্চলে এই কুমীরের বংশধরেরাই কৌলিন্য পাইয়াছে।

প্রকৃত ব্যাপার সম্ভবতঃ এই যে এই স্থান তৎকালে সমুদ্রের নিকটবর্তী এবং বড় বড় নদী এই দীঘির নিকট দিয়া প্রবাহিত ছিল। বিল খালে অসংখ্য কুমীর বাস করিত। এখনও কিছু সংখ্যক কুমীর যত্রতত্র পরিলক্ষিত হয়। বিশালকায় দীঘির মধ্যে নিয়মিত খাদ্য পাইয়া খানজাহানের সময় বা পরবর্তীকালে কুমীর স্থায়ী বাসা বাঁধিয়াছে। এখনও বর্ষাকালে বিভিন্ন দিক হইতে কুমীর আসিয়া বিভিন্ন দীঘিতে আশ্রয় গ্রহণ করে। কুমীরের বাচ্চা এক পুকুর হইতে অন্য পুকুরে ঘুরিয়া বেড়ায়।

যাহা হউক খাঞ্জেলী দীঘি বা ঠাকুরদীঘির কুমীর শত শত বৎসর ধরিয়া এখানে অবস্থান করিতেছে। এক যায় আর এক আসে। ব্যাঘ্র, কুমীর, সর্প

প্রভৃতি ভয়াবহ জন্তুও পোষ মানিয়া থাকে। কিন্তু সুযোগ পাইলে ইহারা আবার পালন কর্তাকে দংশন করিতে দ্বিধাবোধ করে না। দীঘির কুমীরের বৈশিষ্ট এই যে ধলাপাড় ও কালাপাড় বলিয়া ডাক দিলে উহারা প্রায়ই খাবারের লোভে ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হয়। মুর্গি ও ছাগলের ডাক শুনিলেও কুমীর আসিয়া থাকে। চৈত্র পূর্ণিমায় মেলার সময় কুমীরেরা খাবারের লোভে ঘাটে পড়িয়া থাকে। মুরগী খাইবার জন্য কুমীরে সিড়ির উপর উঠিয়া বসিয়া থাকে। ইহারা প্রচুর আহার পায় সেজন্য সাধারণত নরমাংস ভক্ষণ হইতে বিরত থাকে। অসংখ্য লোক দীঘির পাড়ে কুমীর দেখার জন্য ভীড় জমায়। শিশুগণ সিড়ির উপর কুমীর দেখিয়া আনন্দ লাভ করে। মেলার সময় দর্শকদের ভীড়ে দুর্বল লোকের পক্ষে কুমীর দেখা প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়ে।

গ্রীষ্ম সমাগমে মাদী কুমীর পুকুর পাড়ে গর্ত করিয়া ডিম পাড়ে এবং তিন মাস যাবৎ ঐ ডিমে তা দেয়। নব বর্ষার সমাগমে ডিম হইতে বাচ্চা বাহির হয়। ডিমগুলি রাজহাঁসের ডিম্বাকৃতি, তবে উহার চেয়ে একটু লম্বা। ডিমের খোসা সেলুলাইড প্লাষ্টিকের ন্যায় মোলায়েম। মাদী কুমীর বাচ্চা বহির হইবার পর উহাদের সঙ্গে লইয়া দীঘিতে নামে। বাচ্চাগুলি উহার পার্শ্বে মৎস্যের ন্যায় ক্রীড়া করে। তখন মাদী কুমীর হা করিয়া থাকে। উহার মুখের ভিতর ধবধবে সাদা। বাচ্চাগুলি খেলিতে খেলিতে উহার মুখের ভিতর প্রবেশ করা মাত্র নিঃশঙ্কচিত্তে উহাদিগকে উদরস্থ করে। পুরুষ কুমীরেরাও স্বীয় বাচ্চা ভক্ষণ করে। এখানে সব সময় একটি মাত্র পুরুষ কুমীর দৃষ্ট হয়। মধ্য ভারতের হনুমানদের ন্যায় একটির অধিক পুরুষ কুমীর সাধারণত এখানে থাকে না।

খাঞ্জেলী দীঘির কুমীর সম্পর্কে বহু আজগুবি গল্প অতিরঞ্জিত হইয়া এতদঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সতীশবাবু লিখিয়াছেন: "খানজাহানের ধলাপাড় ও কালাপাড়ের বংশধরেরা নরমাংস লোভ পরিহার করিয়াছিল বলিয়া তাহাদের বংশধরগণও সেই গুণ পাইয়াছে। এখনও ঠাকুর দীঘি ও ঘোড়াদীঘিতে কতকগুলি কুমীর আছে। তাহারা মানুষকে আক্রমণ করে না।" পশুপতি বাবু বাগেরহাটের লোক, তিনিও লিখিয়াছেন; "কুমীরগুলি একেবারে তীরে আসে কিন্তু কাহাকেও কিছু বলে না। এই দীঘির কুমীরগুলি মানুষের মাংস

খাইয়াছে এমন কোন সংবাদ আজিও পাওয় যায় নাই।" সাধারণ লোকের বিশ্বাস দীঘির কুমীরে মানুষ ভক্ষণ করে না। লোকে কুমীরকে খাওয়াইবার জন্য মুরগী, ছাগল প্রভৃতি মানত করিয়া থাকে। কুমীরকে খাওয়াইলে মরহুম পীর সাহেব খুশী হইবেন এবং মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে বলিয়া লোকে বিশ্বাস করে। পীর পূজা ও গোর পূজার ন্যায় কুমীরে ভক্তির আবেশ দৃষ্ট হয়। এই ধরনের কুসংস্কার কোন কোন লোকের অস্থি মজ্জায় প্রবেশ করিয়া তাহারা প্রকৃত ধর্ম হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছে। যে দেশের দরিদ্র মানুষ দুই বেলা আহার যোগাইতে পারে না সে দেশের অজ্ঞ ও দরিদ্র লোকেরা কুমীরকে মুরগী ও ছাগল খাইতে দেওয়ার চেয়ে কুসংস্কার আর কি হইতে পারে ?

খানজাহানের দীঘির কুমীরে মানুষ ভক্ষণ করে না — ইহাই লোকে জানে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা সঠিক নহে। প্রচুর খাদ্যদ্রব্য পায় বলিয়া ইহারা সচারাচার মনুষ আক্রমণ করে না। দ্বাদশ বর্ষ উর্দ্ধের কথা — একদিন একটি ছোট ছেলেকে স্নান করিবার সময় কুমীরে ধরিয়া লইয়া যায়। এই নিদারুন সংবাদে স্থানীয় লোকেরা বিব্রত হইয়া পড়ে। চতুর্দিকে ক্রন্দনের রোল পড়িয়া যায়। লোকে দীঘির সর্বত্র তল্লাসী চালাইতে থাকে। দরগার অন্যতম খাদিম রজব আলী ফকির কুমীর মারিবার জন্য বন্দুক হস্তে ঘুরিয়া বেড়ান। শেষ পর্যন্ত ছেলেটি কুমীরের হস্তে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বহুক্ষণ পরে মৃত শিশুর লাশের সন্ধান পাওয়া যায়। কুমীরভুক্ত লাশের একাংশ পরে উদ্ধার করা হয়। ডক্টর এনামুল হক লিখিত 'বঙ্গে সুফী প্রভাব' হইতে উদ্ধৃত করিয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর অব্দুল করিম কুমীর সম্পর্কে লিখিয়াছেন: "খানজাহান আলীর কুমীরের নিকট গ্রাম্য যুবতী নারীরা কিছু আকাঙ্খা করিলে নিশ্চিত ফল পাইয়া থাকে। তাহারা দীঘিতে স্নান করিয়া কুমীরের আশীর্বাদ প্রার্থনা করে। তাঁহারা মুরগী ও ছাগ উৎসর্গ করিয়া তাহাদের প্রথম আশার ফল কুমীরকে দিতে প্রতিজ্ঞা করে। এই প্রতিজ্ঞা তাহারা ভঙ্গ করে না। প্রথম নবজাত শিশুকে জলের নিকট আনিয়া আবার ফিরাইয়া লইয়া যায়।"

এককালে এই ধরনের কুসংস্কার এতৎপ্রদেশে পূর্ণ মাত্রায় বিরাজ করিত। বর্তমানে উহা একেবারেই হ্রাস পাইয়াছে বলিলে চলে। কয়েক বৎসর পূর্বে একদিন খাঞ্জেলী দীঘির কুমীরে গোলাপ ফকির নামক এক ব্যক্তির উরুতে

কামড়াইয়া পুকুরের মধ্যে টানিয়া লইয়া যাইতে থাকে। উপস্থিত বুদ্ধিমত তখন স্থানীয় লোকেরা একগাছি দড়ির সাহায্যে তাহাকে কুমীর সহ তীরে লইয়া আসে। তৎক্ষণাৎ কাঠের দ্বারা কুমীরের গাত্রে আঘাত হানিলে লোকটিকে ছাড়িয়া দেয়।

অন্য একটি জ্বলন্ত ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বের কথা। খুলনা জিলার এক নমঃশূদ্র দম্পতি সন্তানাদি না হওয়ায় পীর খানজাহান আলীর দরগায় মানত করে যে সন্তান জন্মিলে কুমীরের মুখে দিয়া আবার ফেরত লইয়া যাইবে। তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস পীরের কুমীরে মনুষ্য ভক্ষণ করে না এবং সন্তানকে উহার নিকট দিলেও ফিরাইয়া দিয়া থাকে। যথাসময় এই গ্রাম্য অশিক্ষিত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন দম্পতির একটি পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করে। সন্ধ্যার সময় পিতামাতা প্রাণ প্রিয় নবজাত শিশুকে আনিয়া খাঞ্জালী দীঘির পাকা ঘাটের সিড়ির উপর রাখিয়া দেয়। তাহারা ভাবিয়াছিল কুমীরে ছেলেটিকে স্পর্শ করিয়া ফেরত দিবে, কিন্তু দীঘির এই হিংস্র জন্তুটি নবজাত শিশুকে নিঃশঙ্কচিত্তে উদরস্থ করিয়া ফেলে। বৈশাখী পূর্ণিমার রাত্রিতে এই দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়। পীরের দরগায় ক্রন্দনের রোল পড়িয়া যায়। স্থানীয় লোকের মধ্যে নিদারুণ ভীতির সঞ্চার হয়। সন্তান শোকে পিতামাতা পাগলপ্রায় হইয়া পড়ে। এই সংবাদ পুলিশের কর্ণগোচর হইলে পিতামাতার নামে একটি ফৌজদারী মোকদ্দমা রুজু হয়। দরগার ফকিরদের বিরুদ্ধেও জোর তদন্ত পরিচালিত হয়। কিন্তু তাহারা এই দুর্ঘটনার সহিত সংশ্লিষ্ট না থাকায় নির্দোষ প্রমাণিত হয়। পিতামাতার বিরুদ্ধে পুলিশ চার্জশিট দখিল করে। ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীদ্বয়কে দায়রায় সোপর্দ করেন। খুলনার দায়রা জজের কোর্টে জুরীর সাহায্যে পিতামাতার বিরুদ্ধে নিম খুনের অপরাধে বিচার কার্য পরিচালিত হয়। বিচারে উভয়ের ৭ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়। আসামীদ্বয় কলিকাতা হাইকোর্টে আপিল করিলে তৎকালীন মাননীয় বিচারপতি তারক আমীর আলী জজকোর্টের রায় ন্যায় সঙ্গত বলিয়া মন্তব্য করেন। তবে মাননীয় বিচারপতি দয়াপরবশ হইয়া কারাদণ্ডের মেয়াদ হ্রাস করিয়া মাত্র তিন বৎসর করিয়া দেন। "Calcutta weekly Note"এ এই মামলার রিপোর্ট যথারীতি প্রকাশিত হয়।

একমাত্র পুত্র সন্তান হারাইবার পর কারাবরণ ও নিঃস্ব অবস্থায় নিদারুণ মানসিক রোগে পিতা জেলখানায় দেহত্যাগ করে। অনাথিনী মাতা জেলে থাকিয়া মস্তিষ্ক বিকৃত অবস্থায় একেবারে উন্মাদিনী হইয়া যায়। তৎকালীন যুক্ত বাংলার গভর্ণর খুলনা জেল পরিদর্শনে আসিয়া জেল কর্মাধ্যক্ষের নিকট এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া বিশেষ মর্মাহত হন। তিনি ফৌজদারী কার্যবিধি আইনের ৪০১ ধারার বিধান অনুযায়ী প্রদত্ত বিশেষ ক্ষমতা বলে স্ত্রীলোকটির অবশিষ্ট কারাদণ্ড মওকুফ করিয়া খালাস দেন এবং রিলিফ ফাণ্ড হইতে তাহার পুনর্বাসনের জন্য ৫০০্ শত টাকা এককালীন মঞ্জুর করেন। তৎকালীন জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট ফকাস সাহেবের আদেশে সাব ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মোতাহারুল হক সাহেব ১৯২২ সালের কোন একদিনে ঐ সাহায্যের অর্থ লইয়া স্ত্রীলোকটির বাড়ীতে গিয়া ঐ অর্থ দান করিয়া আসেন। ইহার পর কুমীরের স্বভাব সম্পর্কে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন মনে করি। মোতাহারুল হক সাহেবের নিকট আমরা সবিস্তারে এই ঘটনা শ্রবণ করিয়াছি।

সম্প্রতিকালে ঢাকা নগরীর অদূরে কুর্ত্তার শাহ পীরের দীঘিতে একটি ৫।৬ বৎসর বয়স্ক মেয়ে সন্তানকে তীর হইতে কুমীরে ধরিয়া লইয়া যায়। মেয়েটি অন্যান্য দর্শকদের সহিত কৌতুহল চিত্তে কুমীর দেখিতেছিল। হতভাগিনী শিশুকে কুমীরে আক্রমণ করিয়া মারিয়া ফেলে এবং পরে বহু চেষ্টার পর তাহার অর্ধভুক্ত লাশ পাওয়া যায়। অচিরাৎ দেশব্যাপী এই চাঞ্চল্যকর কাহিনী সংবাদ পত্রের মারফত বিস্তার লাভ করে। প্রকৃত ব্যাপার এই যে কুমীর, ব্যাঘ্র, সর্প, সিংহ প্রভৃতি হিংস্র জন্তু রীতিমত পোষ মানে না। একদিন না একদিন উহার প্রকৃত স্বভাব বাহির হইয়া পড়ে। মহাত্মা সেখ সাদী বলিয়াছেন :—

"শার্দুল শিশু শার্দুল হবে শেষে সে
যদিও পালিত হয় মানবের বেশে সে।"

বুদ্ধ মূর্তির আজগুবি উপখ্যান

খানজাহান আলী তাঁহার বৃহত্তম জলাশয় "খাঞ্জালী দীঘি" খনন কালে একটি কৃষ্ণ প্রস্তরের ধ্যানী বুদ্ধমূর্তি পাইয়াছিলেন সেকথা পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে।

ইহা প্রকৃত ঘটনা এবং এই প্রবাদ আদৌ ভিত্তিহীন নহে। এই আবিষ্কারের পর মূর্তিটি দীঘির পূর্ব পাড়ে রাখিয়া দেওয়া হয়। হিন্দুগণ উহাকে দেবতা শিব জ্ঞানে পূজা করিত। খানজাহানের যেরূপ স্বধর্মনিষ্ঠা ছিল তদ্রূপ তিনি পরধর্মে সহিষ্ণু ছিলেন। মুসলমান অধ্যুষিত হাবেলী কসবায় মূর্তির অবস্থানে স্থানীয় হিন্দুগণ আপত্তি করিলে খানজাহান ঐ মূর্তি তাহাদের ইচ্ছানুসারে মহেশ চন্দ্র ব্রহ্মচারী নামক জনৈক ব্রাহ্মণকে দান করেন। অতঃপর ঐ বুদ্ধমূর্তি বাগেরহাট হইতে চারি মাইল পূর্বে কচুয়া থানার অন্তর্গত একটি গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয়। তদবধি ঐ গ্রামের নাম হইয়াছে শিববাড়ী। আজিও ঐ গ্রামে সেই প্রাচীনকালীন বুদ্ধমূর্তি সযত্নে রক্ষিত আছে। হিন্দুগণ এখনও উহাকে দেবতা শিব বলিয়া পুজা করিয়া থাকে। ভ্রম ক্রমেই তাহারা উহাকে শিবমূর্তি বলিয়া পূজা করে। প্রকৃতপক্ষে উহা আদি ও অকৃত্রিম বুদ্ধমূর্তি। এ মূর্তির ফটো দর্শনে পাঠকগণ ইহা সহজেই বুঝিতে পারিবেন। শিববাড়ীতে বৎসরে হিন্দুদের এক বিরাট মেলা হয়।

এই প্রস্তর মূর্তিকে ভিত্তি করিয়া এদেশে অনেক প্রবাদ ও কিংবদন্তী ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বাগেরহাটের সর্বপ্রথম এস, ডি, ও ছিলেন জনৈক ইংরেজ, নাম মিঃ সাণ্ডার্স। পরবর্তী এস, ডি, ওর নাম বাবু গৌরদাস বসাক। ইনি দেশীয় খ্রীষ্টান। উভয়ে বাগেরহাটের প্রাচীন কীর্তি সম্পর্কে পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। দুর্ভাগ্যক্রমে বহু চেষ্টা করিয়াও পুস্তক দুইখানির সন্ধান করিতে পারি নাই। তবে এইটুকু জানা যায় যে গৌরদাস বাবু স্থানীয় প্রবাদের উপর নির্ভর করিয়া লিখিয়াছেন যে দীঘি খনন কালে একটি মন্দির পাওয়া যায় এবং উক্ত মন্দিরের মধ্যে একজন মুসলমান সাধু ধ্যানস্থ অবস্থায় ছিলেন। কথিত আছে যে এই সাধু ভৈরব তীরে আশ্রম স্থাপিত করিয়া ধ্যানস্থ থাকেন। যখন তাঁহার ধ্যানভঙ্গ হয় তখন মন্দির মৃত্তিকার নিম্নে প্রোথিত হইয়া যায়।

দ্বিতীয় প্রবাদ সম্পর্কে সতীশবাবু লিখিয়াছেন ঃ "অনেকদূর খনন করিলেও জল পাওয়া গেল না। শেষে আরও খনন করিলেও একটি মন্দির বাহির হইল। সেই মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়া খানজাহান আলী এক হিন্দু যোগীর সাক্ষাৎ পাইলেন। তিনি যোগীর নিকট জল চাহিলে উৎসমুক্ত জল দ্রুতবেগে বাহি

হইতেই খানজাহান ও তাঁহরে অনুচরবর্গ বহু কষ্টে কূলে উঠিয়া আত্ম রক্ষা করিলেন। লোকের বিশ্বাস এই মন্দির এখনও জলতলে বিদ্যমান।"

অন্যান্য প্রবাদের কথা আমরা পূর্বে বর্ণনা করিয়াছি। চতুর্থ প্রবাদ এই যে দীঘি খনন কালে মৃত্তিকা গর্ভে একটি মসজিদ উঠিয়াছিল। ঐ মসজিদে একজন ধ্যানস্থ মহাপুরুষ ছিলেন। তিনি এখনও সেই অবস্থায় আছেন। বাগেরহাটের জনৈক প্রবীণ অভিজ্ঞ ব্যক্তি লেখকের নিকট এ কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন। আমি উহা বিশ্বাস করিতে অপারগ হইলে তিনি একটু অসন্তুষ্ট হন। এ সম্পর্কে প্রবাদ আছে যে প্রায় একশত বৎসর পূর্বে একবার ভীষণ জলকষ্ট দেখা দেয়। তখন দীঘির পানি প্রায় শুকাইয়া যায়। জনশ্রুতি আছে যে ঐ বৎসর উক্ত মসজিদের চূড়ার উপরিভাগ দেখা যায়। একথা অনেকে বলে এবং বিশ্বাস করে। বাগেরহাট অঞ্চলের বিশেষ বিশেষ প্রবীণ ব্যক্তির মুখে শুনিয়াছি যে তাঁহারা নৌকারোহণে দীঘির তলদেশে ইষ্টকস্তূপ বা পাথরে আঘাত করিয়া ঠক্ ঠক্ শব্দ পরখ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে এখানে ঐরূপ কিছু একটা আছে। তবে একথা সত্য যে খানজাহানের পূর্বে এদেশে কোন মুসলমান আগমন করিয়াছিলের কিনা জানা দুষ্কর। সেজন্য মসজিদের অবস্থান অলীক বলিয়া মনে করি। সম্ভবতঃ বুদ্ধ মূর্তি রক্ষিত পুরাকালীন মঠ বা মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দীঘির মধ্যে পড়িয়া আছে। প্রায় ৫০ বৎসর পূর্বে দীঘির মধ্যে একটি বিরাটকায় মৎস্য ভাসিয়া থাকিতে দেখা যায়। লোকে উহাকে মসজিদের চূড়া বলিয়া প্রচার করে। প্রকৃতপক্ষে উহা ছিল একটি মৃত কাতল মাছ। অন্যমতে দীঘির মধ্যস্থলে একটি পাকা পিলার স্থাপিত হইয়াছিল। উহা সেই পিলার বা স্তম্ভ। দীঘি মধ্যে এইরূপ একটি স্তম্ভ দেওয়ার রীতি পূর্বে ছিল।

সতীশ বাবু জীবন্ত যোগী মূর্তির কথা বিশ্বাস করেন নাই। কিন্তু তিনি গৌরদাস বাবুর সমালোচনা করিয়া বলিয়াছেন:—"গৌরদাস বাবু মুসলমান ফকিরের কথা মুসলমানগণের আত্মগৌরব প্রতিষ্ঠার অতিরঞ্জিত সংস্করণ ভিন্ন কিছুই নহে।" উভয় লেখকের লেখনীর তাৎপর্য আছে। সতীশ বাবু হিন্দু মূর্তির উপর জোর দিয়াছেন আর গৌরদাস বাবু মুসলমান ফকিরের কথা বলিয়াছেন। সেজন্য সতীশ বাবু ক্রোধান্বিত হইয়া তাঁহার কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন।

প্রকৃত ব্যাপার এই যে মুসলমান ফকির বা হিন্দু যোগীর জীবন্ত ছবি মৃত্তিকার মধ্যে প্রাপ্তির গল্প শুধু অতিরঞ্জিত নহে অসত্যও বটে। আউলিয়া, দরবেশ ও মনীষীদের জীবনী লিখিতে গিয়া অনেকে এই ধরনের উদ্ভট কাহিনী সত্য বলিয়া চালাইয়া দেন। সেজন্য লেখক ও প্রচারকগণই দায়ী —অন্য কেহ নহে। সমস্ত প্রবাদকে আমরা ভিত্তিহীন বলিয়া মনে করি। প্রকৃত ব্যাপার এই যে দীঘি খননকালে যে বুদ্ধমূর্তি পাওয়া গিয়াছিল উহা হইতে ক্রমশঃ এই সমস্ত প্রবাদ লোকমুখে সৃষ্ট হইয়া অতিরঞ্জিত আকারে আমাদের কাছে আসিয়া পৌছিয়াছে। মস্‌জিদ, মন্দির বা ধ্যানী যোগীর কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে। কোন প্রাচীনকালীন প্রস্তর বা ইষ্টক নির্মিত ইমারতের ভগ্নাবশেষ থাকিতে পারে। সম্ভবতঃ প্রাকৃতিক বিপ্লবে উহা মৃত্তিকার তলদেশে চলিয়া যায়। এ বিষয় আরও অনুসন্ধান হইলে প্রকৃত ব্যাপার জানা যাইবে। উপরোক্ত অনৈতিহাসিক কাহিনীগুলি মিঃ ওমালী লিখিত ফকির ও ঋষির গল্পের শাখা প্রশাখা।

শেষ জীবন ও সাধনা

ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে খানজাহান বীর ও যোদ্ধা। তিনি ধর্ম প্রচারক ও সাধক। জনহিতার্থে তিনি স্বীয় জানমাল কোরবাণ করিয়া দিয়াছেন। এই দানবীরের জীবন ধন্য। তিনিই সর্বপ্রথম অভিযানকারী যিনি সুন্দর বনাঞ্চলের গভীর অরণ্যানীর মধ্যে জঙ্গল কাটিয়া বসতি স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার সুযোগ্য সহকর্মী ও শিষ্যদের ত্যাগও কম নহে। সুশৃঙ্খলভাবে তাঁহারা সমস্ত কার্য সমাধা করিতেন। খানজাহানের চরিত্রে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক শক্তির অপূর্ব সমাবেশ দৃষ্ট হয়। এক কথায় তিনি বীর সন্ন্যাসী বা সৈনিক-তাপস। সুশাসক ও ইসলাম প্রচারক হিসাবে তিনি যে নজির সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন তাহা এদেশের ইতিহাসে বিরল। তাঁহার অসংখ্য সৈন্য ও অগণিত অর্থ ছিল। জনবল, ধনবল ও ধর্মবলে বলিয়ান হইয়া তিনি সব কিছু মানব সেবায় উৎসর্গ করিয়াছেন। তাঁহার সাধু প্রকৃতি ও জনসেবায় মুগ্ধ হইয়া এ দেশবাসী দলেদলে স্বেচ্ছায় ইস্‌লাম গ্রহণ করিয়াছিল। খলিফাতাবাদ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে তাঁহার বিশেষ কষ্ট স্বীকার করিতে হয় নাই। জনশ্রুতি আছে যে খানজাহান মৃত্তিকার নিম্নে অর্থ পুতিয়া রাখিতেন যাহাতে ভবিষ্যতে ভূমি কর্ষনের সময় ঐ অর্থ

পাওয়া যায় এবং উহার আশায় লোকে সুন্দরভাবে ভূমি কর্ষণ করে। এক সময় এখানে একাধিক লোক একত্রে হলকর্ষণ করিত না বলিয়া প্রবাদ আছে। শেষে অর্থ পাইলে উহা লইয়া গোলযোগ উপস্থিত হইতে পারে। এ বিষয় অনেক অতিরঞ্জিত কাহিনী এতদঞ্চলে আজিও প্রচলিত আছে।

মহাত্মা খানজাহান অন্যূন একশত বৎসর জীবিত ছিলেন। জীবন সায়াহ্নে তিনি দরগায় বসিয়া মোরাকেবা ও মোশাহেদায় কালাতিপাত করেন। তিনি নিজেই সম্ভবতঃ তাঁহার এবং তদীয় বন্ধু মোহাম্মদ তাহেরের সমাধি ভবন নির্মাণ করিয়া গিয়াছেন। তবে সমাধির উপরিস্থ প্রস্তরগুলি তাঁহারই পূর্ব নির্দেশ অনুসারে বা নিজস্ব কোন আত্মীয় বা বন্ধু-দ্বারা সংস্থাপিত হইয়াছিল। সমস্ত লিপিগুলি সম্ভবতঃ তদীয় বন্ধুবান্ধব ও বিজ্ঞ ব্যক্তিদের সহিত পরামর্শ করিয়া প্রস্তরোপরি লিপিবদ্ধ করিতে নির্দেশ দিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। উক্ত লিপিগুলিই ঐতিহাসিকের একমাত্র নির্ভরযোগ্য উপকরণ। গৌরদাস বাবু বলিয়াছেন যে এই সমাধি স্মৃতিসৌধ মোহাম্মদ তাহের ওরফে পীর আলী কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল। এইরূপ চিন্তা করারও কারণ আছে। অন্তিমকালে নির্মীয়মাণ সমাধিভবনের পশ্চিম পার্শ্বস্থ মসজিদে বসিয়া তিনি এবাদত বন্দেগী করিয়া অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতেন। প্রথম জীবনে নরহত্যা, লুণ্ঠন, ধ্বংসাত্মক কার্য, আমীর ওমরাহদের ষড়যন্ত্র দর্শনে তিনি মর্মাহত হইয়া রাজদরবার ত্যাগ করিয়া অচীন দেশে জীবন অতিবাহিত করেন। বিদেশে আগমনের পর তিনি মানব সেবা ও খোদাপ্রেমে আত্মনিয়োগ করিবার পূর্ণ সুযোগ পাইয়াছিলেন।

যে সমস্ত ব্যক্তি খানজাহানের সাহচর্য পাইয়া ধন্য হইয়াছিলেন তাঁহাদের বংশধরের কেহ কেহ এখনও জীবিত আছেন। বংশ পরম্পরায় প্রচলিত ও পুরুষানুক্রমে শ্রুত প্রবাদ হইতে জানা যায় যে খানজাহান বলিষ্ঠ ও দীর্ঘাকৃতি সুপুরুষ ছিলেন। বার্ধক্যে তাঁহার মস্তকের কেশরাশি শুভ্র হইয়া গিয়াছিল। শুভ্র শ্মশ্রুমণ্ডিত মুখমণ্ডল, অমায়িক ব্যবহার ও সদালাপে তিনি প্রত্যেককে মুগ্ধ করিতেন। শেষ জীবনে দলে দলে লোক তাঁহার খেদমতে উপস্থিত হইয়া ধর্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া ধন্য মনে করিত। জনশ্রুতি আছে যে তিনি প্রথম

জীবনে জাঁকাল রাজকীয় পোষাক পরিধান করিতেন। তাঁহার মস্তকোপরী মনোরম জরির শিরস্ত্রাণ শোভা পাইত। তাঁহার গাম্ভীর্যপূর্ণ অবয়ব দর্শনে সকলে তাঁহাকে পরম শ্রদ্ধা করিত।

খানজাহান ৮৬৩ হিজরী ২৬শে জিলহজ্জ, ইংরাজী ১৪৫৯ খৃষ্টাব্দে ২৩শে অক্টোবর ইহধাম ত্যাগ করেন। বুধবার দিবাগত রাত্রে তাঁহার প্রাণ বায়ু বহির্গত হয় এবং পরদিন অর্থাৎ বৃহস্পতিবার আছরের নামাজের সময় তাঁহার পবিত্র দেহ সমাধিস্থ করা হয়। তাঁহার মৃত্যুতে রাজধানী খলিফাতাবাদ শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি মরিয়াও অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। সৈয়দ সুলতান আলী সাহেব বলিয়াছেন, "বর্তমান বাগেরহাটের সৃষ্টিকর্তা হইলেন খানজাহান। খানজাহানকে বাদ দিয়া বাগেরহাটকে কল্পনা করা যায় না। তিনি সত্যই মৃত্যুঞ্জয়ী মহাপুরুষ।" তদীয় হর্মরাজি সম্পর্কে আলী আহম্মদ সাহেব বলিয়াছেন, "তাজমহলের উন্মত্ত সৌন্দর্য এর দেহে নাই, আছে একটা ঘুমন্ত মাধুর্য। এত বড় একটা বিরাট বিস্ময় তার কোন সুলিখিত নির্ভরযোগ্য ইতিহাস নাই। আবও অনেক ইতিবৃত্ত অন্ধকারের জাল ছিড়ে আলোয় বেরিয়ে আসবে। জানা যাবে আরও অনেক অলৌকিক ও অত্যাশ্চার্য ঘটনাবলী। আমি সেই অনাগত দিনের প্রতীক্ষায় রহিলাম। দেশের গুপ্তরত্ন বিভিন্ন দেশে প্রচারের যে একটা গর্বমিশ্রিত অনাবিল আনন্দ তা বিভিন্ন ভাষায় পুস্তক প্রণয়নেই সম্ভবপর হয়।"

খানজাহান শুধু বাগেরহাটের সৃষ্টিকর্তা নহেন। তিনি এমন এক মহাপুরুষ যাঁহার মহৎ গুণরাজির দ্বারা ভাটি অঞ্চল ধন্য হইয়াছে। বারবাজার হইতে যশোর, যশোর হইতে তালা, ডুমুরীয়া হইয়া তাঁহার কীর্তিসমূহ সুদূর বেতকাশী তথা সুন্দরবনের অভ্যন্তরে এবং যশোর হইতে পিরোজপুর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ প্রদেশে বিস্তারলাভ করিয়াছিল। তাঁহারই চেষ্টায় এই বিস্তীর্ণ পল্বলময় লবনাক্ত দেশে ঘনবসতি ও সুন্দর বাসভূমির প্রবর্তন সম্ভব হইয়াছিল। তাঁহাকে সুন্দরবন অঞ্চলের মুকুট বিহীন সম্রাট বলিলে অত্যুক্তি হয়না।

মাজার লিপি

এখন আমরা সুধী পাঠকগণকে মহাত্মা খানজাহানের পবিত্র সমাধির দিকে লইয়া যাইতেছি। তাঁহার পবিত্র সমাধি সর্বজন সম্মানিত। সমাধি

ভবনের বিবরণ পূর্বে প্রদত্ত হইয়াছে। এখন উহার গাত্রে খোদিত লিপি ও বাণী আমাদের আলোচ্য বিষয়। এই রওজা মোবারক সর্বদা বস্ত্রাবৃত থাকে। সমাধির প্রথমে মেজের সমান করিয়া একটি ইষ্টকের ভিত্তি। ইহার উপর একটি তাক—কয়েকখানি কৃষ্ণ প্রস্তর দ্বারা নির্মিত। উহার উপর আর একটি প্রস্তরের তাক। সমাধির উপরিভাগে অর্ধগোলাকৃতি রোহিত মৎস্যের পৃষ্ঠের ন্যায় একখানি কৃষ্ণ প্রস্তর। এই শীর্ষ প্রস্তরখানি এবং উহার নীচে দুই স্তরের প্রস্তরগুলিতে আরবী ও ফার্সি ভাষায় বিভিন্ন প্রকার বাণী খোদিত আছে। এই সমস্ত লিপি যে উচ্চাঙ্গের ভাস্কর্য শিল্পের জ্বলন্ত নিদর্শন তাহা সহজেই অনুমেয়। মধ্যে মধ্যে দুই একটি অক্ষর উঠিয়া গিয়াছে। উহার পুনর্স্থাপন আবশ্যক।

খানজাহানের কিরূপ ধর্মনিষ্ঠা ছিল তাহা তদীয় সমাধি লিপির মর্ম হইতে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। ধর্মের প্রতি তাঁহার বিশ্বাস ছিল অটল। ভক্তির চিহ্ন স্বরূপ সমাধির চতুষ্কোণে হযরত আবুবকর, হযরত ওমর, হযরত ওসমান ও হযরত আলী এই চারিজন মহান খলিফার নাম লিখিত আছে। প্রত্যেক খলিফার নামের পূর্বে

"এলাহি বেহুরমাতে" এবং পরে "রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু"—

অর্থাৎ, "হে প্রভু খলিফাদের উপর শান্তি বর্ষিত হউক — তাঁহারই সম্মানার্থে লিখিত হইল।" এই লেখনী হইতে বুঝা যায় যে তিনি খোলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শ মনে প্রাণে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কবরের চতুর্দিকে আরবী ভাষায় লিখিত আছে —

"মাম্মাতা- গারীবান- ফাকাদ মা'তা- শাহীদান।"

অর্থাৎ "যিনি মোসাফের অবস্থায় দেহত্যাগ করিলেন, তিনি যেন শহীদ বা ধর্মযোদ্ধার ন্যায় মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।" অর্ধ গোলাকৃতি মৎস্য পৃষ্ঠের ন্যায় প্রস্তরের উপর লিখিত আছে —

"আউজোবিল্লাহে মেনাশ্‌শায়তনের রাজিম- বিসামিল্লাহ্‌ হের রহমানের রাহিম।"

অর্থাৎ "আল্লার নামে আমি বিতাড়িত শয়তানের প্রলোভন হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সাহায্য চাহিতেছি- সর্ব প্রদাতা করুণাময় আল্লা'র নামে আরম্ভ

করিতেছি।" উত্তরদিকে শীর্ষ প্রস্তরের উপর কলেমা তৈয়ব ও কলেমা শাহাদাত আরবী ভাষায় লিখিত আছে। উহার অর্থ — "আল্লাহ্ তায়ালা ব্যতীত আর কেহ উপাস্য নাই এবং হযরত মোহাম্মদ (দঃ) তাঁহার প্রেরিত রসুল" এবং "আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ্ তায়ালা ব্যতীত আর কেহই এবাদত পাওয়ার যোগ্য নাই ; তিনি এক, তাঁহার কেহই অংশীদার নাই, আমি আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে, হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) তাঁহার একজন বান্দা এবং তাঁহার প্রেরিত পয়গম্বর।" এই কলেমা ইস্লাম ধর্মের কুঞ্জিবিশেষ এবং ইহা পাঠ ও বিশ্বাস না করিলে প্রকৃত মুসলমান হওয়া যায় না।

রওজা মোবারকের উত্তর দিকে আরবী ভাষায় লিখিত আছে —
"হাজেহি রওজাতোম মোবারাকাতোন মের বেয়াজিল জান্নাতে লে খানেলআজম খানেজাহান আলাইহের রাহ্মাতো অরেজয়ানোত্তা-হারিরে ফি ছেত্তাতে এশরিনা মেন জিলহাজ্জে অছালাছা ছেত্তিনা আমান অ ছামানিয়াতা মেয়াতেন।"

অর্থাৎ "খানে আজম খান জাহানের এই পবিত্র সমাধি বেহেশ্তের বাগিচা বিশেষ। তাঁহার উপর আল্লা'র অনুগ্রহ বর্ষিত হউক। তারিখ ২৬ শে জিলহজ্জ ৮৬৩ হিজরী।" তুর্ক আফগান আমলে প্রধান সেনাপতির সম্মানিত উপাধি ছিল খানেআজম। আমরা ইতি পূর্বে অন্য কয়েকজন খানে আজমের নাম প্রকাশ করিয়াছি। স্বাধীন শাসক হইলে তাঁহার কবরগাত্রে সুলতান, রাজা বা বাদশাহ্ বা অনুরূপ কোন খেতাব খোদিত থাকিত। সমসাময়িক কোন ইতিহাস গ্রন্থে খানজাহানের নাম নাই। "খানে আজম" উপাধি হইতে ইহাই প্রতীত হয় যে তিনি প্রধানত একজন সেনানায়ক। ইস্লাম ধর্মে তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি এবং মানব সেবার দিক দিয়া তিনি অসংখ্য জ্বলন্ত নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন। কবরের দক্ষিণ দিকেও আরবী ভাষায় লিপিবদ্ধ আছে —

"অদ্দুনীয়া আউয়োলোহা বোকায়োন,
অ আওছাতোহা আনাওন
অ আখেরোহা ফানাওন।"

অর্থাৎ "দুনিয়া এমন এক স্থান যাহার প্রারম্ভ ক্রন্দনে, মধ্যাবস্থা দুঃখকষ্টে এবং ধ্বংস উহার পরিণতি।"

কবরের দক্ষিণদিকে ইরানের সুফী সাধকদের অমর বাণী নিম্নোক্ত মূল্যবান উপদেশ মিশ্রিত অরবী-ফার্সি ভাষায় লিপিবদ্ধ আছে — ইহা অরবী ও ফার্সি ভাষার সংমিশ্রনে প্রণীত একটি সুন্দর রোবাই বা চতুষ্পদী। এমন সুন্দর মর্মগাঁথা মানুষের হৃদয়কে খোদাপ্রেমে তন্ময় করিয়া রাখে।

ইয়ারো মুরিদ-ই দোস্তান
আলমওতো হাক্কোন আলমওতো হাক্কোন।
খারাস্ত আন্দার বোস্তান
আলমওতো হাক্কোন আলমওতো হাক্কোন।
মরগাস্ত খাসমিয়ে মোহকামি পিয়ে জোমলায়ে জানান যু একিন।
নায় হামচুদিগার দুষমুনান
আলমওতো হাক্কোন আলমওতো হাক্কোন॥

ভাবার্থঃ— "হে সুহৃদ, ভক্ত ও বন্ধুগণ! স্মরণ রাখিও, মৃত্যুই সত্য, উহা কাহাকেও ছাড়িবে না। ইহা বাগিচার মধ্যে অবস্থিত কণ্টকের ন্যায়। মৃত্যু নিশ্চিত জানিও। মৃত্যু প্রতিটি জীবের মহাশত্রু। অন্যান্য শত্রু অপেক্ষা ইহা ভয়ংকর। নিশ্চয় জানিও মৃত্যু অনিবার্য।"

—ঃ কবির ভাষায় ঃ—

জগতে ক্রন্দন ল'য়ে খুলি এ জীবন
কতবা যাতনা কষ্ট করে আক্রমণ।
পরীক্ষার নাহি পার জীবন ভরিয়া
সবশেষ করে শেষ মরণ আসিয়া।
মৃত্যুই নিশ্চিত ভাই, মৃত্যুই নিশ্চয়,
জীবন উদ্যানে তীক্ষ্ণ কণ্টকের ন্যায়,
মরণ নিশ্চয় ভাই, মরণ নিশ্চয়
জীবনের হেন অরি নাহি কেহ আর,
অন্য শত্রু হ'তে এর প্রভেদ বিস্তার,

দুষ্ট শয়তান আছে অরাতি তোমার
টলাতে বিশ্বাস তব চেষ্টা সদা তার,
সকল সমাজে দেখি এই রীতি আছে
দুর্বল লভয়ে ক্ষমা সবলের কাছে ;
ক্ষমা নাই দয়া নাই, মৃত্যু দুর্নিবার,
মরণ নিশ্চিত ভাই আছয়ে সবার।" (বাগেরহাটের প্রথম এস, ডি, ও মিঃ সাণ্ডার্সের ইংরাজী অনুবাদ হইতে বাংলায় রূপান্তরিত)

কবর গাত্রের প্রস্তর পিঠের দক্ষিণদিকে মধ্যস্থলে একটি চতুষ্কোণ এবং তন্মধ্যে একটি বৃত্ত আছে। এই বৃত্তের চারিপার্শ্বে আরবী ভাষায় নিম্নোক্ত কথাগুলি লিখিত আছে :

"এনতাকালাল আবদোদ্দায়ীফ আলমোহ্‌তাজো এলা রাহ্‌মাতে রাব্বেল আলামীন আল মোহেব্বো লে আওলাদে ছাইয়েদেল মোরছালিন; আল মোখলেছো লেল উলামায়ের রাশেদীন; আলমোবগেদো লেল কোফ্‌ফারে অলমোশরেকীন; আল মঈনো লেল ইস্‌লামে আল মোসলেমীন; উলুঘ খানজাহান আলাইহের-রাহ্‌মাতো আলগোফ্‌রান মেন দারেদ্দুনীয়া এলা দারিলবাকা; লায়লাতোল আরবায়া ফি ছেত্তাতে ও অ এশরীনা মেন জিলহাজ্জ; অদোফেনা ইয়াওমাল খামিছে ফি ছাবয়াতে ও অ এশরীনা মেনহু; ফি ছানাতে ছালাছা ছেত্তিনা অছামানিয়াতা

উহার মর্মার্থ এই ঃ— "এখানে আল্লা'র এক দীন দাসানুদাস মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। তিনি আল্লা'র অনুগ্রহ প্রার্থী। তিনি পয়গম্বরদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহানবীর বংশধরগণের প্রতি অনুরক্ত-যিনি সত্য পথানুসারী উলামাদের প্রকৃত হিতাকাঙ্খী এবং আল্লা'র নাফরমানকারীদের প্রতি ঘৃণা পোষণ করেন। যিনি ইস্‌লাম ও মুসলমানদের সদা সাহায্যকারী। তাঁহার নাম উলুঘ খানজাহান (আল্লাহ্‌ তাঁহার প্রতি সদয় হউন)। তিনি অস্থায়ী জগৎ হইতে স্থায়ী জগতের আশায় ৮৬৩ হিজরী ২৬ শে জিলহজ্জ বুধবার রাত্রি ধরাধাম ত্যাগ করিয়াছেন

এবং ২৭ শে জিলহজ্জ বৃহস্পতিবার তাঁহাকে সমাহিত করা হয়।" এই লেখনীর মধ্যে এই আভাষ পাওয়া যায় যে তিনি মহানবীর বংশধরদের অতিশয় সম্মান করিতেন। আল্লায় আত্মসর্মপণ, ধর্মের প্রতি অটল বিশ্বাস ও ভক্তি এবং দীনতা উক্ত লেখনীর মধ্যে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

সমাধি গাত্রের পশ্চিমদিকে পবিত্র কোরাণের ১০৯ সুরা (কাফেরুণ) কোরানের ভাষায় লিপিবদ্ধ আছে;

"বল হে বিধর্মী, তোমরা যাহার
পূজা কর, আমি পূজা করিনা তাহাব।
তোমরা পূজ না তাঁরে আমি পূজি যাঁরে,
তোমরা যাহারে পূজ আমি ও তাহারে
পূজিতে সম্মত নই। তোমবাও নহ
প্রস্তুত পূজিতে, যাঁরে পূজি অহরহ
তোমাদের ধর্ম যাহা তোমাদের তরে,
আমার যে ধর্ম রবে আমারি উপরে।"

সমাধি গাত্রের পূর্বদিকে পবিত্র কোরানের ১০২সুরা (তাকাসোর=আলহাক-মোত্তাকা) লিখিত আছে। উহার অর্থ-"আধিক্যের আকাঙ্খাই তোমাদিগকে মোহাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, যে পর্যন্ত না তোমরা সমাধিসমূহে উপস্থিত হইতেছে। তা নয়, তোমরা শীঘ্রই অবগত হইবে; আবার না, তোমরা অচিরেই অবগত হইবে। কিন্তু না, যদি তোমরা ধ্রুব জ্ঞানে অবগত হইতে। নিশ্চয় তোমরা নরক অবলোকন করিবে। তৎপর নিশ্চয় তোমরা উহা নিশ্চিত দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করিবে। অনন্তর নিশ্চয় তোমরা সেদিন সুখ-সম্পদ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইবে।" কি সুন্দর আল্লা'র এই বাণী। শাহানশাহ্ হইতে আরম্ভ করিয়া দীন ভিক্ষুক সকলেরই একই দশার কথা ইস্‌লাম পুণঃ পুনঃ ঘোষনা করিয়াছে। বিপুল বিভব সম্পদ, আধিক্যের আকঙ্খা সবই অসার। আল্লাহ্ ধনজনের মোহ ও অহমিকার পরিণাম সম্পর্কে হুশিয়ার করিয়া দিয়াছেন। খানজাহান বিপুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হইয়াও সরল ও নিরহঙ্কারী ছিলেন তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

সমাধি গাত্রের পশ্চিমদিকে পবিত্র কোরাণের বৃহত্তম সুরার (সুরা বাকার) অংশ বিশেষ যাহাকে "আয়তোল কুরসী" অর্থাৎ কোরাণের মহামহিমান্বিত কয়েকটি বাণী লিপিবদ্ধ আছে। এই সম্মানিত আয়াত পাঠে অসীম পুণ্য। ইহাতে আল্লা'র মহাগুণাবলীর পরিচয় আছে। উহার বঙ্গানুবাদ নিম্নে দেওয়া হইল:

"সেই আল্লাহ্ ব্যতীত কোনই উপাস্য নাই—যিনি চির জীবন্ত ও নিত্য বিরাজমান; তন্দ্রা অথবা নিদ্রা তাঁহাকে আকর্ষণ করে না। নভোমণ্ডলে যাহা আছে ও ভূমণ্ডলে যাহা আছে তাহা তাহারই; এমন কে আছে যে তদীয় অনুমতি ব্যতীত তাঁহার নিকট অনুরোধ করিতে পারে? তাহাদের সম্মুখে যাহা আছে. ও তাহাদের পশ্চাতে যাহা আছে, তিনি তাহা পরিজ্ঞাত আছেন; তিনি যাহা ইচ্ছা করেন তদ্ব্যতীত তাঁহার অনন্ত জ্ঞানের কোন বিষয়ই কেহ ধারণা করিতে পারে না। তাঁহার আসন নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে এবং এতদুভয়ের সংরক্ষণে তাঁহাকে বিব্রত হইতে হয় না; এবং তিনি সমুন্নত মহীয়ান। ধর্ম সম্বন্ধে বলপ্রয়োগ নাই; নিশ্চয় ভ্রান্তি হইতে সুপথ প্রকাশিত হইয়াছে; অতএব যে শয়তানকে অবিশ্বাস করে এব' আল্লার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, তবে নিশ্চয় সে সুদৃঢ় অবলম্বন ধারণ করিয়াছে যাহা ছিন্ন হইবাব নহে; এবং আল্লাহ শ্রবণকারী মহাজ্ঞানী।"

সমাধিগাত্রের উত্তর পশ্চিমদিকে পবিত্র কোরাণের ১১২, ১১৩, ও ১১৪ সুরা (এখলাস, ফালাক ও নাস) লিখিত আছে। এই বাণীগুলি সমগ্র কোরাণের মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে।

সুরা এখলাস:

বল, আল্লাহ এক! প্রভু ইচ্ছাময়,
নিষ্কাম নিরপেক্ষ, অন্য কেহ নয়।
করেন না কাহারেও তিনি যে জনম
কাহারও ঔরসজাত তিনি নন
সমতুল তাঁর
নাই কেহ আর!

সুরা ফালাক ঃ

বল, "আমি শরণ যাচি উষাপতির
হাত হ'তে তাঁর সৃষ্টিতে যা আছে ক্ষতির।
আঁধার ঘন নিশীথ রাতের ভয় অপকার
এসব হ'তে অভয় শরণ যাঁচি তাঁহার।
যাদুর ফুঁয়ে শিথিল করে (কঠিন সাধন)
সংকল্পেব বাঁধন, যাচি তাঁর নিবারন ।
ঈর্ষাতুরের বিদ্বেষ যে ক্ষতি করে
শরণ যাচি, পানাহ মাগি তাঁহার তরে।"

সুরা নাস :

"বল, আমি তাঁরি কাছে মাগিগো শরণ
সকল মানবে যিনি করেন পালন।
কেবল তাঁহারি কাছে, ত্রিভুবন মাঝ
সবার উপাস্য যিনি রাজ-অধিরাজ
কুমন্ত্রণা দানকারী 'খান্নাস' শয়তান
মানব দানব হ'তে চাহি পরিত্রাণ।"

(অনুবাদক — কাজী নজরুল ইসলাম)

সমাধিলিপির মধ্যে আল্লহ'র নামাবলী বা আস্‌মায়াল হোসনা (সুন্দর নামসমূহ) লিখিত আছে।

আল্লার মহান গুণাবলীর পার্শ্বে নিম্নোক্ত দোয়া লিখিত আছে ঃ

"নাছরুম্ মেনাল্লাহে অ ফাতহুন কারীব—অবাশ্বেরেল মুমেনীন"
অর্থাৎ, আল্লা'র সাহায্য ও জয় নিকটবর্তী। মোমেনদিগের জন্য খোশ খবর। কবর গাত্রের উত্তরদিকে হযরত জিবরাঈল, হযরত মিকাঈল, হযরত ইস্রাফিল এবং হযরত আজ্‌রাঈল - এই মহান ফেরেস্তাগণের পবিত্র নাম লিখিত আছে। সমাধিগাত্রের দক্ষিণদিকে লিখিত আছে ঃ

"ইয়া বোরহানো ইয়া বোদিউচ্ছামাওয়াতে অল-আরদ খাল্লেছনা মেনান্নার" :—

—হে সর্বপ্রকাশক, হে নিখিল বিশ্বের পালক— আমাদিগকে (পরজগতের) অগ্নিশিখা হইতে পরিত্রাণ কর।

সমাধিগাত্রে আল্লা'র যে পবিত্র নামগুলি লিখিত আছে উহার কয়েকটি এখানে অর্থসহ উদ্ধৃত হইলঃ—

আল্লাহ্— একমাত্র উপাস্য, আর রাহমানু — অতি অনুগ্রহকারী, আররহিমু— পরম দয়ালু, আল মালেকু-সর্বময় কর্তা, আল-কুদ্দুস্থ —অতি পবিত্র, আস সালামু — শান্তিময়, শান্তিদাতা, আল-মুমিনু—বিশ্বাসী, আলমোহায়মেনু—পরম সাহসী, আল-আযীজু— পরাক্রমশালী, আল-জাববারু— ক্ষমতাশালী, আল-খালেকু — সৃষ্টিকর্তা, আল-গাফফারু — মার্জনাকারী, আর-রাজ্জাকু— রুজিদাতা, আল-আলীমু— মহাজ্ঞানী, আর-রাফিউ— উন্নতিদাতা, আল-হাকামু— সুবিচারক, আল-আদলু — ন্যায় বিচারক, আল-হালিমু— অধিক ধৈর্যশীল, আল-গাফুরু— অতি ক্ষমাশীল, আশ-শাকুরু— অতি কৃতজ্ঞ, আল-জালীলু— মহা প্রতিপত্তিশালী, আল-ওকিলু— জিম্মাদার, আল হামিদু— প্রশংসাবাদী, আল-মুমিতু— মৃত্যুদাতা, আল-আহাদু— একক, আচ্ছামাদু— একাধিপতি, আল-মাতিনু — দৃঢ়, অটল, আচ্ছাবুরু— অতি ধৈর্যশীল, আস সাত্তারু— দোষ গোপনকারী, আস-সাদেকু — সত্যবাদী।

— এই পবিত্র নামাবলী সুফী সাধকদের অতি আদরের ধন। এই নামগুলি উচ্চারণ-করিয়া তাঁহারা জেকের বা সাধনা করিয়া থাকে।

উপরোক্ত লেখনী ব্যতীত আরও বহু লিপি আরবী ভাষায় উৎকীর্ণ আছে। দীর্ঘদিন প্রচেষ্টা চালাইবার পরও সমস্ত লিপিগুলির পক্ষোদ্ধার সম্ভবপর হয় নাই। লিপিসমূহ উদ্ধার করিতে নানাপ্রকার অসুবিধার মধ্যে পড়িতে হইয়াছে। পরবর্তী সংস্করণে লিপিসমূহ উদ্ধারের প্রবল বাসনা রহিল। কবরগাত্রের

অবশিষ্ট লিপিগুলির পাঠোদ্ধার হইলে খানজাহান সম্পর্কে আরও কিছু অজানা ইতিহাসের উদ্ধার সাধন হইতে পারে।

মোহাম্মদ তাহেরের সমাধি

হযরত খানজাহানের রওজা মোবারকের পশ্চিম পার্শ্বে তদীয় বন্ধু ও সহকারী শাসনকর্তা পীর আলী মোহাম্মদ তাহেরের সমাধি। "যশোরের ইতিবৃত্ত" প্রণেতা জেমস ওয়েষ্টল্যাণ্ড তাঁহাকে খানজাহানের দেওয়ান বা মন্ত্রী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। গৌরদাস বসাক বলিয়াছেন, "পীর আলী মোহাম্মদ তাহের গোঁড়া মুসলমান ছিলেন। তিনি অতীব নিষ্ঠার সহিত ইসলাম ধর্মের বিধানসমূহ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতেন। সুশাসন ও ন্যায়পরায়ণতার জন্য তিনি খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন।" তাঁহার সম্পর্কে ইতিপূর্বে পীরালী সম্প্রদায়ের উৎপত্তি ও প্রসার প্রসঙ্গে সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছি। মোহাম্মদ তাহের খানজাহানের সহকর্মীদের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। খানজাহানের অতি আপন জন ছিলেন তিনি। পাশাপাশি উভয়ের এইরূপ সমাধি ঘনিষ্ট সম্পর্কের পরিচয় বহন করে।

পীর আলীর সমাধিগাত্রও অর্ধ গোলাকৃতি প্রস্তর দ্বারা আবৃত। প্রস্তরের উপর লিখিত আছে —

"হাজেহি রওজাতোম মোবারাকাতোন মেররিয়াজিল জান্নাতে অ হাজেহি সাক্‌বেয়া তোললে হাবিবেহী এসমোহু মোহাম্মদ তাহের ছালাছাছেস্তিনা অছামানীয়াতা" —

অর্থাৎ এই স্থান বেহেস্তের বাগিচার অংশ বিশেষ এবং ইহা জনৈক বন্ধুর সমাধি— নাম মোহাম্মদ তাহের, তারিখ ৮৬৩ জিলহাজ্জ।" মোহাম্মদ তাহের যে খানজাহানের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন তাহার স্পষ্ট পরিচয় এখানে পাওয়া যায়। কবরগাত্রে খানজাহানের সমাধির ন্যায় সুরা তাকাসোর, আল্লা'র মহান গুণাবলী বা নামসমূহ, কলেমা তৈয়ব ও কলেমা শাহাদাত লিখিত আছে। ইহার বঙ্গানুবাদ পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে, সেজন্য পুনরুল্লেখ নিষ্প্রোয়জন। অর্ধ গোলাকৃতি প্রস্তরের নিম্নস্তরে বৃহৎকায় তিন খণ্ড প্রস্তর আছে। দ্বিতীয় স্তরে

অনেকগুলি খণ্ড প্রস্তর। তৃতীয় ও শেষ স্তর কৃষ্ণ প্রস্তর দ্বারা আবৃত। কবরের লিপিগুলি আরবী অক্ষরে উৎকীর্ণ করা হইয়াছে এবং উহা এত স্পষ্ট যে আমাদের পক্ষে উহার পক্ষোদ্ধার করিতে বিশেষ কষ্ট স্বীকার করিতে হয় নাই। তাহের সাহেবের সমাধির নীচে শূন্যগর্ভ কিন্তু উহারও নীচে প্রকৃত কবর আছে। তারিখ দৃষ্টে প্রমাণিত হয় যে উভয় সমাধিগাত্র একই সময় নির্মিত হইয়াছিল এবং প্রস্তর কাটিয়া অশেষ পরিশ্রমে অক্ষরগুলি উৎকীর্ণ করা হইয়াছিল। মোহাম্মদ তাহের খানজাহানের পরে মৃত্যুমুখে পতিত হন, তবে কোথায় এবং কিভাবে জানা যায় নাই। এ সম্পর্কে গৌরদাস বসাক বলিয়াছেন যে, মোহাম্মদ তাহের কোন কারণ বশতঃ দিল্লীতে প্রেরিত হন এবং তথায় সম্রাটের আদেশে তাঁহার মস্তক ছেদন করা হয়। প্রবাদের উপর ভিত্তি করিয়া তিনি একথা বলিয়াছেন, কিন্তু কোন ঐতিহাসিক সূত্রের উল্লেখ করেন নাই। আমরা সবিস্তারে আলোচনার পর এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছি যে খলিফাতাবাদ নগরীর প্রতিষ্ঠা বা তাঁহার আগমনের পর খানজাহানের সহিত দিল্লীর কোনই সম্পর্ক স্থাপন করা অসম্ভব। খানজাহানের পরেও বহুদিন বঙ্গদেশ দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করে নাই। সেইজন্য উপরোক্ত প্রবাদ ভিত্তিহীন বলিয়া মনে করি।

শেষ কথা

খানজাহান যে সময় খলিফাতাবাদে শুভাগমন করেন তখন এই স্থানের কি নাম ছিল জানা যায় না। বাগেরহাট নাম পরবর্তীকালের সৃষ্টি। সে বিষয় পরে আলোচনা করিব। বয়োবৃদ্ধ অবস্থায় এখানে আসিয়া খানজাহান প্রায় ত্রিশ বৎসর বসবাস ও রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। স্বীয় প্রতিষ্ঠিত নগরীর সৌন্দর্যবর্ধন ও প্রজাদের কল্যাণের জন্য তিনি আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহারই ঐকান্তিক সাধনায় খলিফাতাবাদের সমৃদ্ধি ও সৌন্দর্য দিন দিন বর্ধিত হইতে থাকে। এইরূপ জনাকীর্ণ শহর তখন এতদঞ্চলে আর একটিও ছিল না। সেজন্য গৌড়ের সুলতান নসরৎ শাহ্ পিতার জীবদ্দশায় খানজাহান প্রতিষ্ঠিত শহরে ঐতিহাসিক খলিফাতাবাদ টাঁকশাল হইতে মুদ্রাঙ্কণ করিয়াছিলেন। এই শহরের শান শওকত ও সৌন্দর্য দীর্ঘস্থায়ী হইয়াছিল।

খানজাহানের প্রায় দেড়শত বৎসর পরে সুন্দরবন অঞ্চলে মহারাজ প্রতাপাদিত্য, তদীয় পিতা বিক্রমাদিত্য এবং খুল্লতাত বসন্ত রায় যে শহর নির্মাণ করিয়াছিলেন তাহার অধিকাংশ হর্মরাজি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। রাজধানী গৌড়ের ধনভাণ্ডার দ্বারা প্রাচীন যশোর নগরীর পত্তন হইয়াছিল। বঙ্গের শেষ স্বাধীন সুলতান দায়ূদ খান সম্রাট আকবরের হস্তে নিহত হইলে প্রতাপাদিত্যের পিতা রাজধানীর বিশৃঙ্খলা ও গোলযোগের মধ্যে বিপুল ধনভাণ্ডার আনিয়া রাজশক্তির আড়ালে সুন্দরবন আবাদ করিয়া যশোর নগরীর পত্তন করিয়াছিলেন, তাহা ইতিপূর্বে বর্ণনা করিয়াছি। গৌড়ের যশ হরণকারী বলিয়া এই নগরীর নাম হইয়াছিল যশো-হর। গৌড়ের ধনভাণ্ডার দ্বারা যেমন সুন্দরবনের সংলগ্ন খুলনা জেলার দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্তে যশোর নগরীর পত্তন হইয়াছিল তেমনই খানজাহান আনীত ধনভাণ্ডার দ্বারা খলিফাতাবাদ নগরীর প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। স্থাপত্য শিল্পে খানজাহানের যেরূপ দক্ষতা, প্রতাপাদিত্যের তাহা ছিল না। প্রতাপাদিত্যের রাজধানী এবং হর্মরাজির প্রায় সমস্তই ধ্বংস স্তূপে পরিণত হইয়াছে। সামান্য যে সব কীর্তি এখনও বিদ্যমান তাহা পুনর্নির্মাণের জন্য টিকিয়া আছে। স্থায়িত্বের চিন্তা করিয়া খানজাহান বহুল পরিমাণে প্রস্তর ব্যবহার করিয়াছিলেন। প্রাচীন হইলেও খানজাহানের সৌধরাজির অনেকগুলি আজিও কালের আঘাত সহ্য করিয়া প্রায় অক্ষত অবস্থায় দণ্ডায়মান আছে।

আবুল ফজল প্রণীত আইনী আকবরী হইতে জানা যায় যে সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে খলিফাতাবাদ নগরী প্রসিদ্ধ ছিল। সমগ্র রাজ্যে ১৫টি সুবা বা প্রদেশের অন্তর্গত ১০৫টি সরকার ছিল। এই সমস্ত সরকারের অধীন ২৭৩৭টি মহল বা পরগনা ছিল। বঙ্গদেশে ২৪টি সরকার ছিল, তন্মধ্যে খলিফাতাবাদের অন্তর্গত পরগণা হাবেলী অবস্থিত ছিল। হাবেলী কসবা বা বাগেরহাট এই সরকারের শাসনকেন্দ্র বা রাজধানী ছিল। পরগনা হাবেলীতে ৪৬টি গ্রাম, উহার অধিকাংশের নাম পূর্বে উল্লেখিত হইয়াছে। আকবরের সময় খলিফাতাবাদ সরকারের রাজস্ব আদায় হইত ১৩৫০৫৩৲ টাকা এবং এই সরকার হইতে রাজকীয় সৈন্যদলে ১০০ অশ্বারোহী ১৫১৫০ জন পদাতিক সৈন্য

রাজ্যের রক্ষণাবেক্ষণ করিত। খলিফাতাবাদে চাষাবাদ হইত এবং ইহার জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে হস্তী ও বন্য মহিষ পাওয়া যাইত। সামরিক দিক হইতে খলিফাতাবাদের বিশেষ গুরুত্ব ছিল। স্থানীয় লোকেরাও রাজ্যের সেনাদলে যোগদান করিত।

খানজাহান প্রতিষ্ঠিত শহর তাঁহার তিরোধানের পরও বেশ কিছুকাল জমকাল অবস্থায় ছিল। খানজাহান বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। শিল্পকলা ও সাহিত্যে তিনি বিশেষ মনযোগ দিয়াছিলেন। তাঁহার শাসিত প্রদেশে ফার্সি সাহিত্যের সবিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। খলিফাতাবাদ ব্যতীত পায়গ্রাম কসবা, যশোর, বারবাজার, লাবসা প্রভৃতি স্থানেও বিদ্যাচর্চ্চার কেন্দ্র ছিল। অত্র জিলার বহু মুস্লীম পরিবারের মধ্যে আজিও ফার্সি সাহিত্যের ঐতিহ্য বিদ্যমান।

খানজাহানের সময় যশোর খুলনার প্রায় সর্বত্র মুসলমান বসতি স্থাপিত হইয়াছিল। ইহার পূর্বেও এতদঞ্চল স্বাধীন গৌড় সুলতানের অধীন ছিল এবং যশোর, বারবাজার, লাবসা, সুলতানপুর প্রভৃতি স্থানে কিছু কিছু মুসলমান বসতি ছিল বলিয়া জানা যায়। খানজাহানের আমলে অসংখ্য বহিরাগত মুসলমান এদেশে আসিয়া স্থায়ীভাবে বসবাস করিয়াছিল। অসংখ্য পাঠান ও অন্যান্য মুসলমান এদেশের মাটিতে বসবাস করিয়া পূর্ব কৃষ্টি ভুলিয়া এদেশীয় ভাবধারার সহিত একেবারে মিশিয়া গিয়াছিল। গ্রন্থের শেষ দিকে এবিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি।

খানজাহান প্রজারঞ্জক শাসক ছিলেন। দাম্ভিকতা তাঁহার অন্তরে স্থান পায় নাই। তাঁহার শাহানশাহের ন্যায় হাবভাব ও চালচলন ছিল না। তিনি অন্তরে ছিলেন ফকির বা সর্বত্যাগী। তাঁহার হৃদয় ছিল খোদাপ্রেমে ভরপুর। দীন দুঃখীর প্রতি তিনি সর্বদা মুক্ত হস্ত ছিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সরাই ও বাবুর্চিখানা হইতে দৈনিক বহু আগন্তুক ও অভাবগ্রস্থ ব্যক্তি আহার সংগ্রহ করিত। ক্ষমতার গৌরবে তিনি কাহারও প্রতি কোন অত্যাচার করিয়াছেন এইরূপ কোন ঘটনা শ্রুত হয় নাই। ইস্লাম প্রচারকদের মধ্যে তিনি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন। জবরদস্তিমূলক ভাবে তিনি কাহাকেও

ইস্‌লাম ধর্মে দীক্ষিত করেন নাই। "ধর্ম সম্পর্কে বাড়াবাড়ি করিওনা — " কোরাণের এই শাশ্বত বাণী তিনি মনে প্রাণে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তদীয় কবরগাত্রে কোরাণের মহাবাণী সমূহ খোদাই করিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন। শেষ জীবনে তিনি মোরাকেবা ও মোশাহেদায় কালাতিপাত করিয়াছিলেন। দেশ বিদেশ হইতে দলে দলে লোক আসিয়া তাঁহার বাণী শ্রবণ করিত। হিন্দু-মুসলীম জাতি ধর্ম নির্বিশেষে তিনি সকলের ভক্তিভাজন ছিলেন। তিনি একজন সৈনিক এবং খান বা দলপতি। খানে আজম বা প্রধান সেনাপতির গৌরবও তিনি অর্জন করিয়াছিলেন। সিলেটের মহাত্মা শাহ জালালের ন্যায় তিনিও একজন সৈনিক দরবেশ। এই বীর শাসকের বৈচিত্রময় চারিত্রিক মাধুর্য এদেশবাসীকে ধন্য ও মহিমান্বিত করিয়াছে।

খানজাহান সুন্দরবন অঞ্চলের গৌবব, ইতিহাস তাহা চিরদিন সাক্ষ্য দিবে। রূপকথার কাহিনীর ন্যায় বিস্ময়কর তাঁহার জীবন গাঁথা। তাঁহার হাতে ছিল রাজদণ্ড আর অন্তর ছিল খোদাপ্রেমে ভরপূর। তিনি রাজনীতি ও ধর্মনীতির সমন্বয় সাধনে কৃতকার্যতা লাভ করিয়াছিলেন। প্রাক-বিভাগ যুগে হাবেলী পরগনা হিতৈসিনী সভার দ্বাদশ বার্ষিক অধিবেশনে একটি রিপোর্ট পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। বাসাবাটীর মণ্ডল আবদুল করিমের নিকট ইহা গচ্ছিত আছে। ইহা হইতে জানা যায় যে অধ্যাপক রনদাকান্ত রায় চৌধরী উহাতে সভাপতি করেন। অধিবেশনের কার্যবিবরণীর মুখবন্ধে খানজাহানকে একজন তাপস, পরধর্মসহিষ্ণু মহাপুরুষ বলা হইয়াছে। খানজাহানের আগমন কালে দেশে সম্ভবতঃ কোন সুসংঘটিত শাসন প্রণালী ছিল না। হিন্দুবৌদ্ধ সংঘর্ষে স্থানীয় লোকেরা নিঃস্ব ও বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতির মধ্যে কালাতিপাত করিতেছিল। এহেন যুগ সন্ধিক্ষণে খানজাহানের আবির্ভাব "দুর্যোগ রজনী অবসানে সূর্যোদয়ের মত।"

"খানজাহান" নামক কবিতায় জনৈক পল্লী কবির বর্ণনায় এই মহাত্মার কর্মময় জীবনের কিছু পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, উহার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি :

"দীন ইসলামী ডঙ্কা বাজায়ে, ঝাণ্ডা করিয়া উঁচু।
মুখে শাহাদাত বুকেতে কুয়ত ডরো নাই কোন কিছু ॥

আল্লার বাণী নতশিরে মানি হেকেছিলে তকবীর
করেছ খতম বে-ইনসাফি, হানি ইনসাফী তীর
এলে মশরেক তুড়িতে শেরেক বেদাত করিতে দূর।
তোহফা তৌহিদে হৃদয় খাঞ্চা করেছিলে ভরপূর।
করেছ খনন দীঘি অগণন মস্‌জিদ ঠাই ঠাই
কাটি জঙ্গল করি জাঙ্গাল ফুটায়েছ রোশনাই
ছিল শোর-সার তব দরবার-ষাটগুম্বজ যেথা
(আজও) তোমারে স্মরিয়া মুয়াজ্জিনের কণ্ঠ পুকারে হেথা ॥"

কথিত আছে খানজাহান জীবন সায়াহ্নে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবার জন্য স্বীয় আত্মাকে প্রস্তুত করিয়াছিলেন। আজিও খাঞ্জালী দীঘির উত্তর পাড়ে দৈনিক অসংখ্য তীর্থ যাত্রী তাঁহার মাজার পরিদর্শনে ভীড় জমাইয়া থাকে। খানজাহানের নশ্বরদেহ এখানে চিরশায়িত। তিনি মরিয়াও অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। জনসাধারণ তাঁহাকে পীর বা মোর্শেদ বলিয়া জানে। পীর যদি ইহকাল বাদ দিয়া শুধু পরকাল লইয়া ব্যস্ত থাকেন তবে তিনি প্রকৃত পীর শ্রেণীভুক্ত হইতে পাবেন কিনা সে বিষয় বিচার্য। ইহকাল ও পরকালের মঙ্গল সাধনই ইস্‌লামেব প্রকৃত শিক্ষা। মহাত্মা শেখসা'দী বলিয়াছেন — "ধর্ম শুধু বাহ্যিক আচবণে সীমাবদ্ধ নহে, ধর্ম জীবে সেবায় ও মানব কল্যাণে।" খানজাহান মন প্রাণ দিয়া মানবসেবায় স্বীয় জানমাল কোরবাণ করিয়াছেন তজ্জন্য তিনি সকলেরই মোর্শেদ বা পীর। তাঁহার খনিত জলাশয় সমূহ, সুবিস্তীর্ণ রাস্তা ও পথঘাট আজিও এদেশেব মানবমনে গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছে। আল্লা'র এবাদতের জন্য তিনি অসংখ্য মস্‌জিদ নির্মাণ করিয়া সকলকে ইস্‌লামী দাওয়াতে আহবান করিতেন।

ধর্মচিন্তা ও জনসেবাই ছিল খানজাহান জীবনের মূলমন্ত্র। তাঁহার কবর-গাত্রে খোদিত কোরাণের বাণী, আরবী ও ফার্সি ভাষায় লিখিত উপদেশমালা হইতে তাঁহার শেষ জীবনের মনোভাব সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়। আল্লা'র রসুলে তাঁহার অগাধ ভক্তি ছিল। খোলাফায়ে রাশেদীনের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া তিনি আদর্শ ইসলামী জিন্দেগী পালন করিয়া গিয়াছেন তাহা সহজেই অনুমেয়। তিনি সুবিচারক, ন্যায় পরায়ণ এবং যুগশ্রেষ্ঠ মানব ছিলেন। তাঁহার

শাসনকালে বিদ্রোহ, বিশৃঙ্খলা বা ভয়াবহ ষড়যন্ত্রের কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। তিনি শান্তি ও সাম্যের প্রতীক ছিলেন এবং দক্ষিণ বঙ্গে মৎসন্যায় বা অরাজগতার যুগে শান্তি স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি নিজে স্বাধীন বাদশাহ্ ছিলেন না। গৌড়ের স্বাধীন সুলতানের সহিত সখ্যতা স্থাপন বা অধীনতা স্বীকার করিয়া তিনি প্রজাপালন করিতেন। এ বিষয় যথাস্থানে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি

খানজাহান কিরূপ সাধক ও সংযমী পুরুষ ছিলেন তাহা তদীয় কবরগাত্রের লেখনী হইতে জানা যায়। নিজেকে একজন দীন আগন্তুক বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব পুরুষদের পরিচয় তিনি সম্পূর্ণ অপ্রকাশিত রাখিয়াছেন। ইহা কি অসাধ্য সাধন নহে? বীর সৈনিক আত্মীয় পরিজন ত্যাগ করিয়া একমাত্র মানবসেবা ও ধর্মচিন্তায় জীবন অতিবাহিত করিবার জন্য সুদূর বিদেশ ভূমিতে দেহত্যাগ করিয়াছেন। আত্মত্যাগের এহেন জ্বলন্ত নিদর্শন ইহার চেয়ে আর কি হইতে পারে?

খানজাহান শিল্পানুরাগী শাসক ছিলেন তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। অভিনব কারুকার্যের দ্বারা তিনি মস্‌জিদগুলিকে সুসজ্জিত করিয়াছেন। তাঁহার স্থাপত্য শিল্প একদিকে যেমন তোগলক স্থাপত্যের নিদর্শন অন্যদিকে তেমনি গৌড়ীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের অনুরূপ। রাস্তা নির্মাণে তিনি যে শিল্প প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন তাহা অভিনব ও যুগোপযোগী। তাঁহার অধিকাংশ শিল্পীই এদেশীয় ছিল। প্রবাদ আছে যে তিনি জৌনপুর ও গৌড় হইতে কিছু সংখ্যক শিল্পী আনায়ন করিয়াছিলেন। কবরগাত্রে প্রস্তরের লিপিগুলি উৎকীর্ণ, উহা খোদিত নহে। নির্মাণ কৌশলে তিনি বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি প্রতিভাবান শিল্পী হিসাবে ইতিহাসের পাতায় এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন।

খানজাহানের কোন পুত্র সন্তান ছিল না। তিনি আজীবন ধর্ম প্রচার জনকল্যাণমূলক কার্য এবং সাধনায় জীবন অতিবাহিত করেন। তিনি জনসাধারণের হৃদয়রাজ্য জয় করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম হইয়াছিলেন। সুন্দরবন অঞ্চলে খানজাহান আদর্শ শাসক ও ধর্মপ্রাণ মহাপুরুষ হিসাবে সুপরিচিত। তাঁহার পুণ্যময় অমর আত্মা শান্তিলাভ করুক-ইহাই আমাদের কাম্য।

লেখক ও কবিদের চোখে খানজাহান

খানজাহান সম্পর্কে কেহ কোন ধারাবাহিক ইতিহাস লিখিয়া যান নাই। যাঁহারা কিছু কিছু লিখিয়াছেন তাঁহারাও সাধারণতঃ তাঁহার জীবনেতিহাসের সমস্ত দিক আলোচনা করেন নাই। আমরা বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া এ বিষয় আলোচনা করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

খানজাহান সম্পর্কে যে সকল ইংরেজ লেখক যৎসামান্য আলোচনা করিয়াছেন তাহাও নির্ভরযোগ্য নহে। এই সমস্ত বিদেশীয় লেখকদের মধ্যে ঐতিহাসিক ব্লকম্যানের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি এ সম্পর্কে মাত্র কয়েকটি কথা লিখিয়াছেন। ব্লকম্যান ব্যতীত এল, এস, এস ওমালী আই, সি, এস, ডাব্লু, ডাব্লু, হাণ্টার, এল, আর ফকাস, আই, সি, এস, জেমস ওয়েষ্টল্যাণ্ড প্রমুখ খানজাহান সম্পর্কে কিছু কিছু লিখিয়াছেন। ইংরেজ সরকারের পক্ষে এই সমস্ত উচ্চ পদস্থ কর্মচারী দেশ শাসনের সঙ্গে সঙ্গে এদেশের লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধারকল্পে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। শাসন কার্যের সুবিধার্থে এবং নবাগত সরকারী কর্মচারীদের জ্ঞাতার্থে তাঁহারা অশেষ পরিশ্রম সহকারে বঙ্গদেশের প্রত্যেক জিলার গেজেটিয়ার বা ভৌগলিক অভিধান প্রণয়ন করিয়াছিলেন। জিলার পরিচয় হিসাবে এখনও উহাই একমাত্র সম্বল। পাক সরকার বারংবার চেষ্টা করিয়াও এ বিষয়ে ব্যর্থকাম হইয়াছেন।

ইংরেজ লেখকদের লিখিত বইগুলি এখন একরূপ দুষ্প্রাপ্য। যেগুলি বহুকষ্টে যোগাড় করিতে সক্ষম হইয়াছি তাহা পাঠে ইহাই অবগত হওয়া যায় যে তাঁহারা সাধারণতঃ স্থানীয় প্রবাদ ও জনশ্রুতি এবং অফিস আদালতের কর্মচারীদের মারফত ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক বিবরণী সংগ্রহ করিতেন। দুই এক জন ব্যতীত তাঁহাদের প্রায় সকলের মধ্যে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব পরিলক্ষিত হয়। সুক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া লেখনী চালনা করিবার অবসরই বা তাঁহাদের কোথায় ছিল। গবেষণার সুযোগ সুবিধাও তখন এদেশে ছিল না। তাঁহাদের অনেকেরই গ্রন্থে বহু অনৈতিহাসিক-

ঘটনাবলীর বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। তবে স্বেচ্ছায় কেহ ইতিহাসকে বিকৃত করেন নাই বলিয়া মনে হয়। ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া একমাত্র ব্লকম্যান সমসাময়িক ইতিহাসের দুই একটি খুঁটিনাটি বিষয় যাচাই করিয়াছেন। খানজাহান সম্পর্কে জেমস ওয়েষ্টল্যাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণীও প্রশংসার যোগ্য। ওমালী, ফকাস প্রমুখ লেখকেরা তাঁহাদের পূর্ব সুরীদের অনুসরণ করিয়াছেন। অবশ্য ওমালী তদীয় খুলনা গেজেটিয়ারে কয়েকটি আজগুবি ও অতিরঞ্জিত ঘটনাবলীর বর্ণনা দিয়াছেন। এগুলি অবশ্য ইতিহাসের পর্যায়ে পড়ে না। আমি সমস্ত লেখকদের বিবরণী লইয়া ইতিপূর্বে যথাস্থানে সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছি। বিদেশী লেখকদের দোষক্রুটি থাকা সত্ত্বেও তাঁহাদের প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। এদিক দিয়া তাঁহাদের কাছে আমরা ঋণী।

কোন আরবী ফার্সি বা উর্দু পুস্তক পুস্তিকায় খানজাহান সম্পর্কে বিশেষ কিছুই লিখিত হয় নাই বলিয়া জানি। একটি মাত্র উর্দু পুস্তিকার বিষয় আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করিয়াছি। উহাও ক্রুটীপূর্ণ। কবরগাত্রের আরবী ও ফার্সি লিপিগুলি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য এবং উহার যথাযথ মর্যাদার বিষয়ও আমরা আলচনা করিতে কার্পণ্য করি নাই।

এখন আমাদের দেশীয় লেখকদের বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না বলিয়া মনে করি। গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে প্রত্যেক লেখকদের বিষয় আলোকপাত করিয়া আমাদের অভিমতও পাশাপাশি আলোচনা করিয়াছি। দেশী লেখকদের মধ্যে অধ্যাপক সতীশচন্দ্র মিত্রের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তবে তাঁহার লেখনীও দোষক্রুটী মুক্ত নহে। এসব সত্বেও তিনি বহু সঠিক ইতিহাস উদ্ধার করিয়াছেন। তজ্জন্য তিনি আমাদের শ্রদ্ধাভাজন। অন্যান্য যাঁহারা এক বা একাধিক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে ডক্টর এ, এইচ, দানী, সৈয়দ মুর্তজা আলী, ডক্টর এম, এ, করিম এবং ডক্টর আবদুল কাদেরের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহাদের প্রত্যেকের লেখনীর মধ্যে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা পরিলক্ষিত হইয়াছে। তাঁহারা খানজাহান সম্পর্কে যাহা লিখিয়াছেন উহার কোন কোন অংশ আমরা গ্রহণ করিয়াছি এবং মতান্তরের বিষয়ও যথাস্থানে উল্লেখ করিয়াছি।

অন্যান্য লেখকদের মধ্যে কবি গোলাম মোস্তাফা, মোতাহারুল হক, ডাঃ আবুল কাসেম, পশুপতি ভট্টাচার্য, শেখ আবদুল আজিজ প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদের লেখনীর বেশীর ভাগই ভাবাবেগ দোষ বর্জিত নহে। আরও বহু লেখকের নাম অত্র গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে স্থান পাইয়াছে। অবশ্য বিস্তারিত আলোচনা এখানে সম্ভবপর নহে।

দৈনন্দিন অসংখ্য যাত্রী খানজাহানের কবর জেয়ারত করিয়া তাঁহার আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন। বহু সাধক ও বাতেনী এবাদতকারী এখানে অবস্থান করিয়া কায়মনোবাক্যে আল্লা'র আরাধনায় লিপ্ত থাকেন। বিশেষ বিশেষ অধিবেশনে দরগার ফকির ও জাকেরগণ জলী জেকেরের আসরে অন্যান্য এবাদতের মধ্যে নিম্নোক্ত গজলটি পাঠ করিয়া থাকেন :—

"ও সোনার খানজাহান, বাবা মাওলানা,
অধম সন্তান ডাকে তোমায় ডাক শোনো না।
ঘুমিয়ে আছ মাজারেতে, উঠবে না আর জানি
তবু তোমার মোদের লাগি আছে অমর বাণী।
ও সোনার খানজাহান, বাবা মাওলানা,
অধম সন্তান ডাকে তোমায় ডাক শোনো না।
তোমার নামে পাথর ভাসে, জলের কুম্ভীর ডাঙ্গায় আসে,
ও সোনার খানজাহান, বাবা মাওলানা,
অধম সন্তান ডাকে তোমায় ডাক শোনো না।
দয়ার সাগর তুমি, কৃপা ভিখারী আমি
কিঞ্চিত দোয়া কর বাবা, বঞ্চিত করো না —
ও সোনার খানজাহান, বাবা মাওলানা,
অধম সন্তান ডাকে তোমায় ডাক শোনো না।
খানজাহান আলীর ফুল বাগানে —
ফুটছে আজি আজব রঙ্গের ফুল।
ঝাকে ঝাকে উড়ে আসে, আসে অলিকুল
হুরপরী আর ফেরেশ্তারা —
ফুলের গন্ধ পেয়ে তাঁরা —

আকাশ থেকে নেমে এসে জেয়ারত সে করে কবুল
খানজাহান আলীর ফুল বাগানে —
ফুটছে আজি আজব রঙ্গের ফুল।
ফুলের গন্ধ পেয়ে তাঁরা —
হয়ে গেছে আত্মহারা —
দুনিয়ার মুখ চাহে না তাঁরা —
চায় না জাতি কুল
খানজাহান আলীর ফুল বাগানে
ফুটছে আজি আজব রঙ্গের ফুল।
যে পেয়েছে ফুলের মর্ম —
তাঁর হয়েছে আসল ধর্ম —
থাকবে না তার বাজে কর্ম
দীলে শুধু আল্লাহ ও রসুল।
ফুলগাছে চার ডাল আছে —
সেই ডালে আছেরে ভাই আল্লাহ ও রসুল
খানজাহান আলীর ফুল বাগানে —
ফুটছে আজি আজব রঙ্গের ফুল।"

নানাপ্রকার জেকের ও লোক-গাঁথা ছাড়া দেহতত্ব ও আধ্যাত্মিক গজল ও গীত হয়। খাঞ্জেলী দরগাহ বহু মস্তান ফকিরের আস্তানায় পরিণত হইয়াছে। বে-শরাহ ফকিরদের আড্ডাও খুব বেশী। ২৫শে অগ্রহায়ণ ওরসের সময় এই ধরণের বহু ভাল-মন্দ লোকের সমাবেশ দৃষ্ট হয়। চৈত্র পূর্ণিমার মেলার সময় সৎকর্মের চেয়ে বাড়াবাড়ি ও অনাচার অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়। সমাজ বিরোধী ও ধর্ম বিরোধী শেরেকে বেদাত প্রভৃতি ক্রিয়াকর্মের আশু অবসান আবশ্যক।

খানজাহানকে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে কিভাবে দেখিয়া থাকেন তন্নিমিত্ত সর্বপ্রকার মত ও পথের যথাযথ উল্লেখ করিতে চেষ্টা

করিয়াছি। আমার নিজস্ব মতও যথাস্থানে ব্যক্ত করিয়াছি। জনৈক গ্রাম্য কবি একদা খাঞ্জেলী দীঘির পশ্চিম পাড়ে নিশা যাপনকালে নিম্নোক্ত গজলটি রচনা করেন। ইহার অংশবিশেষ মর্মস্পর্শী :—

"ও ফকির! ও ফকির! বলতে পার কোন সে দিনের গান!
এই খানজাহান, এই খানজাহান !!
কোন মানুষের বুকের বাণী —
গাইছে ধরায় স্মৃতিখানি —
আমরা কি তার কিছুই জানি
এযে খোদ খোদাবই দান !!
এই খানজাহান !!
জলের কুম্ভীর কথা বলে,
ভাষায় পাথর চোখের জলে
কোন মানুষের দোলার তালে
কাঁদে ঘাট নিশান।
দেখলো জগৎ ভাবলো না কেউ —
কোন মানুষেব প্রাণ !!
এই খানজাহান,
এই খানজাহান,
এই খানজাহান।"

পুথি লেখকেরা খানজাহানেব গুণ কীর্তনে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন। পুঁথি সাহিত্য বলিতে আমরা যাহা বুঝি এই সমস্ত পুঁথি বা পুস্তিকা সে পর্যায়ে পড়ে না। পুঁথি লেখকদেব প্রায় সমস্ত লেখনী অনৈতিহাসিক এবং উহা আমরা এড়াইয়া গিয়াছি।

এতদঞ্চলে হিন্দু মুসলিম প্রতি ঘরে ঘরে খানজাহান নাম সুপরিচিত। জন সাধারণের খাঞ্জেলী পীর, খাঞ্জেলী দরগাহ কথাগুলি এমনভাবে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে যে উহা একরূপ কেচ্ছা-কাহিনীতে পরিণত হইয়াছে। খাঞ্জেলী পীর হিন্দুদের আরাধ্য দেবতা এবং মুসলমানদের পরম শ্রদ্ধাভাজন।

কবি, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক খানজাহানকে লইয়া কতই না চিন্তা করেন তাহা বলাই বাহুল্য। যে কোন জ্ঞানী ব্যক্তি খানজাহানের কীর্তিরাজি পরিদর্শন করিলে তিনি এই মহাত্মার জীবনালেখ্য লইয়া আলোচনায় রত হন এবং স্বীয় মতামত প্রকাশ করেন। ঘরে ঘরে খানজাহান সম্পর্কে রূপকথার ছড়াছড়ি। ভাবগান, ধূয়া, জারি, কবিগানের মধ্যে খাঞ্জেলী পীরের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা গীত ও শ্রুত হয়। বাতেনী মতবাদীরা খানজাহানকে বিভিন্ন নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন। জনৈক আলেমের কাছে আমি এ বিষয়ে অবহিত হইয়াছি। কেহ কেহ তাঁহাকে অতি মানুষ হিসাবে দেখিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তাহা এত অতিরঞ্জিত ও অবাস্তর যে উহা একেবারেই পরিত্যাজ্য। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে যাহা সঠিক তাহাই গ্রহণ করিয়া অতিরঞ্জন ও ভূয়া কথা বাদ দিয়াছি।

সুদীর্ঘ পাচ শতাব্দীর উর্ধ্বকাল ধরিয়া সুন্দরবনাঞ্চলের অধিবাসীরা মহাত্মা খানজাহানের নাম ভক্তির সহিত স্মরণ করিয়া আসিতেছে। তাঁহার কীর্তিরাজি এদেশের যে কোন রাজা বাদশাহের কীর্তি অপেক্ষা অধিকতর খ্যাত। এদেশের কত রাজা মহারাজা গতায়ু হইয়াছেন, কত রাজ্য ও রাজবংশের উত্থান পতন সংঘটিত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। শাহী তখ্ত ও বালাখানার নাম নিশানা সবই আজ স্মৃতির অতলতলে লুপ্তপ্রায়। রাজা বাদশাহের জীবনাবসানের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের রাজপ্রাসাদ ও ধন দৌলতেরও অবসান ঘটিয়াছে। কিন্তু মণীষী খানজাহান এমন এক মহাপুরুষ যাঁহার পুণ্যস্মৃতি মানব হৃদয়ে এমন ভাবে গ্রথিত হইয়াছে যে উহা সহজে মুছিবার নহে। "খানজাহান জিন্দাবাদ" ধ্বনি তাই আজ এতদঞ্চলের সর্বত্র মুখরিত।

খানজাহানের জলদান পুণ্যের কথা লোক-গাঁথায় পরিণত হইয়াছে। তৎপ্রতিষ্ঠিত জাঙ্গাল, অসংখ্য মসজিদও মানব মনে দাগ রাখিয়া গিয়াছে। তদীয় কীর্তিরাজিই তাঁহাকে অমরত্ব প্রদান করিয়াছে। তাঁহার কীর্তির চেয়ে নিশ্চয়ই তিনি অধিকতর মহীয়ান ও গরীয়ান।

হোসেন শাহ ও নসরত শাহ

।। নয় ।।

আলাউদ্দিন হোসেন শাহ বাংলার শ্রেষ্ঠ স্বাধীন সুলতান। স্বাধীন বাংলার ইতিহাসে হোসেনশাহী বংশ এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের সূচনা করিয়াছে। হোসেন শাহ্, তৎপুত্র গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ ও নসরত শাহের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল য.শার-খুলনার সহিত।

বর্তমান খুলনা শহর হইতে প্রায় ৭ মাইল উত্তর-পূর্বে ভৈরব নদী আঠার বাকীর সহিত মিশিয়াছে এবং ঐ স্থান হইতে ভৈরব মূলঘর ও যাত্রাপুর হইয়া বাগেরহাটের পূর্বে শেষ হইয়াছে। ভৈরব ও আঠারবাকীর সঙ্গমস্থলে পশ্চিম তীবে আলাইপুব গ্রাম। তুর্ক-আফগান আমলে এইখানে একটি ক্ষুদ্র শহর ছিল। তৎকালে সম্ভবতঃ বর্তমান খুলনা শহর সুন্দরবন বা জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। আলাউদ্দিন হোসেন শাহের নামানুসারে এইস্থানের নাম হইয়াছিল আলাইপুর। আলাইপুরের পূর্বদিকে পিঠাভোগ ও চাঁদপুর গ্রাম। বর্তমানে আলাইপুর বাজার ভৈরব নদীর পূর্বপাড়ে পড়িয়া প্রকৃত আলাইপুর গ্রাম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। সেকালে আঠার বাকী নদী ছিল না এবং আলাইপুর, পিঠাভোগ ও চাঁদপুব পরস্পর সংযুক্ত ছিল। এই চাঁদপুরে কাজীরা বাস করিতেন। কাজী বংশের পূর্ব পরিচয় অস্পষ্ট, তবে তাঁহারা দেশবরণীয় ছিলেন। এই বংশের কেহ কেহ গৌড়-সুলতানের অধীনে বিচারকের পদে অধিষ্ঠিত থাকায় তাঁহাদের উপাধি হয় কাজী বা বিচারক। চাঁদপুরে কাজীদের বাড়ীতে বিদ্যা শিক্ষারও ব্যবস্থা ছিল। কথিত আছে যে হোসেন বাল্যকালে এই কাজীদের বাড়ী আশ্রয় পাইয়া নিজেকে ভবিষ্যতের জন্য উপযুক্তভাবে গঠন করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন।

হোসেন শাহের পূর্ব পরিচয় সম্পর্কে অনেক কিংবদন্তি আছে। আমরা একে একে উহার আলোচনা করিব। রিয়াজউস-সালাতীনের লেখক বলেন, হোসেন শাহ তুর্কীস্তানের অন্তর্গত তিরমিজ নগরে জন্মগ্রহণ করেন। গৌড়ের

কদম রসুল নামীয় মস্‌জিদ গাত্রের শিলালিপি হইতে জানা যায় যে তাঁহার পিতার নাম সৈয়দ আশরাফুল হোসায়েন মক্কী। তিনি মক্কার কোরেশ বংশ সম্ভূত এবং মহানবী হযরত মোহাম্মদের বংশধর বলিয়া দাবী করিতেন। তাঁহার পূর্ব পুরুষের কেহ মক্কা নগবের সম্ভ্রান্ত বাসিন্দা ছিলেন। সেইজন্য তাঁহার পিতা মক্কী উপাধি গ্রহণ করেন। স্বদেশ ত্যাগের পর বহুদেশ পর্যাটন করিয়া হোসেন এবং তদীয় ভ্রাতা ইউসুফ পিতার সহিত বঙ্গদেশে আগমন কবেন।

ডক্টর এম, আর, তবফদাব তদীয় গ্রন্থ "হোসেন শাহী বেঙ্গল" এ বলিয়াছেন: হোসেন শাহেব জীবনেতিহাসের রোমাঞ্চকব কাহিনীর টুকিটাকি ইহাই প্রমাণ করে যে তিনি বাল্যবেলায় বঙ্গের সমাজে পরিচিত হন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে হোসেনেব বাল্যজীবন সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে সীমাহীন তর্কের বেড়াজাল সৃষ্টি হইয়াছে। ডি, ব্যাবোজের মতে হোসেন আরব বংশীয় সম্ভ্রান্ত বণিক এবং এডেনেব অধিবাসী। তিনি কিছু সংখ্যক সৈন্যসহ চট্টগ্রামে আগমন করেন এবং গৌড় সুলতানেব সহায়তায় উড়িষ্যা (crixa) জয় করেন। পবে তিনি সুলতানকে হত্যা করিয়া গৌড়ের মসনদে আরোহণ করেন। যশোব বা খুলনার চাঁদপাড়া (চাঁদপুর) সম্পর্কে ডক্টর তরফদার বলিয়াছেন:— হোসেনের বাল্যজীবন সম্পর্কে এখানে কোন প্রবাদের কথা জানা যায় না যাহা মুর্শিদাবাদে পাওয়া যায়। যশোরে কোন শিলালিপিও পাওয়া যায় নাই। রাঢ়ের চাঁদপাড়ার সন্নিকটে হোসেনের রাজত্বের প্রাথমিক যুগের শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। চৈতন্য চরিতামৃতে বর্ণিত হোসেন ও সুবুদ্ধি রায় সম্পর্কিত কাহিনীকে তিনি বিশ্বাসযোগ্য মনে করিয়াছেন। ডঃ তরফদার আরও বলিয়াছেন যে হোসেন কিভাবে হাবসী রাজ সরকারের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করেন সঠিকভাবে জানা যায় না। ফিরিশতা ও সলিম তাঁহাকে মোজাফ্‌ফরের উজির বলিয়াছেন। নিজামউদ্দিন তাঁহাকে সিপাহী বা সাধারণ সৈনিক হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। এসম্পর্কেও কোন সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। রিয়াজের লেখক বলেন হোসেন রাঢ়েব কাজীর অনুরোধে সরাসরি মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত হন। ঐতিহাসিকগণ তাঁহার সম্পর্কে যে সমস্ত বিবরণী দিয়াছেন, তাহা পরস্পর বিরোধী ও প্রধানতঃ অনুমানমূলক।

হোসেনের পিতা মহানবী হযরত মোহাম্মদের দৌহিত্র ইমাম হোসেনের বংশধর বলিয়া কথিত হইয়াছেন। ডক্টর তরফদার বলেন তিনি মধ্য এশিয়ার তিরমিজ শহরে বসবাস করিয়াছিলেন। হোসেন শাহের এক পারস্য রমণী ছিলেন বলিয়া জানা যায়। ঐ রমণীর গর্ভজাত কন্যা রওশান আখ্‌তার বানুকে কুতুবুল আশাগীনের সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। তাঁহার বংশধরেরা মোঘল রাজত্বের শেষ পর্যন্ত সোনারগাঁয়ে ভূসম্পত্তি ভোগ দখল করিয়াছিলেন। ডঃ তরফদার হোসেন সম্পর্কে অমূল্য ঐতিহাসিক তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন সন্দেহ নাই। তবে সুবুদ্ধি রায় কাহিনী এবং রাঢ়ের চাঁদপাড়া হোসেনের বাল্যলীলা নিকেতন সে সম্পর্কে আমরা একমত হইতে পারিতেছিনা। পরবর্তী আলোচনায় এবিষয় সম্পূর্ণ জানা যাইবে। এখন আমরা আরও কয়েকটি মত আলোচনা করিয়া আমাদের সিদ্ধান্ত পেশ করিব।

বুকানন হ্যামিলটন তদীয় পূর্ব ভারতের মুসলমান (Muslims in Eastern India, page 448) পুস্তকে লিখিয়াছেন যে রংপুর জিলার উত্তরাংশে প্রবল জনশ্রুতি আছে যে হোসেন তথাকার বাসিন্দা এবং ইব্রাহিমের দৌহিত্র। গোবিন্দগঞ্জ হইতে ১৬ মাইল দূরে দেবনগর নামক স্থানে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পাণ্ডুয়ায় প্রাপ্ত একখানি অজ্ঞাতনামা হস্তলিপি হইতে তিনি এ বিষয় জ্ঞাত হইয়াছেন। হোসেনের পূর্বপুরুষেরা যদু বা জালালউদ্দিন কর্তৃক উৎখাত হইয়াছিলেন এবং ৭৬ বৎসর পরে তিনি পূর্বপুরুষের সিংহাসন উদ্ধার করেন। কিন্তু আমরা এই মতের কোন সমর্থন খুঁজিয়া পাই নাই।

হোসেন শাহের জন্মস্থান ও বাল্যজীবন কোথায় অতিবাহিত হয় সে সম্পর্কে বিতর্ক উপস্থিত হইয়াছে। আবদুর রহমান ফেরদৌসি ১৯৬৪ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী শেখ অবুল হাশেম লিখিত প্রবন্ধের সমালোচনা করিয়া "পূর্বদেশ" পত্রিকায় এক নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধে হোসেন শাহের জন্মস্থান মক্কা নগরে এবং তিরমিজ সহরে নহে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মক্কা নগরে জন্মস্থান এ সম্পর্কে তিনি কোন সঠিক ঐতিহাসিক সূত্রের নাম দিতে পারেন নাই। কোন উত্তম সূত্র দেখাইলে তাহা হয়তো গ্রহণযোগ্য হইত। এমতাবস্থায় উক্ত প্রবন্ধের মত আমরা কেমন করিয়া গ্রহণ করি? হোসেন শাহের পিতার মক্কী

উপাধি দেখিয়া মক্কায় তাঁহার জন্ম তাহা বলা যায় না। এ সম্পর্কে মওলানা আকরম খাঁ বলিয়াছেন: "হোসেন শাহ প্রকৃত পক্ষে সৈয়দ ছিলেন কিনা, তাহা আমাদের জানা নাই, জানার কোন দরকারও আমাদের নাই। তবে নিজেকে "শরীফে মক্কা" বলিয়া দাবী করাব কোন অধিকার তাঁহার ছিল না। তুর্কী সুলতান "শরীফ" নিযুক্ত করিতেন, উহা ব্যক্তিগত উপাধি, গোত্রগত পদবী নহে।" মক্কা ব্যতীত অন্য কোথাও তাঁহার জন্ম হইবে। যাহা হউক জন্মস্থান অপেক্ষা তাঁহার বাল্য জীবন কোথায় কিভাবে অতিবাহিত হইয়াছিল সে সম্পর্কে বিভিন্ন লেখক জটিল প্রশ্নের অবতারণা করিয়াছেন। প্রশ্নটি নূতন না হইলেও এ বিষয়ের সুরাহা প্রয়োজন। হোসেন শাহের বাল্য জীবন কোথায় অতিবাহিত হয়, খুলনার চাঁদপুরে না মুর্শিদাবাদের চাঁদপাড়ায়? শতাধিক বৎসর ধরিয়া এ বিষয়ে মতানৈক্য চলিয়া আসিতেছে। শেষোক্ত স্থানে হোসেন শাহেব পিতাব সমাধি অবস্থিত। বার্নিয়াবের ভ্রমণ বৃত্তান্তে একথা উল্লেখ আছে। কিন্তু উক্ত ভ্রমণ বৃত্তান্তে হোসেনের বাল্যজীবন সম্পর্কে কিছুই লিখিত নাই। একমাত্র সূত্র চৈতন্য মঙ্গল —
উহাতে আছে :—

"শিশুপুত্র লৈযা সাথে ভ্রমিতে ভ্রমিতে
উপনীত হৈলা আসি বাঢ়েব পল্লীতে
... ...
বয়ক্রম অষ্টবর্ষ সবেমাত্র হয়
পাথরে ভাসিল শিশু হয়ে নিরাশ্রয়।"

চৈতন্য মঙ্গলে আবও বর্ণিত আছে যে হোসেনকে শিশু অবস্থায় তথাকার কাজী গিয়াসউদ্দিন লালন পালন করিয়া নিজ কন্যাব সহিত বিবাহ দিয়া পরে গৌড় দরবারে স্বীয় জামাতাব চাকুরীর সংস্থান করিয়া দেন। রিয়াজের লেখকে গোলাম হোসেন সলিম হুগলী নদীর পশ্চিমতীরে চাঁদপুর বা চাঁদপাড়ার কথা বলিয়াছেন। এ সম্পর্কে আমরা সেখানে অনুসন্ধান করিয়াছি। উক্ত স্থান বর্তমানে এক আনা চাঁদপাড়া বলিয়া কথিত। জঙ্গীপুর মহাকুমার সাগরদীঘি থানার অন্তর্গত এই গ্রাম। সাগরদীঘিতে প্রায় এক

মাইল দীর্ঘ একটি দীঘি আছে। সাগরদীঘি হইতে খায়রল (হরিয়র) গ্রামে একটি অসম্পূর্ণ মস্‌জিদ আছে। উহাকে লোকে হোসেন শাহের মস্‌জিদ বলে। নিকটবর্তী গোকুলতলা গ্রামে কাজী বংশের বসবাস আছে। চাঁদপাড়ার সন্নিকটে হোসেন শাহের রাজ্যারোহণের প্রথম টিক্‌কার কয়েকটি শিলালিপি প্রাপ্তিতে কেহ কেহ বিশ্বাস করেন যে এখানেই তাঁহার বাল্যজীবন অতিবাহিত হয়।

খুলনা জিলার চাঁদপুরের কাজীদের নামেও অনুরূপ প্রবাদ শত শত বর্ষ ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। আরও প্রবাদ আছে হোসেন চাঁদপুরের কাজী বংশের যে কন্যাকে বিবাহ করেন তাঁহার নাম ছিল চাঁদ বিবি। বাংলার ইতিহাস প্রণেতা ষ্টুয়ার্ট, খুলনা গেজেটীয়ার প্রণেতা এল, এস, এম, ওমালী আই, সি, এস, ব্লকম্যানের মতই গ্রহণ করিয়া খুলনা জিলার চাঁদপুরই হোসেন শাহের বাল্যলীলা নিকেতন বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। ব্লকম্যান মুর্শিদাবাদের এক আনা চাঁদপাড়া হোসেনের বাল্যলীলা নিকেতন সম্পর্কে সন্ধিহান। ষ্টুয়ার্টের পুস্তকে খুলনার চাঁদপুরের কাজীদের কথা আছে, রাঢ়ের 'চাঁদপাড়া" নাই। জিয়া বারাণী, ফিরিশতা, যদুনাথ সরকার, রাখাল বাবু বা অন্যান্য ঐতিহাসিক এ বিষয়ে নীরব। ষ্টুয়ার্ট বলেন, "হোসেন বাংলায় আসিয়া কিছুদিন দৈন্যতার সহিত কালাতিপাত করেন।" পিতার মৃত্যুর পর হোসেন খুলনার চাঁদপুরে আসিয়া নিরাশ্রয় অবস্থায় কাজীদের বাড়ীতে বাল্যজীবন অতিবাতি করার বিষয় অসম্ভব বা অযৌক্তিক নহে। মুর্শিদাবাদের চাঁদপাড়ার সহিত খুলনার চাঁদপুরের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকাও অসম্ভব নহে। চৈতন্য চরিত্রামৃত বা চৈতন্য মঙ্গল ইতিহাস পুস্তক নহে। বহু অলীক গল্পের বিষয়ও উক্ত গ্রন্থদ্বয়ে বর্ণিত আছে। একটি অনুরূপ আজগুবি ও অসম্ভব গল্পের বিষয় আমরা পরেই বর্ণনা করিতেছি। যে সমস্ত ইংরেজ ঐতিহাসিক এদেশের লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন মিঃ ব্লকম্যান নিঃসন্দেহে তাঁহাদের অন্যতম অনুসন্ধিৎসু লেখক। এ বিষয়ে অন্য কোন সঠিক তথ্য এ পর্যন্ত কেহ পরিবেশন করিতে পারেন নাই। শুধু হোসেন শাহ নহে, তাঁহার পুত্রদের নাড়ীর যোগসূত্র খুলনা-যশোরে, আমাদের পরবর্তী আলোচনা হইতে এ বিষয় আরও স্পষ্ট হইবে।

চৈতন্য মঙ্গলের বর্ণনায়ও এই আভাষ পাওয়া যায় যে আট বৎসর বয়সে পিতৃহারা হোসেন নিরাশ্রয় ও অসহায় অবস্থায় স্বীয় ভাগ্যান্বেষনে ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকেন। সম্ভবতঃ পিতৃহারা হইবার পর হোসেন রাঢ় প্রদেশ হইতে খুলনার চাঁদপুরে কাজীদের আশ্রয় গ্রহণ করেন।

আলাউদ্দিন হোসেন নামীয় আলাইপুর গ্রামে এখনও প্রাচীন কালের পাকা বসতি চিহ্ন এবং দীঘিকা দেখিতে পাওয়া যায়। আলাইপুরের ৩ মাইল পশ্চিমে আজোগাড়ার সন্নিকটে হোসেন শাহ্ নামীয় গ্রাম "হোসেন পুর" বিদ্যমান আছে। সম্ভবতঃ এখানে হোসেন শাহের কোন আত্মীয় বা হিতাকাঙ্খীর বাড়ী ছিল। মিঃ ব্লকম্যান বলেন যে হোসেন শাহ্ রাজ্যারোহণ করিয়া খুলনার নিকটবর্তী ফতেহাবাদ (ফরিদপুর) হইতে স্বীয় নামে সর্বপ্রথম মুদ্রা প্রচলন করেন এবং সেখানেই (ফতেহাবাদ) সর্বপ্রথম স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করেন। ব্লকম্যান সাহেব এ সম্পর্কে আরও বলেন যে হোসেন শাহ্ তদীয় ভ্রাতা ইউসুফ শাহ্ এবং তৎপুত্র নসরত ও মোহাম্মদ শাহ্ নামে যশোহর, খুলনা ও ফরিদপুরে নসরত শাহী, মোহাম্মদ শাহী ইউসুফপুর ও মোহাম্মদাবাদ পরগনার নাম জড়িত আছে। হোসেন-আবাদ বা ২৪ পরগনার হাসনাবাদ সুলতান হোসেনের স্থাপিত শহর বলিয়া প্রবাদ আছে। খুলনা শহরের উত্তরপার সেনের বাজার। ইহার অদূরে বেলফুলিয়ায় কাজীদের পূর্বপুরুষেরা বাস করিত। এখানকার কাজীর জাঙ্গাল, কাজীর দীঘি ও কাজীর দেউড়ী প্রভৃতি পুরাকালীন স্মৃতি চিহ্নের নিদর্শন ছিল। হোসেন শাহী আমলে এই স্থানে সুবী খাঁ ও সুচী খাঁ নামে দুইজন কাজী ছিলেন। তাঁহাদের পিতার নাম পঞ্চরঙ্গ খাঁ। পঞ্চরঙ্গ খাঁর প্রকৃত নাম ছিল চতুরঙ্গ; তিনি বৃদ্ধ বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁহার খনিত একটি দীঘি শ্রীফলতলা গ্রামে বিদ্যমান। চতুরঙ্গ হোসেন শাহের স্বনামধন্য হিন্দু অমাত্য পুরন্দর খাঁর আত্মীয়। রূপ ও সনাতন হোসেন শাহের যে দুইজন প্রধান অমাত্য ছিলেন তাঁহারা সকলেই যশোর-খুলনার অধিবাসী। মুর্শিদাবাদের একআনা চাঁদপাড়ার এলাকা অপেক্ষা যশোর খুলনার সহিত হোসেনের সম্পর্ক ছিল খুবই ঘনিষ্ঠ।

চাঁদপুরের কাজীরা আলাইপুরের কাজী নামে খ্যাত। এই কাজী বংশের শেষ প্রদীপ কাজী সিরাজুল হক বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে দেহত্যাগ করেন। চাঁদপুর গ্রামের এক অংশ এখনও কাজীডাঙ্গা নামে পরিচিত। সেখানে একটি পাকা বাসগৃহ এবং মসজিদের ভগ্নাবশেষ ছিল। বর্তমানে ইষ্টক স্তূপ নিশ্চিহ্ন হইয়াছে। সেকালের একটি পুকুর আছে এবং উহার পশ্চিমতীরে ২০ ফুট বেড় বিশিষ্ট একটি বৃহৎকায় তেঁতুলগাছ এবং পূর্বদিকে বিলের মধ্যে অনুরূপ একটি অশ্বত্থ বৃক্ষ প্রাচীনত্বের সাক্ষ্য দিতেছে। কাজীডাঙ্গার উত্তর ও পশ্চিমে বিল ছিল এবং পশ্চিম ও পূর্বদিকে গড়খাই ছিল। উহা এখন প্রায় নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। কাজীদের বাড়ী হইতে দক্ষিণে ভৈরবতীর পর্যন্ত প্রশস্ত রাস্তা ছিল। চাঁদপুরের বাড়ী ছাড়াও কাজীদের আলাইপুর গ্রামের মধ্যে বসতবাটী ছিল। কাজীগণ শেষদিকে আলাইপুরেই বাস করিতেন। আলাইপুরের বাড়ীর পূর্বদিকে একটি পাকাঘাট বিশিষ্ট পুকুর এবং উত্তরদিকে আর একটি পুকুর ছিল। এই স্থান হইতে ভৈরবনদী মাত্র ২ ০ শত গজ দূরে ছিল। এখন উহা প্রায় ২মাইল দক্ষিণে সরিয়া গিয়াছে। বাড়ীর পার্শ্বে এখনও একখানি পাথর পড়িয়া আছে। কয়েকটি উঁচু ভিটা ইষ্টক ও প্রস্তর নির্মিত বাড়ীর শেষ চিহ্নস্বরূপ বিদ্যমান আছে। হোসেন শাহ বা তৎপুত্র নসরৎ শাহ মধ্যে মধ্যে আলাইপুরে আসিয়া অবস্থান করিতেন বলিয়া প্রবল জনশ্রুতি আছে। চাঁদপুরের পূর্বে মানসা গ্রামে ভৈরব নদীর ত্রিমোহনা ছিল। চাঁদপুরে একস্থানে কুমীরের আড্ডা ছিল সেইজন্য লোকে ঐ স্থানকে কুমীরের খোরদাটা বলিত। ভৈরব নদী ঘাটভোগ, চাঁদপুর ও আলাইপুরের দক্ষিণ দিয়া সোজা পথে পশ্চিমমুখী হইয়া সেনের বাজার পৌঁছিয়াছিল। ভৈরবের পুরাতন খাতের চিহ্ন এখনও দেখা যায়। বর্তমান আলইপুর বাজার সবা ভৈরবের খাতের মধ্যে পিঠাভোগ মৌজায় অবস্থিত। তখন আঠারবাকী নদীর অস্তিত্ব ছিল না। পরে একটি ক্ষুদ্র খাল আঠারবাকী নদীতে পরিণত হয়। ইংরেজ আমলের মধ্যভাগে পূর্বতীরের লোকেরা পশ্চিমতীরে যাইতে হইলে খালপারে যাইব — এই কথা বলিত।

পরবর্তীকালে রাজ্যারোহণের পরও হোসেন শাহের সহিত খুলনা জিলার বিশেষ সম্বন্ধ ছিল। বাগেরহাট শহর হইতে ষাটগুম্বজের পথে পশ্চিমদিকে

প্রায় ২ মাইল অগ্রসর হইলে রাস্তার উত্তরদিকে কৃষ্ণনগর গ্রামে একটি দশ গুম্বজবিশিষ্ট বৃহৎকায় মসজিদ দৃষ্ট হইবে। উহাকে হোসেন শাহী মসজিদ বলা হয়। উহার সন্নিকটে একটি প্রকাণ্ড দীঘি ও অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ আছে। এই মসজিদে নিয়মিত ওক্তিয়া ও জুম্মার নামাজ হয়। মরহুম হাজী আরিফের নেতৃত্বে স্থানীয় লোকেরা এই মসজিদের পূর্ণ সংস্কার করিয়াছে। স্থানে স্থানে পুরাকালীন ইটের গাঁথুনি খুলিয়া পড়ায় উহা পুনরায় গাঁথিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই মসজিদের উত্তরে চৌদেয়ারী প্রাচীর ছিল। ইহারই সন্নিকটে সামান্য পূর্বে একটি হাবসীখানা (কয়েদখানা) ছিল। উহার ভগ্নাবশেষ আছে। এই সমস্ত কীর্তিবাজিকে অনেকে খানজাহানের নামের সহিত যুক্ত করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহা ঠিক বলিয়া মনে হয় না। ঐগুলি হোসেন শাহ বা তৎপুত্র নসরৎ শাহের খলিফাতাবাদ রাজধানীর অন্যতম কীর্তি বলিয়া অনুমিত হয়। হোসেন শাহের অন্য পুত্র গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহও খলিফাতাবাদ হইতে মুদ্রা প্রচলন করেন। কাজীদের বাড়ীর পার্শ্ববর্তী চর বা দ্বীপের উপর যে গ্রামের প্রতিষ্ঠা হয় উহার নাম হয় কাজিদিয়া বা কাজদিয়া (দিয়া = দ্বীপ)। তৎপার্শ্ববর্তী সামন্তসেনা গ্রামে হোসেন শাহ বা তৎপুত্র নসরৎ শাহের গড় ছিল। পূর্বে এখানে গড়বেষ্টিত বাড়ী ছিল। উহা বহুদিন পূর্বে নদীতে ভাঙ্গিয়া ভৈরবের উত্তর পারে বিরাটকায় চরভূমির সৃষ্টি করিয়াছে। মুন্সি খয়রাতুল্লা সর্দার প্রণীত "শহীদে কারবালা" পুস্তকে একথা লিপিবদ্ধ আছে। উক্ত গ্রামের তিন দিকে নদীমুখী বিরাট গড় ও গড়খাই ছিল — সেকথা লোকমুখে শ্রুত হয়। প্রাচীন মানচিত্রে গড়ের প্রমাণ আছে। সামন্তসেনার বিরাট দীঘিটি প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে নদী গর্ভে বিলীন হইয়াছে।

চাঁদপুরের কাজীরা মহাত্মা খানজাহান আলীর দরবারে রাজকার্যে নিযুক্ত ছিলেন বলিয়া সতীশবাবু লিখিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে খানজাহান বালক হোসেনের শিক্ষার জন্য কাজীদের বাড়ীতে তাঁহাদের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া দেন। হোসেন শাহ খানজাহানের সময় এদেশে আসেন নাই। সতীশবাবু এই দুই জনের মধ্যে যে সম্পর্ক সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করিয়াছেন তাহা ঐতিহাসিক সত্যের বিপরীত। হোসেন শাহের বাল্যজীবনের ঘটনাবলী





উপরে : খাঞ্জেলী মস্‌জিদ, মরগা (বিবির মস্‌জিদ)—বাগেরহাট—৩১৫

নীচে : হোসেনশাহী মস্‌জিদ (১০ গুম্বজ)—বাগেবহাট— ৩৭৪

খানজাহানের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে। খানজাহানের মৃত্যুতারিখ দৃষ্টে তাহা সপ্রমাণিত হইয়াছে। মিঃ ষ্টুয়ার্ট বলেন যে চাঁদপুরের কাজীরা হোসেনের বংশ পরিচয় জানিতে পারিয়া তাঁহাদের কন্যাকে এই যুবকের সহিত বিবাহ দিয়া গৌড়ের শাহী দরবারের সহিত পরিচয় করাইয়া দেন। তখন হইতে আলাউদ্দিন হোসেন গৌড়ের হাবসী সুলতান সিদী বদর দেওয়ানা মোজাফফর শাহের অধীনে চাকরি গ্রহণ করেন। ইহাই হোসেন শাহের বাল্য পরিচয়।

সুলতান হোসেন শাহের পূর্ব পরিচয় সম্পর্কে অধ্যাপক সতীশচন্দ্র দুইটি গল্পের অবতারণা করিয়াছেন, উহার উত্তর দেওয়া আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, "সম্ভবতঃ বঙ্গে আসিবার পর কোন আকস্মিক বিপদে হোসেনের পিতার মৃত্যু হয় এবং বালকেরা নিঃসহায় অবস্থায় বিভিন্ন স্থানে আশ্রয় লয়। জনশ্রুতি আছে যে হোসেন এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে রাখালী করিতেন। এই ব্রাহ্মণ শেষে হোসেনের কৃপায় বলশালী হইয়া যশোর জেলার অন্তর্গত বেনাপোলের সন্নিকটে কাগজ পুকুরীয়ায় বাটী নির্মাণ করিয়া প্রবল জমিদারের মত বাস করিতেন। এই ব্রাহ্মণের নাম রামচন্দ্র খান। ব্রাহ্মণ রামচন্দ্র একদা দেখিলেন তাহার গো রাখাল হোসেন প্রান্তরে এক বৃক্ষতলে নিদ্রিত রহিয়াছে। তাঁহার মস্তকের উপর দুইটি সর্পে ফনা বিস্তার করিয়া ছায়া করিয়া রাখিয়াছে। তদবধি তিনি বুঝিলেন বালকের ভবিষ্যৎ সমুজ্জ্বল। এইজন্য তিনি নিরাশ্রয় বালককে স্নেহের চোখে দেখিতেন। হোসেন সে স্নেহের মূল্য কড়ায় গণ্ডায় শোধ করিয়াছিলেন। হোসেন রামচন্দ্রের আশ্রয়ে থাকিতে থাকিতেই সম্ভবতঃ খাঁজাহান আলী তাহার উচ্চ বংশের পরিচয় অবগত হন এবং তাহাকে খলিফাতাবাদ লইয়া যান।" এই গল্পের মধ্যে কোন ঐতিহাসিক সত্য নিহিত আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। এই ধরনের কোন জনশ্রুতি বা প্রবাদের কথা চেষ্টা করিয়াও জানিতে পারি নাই। রামচন্দ্রের কথা জানি এবং তাহার বিষয়ে যথাস্থানে আলোচিত হইবে। কিন্তু হোসেন শাহ তাহার রাখালী করিতেন, তাহা উদ্ভট গল্প ভিন্ন অন্য কিছু নহে। অন্য আর একটি গল্পের বর্ণনা দিতেছি। উহা নিম্নরূপ :—

মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুর মহাকুমায় একআনা চাঁদপাড়া গ্রমে সুবুদ্ধি রায় নামক একজন সমৃদ্ধ জমিদার বাস করিতেন। হোসেন গৌড় সরকারে প্রবেশ লাভের পূর্বে এই সুবুদ্ধি রায়ের কর্মচারী ছিলেন। বালক হোসেন একটি দীঘিকা খনন কার্যে তত্ত্বাবধান কালে কোন ত্রুটির জন্য সুবুদ্ধি রায় তাহাকে চাবুক মারিয়াছিলেন। চৈতন্য চরিতামৃতে আছে ঃ—

"পূর্বে যবে সুবুদ্ধি রায় ছিলা গৌড় অধিকারী
সৈয়দ হোসেন খাঁ করে তাহার চাকুরী।
দীঘি খোদাইতে তারে মন্‌সীব কইল
ছিদ্রা পাঞা রায় তারে চাবুক মারিল।"

কথিত আছে হোসেন বাদশাহী পাইবার পর পূর্ব প্রভু সুবুদ্ধি রায়কে চাঁদপাড়া গ্রাম দান করিয়াছিলেন। সতীশবাবু বলিয়াছেন, "যবনের দান লইতে সুবুদ্ধি রায় অস্বীকৃত হইলে হুসেন উহার একআনা মাত্র কর ধায করিয়া দেন। তদবধি ঐ গ্রামের নাম হইয়াছে একআনা চাঁদপাড়া। হুসেন তাহার পৃষ্ঠদেশে চাবুকের কথা গুপ্ত রাখিয়াছিলেন। রাজা হইলে কোন সময় তাঁহার স্ত্রী তাহা দেখিতে পান। তখন স্ত্রীর প্ররোচনায় হুসেন সুবুদ্ধি রায়কে জাতিচ্যুত করিয়াছিলেন।" ইহাই দ্বিতীয় গল্পের সারকথা।

চৈতন্য চরিতামৃতে বর্ণিত সৈয়দ হুসেন খাঁ আমাদের আলাউদ্দিন হোসেন নহে এবং সুবুদ্ধি রায়ও গৌড় অধিকারী ছিলেন না। অবশ্য ডক্টর শহিদুল্লাহ্ কবিতার প্রথম লাইন হইতে গৌড় শব্দটি তুলিয়া দিয়াছেন। স্যার যদুনাথ সরকার বলিয়াছেন, "একটি অজ্ঞাতনামা ইস্তাহারের উপর নির্ভর করিয়া রিয়াজের লেখক সলিম হোসেনের এইরূপ পরিচয় দিতে গিয়া জঙ্গীপুরের একআনা চাঁদপাড়া গ্রামে তাহার বাল্যলীলা নিকেতনের বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। এই গল্প বাহমনী সুলতান হাসান গঙ্গু বাহমনীর ন্যায় রচিত।" এই মন্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। চৈতন্য সাহিত্যের লেখকেরা পুঁথি-সাহিত্যের ন্যায় অসংখ্য আজগুবি বিষয়ের বর্ণনা করিয়াছেন। বিশেষ বিবেচনার পর চৈতন্য সাহিত্যের কথা গ্রহণ করিতে হইবে। চৈতন্য সাহিত্য ইতিহাস নহে। সেজন্য হোসেন শাহের বাল্য লীলাক্ষেত্র যশোর-খুলনায়

বা রাঢ়ের জঙ্গীপুরে সে সম্পর্কে নূতন করিয়া অনুসন্ধান করিতে হইবে। জঙ্গীপুর অপেক্ষা যশোর-খুলনায় হোসেনী বংশের কীর্তিরাজি বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হয়। জঙ্গীপুর রাজধানী গৌড়ের সন্নিকটে তন্নির্মিত হোসেন শাহের প্রথম জীবনের কিছু শিলালিপি প্রাপ্তিতে এ বিষয়ের স্পষ্ট প্রমাণ হয় না। জঙ্গীপুরের সুবুদ্ধি রায়ও যশোবের রামচন্দ্র খানের সহিত হোসেনের সম্পর্ক অবিশ্বাস্য তাহা ইতিপূর্বে আলোচনা কবিয়াছি।

কোন হিন্দু জমিদারকে মুসলমান বাদশাহ কোন সম্পত্তি বা উপাধি দান করিলে তাহা প্রত্যাখ্যান করার মত সাহস এদেশেব কোন লোকের ছিল না। পরন্তু প্রত্যেকেই অতীব সন্তুষ্টির সহিত রাজ প্রদত্ত খেলাত ও সম্পত্তি গৌরবেব চিহ্ন স্বরূপ গ্রহণ কবিতেন যবনেব দান অস্বীকার করার পরও উহার কর এক আনা ধার্য করিয়া পুনরায় তাঁহাকে প্রদান করার কথা নিছক আজগুবি গল্প। তদ্ব্যতীত সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের সন্তান হোসেন দেশব্যাপী মুসলমান রাজত্ব ও প্রতাপ থাকা সত্বেও সেদিকে না গিয়া হিন্দু জমিদারের চাকুরী গ্রহণ করা একটি অবিশ্বাস্য ও অস্বাভাবিক ব্যাপার। মুর্শিদাবাদে সুবুদ্ধি রায় নামে কোন রাজার সঠিক ইতিহাস পাওয়া যায় না—গৌড়ের তো কথাই নাই। গল্পটি শুধু অতিবঞ্জন নহে, অসত্যও বটে। সতীশবাবু গল্প দুইটির উপব জোর দিয়া বলিয়াছেন, "তাই গোপালন নিরত নগণ্য বালক স্বীয় প্রতিভাবলে একদিন গৌড়ের রাজ তখ্‌তে উপবিষ্ট হইয়া বিশাল বিস্তীর্ণ রাজ্য রামরাজ্যের মত শাসন করিয়াছিলেন।" ইহার উপর অধিকতর সমালোচনা নিষ্প্রয়োজন মনে করি।

যাহা হউক বিদ্যাশিক্ষায় সবিশেষ উন্নতি ও পারদর্শিতা লাভ করিয়া হোসেন গৌড় রাজ দরবারে পরিচিত হন। তিনি আত্মনির্ভরশীল মনীষী ছিলেন। তাঁহার সুন্দর মুখাকৃতি, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও সদালাপে সকলেই মুগ্ধ হইত। স্বীয় প্রতিভাবলে হোসেন হাবসী শাসক মোজাফফর শাহের উজির পদে উন্নীত হন। সুলতানের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া প্রজাগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এই সুযোগে মন্ত্রীপ্রবর আলাউদ্দিন হোসেন বিদ্রোহী প্রজাদের দলে যোগদান করেন। বিদ্রোহীদের সহিত যুদ্ধে মোজাফফর নিহত হন। গৌড়ের

আমীর ওমরাহগণ একযোগে সমাজের অগ্রদূত হোসেনকে রাজ সিংহাসনের ভারার্পণ করেন।

রাজ্যারোহণের পর হোসেন শাহ গৌড় হইতে উড়িষ্যা পর্যন্ত সমগ্র ভূখণ্ডে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করেন। তিনি কামরূপ ও কামাখ্যা রাজ্যের রাজগণকে পরাজিত করিয়া অগণিত অর্থ সঞ্চয় করেন। জৌনপুরের সুলতান হোসেন শাহ শর্কীকে আশ্রয় প্রদানের জন্য ক্রুদ্ধ হইয়া দিল্লীর সম্রাট সেকন্দার লোদী ১৪৯৫খৃঃ বঙ্গদেশ আক্রমণ করিলে আলাউদ্দিন হোসেন তাঁহার সহিত সন্ধি স্থাপন করেন। একখানি আরবী শিলালিপি হইতে জানা যায় যে হোসেন ত্রিপুরা রাজ্যের একাংশ অধিকার করিয়াছিলেন। সুন্দরবনের প্রান্তসীমা পর্যন্ত দক্ষিণে তাঁহার রাজ্য বিস্তৃত ছিল। বৃন্দাবন দাস ছত্রভোগের উল্লেখ করিয়াছেন। আজীবন যুদ্ধ বিগ্রহের পর দোর্দণ্ড প্রতাপে রাজ্যশাসন করিয়া গৌড়ের শ্রেষ্ঠ স্বাধীন নরপতি সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ ১৫২০ অন্যমতে ১৫১৯ খৃষ্টাব্দে ইহধাম ত্যাগ করেন। তিনি মালদহের কাটরায় একটি মসজিদ, ঢাকার আজমনগরে একটি মসজিদ, গৌড়ে একটি তোরণ, মালদহ ইংরেজ বাজারে একটি বিদ্যালয় এবং একটি সেতু, পাণ্ডুয়ার বিখ্যাত আউলিয়া নুর কুতুব-উল-আলমের সমাধি সৌধ এবং গৌড় দুর্গের তোরণ নির্মাণ করিয়াছিলেন।

রিয়াজউস সালাতীন অনুসারে হোসেন শাহ সপ্তবিংশতি বর্ষ বা উনত্রিংশ বর্ষ রাজত্ব করেন। অশান্তি ও অরাজকতার যুগে তিনি দেশব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী সুলতান ছিলেন। তাঁহার রাজত্বে প্রজাগণ পরম সুখে বাস করিত। এখনও লোকে সে যুগের কথা স্মরণ করিয়া আক্ষেপের সহিত বলিয়া থাকে, "সে হোসেনী আমল আর নাই।" হোসেন শাহ শান্তি ও সুশৃঙ্খলার সহিত রাজ্যশাসন করিতেন। তাঁহার সহৃদয়তা ও ন্যায়পরায়ণতার কথা প্রবাদ বাক্যে পরিণত হইয়াছে। রিয়াজউস সালাতীনের লেখক বলেন, "মন্ত্রী থাকাকালে তিনি জনসাধারণের সহিত অত্যন্ত সংব্যবহার করিতেন। রাজ্যের আমাত্যবর্গের সহিত তিনি অন্তরঙ্গ বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করিতেন। "জাতিধর্ম নির্বিশেষে তিনি নিরপেক্ষভাবে প্রজাপালন করিতেন।

জনৈক বৈষ্ণব কবি ভক্তি গদগদ কণ্ঠে বলিয়াছেন :—

"শ্রীযুক্ত হসন, জগৎভূষণ, সেহ এ বস জান।
পঞ্চ গৌড়েশ্বর, ভোগপুরন্দর ভনে যশোরাজ খান॥"

মহাভারতের অনুবাদক কবীন্দ্র পরমেশ্বর লিখিয়াছেন :—

"নৃপতি হুসেন শাহ হয়ে মহামতি।
পঞ্চম গৌড়েতে যার পরম সুখ্যাতি॥
অস্ত্রশস্ত্রে সুপণ্ডিত মহিমা অপার
কলিকালে হইব যেন কৃষ্ণ অবতার॥"

হোসেন শাহের সময় শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব হয়। ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে শ্রী চৈতন্য জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করেন। ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে তিনি দেহত্যাগ করেন। শ্রীচৈতন্য একজন মহাপুরুষ ছিলেন। হিন্দু সমাজ জীবনে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত নব ধর্মমতের ঝংকার বাজিয়াছিল। পরম করুণাময়ের নামের মাহাত্ম কীর্তনই তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মতের সারমর্ম। অসংখ্য হিন্দু ধর্মাবলম্বী তাঁহার মতবাদে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিল। বহু মুসলমানের উপরও শ্রীচৈতন্যের প্রভাব পড়িয়াছিল সে কথা পরে বর্ণনা করিতেছি।

শ্রীচৈতন্যের পিতার নাম জগন্নাথ মিশ্র এবং মাতার নাম শচী দেবী। তাঁহার বিশ্বম্ভর নামকরণ হয়। বাল্য নাম নিমাই। গৌর কান্তির জন্য ভক্তগণ তাঁহাকে গৌরাঙ্গ বলিত। ডক্টর শহিদুল্লাহ চৈতন্যকে একেশ্বরবাদী বলিয়াছেন। পক্ষান্তরে মওলানা আকরম খাঁ বলেন :— "তাঁহার জীবন চরিতের সকল অংশে আমরা এইরূপ অসংখ্য প্রমাণ পাই যে, তিনি ছিলেন একজন গোঁড়া মূর্তি পূজক।"

হোসেন শাহ জাতিধর্ম নির্বিশেষে নিরপেক্ষভাবে রাজকর্মচারীদিগকে খেতাব বিতরণ করিতেন। গুণীর সমাদর করা তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট। তাঁহার অন্যতম অমাত্য গোপীনাথ বসুকে তিনি পুরন্দর খাঁ উপাধি দিয়াছিলেন। পুরন্দর খাঁর পর তাঁহার উজির হইয়াছিলেন রূপ ও সনাতন। লঘুতোষিনী নামক গ্রন্থ হইতে রূপ ও সনাতনের পরিচয় পাওয়া যায়।

এই দুই ভ্রাতা যশোর জিলার কৃতি সন্তান। যশোর জিলার চেঙ্গুটিয়া রেলওয়ে ষ্টেশনের এক মাইল পশ্চিমে প্রেমভাগ গ্রাম অবস্থিত। এই গ্রামের কুমার নামক এক ব্রাহ্মণের রূপ ও সনাতন নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করে। উভয়ে শ্রীচৈতন্যের শিষ্যত্ব লাভ করেন।

সনাতন অতি অল্প বয়সে হোসেন শাহের রাজসরকারে প্রবেশ করেন এবং স্বীয় অসাধারণ প্রতিভা বলে বিশেষ উন্নতি লাভ করেন। কয়েক বৎসর পবে রূপও তাঁহার সঙ্গে সরকাবী পদে অধিষ্ঠিত হন। অল্প দিনেব মধ্যে উভয় ভ্রাতা রাজ্যের প্রধান অমাত্য শ্রেণীভুক্ত হন। হোসেন শাহ্ সনাতনকে অসাধারণ বুদ্ধি কৌশলের জন্য "শাকব মল্লিক" এবং রূপকে তাহার সাহিত্য প্রতিভার জন্য "দবির খাশ" উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন।

কথিত আছে যে বহুদিন বাজকার্য পরিচালনাব পর রূপ ও সনাতন রাজ্যমধ্যে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। হোসেন শাহ ও যথাসময়ে সতর্কতা অবলম্বন করিয়া সনাতনকে ভৎ´সনা করিয়া বলেন :—

"তোমাব বড় ভাই করে দস্যু ব্যবহার।
জীব বহু মারি কৈল চাকলা ছারখার
হেথা তুমি কৈলে আমার সর্বনাশ।"

(বিশ্বকোষ)

অচিরাৎ উভয় ভ্রাতার বুঝিতে বাকী রহিল না যে বাদশাহ্ তাঁহাদের গোপন ছলচাতুরী সবই অবগত আছেন। সম্রাট আকবরের ন্যায় গৌড়-সুলতান হোসেন জাতিধর্ম নির্বিশেষে অমাত্য নিয়োগ করিতেন। এই সব অমুসলীম মন্ত্রী বাদশা'র প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন আবার গোপনে ষড়যন্ত্র করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। উভয় ভ্রাতা বৈরাগ্যের ছলনায় রাজকর্ম ত্যাগ করিয়া সুলতানের চোখে ধুলা দিয়া গোপনে শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে মিলিত হন। বাদশাহ ইহার পূর্বেই সনাতনকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন। সনাতন কারারক্ষীকে বিপুল অর্থ উৎকোচ দিয়া কারাগার হইতে গোপনে মুক্তিলাভ করেন।

শ্রী চৈতন্যের সহিত মিলিত হইবার পূর্বে রূপ সুলতান হোসেনের প্রতি যে স্তোতবাক্য বলিয়াছিলেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"মোরে কেন পুছ তুমি পুছ আপন জন
তুমি নরাধিপ হও বিষ্ণু অংশ নম।"

ইহার পর দুইভাই যবন হরিদাস ও শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে যাত্রা করিয়া সংসার ত্যাগ করেন। রাজধানী গৌড় ত্যাগের পর ভ্রাতৃদ্বয়ের কি অবস্থা হইয়াছিল সে কথাও চৈতন্য চরিতামৃতে উল্লেখ আছে :—

"শ্রীরূপেরে শিক্ষা দিয়া পাঠাল্যা বৃন্দাবন
আপনে করিল বারানসী আগমন
কাশীতে প্রভুরা আসি মিলিল সনাতন
দুইমাস বহি তারে করল্যা শিক্ষণ
মথুরা পাঠাল্যা তারে দিয়া ভক্তি বল
সন্ন্যাসীরে কৃপা করি গেলা নীলাচল।"

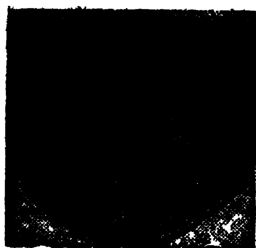
সন্ন্যাসব্রত গ্রহণের পর সম্ভবতঃ তাঁহারা পৈতৃক বাসভূমিতে ফিরিয়া আসেন নাই। রূপ সনাতনের সময় যশোরের প্রেমভাগ গ্রামে তাঁহাদের খনিত কতিপয় দীঘি ও পাকা ইমারতের ভগ্নাবশেষ আছে। বিশ্বকোষে চেঙ্গুটিয়ার সন্নিকটে রূপ সনাতনের প্রতিষ্ঠিত মঠের উল্লেখ আছে। তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত কীর্তিচিহ্ন এখন বিলুপ্তপ্রায়। ১৫৫৮ খৃষ্টাব্দে সনাতন এবং পর বৎসর রূপ দেহত্যাগ করেন।

নাসিরউদ্দিন নসরৎ শাহ সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের অষ্টাদশ পুত্রের অন্যতম। পিতার প্রথম পুত্র হিসাবে এবং বীরত্ব ও প্রতিভার জন্য অমাত্যগণ কর্তৃক তিনি রাজ্যারোহণের জন্য মনোনীত হন। পারস্য ভাষায় ফিরিশ্তা রচিত ইতিহাসে তিনি 'নাসিরশাহ' নামে পরিচিত। নসরৎ শাহের রাজত্বকালে গৌড়ের মুসলমানগণ অহম রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে পর্তুগীজগণ সর্বপ্রথম বাংলাদেশে আগমন করেন। এই পর্তুগীজদের বাসভূমি ইউরোপের অন্তর্গত পর্তুগালে। স্পেন ও এই দেশ মুসলমানেরা (মূরগণ) কয়েক শতাব্দী ধরিয়া দোর্দণ্ড প্রতাপে শাসন করে। মূরদের পতনে এদেশ

আবার খ্রীষ্টান রাজার অধিকারে আসে। ইহারা সমুদ্রপথে জাহাজ ও নৌকা-যোগে দক্ষিণ-বঙ্গে প্রবেশ করিয়া লুঠতরাজ করিত। সেইজন্য ইহাদের পর্তুগীজ জলদস্যু (Pirates) বলা হইয়া থাকে। পর্তুগীজ শাসক নুনো দা কানহা বঙ্গদেশে আধিপত্য বিস্তারের জন্য ১৫২৮ খৃষ্টাব্দে মার্টিন আলফোনসোকে এদেশে প্রেরণ করেন। জাহাজডুবি হওয়ায় তিনি চট্টগ্রামে খোদাবক্স খানের হস্তে বন্দী হন। এই সময় হইতে পর্তুগীজদের সহিত নসরৎ শাহের গোলযোগ আরম্ভ হয় এবং সুলতান নসরতের আদেশে বহু পর্তুগীজ নিহত ও দেশান্তরিত হয়। প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে গিয়া পর্তুগীজগণ চট্টগ্রাম শহর ভস্মীভূত করিয়া দেয়। ইহাতে নসরৎ শাহ ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদের প্রতি কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। ফলে পর্তুগীজগণ চরম বিপদের মধ্যে নিপতিত হয়।

নসরত শাহ রাজ্যের বিভিন্ন টাঁকশাল হইতে মুদ্রাঙ্কণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নির্মিত অনেকগুলি প্রাচীন কীর্তি বিদ্যমান থাকিয়া তাঁহার সুনাম ঘোষণা করিতেছে। তিনি বর্ধমান জিলার মঙ্গলকোট এবং রাজশাহীর বাঘা নামক গ্রামে দুইটি মসজিদ, গৌড়ের সুবিখ্যাত সোনা মসজিদ বা বার দুয়ারী নির্মাণ করেন। তিনি মহানবী হযরত মোহাম্মদের পদচিহ্ন রক্ষার জন্য একটি মসজিদ নির্মাণ করেন, উহা কদম রসুল নামে সুপরিচিত। নসরৎ নিরপেক্ষ, ন্যায়পরায়ণ ও বিদ্যোৎসাহী নৃপতি হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁহার পূর্বে "পাণ্ডব বর্জিত" বঙ্গে বাংলা ভাষায় কেহ মহাভারতের অনুবাদ করিতে সাহসী হন নাই। তিনি উহার বঙ্গানুবাদের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বাঙ্গালী জাতিয়তা ও দেশাত্ববোধ প্রতিষ্ঠায় হোসেনশাহী রাজাদের দান অপরিসীম।

স্যার উলসে হেইগ বলেন, "মুসলমানদের পূর্বে কোন হিন্দু রাজা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেন নাই।" বাংলা ভাষা ও সাহিত্য মুসলীম সুলতানদের হাতে পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। হোসেন শাহ ও তৎপুত্র নসরতের নাম বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক হিসাবে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। নসরৎ শাহ যখন পরম বিক্রম ও শৌর্যবীর্যের সহিত দেশ শাসন করিতেছিলেন তখন রাজাদেশে কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকর নন্দী ও শ্রীধর নামক অসাধারণ পণ্ডিতত্রয় মহাভারতের বঙ্গানুবাদ করেন। শ্রীগোপাল হালদার তদীয় বাংলা



(ক)



(খ)



(গ)



(ঘ)



(ঙ)



(চ)

তুর্ক-আফগান আমলের মুদ্রা—

(ক) দনুজমর্দনের মুদ্রা
(খ) ঐ
(ঙ) নসরৎ শাহের মুদ্রা
(গ) মাহমুদ শাহের মুদ্রা
(ঘ) খলিফাতাবাদের মুদ্রা
(চ) নসরত শাহের মুদ্রা

সাহিত্যের রূপরেখা গ্রন্থে বলিয়াছেন, "মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য হুসেন শাহ ও তাঁর পুত্রের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। হুসেন শাহী রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় এবার তাই বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়ে উঠলো।" তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন, "বাংলা সাহিত্যের ভাগ্যাকাশে হুসেন শাহ ও নুসরত শাহ দুই উজ্জ্বল নক্ষত্র।"

১৫২৬ খৃষ্টাব্দে লোদী বংশের শেষ প্রদীপ সুলতান ইব্রাহিম বাবরের হস্তে পানিপথের যুদ্ধে নিহত হইলে দিল্লীর সিংহাসন মোঘল অধিকৃত হয় এবং পাক-ভারতে তুর্ক-আফগান রাজত্বের সমাধি প্রাপ্তি হয়। এই সময় বহু আফগান অমাত্য ও রাজকর্মচারী গৌড় সুলতানের আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইব্রাহিম লোদীর ভ্রাতা মাহমুদ বহু অমাত্য এবং সম্রাটের এক কন্যাসহ গৌড়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। মহা ধুমধামের সহিত ইব্রাহিম লোদীর কন্যার সঙ্গে নসরৎ শাহের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছিল। এই সময় হইতে স্বাধীন বাংলার উপর একে একে নানাপ্রকার বিপদ আসিতে থাকে।

একদা নসরৎ শাহ পিতার সমাধি দর্শনের জন্য গৌড়ে গমন করেন। পূর্বাক্রোশ বশতঃ জনৈক খোজা অন্যান্য খোজাদের সহিত মিলিত হইয়া ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে নিহত করেন। নসরত শাহের বহু রজত মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সকল মুদ্রা নসরতাবাদ, ফতেহাবাদ, হোসেনাবাদ (সপ্তগ্রাম) খলিফাতাবাদ (বাগেরহাট) ও মোহাম্মদাবাদ (উত্তর যশোর) টাঁকশাল হইতে মুদ্রিত হইয়াছিল। স্বাধীন সুলতানগণের আমলে বঙ্গদেশে মোট ২১টি টাঁকশাল ছিল।

খলিফাতাবাদ বা বাগেরহাটের তিন প্রকার রৌপ্য মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। উহার দুইটি নসরত শাহের এবং তৃতীয়টি তদীয় ভ্রাতা পরবর্তী সুলতান আবুল মোজাফফর মাহমুদ শাহের নামাঙ্কিত। প্রথম দুইটির তারিখ ৯২২ হিজরী বা ১৫১৬ - ১৭ খৃষ্টাব্দ এবং তৃতীয়টির তারিখ ৯৪২ হিজরী বা ১৫৩৫ - ৩৬ খৃষ্টাব্দ। কলিকাতার যাদুঘরে এই তিন প্রকার মুদ্রা রক্ষিত আছে। মুদ্রাগুলি পারস্য ভাষায় লিখিত। নিম্নে উহার বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল :

—প্রথম পৃষ্ঠা "রাজা, রাজপুত্র পৃথিবীর মধ্যে বিশ্বাসবান এবং ধর্মভীরু আবুল মোজাফফর," অপর পৃষ্ঠায় আছে "নসরত শাহ, সুলতান হোসেন

বংশীয় রাজা হোসেন শাহের পুত্র, আল্লাহ্ তাঁহাকে এবং তাঁহার রাজ্য রক্ষা করুন — খলিফাতাবাদ, ৯২২।" তৃতীয় প্রকার মুদ্রায় এইরূপ লিখিত আছে — "রাজা, রাজপুত্র, পৃথিবীর মধ্যে বিশ্বাসবান ও ধর্মপরায়ণ আবুল মোজাফফর মাহমুদ খলিফাতাবাদ ৯৪২," অপর পৃষ্ঠায় আছে, "বাদশা, রাজা, সুলতান হোসেন শাহের পুত্র, আল্লাহ্ তাঁহাকে, তাঁহাব রাজ্য রক্ষা করুণ।" মিঃ এইচ নেলসন রাইট কর্তৃক লিখিত "ষ্ট্যাটিসটিক্স ক্যাটালগ অব কয়েন্স ইন ইনডিয়ান মিউজিয়াম." দ্বিতীয় ভাগ পুস্তকে নসরত শাহী মুদ্রার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

খলিফাতাবাদের সঙ্গে নসরত শাহেব ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল। কেহ কেহ বলেন নসরৎ পিতার জীবদ্দশায় বিদ্রোহ করিয়াছিলেন এবং সুন্দরবন অঞ্চলে আসিয়া নদী-নালা বেষ্টিত ও জঙ্গলাকীর্ণ খলিফাতাবাদ শহব হইতে স্বীয় নামে মুদ্রাঙ্কণ কবিয়াছিলেন। খানজাহানের মৃত্যুব প্রায় ৬০ বৎসর পরে নসরৎ শাহ বাগেরহাটে আসিয়া তথায় টাঁকশাল স্থাপন করেন এবং পিতার জীবদ্দশায় ১৫১৫ খৃষ্টাব্দে তৎপ্রতিষ্ঠিত ঐতিহাসিক খলিফাতাবাদ টাঁকশাল হইতে নিজ নামে মুদ্রাঙ্কণ করেন। উক্ত মুদ্রায় ইহাই সপ্রমাণিত হয় যে আলাউদ্দিন হোসেন শাহ যখন গৌড়েব শাহী তখ্‌তে সমাসীন ঠিক সেই সময় তদীয় পুত্রের বাগেরহাটে আগমন ও স্বাধীন সুলতানের ন্যায় মুদ্রাঙ্কণ অনেকটা বিস্ময়কর ব্যাপার। ব্লকম্যান, ওমালী প্রমুখ লেখকেরা বলিয়াছেন, "নসরৎ পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া তাঁহারই জীবদ্দশায় বাগেরহাটে মুদ্রাঙ্কণ করিয়াছিলেন। একথা অনুমান করা যাইতে পারে যে বৃদ্ধ বয়সে হোসেন সুন্দরবনাঞ্চলে সুশৃঙ্খল শাসন প্রতিষ্ঠাকল্পে এবং স্বীয় পুত্রকে রাজকার্যে অভিজ্ঞতা অর্জন করিতে মুদ্রাঙ্কণের আদেশ দিয়া খানজাহান প্রতিষ্ঠিত শহরে প্রেরণ করিয়াছিলেন। যে অবস্থায়ই হউক নসরৎ পিতার জীবদ্দশায় বাগেরহাট ও মোহাম্মদাবাদ হইতে স্বনামে স্বাধীন রাজার ন্যায় মুদ্রাঙ্কণ করেন। পূর্ব বর্ণিত নসরৎ শাহী মুদ্রায় সম্ভবতঃ পিতৃভক্তির চিহ্ন স্বরূপ হোসেন শাহের নামও জড়িত আছে। যাহা হউক এই দুইটি টাঁকশালই যশোর-খুলনার মধ্যে অবস্থিত। সে যুগে রেলগাড়ী, ষ্টিমার বা অন্য কোন দ্রুত যানবাহন ছিল না।

সেজন্য সুন্দরবনাঞ্চলে নসরৎ স্বসৈন্যে অভিযান করিয়া স্বাধীন রাজার ন্যায় তথায় কিছুকাল শাসন কার্য পরিচালনা করিলেও সে সংবাদ সহসা রাজধানীতে পৌঁছিত না।

ডক্টর তরফদার বলিয়াছেন :— জীবদ্দশায় হোসেন স্বীয় পুত্র নসরৎকে খলিফাতাবাদ হইতে মুদ্রাঙ্কণ করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। আলাউদ্দিন হোসেন যেরূপ প্রতাপান্বিত রাজা ছিলেন তাহাতে তাঁহার পক্ষে রাজ্যমধ্যে কোন বিদ্রোহীর স্থান ছিল না। গৃহযুদ্ধ বা বিদ্রোহের কোন ইতিহাসও পাওয়া যায় না। হোসেনের পুত্রদের মধ্যে নসরৎ জ্যেষ্ঠ এবং সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ছিলেন। ব্লকম্যান সর্বপ্রথম এই অনিয়ম লক্ষ্য করেন। পিতার রাজত্বকালে নসরৎ ১৫১৫-১৭ খৃঃ পর্যন্ত স্বীয় নামে মুদ্রাঙ্কণ করেন। নসরতের রাজত্বকালে মাহমুদ ১৫২৭-২৯খৃঃ এবং ১৫৩২খৃঃ, মাহমুদের সময় ফিরোজ ১৫৩২-৩৩ খৃষ্টাব্দে স্বাধীনভাবে মুদ্রাঙ্কণ করিয়াছিলেন। এই সমস্ত মুদ্রাঙ্কণ অনিয়ম বলিয়া মনে হয় কিন্তু উহা রাজাদেশেই হইয়াছিল।

কেহ কেহ বলিয়াছেন নসরৎ বা তদীয় পিতা হোসেন শাহের সহিত স্থানীয় সৈন্যের কয়েকটি খণ্ড যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। সেইজন্য বাগেরহাটের সন্নিকটে যুদ্ধ জয়ের চিহ্নস্বরূপ কয়েকটি গ্রামের নামকরণ হইয়াছে রণবিজয়পুর, রণভূম, ফতেপুর ইত্যাদি। নসরৎ শাহ গুণী জ্ঞানী লোকের শক্তি সামর্থের মর্যাদা রক্ষা করিতেন। জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলকে তিনি সমান চক্ষে দেখিতেন। তাঁহার রাজত্বকালে প্রজাগণ পরম সুখে কালাতিপাত করিত।

নসরৎ শাহের আমলে এতদ্দেশে মানব প্রকৃতি অত্যন্ত সরল ও স্বাভাবিক ছিল। তাহারা বড় একটা বহির্জগতের ধার ধারিত না। মুসলমানগণ তাহাদের আপন ধর্মচিন্তা করিত এবং হিন্দুগণ তখন গৌরাঙ্গ প্রবর্তিত নূতন ধর্ম প্রবাহে গা ভাসাইয়া দিত। তাঁহার রাজ্যমধ্যে হিন্দু মুসলমানদের ভিতর কোন অপ্রীতিকর কলহের সুর বাজিয়া উঠিত না বরং পরস্পর সম্প্রীতির সহিত স্ব স্ব ধর্মের আলোচনায় সময় অতিবাহিত করিত। তিনি যোগ্য পিতার যোগ্য পুত্র ছিলেন। পিতার অশেষ গুণাবলী তাঁহার মধ্যে বিদ্যমান ছিল। তিনি মিলন ও আদর আপ্যায়নে অপামর জনসাধারণকে পরিতুষ্ট করিয়া প্রজাসাধারণের

প্রীতিভাজন হন। কথিত আছে তিনি দরিদ্রের হিতার্থে নিশীথে নগর ভ্রমণ করিয়া তাহাদের অভাব মোচনার্থে ও সুবিচার করিবার জন্য সত্যোদ্ধারে রত থাকিতেন।

নসরৎ শাহ বাগেরহাটে কয়েক বৎসর অবস্থান করেন। বর্তমান বাগেরহাট ফৌজদারী আদালতের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত নসরৎ শাহ খনিত পুকুর তাঁহার কীর্তি ঘোষণা করিতেছে। বাগেরহাটে এই জলাশয় 'মিঠাপুকুর' নামে সুপরিচিত। ইহার দক্ষিণ দিকে পাকা ঘাটের চিহ্ন আজিও বিদ্যমান। এই পুকুরের দক্ষিণ পাড়ে নসরৎ শাহের রাজবাটী ছিল। এই স্থান হইতে দক্ষিণ দিকে কিছুদূর পর্যন্ত স্থানে স্থানে মৃত্তিকার নিম্নে পাকা ইষ্টক পাওয়া গিয়াছে। সম্প্রতিকালে কয়েকটি বাটীর ভিত্তি পত্তনের সময় এই ইষ্টক চিহ্ন পরিদৃষ্ট হয়। মিঠাপুকুরের পূর্বতীরের দক্ষিণদিকে যে উঁচু ভিটার চিহ্ন ছিল উহাই ঐতিহাসিক খলিফাতাবাদ টাঁকশাল। বর্তমানে সেখানে নূতন ইমারত নির্মিত হইতেছে। খানজাহানের অসংখ্য কীর্তিরাজির মধ্যে হোসেনী বংশের এই অত্যাবশ্যকীয় কীর্তি সমূহের অনেকেই খোঁজ রাখেন না। খুলনাবাসী হোসেন শাহ ও তৎপুত্র নসরৎ শাহের নাম চিরদিন ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিবে।

কথিত আছে যে নসরৎ শাহ বাগেরহাট শহরে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। উহার কোন চিহ্ন বর্তমানে নাই। খুলনা গেজেটিয়ার প্রণেতা মিঃ ওমালী বলেন যে ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে বাগেরহাট শহরের মিঠাপুকুরের (নসরৎ শাহ খনিত) সংস্কার সাধিত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে মুর্শিদাবাদ নবাবের জায়গীর প্রাপ্তা মহিলা বউ বেগমের অফিস ও ট্রেজারী এই পুকুরের পার্শ্বে ছিল। জায়গীরদার বউবেগম খলিফাতাবাদ পরগনার জমিদারীর ৵৹ বা ছয় আনা অংশীদার ছিলেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর তাঁহাকে জায়গীরের পরিবর্তে অর্থ দেওয়া হইত। ১৭৯৪খৃঃ তাঁহার মৃত্যুর পর উক্ত জায়গীর তুলিয়া দেওয়া হয়।

নসরৎ শাহের মৃত্যুর পর তৎপুত্র আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিন মাস রাজ্যভোগের পর হোসেন শাহের অন্যতম পুত্র গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহ ভ্রাতুষ্পুত্রকে হত্যা করিয়া সিংহাসন

অধিকার করেন। শের খাঁ (শের শাহ) বঙ্গদেশ আক্রমণ করিলে উপায়ান্তর না দেখিয়া গিয়াসউদ্দিন দক্ষিণ বঙ্গে সম্ভবতঃ খলিফাতাবাদে পলায়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার দুইপুত্র শের খাঁর পুত্র জালাল খাঁর আদেশে নিহত হইয়াছেন শুনিয়া হোসেনী বংশের শেষ স্বাধীন সুলতান গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহ শোকে ও দুঃখে ১৫৩৮ খৃঃ কহলগায়ে দেহত্যাগ করেন। গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহের সুবর্ণ ও রজত মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। কতকগুলি রজতমুদ্রা হোসেনাবাদ (সপ্তগ্রাম) ও খলিফাতাবাদ হইতে মুদ্রিত হইয়াছিল।

আইন-ই-আকবরী হইতে জানা যায় যে শের শাহ মোহাম্মদাবাদ আক্রমণ করিলে হোসেন বংশীয় জনৈক নৃপতি যশোবের উত্তরদিকে তাঁহার গতিরোধ করেন। তিনি যুদ্ধে পরাজিত হইয়া অনেকগুলি হস্তী ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন সে বিষয়ের উল্লেখ আছে। পবে ঐ সমস্ত হস্তী খলিফাতাবাদের জঙ্গলে প্রবেশ করিয়া বন্য হইয়া গিয়াছিল।

হোসেন শাহী বংশের কীর্তিরাজি আজিও এতদঞ্চলে বিদ্যমান। ঐতিহাসিক টাঁকশাল ও মিঠাপুকুর ও হোসেন শাহ নামীয় মসজিদ বাগেরহাটেই অবস্থিত তাহা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ঝিনিয়াদহ হইতে ১২ মাইল উত্তরে কুমার নদীর তীরে শৈলকূপা গ্রামে একটি প্রাচীন মসজিদ ও মাজার আছে। ইহা দরগাপাড়া বা মসজিদপাড়ায় অবস্থিত। ইহা নসরৎ শাহ (নাসির শাহ) কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল। এ বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ পরে দেওয়া হইয়াছে। হোসেন শাহী বংশের বিভিন্ন রাজপুরুষের নামে বহু গ্রাম, মৌজা, পরগনা ও শহরের নাম যশোর-খুলনা অঞ্চলে ছিল সে ইতিহাস সুস্পষ্ট। সুন্দরবনাঞ্চলের সহিত এই বংশের সুলতানদের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তন্নিমিত্ত তাঁহাদের ইতিবৃত্ত পৃথকভাবে সন্নিবেশিত হইল।

যবন হরিদাস, রামচন্দ্র খাঁ ও লক্ষহীরা

॥ দশ ॥

যে সময় পাক ভারতে তুর্ক-আফগান রাজত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং বঙ্গের সুলতানগণ দিল্লীর সহিত সম্পর্কচ্ছেদ করিয়া স্বাধীনভাবে গৌড়ের শাহী তখ্‌তে সমাসীন সেই সময় হিন্দু সমাজে এক অভূতপূর্ব আন্দোলন দেখা দেয়। ধর্মীয় জগতে ইহা বৈষ্ণব মতবাদ বলিয়া পরিচিত। নিমাই সন্ন্যাসী বা শ্রীচৈতন্যই এই বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তক। তাঁহার আবির্ভাবে হিন্দুধর্মে এক যুগান্তর সৃষ্টি হয় এবং বঙ্গদেশে এই নব মতের ঢেউ খেলিয়া যায়। শ্রীচৈতন্যের পরিচয় আমরা পূর্বাধ্যায়ে সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছি। এখন আমরা তাঁহার অন্যতম শিষ্য হরিদাসের বিষয় আলোচনা করিব। ইতিহাসে ইনি যবন হরিদাস নামে পরিচিত। তাঁহার জন্মস্থান খুলনা জিলার সাতক্ষীরা অঞ্চলে এবং কর্মস্থল যশোর জিলায়। সেইজন্য এই দুই জিলার ইতিহাসে তাঁহার নাম বিশেষভাবে জড়িত। এই যুগে আরও কয়েকজন হরিদাস ছিলেন। তন্মধ্যে দুইজন "কীর্তনীয়া" হরিদাস। এই মহাত্মার নাম যবন হরিদাস কেন সে প্রশ্ন সততই মনে জাগরুক হওয়া স্বাভাবিক। প্রবাদ এই যে হরিদাস মুসলমান বা যবনকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন তিনি হাকিমপুরের কাজী বংশের সন্তান। বৈষ্ণব গ্রন্থে তিনি "হীনকুলে জাত" আবার মুসলমান নরপতি হোসেন শাহ তাঁহাকে মহাবংশজাত বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। এইজন্য অনেকে তাঁহাকে মুসলমান সন্তান বলিয়া মনে করেন। বৃন্দাবন দাস এই মতের প্রধান সমর্থক। হাকিমপুরের কাজীদের ঘরে তাঁহার জন্ম, সে সম্পর্কে কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। কাজী বংশের মধ্যেও এইরূপ কোন প্রবাদ বংশানুক্রমে চলিয়া আসে নাই। আমরা বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া এই মতে উপনীত হইয়াছি যে হরিদাস হিন্দু সন্তান। জয়ানন্দ বলিয়াছেন তাঁহার মায়ের নাম উজ্জ্বলা এবং পিতার নাম মনোহর। অন্যমতে হরিদাসের পিতার নাম সুমতি শর্মা এবং মাতার নাম গৌরীদেবী।

ডঃ শহিদুল্লাহ বলিয়াছেন ঃ— "আমরা মনে করি হরিদাস চৈতন্যের ভক্ত হইলেও তিনি দরবেশ ছিলেন, হিন্দু ছিলেন না। তিনি প্রত্যহ তিনলক্ষ হরিনাম জপ করিতেন। এক দরবেশ সম্প্রদায়ের মতে ঈশ্বরের কোন নাম নাই। যে নামে তাঁহাকে ডাক তিনি সাড়া দেন। হরিদাস জগন্নাথ মন্দিরে যাওয়ার কথা দূরে থাক, মন্দিরের কাছাকাছি পথে ঘাটেও বাহির হইতেন না। তাঁহার প্রতিমা পূজার কথা বৈষ্ণব গ্রন্থে নাই। মৃত্যুর পর তাঁহাকে সমুদ্রতীরে কবর দেওয়া হইয়াছিল।" পক্ষান্তরে ডঃ তরফদার বলেন ঃ— হরিদাসের ধর্মান্তিকরণ এবং তাঁহার জীবনেতিহাস অন্ধকারাচ্ছন্ন। চৈতন্য চরিতামৃত, চৈতন্য ভাগবৎ, আদিভূত প্রকাশ, প্রেমাভিলাষ, ভক্তিরত্নাকর প্রভৃতি গ্রন্থের কোথাও নাই যে তিনি মুসলমানের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। যবন শব্দ কিভাবে তাঁহার নামের পূর্বে যুক্ত হয় জানা যায় নাই। সম্ভবতঃ মুসলমানের ঘরে পালিত হইয়া এইরূপ হইয়াছে। ঈশান সাগরের আধ্যাত্ম প্রকাশে এ বিষয়ের ঈঙ্গিত আছে।

এখন প্রশ্ন এই যে তিনি হিন্দু সন্তান হইয়াও কেন যবন আখ্যা প্রাপ্ত হইলেন ? বৈষ্ণব গ্রন্থানুসারে হরিদাস ১৩৭২ শকে বা ১৪৫০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন যে পীরালী সম্প্রদায় যখন সাতক্ষীরা অঞ্চলে বিস্তার লাভ করে সেই সময় হরিদাসের পিতামাতা ইসলাম গ্রহণ করেন। বালক হরিদাস হাকিমপুরের কাজীদের বাড়ীতে লালিত পালিত হন। এইজন্য লোকে তাঁহাকে মুসলমান বলিয়া জানিত। কিন্তু এই অনুমানের মধ্যেও কোন ঐতিহাসিক সত্য নিহিত আছে বলিয়া মনে করি না। সতীশ বাবু নিঃসন্দেহে তাঁহাকে হিন্দু-সন্তান বলিয়াছেন। রাজশাহী বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত সুন্দরবন সম্পর্কিত পুস্তিকায় কালীদাস দত্ত বলিয়াছেন, "সাধু হরিদাস ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন (Converted Muslim)।" কিন্তু একথাও আদৌ ঠিক নহে।

গোপাল হালদার বলিয়াছেন :— "ভক্ত হিসাবে হরিদাসের তুলনা নাই। তিনি জন্মেছিলেন মুসলমানের ঘরে, কিন্তু শুধু এক মুসলমানী জন্ম ছাড়া কোরাণ-হাদিস সম্মত আচরণের কোন চিহ্ন তাঁর ছিল না। তাঁকে নিয়েই

নবদ্বীপের মুসলমান সমাজের সঙ্গে চৈতন্যমণ্ডলীর কলহ দেখা দেয়।" যবন হরিদাস সম্পর্কে আমরা মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ ও ডক্টব মোহাম্মদ শহিদুল্লাব সঙ্গে আলোচনা কবিয়াছি। মওলানা সাহেবের গ্রাম হাকিমপুব। তিনি বলিয়াছেন :— "তাঁহাব গ্রামেব সহিত হরিদাসেব কোন সম্পর্ক ছিল না।" ঐ সময় হিন্দুধর্ম পুনর্জীবনেব আন্দোলন সৃষ্টি হয়। ইসলামের সাম্যবাদে মুগ্ধ হইয়া বহু হিন্দু ইসলাম গ্রহণ কবিতে থাকে। ইহারই পবিপ্রেক্ষিতে হিন্দু সমাজ জীবনে আলোড়নের সৃষ্টি হয়। মূর্তি পূজাব অসাবতা সম্পর্কে জনমত সৃষ্টি হইতে থাকে। এহেন ধর্ম বিবর্তনের যুগ সন্ধিক্ষণে বঙ্গদেশে শ্রীচৈতন্য এবং পঞ্জাবে গুরু নানকের আবির্ভাব হয়। উভয়ে হিন্দু ধর্মেব সংস্কাবক হিসাবে খ্যাতিলাভ কবিয়াছেন। তাঁহাদেব একেশ্বরবাদী নীতি ইসলাম হইতে গৃহীত। অনুরূপ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইযা পববর্তীকালে বাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্ম সমাজের সৃষ্টি কবেন। ইহাব মূলমন্ত্র "এক ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি।" কবি সম্রাট রবীন্দ্রনাথও এই সমাজভুক্ত ছিলেন। যাহা হউক ডক্টব শহিদুল্লাহ বলিয়াছেন যে, যবন হরিদাস ইসলামেব মূলমন্ত্রে বিশ্বাসী বলিয়া একমাত্র 'হরিনাম' জপ ছিল তাঁহার ধর্ম। তিনি কোনদিন কোন দেবমূর্তিব প্রতিষ্ঠা বা পূজাপার্বনাদি করেন নাই। সেজন্য ডক্টব শহিদুল্লাহ তাঁহাকে শরিয়ত পরিপন্থী কার্যকলাপের জন্য "বে-শবা" ফকিব বলিয়া অভিহিত করিযাছেন।

অনেকেই অনুমান করেন হরিদাস সোনাই নদীব তীবে এক নিম্নশ্রেণীর হিন্দুর ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। সেইজন্য তাঁহাকে "হীন কুলজাত" বলা স্বাভাবিক বলিয়া মনে করি। তাঁহার জন্মভূমি কলারোয়া অঞ্চলে। প্রবাদ আছে যে তিনি হিন্দু সন্তান। পিতামাতার অকাল মৃত্যুতে হরিদাস নিরাশ্রয় অবস্থায় পতিত হন। এই সময় দয়াপরবশ হইয়া কারিকর সম্প্রদায়ের জনৈক বিধবা তাঁহাকে পুত্রবৎ লালন পালন করিয়াছিলেন। হরিদাস হিন্দু সন্তান, নিজে সে কথা জানিতেন এবং তাঁহার আশ্রয়দাতাও তাঁহাকে মুসলমান ধর্মে দীক্ষা দিতে কোন প্রকারে চেষ্টিত হন নাই। মুসলমান ঘরে কিছুদিন লালিত পালিত হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে বৈষ্ণব যুগে যবন আখ্যা দেওয়া হইয়াছিল। ইহাই আমাদের সুচিন্তিত অভিমত। হরিদাসের জন্মভূমিতে এখনও এই

তি প্রবল। জনশ্রুতিরও যথেষ্ট মূল্য আছে, উহা আমরা অগ্রাহ্য করিতে া। বিভিন্ন বৈষ্ণব গ্রন্থে হরিদাসের জন্মকথা সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন মত করা হইয়াছে। সমস্ত বৈষ্ণব গ্রন্থও সমসাময়িক নহে। ইহার ভিতরও ট থাকা স্বাভাবিক। হরিদাস সম্পর্কে চৈতন্য চরিতামৃতে বর্ণিত আছে :—

"এবে শুন হরিদাস ঠাকুবেব কথা
যাহার শ্রবণে কৃষ্ণ পাইয়ে সর্বথা
বুড়ন গ্রামেতে অবতীর্ণ হরিদাস
সে ভাগ্যে সে সব দেশে কীর্তন প্রকাশ
কথোদিন থাকিয়া আইলা গঙ্গাতীরে
আসিয়া রহিলা ফুলিয়ায় শান্তিপুবে।"

এই বুড়ন গ্রাম কোথায়? ইহার প্রকৃত অবস্থান কোথায় ছিল জানা যায় না। তবে বুড়ন দ্বীপ বা বৃদ্ধদ্বীপ বহু পূর্ব হইতে ছিল। সে বিষয় গ্রন্থের প্রারম্ভেই বর্ণনা কবিয়াছি। বুড়ন বর্তমানে খুলনা জিলার একটি পরগণা এবং সাতক্ষীরা এই বুড়ন পরগনার অন্তর্গত। বিশ্বকোষে বুড়নকে বর্তমান বনগ্রাম বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কালী প্রসন্ন ঘোষও এই মতের পোষকতা করেন, কিন্তু তাহা ঠিক নহে। বনগ্রামেব নিকট সোনাই নদী নাই এবং সমস্ত প্রকার উৎস হইতে জানা যায় যে সোনাই নদী তীবেই হরিদাসের জন্ম হয়। জয়ানন্দ প্রণীত চৈতন্য মঙ্গলে আছে :

"স্বর্ণ নদী তীরে ভাট কলাগাছি গ্রামে
হীন কুলে জন্ম হয় উপরি পূর্ব নামে।"

কবি জয়ানন্দ শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক। সেইজন্য তাঁহার মতই গ্রহণযোগ্য। এই কবিতা হইতে আমরা হরিদাসের জন্মস্থান ভাটকলাগাছি জানিতে পারি। সতীশবাবু বলিয়াছেন, "ভাট কলাগাছি একটি গ্রামের নাম নহে, উহা জোড়া গ্রাম। বুড়ন পরগনায় এখনও স্বর্ণনদী বা সোনাই নদী আছে এবং উহার কুলে ভাটলা বা ভাটপাড়া এবং কলাগাছি বা কেড়াগাছি নামে দুইটি পাশাপাশি গ্রাম এখনও আছে।" এই বর্ণনায় কিছু ভুল আছে। আমরা অনুসন্ধানের পর জানিতে পারিয়াছি যে ভাটলা বা ভাটপাড়া নামীয় কোন গ্রাম ছিল না।

তবে ভাদলী গ্রাম পূর্বেও ছিল, এখনও আছে। এই ভাদ্‌লীর পার্শ্বে প্রাচীন কেলাগাছি গ্রাম। কেলা ফার্সি শব্দ এবং এই কেলাগাছি হইতে কেড়াগাছি নামের উৎপত্তি হইয়াছে। উহাকে কলাগাছিও বলা হইত। ভাটলা বা ভাটপল্লী নাম হইতে ভাট শব্দের উৎপত্তি হয় নাই। ভাদ্‌লীর "লী" বাদ দিয়া ভাদ্‌ থাকে এবং উহা হইতেই ভাট্‌ শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। সোনাই নদীর তীরে এখনও ভাদলী ও কেড়াগাছি গ্রামদ্বয় বিদ্যমান। কেড়াগাছি গ্রামে হরিদাসের সাধনপীঠ ছিল। ঐ স্থানে বসতবাটী স্থাপিত হইয়াছে। তবে পীঠস্থান এখনও সুরক্ষিত থাকিয়া হরিদাসের স্মৃতি বহন করিতেছে। পূর্বে এখানে একটি স স্কৃত টোল ছিল।

যাহা হউক বাল্যকাল হইতেই হরিদাস ধর্ম ভাবাপন্ন ছিলেন। বিশ বৎসর বয়সে তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া যশোর জিলার অন্তর্গত বেনাপোলে আগমন করেন। তখন বেনাপোল অঞ্চল গভীর অরণ্যে সমাচ্ছন্ন ছিল। রাস্তাঘাট ও মনুষ্য বসতির চিহ্ন খুবই কম ছিল। হরিদাস বেনাপোলের জঙ্গল মধ্যে নিজ বাসের জন্য একখানি কুটীর নির্মাণ করেন এবং তথায় তুলসী বৃক্ষ রোপণ করিয়া উহার পার্শ্বে সাধনায় রত থাকেন। এই স্থানকে হরিদাসের সাধনপীঠ ও তুলসীমঞ্চ বলা হয়। পাক্‌ সীমান্তে বেনাপোল ষ্টেশনের অদূরে উত্তর পূর্বদিকে এই তুলসীমঞ্চ অবস্থিত। এই স্থানে বসিয়া হরিদাস নাম জপ করিতেন। সাধারণ লোকের নিকট উক্ত স্থান পাটবাড়ী বলিয়া সুপরিচিত। হরিদাসের তুলসী মঞ্চে কোন তুলসী বৃক্ষ নাই। তবে কয়েকটি ফুলের গাছ ঐ মঞ্চকে ছায়াদান করিতেছে। একটি ইষ্টক নির্মিত বেদী হরিদাসের যজ্ঞস্থানের সাক্ষ্য বহন করিতেছে। তুলসী মঞ্চের উত্তর দিকে হরিদাসের জনৈক ভক্ত একটি মন্দির নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন। উক্ত মন্দিরের অভ্যন্তরে শ্রীচৈতন্য বা গৌর এবং তদীয় প্রধান শিষ্য নিতাইয়ের মূর্তির সঙ্গে হরিদাস ঠাকুর ও তদীয় শিষ্যা হীরানটীর দারুময়ী মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। মন্দির গাত্রে এই কথাগুলি লিখিত আছে। "ভগবৎ নিষ্ঠ ভক্তের সেবক টাকী নিবাসী শ্রীযুক্ত সূর্যকান্ত রায় চৌধুরীর বিশেষ অনুকূলে এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল। ১৩২৫ = ১৯১৮-১৯।"





উপরে : যবন হরিদাসের তুলসীমঞ্চ, বেনাপোল, যশোর
নীচে : যবন হরিদাসের মন্দির— ঐ

নির্জন কুটীর পার্শ্বে তুলসী বৃক্ষতলে হরিদাস জপ-তপ আরম্ভ করেন। কথিত আছে যে তিনি প্রতিমাসে এক কোটি বার হরিনাম জপ করিবার সংকল্প করিয়া কার্যারম্ভ করিতেন। প্রবাদ আছে যে তিনি দৈনিক তিন লক্ষ বার জপ করিতেন। প্রকাশ্যে এই জপ গীত হইত এবং উহা শ্রোতাগণকে মুগ্ধ করিত। শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরোচিত চৈতন্য চরিতামৃতে হরিদাসের গৃহত্যাগ, বেনাপোলে অবস্থান এবং নামকীর্তন সম্পর্কে বর্ণিত আছে ঃ

শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে শ্রীবৃন্দাবন দাস
হরিদাসের গুণ কিছু করিয়াছে প্রকাশ ।।
... ...
বৃন্দাবন দাস যাহা না কৈল বর্ণন
হরিদাসের গুণ কিছু শুন ভক্তগণ
হরিদাস যবে নিজ গৃহত্যাগ কৈলা
বেনাপোলের বনমধ্যে কত দিন রহিলা।
নির্জন বনে কুটীর করি তুলসী সেবন
রাত্রিদিনে তিন লক্ষ নাম সংকীর্তন।।
ব্রাহ্মণেরে ঘরে করে ভিক্ষা নির্বাহন
প্রভাবে সকল লোক করহে পূজন।"

হরিদাস বেনাপোলে যে তুলসীমঞ্চের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তথায় অসংখ্য ভক্তের সমাগম হইত। কালক্রমে এই স্থান এক তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়। হরিদাসের নামে এখানে প্রতি বৎসর দোলযাত্রার সময় হিন্দুদের উৎসব হইয়া থাকে এবং তদুপলক্ষে কয়েক সহস্র নরনারীর সমাগম হয়।

বেনাপোল ত্যাগ করিয়া হরিদাস কয়েক বৎসর নানা স্থান পরিভ্রমণ পূর্বক অবশেষে সপ্তগ্রামের নিকট চাঁদপুরে আসিয়া উপনীত হন। এইখানে তিনি আবার তপজপ আরম্ভ করেন। তিনি শ্রীঅদ্বৈত আচার্যের সাক্ষাৎ লাভের জন্য শান্তিপুরে গমন করেন। আচার্যের অত্যধিক যত্ন হরিদাসের সাধু প্রাণে সহিল না। তিনি শান্তিপুর ত্যাগ করিয়া ফুলিয়া গ্রামে আগমন করেন। এই

সময় হরিদাসের বিরুদ্ধে প্রচারিত হইল যে তিনি যবন কুলজাত হইয়াও হরিনাম জপ করেন। এইরূপ অপপ্রচার চিরদিন হিন্দু সমাজের সর্বনাশ সাধন করিয়া আসিতেছে। ব্রাহ্মণেরা হরিদাসের বিরুদ্ধাচারণ করিতে থাকে। তৎকালে হোসেন শাহ গৌড়ের স্বাধীন সুলতান ছিলেন। কথিত আছে যে হরিদাসকে বিচারের জন্য রাজ সমীপে লইয়া যাওয়া হইল। বৃন্দাবন দাস রচিত "চৈতন্য ভাগবতে" আছে যে হোসেন শাহ হরিদাসকেই সম্মানের সহিত গ্রহণ করেন,

"আইলেন মুলুকের অধিপতি স্থান
অতি মনোহর বেশ দেখিয়া তাহান
পরম গৌরবে বসিবারে দিল স্থান ॥
আপনে জিজ্ঞাসি তানে মুলুকের পতি
"কেন ভাই ? কিরূপ তোমার দেখি মতি ॥
কত ভাগ্য দেখ তুমি হৈয়াছ যবন
তবে কেন হিন্দুর আচারে দেহ মন ॥
আমরা হিন্দুরে দেখি নাহি খাই ভাত
তাহা তুমি ছাড় হই মহাবংশজাত ॥
পরলোকে কে মতে বা পাইবা নিস্তার
না জানিঞা যে কিছু করিলা অনাচার
সে পাপ ঘুচাহ করি কলিমা উচ্চার ॥"

সুলতানের কথার উত্তরে অতীব বিনয়ের সহিত হরিদাস বলিয়াছেন :—

"শুন বাপ : স্বভাবই একই ঈশ্বর
নামমাত্র ভেদ করে হিন্দুয়ে যবনে
পরমার্থে এক কহে কোরাণে পুরাণে ॥"

কথিত আছে যে গৌড় রাজ দরবারে হরিদাসের বিচার হয়। কাজীর বিচারে তাঁহাকে বেত্রাঘাত করা হয়। হরিদাস তাহাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া স্বীয় ধর্মকার্যে মনোযোগ দিয়াছিলেন। ইহার পর তিনি শ্রীচৈতন্যের সহিত নবদ্বীপে মিলিত হন। পরে চৈতন্য যখন পুরীতে অবস্থান করেন সেই সময় হরিদাসও তথায় গিয়া উপনীত হন। গুরুর চরণে মস্তক রাখিয়া এইখানে

তিনি নাম জপ করিতেন। হিন্দুজাতির খ্যাতনামা তীর্থক্ষেত্র পুরীতে এখনও হরিদাসের মঠ দেখিতে পাওয়া যায়। হোসেন শাহ যেরূপ পর ধর্মসহিষ্ণু ছিলেন তাহাতে হরিদাসের প্রতি তাঁহার দুর্ব্যবহারের কাহিনী অবিশ্বাস্য।

বেনাপোলের যে স্থানে হরিদাস পীঠস্থান রচনা করিয়াছিলেন তাহারই অদূরে কাগজ পুকুরিয়া গ্রাম। প্রাচীন মানচিত্রে কাগজ পুকুরিয়ার নাম দেখিতে পাওয়া যায়। এখনও কাগজ পুকুরিয়া গ্রাম আছে। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি প্রকাশিত এক প্রবন্ধে এই গ্রামকে খুলনা জিলার অন্তর্গত বলা হইয়াছে। কিন্তু তাহা ঠিক নহে। ইহা বরাবরই যশোরের অন্তর্গত। রামচন্দ্র সম্পর্কে চৈতন্য ভাগবতে আছে :—

"সেই গ্রামে অধিবাসী রামচন্দ্র খান
যদ্যাপি বিষয়ী তবু মহা ভাগ্যবান।"

রামচন্দ্র খাঁ প্রবল জমিদার ছিলেন। তাঁহার পূর্ব নাম শাস্তিধর। রাম খাঁ তাঁহার উপাধি। ইনি জাতিতে ব্রাহ্মণ। মুসলমান সুলতান তাঁহাকে রাম খাঁ উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। সম্ভবতঃ তিনি মুসলিম নরপতির পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। তিনি অতিশয় গোঁড়া ও প্রাচীন পন্থী ছিলেন। নব্য বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি তাঁহার বিন্দুমাত্র আস্থা ছিল না। সাধু হরিদাসকে সকলে ভক্তি করে। তাঁহার পর্ণকুটীরে রামচন্দ্রের রাজবাটী অপেক্ষা অধিক জন সমাগম হইত। রামচন্দ্র ইহাতে মনে মনে ঈর্ষা পোষণ করিতেন। ইতিমধ্যে অসংখ্য লোক হরিদাসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছে। রামচন্দ্র তাহা সহ্য করিতে পারেন না। চৈতন্য চরিতামৃতে বর্ণিত আছে :—

"সেই দেশাধ্যক্ষ নাম রামচন্দ্র খান
বৈষ্ণব বিদ্বেষী সেই পাষণ্ড প্রধান
হরিদাসে লোকে পূজে সহিতে না পারে
তার অপমান করিতে নানা উপায় করে॥
কোন প্রকারে হরিদাসের ছিদ্র না পায়
বেশ্যাগণে আনি করে ছিদ্রের উপায়।
বেশ্যাগণে কহে, "এই বৈরাগী হরিদাস।
তুমি সব কর ইহার বৈরাগ্য ধর্মনাশ॥"

বহু চেষ্টার পর রামচন্দ্র হরিদাসের জপভঙ্গ করিতে পারিলেন না। সাধু হরিদাস দিবারাত্র হরিনাম কীর্তন করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র অনন্যোপায় হইয়া হীন ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। মধ্যযুগে প্রবল জমিদার ও রাজগণের অনেকেই অত্যাচারী ও চরিত্রহীন ছিলেন। রামচন্দ্রের এক উপপত্নী ছিল। তিনি তাহার প্রেমে পাগল ছিলেন। তাঁহার এই প্রণয়িণীর নাম ছিল হীরা। অত্যাচারী জমিদারের বিপুল অর্থ লাভ করিয়া অপ্সরীতুল্যা হীরা লক্ষাধিক মুদ্রা সঞ্চয় করিয়াছিল। প্রবাদ আছে যে এইজন্য তাহার নাম হইয়াছিল লক্ষহীরা। যশোর জিলার উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে হীরা সর্বজন পরিচিত খ্যাতনাম্নী নারী।

হীরার পূর্ব নিবাস কোথায় ছিল সঠিক জানা যায় না। বারবাজার অঞ্চল ভ্রমণকালে স্থানীয় অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিদের নিকট হইতে জানিতে পারিয়াছি যে ধোপাদী গ্রামে সম্ভবতঃ হীরার পৈতৃক বাটী ছিল। আজিও এই গ্রামের মধ্যস্থলে বিলের মধ্যে একটি প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ আছে। উহাকে লোকে হীরার মন্দির বলে। কাগজ পুকুরিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বর্তমান রেল লাইনের দক্ষিণে গয়ড়া রাজাপুরে হীরার জন্য একটি বাড়ী নির্মিত হইয়াছিল। রাজা রামচন্দ্র খাঁ এই পরমাসুন্দরী ও তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিশালিনী হীরার প্রেমে অতিরিক্ত আসক্ত হইয়া পড়েন। তিনি ময়ূরপঙ্খী নৌকায় আরোহণ করিয়া রাজকার্য সমাপনান্তে দিবাশেষে হীরার সুসজ্জিত বাস গৃহে গমন করিয়া চিত্তবিনোদন করিতেন। সেই পথ ও খালের চিহ্ন এখনও লোকে দেখাইয়া থাকে। হীরার পুকুর ও বাড়ীর শেষ নিদর্শন অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। তখনকার দিনে যশোর-কলিকাতার রাস্তা ছিল না। মহানগরী কলিকাতা তখন জঙ্গলে পূর্ণ ছিল। রামচন্দ্রের রাজবাড়ী হইতে হীরার বাড়ীর পথ বর্তমান যশোর-কলিকাতা রাস্তার মধ্য দিয়া ছিল। উহার কোন চিহ্ন নাই বলিলেও চলে। তবে এতদঞ্চলে যত্রতত্র গড় ও খালের চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়।

প্রতাপশালী জমিদার রামচন্দ্র খাঁ হরিদাসের সর্বনাশ সাধনের জন্য লক্ষ হীরাকে নিযুক্ত করেন। সে মাত্র তিনদিনের মধ্যে হরিদাসের মতি হরণ করিবে বলিয়া রামচন্দ্রের নিকট প্রতিজ্ঞা করিল। যৌবন-চঞ্চলা হাবভাবময়ী ধনগর্বী অপ্সরী হীরা বহুমূল্য স্বর্ণালঙ্কারে বিভূষিতা হইয়া হরিদাসের তপভঙ্গের

জন্য তাঁহার কুটিরে উপনীত হইল। এ সম্পর্কে চৈতন্য চরিতামৃতে আছে :—

"রাত্রিকালে সেই বেশ্যা সুবেশ ধরিয়া
হরিদাসের বাসা গেল উল্লসিত হৈয়া
তুলসী নমস্কার করি হরিদাসের দ্বারে যাইয়া
গোসাঞিরে নমস্কারি রহিল দণ্ডাইয়া ॥"

হীরা দেখিতে পাইল ভক্ত সাধু মধুর ঝংকারে হরিনাম জপ করিতেছেন। হীরা তাঁহাকে বারংবার বিরক্ত করিতে লাগিল। সাধু হরিদাস বলিলেন, "তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি জপ শেষ করিয়া তোমার বক্তব্য শ্রবণ করিব।" হীরা বসিয়া থাকিল। দিন গেল রাত্রি আসিল — তবুও সাধুর জপ থামে না। নিশাশেষে হরিদাস জপ শেষ করিয়া বলিলেন, "তুমি কাল আসিও। অদ্য তোমার সহিত বাক্যালাপ করিতে পারিলাম না।" পরদিন পুনরায় সুসজ্জিত বেশে হীরা সাধুর কুটিরে আগমন করিল। আসিয়া দেখিল সাধু জপ করিতেছেন। সারারাত্রি বসিয়া হীরা সাধুর জপভঙ্গ করিতে পারিল না। সেদিনও হীরা চলিয়া গেল। তৃতীয় দিনে হীরা আসিল। কিন্তু আজ তাহার মনের অবস্থা পরিবর্তিত হইয়াছে। কথিত আছে যে হীরা হরিনামের মধুর ঝংকার শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল। সমস্ত রাত্রি কীর্তন শুনিয়া তাহার মনের অবস্থার অভাবনীয় পরিবর্তন সাধিত হইল।

"কীর্তন করিতে ঐছে রাত্রি শেষ হৈল
ঠাকুরের সনে বেশ্যা মন ফিরি গেল।
দণ্ডবৎ হইয়া পড়ে ঠাকুর চরণে
রামচন্দ্র খানের কথা কৈল নিবেদনে
বেশ্যা হইয়া মুঞি পাপ করিয়াছি অপার
কৃপা করি অধমেরে করহ নিস্তার।"

কৃত পাপের জন্য হীরা ক্ষমা ভিক্ষা চাহিল। সাধু তাহাকে ধর্মোপদেশ দিলেন।

"ঠাকুর কহে, "খানের কথা সব আমি জানি।
অজ্ঞ মূর্খ সেই তারে দুঃখ নাহি মানি ॥
সেইদিন যাইতাম এ স্থান ছাড়িয়া
তিন দিন রহিলাম তোমার লাগিয়া ॥"

হীরার পরিবর্তন আসিয়াছে, সে মন্ত্রমুগ্ধবৎ অবস্থায় বলিতে লাগিল ঃ—

"বেশ্যা কহে কৃপা করি কর উপদেশ
কি মোর কর্তব্য যাতে যায় ভব ক্লেশ।"

সাধু হরিদাস অবশেষে হীরাকে নিজের কুটীরে রাখিয়া উক্ত স্থান পরিত্যাগ করেন। "হীরা আর সে হীরা নাই; রামচন্দ্র ভাবিয়াছিলেন এক, হইল অন্য। পরকে ভুলাইতে হীরাকে পাঠাইলেন, হীরা নিজেই ভুলিয়া গেল। হীরা গুরু হরিদাসের আদেশে বিলাসিতা ও বেশ্যাবৃত্তি ত্যাগ করিল, সৌখিন বস্ত্রালঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া মোটা কাপড় পরিধান করিল। মস্তক মুণ্ডন করিয়া সযত্ন বর্ধিত সুন্দর কেশরাশি জগন্নাথের মন্দিরে সমর্পন করিবার জন্য তুলিয়া রাখিল।"

"মাথামুড়ি একবস্ত্রে রহিলা সে ঘরে,
রাত্রি দিনে তিন লক্ষ নাম গ্রহণ করে॥
তুলসী সেবন করে চর্বণ উপবাস
ইন্দ্রিয় দমন হৈল প্রেমের প্রকাশ॥
বেশ্যার চরিত্র দেখে লোকে চমৎকার
হরিদাসের মহিমা কহে করি নমস্কার॥

হীরার পাপার্জিত সমস্ত অর্থ লোক সেবায় দান করিয়া দিল। তাহার গৃহ-বিত্ত সমস্ত ব্রাহ্মণের খেদমতে প্রদান করিল। রামচন্দ্র হীরার উপর অত্যাচার করিতে পারে এই ভয়ে সে জগন্নাথ যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিল। হীরা সে ভয়ে ভীত হইল না। গুরুর আদেশে হীরা কয়েক বৎসর পরে জগন্নাথ যাত্রা করিয়াছিল। জগন্নাথ যাতায়াতের পথ তখন দুর্গম ছিল। সেখানে যাইতে হইলে লোকে বাড়ী হইতে চিরবিদায় লইয়া যাইত। হীরার বেশ্যাবৃত্তি ত্যাগ ও সন্ন্যাস গ্রহণ ঐতিহাসিক ঘটনা। ইহা কল্পিত কাহিনী নহে। যশোর অঞ্চলে হীরা সম্পর্কে অনেক প্রবাদ প্রচলিত আছে। তাহার আজানুলম্বিত কেশরাশির দ্বারা খোপা বাঁধিত, উহা মুণ্ডনের পর রাখিয়া দিয়াছিল এবং পুরীতে গিয়া জগন্নাথের মন্দিরে ঝুলাইয়া রাখিয়াছিল। শুনা যায় পুরীর লোকেরা এখনও "হীরার লোটনের" গল্প করিয়া থাকে। পরম করুণাময়ের ইচ্ছায় দস্যুতস্করও অভ্যাস ত্যাগ করিয়া ভগবৎ প্রেমে তন্ময় হইয়া যায়।

রামচন্দ্রের রক্ষিতা "হীরা নটিও" বেশ্যাবৃত্তি ত্যাগ করিয়া মস্তকের সৌন্দর্য কেশরাশি কর্তন করিয়া হরিদাসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া ধন্য হইয়াছিল। রাজসঙ্গ ত্যাগ করিয়া এহেন অবস্থায় সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন আত্মত্যাগের এক জ্বলন্ত নিদর্শন। কবি সত্যই বলিয়াছেন :—

"এমনই হরির অহেতু করুণা প্রেমের এমনই যাদু
কয়লা হৃদয় গলি হীরা হয় তস্করও হয় সাধু।"

হীরার বিপুল অর্থ জন হিতার্থে ব্যয়িত হইয়াছিল। যাতায়াতের কষ্ট দূরীকরণার্থে হীরা বহু অর্থ ব্যয়ে যশোবাঞ্চলে একটি রাস্তা নির্মাণ করিয়াছিল। এখনও উহা "হীরার জাঙ্গাল" নামে খ্যাত। বারবাজার অঞ্চলে এই রাস্তার কথা শ্রুত হয়। সম্ভবতঃ হীরার পূর্ব নিবাস ধোপাদি হইতে এই রাস্তার আরম্ভ ছিল। বক্সারের জমিদার কালী বাবুর রাস্তার একাংশের সহিত হীরার রাস্তা মিশিয়া গিয়াছে। এখনও খাজুরার দিকের লোকে "হীরানটির জাঙ্গাল" দেখাইয়া থাকে। নারায়ণপুর গ্রামে এখনও "হীরানটির গড়ের" চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়।

হরিদাস এইস্থান ত্যাগ করিয়া গঙ্গাতীরে চলিয়া যান। মাতৃভূমির সহিত এইখানেই তাঁহার সম্পর্ক চিরদিনের জন্য বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। সন্ন্যাসী হরিদাস দেশবিদেশ ভ্রমণ করিয়া শেষজীবন অতিবাহিত করেন।

হরিদাস বেনাপোল ত্যাগ করিয়া নাওভাঙ্গা নদীতীরে একস্থানে কয়েক দিন অবস্থান করেন। অল্প দিনের মধ্যে তাঁহার যশোরাশি চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। বহুলোক সেখানে জমায়েত হইয়া হরিদাসের গুণকীর্তন করিত এবং রামচন্দ্রকে অভিসম্পাত দিত। সাধুর ভক্তেরা পরে এইস্থানের নামকরণ করিয়াছিল হরিদাসপুর। হরিদাসপুর এখন ইন্দো-পাক দেশদ্বয়ের একটি সীমান্ত পথ। যশোর রাস্তার পার্শ্বে হরিদাসের আস্তানা দেখিতে পাওয়া যায়।

হরিদাসের বেনাপোল ত্যাগের পর রামচন্দ্র খাঁ বহুদিন পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। তাঁহার রাজ্য দক্ষিণে সুন্দরবন পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল বলিয়া প্রবাদ আছে। তিনি কঠোর হস্তে রাজ্য শাসন করিতেন। কোন অজ্ঞাত কারণে

গৌড়ের সুলতান হোসেন শাহ রামচন্দ্রের প্রতি রুষ্ট হন। হোসেন শাহ নিরাশ্রয় অবস্থায় রামচন্দ্রের অধীনে কার্য করিতেন তাহা গল্প মাত্র। সে কথা অন্যত্র আলোচনা করিয়াছি। শান্তিধর নামক যে ব্রাহ্মণ হোসেন শাহের নিকট রাম খাঁ উপাধি প্রাপ্ত হন তিনিই কাগজ পুকুরিয়ার রামচন্দ্র খান।

রামচন্দ্র বিলাসপ্রিয় ও অত্যাচারী ছিলেন। এসব সত্ত্বেও তাঁহার পুণ্য কার্যের ব্যয়ও ছিল প্রচুর। বেনাপোলের অদূরে সার্শা থানার অন্তর্গত কাগজ পুকুরিয়া গ্রামে তাঁহার রাজবাড়ীর ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। ইষ্টক নির্মিত গৃহের একাংশ মৃত্তিকার মধ্যে প্রোথিত হইয়া গিয়াছে। কাগজপুকুরিয়া ও পার্শ্ববর্তী কয়েক মাইল জুড়িয়া রামচন্দ্রের রাজধানী বিস্তৃত ছিল। এখন প্রায় সমস্ত বাড়ী ও অধিকাংশ পুকুর আবাদ ভূমিতে পরিণত হইয়াছে। কোন কোন জমিতে মৃত্তিকার ঢিল অপেক্ষা প্রাচীনকালীন ইটের সংখ্যাই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। বেনাপোলের এক মাইল উত্তর পূর্ব দিকে বিস্তীর্ণ প্রান্তরের মধ্যে অসংখ্য অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ আমরা দর্শন করিয়াছি। কোন কোন স্থানে বহু পুরাতন বটবৃক্ষ এই স্থানের প্রাচীনত্বের সাক্ষ্য দিতেছে। কয়েক বৎসর পূর্বে মৃত্তিকা খননকালে কাগজপুকুরিয়ায় একটি লোহার সিন্দুক পাওয়া গিয়াছিল।

রামচন্দ্রের রাজবাটীর চতুর্দিক গড় বেষ্টিত ছিল। উহা বৃত্তাকারে চারিদিকে বেষ্টিত ছিল। চতুর্দিকের পরিখা এখনও বিদ্যমান আছে। রাজবাটীর ভগ্ন ইষ্টক স্তূপ অন্যান্য স্থানের ন্যায় স্থানীয় লোকে আত্মসাৎ করে নাই। লোকে বলে ঐ ইষ্টক ব্যবহার করিলে তাহার বংশ ধ্বংস হইয়া যাইবে। এই ভয়ে কেহ উহার ইষ্টক ব্যবহার করে না। সতীশ বাবু বলিয়াছেন গড়ের বাহিরে পশ্চিমদিকে মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয় এবং মাঠের মধ্যে সে চিহ্ন পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু আমরা উহার কিছুই দেখিতে পাই নাই। স্থানীয় লোকরা বলে গড়ের বাহিরে রামচন্দ্রের অশ্বশালা ও হাতীশালা ছিল।

রামচন্দ্রের প্রধান কীর্তি তাঁহার জলদান পুণ্য। তখনকার দিনে রাজা ও ধনাঢ্য জমিদারগণ জনসাধারণের হিতার্থে পুকুর খনন করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করিতেন। কালের আঘাতে হর্ম্যরাজির চিহ্ন ও চাকচিক্য নষ্ট হইয়া যায়।

কিন্তু শত শত বৎসর ধরিয়া দীঘি ও পুকুরের চিহ্ন কালের সাক্ষী হইয়া থাকে। প্রবাদ আছে যে রামচন্দ্র অনেকগুলি পুষ্করিণী খনন করাইয়াছিলেন এবং উহার সংখ্যা ছিল ১০১টি। সেই পুকুরগুলির কয়েকটির নামও জানা গিয়াছে। যথা:— মিঠাপুকুর, হাঁসপুকুর, ধবদবে, চালধোয়ানীর পুকুর, কালুর পুকুর, হাজির পুকুর প্রভৃতি। দীঘির পাড় বলিয়া একটি প্রকাণ্ড পুকুর আছে। উহার পাড় অত্যুচ্চ বলিয়া দীঘির পাড় নাম হইয়াছে। তিরিশ বিঘা জমি জুড়িয়া এই জলাশয় বিস্তৃত। কালুব পুকুর প্রস্থের তুলনায় দৈর্ঘ্য বেশী। স্থানীয় লোকেরা উহাকে "কেলোর পুকুর" বলে। এই সমস্ত পুকুরে প্রচুর মৎস্য থাকে। গ্রীষ্মকালে কোন কোন সময় পুকুব শুকাইয়া যায়। রামচন্দ্র খনিত বৃহত্তম জলাশয়ের নাম ভবার বেড়ের দীঘি। ইহা বর্তমানে রেল লাইনের দক্ষিণে পড়িয়াছে। ৫৯ বিঘার অধিক জমি জুড়িয়া এই দীঘিটি বিস্তৃত। বারবাজার অঞ্চলে এবং সাতক্ষীরার গণরাজার রাজধানী বাবুলিয়ায় এই ধরনেব অসংখ্য দীঘি ও পুকুর দেখিতে পাওয়া যায়। রামচন্দ্র এই সমস্ত দীঘি খনন কবিয়া এদেশবাসীর অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছিলেন সে বিষয় সন্দেহ নাই।

তুর্ক-আফগান আমলে যে সমস্ত সামন্ত রাজা বা জমিদার প্রজার হিতার্থে মুক্ত হস্তে দান করিতেন তাঁহারা রাজকীয় রাজস্ব হইতে রেহাই পাইতেন। কথিত আছে যে হোসেন শাহ এই জন্য রামচন্দ্রেব রাজস্বও মওকুফ্ করিয়া দিয়াছিলেন।

বৈষ্ণব কবি বলিয়াছেন যে হরিদাসের প্রতি অত্যাচারের জন্য রামচন্দ্র যে বীজ বপন করিয়াছিলেন, তাহা হইতে বিষ বৃক্ষের সৃষ্টি হইয়া রামচন্দ্রের সর্বনাশ সাধন করিয়াছিল। প্রবাদ আছে যে শ্রীচৈতন্যের সহকর্মী নিত্যানন্দ নব ধর্মমত প্রচারের উদ্দেশ্যে দেশব্যাপী পর্যটন করেন। তিনি একদা শিষ্যগণ সহ রামচন্দ্রের আতিথ্য গ্রহণ করেন। রামচন্দ্রের বাটীতে পৌঁছিলে তিনি এই সম্মানীয় অতিথিকে অপমান করিয়া তাড়াইয়া দেন। কথিত আছে যে সাধু নিত্যানন্দ তাঁহাকে অভিসম্পাত দিয়াছিলেন।

রামচন্দ্রের সহিত হোসেন শাহের সম্পর্ক মধুর ছিল। গৌড়ের সুলতান

তাঁহার নিকট হইতে রাজস্ব আদায়ে কোন কড়াকড়ি করিতেন না। হোসেন শাহের মৃত্যুর পর তৎপুত্র নসরৎ শাহের সময় রাজস্ব আদায়ের জন্য গৌড়ের সেনাবাহিনী কাগজ পুকুরিয়ায় আগমন করে। সম্ভবতঃ রামচন্দ্র তাহাদিগকে বিশেষ সম্মান দেখান নাই। সেজন্য রামচন্দ্রের উপর সৈন্যগণ অমানুসিক অত্যাচার করিয়াছিল। এ সম্পর্কে চৈতন্য চরিতামৃতে আছে ঃ—

"দস্যুবৃত্তি রামচন্দ্র রাজায় না দেয় কর।
ক্রুদ্ধ হইয়া ম্লেচ্ছ উজীর আইল তার ঘর॥
স্ত্রীপুত্র সহিত রামচন্দ্রেরে বাঁধিয়া
তার ঘর গ্রাম লুটে তিন দিন ধরিয়া
জাতি ধন জন খানের সকল লইল।
বহু দিন পর্যন্ত গ্রাম উজাড় রহিল॥"

মুসলমান সৈন্যের অমানুষিক অত্যাচারে কাগজ পুকুরিয়া শ্মশানভূমিতে পরিণত হইল। এই ভাবে রামচন্দ্রের দৌরাত্ম্য হইতে সকলে রক্ষা পাইল। রামচন্দ্রের শোচনীয় পরিণতি সম্পর্কে আর একটি কাহিনী এদেশে প্রচলিত আছে। কথিত আছে যে রামচন্দ্রের রাজবাটীর অভ্যন্তরে আত্মরক্ষার জন্য একটি ক্ষুদ্র দুর্গ ছিল। উহার মধ্যে প্রবেশের জন্য একটি মাত্র দরজা ছিল। সে দরজার সন্ধান অন্য কেহ জানিত না। মুসলমান সৈন্যের আগমনে রামচন্দ্র সমস্ত ধনরত্ন ও পরিজন সহ এই গুপ্ত দুর্গে প্রবেশ করে। উহার দ্বারে তালাবদ্ধ করিয়া বিশ্বস্ত ভৃত্য কালু চাবি সহ এক বৃক্ষে লুকাইয়া থাকে। কালুর সহিত কথা ছিল সৈন্যগণ রাজধানী ত্যাগ করিলে সে ঐ গুপ্ত দ্বার উন্মোচন করিয়া দিবে। সৈন্যগণ রামচন্দ্রকে না পাইয়া তাহার বাড়ী ও পার্শ্ববর্তী গ্রামে অত্যাচার চালাইল। তাহারা প্রস্থান করিবার সময় বিশ্বস্ত ভৃত্য কালুকে পুকুরোপরি এক ডালে লুক্কায়িত অবস্থায় দেখিতে পাইয়া তীরবিদ্ধ করত তাহাকে হত্যা করিয়া চলিয়া যায়। সেইজন্য ঐ পুকুরকে "কালুর পুকুর" বলা হইয়া থাকে। কালুর পুকুরের পার্শ্বে বর্তমানে কোন বৃক্ষ নাই। রাজবাড়ীর ভগ্নাবশেষের উত্তরদিকে "পাটনাচের জমি।" কথিত আছে যে উহার নীচে রাজা সপরিবারে প্রবেশ করিয়া আর উঠেন নাই। এই কাহিনী চমকপ্রদ

সন্দেহ নাই ; তবে ইহাতে কোন ঐতিহাসিক সত্য নিহিত আছে বলিয়া মনে করি না।

চৈতন্য চরিতামৃতে বর্ণিত আছে যে রামচন্দ্র সপরিবারে বন্দী হইয়া গৌড়ে নীত হন এবং তথা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র রাজসরকারে চাকুরী করিতেন। রামচন্দ্রের দুই পুত্র, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণানন্দ এবং কনিষ্ঠ ভুবনানন্দ। ভুবনানন্দ কবি কণ্ঠাভরণ উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন এবং 'বিশ্ব প্রদীপ' নামে এক বিরাট আভিধানিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এই মহাগ্রন্থে যাবতীয় বিদ্যার তত্ত্ব লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। উহাতে জ্যোতিষ শাস্ত্র, সঙ্গীত বিদ্যা, আলোক, অংশু প্রভৃতি অষ্টাদশ বিদ্যার আলোচনা স্থান লাভ করিয়াছে।

কৃষ্ণানন্দ ও ভুবনানন্দ গৌড় দরবারে বিশেষভাবে সম্মানিত হইয়াছিলেন। ভুবনানন্দ বিদ্যার্ণব মন্থন করিয়া সূক্ষ্ম বিচার সম্পন্ন মহাগ্রন্থ সম্পাদন করেন। তাঁহার ন্যায় মহাপণ্ডিত তৎকালীন বঙ্গীয় সমাজে বিরল ছিল।



গাজীকালু, চম্পাবতী ও মুকুটরায় ;
— দক্ষিণরায় ও গাজীর যুদ্ধ

॥ এগার ॥

গাজী-কালুর নাম এদেশে সর্বজন বিদিত। পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের প্রায় সর্বত্র গাজী সাহেবের প্রভাব বিস্তারিত ছিল। এককালে গাজী তাঁহার দুর্জয় শক্তিদ্বারা এমন অভাবনীয় পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছিলেন যে সমগ্র দেশ গাজীময় হইয়া গিয়াছিল। শীত, বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে পল্লীতে পল্লীতে গাজীর গীতের আসর বসিত। সেখানে অবাধভাবে গাজীর গান ও নাচ হইত। গ্রামাঞ্চলের অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত লোকেরা এই গাজীর গান শুনিয়া দিবাবসানে চিত্ত বিনোদন করিত। বর্তমানেও গাজীর গান হয়। কিন্তু উহার তীব্রতা একেবারেই হ্রাস পাইয়াছে। মনসার ভাসান যেমন হিন্দুদের মধ্যে প্রসিদ্ধ মুসলমানদের নিকট গাজীর গীত তেমন খ্যাতি লাভ করিয়াছে। জারীগান, উত্তরবঙ্গের রূপবান গান এবং বরিশালের জরিনা গানের ন্যায় গাজীর গানও এককালে বিশেষ জনপ্রিয় ছিল। গাজীর গীত শ্রবণ করিতে করিতে দেশের লোকে এক সময় এত উত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছিল যে কেহ একই কথা বারবার বলিলে উহাকে "গাজীর আলাপ" বলিয়া উপহাস করিত এবং ঐরূপ অতিরিক্ত লেখা দেখিলে তাহা না পড়িয়া 'গাজীর পট' বলিয়া উপেক্ষা করিত। গাজী সাহেবের জনপ্রিয়তা ও প্রভাবের ফলে এদেশের বহুস্থানে গাজীর হাট, গাজীপুর, গাজীর জাঙ্গাল, গাজীডাঙ্গা, গাজীর ঘাট, গাজীর দেউল, গাজীর খাল, গাজীর ঘুটো প্রভৃতি নামকরণ হইয়াছে। কলিকাতার পরপারে শিবপুরে এবং ২৪ পরগনার কয়েকস্থানে গাজীর দরগা আছে। বগুড়া জেলার শেরপুরে প্রতি জ্যৈষ্ঠ মাসে গাজী কালুর নামে মেলা বসিয়া থাকে। সুন্দরবনে মৎস্যজীবি হিন্দুরা গাজীর নামে পাঠা

বলি দেয়। ঝড় তুফানের মধ্যে বিপদ-সঙ্কুল নদীপথে যখন দাঁড়ি মাঝিরা নৌকা চালাইয়া আপন মনে পাল তুলিয়া চলিতে থাকে, তখন তাহাদের গানের সুরের মধ্য দিয়াও শক্তিধর গাজী শাহের গুণ কীর্তন শ্রুত হয়।

"আমরা আছি পোলাপান,
গাজী আছেন নিঘাবান
শিরে গঙ্গা দরিয়া
পাচপীর, বদর বদর।।"

পাচপীর ও পীর বদর পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় সর্বত্র সুপরিচিত। এই বিখ্যাত পাচপীরের মধ্যে সেকন্দর, শাহ্, গাজী ও কালুর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অন্য দুইজনের সঠিক পরিচয় জানা যায় না। কেহ কেহ বলেন যে সামসুদ্দিন ইলিয়াস ও গিয়াসউদ্দীন পাচপীরের অন্য দুইজন। কিন্তু তাহা অনুমান মাত্র। পূর্ববঙ্গের পল্লী অঞ্চলে যে গাজীর গীতের প্রচলন আছে তাহার মধ্যে পাচপীরের কথা আছে। কথিত আছে যে এই পাচপীরের নাম গিয়াসউদ্দীন, তৎপুত্র সামসুদ্দীন এবং সামসুদ্দীনের পুত্র সেকন্দর। সেকন্দরের পুত্র বরখান গাজী এবং কালু। গাজীর গীতে পাচপীরের সম্পর্কে আছে:

"পোড়াগাজী গায়েশাদ, তার বেটা সমসদি
পুত্র তার সাই সেকন্দার
তার বেটা বরখান গাজী, খোদাবন্দ মুলুকের কাজী
কলিযুগে তার অবসর
বাদশাই ছিড়িল রঙ্গে; কেবল ভাই কালুর সঙ্গে
নিজনামে হইল ফকির।"

তুর্ক আফগান আমলে এদেশে অসংখ্য পীর ও আউলিয়ার শুভাগমন হয়। তাঁহারাই এদেশে ইসলাম প্রচারে অগ্রণী ছিলেন। তাঁহাদের মধ্য হইতেই এই "পাঁচ পীরের" নামকরণ হইয়াছে। সুবর্ণগ্রামে এই পাচপীরের নামে পাচটি দরগা আছে। সিলেটের জিন্দাবাজার মহল্লায় তাঁহাদের গোরস্থান "পাচপীরের মোকাম" বলিয়া পরিচিত। এই পাচপীর সম্পর্কে ডক্টর আনিসুজ্জামান তদীয় মুস্লীম মানস ও বাংলা সাহিত্য পুস্তকে বলিয়াছেন যে

হিন্দু দেবদেবী ও তাঁহাদের গুণাবলীর পরিচয় মুস্লীম মানসে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে তাহারই ফলে এইসব দেবদেবীর মুসলমান প্রতিরূপও গড়িয়া উঠে। হিন্দু বনদুর্গার স্থলে বনবিবি, দক্ষিণরায়ের রূপান্তর গাজীপীর ও কালু, মৎস্যেন্দ্রনাথের পরিবর্তে মসন্দলি এবং সত্যনারায়ণের প্রতিরূপ সত্যপীর। মুসলমান সমাজের খোয়াজ খিজির, পীর বদর, মাণিক পীর ও পাচপীরের উপাসনা দেখা যায়। ডক্টর জামান বলেনঃ "এইসব পীরের ঐতিহাসিক অস্তিত্ব ছিল কিনা সে সম্পর্কে নিঃসংশয়ে কিছু বলা যায় না।" পাচপীর কথাটি বাবভূঞা বা বার আউলিয়ার ন্যায়। পাচপীরের যে পাচটি পৃথক সত্ত্বা ছিল, তাহারও সঠিক বিবরণ পাওয়া দুষ্কর। বনবিবি, সত্যপীর ও মাণিকপীরের অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। তবে গাজীকালু, পীরবদর ও দক্ষিণরায় ঐতিহাসিক চরিত্র বলিয়া বিশ্বাস করি।

সুন্দরবনাঞ্চলে গাজীর দুর্জয় প্রতাপ শত শত বৎসর ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। মিঃ ওমালী বলেন গাজীর নামে বনের ব্যাঘ্রকুল নত হইত এবং জঙ্গলে লোকে নির্ভয়ে চলাফেরা করিত। গাজীকে তিনি জিন্দাগাজী বা জিন্দক-ই-গাজী বা বিধর্মীদের সহিত যুদ্ধে বিজয়ী বীব বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মিঃ গেইট বলেন গাজী কাঠুরিয়াদের পৃষ্ঠপোষক পীর এবং ব্যাঘ্র ও কুম্ভীরের ভয় হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করেন।

বারবাজারে এই পাচ পীরের প্রভাব আছে। খুলনা জিলার লাবসা অঞ্চলে পাঁচ পীরের মোকাম বা দরগা অবস্থিত। বারবাজার হাই স্কুলের উত্তরে এবং রেল লাইনের পূর্ব দিকে এখনও পাচ পীরের নামে সুন্দর জলাশয় তাঁহাদের স্মৃতি রক্ষা করিতেছে। পীর বদরও সুন্দরবনাঞ্চলে প্রসিদ্ধ। বারবাজারের দক্ষিণে হাসিলবাগ গ্রামে একটি হাট ছিল — উহার নামকরণ হইয়াছিল বদরের হাট। নৌকার মাঝিরা ভয়সঙ্কুল নদীপথে যে পীর বদরের নাম উচ্চারণ করিয়া থাকে তাঁহার নামেও এই হাটের নামকরণ হইতে পারে। চট্টগ্রাম শহরে বখ্শী বাজার মার্কেটের দক্ষিণে পীর বদরের মাজার আছে। তিনি বদর শাহ ও শাহ বদর নামেও পরিচিত। কথিত আছে যে পীর বদর প্রায় ছয় শত বৎসর পূর্বে একটি প্রস্তরের উপর বসিয়া চট্টগ্রামে আসেন। তিনি

একটি মাটির আশ্চর্য প্রদীপ জ্বালাইতেন। উহাকে 'চাটি' বলা হইত। যে স্থানে ঐ প্রদীপ প্রজ্বলিত হইত উহা বর্তমানে "বদব পাটি" নামে পরিচিত। এই 'চাটি' শব্দ হইতে চাটিগ্রাম বা চাটগাঁও নামের উৎপত্তি হইয়াছে। গাজী ও পীর বদর উভয়ে ঐতিহাসিক ব্যক্তি। পীর বদর সম্পর্কে গাজীর ন্যায় বহু অতিরঞ্জিত আজগুবি গল্প এদেশে প্রচলিত থাকিলেও একথা সত্য যে তিনি চট্টগ্রামে সর্বপ্রথম ইসলাম প্রচার করেন। ভক্তেরা তাঁহাকে চট্টগ্রামেব অভিভাবক দরবেশ বলিয়া জানে। মুসলমানেরা গাহিয়া থাকে :—

"আমরা আছি পোলাপান
গাজী আছে নিঘাবান
আল্লা নবী, পাচপীর,
বদর বদর।

চট্টগ্রামে একটি মাজাবের উৎকীর্ণ ফলক প্রমাণ করে যে পীর বদর শাহ ১৩৪০ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন। ইহা হইতে জানা যায় যে গাজী কালুব বহু পূর্বে পীর বদর এদেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সিলেটের বদরপুর রেল ষ্টেশনের নিকট অন্য আর এক পীব বদরেব সমাধি আছে।

গাজীর নামে বাবরাজার অঞ্চলে "গাজীর জাঙ্গাল" আছে। ঐ অঞ্চলে জাঙ্গাল মৌজা উহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ঐতিহাসিক ছাপাই নগর গ্রাম বর্তমান বাদুরগাছা মৌজার মধ্যে এবং বারবাজাব রেলষ্টেশন হইতে এক মাইল উত্তর পূর্বে অবস্থিত। এই ছাপাই নগরে শ্রীরাম রাজার গড় বেষ্টিত বাড়ী ছিল। উহার নিদর্শন আজিও বিদ্যমান। গড়ের মধ্যে এখনও বারমাস জল ভর্তি থাকে। এই গড়ের সংলগ্ন দক্ষিণে প্রাচীনকালের একটি বটবৃক্ষ ছিল। কিছুদিন পূর্বে ঐ বট বৃক্ষটি আগুনে পুড়িয়া যাওয়ায় তথাকার জঙ্গল অপসারিত হইয়া কয়েকটি পাকা কবর আবিষ্কৃত হইয়াছে। স্থানীয় লোকে বলে এখানে গাজীর এবাদতখানা বা প্রার্থনাগার ছিল। সেখানে গাজী সাহেবের নামে একটি দরগা আছে। সতীশ বাবু বলিয়াছেন যে সেখানে একটি হিন্দু মন্দির ছিল। কিন্তু উহা অনুমান মাত্র। প্রবাদ আছে যে গাজী তদীয় প্রিয়তমা সহধর্মিণীসহ কিছুকাল মুরলী ও বারবাজার অঞ্চলে বসবাস করিয়াছিলেন।

অনুমান করা হয় যে গাজীর স্ত্রী চম্পাবতীর নামানুসারে ঐ স্থানের নাম হয় চাম্পাপুর বা চাপাইনগর। বারবাজারের সন্নিকটে হাসিলবাগ গ্রামের দক্ষিণে মরা ভৈরবের তীরে একটি অশ্বত্থ বৃক্ষের নিম্নে গাজীর দরগা আছে। এখানে লোকে গাজীর নামে সিন্নি দেয়।

ঝিকিরগাছার তুই মাইল পূর্বে যশোর রাস্তার সংলগ্ন লাউজানি বা ব্রাহ্মণনগর গ্রামে গাজীর নামীয় বিখ্যাত দরগা অবস্থিত। এই দরগার সংলগ্ন চম্পাবতীর পুকুর এবং দক্ষিণে খনিয়ার রণক্ষেত্র। বেনাপোল কাষ্টম কলোনীর মধ্যেও গাজীর নামে একটি দরগা আছে। বাগেরহাটের সন্নিকটে রণবিজয়পুরে গাজীর দরগা বিদ্যমান। যশোর-খুলনার নানাস্থানে গাজীর বটগাছ আছে। মুজগুন্নির পার্শ্বে বিল পাবলার একস্থানের নাম গাজীর ঘুটো। মোরেলগঞ্জ থানার সুতালরী গ্রামে কাষ্ঠ নির্মিত বিরাটকায় ব্যাঘ্র ও অশ্বমূর্তির পৃষ্ঠে গাজী ও কালুর মূর্তিদ্বয় সোয়ার অবস্থায় দেখা যাইত। এই সমস্ত দর্শনে শক্তিশালী গাজীর প্রতাপ এতদঞ্চলে বিশেষভাবে অনুভূত হয়।

গাজী ঐতিহাসিক ব্যক্তি সে বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার প্রকৃত ইতিহাস আবিষ্কার করা তুরূহ সমস্যা হইয়া পড়িয়াছে। আমরা আপ্রাণ চেষ্টা ও অনুসন্ধানের পর ইতিহাসের যে টুকিটাকি হস্তগত করিয়াছি উহাই গাজী কালুর ইতিহাস প্রণয়নে আমাদের সম্বল। "গাজী কালু ও চম্পাবতীর পুঁথি" "দরাফখানের গঙ্গা স্তোত্র" ও "দরাফ খান গাজী," (দফর খা বা জাফর খাঁ গাজী) মৌলভী আবতুল জব্বার প্রণীত "গাজী" নামক পুস্তক, আবতুল গফুর ও হালুমিয়ার "বড়খা গাজীর কেরামতি" ও "গাজীমঙ্গল" প্রকৃতপক্ষে ইতিহাসের মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখিতে পারে নাই। ইহা এত অতিরঞ্জিত, অযৌক্তিক এবং অসম্ভাবিত ঔপন্যাসিক সৃষ্টি ছাড়া অলীক গল্পে পূর্ণ হইয়া এমন বীভৎস্য আকার ধারণ করিয়াছে যে তাহার মধ্য হইতে বর্তমানে আমাদের আলোচ্য ইতিবৃত্তের কোন সঠিক তথ্য বা উপকরণ পাওয়া তুষ্কর। এই সমস্ত পুঁথি এদেশে এত বেশী প্রসার লাভ করিয়াছে যে ইহা ইতিহাসকে একরূপ ধামাচাপা দিয়া মিথ্যার স্বরূপ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের দেশে এক শ্রেণীর লোক এই ধরনের পুঁথি পড়িয়া অতীব আনন্দ উপভোগ করে।

পুঁথিতে সাহিত্য রস আছে, কিন্তু অনেক স্থলেই ঐতিহাসিক চরিত্র বিকৃত করিয়া দেখান হইয়াছে। গাজী কালুর পুঁথির এক স্থানে আছে :—

"গাজী শাহের বাপের নাম সেখ সেকন্দর
চৌদ্দ বছর যুদ্ধ কল্ল বেতকাটার ভিতর ॥

ডাক্তার আবুল কাসেম এ সম্পর্কে বিভাগ পূর্ব কালের এক প্রবন্ধে বলিয়াছেন, "বাঙ্গালী মোসলমানদের মধ্যে আজকাল উপন্যাস লেখকের বড় একটা অভাব নাই। কিন্তু ঐতিহাসিকের অভাবের কথা ভাবিলে দুঃখে, ক্ষোভে ম্রিয়মান হইতে হয়।" গাজীর গান ধর্মপ্রাণ গাজীর নামে অনাচারের সৃষ্টি করিয়াছে। তাঁহার সৎকার্যের খতিয়ানের স্থান দখল করিয়াছে গাজীর গানের ছড়া।

গাজী কালুর ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ করিতে আমাদের গলদঘর্ম হইয়াছে, তবুও আশাতীত ভাবে সাফল্য লাভ করিতে পারি নাই। ঐতিহাসিক প্রবন্ধ, গাজীর গীত, উপন্যাস, পুঁথি সাহিত্য, কিংবদান্তি, জনশ্রুতি, স্থানীয় প্রবাদ প্রভৃতি পর্বত প্রমাণ তুষরাশির মধ্য হইতে গাজীর ঐতিসাসিক তথ্য দুই চারিটি তণ্ডুলকণার ন্যায় বাছিয়া লিপিবদ্ধ করিলাম। ঐতিহাসিকের চক্ষে যাহা বাস্তব সত্য তাহাই উদ্ধার করিতে চেষ্টা করিয়াছি এবং যাহা অবাস্তব ও অসত্য তাহা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করিয়াছি। বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান ও দার্শনিক যুক্তিতর্কের যুগে সুধী সমাজ অসম্ভব ও আজগুবি কথার উপর আস্থা স্থাপন করিবেন না, এ বিশ্বাস আমাদের আছে।

এখন এই ভাগ্যবান পুরুষ সিংহ কে? তাহাই আমাদের বিচার করিতে হইবে। গাজীর পূর্ব পুরুষের পরিচয় পাওয়া দুষ্কর। গৌড়ের সুলতান সামসুদ্দিন ইলিয়াস এবং সেকন্দর শাহের ইতিহাস আমরা যথাস্থানে বর্ণনা করিয়াছি। কথিত আছে যে সেকন্দরের প্রথমা রাণীর গর্ভে গিয়াসউদ্দিন (জুলহাস) ও বরখান (গাজী) জন্মগ্রহণ করেন। "গাজী" নামক পুস্তক ও পুঁথিতে আছে বৈরাট নগর নিবাসী শাহ্ সেকন্দরের পুত্র গাজী। তাঁহার মাতার নাম অজুপা সুন্দরী। অজুপা সুন্দরীর এক পালিত পুত্রের নাম কালু। গাজী বাল্যকালে বাদশাহী গ্রহণ করিবার জন্য পিতা কর্তৃক আদিষ্ট হন। উত্তরে গাজী বলিয়াছিলেন, "আমি বাদশাহী চাহি না! পক্ষান্তরে ফকির

হইতে ইচ্ছা করি।" গাজীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শিকারে গিয়া নিখোঁজ হন। কাজেই পিতা পুনঃপুনঃ তাঁহাকে রাজদণ্ড গ্রহণ করিতে বলেন। আদেশ অমান্য করায় তিনি রাজরোষে পতিত হন। বাদশাহ্ অতঃপর স্বীয় পুত্র গাজীকে হত্যা করার জন্য জল্লাদকে আদেশ করেন। আশ্চর্যের বিষয় জল্লাদের খরশান অসির আঘাতে গাজীর একটি লোম পর্যন্ত কাটিল না। হুকুম হইল তাঁহাকে হস্তী পদতলে নিক্ষেপ করা হইবে। কিন্তু তাহাতেও কিছু হইল না। অতঃপর তাঁহাকে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হইল। তাহাতেও কিছু হইল না। গাজীকে পাথরের সহিত বাঁধিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হইল তথাপি কিছুই হইল না। পরিশেষে একটি সূঁচে বিশেষ চিহ্ন দিয়া সমুদ্র গর্ভে ফেলিয়া গাজীকে তাহা উঠাইবার জন্য আদেশ করা হইল। খোদার কৃপায় অসম্ভব সম্ভবে পরিণত হইল। সাগর শুকাইয়া গেল। খোঁয়াজ খিজির আসিয়া পাতাল পুরী হইতে চিহ্নিত সূচ কুড়াইয়া গাজীকে দিলেন। মহানন্দে গাজী গৃহে প্রত্যাগমণ করিলেন।

অতঃপর গাজী ও কালু সিদ্ধার্থের ন্যায় রাজসিংহাসন ও সংসার জীবন ত্যাগ করিয়া ফকিরী বেশে পৈতৃক বাসভূমি হইতে পলায়ন করিয়া বহু জনপদ ভ্রমণ-পূর্বক অবশেষে সুন্দরবনে আসিয়া পৌঁছিলেন। তাঁহাদের অসাধারণ আধ্যাত্মিক শক্তির প্রভাবে বনের ব্যাঘ্র ও কুমীর পর্যন্ত বাধ্য হইয়া গেল। অবশেষে গাজী ছাপাই নগরে শ্রীরাম রাজার দেশে পৌঁছিলেন। সে দেশে মুসলমান বাসিন্দা না থাকায় গাজী তথায় ইসলাম প্রচার আরম্ভ করেন। পুঁথিতে আছে :—

"প্রজাগণ যত তার সব হিন্দুয়ান
সে দেশের মধ্যে নাহি এক মুসলমান।"

হাসিলবাগে আসিয়া শ্রীরাম তাঁতীর উপর গাজীর অনুগ্রহ বর্ষিত হয় এবং তিনি তাহাকে ধনী করিয়া দেন। তিনি জামাল গোদা নামক এক ব্যক্তির গোদ আরোগ্য করিয়া বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। অকস্মাৎ শ্রীরাম রাজার রাজবাড়ীতে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইল, রাণী অপহৃত হইলেন এবং সেখানকার সমস্ত অধিবাসী ইস্‌লাম কবুল করিল। ছাপাই নগরে একটি সুবর্ণমণ্ডিত

মস্‌জিদ নির্মিত হইল। অবশেষে গাজী কালু দুই ভাই সোনারপুর ও ব্রাহ্মণনগরে রাজা মুকুট রায়ের দেশে গেলেন। পুঁথিতে আছে ঃ—

"ব্রাহ্মণ নগর এই শুন বিবরণ ॥
এদেশের প্রজাগণ সকলি ব্রাহ্মণ
অন্য জাতি দেশে রাজা নাহি দেয় ঠাই ॥
যবন পাইলে খায় দক্ষিণা গোসাই"

মুকুটরায়ের সাত পুত্র ও এক কন্যা, তাহার নাম চম্পাবতী। চম্পাবতীর ন্যায় পরমা সুন্দরী সে যুগে আর ছিল না। ফকির গাজী চম্পার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে বিবাহ করিবার জন্য অতিমাত্রায় ব্যগ্র হইলেন। কালু ঘটক হিসাবে মুকুটরায়ের দরবারে গিয়া গাজীর সহিত চম্পার বিবাহের প্রস্তাব করায় কালু বন্দী হইলেন। ফলে সমর দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল। গাজীর সৈন্য অসংখ্য ব্যাঘ্র। ব্যাঘ্র সৈন্য সহ গাজী মুকুটরায়ের রাজধানী আক্রমণ করিলেন। মুকুটরায়ের সেনাপতি মহাবীর দক্ষিণরায়। কুমীর লইয়া তিনি গাজীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। দক্ষিণরায় মুগুর হস্তে আসিয়া সক্রোধে গাজীর হাতের আসা (যষ্ঠি) ভাঙ্গিয়া দিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি গাজীর অদ্ভুত রণ-কৌশলে পরাস্ত হইলেন। রণ-বিজয়ী গাজী দক্ষিণরায়ের দুই কর্ণ ও বারহাত লম্বা টিকি কাটিয়া তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিলেন। এই নিদারুণ সংবাদে মুকুটরায় স্বয়ং তিন কোটি বার লক্ষ তের হাজার সৈন্য ও লক্ষ লক্ষ "তোপতীর" লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। মুকুটের প্রতিদিন যত সৈন্য, ঘোড়া, হাতী ক্ষয় হইত, তিনি তাঁহার "মৃতঞ্জীব কূপ" হইতে জল ছিটাইয়া তাহা বাঁচাইয়া দিতে লাগিলেন। গাজীর লশ্‌করগণ এই গুপ্ত রহস্য জানিতে পারিয়া সেই কূপে গোমাংস ও রক্ত নিক্ষেপ করিয়া উহার সঞ্জিবনী শক্তি নষ্ট করিয়া দিলেন। মুকুটরায় নিরাশ হইয়া পড়িলেন। গাজীর ব্যাঘ্র সৈন্য ও পরীদল প্রতিদ্বন্দ্বী মুকুটের বারলক্ষ হস্তী ও ঘোড়া এবং তিন কোটি সৈন্য মারিয়া ফেলিল। রাজা ও সভাসদগণ পৈতা ছিড়িয়া কলেমা পড়িয়া ঝুটি কাঁটিয়া ইস্‌লাম গ্রহণ করেন। বাঘ ও পরীগণ তখন রাজপুরীর মধ্য হইতে চম্পাবতীকে অপহরণ করিয়া লইল। গাজীর সহিত চম্পার বিবাহ হইয়া গেল। রাজা ও রাণী ইহাতে কোন আপত্তি করিলেন না। পুঁথিতে আছে, মুকুটরায় বলিতেছেনঃ

"বড় আহ্লাদের মোর কন্যা চম্পাবতী
সাতপুত্র মধ্যে সেই আদরের অতি
তার প্রতি দয়া তুমি সর্বদা রাখিবা
অনিষ্ট করিলে কোন মার্জনা করিবা।"

ইহার পর চম্পাকে লইয়া গাজী বিদায় হইলেন। বাঘ ও পরীগণ রাজাকে সালাম করিয়া বিদায় লইল। গাজী চম্পার রূপে মুগ্ধ হইলেন। পুঁথিতে চম্পার রূপ বর্ণিত হইয়াছে,

"বিধুমুখী চম্পাবতী আছে কাছে বসি।
জ্বলিতেছে রূপ যিনি লক্ষকোটি শশী
হঠাৎ চম্পার রূপ নয়নে হেরিয়া॥
মূর্চ্ছিত হইয়া গাজী পড়িল ঢলিয়া।"

কিছুদিন পরে গাজী দেখিলেন এক নদীর তীরে তিন শত যোগী সাধনায় নিযুক্ত আছেন। তিনি গঙ্গাকে ডাকিয়া যোগীদিগের অভিষ্ট কমলে কামিনী দর্শন করাইলেন। যোগীরা মুসলমান ধর্মের ন্যায় ধর্ম নাই দেখিয়া ঝুঁটি কাটিয়া মুসলমান হইল। পরে পাতালপুরী হইতে জুলহাসকে লইয়া গাজী-কালু ও চম্পাবতী সাগর পার হইয়া বৈরাট নগরে পৌঁছিলেন। মলিন রাজপুরী হর্ষ কোলাহলে মুখরিত হইল। ইহাই পুঁথির সারকথা।

এইবার আমরা উপরোক্ত নিছক কল্পিত পুঁথির স্তূপীকৃত আবর্জনা রাশির মধ্য হইতে কিছু কিছু ঐতিহাসিক তথ্য উদ্ধার করিতে চেষ্টা করিব। সর্বপ্রথমে আমাদের জানা আবশ্যক বৈরাট বা বিরাট নগর কোথায়? গাজীর প্রকৃত পরিচয় কি? বিরাট নগরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে এ পর্যন্ত কেহ কোন অনুসন্ধান দিতে পারেন নাই। অনুসন্ধানের পর আমরা জানিতে পারিয়াছি যে বারবাজারের সন্নিকটে বেলাট দৌলতপুর মৌজা অবস্থিত। বিরাট বা বৈরাট নগর এই বেলাট শব্দের অপভ্রংশ বলিয়া মনে করি। তুর্ক-আফগান আমলে এবং উহার পূর্বে ও এখানে জনাকীর্ণ শহর ছিল। এক সময় এই স্থান মুসলমান সভ্যতার কেন্দ্র ছিল। বিরাট নগর এখানেই হওয়া স্বাভাবিক। যেহেতু এই স্থান হইতে ব্রাহ্মণ নগর বেশী দূরে অবস্থিত নয়। গাজীর স্মৃতি এতদঞ্চলের রন্ধ্রে রন্ধ্রে জড়িত

তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। গাজী ঐতিহাসিক ব্যক্তি। তিনি সেকন্দর সাহের পুত্র—ইহা ঐতিহাসিক সত্যের বিপরীত। বরখান গাজী বা বড় খাঁ নামে সেকেন্দর শাহের কোন পুত্র ছিল না। সেকন্দার শাহ্ ১৩৫৯ হইতে ১৩৯২ খৃষ্টাব্দে পর্যন্ত দোর্দণ্ড প্রতাপে বাংলাদেশে রাজত্ব করেন। সেকন্দরের অষ্টাদশ পুত্র ছিল। তন্মধ্যে গিয়াসউদ্দীন পিতার উত্তরাধিকারিত্ব লাভ করেন। মুকুট রায় ও গাজীর যুদ্ধ সংঘটিত হয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে অর্থাৎ সেকন্দর শাহের প্রায় একশত বৎসর পরে। গাজীর সহিত সেকন্দর শাহের কোন প্রকার সম্পর্ক স্থাপন করা একেবারেই অসম্ভব। বনবিবির পুঁথি ও গাজীর গীতের মধ্যেও বরখান নাম দেখিতে পাওয়া যায়। রায়মঙ্গলে আছে দক্ষিণ রায়ের সঙ্গে যে গাজীর সন্ধি হয়, তিনি বরখান গাজী বা বড় খাঁ গাজী নামে পরিচিত।

> "বড় খাঁ গাজীর সাথে মহাযুদ্ধ খণিয়াতে
> দোস্তানী হইল তারপর।"

শাহ্ গরীবুল্লার জঙ্গনামা পুঁথিতে বড় খাঁ নাম আছে :

> "বাপ নাম শাহ ছুন্দি আল্লার ফকিব
> ভাঁটির সোলতান গাজী বড় খাঁ পীর।
> অধীন ফকির বলে কেতাবের বাত
> বড় খাঁ গাজী যারে দিল মোলাকাত।"

অমুসলমান লেখকদের হস্তে পড়িয়া সম্ভবতঃ বরখান নাম বড় খাঁ'তে পরিবর্তিত হইয়াছে। তাঁহারা ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক মুসলমানী নাম সঠিকভাবে দিতে অনেক সময় ভুল করেন। চব্বিশ পরগণা জিলার কবি কৃষ্ণরাম দাস ১৬৮৬-৮৭ খৃষ্টাব্দে তদীয় রায়মঙ্গল কাব্য রচনা করেন। সুন্দরবন অধিপতি দক্ষিণ রায়ের নামের সহিত এই কাব্যের নাম বিজড়িত। দক্ষিণরায় ও গাজীর মধ্যে যে ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘঠিত হয়, উহার অসংখ্য কাহিনী দ্বারা এই কাব্যখানি ভরপুর। কাব্যের শেষদিকে দক্ষিণরায়ের সঙ্গে গাজীর বন্ধুত্বের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। অসম্ভাবিত ঘটনা বর্ণনায় রায়মঙ্গল কাব্য গাজী-কালুর পুঁথিকেও অতিক্রম করিয়াছে। এতৎসত্ত্বেও রায়মঙ্গল কাব্যে ইতিহাসের যৎকিঞ্চিত উপকরণ পাওয়া যায়।

উপরোক্ত আলোচনা হইতে আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে আমাদের আলোচ্য গাজী শাহের প্রকৃত নাম বরখান গাজী। সম্ভবতঃ তিনি রাজনন্দন না হইয়া সেকন্দর নামীয় কোন অমাত্য বা ধনাঢ্য ব্যক্তির পুত্র হইতে পারেন। ইহাও সম্ভব যে তাঁহার পিতা তুর্ক আফগান আমলে কোন সামন্তরাজ বা অধীনস্থ শাসনকর্তা ছিলেন। সিলেট জিলার শেখ সেকন্দর ওরফে শাহ্ সেকন্দর নামে একজন দরবেশ ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম শাহ্ গাজী। উভয়ের সমাধি শাহ্ সিকন্দর নামক গ্রামে অবস্থিত। আমাদের আলোচ্য গাজীর সহিত তাঁহাদেরও কোন সম্পর্ক স্থাপন করা যায় না। ফলকথা ইতিহাস বহু চেষ্টা করিয়াও আজ পর্যন্ত তাঁহার পূর্ব পুরুষের সঠিক পরিচয় উদ্ধার করিতে পারে নাই।

গাজীর বাল্য জীবনও পূর্ব পুরুষের পরিচয়ের ন্যায় অস্পষ্ট। কথিত আছে যে তিনি বাল্যকালে অসাধারণ স্মৃতি শক্তি ধারণ করিতেন এবং অতি অল্পদিনের মধ্যে পবিত্র কোরানের শিক্ষায় নিজেকে মহিমান্বিত করেন। তিনি আরবী, ফার্সি, গণিত ও ধর্মশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য লাভ করেন। গাজী বাল্যকাল হইতে চিন্তাশীল ছিলেন এবং ধর্মকার্যে আত্মনিয়োগ করেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গাজীর প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও অন্যান্য গুণরাজি উত্তরোত্তর বর্ধিত হইতে লাগিল। পাণ্ডুয়ার তাপস প্রবর শাহ্ জালালউদ্দিন তাব্রিজীর সহিত গাজীর সাক্ষাৎ লাভ হইয়াছিল। এই মহাত্মা গাজীকে জীবজগৎ, আধ্যাত্ম জগৎ, পারলৌকিক জগৎ ও মানুষের কর্তব্য সম্বন্ধে অনেক কথা বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। এই সময় তিনি আধ্যাত্মিক জগতের সন্ধান লাভ করেন। দেশ পর্যটনের অদম্য আশা তাহাকে পাগল করিয়াছিল। একথা সত্য যে গাজী কোন আধ্যাত্মিক গুরুর নিকট জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। আমাদের মতে শাহ্ জালাল উদ্দিন তাব্রিজী গাজীর বাল্য শিক্ষক হইতে পারেন না। এই মহাত্মা দ্বাদশ শতাব্দীর পরেই এদেশে আগমন করিয়া ইসলাম ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। গাজী আবির্ভূত হইয়াছিলেন ইহার প্রায় তিন শত বৎসর পরে।

প্রবাদের যথেষ্ট ঐতিহাসিক মূল্য আছে। সত্য নির্ধারণের জন্য প্রবাদ সমূহকে যুক্তিতর্ক ও বিবেকের দ্বারা যাচাই করিয়া আমরা উহা গ্রহণ করিতে

পারি। গাজীর বিষয় একথা সহজে বলা চলে যে তিনি ধনীর দুলাল হইয়াও সংসার বিরাগী ছিলেন, তাঁহার গৃহত্যাগ অকস্মাৎ ঘটনা নহে। গভীর চিন্তার পর তিনি এই চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। গাজীর গীতে বর্ণিত আছে:

"গাজী বলে কালু ভাই
চল মোরা ফকির হয়ে যাই।"

অতঃপর গাজী এক নিশীথে কালুকে সঙ্গে লইয়া সংসার ত্যাগ করেন। কালুর সহিত তাঁহার সম্পর্ক ছিল রাম লক্ষণের ন্যায়। শিশুকাল হইতে কালুকে তিনি সহোদর ভ্রাতার ন্যায় স্নেহ করিতেন। তাই গৃহ ত্যাগ করিয়াও একসঙ্গে দুইজনে যৌবনে যোগী সাজিলেন। দীর্ঘকাল পথে পথে দুই নবীন সাধু বহুকষ্ট সহ্য করিয়া চলিতে থাকেন। কত বিনিদ্র রজনী কাটিয়া যায়, কত ঝড় ঝাপটা মস্তকের উপর দিয়া বহিয়া যায়, কত বিপদ আপদ পাশ কাটাইয়া যায়—পথিকদ্বয় তাহা ভ্রূক্ষেপ করেন না। সর্ব প্রকার দুঃখ কষ্ট তাঁহারা নীরবে সহ্য করিতে থাকেন। অবশেষে তরুণ সন্ন্যাসীদ্বয় সুন্দরবনের গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিয়া কঠোর সাধনায় লিপ্ত হন। অতঃপব দুই ভ্রাতা পবিত্র ইসলাম ধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন।

গাজী শব্দের অর্থ মোজাহেদ বা ধর্মযুদ্ধে বিজয়ী বীর, অর্থাৎ বিধর্মীদের সহিত ইসলাম ধর্মেব স্বার্থে যিনি যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করেন, তিনিই "গাজী" নামে সম্মানিত হন। গাজী শব্দ এই উপাধি, প্রকৃত নাম নহে। তুর্ক আফগান আমলে এই ধরনের বহু গাজী এদেশে প্রতিপত্তি বিস্তার করেন। গাজীদের অনেক আস্তানা ও দরগাহ্ এদেশে আজিও সযত্নে রক্ষিত হইতেছে। কেহ কেহ বলেন মুকুট রায়ের সহিত যে গাজী যুদ্ধ করেন, তাঁহার নাম গোরাই গাজী। কিন্তু পীর গোরা চাঁদ বা গোরাই গাজী সম্পর্কে পৃথক ইতিবৃত্ত আছে। তাহাতে মুকুট রায়ের সহিত যুদ্ধের কথা নাই। আবদুল গফুর সিদ্দিকী সাহেব গোরাই গাজী সম্পর্কে যে বর্ণনা দিয়াছেন ডক্টর শহিদুল্লাহ্ উহার ভিন্নমত পোষণ করেন। গোরাই গাজীর প্রকৃত নাম সৈয়দ আব্বাস আলী মক্কী। তিনি দেউলিয়ার রাজা চন্দ্রকেতুকে বশীভূত করিতে চেষ্টা করেন। ২৪ পরগণার গেজেটীয়ার হইতে জানা যায় যে হাতীয়াগড়ে গোরাই গাজীর সহিত রাজা

মহিদানন্দের পুত্র অক্ষয়ানন্দ ও বকানন্দের যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। যুদ্ধে বকানন্দ নিহত হন, এবং গোরাই গাজী ভীষণভাবে আহত হইয়া বালাণ্ডার সন্নিকটবর্তী হাড়োয়ায় আসিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। কেহ কেহ বলেন গোরাই গাজীর হাড় হইতে হাড়োয়া নামকরণ হইয়াছে। গৌড়ের সুলতান আলাউদ্দীন (১২৩০—১২৩১) গোরাই গাজীর সমাধির উপর এক মস্‌জিদ নির্মাণ করাইয়া দেন এবং মস্‌জিদের ব্যয় নির্বাহের জন্য পাঁচশত একর জমি নিষ্কর দিয়াছিলেন। বসিরহাট অঞ্চলে গোরাই গাজী সর্বজন পরিচিত পীর। প্রতি বৎসর তাঁহার নামে হাড়োয়ায় প্রকাণ্ড মেলা বসিয়া থাকে। ফকিরেরা এখনও কলিকাতার রাস্তায় এবং অন্যত্র সন্ধ্যাকালে প্রদীপ জ্বালাইয়া, "পীর গোরাচাঁদ মুশ্‌কিল আসান" বলিয়া গান করিয়া ভিক্ষা মাগিয়া বেড়ায়। গোরাই গাজীর স্মৃতি রক্ষার্থে এখনও কলিকাতায় গোরাচাঁদ রোড আছে। গোরাই গাজী এবং আমাদের আলোচ্য গাজী ভিন্ন ব্যক্তি।

গোরাই গাজী ব্যতীত বারাসাতের একদল শাহ্, বাঁশড়ার মোবারক গাজী এবং আরও কয়েকজন ধর্মপ্রচারক এদেশে ধর্মপ্রচার করেন। মোবারক গাজী সুন্দরবনের একাংশে ব্যাঘ্রভীতি নিবারণ করিয়া বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। কথিত আছে তিনি ব্যাঘ্র পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। মোবারক গাজী যোদ্ধা দরবেশ। বহুস্থানে তাঁহার নামীয় দরগা আছে।

ত্রিবেনীর জাফর খাঁ গাজীর তৃতীয় পুত্রের নাম বড় খাঁ গাজী। তিনি সুপ্রসিদ্ধ যোদ্ধা ছিলেন। ব্লকম্যান ছোট পাণ্ডুয়ায় হুগলী) জাফর খাঁ গাজীর সমাধির পার্শ্বেই বড় খাঁ গাজীর কবর দর্শন করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, এই বড় খাঁ গাজী হুগলীর রাজাকে পরাজিত করিয়া তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করেন। ডক্টর সুকুমার সেন বলেন ইসমাইল গাজীই পরবর্তী কালে বড়খাঁ গাজী নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ডক্টর সেনের সহিত আমরা একমত হইতে পারিতেছি না। কারণ রিসালাতুস-শুহাদা নামক ফার্সি গ্রন্থে তাঁহার জন্ম বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ আছে। এই গ্রন্থে বা অন্য কোথাও ইহার উল্লেখ পাওয়া যায় না।

ইসমাইল গাজী গৌড় সুলতান বরবক শাহের সমসাময়িক এবং তাঁহার সময় তিনি উড়িষ্যা আক্রমণ করিয়াছিলেন। সপ্তদশ শতকে রচিত কবিতায় সীতারাম দাস তাঁহার আধ্যাত্মিক শক্তির-ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি কামরূপের রাজাকে পরাজিত করিয়া ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন। বুকানন হ্যামিলটন বলেন যে তিনি হোসেন শাহের সহিত কামরূপ আক্রমণে অংশ গ্রহণ করেন। কিন্তু তাহা ঠিক নহে। ১৪৭৪ খৃষ্টাব্দে বন্দেশী রায়ের চক্রান্তের ফলে ইসমাইল গাজীর শিরশ্ছেদ হয়। ইহা মুসলীম বঙ্গের ইতিহাসে এক মর্মান্তিক ঘটনা। তাঁহার মস্তক রংপুরের কাটাদুয়ারে এবং দেহ তদীয় কর্মক্ষেত্র হুগলীর গড়মান্দারনে সমাধিস্থ হইয়াছিল। বন্দেশী রায়ের ষড়যন্ত্রের কথা জানিতে পারিয়া সুলতান গভীর মর্মপীড়া ভোগ করেন এবং নির্দ্দোষ মনীষীর সম্মানার্থে তিনি বেগমকে সঙ্গে লইয়া মান্দারান ও কাটাদুয়ারে উপস্থিত হইয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে গাজীর দরগাহ জিয়ারত করেন।

ত্রিবেনীর বড়খাঁ গাজী, রংপুরের ইসমাইল গাজী এবং আলোচ্য বরখান গাজী প্রত্যেকেই পৃথক ঐতিহাসিক চরিত্র। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষদিকে জাফর খান গাজী ত্রিবেনীতে ইস্‌লাম প্রচার করিয়া ১২৯৮ খৃঃ তথায় একটি মস্‌জিদ নির্মাণ করেন। কথিত আছে যে ১৩১৩ খৃঃ তিনি সেখানেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। এক শিলালিপিতে তাঁহাকে বলা হইয়াছে "নাসিরুল ইস্‌লাম" বা ইসলামের সহায়ক এবং "শিহাবুল হকওয়াদ্দিন" বা সত্য ও ধর্মের উল্কাস্বরূপ। জাফর খার পুত্র বড় খাঁ গাজী চতুর্দশ শতকের প্রথম দিকে বঙ্গে আসেন এবং আমাদের আলোচ্য গাজী শাহের কার্যকাল পঞ্চদশ শতকের শেষ ভাগে। ডক্টর এনামল হক বলিয়াছেন যে আমাদের আলোচ্য গাজী শাহ সম্ভবতঃ ত্রিবেণী বিজেতা জাফর খাঁ গাজীর পুত্র এবং গৌড়াধিপতি সোলতান সেকন্দর শাহের আমলের ব্রাহ্মণ রাজা হইলেন মুকুট রায়। তিনি আরও বলিয়াছেন যে বড় খাঁ গাজী সম্ভবতঃ দক্ষিণাঞ্চলে যশোর-খুলনা ও ২৪ পরগণায় যুদ্ধাভিযান করিয়াছিলেন। জাফর খাঁ বা তৎপুত্র বড় খাঁ সম্ভবতঃ ইসলাম প্রচারকল্পে ২৪পরগণা অঞ্চলে আগমন করিয়াছিলেন গাজী কালুর অন্যূন একশত বৎসর পূর্বে। জাফর খাঁ প্রতিষ্ঠিত মসজিদের খোদিত লিপি হইতে

জানা যায় যে উক্ত মসজিদ ১২৯৪ খৃঃ স্থাপিত হয়। তাঁহার বা তদীয় পুত্রের সময় মুকুট রায় বা আমাদের আলোচ্য গাজীর নাম পাওয়া যায় না। দারাবউদ্দিন বা দরাফ খাঁ বা দফর খাঁ গাজী এবং ত্রিবেণীর জাফর খাঁ গাজী অভিন্ন ব্যক্তি। দরাফ খানের গঙ্গাস্তোত্র পুস্তকে তাঁহাকে গঙ্গাভক্ত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। মুসলমান হইয়া তিনি কিভাবে গঙ্গাদেবীর ভক্ত হইয়া পড়েন তাহাই এই পুস্তকের সারমর্ম। অবশ্য এই সমস্ত কাল্পনিক কাহিনীর আমরা কোন গুরুত্ব দিতে পারি না।

আমাদের আলোচ্য গাজী শাহ্ দয়ার প্রতীক ছিলেন। এজন্য এদেশের অতিরিক্ত দয়ালু ব্যক্তিকে "দয়ার গাজী" বলা হইয়া থাকে। ইনিই সাধারণতঃ বরখান গাজী, বড়খাঁ গাজী বা বড়গাজী এবং গাজী সাহেব বলিয়া সুপরিচিত এবং কালুর সহিত তাঁহার নাম অঙ্গাঙ্গীভাবে বিজড়িত। এদেশের গ্রামাঞ্চল, নদ-নদী, সুন্দরবন এমনকি আলো বাতাসের সহিত এই গাজী সাহেবের নাম জড়িত রহিয়াছে।

এখন আমরা গাজীর সহিত দক্ষিণ রায় ও মুকুট রায়ের যুদ্ধের বর্ণনা দিব। উহার পূর্বে সত্যাসত্য নির্ধারণের জন্য কয়েকটি বিষয় আলোচনা করিতেছি। অনেকে মনে করেন গাজী কালুর কাহিনী, সোনাবান, জয়গুণ বিবি, বনবিবি, বিরাগগুরু প্রভৃতি পুঁথির ন্যায় অলীক গল্পে পূর্ণ কিন্তু তাহা ঠিক নহে। সমুদ্রের রাশি রাশি বালুকণার মধ্যে যেমন কদাচিৎ মণিমুক্তা পাওয়া যায়, তেমন পুঁথির আবর্জনারাশির মধ্যেও কিছু কিছু ঐতিহাসিক সত্য নিহিত আছে। স্থানীয় প্রবাদ, মুকুট রায়ের রাজ বাড়ীর ভগ্নাবশেষ, গাজীর দরগাহ, চম্পাবতীর দরগা প্রভৃতি নিদর্শন হইতে বহু সত্য উদ্ধার করিতে সক্ষম হইয়াছি। কোট চাঁদপুরের পশ্চিমদিকে বিখ্যাত জয়দিয়া বাওড়ের পার্শ্বে মুকুট রায়ের রাজবাড়ীর ভগ্নাবশেষ আছে বলিয়া জনশ্রুতি আছে। মুকুট রায়ের যুদ্ধ ও চম্পাবতী হরণের কাহিনী এতদঞ্চলে শ্রুত হয়। কিন্তু উহা প্রবাদ মাত্র।

যশোর জিলার ঝিকিরগাছার দুই মাইল পূর্বে লাউজানি গ্রাম। বর্তমান রেল লাইনের দক্ষিণ ও উত্তরে এই গ্রামের বিস্তৃতি। বজ্রারের বিখ্যাত

কালিবাবুর রাস্তা এই গ্রামের মধ্য দিয়া কলিকাতায় গিয়াছে। রাস্তার দুই পার্শ্বে অসংখ্য প্রাচীন বৃক্ষ কালের সাক্ষী হইয়া রহিয়াছে। পূর্বেই বলিয়াছি রেল লাইনের উত্তর দিকে লাউজানি গেটের পূর্বে বিখ্যাত গাজীর দরগা অবস্থিত। ইহা বর্তমানে মল্লিকপুর মৌজার মধ্যে পড়িয়াছে। বড় রাস্তার সংলগ্ন দক্ষিণ দিকে এই দরগা অবস্থিত। দরগায় পূর্বে একখানি ঘর ছিল। সে ঘর এখন আর নাই। উন্মুক্ত স্থানই দরগা হিসাবে পরিচিত। বহু পূর্বে এখানে প্রতিবৎসর মেলা বসিত। বর্তমানে দরগার সংলগ্ন দক্ষিণ দিকে পোষ্ট অফিস ও মাদ্রাসা আছে। ইহার পূর্বদিকে চম্পাবতী নামীয় পুকুর। ইহার একটু পূর্বে "বাঘমারীর পুকুর।" লোকে বলে গাজী এখানে ব্যাঘ্র বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন। দরগার সংলগ্ন "আমুডী কুয়া" বা "মৃতঞ্জীব কূপ"— এখনও লোকে সেই স্থান দেখাইয়া থাকে। একটি বটগাছের নিম্নে এই কুয়া অবস্থিত ছিল। স্থানীয় বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিরা তাহাদের পূর্ব পুরুষের মুখে সে কথা শুনিয়াছেন। পরে এই কূপের সন্ধান করা হইয়াছে, কিন্তু পাওয়া যায় নাই। কথিত আছে যে ঐ কূপের জল ছিটাইয়া দিলে মৃত ব্যক্তি বাঁচিয়া উঠিত। ইসলামিক দৃষ্টিভঙ্গি ও দার্শনিক যুক্তির মাপকাঠিতে ইহা একেবারেই অবিশ্বাস্য। তবে তথাকথিত এই মৃতঞ্জীব কূপ বা "জীয়ত কুঁড়ির" স্থান নির্দিষ্ট আছে এবং সাধারণ লোকে উক্ত গল্প সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে। দরগার দক্ষিণদিকে খনিয়া বা কুনিয়ার রণক্ষেত্র। সে ময়দান স্থানীয় লোকে আমাদের দেখাইয়া দেয়। এই ময়দানেই গাজীর সহিত দক্ষিণ রায়ের 'মহাযুদ্ধ' সংঘটিত হইয়াছিল। তিন চারি বর্গমাইল ব্যাপী মুকুট রায়ের রাজধানী এবং শহর বিস্তৃত ছিল। রাজধানীর নাম ছিল ব্রাহ্মণ নগর। স্থানীয় লোকে এখনও ঐ নাম জানে—লাউজানী উহার বর্তমান নাম। বাবু রামসঙ্কর সেন লিখিয়াছেন যে মুকুট রায়ের রাজধানী খড়িয়া নগরে ছিল। খনিয়া, কুনিয়া বা খড়িয়া একই স্থানের বিভিন্ন নাম। ইহা রাজধানী ব্রাহ্মণ নগরের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত। এখানে শহরের কোন চিহ্ন আমরা দেখিতে পাই নাই।

দরগার কিছুদূর পশ্চিমে লাউজানীর ক্ষুদ্র বাজার অবস্থিত। এই বাজারের দক্ষিণে কলিকাতার রাস্তা ও রেল লাইন। মুকুট রায়ের রাজবাড়ীর সীমানার

মধ্য দিয়া রেল লাইন চলিয়া গিয়াছে। ইহার দক্ষিণ দিকে মুকুট রায় খনিত প্রকাণ্ড দীঘি। উহা পূর্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ। দীঘির দক্ষিণ পাড়ে মুকুট রায়ের রাজবাড়ীর ভগ্নাবশেষের নিদর্শন অদ্যাপি বিদ্যমান। রাজবাড়ীর ভিটায় চাষীরা চাষ করিয়া ফসল ফলাইতেছে। জমি খুঁড়িলে প্রাচীন কালের ইট পাওয়া যায়। দীঘির দক্ষিণ পার্শ্বে পাকা ঘাট ছিল। সে চিহ্ন এখন আর নাই। রাজবাড়ীর দক্ষিণ দিকে অন্দর মহলের একটি পুকুর ছিল। রাজবাড়ীর ভিটায় একটি প্রকাণ্ড হরীতকী বৃক্ষ ছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে শিশুরা এই বৃক্ষতলে জমায়েত হইয়া হরীতকী ফল সেবন করিত। চাচ্ড়ার রাজষ্টেট হইতে এই বৃক্ষটি ছেদন করিয়া রাজবাড়ীর সৌখিন আসবাব পত্র প্রস্তুত করা হইয়াছিল। মুকুট রায়ের জমিদারী পরবর্তী কালে চাচ্ড়া ও নলডাঙ্গার রাজাদের মধ্যে বণ্টন হইয়া যায়। নলডাঙ্গার অংশ ছিল চারি আনা এবং চাচ্ড়ার বার আনা। বর্তমানে প্রজাগণ ঐ সম্পত্তি খাশে ভোগ-দখল করিতেছে। নোয়াখালী জেলার বহু দরিদ্র কৃষক পরিবার এখন রাজবাড়ীর আসে পাশে বসবাস করিতেছে।

মুকুটরায় গুড় গাঁঞিভুক্ত শ্রোত্রিয় ব্যাহ্মণ ছিলেন। মুসলমান আক্রমণের পূর্ব হইতেই তাঁহারা এদেশে বাস করিতেন। সেই জন্য সম্ভবতঃ স্থানের নাম হইয়াছিল ব্রহ্মণনগর। এই স্থানের উত্তরে গুংড়ী নদী প্রবাহিত ছিল। বর্তমানে এই নদী মজিয়া গিয়াছে। দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে হরিহর নদী এবং পশ্চিমদিকে কপোতাক্ষ নদী প্রবাহিত ছিল। ইহার মধ্যে পরিখা বেষ্টিত দুর্গে সাড়ম্বরে রাজা মুকুট রায় বাস করিতেন। কেহ কেহ বলেন যে তাঁহার রাজ্য সম্ভবতঃ দক্ষিণ দিকে সুন্দরবন ও পশ্চিমে হুগলী নদী পর্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছিল।

মুকুটরায়ের সেনাপতির নাম ছিল দক্ষিণ রায়। তিনিও জাতিতে ব্রাহ্মণ এবং রাজার আত্মীয়। উপরোক্ত তথ্য হইতে ইহাই সপ্রমাণিত হয় যে গাজী-কালু; চম্পাবতী, মুকুটরায় এবং তদীয় সেনাপতি দক্ষিণ রায় সকলেই ঐতিহাসিক চরিত্র। পরবর্তী আলোচনা হইতে এই ইতিহাস আরও স্পষ্ট হইয়া পড়িবে। এখন মুকুটরায় ও দক্ষিণ রায়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি।

যশোর অঞ্চলে মুকুট রায়ের নাম না জানেন এমন লোক নাই। ঝিকির গাছা অঞ্চলের সাধারণ লোকেরা তাঁহাকে মটুক রাজা বলিয়া অভিহিত করে। সতীশবাবু তদীয় যশোর খুলনার ইতিহাসে কয়েকজন মুকুট রায়ের উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা একে একে তাঁহাদের পরিচয় দিতেছি। প্রথম— জমিদার মুকুট রায়, তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম বিনোদ রায়। ইনি জাতিতে ব্রাহ্মণ। যশোর জিলার উত্তরে তাঁহার জমিদারী ছিল। নলডাঙ্গার রাজ বংশের প্রবল প্রতাপে সেই বংশের জমিদারী বিলুপ্ত হয়। দ্বিতীয় মুকুট রায় ঝিনাইদহ অঞ্চলে। ইনি একজন প্রতাপশালী জমিদার ছিলেন। তিনিও জাতিতে ব্রাহ্মণ। লোকে তাঁহাকে রাজা মুকুট রায় বলিত। তাঁহার ভ্রাতার নাম গন্ধর্ব রায়। গৌড়ের সুলতান তাঁহাকে খাঁ উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। তাঁহার বহু সৈন্য সামন্ত এবং অশ্ব ও হস্তী ছিল। তিনি জন হিতার্থে অসংখ্য জলাশয় খনন ও রাস্তা নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। এখনও ঝিনাইদাহ অঞ্চলে উহার চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। ঢোল সমুদ্র নামক জলাশয় সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। ঝিনাইদহের পূর্ব দিকে বিজয়পুরে তাহার রাজধানী ছিল। উহার দক্ষিণ পশ্চিমে বাড়ী বাথান নামক স্থানে তাঁহার প্রকাণ্ড গোশালা ছিল। কথিত আছে যে তাঁহার ১৬ হল্‌কা হাতী, ২০ হল্‌কা ঘোড়া এবং ২২০০ কোড়াদার ছিল। তিনি অসখ্য গাভী পুষিতেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে বৃন্দাবনের "নন্দ মহারাজ" আখ্যা দিয়াছিল। বেড়বাডী নামক স্থানে তাঁহার উদ্যানবাটী অবস্থিত ছিল। রঘুপতি ঘোষ রায় তাঁহার প্রধান সেনাপতি ছিলেন। মুকুট রায়ের গয়েশউদ্দিন নামীয় আর একজন প্রধান সেনাপতি ছিলেন। তাঁহারই নামানুসারে তদীয় কর্মস্থলের নাম হইয়াছে গয়েশপুর। চণ্ডী সর্দার ও কেশব সর্দার নামে তাঁহার আরও দুই জন প্রধান সৈন্য ছিলেন। কথিত আছে গৌড়েশ্বরের সৈন্যের সহিত বাড়ীবাথানে মুকুট রায়ের এক যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে হিন্দু রাজা পরাজিত হইয়া বশ্যতা স্বীকার করেন।

প্রবাদ আছে যে কোন রাজা বন্দী হইলে সঙ্গে দুইটি কপোত উড়িয়া যাইত। বন্দীকে হত্যা করা হইলে কপোত দুইটি ফিরিয়া আসিত। পারাবত প্রত্যাগমন করিয়াছে জানিতে পারিলে বন্দীর স্ত্রী পুত্র সকলে মিলিয়া আত্মহত্যা

করিয়া ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে বংশ চিহ্ন মুছিয়া ফেলিত। অনেক সময় বন্দী নিষ্কৃতি পাইলেও দৈবক্রমে পারাবত উড়িয়া আসিয়া বংশ নির্লোপ করিয়া দিত। কথিত আছে যে এইরূপ ভুলের জন্য দেবগ্রামের দেবপাল রাজা, দেউলিয়ার চন্দ্র কেতু, মোহাম্মদপুরের সীতারাম ও বাড়ীবাথানের এই মুকুট রায়ের বংশ ধ্বংস হইয়াছিল। সামাজিক কুসংস্কার ও কুশিক্ষার জন্য এহেন বিপদ ঘটিয়া থাকিবে। কথিত আছে মুকুট রায়ের কপোত ফিরিয়া আসিবা মাত্র তাঁহার পরিবারবর্গ গুপ্তদুর্গের পার্শ্ববর্তী পরিখাতে নিমজ্জিত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করেন। যেখানে তাঁহার কন্যারা মরেন তাহা "কন্যাদহ," যেখানে তাঁহার দুই স্ত্রী নিমজ্জিত হন, তাহা দুই সতীনে বলিয়া খ্যাত। বর্তমানে সে পরিখা ও দুর্গ চিহ্ন বিলুপ্ত হইয়াছে। এই মুকুট রায়ের সহিত গাজীর যুদ্ধের কোন উল্লেখ নাই।

তৃতীয় মুকুট রায়ের বাড়ী ছিল ব্রাহ্মণ নগর। তাঁহার কথা পূর্বেই বলিয়াছি। তাঁহার রাজ্য শাসন কার্যের সুবিধার জন্য দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। তাঁহার অধীনে বিপুল সংখ্যক পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য ছিল। তিনি নিজে উত্তর দিকের শাসনভার স্বহস্তে পরিচালনা করিতেন। দক্ষিণ দেশে বা ভাটি মুল্লুকের শাসনভার দক্ষিণরায়ের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। লোকে তাঁহাকে ভাটিশ্বর এবং আঠার ভাটির রাজা বলিত। এজন্য তাঁহার শক্তিশালী নৌবাহিনী ছিল। সুন্দরবন অঞ্চলে দক্ষিণ রায়ের প্রতাপ অত্যধিক ছিল। তিনি ছিলেন বীর্যবান বীর পুরুষ এবং তীর, ধনুক ও অন্যান্য অস্ত্রের সাহায্যে বহু ব্যাঘ্র ও কুমীর শিকার করিতেন। এজন্য সুন্দরবনে দক্ষিণ রায়ের নাম সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। কৃষ্ণদাস প্রণীত "রায়মঙ্গল" গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে ২৪ পরগনার দক্ষিণে জঙ্গল কাটাইয়া প্রভাকর নামে জনৈক রাজা একটি রাজ্য স্থাপন করেন। দক্ষিণ রায় তাঁহার পুত্র। সম্ভবতঃ দক্ষিণ রায়ের ব্যাঘ্র শিকারের খ্যাতি শ্রবণে মুকুট রায় তাঁহাকে সেনাপতির পদে অধিষ্টিত করিয়াছিলেন।

আমরা যে কয়েকজন মুকুট রায়ের কথা আলোচনা করিয়াছি, তন্মধ্যে শেষোক্ত মুকুট রায়ই আমাদের আলোচ্য ব্যক্তি। চম্পাবতী বা সুভদ্রা তাঁহার একমাত্র কন্যা, দক্ষিণ রায় তাঁহার সেনাপতি এবং গাজীর সহিত খনিয়ার যুদ্ধদানে

তাঁহারই "মহাযুদ্ধ" সংঘটিত হইয়াছিল। মুকুট রায়ের স্ত্রীর নাম লীলাবতী। তাঁহার সাত পুত্র ও এক কন্যা ছিল। সাত ভাইয়ের এক বোন চম্পাবতী—সকলেরই বিশেষ আদরণীয় ছিল। কোন আদরের ভগ্নির কথা উঠিলে আমাদের দেশে এখনও লোকে "সাত ভাই চম্পার" কথা বলিয়া থাকে। গানের সুরে ও সে কথা সুমধুর ঝঙ্কারে গীত হয়। "সাত ভাই চম্পা জাগরে"—এই সুরলহরীর সন্ধান অনেকে জানেন না। ইনি সেই মুকুট কন্যা এবং গাজীর সহধর্মিণী চম্পাবতী। কবি ও গায়কের নিকট এই নাম অতীব প্রিয়। চম্পাবতীর অপরূপ সৌন্দর্যের খ্যাতি ছিল। তাঁহার নাম রূপ কথার রাজকন্যার ন্যায় রোমঞ্চকর কাহিনীতে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু ইনি ছিলেন প্রকৃত রূপবতী রাজকন্যা।

পুঁথিতে আছে যে গাজী তাঁহাকে বিবাহ করিবার জন্য পাগলপ্রায় হইয়া পড়েন এবং বিবাহের প্রস্তাব সহ কালুকে মুকুট রায়ের দরবারে প্রেরণ করেন। কালু বন্দী হইলে তাঁহার মুক্তির জন্য গাজী সোনারপুর হইতে যুদ্ধ যাত্রা করেন। প্রবাদ আছে যে গৌড়ের সুলতান হোসেন শাহ্‌ও গাজীকে সৈন্য দিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন। পুঁথিতে গাজীর চরিত্রের উপর কলঙ্ক আরোপ করা হইয়াছে এবং তাঁহাকে ইন্দ্রিয়পরায়ণ ও কামুক বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। তিনি যে চম্পাবতীর উপর আসক্ত ছিলেন এবং তাহাকে বিবাহ করিবার জন্য রক্তগঙ্গা বহাইয়া দিয়াছিলেন ইত্যাদি ঘটনা পুঁথি লেখকদের কল্পনাপ্রসূত রসাল কাহিনী। এই ধরনের কাহিনী সংযোজিত না করিলে বাজারে পুঁথি চলে না এবং অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত পাঠক ও শ্রোতাদের আসর জমিতে পারে না। সতীশবাবু বলিয়াছেন, "এ বিষয় মুসলমান পুঁথিতে গাজী সাহেবের কামুকতার যে বিস্তৃত কাহিনী আছে তাহা সম্পূর্ণ অলীক বলিয়া বোধ হয়।" প্রকৃতপক্ষে গাজী ধর্মপরায়ণ ও পূত চরিত্রের লোক ছিলেন। তাঁহার ন্যায় ধর্মযোদ্ধা দিব্যজ্ঞানী সেনানায়কের এইরূপ কুৎসিত চরিত্র কল্পনা ভিন্ন অন্য কিছু নহে।

প্রকৃত ব্যাপার এই যে, গাজী সম্ভবতঃ ব্রাহ্মণ রাজা মুকুট রায়ের ইসলাম বিদ্বেষের কথা জানিতেন। দক্ষিণ রায়ও ইসলাম বিদ্বেষী ছিলেন। এ সম্পর্কে সতীশবাবু বলিয়াছেন "মুকুট রায় অতিরিক্ত যবনবিদ্বেষী ছিলেন; তখন সম্যক্

শাসন বিস্তৃত না হইলেও দেশ যবনাধিকার ভুক্ত ছিল। কিন্তু তবুও মুকুট রায় যবনের আধিপত্য স্বীকার করিতেন না, যবনের মুখ দর্শন করিতেন না; কোন কারণে যবন দর্শন করিলে তজ্জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতেন।" দক্ষিণ রায় সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন: "দক্ষিণ রায়ও মুকুট রায়ের মত যবনদ্বেষী ছিলেন। এই যবনদ্বেষই তাহাদের কালস্বরূপ হইয়াছিল।"কালুকে সম্ভবতঃ মুকুট রায়ের দরবারে ইসলামী দাওয়াত কবুল করার জন্য প্রেরণ করা হইয়াছিল। রাজা মুকুট রায় ইহাতে অপমানিত মনে করিয়া কালুকে বন্দী করিয়াছিলেন। ইস্‌লাম ধর্মের প্রতি অবমাননা এবং কালুর বন্দী হেতু গাজী সমরায়োজন করিতে বাধ্য হইয়া ছিলেন। যে গাজী সংসারের সুখ স্বাচ্ছন্দ ত্যাগ করিয়া ফকিরী বেশ ধারণপূর্বক বনে জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াইতেন, তাঁহার পক্ষে চম্পার রূপের কথা শুনিয়া তাহাকে পাইবার জন্য যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার কাহিনী অলীক বলিয়া মনে করি। এই ধরণের যুদ্ধকে ধর্ম যুদ্ধ বলা হয় না এবং এহেন বিজয়ী বীর গাজী আখ্যা পাওয়ার অযোগ্য।

প্রকৃত ব্যাপর এই যে মুকুট রায়ের রাজধানী ব্রাহ্মণ নগরের সংলগ্ন খনিয়ার রণক্ষেত্রে গাজীব সহিত মুকুট রায়ের যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। এই যুদ্ধে দক্ষিণ রায় সেনাপতিরূপে মুকুটের পক্ষে যুদ্ধ করেন। পুঁথিতে গাজীর ব্যাঘ্র সৈন্য এবং দক্ষিণ রায়ের কুমীর সৈন্যের উল্লেখ আছে। এই কথার বিশেষ তাৎপর্য আছে বলিয়া মনে করি। ২৪ পরগণা জেলার হিজলী, হাতীয়াগড, সোনারপুব এবং বর্ধমান ও হুগলী অঞ্চল হইতে গাজী ব্যাঘ্রের ন্যায় শক্তিশালী পাঠান সৈন্য এই যুদ্ধের জন্য নিয়োগ করিয়াছিলেন। সেই জন্য পুঁথিতে আজগুবি ব্যাঘ্র সৈন্যের কথা বলা হইয়াছে। দক্ষিণ রায় ভাটি অঞ্চলের প্রতাপশালী যোদ্ধা, সুন্দরবনের নদনদীতেই তাঁহার আধিপত্য। তিনি নৌসেনার অধিনায়ক ছিলেন। সেজন্য তাঁহার পক্ষের যোদ্ধাদের কুমীর সেনা বলা হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে গাজীর শক্তিশালী পদাতিক সৈন্যের সহিত দক্ষিণ রায়ের নৌবাহিনীর যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল।

খনিয়ার ময়দানে গাজীর সেনাদলের সহিত দক্ষিণ রায়ের সৈন্যদের মধ্যে ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয়, তাহা ঐতিহাসিক ঘটনা। কথিত আছে যে

গৌড় সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ, গাজীকে এই যুদ্ধে সৈন্য দ্বারা সাহায্য করিয়াছিলেন। অবশ্য এ বিষয়ের সঠিক তথ্য পাওয়া দুষ্কর। কয়েক দিন ধরিয়া ভীষণ যুদ্ধ চলিয়াছিল। দক্ষিণ রায়ের সৈন্যগণ বীর বিক্রমে যুদ্ধ করিয়াছিল। শেষ পর্যন্ত তাহারা মুসলমানদের নিকট টিকিতে পারিল না। যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া গাজীর সৈন্যগণ সদলবলে রাজপুরীর মধ্যে প্রবেশ করিলে মুকুট রায় আত্মসমর্পণ করেন। পরাজয়েব গ্লানি হইতে রক্ষা পাইবার জন্য মুকুটের পরিবারবর্গের অনেকেই কূপে পড়িয়া আত্মহত্যা করেন। মুকুটের সর্ব কনিষ্ঠ পুত্র কামদেব এবং এক মাত্র কন্যা সুভদ্রা বা চম্পাবতী সৈন্যদের হস্তে বন্দী হইয়াছিল। কামদেব পবে ইসলাম গ্রহণ করিয়া পীর ঠাকুরবর নামে প্রসিদ্ধ হন। তিনি দেশব্যাপী ধর্ম প্রচার করিয়া বেড়াইতেন। তাঁহার বিষয় অনেক কিংবদন্তী আছে। সেনাপতি দক্ষিণ রায় পরাজিত হইবার পর যুদ্ধ সমাপনান্তে গাজীর সহিত সখ্য সূত্রে আবদ্ধ হন। মুকুট রায় ইহার পর দেশত্যাগ করেন। কেহ কেহ বলেন তিনিও কূপে পড়িয়া আত্মহত্যা করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধের পর বীর সেনানায়ক বরখান "গাজী" উপাধিতে ভূষিত হন। ইহাই যুদ্ধের সার কথা।

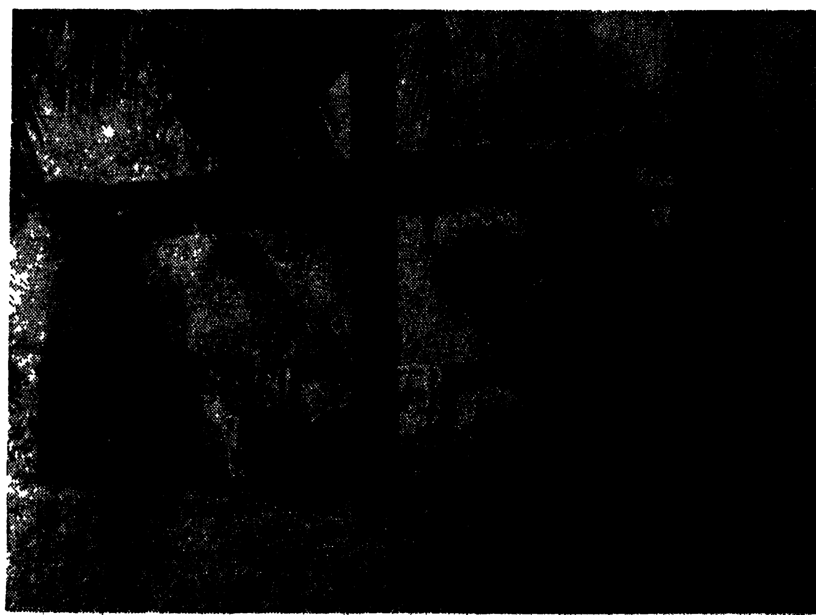
যুদ্ধশেষে চম্পাবতী মুসলীম শিবিরে নীত হইলে গাজীর সহিত তাহার বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। গাজী শেষ পর্যন্ত ভক্তগণের অনুরোধে চম্পাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই দাম্পত্য জীবনের ইতিহাস অজ্ঞাত। কেহ কেহ বলেন গাজী চম্পাকে বিবাহ করেন নাই, আবার পুঁথির ভাষায় বিবাহ করিয়া পরে গাজী তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছিলেন। চম্পাবতীর সহিত গাজীব শেষ পর্যন্ত বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল। সম্ভবতঃ ফকির গাজী সংসার বিরাগী বিধায় তাঁহার সহিত রাজকন্যা চম্পার দাম্পত্য জীবন খাপ খায় নাই। গাজীর কবর সিলেট জেলায় এবং চম্পাবতীর কবর খুলনার পশ্চিম সীমান্তে। উভয়ে একত্রে বসবাস করিলে একই স্থানে সমাধিস্থ হওয়া স্বাভাবিক। গাজী ও চম্পাবতীর সমাধি ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিলীন হয় নাই। শেষ জীবনে চম্পাবতী ধর্ম সাধনায় ও আত্ম চিন্তায় কালাতিপাত করেন। তাঁহার যাহা কিছু বিষয় সম্পত্তি ছিল সমস্তই পর সেবায় দান করিয়া এমন আদর্শভাবে জীবন যাপন করিতেন যে জাতি ধর্ম

নির্বিশেষে সকলে তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকিত, মায়ের ন্যায় ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিত। সেইজন্য এই মহিয়সী মহিলার নাম হইয়াছিল মা চম্পা বা "মাই চম্পা বিবি।" তাঁহার তিরোধানের পর তদীয় ভক্তবৃন্দ তাঁহার স্মৃতি সৌধ নির্মাণ করিয়া দেন। চম্পাবতী মুসলমানের পত্নী না হইলে তাঁহার দেহ সমাহিত করা হইত না। জাফর খান গাজী কর্তৃক ত্রিবেনী বিজয় ঘটনা অবলম্বনে যে ঐতিহাসিক উপন্যাস রচিত হইয়াছে তাহাতে গাজী ও চম্পার কবরের দুইখানি হাফটোন ছবি আছে। ইহা উপন্যাস ইতিহাস নহে। সাতক্ষীরা শহরের তিন মাইল উত্তরে লাবসা গ্রামে মাই চম্পার দরগা আজিও তাঁহার স্মৃতি রক্ষা করিতেছে। বারাসাতের নিকট ঘোলা গ্রামে মাই চম্পার একটি প্রসিদ্ধ আস্তানা আছে।

মুকুট রায়ের একমাত্র কন্যা সুন্দরী শ্রেষ্ঠা চম্পাবতী লাবসা গ্রামে চিরশায়িত। কালের কষাঘাতে জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া সমাধি সৌধটি মৃত্তিকার নিম্নে পড়িয়া যায়। বহু পরে মৃত্তিকা খনন করিয়া উহা বাহির করা হয়। চম্পাবতীর নামের সহিত অনেক অলৌকিক কাহিনী জড়িত আছে। দরগার পার্শ্বে ও উপরে একটি চম্পক ফুলের গাছ এবং প্রাচীন কালীন দুইটি বটবৃক্ষ, একটি নিমগাছ ও অন্যান্য বৃক্ষলতা স্থানটিকে জঙ্গলাবৃত করিয়া রাখিয়াছে। সমাধি সৌধের চারিটি স্তম্ভ ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। এই জরাজীর্ণ দরগার সংস্কার আবশ্যক। পূর্বে এখানে চৈত্র, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে সাতক্ষীরার গুড় পুকুরের মেলার ন্যায় হিন্দু মুসলমানের বিরাট মেলা বসিত। প্রায় ২৫ বৎসর হইল আলেমগণ ফতোয়া দিয়া ঐ মেলা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। মেলায় অসংখ্য মুরগী ও ছাগল মানত হিসাবে আসিত। হিন্দুগণ শনি ও মঙ্গলবারে দরগায় পূজা দিত।

মাই চম্পার জীবন কাহিনী সম্পর্কে অনেকেই অজ্ঞ। ইতিহাস এ বিষয় এক প্রকার নীরব। খুলনা গেজেটীয়ার প্রণেতা মিঃ ওমালি একটি প্রবাদের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন: "চম্পা বাগদাদ নগরীর খলিফা বংশের অবিবাহিতা কন্যা। ইসলাম ধর্ম প্রচার ও প্রসারের জন্য তিনি মহানগরী বাগদাদ হইতে সুদূর বঙ্গদেশে আগমন করিয়াছিলেন। ইসলাম ধর্ম প্রচার করিতে করিতে চম্পা একদিন নৌখালি নদীর মধ্য দিয়া নৌকাযোগে





উপরে : চম্পাবতীর (মাইচম্পা) দরগা, লাবশা, খুলনা।

নীচে : সুলতানপুরের প্রাচীন মসজিদ, সাতক্ষীরা, খুলনা।

যাইবার সময় লাবসা গ্রামে তাঁহার নৌকা ডুবি হয়। তিনি ও তাঁহার সঙ্গীরা এই দুর্ঘটনা হইতে রক্ষা পান এবং তখন হইতে নদী তীরে লাবসা গ্রামে আস্তানা স্থাপন করেন। সেখানে তাঁহার শিষ্য সংখ্যা বাড়িয়া যায়। তাঁহার মৃত্যুর পর শিষ্যগণ তদীয় সমাধির উপর এক স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করেন।" ওমালি সাহেব এই গল্প অবিশ্বাস করিয়াছেন। চম্পাবতী যে হিন্দু রাজকন্যা তাহাও তিনি উল্লেখ কবিয়াছেন, কিন্তু কোন ঐতিহাসিক সূত্র পরিবেশন করিতে পারেন নাই।

এখন আমরা গাজীর শেষ জীবন সম্বন্ধে আলোকপাত করিতে চেষ্টা করিব। শেষ পর্যন্ত যশোর অঞ্চল হইতে গাজী ইসলাম ধর্ম প্রচার করিতে করিতে আসামের দিকে চলিয়া যান। তথায় গাজীর ইসলাম প্রচারের কাহিনী লোকমুখে শ্রুত হয়। কথিত আছে যে সিলেট জেলায় গাজীর শেষ জীবন অতিবাহিত হয়। সেখানেও তাঁহার নামীয় দরগা আছে। গাজী অতঃপর শেষ জীবনে সিলেটের অন্তর্গত হবিগঞ্জ মহকুমায় দেহত্যাগ করেন। এখানে বিশগাঁও (পরবতী নাম গাজীপুর) গ্রামে অদ্যাপি গাজীর সমাধি ও আস্তানা অক্ষতরূপে বিদ্যমান থাকিয়া ধরাপৃষ্ঠে গাজীর বহু শতাব্দী পূর্বের শৌর্যবীর্য ও ইসলাম প্রচাবের কথা সগৌরবে ঘোষণা করিতেছে। সৈয়দ আবদুল আগফর লিখিত ও ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত তরপের ইতিহাসে আছে "সা গাজী বিলগ্রামের অন্তর্বর্তী গাজীপুরে তাঁহার দরগা আছে। সৈয়দ নাসিরুদ্দীন সা গাজীর সহায়তায় ত্রিপুরার রাজাকে পরাজিত করিয়া তরফ দখল করেন।" ষ্টেপেলটন সাহেব বিশগাঁও গ্রামে গাজীর সমাধির কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

এইক্ষণ আমরা দক্ষিণ রায় ও গাজীর শেষ পরিচয় বর্ণনা করিব। দক্ষিণ রায়ের সঙ্গে তথাকথিত বনদেবতা বনবিবির নাম ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত। প্রতাপশালী যোদ্ধা দক্ষিণ রায় ব্যাঘ্রের দেবতা বলিয়া পরিচিত। সুন্দরবনের সর্বত্র বনবিবি ও গাজীর আধিপত্য বিরাজমান। আজিও নৌকার মাঝিরা উভয়ের নাম স্মরণ করিয়া জঙ্গলে প্রবেশ করিয়া থাকে। এই মানস সুন্দরী বনবিবি কে? ইতিহাস তাহা নির্ধারণ করিতে পারে নাই। জঙ্গলের লোকেরা রোমাঞ্চময়ী বনবিবিকে অতি আপন জন হিসাবে বিশ্বাস করে। বিপদ আপদে বনবিবির সাহায্যের প্রত্যাশী হয়। সুন্দরবনাঞ্চলের প্রায় সর্বত্র বনবিবির

কাহিনী অতিরঞ্জিত ও আজগুবি করিয়া গল্পের আসর জমানো হয়। অজ্ঞ লোকেরা বলে, বনবিবির আকৃতি বিরাটকায় নারীর ন্যায়। এহেন নারী মূর্তি সুন্দরবনের গভীর অরণ্যানীর মধ্যে একবৃক্ষ হইতে অন্য বৃক্ষে যাতায়াত করিতে দেখা যায়। ব্যাঘ্র, কুমীর প্রভৃতি হিংস্র জন্তু সবই তাহার অনুগত। সাধারণ লোকে এই কল্পিত কাহিনী সরল ভাবে বিশ্বাস করে।

"বনবিবির জহুরানামা" নামক পুঁথিতে বর্ণিত আছে যে মক্কাবাসী বেরাহিমের স্ত্রী গুলাল বিবি, সতীনের কৌশলে সুন্দরবনে নির্বাসিত হন। সেই সময় তিনি সন্তানসম্ভবা ছিলেন। বনের মধ্যে শাহ জঙ্গলী ও বনবিবি নামে তাঁহার দুই যমজ পুত্র-কন্যা জন্মগ্রহণ করে। বনবিবির বাল্যকাল রোমঞ্চকর কাহিনীর সহিত বিজড়িত। পুঁথিতে আছে,—

"বনের হরিণ সব খোদার মেহেরে॥
হামেশা পালন করে বনবিবির তরে॥
বেহেশতের হুর এসে কোলে কাঁখে নিয়া,
তুষিয়া মায়ের মত ফেরে বেড়াইয়া।"

ভাটি দেশের রাজা দক্ষিণ রায়ের কবল হইতে দুঃস্থ ও দুর্বলকে রক্ষা করার জন্য আল্লাহর আদেশে বনবিবি ও তাহার ভ্রাতা সুন্দর বনে থাকিয়া যায়। দক্ষিণ রায় প্রতাপশালী যোদ্ধা। তাঁহার সম্পর্কে বনবিবির পুঁথিতে আছে।

"এখানে দক্ষিণ রায় ভাটির ঈশ্বর
নানা শিষ্য কৈল সেই বনের ভিতর।"

অল্পদিনের মধ্যে কয়েকটি পরগনা বনবিবির অধীনতা স্বীকার করে। দক্ষিণ রায় এই আধিপত্য সহ্য করিতে নারাজ। তিনি বনবিবির বিরুদ্ধে সমরায়োজন করিতে লাগিলেন। কিন্তু পুরুষ হইয়া নারীর সঙ্গে কি করিয়া যুদ্ধ করিবেন? শেষ পর্যন্ত তিনি মাতা নারায়ণীকে বনবিবির সঙ্গে যুদ্ধ করিতে প্রেরণ করেণ। যুদ্ধে নারায়ণী পরাজিত হইয়া বনবিবির সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করেন। এই সন্ধি অধিকদিন স্থায়ী হয় নাই।

পুঁথিতে আছে এই সময় বরিজ হাটীতে ধোনাই মেনোই নামে দুই ভাই বাস করিত। তাহারা একদা সপ্তডিঙ্গা সাজাইয়া সুন্দরবনে মধু সংগ্রহ করিতে যায়। তাহাদের সঙ্গে এক দুঃখিনী বিধবার একমাত্র পুত্র দুঃখেও ছিল। সপ্তডিঙ্গা গড়খালি নদীতে পৌঁছিলে দক্ষিণ রায় তাহাদের নিকট নরবলি দাবি করেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া ধোনাই ও মোনাই দুঃখেকে রাখিয়া গেল। দুঃখে এহেন বিপদের মধ্যে মা বনবিবির কৃপা প্রার্থী হইল :—

"কহে মা বোন বিবি কোথা রইলে এই সময়
জলদি করে এসে দেখ তোমার দুঃখে মারা যায়।
কারার দিয়াছো মাগো যদি না পালিবে॥
ভাটি মধ্যে তোমার কলঙ্ক বয়ে যাবে।"

দুঃখের করুণ ক্রন্দনে যথা সময়ে সাড়া পড়িল। বনবিবি দুঃখের জীবন রক্ষার্থে দক্ষিণ রায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া দক্ষিণ রায় বনবিবির বশ্যতা স্বীকার করিলেন। এইভাবে দুঃখের জীবন রক্ষা পাইল। বনবিবির দোয়ার বরকতে দুঃখের অনাথিনী বিধবা মাতার অন্ধত্ব ও বধিরত্ব ঘুচিয়া গেল। দুঃখে বহু সম্পত্তির মালিক হইল। ধোনাইয়ের মেয়ে চম্পার সঙ্গে তাহার শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইল। সেই অবধি বনবিবি বনদেবতা বা মানস সুন্দরী দেবী। পুঁথিতে আরো আছে আমাদের আলোচ্য গাজী শাহ বনবিবির বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। ইহাই "বনবিবির জহুরা নামা" পুঁথির সারাংশ।

সতীশবাবু গাজী, বনবিবি ও দক্ষিণ রায়কে দেবতার আসনে স্থান দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, 'গাজী ও দক্ষিণ রায়ের উপব প্রভু ছিল, তাঁহারা যতই প্রভুত্ব করেন বনদেবতার (বনবিবি) স্থান তাঁহাদের অপেক্ষা অনেক উচ্চে।" তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন "পূর্বে দেখিয়াছি গাজী সাহেব বনবিবির বশ্যতা স্বীকার করিলেন। বনবিবি মানুষ হইয়া দেবতা হইয়া গেলেন. তাহার অনুগত বীর দক্ষিণ রায় কেন দেবতা হইবেন না?" সতীশবাবু তদীয় যশোর খুলনার ইতিহাসে সর্বত্র এইরূপ কুসংস্কারকে

ইতিহাস হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। এ সমস্ত নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক তথ্যের মূল নীতি বিরোধী। বনবিবি কাল্পনিক চরিত্র, গাজী ও দক্ষিণ রায় বীর যোদ্ধা হইলেও তাঁহাদিগকে দেবতা বা অতিমানুষ আখ্যা দেওয়া নিছক ধর্মান্ধতা বা কুসংস্কার।

গাজী-কালু ও চম্পাবতীর পুঁথিতে আবর্জনা রাশির মধ্যে কিছু কিছু ঐতিহাসিক তথ্য নিহিত আছে। কিন্তু বনবিবির পুঁথি নিছক কল্পিত কাহিনী। বটতলার পুঁথি লেখকেরা ব্যবসায়ের জন্য মক্কাবাসী হযরত ইব্রাহীমের সহধর্মিণী বিবি হাজেরার বনবাস কাহিনী অবলম্বনে এই পুঁথি রচনা করিয়াছেন। ইহাতে ইতিহাস নাই, আছে শুধু রোমাঞ্চকর কল্পিত কাহিনী। তবে দক্ষিণ রায়ের প্রতাপ সম্পর্কে যৎকিঞ্চিত তথ্য এই পুঁথিতে পাওয়া যায়।

সুন্দর বনাঞ্চলের এক শ্রেণীর অশিক্ষিত লোক বিশেষ করিয়া অজ্ঞ সমাজ বনবিবি ও গাজীর নামে দোহাই দেয়। হিন্দুরা এই আরাধ্য দেবতাদের নামে পাঠা বলি দিয়া থাকে, গাজীর দরগায় সিন্নী মানত করিয়া তাঁহার গায়েবী সাহায্যের আশা রাখে। ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রায় সমস্ত দরগায় শরিয়ত বিরোধী কার্য অবাধভাবে চলিয়া থাকে। মানুষ আল্লাহর নিকট কিছু প্রার্থনা না করিয়া সাধারণ মানুষ গাজী বা কল্পিত নারী বনবিবির সাহায্যের প্রত্যাশী হয়। এইভাবে বিপদ আপদে পীর দরবেশ ও গাজীদের সাহায্যের জন্য মানুষ আশা করিয়া থাকে। এবম্বিধ কুসংস্কার ও ধর্মবিরোধী কার্যসমূহ সমাজের এক শ্রেণীর লোকের মধ্যে প্রবেশ করিয়া মানুষকে গোমরাহীর দিকে লইয়া যাইতেছে। পীর পূজা ও গোর পূজার কবে অবসান হইবে তাহার নিশ্চয়তা নাই।

ইসলাম প্রচার, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য

।। বার ।।

ইসলামের আদি যুগেই বঙ্গদেশে ইসলাম প্রচারেব ঢেউ আসিয়াছিল। বঙ্গদেশ বিজিত হইবার পর ধর্ম প্রচারের পথ সুগম হইয়াছিল। যে সমস্ত মনীষী সংসার ধর্ম ও জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া সুদূর বঙ্গে আগমন করতঃ ইসলাম প্রচার করিয়া অক্ষয় কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের নাম লোকে ভক্তির সহিত স্মবণ করে। খানজাহান আলীর পূর্বে এবং পরে বহু মনীষী এদেশে ইসলাম প্রচার করিয়াছিলেন। মুসলীম বিজয়ের পূর্ব হইতে আউলিয়া ও ধর্ম যাজকগণ এদেশে ইসলাম প্রচার করিয়া রাষ্ট্র গঠনের পথ উন্মুক্ত করিতে সাহায্য করিয়াছিলেন।

রাজশক্তির মূলে সুফি দরবেশরাই প্রেরণা যোগাইয়াছিলেন এবং তাঁহারা গৌড় সুলতানদের হস্ত শক্তিশালী করিয়াছিলেন। কোন কোন সুলতান মস্‌জিদ ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করিয়া ইসলাম প্রচারে সাহায্য করিয়াছিলেন। সুফি দরবেশদের ত্যাগ, তিতিক্ষা ও সাধনা কম নহে। দুর্গম পাহাড় পর্বত, কান্তার মরুভূমি, বনজঙ্গল ও বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তাঁহারা এদেশে আসিয়াছিলেন। কেহ কেহ ধর্ম প্রচার করিতে গিয়া জীবন বিসর্জনও দিয়াছেন সে দৃষ্টান্ত বিরল নহে।

কোন্ সময় সর্ব প্রথম বঙ্গে ইসলাম প্রচার শুরু হয় সঠিক বলা যায় না। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক পাহাড়পুর খননের সময় বাগদাদের খলিফা হারুণার রসিদের একটি স্বর্ণ মুদ্রা পাওয়া যায় (১৭২ হিজরী = ৭৮৮ খৃঃ)। পাহাড়পুরের স্থাপয়িতা বৌদ্ধ রাজা ধর্মপাল এবং ময়নামতি শালবন বিহারের বৌদ্ধ রাজা ভবদেব হারুণার রসিদের সমসাময়িক। পূর্বোক্ত মুদ্রা প্রাপ্তিতে কেহ কেহ অনুমান করেন যে হারুণের সময়ই সর্ব প্রথম বঙ্গে ইসলাম প্রচার হয়।

সুলতান রুমী, সুলতান বলখী মাহিসোয়ার, বাবা আদম, জালালউদ্দীন তাব্রিজী এবং হযরত শাহদৌলাই বঙ্গে আগত প্রাথমিক যুগের দরবেশদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন বলিয়া অনেকে মনে করেন।

কোন কোন অমুসলীম ঐতিহাসিক বলিয়াছেন যে তরবারীর বলেই বিশ্বে ইসলাম প্রচারিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহা ঠিক নহে। ইসলাম যে সাম্য মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, তাহাই ইসলাম প্রচারে সহায়ক হইয়াছিল। আরব নাবিকেরা বঙ্গের সমুদ্র কূলবর্তী অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করিয়াছিলেন মুসলীম বিজয়ের পূর্বে।

পাক-ভারত বিজয়ের বহু পূর্বে মালবারের হিন্দু রাজা চেরুমন পেরুমল সদলবলে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। চীন, মালয়, ফিলিপাইন ও ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশে ধর্ম যাজক ও ব্যবসায়ীরা ইসলাম ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। এই সমস্ত দেশে মুসলমানদের সহিত ভিন্ন মতাবলম্বীদের কোন প্রকার যুদ্ধ বিগ্রহ সংঘটিত হয় নাই। সুফীবাদ সম্পর্কে ফরাসী লেখক মেসিনিও বলিয়াছেন; "মুসলমান শেখ ও দরবেশগণ জনগণের সহিত মিলিয়া মিশিয়া তাহাদের ভাষা আয়ত্ত করিয়া এমন পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছিলেন যে অসংখ্য হিন্দু ও মালয়ীকে ইসলামে দীক্ষিত করার পথ সুগম হইয়াছিল। বিদেশাগত দিগ্বিজয়ীদের অত্যাচার ও ধর্মান্ধতা বিশেষ ফলপ্রসূ হয় নাই। ইসলাম প্রচারকদের বিনয় ও নম্রতায় সাধারণ মানুষ মুগ্ধ হইয়া ভক্তিভরে তাঁহাদের নামে বহু অলৌকিক ঘটনা পর্যন্ত সৃষ্টি করিতে কুণ্ঠিত হইত না।

কথিত আছে যে লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বকালের শেষভাগে শাহ্ জালালউদ্দীন তাব্রিজী নানা প্রকার নির্যাতন সহ্য করিয়া স্বধর্ম প্রচারের জলন্ত দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন। লক্ষ্মণসেনের সভাকবি হলায়ুধ মিশ্র লিখিত শেক সুভদয়া গ্রন্থে এ বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণী প্রদত্ত হইয়াছে। তিনি উত্তরাঞ্চলে ব্যাপকভাবে ধর্ম প্রচার করেন। পাণ্ডুয়ার দেওতলায় তাঁহার সমাধি অবস্থিত। এক শিলালিপিতে "জালালউদ্দীন জালাল্লাহু জালালে আরেফা বুদ" "এই ফার্সি বয়াত লিখিত আছে, অর্থাৎ তিনি আল্লার প্রদীপ ও দরবেশদের শিরমণি। সৈয়দ মুর্তজা আলী তদীয় গ্রন্থ শাহ্ জালাল ও সিলেটের ইতিহাসে বলিয়াছেন, তাব্রিজী সাহেব সম্রাট আলতামসের রাজত্বকালে (১২১০ — ১২৩৬) এদেশে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত লক্ষ্মণ সেনের সাক্ষাৎকারের কাহিনী ভ্রমাত্মক। প্রখ্যাত দরবেশ বাহাউদ্দীন জাকারিয়া তাঁহার প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছিলেন।

মুসলীম বিজয়ের প্রাক্কালে আউলিয়াকুলশ্রেষ্ঠ তাপস খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্‌তি দিল্লী ও আজমীরে আসিয়া ইসলাম ধর্মের মহিমা প্রচারে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। গরীবের বন্ধু বলিয়া তাঁহার উপাধি ছিল খাজা গরীব নেওয়াজ। তিনি ও তদীয় শিষ্যগণ পাক-ভারতে ইসলাম প্রচারে যতটুকু করিয়াছেন, কোন মুসলীম সম্রাট বাহুবলে তাহা করিতে পারেন নাই। এই জন্য তাঁহাকে ভারতের মুকুট বিহীন সম্রাট আখ্যায় আখ্যায়িত করা হইয়াছে। তাঁহার তিরোধানের পর তুর্ক আফগান রাজত্বের সময় কুতুব দিল্লীর আউলিয়া খাজা কুতুবউদ্দীন বখতিয়ার কাকী এবং হযরত খাজা নিজামউদ্দীন আউলিয়া ইসলাম প্রচারে ব্রতী হইয়াছিলেন।

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীতে বহু দরবেশ বঙ্গদেশে ইসলাম প্রচারকল্পে শুভাগমন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে পাণ্ডুয়ার তাপসপ্রবর খাজা নূর কুতুব-উল-আলমের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাজা গণেশ ও তৎপুত্র যদু (জালালউদ্দীন) এই মহাত্মার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রভাব রাজ দরবার ও অন্যত্র বিশেষভাবে বিদ্যমান ছিল, সে কথা যথাস্থানে বর্ণিত হইয়াছে। পাবনা জিলার অন্তর্গত শাহজাদপুরে হযরত শাহ্‌জাদা মখ্‌দুম শাহ্‌দৌলা দ্বাদশ জন আউলিয়া ও অসংখ্য শিষ্যসহ ইমন হইতে আসিয়া উত্তর বঙ্গে ইসলাম প্রচার করেন। কেহ কেহ বলেন তিনি পূর্ব বঙ্গে আগত প্রথম দরবেশ। তিনি স্থানীয় হিন্দু রাজার সঙ্গে যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। তাঁহার দেহ শাহজাদপুরে এবং মস্তক বিহারে দাফন করা হয়। তাঁহার দরগাহ উত্তর বঙ্গের তীর্থক্ষেত্র। এই জিলার হযরত খাজা শাহ্‌ সুফী ইউনুস আলী নক্‌শবন্দী আসাম ও বাংলার অসংখ্য অধিবাসীকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন। ইবনে বতুতার বিবরণী হইতে জানা যায় যে গৌড় সুলতান ফখরুদ্দীন মোবারক শাহের রাজত্বকালে ১৩৪৬ খৃষ্টাব্দে তিনি "সাদকাওন" বা চাটগাঁও ভ্রমণ করেন। সেই সময় তথাকার বহু মুসলমানের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। আরব বণিকেরা নৌ-পথে ইসলামের অভ্যুদয়ের বহু পূর্ব হইতে শুধু পাক-ভারত নহে, দূর প্রাচ্যের যাভা, বোর্নিও, সুমাত্রা এবং চীন দেশে ব্যবসায় চালাইত। আরবের এই সমস্ত বণিকেরা পৌত্তলিক ধর্ম ছাড়িয়া ইসলাম গ্রহণের পর পূর্বদেশ সমূহে

ব্যবসায়ের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম প্রচার করিত। তাহারাই ইসলামের আদি প্রচারক।

ভাটি ও বঙ্গের আর্দ্র আবহাওয়া, বৃক্ষলতাশোভিত শ্যাম কুঞ্জবন ও নদনদী বিধৌত প্রদেশের মানুষের অন্তর আগত সুফী দরবেশদের বিনয় ব্যবহারে মুগ্ধ হইত। আরবের বণিকেরা ও তাহাদের সঙ্গী প্রচারকগণ এদিক দিয়া অগ্রণী ছিলেন। গৌড়বঙ্গের পশ্চিম পূর্ব ও উত্তর দিকে হিন্দু বৌদ্ধ অধ্যুষিত অঞ্চল ছিল। দক্ষিণে আদিম অধিবাসী ও বৌদ্ধদের বাস ছিল। এই সমস্ত অঞ্চলে আশ্চর্যভাবে মুসলমান বসতি গড়িয়া উঠার ইতিহাস বিস্ময়কর। হিন্দু ধর্মের জাতিভেদ প্রথা, উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু কর্তৃক অস্পৃশ্যদের হেয় প্রতিপন্ন করার বিষয় ইতিপূর্বে বিস্তারিত বর্ণনা করিয়াছি।

রামপালের নিকটবর্তী আবদুল্লাপুর গ্রামে বাবা আদম সদলবলে আগমন করিয়া ইসলাম প্রচার করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে বল্লাল নামক জনৈক স্থানীয় হিন্দু রাজার সহিত যুদ্ধে আদম নিহত হন এবং পরে দুর্ভাগ্যক্রমে রাজ পরিবারের সকলেই অগ্নিকুণ্ডে পড়িয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। অগ্নিকুণ্ডে আত্মবিসর্জন দেওয়ার জন্য রাজার উপাধি হইয়াছিল 'পোড়ারাজা'। আদমের মৃত্যু সংবাদে ধর্মপ্রাণ মুসলমানেরা ক্ষেপিয়া গিয়াছিল। পরে বহু দরবেশ ঢাকা অঞ্চলে আসিয়া ইসলাম প্রচার করিয়াছিলেন। জালালউদ্দীন ফতেশাহ নির্মিত মসজিদের সম্মুখে আজিও বাবা আদমের সমাধি বিদ্যমান আছে। বগুড়ার আদমদীঘির আদম শাহ সম্ভবতঃ পৃথক দরবেশ। এই সময় মীর সৈয়দ আলী তাব্রিজী সদলবলে ধামরাই অঞ্চলে আসিয়াছিলেন। ধামরাই শহরের বড় দরগা উক্ত তাব্রিজী সাহেবের শেষ চিহ্ন রক্ষা করিতেছে। তাঁহার কবর গাহ্ সর্বজন সম্মানিত। চট্টগ্রাম শহরে পীর বদর সর্ব প্রথম ইসলাম প্রচার করেন। ইসমাইল গাজী উত্তর বঙ্গে, বরখান গাজী, মোবারক গাজী ও গোরাই গাজী দক্ষিণ বঙ্গে এবং জাফর খা গাজী প্রমুখ পশ্চিম বঙ্গে ইসলাম প্রচার করিয়া বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। বিখ্যাত মহিলা দরবেশ রওশন-আরা বসিরহাট অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করিয়াছিলেন। ইসমাইল গাজীর সুখ্যাতি উত্তর বঙ্গের সর্বত্র ব্যাপৃত।

তিনি ১৪৭৪ খৃষ্টাব্দে শহীদ হন। ইনি খানজাহানের প্রায় সমসাময়িক। শাহ্ মখ্‌দুম রাজশাহী অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন। দরগাপাড়ায় পদ্মাতীরে শাহ্ মখদুমের কবরগাহ সর্বজন সম্মানিত। ময়মনসিংহ জিলার মদনপুরে সুলতান রুমী এবং মহাস্তান গড়ের সুলতান বলখী মাহিসোয়ার প্রভৃতি বহু দরবেশ বঙ্গে ইসলাম প্রচার করিয়াছিলেন। ৪৪৫ হিজরীতে (১০৫৩ খৃঃ) কতিপয় শিষ্যসহ সুলতান রুমী মদনপুরে আসেন। শাহ শূজা প্রদত্ত পিরোত্তর সম্পত্তি দানের সময় ১৬৭১ খৃষ্টাব্দে লিখিত দলিলে এ বিষয় বর্ণিত আছে। কথিত আছে যে তিনি মৎস্যাকৃতি নৌকারোহণ করিয়া আসেন সেজন্য তাঁহাকে মাহিসোয়ার বা মৎস্যারোহী বলা হয়। তাঁহাকে মস্তান বলা হইত এবং এই মস্তান হইতে মহাস্তান নামের উৎপত্তি হইয়াছে। অন্যমতে মজনুশাহ্ মস্তান ইংরেজ আমলে এক দুর্গ নির্মাণ করেন বলিয়া মস্তানগড় নাম হইয়াছে। শাহ নিয়ামতুল্লাহ বুৎশিকানের মাজার ঢাকা নগরীর পুরান পল্টন এলাকায় দিলকুশা বাগের সংলগ্ন অবস্থিত। তিনি ঢাকা অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করিয়াছিলেন। গৌড়ের শাহ নিয়ামতুল্লাহ্ পৃথক দরবেশ। বগুড়া অঞ্চল ইসলাম প্রচার করেন শাহ্ তুর্কান শহীদ। তিনি স্থানীয় এক হিন্দু রাজার সঙ্গে যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। শেরপুরে তাঁহার খণ্ডিত শিরের দাফন স্থানকে শিরমোকাম, দেহ বা ধড়ের সমাধি স্থানকে ধড়মোকাম বা ধরমোকাম বলা হয়।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে সৈনিক ও তাপসপ্রবর শেখ জালাল শ্রীহট্ট বা সিলহটে শুভাগমন করিয়াছিলেন। ইতিহাসে শাহ্ জালাল বোখারী, শাহ্ জালাল তাব্রিজী ও শাহ্ জালাল গঞ্জেয নামধেয় আরও তিনজন দরবেশের নাম উল্লেখ আছে। সিলেটের মহাত্মা শাহ্ জালাল এমন প্রদেশের কারণীয়া গ্রামের প্রসিদ্ধ শেখ বংশে জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া তিনি ইমনী বলিয়া পরিচিত। শাহজালাল গুরু পরম্পরায় মহানবী হযরত মোহাম্মদ মোস্তাফার অষ্টাদশ অধস্তন পুরুষ। হোসেন শাহী আমলের এক শিলা লিপিতে তাঁহার নাম দেওয়া আছে, "শেখ জালাল মোজাররদ বিন মোহাম্মদ।" মোজাররদ শব্দের অর্থ চির কুমার। ১৬১৩ খৃষ্টাব্দে মোহাম্মদ গাউস মাণ্ডুভী লিখিত গুলজারে আবরার গ্রন্থে তাঁহাকে "তুর্কীস্তানজাত বাঙ্গালী" বলা হইয়াছে। ৯১১ হিজরীতে

(১৫০৫ খৃঃ) এই শিলালিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল। উহাতে তাঁহার নাম ও জন্মস্থান দেওয়া আছে "শেখ জালাল মোজারবদ কোনিয়াভি"। ইহাতে পরিষ্কারভাবে জানা যায় যে তাঁহার জন্মস্থান প্রাচীন এশিয়া মাইনরের (রুমদেশ) অন্তর্গত কুনিযাতে, পূর্বোক্ত ইমনে নহে। সুহল-ই-ইয়ামান গ্রন্থ রচিত হয় ১৮৫৯ খৃঃ। উক্ত গ্রন্থে তাঁহাকে ইমনী বলা হইযাছে। পূর্বোক্ত শিলালিপি জেমস ওয়াইজ কতৃক আবিষ্কৃত হয় এবং ব্লকম্যান কর্তৃক প্রকাশিত হয়। শাহ্ জালাল দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর ব্যাপী দিবারাত্র শাস্ত্রালোচনা ও কঠোর তপস্যার পর বারজন সঙ্গীসহ গুরুর আদেশে দামেস্ক, পারস্য, গজনী বেলুচিস্তান প্রভৃতি নগর ও দেশের মধ্য দিয়া হিন্দুস্তানে উপনীত হন। নাসিরউদ্দীন হায়দার কর্তৃক পারস্য ভাষায় লিখিত "সুহল-ই ইযামান" নামক পুস্তকে তাঁহার নাম দেওয়া হইযাছে, হজরত শাহ্ জালাল মোজাররদ-ই-ইয়ামানী। হযরত শাহ জালাল ও হযরত খানজাহান আলীর নিষ্ঠা ও ইসলাম প্রচারের কাহিনী পাক-বাংলার লোকে গ্রাম্য কাব্য গাঁথা ও ছড়ায জীবন্ত করিয়া রাখিযাছে।

ত্রযোদশ শতকে সিলেট, গৌড়, লাউড ও জযন্তীয়া—এই তিন ভাগে বিভক্ত ছিল। বর্তমান সুনামগঞ্জ মহকুমার একাংশ তখন গৌড় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই রাজ্যের শেষ হিন্দু রাজা ছিলেন গৌড়গোবিন্দ। তিনি আকিকা উপলক্ষে গো কোরবাণীর জন্য বোরহানুদ্দীনের পরিবারের উপর ভীষণ অত্যাচার করেন। তিনি বোরহানুদ্দীনের দক্ষিণ হস্ত কর্তন করেন এবং তাঁহার শিশু পুত্রকে হত্যা করেন। গৌড়ের সুলতান সামসুদ্দীন ফিরোজ শাহের নিকট এই সংবাদ পৌঁছিলে তিনি সেকন্দর গাজীকে সসৈন্যে সিলেট প্রেরণ করেন। সেকন্দর যুদ্ধ বিশারদ গোবিন্দের সেনাদলের হস্তে পরাস্ত হন। এই সংবাদ দিল্লীর সুলতান ফিরোজ তোগলকের কর্ণ গোচর হইলে তিনি গাজী সেকন্দরকে দ্বিতীয় বার সৈন্যবাহিনীর কর্ণধার করিয়া সিলেটে প্রেরণ করেন। কথিত আছে যে, তিনি এবারও পরাজিত হইযা লজ্জায় ও অপমানে ফিরিয়া যান। অতঃপর দিল্লীর সুলতানের ইচ্ছাক্রমে শাহজালাল ও সৈয়দ নাসিরুদ্দীন নামক আর একজন শক্তিধর রাজনৈতিক সাধক সিলহট আক্রমণ করেন। প্রবাদ আছে যে পথি মধ্যে শাহ্জালালের শিষ্য সংখ্যা ৩৬০ জনে পরিণত হয়।

তন্নিমিত্ত সিলেট জিলা ৩৬০ আউলিয়ার মুল্লুক বলিয়া পরিচিত। তাঁহারা এক যোগে সুরক্ষিত সুরমা ও ব্রহ্মপুত্র নদী পার হইয়া গৌড় গোবিন্দের রাজ্য আক্রমণ করেন। হিন্দু রাজা পরাজিত হইয়া শাহ্ জালালের নিকট আত্ম-সমর্পণ করেন। রাজ্য অধিকারের পর সেকন্দর গাজীর উপর সিলহটের শাসন ভার অর্পিত হয়। এই সময় ত্রিপুরা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, রংপুর ও আসাম অঞ্চলে ইসলাম প্রচারিত হয়। পরে সিলহটের অন্তর্গত তরফ রাজ্য বার জন অধিনায়কের দ্বারা বিজিত হয়। সেইজন্য তরফ নগরের অন্য নাম "বার আউলিয়ার মুল্লুক"। হিজরী ৭০৩ সালে (১৩০৩ খৃঃ) নাসিরউদ্দীন ও শাহজালাল শ্রীহট্ট বিজয় সম্পন্ন করেন। ঢাকা যাদুঘরে রক্ষিত হোসেন শাহের আমলের এক শিলালিপিতে উহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

১৩৪৬-৪৭, খৃষ্টাব্দে মহাত্মা শাহজালাল দেহত্যাগ করেন। সুবিখ্যাত পর্যাটক ইবনে বতুতা মহাত্মা শেখ জালালের খেদমতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তদীয় ভ্রমণ কাহিনী "রিহালায়" এ বিষয় লিপিবদ্ধ আছে। চৌধুরী সামসুর রহমান তদীয় "পূর্ব পাকিস্তানে ইসলামের আলো" পুস্তকে বলিয়াছেন যে, যে মহান দরবেশের সঙ্গে ইবনে বতুতার সাক্ষাৎ হয়, তিনিই শাহজালাল মোজাররদ। তাব্রিজী সাহেব ত্রয়োদশ শতকের প্রথমে এদেশে আসেন এবং বতুতা চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি চীনের পথে কামরূপ ত্যাগ করেন। সৈয়দ মুর্তজা আলী বলেন ইবনে বতুতার সাক্ষাৎকার এতদুভয়ের সঙ্গে নহে, অন্য কোন তৃতীয় দরবেশে সহিত। শাহজালালের মৃত্যু তারিখ এবং ইবনে বতুতার সিলেট বা কামরূপ ত্যাগের সন তারিখে কিছু অসামঞ্জস্য আছে বলিয়া মনে করি। তন্নিমিত্ত এইরূপ মতভেদের সৃষ্টি হইয়াছে। শাহজালাল তাব্রিজীর নাম "রিহালায়" দৃষ্ট হয়। বতুতার ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ হয় বহু বর্ষ পরে। তজ্জন্য ভুলক্রমে "তাব্রিজী" নাম উল্লিখিত হইয়াছে সে বিষয়ে আমরা একেবারেই নিঃসন্দেহ। "রিহালা" পাঠে সততই মনে জাগরুক হয় যে, ইবনে বতুতা যে দরবেশের কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি শাহ জালাল মোজাররদ।

একটি নির্জন পাহাড়ের উপর অদ্যাপি বিশাল গুম্বজবিশিষ্ট মসজিদ ও সমাধিসৌধ শাহ জালালের স্মৃতি রক্ষা করিতেছে। তাঁহার সমাধি ও মসজিদ গাত্র হইতে এ পর্যন্ত সাতখানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

উহাতে আরবী তোগ্রা অক্ষরে উহার নির্মাণের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত ও তারিখ লিখিত আছে। এতদ্ব্যতীত আজিও এই ঐতিহাসিক দরগায় মৃগ চর্মের জায়নামাজ, জুলফিকার তরবারি, তৈয়ম্মুম প্রস্তুত ফলক সযত্নে রক্ষিত আছে। ইমন প্রদেশের রাজকুমার শেখ আলীর দেহ গুরু শাহ জালালের সমাধির দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত।

সিলহটের "জিন্দাবাজার মহল্লায়" জিয়াউদ্দিনের সমাধি বিরাজমান। সেখানে আরও চারিজন আউলিয়া চিরশয্যায় শায়িত। ঐ স্থানের নাম "পাঁচপীরের মোকাম", শাহ জালালের শিষ্যদের মধ্যে আরবের জাকারিয়া, আবু দায়ুদ, গজনীর মখদুম জাফর, সৈয়দ মোহাম্মদ সুলতান আরেফ, আজমীরের শরীফ, সৈয়দ মোহাম্মদ সমরখন্দী, নুরুল হুদা (হায়দর গাজী) বিখ্যাত। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পুস্তকে বহু সংখ্যক আউলিয়ার নাম ও পরিচয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সৈযদ মুর্তজা আলী প্রণীত শাহ জালাল ও সিলেটের ইতিহাস পুস্তকে ইহার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া আছে।

খানজাহানের সঙ্গে শাহ জালালের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। তিনি শাহ জালালের প্রায় ১০০ বৎসর পরে এদেশে আসেন। কথিত আছে যে দ্বাদশ জন আউলিয়া ও অসংখ্য শিষ্য সহ ধর্ম প্রচারের জন্য খানজাহান যশোর অঞ্চলে আসিয়া ভৈরব তীরে যে স্থানে আস্তানা করিয়াছিলেন, সেই স্থানের নাম হইয়াছিল বারবাজার বা বার আউলিয়ার আস্তানা। আরও কথিত আছে যে খানজাহানের শিষ্য সংখ্যা এক সময়ে ৩৬০জন ছিল এবং প্রত্যেকের জন্য তিনি একটি করিয়া মোট ৩৬০টি দীঘি খনন এবং ৩৬০টি মসজিদ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। অনুরূপ প্রবাদের জন্য সিলেটকেও ৩৬০ আউলিয়ার মুল্লুক বলা হয়। শাহ জালাল যুদ্ধ করিয়া সিলেট জয় করিয়াছিলেন এবং খানজাহান বিনা যুদ্ধে যশোর অঞ্চল অধিকার করিয়া ধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। সিলেটের সঙ্গে যশোর-খুলনার বিশেষ সাদৃশ্য আছে। যশোর-খুলনা অঞ্চলে পাঁচপীরের খ্যাতি, বা পাঁচপীরের মোকাম, পীর বদর এবং গাজীর স্মৃতি যেমন বহন করিয়া আসিতেছে সিলেটের ইতিহাসেও তেমনি এই মহাপুরুষদের নাম বিশেষভাবে জড়িত। সিলেটে জিন্দাপীরের নামে জিন্দাবাজার মহল্লা আছে। তথায় তাঁহার সমাধি অবস্থিত। খুলনায়ও জিন্দাপীরের মাজার ও স্মৃতিচিহ্ন আছে।

হেনরী ব্লকম্যান বলিয়াছেন "খানজাহান একজন সাধু পুরুষ ও বীর যোদ্ধা ছিলেন এবং তিনি অলৌকিক শক্তির প্রভাবে বহু অসাধ্য সাধন করিয়া গিয়াছেন। অনুরূপ একজন বিজয়ী যোদ্ধাও সাধক শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। তিনি সিলেটের মহাত্মা শাহ জালাল। তিনি এদেশে মুসলীম বিজয়ের প্রাক্কালে বিধর্মীদের সহিত যুদ্ধ করিয়া ইসলাম ধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। মুসলমান শাসনের প্রথম কয়েক শতাব্দীতে আউলিয়া দরবেশগণ তাঁহাদের আধ্যাত্মিক শক্তির প্রভাবে এদেশবাসীকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছিলেন।"

সোনারগাঁয়ে শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামাহ নামক বিখ্যাত দরবেশের দরগাহ অবস্থিত। ইহা এক তীর্থক্ষেত্র বিশেষ। তিনি তাসাউফতত্ত্বে সুপণ্ডিত ও প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক ছিলেন। তাঁহারই দরগায় থাকিয়া শিক্ষা সমাপ্তির পর মওলানা শরফুদ্দীন ইযাহিয়ার ন্যায় সাধকের সৃষ্টি হইয়াছিল। পশ্চিমবঙ্গ বা রাঢ় অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন শাহ্ মাহমুদ গজনবী। তিনি রাহী পীর নামে খ্যাত। বর্ধমান জিলার মোঙ্গলকোটে তাঁহার মাজার অবস্থিত। ২৪ পরগণা জিলার ঘুটিয়ারী শরিফে শরিফ শাহ্ সাধকের দরগাহ্ আছে। এখানে প্রতি বৎসর বিরাট ওরস হয়।

সে যুগে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অত্যাচারে জন সাধারণ ক্ষিপ্তপ্রায় ছিল। ব্রাহ্মণদের অত্যাচার ভয়ে নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের সর্বদা সন্ত্রস্ত থাকিতে হইত। জাজপুরে ১৬০০ ব্রাহ্মণ পরিবার বিভিন্ন স্থান হইতে জুলুম করিয়া দক্ষিণা আদায় করিত। যাহারা এই কর দিতে পারিত না, ব্রাহ্মণেরা তাহাদিগকে অভিসম্পাত দিত। ধর্মদেবতার পূজা করিলে তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইত। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের উপর ব্রাহ্মণগণ কিরূপ জুলুম করিত এবং কি ভাবে তাহাদের মূলচ্ছেদ হইয়াছিল তাহা অন্যত্র বর্ণনা করিয়াছি। সামাজিক অত্যাচারে কি ভাবে হিন্দু ও বৌদ্ধগণ দলে দলে মুসলমান আউলিয়াদের নিকট ইস্লাম গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা শূণ্য পুরাণের নিম্নোক্ত কবিতাংশ হইতে সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

"ধর্ম হৈল্যা জবনরূপি শিরে পরে কাল টুপি
হাতে শোভে ত্রিকচ কামান

চাপিআ উত্তম হয় ত্রিভুবনে লাগে ভয়
খোদায় বলিয়া এক নাম ॥
নিরঞ্জন নিরাকাব হৈল ভেস্ত অবতার
মুখেতে বলেত দম্বদাব ।
জতেক দেবতাগণ সবে হয়্যা একমন
আনন্দেতে পবিল ইজার ॥
ব্রহ্মা হৈল মহামত বিষ্ণু হৈলা পেকাম্বর
আদম্ফ হৈল সুলপানি ।
গণেশ হইল গাজী কার্তিক হৈল কাজী
ফকির হইল জত মুনি ॥”

“চৈতন্য ভাগবত” আদিকাণ্ডে বর্ণিত আছে যে অনেক ব্রাহ্মণও স্বইচ্ছায় মুসলমান হইয়া যায়,

“হিন্দুকুলে কেহ হেন হইয়া ব্রাহ্মণ ।
আপনে আসিযা হয ইচ্ছায় যবন ॥”

পশ্চিম বঙ্গের প্রখ্যাত লেখক গোপাল হালদাব বলিয়াছেন, “সুফী, ফকির, দরবেশ ও গাজীবা তখন হতে নব বিজিত ভূমিতে ইস্‌লাম বিস্তারের চেষ্টা করতে লাগল। লুণ্ঠন ও ধ্বংস অপেক্ষা ধর্ম প্রচার ও আধ্যাত্মিক বিচারই হ'তে থাকে রাজ্য বিস্তারেব প্রধান অঙ্গ।” তিনি আরও বলিয়াছেন, “বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি ব্রাহ্মণেরা অত্যাচার করাতে নিরঞ্জন রুষ্ট হয়ে ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে দেবতাদের নিয়োজিত করলেন — দেবতারা এলেন মুসলমানরূপে।” শূন্য পুরাণেব বৌদ্ধ কবি নবাগত মুসলমানদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার কর্তৃক বঙ্গদেশ বিজিত হয় ১১৯৭-৯৮খৃষ্টাব্দে। মুসলমানগণ কর্তৃক পাক-ভারত শাসন তিন পর্যায়ে বিভক্ত করা হইয়াছে। বঙ্গাধিকারের মোটামুটি সময় ১২০০সাল ধরিয়া লইলে উহা এইরূপ দাঁড়ায় :—

ক) প্রাথমিক পর্যায় — ১২০০সাল হইতে ১৩৪০সাল পর্যন্ত ১৪০ বৎসর। এই সময় বঙ্গদেশ দিল্লীর সম্রাট কর্তৃক নিয়োজিত শাসনকর্তা বা সুবাদার

কর্তৃক শাসিত হইত। এই যুগে প্রায়ই গৌড় সুলতানগণ কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতেন। সেইজন্য দিল্লীতে গৌড়ের অন্য নাম হইয়াছিল বলগকপুর বা বিদ্রোহী নগর।

খ) দ্বিতীয় পর্যায় — ১৩৪১ সাল হইতে ১৫৭৫ সাল পর্যন্ত মোট ২৩৪ বৎসর। ১৫৭৫খৃঃ মার্চ মাসে গৌড়ের শেষ স্বাধীন সুলতানের পতন ঘটে মোঘল সম্রাট আকবরের সময়। এই দুইশত চৌত্রিশ বৎসর গৌড় সুলতানগণ সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলেন। তাঁহারা দিল্লীর কোন ধার ধারিতেন না। হুমায়ুন ও শেরশাহকে বঙ্গের স্বাধীন সুলতানগণের মধ্যে গণ্য করা হয়।

গ) তৃতীয় পর্যায় — ১৫৭৫সাল হইতে ১৭৬৭ সাল বা বাংলার স্বাধীনতা লুপ্ত হইবার পর হইতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্ব আরম্ভের সময় পর্যন্ত ১৯১ বৎসর। প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়কালই আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয়।

মোঘলেরা এদেশ শাসন করিয়াছে। কিন্তু বিশেষ কোন চিহ্ন রাখিয়া যায় নাই, পক্ষান্তরে তুর্ক-আফগানদের সুশাসন ও কীর্তিসমূহ এখনও বিদ্যমান। এই সমস্ত কীর্তিরও একটি বিশেষত্ব আছে। তুর্ক-আফগান আমলের ন্যায় ব্যাপক না হইলেও মোঘল যুগেও ইসলাম প্রচার হইয়াছিল।

মুসলমান বিজয়ের পূর্বে এদেশে "হিন্দু" নাম ছিল না। বিভিন্ন জাতির নামানুসারে তাহারা পরিচিত হইত, যেমন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শূদ্র, কর্মকার, তন্তুবায়, কুম্ভকার প্রভৃতি। তখন হিন্দু ধর্মও ছিল না। বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, গাণপত্য প্রভৃতি সম্প্রদায় বিদ্যমান ছিল।

এখন আমরা পূর্ব পাকিস্তান তথা সুন্দরবনাঞ্চলের অধিবাসীদের বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। কেহ কেহ বলিয়াছেন, এদেশের মুসলমানদের পূর্ব পুরুষ সকলেই হিন্দু ছিল। তুর্ক-আফগান আমলের কিছু পূর্ব হইতে বঙ্গদেশে ইসলাম প্রচার শুরু হয়। মোহাম্মদ বিন বখতিয়ারের আমল হইতে সুফী দরবেশ ও আউলিয়ারা ইসলাম প্রচার করেন সে কথা ইতিপূর্বে বর্ণনা করিয়াছি। রাজশক্তির ভয়ে ইসলাম গ্রহণের উদাহরণ এদেশে বিরল। স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণের অসংখ্য নজির পাওয়া যায়

তুর্ক-আফগান আমলে অসংখ্য মোঘল-পাঠান ও অন্যান্য মুসলমান উত্তর-পশ্চিম দিক্ হইতে বঙ্গের অভ্যন্তরে বসবাস আরম্ভ করে। খানজাহানের সময় এতদঞ্চলে অসংখ্য মুসলীম জঙ্গল আবাদ করিয়া মনুষ্য বসতি গড়িয়া তুলিয়াছে তাহাও আলোচনা করিয়াছি। সমগ্র ভারত জুড়িয়া তখন কমবেশী মুসলীম বসতি গড়িয়া উঠিয়াছিল। ষোড়শ শতকের প্রথম দিকে অসংখ্য পাঠান বঙ্গদেশে হিজরত করিতে বাধ্য হয়। কারণ তখনও বঙ্গদেশ স্বাধীন। পাঠানেরা বিজেতা মোঘলদিগকে শত্রু মনে করিয়া তাহাদিগকে বিষ নজরে দেখিত। সরাসরি মোঘল শক্তির নিকট নতি স্বীকার না করিয়া তাহাদের অনেকেই বঙ্গদেশে আসিয়া মোঘল সাম্রাজ্য বিরোধী আন্দলনে যোগ দিয়াছিল। বারভূঞার মসনদই আলা ইসা খাঁ, তদীয় ভ্রাতা মুসা খাঁ, ভাওয়ালের চাঁদ গাজী, হিজলীর স্বনামধন্য ওসমান খাঁ প্রভৃতি পাঠানেরা এদেশীয় হিন্দু মুসলমানদেব সহযোগিতায় বঙ্গদেশে মোঘল বিরোধী ব্যূহ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে অসংখ্য পাঠান, তুর্কী ও আফগান এদেশে আসিয়াছিল। তাঁহাদের বংশধরেরা এখনও এদেশে বসবাস করিতেছে।

রাজশক্তি যদি ইসলাম প্রচাবের মাপকাঠি হইত তবে দিল্লী, রাজপুতনা, উত্তর প্রদেশ, বিহার প্রভৃতি স্থান মুসলমানে ভরিয়া যাইত। বঙ্গদেশের মধ্যে গৌড় অঞ্চলেই অধিকাংশ যুদ্ধ বিগ্রহ সংঘটিত হইয়াছিল। কিন্তু চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, বাকেরগঞ্জ, যশোর, পাবনা, বগুড়া, ময়মনসিংহ (নাসিরাবাদ) প্রভৃতি অঞ্চলে কোন যুদ্ধ সংঘটিত হয় নাই। অথচ ঐ সমস্ত স্থানে মুসলমানের সংখ্যাধিক্যের পরিমাণ খুব বেশী। বিখ্যাত ইংরেজ লেখক হাণ্টার বলিয়াছেন যে পূর্ববঙ্গ এক সময় পাঠান-মুসলমানের আড্ডায় (Dumping ground) পরিণত হইয়াছিল। এখানে হিন্দু বৌদ্ধদের ধর্মান্তিকরণের দৃষ্টান্ত খুব বেশী নহে। ঐতিহাসিক ঈশ্বরীপ্রসাদ বলিয়াছেন যে, মুসলমানদের বঙ্গাধিকারের সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম দেশ হইতে বিলীন হইয়াছিল। অতএব বৌদ্ধদের মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করার প্রশ্ন উঠিতে পারে না। ঈশ্বরীপ্রসাদ আরও বলিয়াছেন যে ব্রাহ্মণগণ যখন বিপুল সংখ্যক লোককে নিজ ধর্মে আশ্রয় দিতে অস্বীকার করিলেন তখন তাহারা বাধ্য হইয়া বৈষ্ণব সমাজে প্রবেশ

করিয়াছিল। আরব, ইরাণ, এশিয়া মাইনর (রুম), আবিসিনিয়া ও মধ্য এশিয়া হইতে অসংখ্য আগন্তুক সুলতানদের দরবারে চাকুরী করিবার জন্য আসিতেন। তাহারা স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া নূতন জাতি সৃষ্টি করিয়াছিল। অনেকে স্থায়ীভাবে বসবাস করিয়া বাঙ্গালী বনিয়া গিয়াছিল। রাজ সরকার হইতে সম্মান ও প্রতিপত্তি অর্জনের জন্য বহু শিক্ষিত ব্রাহ্মণ কায়েস্থ দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করিবার অসংখ্য নজির আছে। স্বদেশ ও বিদেশীয় মানুষের সংমিশ্রণে মিশ্র জাতির সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক।

তুর্ক-আফগান আমলে যাহারা ই লাম গ্রহণ করিয়াছিল তাহাদের ইতিহাসও বহুলাংশে পাওয়া যায়। পীরালী মুসলমানদের ইতিহাস উহার জ্বলন্ত প্রমাণ। পূর্ব পাকিস্তানে এখনও বহু সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবার আছে যাহাদের পূর্ব পুরুষ হিন্দু ছিল তাহারা সে ইতিহাস জানে। এইরূপ ইতিহাস বংশানুক্রমে চালু থাকাই স্বাভাবিক। ফরিদপুরের কুশলী ও গোবরার চৌধুরীরা কোটীলিপাড়ার ব্রাহ্মণ।

যশোর-খুলনা ও বাকেরগঞ্জের ভাটি অঞ্চলে বর্ণ হিন্দুদের পূর্বে বহু বহিরাগত মুসলমান জঙ্গল আবাদ করিয়া গ্রাম ও শহর গড়িয়া অসংখ্য জন বসতি স্থাপন করিয়াছিল সে বিষয় অন্যত্র আলোকপাত করিয়াছি। এখানকার আর্দ্র মৃত্তিকা, জল বায়ু ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা, খাদ্য, সংস্কৃতি অতি সহজে বহিরাগত ভিন্ন ভাষাভাষি মুসলমানকে বাঙ্গালীতে পরিণত করিয়াছিল। এইরূপ অবাঙ্গালীকে বাঙ্গালীতে পরিণত হইতে এক পুরুষের অধিক সময় লাগে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে বিভাগোত্তরকালে যে সমস্ত পাঞ্জাবী, দিল্লীওয়ালা, বিহারী, উড়িয়া প্রভৃতি পূর্ব পাকিস্তানে আগমন করে তাহাদের সন্তান সন্ততিরা এখন পুরা দস্তুর বাঙ্গালী। ফতেহাবাদ (ফরিদপুর), খলিফাতাবাদ (বাগেরহাট), শাহজাদপুর (পাবনা), পান্নগ্রাম কসবা ও লাবসা (খুলনা)। শায়েস্তাবাদ (বাকেরগঞ্জ) প্রভৃতি স্থানে যে সমস্ত অবাঙ্গালী মুসলমান তুর্ক, আফগান, মোগল ও ইংরেজ আমলে বাস করিত তাহাদের সকলেই এখন বাঙ্গালী। মরহুম খাজা মোহাম্মদ আলী (নোয়াপাড়ার পীর সাহেব) কজর বংশের রাজত্বকালে সরাসরি ইরাণ ভূমি হইতে যশোরে আগমন করেন। তিনি পুরাদস্তুর বাঙ্গালী না হইলেও তাঁহার সন্তান সন্ততি পুরাপুরি বাঙ্গালী।

খুলনার মরহুম জালালউদ্দীন হাসেমীর পিতামহ পূর্বে সীমান্ত প্রদেশের অধিবাসী ছিলেন। এখন এই বংশের মধ্যে পাঠানী সংস্কৃতি বিলুপ্ত হইয়াছে।

এতদঞ্চলের মুসলমানদের মধ্যে অন্যান্য স্থানের ন্যায় কিছু কিছু ভিন্ন সংস্কৃতির ছাপ ছিল। তবে একথা সত্য যে মুসলমানদের উপর হিন্দু সংস্কৃতির কিছু প্রভাব পড়িয়াছিল এবং এদেশের হিন্দু সমাজের উপরও মুসলমানী কৃষ্টির ছাপ পতিত হইয়াছিল। নবাব সিরাজুদ্দৌলার পতনের পর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যার একচ্ছত্র শাসক বনিয়া যান। সে সময় এই তিন প্রদেশের মোট লোক সংখ্যা ছিল মাত্র তিন কোটি, উহা বর্তমানে প্রায় ১৩ কোটিতে দাঁড়াইয়াছে। ইহা হইতে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে এদেশের জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার অত্যধিক। ১৭৭০ খৃঃ বাংলার লোক সংখ্যা ছিল দুই কোটি পঞ্চাশ লক্ষ। তন্মধ্যে এক কোটি ছয় লক্ষ মুসলমান এবং এক কোটি একচল্লিশ লক্ষ ছিল হিন্দু। অবশিষ্ট বৌদ্ধ ও অন্যান্য জাতি।

ডক্টর এম, এ, রহিম তদীয় গ্রন্থে (Social and cultural History of Bengal) তৎকালীন হিন্দু মুসলীম জন্মের হার আলোচনা করিয়াছেন। ১৮৭২—১৮৮১ সালে মুসলীম জন সংখ্যা বৃদ্ধির হার শতকরা ১৭ এবং হিন্দুর সংখ্যা মাত্র ½। ১৮৮১ — ১৮৯১ সালে মুসলমানদের হার ৯.৬, হিন্দুর হার ৪.৭। ১৮৯১ সালে সংখ্যালঘু মুসলমান হিন্দু অধিবাসী অপেক্ষা ১৫ লক্ষ বৃদ্ধি পাইয়া সংখ্যাগুরুতে পরিণত হয়। ১৯১১ খৃঃ মুসলমানেরা বঙ্গে ৫২.৩ এবং হিন্দু ৪৫.২ এ দাঁড়ায়। ১৯৪১ সালে মুসলমানের সংখ্যা ৩ কোটি ৭০ লক্ষে পৌঁছে। অনূন্য ৭০ বৎসরের মধ্যে মুসলমানেরা ১ কোটি ৬৩ লক্ষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। দেশ বিভাগের সময় মুসলমানদের শতকরা হার ৫৬ এ উন্নীত হয়। ইহা নিঃসন্দেহে জন্ম হারের বিস্ময়কর উর্দ্ধগতির ইতিহাস। ইহাই পাকিস্তান হাসিলের প্রধান উৎস্য। হিন্দু অপেক্ষা মুসলমান জনসংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিরও কারণ বিদ্যমান। পূর্ব বঙ্গের উন্মুক্ত শ্যাময়মান প্রান্তর ও স্বাস্থকর পরিবেশের জন্য এখানে জন সংখ্যা বৃদ্ধির হার অন্যান্য স্থানের চেয়ে বেশী এবং এখানকার শতকরা ৮০ ভাগের বেশী অধিবাসী মুসলমান। শহর বন্দর অপেক্ষা গ্রামাঞ্চলে জন্মের হার বেশী। মুসলমানেরা প্রায়ই গ্রামে বাস করিত এবং সমাজের

মধ্যে একাধিক বিবাহ, বিধবা বিবাহের অবাধ প্রচলন, তালাক প্রথা এবং পুনরায় বিবাহ প্রভৃতি কারণে মুসলমানদের সংখ্যা অতিমাত্রায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। জাতিভেদ প্রথা, বর্ণ বিভেদ, শহরবাস, বাল্য বিবাহ, বৈধব্যব্রত গ্রহণ প্রভৃতি কারণে হিন্দু জনসংখ্যার হার তেমন বৃদ্ধি পায় নাই। শত শত বৎসর পরে বর্তমানে পশ্চিম বঙ্গে হিন্দুসমাজে অস্পৃশ্যকে বে-আইনী ঘোষণা করা হইয়াছে এবং বিধবা বিবাহ ও তালাক প্রথা চালু হইয়াছে।

উপরোক্ত আলোচনা হইতে আমরা অভিমত প্রকাশ করিতে পারি যে বাকেরগঞ্জ, যশোর খুলনা ও ফরিদপুরের অধিকাংশ মুসলমানদের পূর্ব পুরুষ এদেশীয় হিন্দু, বৌদ্ধ বা অন্য জাতীয় লোক ছিল না। রাজশক্তির দাপটে যদি ইসলাম প্রচার হইত তবে খুলনা বাকেরগঞ্জের দক্ষিণে, নড়াইল ও গোপালগঞ্জ মহকুমায়—বিপুল হিন্দু সংখ্যাধিক্য থাকিত না। ঐ সব স্থানের কোন কোন এলাকায় এখনও মুসলমানের নাম গন্ধ নাই। হাট-বাজার, বাড়ী-ঘর, ক্ষেত-খামার, বিদ্যালয় প্রভৃতি স্থানে এখনও হিন্দু সমাজের লোক বিদ্যমান এবং কোন মুসলমান সেখানে নাই।

এতদঞ্চলে শেখ, সৈয়দ, মোঘল পাঠান, মোল্লা, মুন্সি, শরীফ, সরদার, খাঁ, বেগ প্রভৃতি প্রায় সকলেরই পূর্ব পুরুষ এতদ্দেশীয় হিন্দু নহে। অনেকের পদবী পরিবর্তিত হইয়াছে যেমন, মোল্লা, মুন্সি, বিশ্বাস, হাওলাদার, ইজারাদার, কাজি, গাজী, চৌধুরী প্রভৃতি। এ বিষয় আমরা অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিদের লইয়া বিভিন্ন সময় আলোচনা করিয়াছি। আমাদের মতে এদেশের মুসলমান অধিবাসীর গড়পড়তা শতকরা ২৫ জনের অনধিক এ দেশীয় হিন্দু হইতে উদ্ভূত হইতে পারে।

ধারাবাহিক ইতিহাস না জানিয়া কেহ কেহ মন্তব্য করিয়াছেন যে এদেশের মুসলমান প্রায় সবই হিন্দু বংশজাত। ইহা মারাত্মক ভ্রমপূর্ণ মন্তব্য এবং ঐতিহাসিক সত্যের বিপরীত।

মোঘল শক্তির অত্যাচারে যেমন মধ্য ভারত ও অন্যান্য স্থান হইতে পাঠানেরা বঙ্গে হিজরত করিয়াছিল তেমনই জালালউদ্দীন ও আলাউদ্দীন খিলজীর সময় অসংখ্য মোঘল দিল্লীতে বসবাসের অনুমতি না পাইয়া বঙ্গে

আসিয়া বসবাস স্থাপন করিয়াছিল (১৪শ, ১৫শ শতক)। দাস ও খিলজীদের অমানুষিক অত্যাচারে বহু মোঘল, পাঠান তুর্কী বঙ্গে আসিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিল।

প্রাক-বিভাগ যুগে যখন সাম্প্রদায়িক উগ্রতা চরম আকার ধারণ করে তখন "মডার্ণ রিভিউ" নামক ইংরেজী মাসিক পত্রিকায় এক আপত্তিকর প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। উক্ত পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে তিনি বলিয়াছিলেন যে বঙ্গের দক্ষিণ-পশ্চিম এলাকার মুসলমানগণ চণ্ডাল ও পোদ হইতে উদ্ভূত। তখন কলিকাতা ও অন্যত্র ইহার বিরুদ্ধে তুমুল প্রতিবাদের ঝড় বহিয়া যায়। এইরূপ মন্তব্যের মূলে কোন ঐতিহাসিক সত্য নাই। উগ্র সাম্প্রদায়িকতাকে উসকানি দেওয়ার জন্য সম্ভবতঃ এহেন বিরূপ মন্তব্য করা হইয়াছিল।

বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের আদি ইতিহাস

ইতিপূর্বে আমরা দেখিয়াছি যে গৌড়বঙ্গে প্রায়ই বিদ্রোহবহ্নি প্রজ্জ্বলিত হইত। দাস বংশের রাজত্বকালে বঙ্গের বিদ্রোহ ভয়াবহ রূপ পরিগ্রহ করে। এই সময় বলবন পুত্র বগড়া খান লক্ষ্মণাবতীর শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। খিলজী ও তোঘলোক আমলেও বিদ্রোহ লাগিয়া থাকিত। ইবনে বতুতা এই সমস্ত বিদ্রোহের চমকপ্রদ বিবরণী রাখিয়া গিয়াছেন। এই সমস্ত কারণে এখানকার শাসকগণ সম্ভবতঃ এদেশীয় সংস্কৃতির দিকে বিশেষ মনযোগ দিতেন। পাঠান শাসকেরা বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী ছিলেন এবং জন সাধারণের মনোরঞ্জনার্থে বংলা ভাষা ও সংস্কৃতির দিকে আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস এদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। আমরা এখানে দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, কিভাবে স্বাধীন বাংলার সুলতানগণ বঙ্গভাষার উন্নতি সাধনে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করিতে তাঁহারা ইসলাম ধর্ম তথা মুসলমান কৃষ্টির সমূহ ক্ষতি সাধন করিয়াছিলেন। এই সমস্ত বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করিবার পূর্বে

মুস্‌লীম বিজয়ের পূর্বে ও প্রাক-কালে বাংলা ভাষার অবস্থা কিরূপ ছিল এবং প্রাচীন কালে কিভাবে এই ভাষার উন্মেষ হইয়াছিল সে বিষয় আলোচনা করা সমুচিৎ।

বৈদিক যুগ অবসানের পর লোক মুখে যে "হিন্দ আর্যভাষা" প্রচলিত ছিল উহার নামকরণ হয় "প্রাকৃত" বা প্রকৃত জনের ভাষা। বৌদ্ধ সমাজ ও বৌদ্ধ ধর্মের বাহন ছিল পালী ভাষা। ধর্মালোচনা ও অন্যান্য কার্য এই ভাষায় চালিত হইত। সংস্কৃত ও অন্যান্য ভাষায় বৌদ্ধদের ধর্ম গ্রন্থাবলীও প্রণীত হইত। কিন্তু পালীই ছিল তাঁহাদের রাষ্ট্রীয় ভাষা।

হিন্দু রাজগণের ভাষা ছিল সংস্কৃত। বিখ্যাত সংস্কৃত গদ্য লেখক বানভট্ট এবং পদ্য লেখক ছিলেন পণ্ডিত কালীদাস। সেন রাজবংশের শেষ প্রদীপ লক্ষ্মণ সেনের রাজত্ব পর্যন্ত সংস্কৃত ভাষাই রাজকীয় ভাষারূপে আদৃত হইত। সৌর সেনী অবহটঠ অষ্টম শতকে উত্তর ভারতের প্রায় সর্বত্র রাষ্ট্রভাষায় পরিণত হয়। মুসলমানী প্রভাবে এই ভাষা পরিণত হয় হিন্দুস্তানীতে। "হিন্দী" — এই হিন্দুস্তানীর উপর গঠিত সংস্কৃতবহুল লিখিত ভাষা, এবং ফার্সি ও আরবী শব্দ বহুল হিন্দুস্তানী ভাষার উপর উর্দু ভাষার উৎপত্তি। তন্নিমিত্ত পাক-ভারতে হিন্দী ও উর্দু ভাষাদ্বয় কিছুটা কৌলিন্য পাইয়াছে।

বাংলার লোকেরা পূর্বে সংস্কৃত ও পালী ভাষায় পুস্তকাদি রচনা করিতেন। ইংরেজ আমলের মাঝা মাঝি পর্যন্ত এদেশে পালী ভাষার কিছু প্রচলন ছিল। মুসলমান বিজয়ের পূর্বে সমগ্র জাতির নাম বাঙ্গালী হয় নাই। বৈদিক যুগে বঙ্গকে পাণ্ডববর্জিত দেশ বলিত এবং অসম্মানের চোখে দেখা হইত। বঙ্গ জাতিকে "বায়াংসি" বা পক্ষী জাতীয় বলা হইত। প্রাচীন বাংলাভাষা সংস্কৃতের উত্তরাধিকার। ক্রমাগত এই ভাষায় বহু ফার্সি, আরবী ও উর্দু শব্দ সংযোজিত হইয়া উহার উন্নতি ও পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে।

এখন হইতে প্রায় হাজার বৎসর পূর্বে বঙ্গভাষা জন্মলাভ করিয়াছিল। বাংলা ভাষায় প্রথম সুচনা হয় "বৌদ্ধ গান ও দোহা" — এর মাধ্যমে। "চর্যাচর্য বিনিশ্চয়," সহরপাদের "দোহাকোষ" ও কাহ্নুদেবের "ডাকার্ণব" এই তিন খানা পুঁথির সম্পাদনা করিয়াছেন ঐতিহাসিক হর প্রসাদ শাস্ত্রী। চর্যাপদের রচয়িতা ছিলেন সিদ্ধাচার্যগণ, সংখ্যায় ৮৪ জন। ১০ম ও ১২শ

শতকের মধ্যে চর্যাপদ রচিত বলিয়া অধিকাংশ পণ্ডিত মত প্রকাশ করিয়াছেন। নাথপন্থী এবং সহজীয়া বৌদ্ধদের সাধনতন্ত্রের কথা ইহাতে লিপিবদ্ধ আছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলিয়াছেন, "চর্যাপদের ভাষা সন্ধার অন্ধকারের ন্যায় আবছায়া।" চর্যাপদ বিনিশ্চয়ই একমাত্র খাটি বাঙ্গালীর লেখা কবিতা বা পদ। তৎকালে এই পদ সাহিত্য গান হিসাবে গীত হইত। ইহাতে ভাব ও অনুভূতি ছিল। নাথগুরুরা সহজযানের সাধনতত্ত্বের কথা চর্যাগীতের মধ্যে ব্যক্ত করিয়াছেন। ইহাই বঙ্গ ভাষার আদি গ্রন্থ বলিয়া স্বীকৃতি পাইয়াছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ইহাকে হাজার বছরের পুরাতন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ডক্টর শহিদুল্লাহ বলেন যে, চর্যাপদ সপ্তম শতকের রচনা। চর্যাপদের মূল পুঁথিখানি সঙ্কলিত হয় ১৪শ শতকে। চযাপদ সুপ্রাচীন ও মূল্যবান সাহিত্য সে বিষয় কোন সন্দেহের অবকাশ নাই।

বাংলার খনার বচন, ডাকের বচন, রূপকথা, উপখ্যান, ব্রতকথা, ছড়া প্রভৃতিও প্রাচীন। চর্যাপদের পরেই সম্ভবতঃ খনার বচন, ব্রতকথা প্রভৃতি। ইহার পর রচিত হয় ধর্মমঙ্গলের লাউসেনের কথা, চণ্ডীমঙ্গলের কালকেতুর কথা, মনসামঙ্গলের লক্ষীন্দর বেহুলার কথা। উহা লোক সমাজে অবাধভাবে গীতও শ্রুত হইত।

বাংলা সাহিত্যের উন্মেষকালে উহা চর্যাপদের মধ্যে কি ভাবে বিকশিত হইত উহার কয়েকটি উদাহরণ নিম্নে দেওয়া গেল;

উচা উচা পাবত তঁহি বসই সবরী বালী
মোরঙ্গী পীচ্ছ পরহিন সবরী গিবত গুঞ্জরী মালী ॥ ধ্রু ॥
উমত সবরো পাগল সবরো মাকরগুলি গুহাড়া তোহৌরী —
নি-অ ঘরিণী নামে সহজ সুন্দারী —

অনুবাদ — উঁচু উঁচু পর্বত, তথায় বাস করে শবরী বালিকা; ময়ূরপুচ্ছ পরিহিতা সেই শবরী, গলায় তাহার গুঞ্জার মালা, উন্মত্ত শবর, পাগল শবর, গোল করিও না। তোমার গোহারী, তোমার নিজ গৃহিণী — নাম সহজ সুন্দরী।

অন্য একটি চর্যাপদ :—

বঙ্গে জায়া নিলেসী পবে ভাগেল তোহাব বিণাণা — বঙ্গে জায়া গ্রহণ করিবার পর তোমার বিজ্ঞান ভাঙ্গিয়া গেল।

তিনি ভূ-অন মই বাহি-অ হেলে˚
হাঁউ-সুতেলি মহাসুখ লীড়ে
কাহ্নে গাইতু কাম চণ্ডালী
ডোম্বি তথাগলি নাহি চ্ছিনালী ॥

অনুবাদ — তিন ভুবন আমার দ্বাবা হেলায় বাহিত হইল। আমি মহাসুখ লীলায় শয়ন করিলাম। কাহ্ন গাহে, তুই কাম চণ্ডালী, তোর বাড়া ছিনাল আর নাই। এই সমস্ত চর্যাপদে তৎকালেব মানুষেব সৌন্দর্যবোধ ও সামাজিক পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাই ছিল বঙ্গ ভাষার উন্মেষ কালের নিদর্শন।

মধ্য যুগের বাংলা সাহিত্য

দীনেশ চন্দ্র সেন বলিয়াছেন :— ব্রাহ্মণেরা প্রথমত: ভাষা গ্রন্থ প্রচারের বিবোধী ছিলেন। রামায়ণ ও মহাভাবত সংস্কৃত ভাষা হইতে বাংলায় অনুবাদ কবার জন্য কীর্তিবাস ও কাশীদাসকে তাহাবা 'সর্বনেশে' উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন এবং অষ্টাদশ পুবাণ অনুবাদকগণেব জন্য রৌরব নামক নরকে স্থান নির্দেশ করিয়াছিলেন। মুসলমান কর্তৃক বঙ্গ বিজয় এই সৌভাগ্যের কাবণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। গৌড় সুলতানগণের নির্দেশে হিন্দু শাস্ত্র গ্রন্থের অনুবাদ আরম্ভ হইয়াছিল।

তুর্ক-আফগান শাসকদের আমলে রাজকীয় ভাষা ছিল ফার্সি। এতৎ সত্ত্বেও অবাধভাবে বাংলা ভাষার প্রচলন শুরু হয়। ফার্সি ও সংস্কৃত সাহিত্য সীমাবদ্ধ গণ্ডির মধ্যে থাকায় বঙ্গভাষা ও সাহিত্য এদেশের মাটিতে শিকড় গাড়িয়া বসে। হোসেন শাহী আমলের পূর্বে বঙ্গ ভাষা মন্থর গতিতে অগ্রসর হইতে থাকে। গৌড় সুলতান সামসুদ্দীন ইউসুফ শাহ মালাধর বসুকে সাহিত্য প্রতিভার জন্য গুণরাজ খাঁ উপাধিতে ভূষিত করেন। কবি মালাধর বসু সুলতান সম্পর্কে লিখিয়াছেন :—

নির্গুণ অধম মুঞি নাহি কোন গ্রাম
গৌড়েশ্বর দিলা নাম গুণরাজ খান।

মালাধর বসুর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ "শ্রীকৃষ্ণ বিজয়"।

সুখময় মুখোপাধ্যায় বলেন যে কীর্তিবাসের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন রোকনউদ্দীন বরবক শাহ। কীর্তিবাস ও কাশীদাস মহাপণ্ডিতদ্বয় সুলতানের আদেশে অশেষ পরিশ্রমে রামায়ণ ও মহাভারতের বঙ্গানুবাদ করেন। এজন্য ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদিগকে মোটেই সুনজরে দেখিত না। তাঁহাদিগকে হেয় প্রতিপন্ন করার সর্ব প্রকার চেষ্টা চলিত।

এই সময় বঙ্গে মনসার গান, চণ্ডীবাশুলীর গান জন সাধারণের মধ্যে অত্যন্ত প্রিয় ছিল। লোকে শিবের গান গাহিয়া ভিক্ষা মাগিত। যোগীপাল, ভোগিপাল, মহীপাল প্রভৃতি বৌদ্ধ গীতেরও প্রচলন ছিল। তখন পাচালী গীতেরও প্রচলন হয় অত্যধিক। প্রাক হোসেন শাহী আমলের বাংলা সাহিত্যে সর্বাগ্রে চণ্ডীদাসের নাম শ্রুত হয়। চণ্ডীদাসের পরবর্তী কবি বিদ্যাপতি। বিখ্যাত কবি জয়দেবের পরেই মিথিলার বিদ্যাপতির নাম শ্রুত হয়। বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণ লীলা অপূর্ব কাব্যরসের সৃষ্টি। মহাকবি চণ্ডিদাস রচিত সেই বহু বিশ্রুত পদ :—

শুনহ মানুষ ভাই
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।

চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন' বাংলা ভাষার দ্বিতীয় গ্রন্থ হিসাবে খ্যাত। মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণ বিজয় — কৃষ্ণলীলার প্রথম কাব্য। ইহার পর মনসামঙ্গল ও বেহুলার ভাষান উল্লেখযোগ্য।

চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি কাল হইতে প্রায় সোয়া দুইশত বৎসর — বাংলার তুর্ক ও আফগান সুলতানগণ বাঙ্গালী কবি সাহিত্যিকদের উৎসাহ দাতা ও পৃষ্টপোষক ছিলেন। দিল্লীর রাজ শক্তির বিরুদ্ধে বাঙ্গালী হিন্দুর সহানুভূতি ও সাহায্য আকর্ষণ করাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। অধীন জাতির ধর্ম ও কৃষ্টি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করিবার আকাঙ্খাও তাঁহাদের ছিল না এমন নহে।

ত্রয়োদশ শতকে বঙ্গ ভাষার তেমন প্রচলন হয় নাই। ইলিয়াস শাহী-বংশের দ্বারা শান্তি স্থাপিত হইবার পর চতুর্দশ শতাব্দীতে বাংলা ভাষার প্রচলন দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতে থাকে। কবি চণ্ডিদাস ও মালাধর বসুর আবির্ভাব হয় ১৪শ ও ১৫শ শতকে। এই সময় সংস্কৃত ভাষার গ্রন্থ সমূহ বাংলায় কাব্যাকারে অনুদিত ও প্রকাশিত হইতে থাকে। হোসেন শাহী আমলে দেশীয় ভাষা নবরূপে সুসজ্জিত হয়। প্রকৃতপক্ষে হোসেনী বংশ খাঁটি বাঙ্গালী ছিলেন। বাঙ্গালী জাতীয়তা ও দেশাত্মবোধ প্রতিষ্ঠায় হোসেন শাহী রাজাদের দান অপরিসীম। তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষকতায় দেশীয় ভাষার শিশুত্ব ঘুচিয়া যায়। পঞ্চদশ শতকের শেষ দিকে পাচালী কবিতার বহুল প্রচলন দেখা যায়।

তুর্ক-আফগান আমলের মাঝামাঝি কাল হইতে মোঘল রাজত্বের প্রারম্ভ পর্যন্ত বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত মুসলমান পরিবারে বাংলা কথোপকথনের ক্রমবিকাশ দৃষ্ট হয়। সৈয়দ সুলতান, শেখ ফয়জুল্লাহ, দৌলত কাজী, আলাওল, মাগন প্রমুখ কবি সাহিত্যিক প্রতিভা ষোড়শ শতকের এই ক্রম বিকাশের পরিণতি। কবি মোহাম্মদ খান, মহাকবি সৈয়দ সুলতানের শিষ্য। মহাকবি আলাওল আরাকান বা রোসাঙ্গ রাজসভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। বঙ্গ সাহিত্যের ভাণ্ডারে আলাওলের দান অপরিসীম। মোহাম্মদ সগীর এ যুগের আর একজন খ্যাতনামা কবি।

মধ্যযুগের জনপ্রিয় আখ্যান মনসামঙ্গলের কাহিনী, কালকেতুর উপখ্যান, চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনী, সওদাগর ধনপতির কাহিনী, বিদ্যা ও সুন্দরের কাহিনী, মুসলমানী উপখ্যান, হিন্দু উপখ্যান এবং সত্যপীরের কাহিনী। মানিক দত্ত, দ্বিজ মাধব, কবি কঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী, ভারত চন্দ্র রায়, ভবানী শঙ্কর দাস, প্রমুখ প্রত্যেকেই চণ্ডিমঙ্গলের কবি। ধর্মমঙ্গলের কবি হইতেছেন আদি রূপরাম, খেলারাম, মানিকরাম, সীতারাম দাস এবং আরও অনেকে। কালিকামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দর কাব্যের কবিগণ হইতেছেন — শ্রীধর কবিরাজ, কবিশেখর বলরাম চক্রবর্তী, কঙ্ক, ভারত চন্দ্র রায় গুণাকর, কবীন্দ্র প্রভৃতি। ফয়জুল্লাহ, ঘনরাম চক্রবর্ত্তী, ফকিররাম দাস প্রভৃতি ৭২জন কবি সত্যপীরের পাচালী

লিখিয়াছেন। শীতলামঙ্গল, ষষ্ঠিমঙ্গল, রায়মঙ্গল প্রভৃতি অন্যান্য মঙ্গল কাব্যের অন্তর্ভুক্ত। রায়মঙ্গলে দক্ষিণ রায়, গাজী ও কালু রায়ের কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে।

হোসেন শাহ ও তৎপুত্র নসরত শাহের পৃষ্ঠপোষকতার বিষয় বাংলা ভাষার ইতিহাসে অক্ষয় হইয়া আছে। হোসেন শাহের অধিকাংশ মন্ত্রী ও অমাত্য এদেশীয় হিন্দু ছিলেন। পুরন্দর খা ও রূপ সনাতনের কথা যথাস্থানে বিবৃত হইয়াছে। জগাই ও মাধাই ছিলেন নবদ্বীপের কোতয়াল, দেহরক্ষীদের প্রধান ছিলেন কেশব খান ছত্রী। গোপীনাথ বসু মন্ত্রী, অনুপা টাঁকশালের কর্মাধ্যক্ষ এবং মুকুন্দ দাস রাজবৈদ্য ছিলেন। হিন্দু কৃষ্টির এই সময় সবিশেষ উন্নতি সাধিত হয়, পক্ষান্তরে মুস্লীম কৃষ্টি তথা ইসলাম ধর্মের জন্য এই সকল স্বাধীন সুলতান কি করিয়াছিলেন জানা যায় না। অবশ্য এই যুগের শেষ দিকে মুসলীম কবি সাহিত্যিক ও পুঁথি লেখকেরা ইস্লামী কৃষ্টির পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন। তাঁহাদের চেষ্টায় বাংলা সাহিত্যের সবিশেষ উন্নতি পরিলক্ষিত হয় এবং বঙ্গভাষায় অবাধভাবে আরবী, ফার্সি শব্দ ব্যবহৃত হইতে থাকে।

বৈষ্ণব সাহিত্য বঙ্গদেশে এক আলোড়নের সৃষ্টি করে। হোসেন শাহের সমসাময়িক লেখক চৈতন্য ভাগবতের কবি শ্রীবৃন্দাবন দাস, চৈতন্য চরিতামৃত প্রণেতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ, চৈতন্যমঙ্গল প্রণেতা লোচন দাস প্রমুখ। তাঁহারা সকলেই প্রখ্যাত লেখক ছিলেন। পরাগলী মহাভারত ও অশ্বমেধ পর্ব, রাজমালা, আসাম বুরুঞ্জী, ধর্মপূজা বিধান ও গোরক্ষবিজয় এই সময়কার গ্রন্থ। সৈয়দ সুলতান প্রণয়ন করেন শবে মিরাজ ও জ্ঞান প্রদীপ। আলীরেজার যুগ কালান্দার ও জ্ঞান সাগর বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে।

কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দীর বিবরণ হইতে জানা যায় যে পরাগল খাঁ এবং তৎপুত্র ছুটি খাঁ ফেণী নদীতীরে অবস্থিত চট্টগ্রামের মিলিটারী গভর্ণর ছিলেন। পরাগল খাঁর আদেশে শ্রীকর নন্দী মহাভারত রচনা করেন। কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকর নন্দী, শ্রীধর প্রমুখ পণ্ডিতেরা রাজ পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা

সাহিত্যের চর্চা করিতেন। শ্রীধরের লিখিত যোগদর্শন, বিদ্যাসুন্দর, মহাভারতের বঙ্গানুবাদ, বৈষ্ণব পদাবলী এ যুগের সৃষ্ট সাহিত্য ভাণ্ডার।

কুতুবন ও যশোধর নামে দুইজন হিন্দুস্তানী কবিও হোসেন শাহের প্রশস্তি গাহিয়াছেন। মনসামঙ্গলের কবিগণ হইতেছেন বিপ্রদাস, কানা হরিদত্ত, নারায়ণ দেব, কালিদাস, খেমানন্দ, জানকী নাথ, গোপাল মজুমদার প্রভৃতি। মনসার ভাষান রচয়িতা কবি বিজয় গুপ্ত বাকেরগঞ্জ জিলার কৃতি সন্তান। তিনি হোসেন শাহের রাজত্ব কালে ১৪৯৪খৃষ্টাব্দে মনসামঙ্গল রচনা করেন। নিজ পরিচয় দিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন ঃ—

"পশ্চিমে ঘাঘর নদী পূবে ঘণ্টেশ্বর
মধ্যে ফুল্লশ্রী গ্রাম পণ্ডিত নগর ॥
স্থান গুণে যেই জন্মে সেই গুণময়,
হেন ফুল্লশ্রী গ্রামে নিবসে বিজয় ॥"

বিজয় গুপ্ত হোসেন শাহের প্রশংসাসূচক কবিতায় বলিয়াছেন ঃ—

"ঋতু শশী বেদ শশী পরিমিত শক
সুলতান হুসেন শাহ নৃপতি তিলক
সংগ্রামে অর্জুন-রাজা প্রভাতের রবি
নিজ বাহুবলে রাজা শাসিল পৃথিবী —" ইত্যাদি।

কবি ছোট বিদ্যাপতি নসরতের সমসাময়িক। তিনি নসরতকে নাসিরশাহ বলিয়াছেন। আহামদ শরীফ সম্পাদিত মুসলীম কবির পদসাহিত্য পুস্তকে নসরত শাহের বিষয় আলোচিত হইয়াছে। নসরত সম্পর্কে হিন্দু-মুসলীম উভয় সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব কবিগণ স্তুতি গাহিয়াছেন। কবি শেখ কবির লিখিয়াছেন ঃ—

"নসরত শাহা নামে তথি অধিরাজ
রাম সম পালে প্রজা করে রাজ কাজ ॥"

অসংখ্য মুসলীম কবি ও সাহিত্যিক মধ্যযুগে বৈষ্ণব সাহিত্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ সাহিত্যেও মুসলীম লেখকেরা অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব সাহিত্যের উন্মেষ হয় শ্রীচৈতন্যকে কেন্দ্র করিয়া। গোরক্ষবিজয়

বৌদ্ধগুরু গোরক্ষনাথের কাহিনীতে পূর্ণ। গোরক্ষবিজয়ের অন্যতম রচয়িতা শুকুর মাহম্মদ লিখিয়াছেন ঃ—

"চৌদ্দ সহস্র ভুবন নিজ নামে হবে পার
শুকুর মামুদ কহে ব্রহ্ম-নাম সার।"

গোরক্ষ বিজয় সম্পর্কে শেখ ফয়জুল্লাহ্ এবং কবিন্দ্র দাস গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। অসংখ্য মুসলমান বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে শাহ আকবর, নসীর মাহমুদ, ফকির হাবিব, শেখ কবির, শেখ লাল, সৈয়দ মুর্তজা, সালবেগ, ফতন, চাঁদ কাজি, শেখ জালাল, শেখ ভিখ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ডক্টর শহিদুল্লাহ বলিয়াছেন যে মুসলীম কবিদের মাত্র অল্প কয়েকজন বৈষ্ণব মতে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। কবি কৃষ্ণদাস বলেন, বিজলী খান ও জনৈক সীমান্ত কর্মচারী বৈষ্ণব মতে দীক্ষা গ্রহণ করেন। অবশ্য বৃন্দাবন দাস ইহার কোন উল্লেখ করেন নাই। ডক্টর তরফদার বলেন যে মুসলমানদের বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত করার কথা চৈতন্য ভাগবত, চৈতন্য চরিতামৃত, ভক্তি রত্নাকর, প্রেমবিলাস প্রভৃতি গ্রন্থে কোন উল্লেখ নাই।

গোড়া হিন্দু সমাজ শ্রীচৈতন্যের কৃতকার্যতা দর্শনে ভীত হইয়া পড়ে। তাহারা হরি নাম সংকীর্তনে আপত্তি করিয়া পুলিশ প্রধান ও বিচারক কাজীর নিকট নালিশ পেশ করে। হিন্দু প্রজাদের অনুরোধে কাজী কীর্তন বন্ধ করিতে হুকুম জারি করেন। ইহাতে শ্রীচৈতন্য ক্রুদ্ধ হইয়া কাজীর বাড়ী আক্রমণ করেন। চৈতন্য ভাগবতে আছে ;

আসিয়া কাজীর দ্বারে প্রভু বিশ্বম্বর
ক্রোধাবেশে হুঙ্কার করয় বহুতর
ক্রোধে বলে প্রভু, আরে কাজী বেটা কোথা।
ঝাট আন ধরিয়া কাটিয়া ফেল মাথা ॥
কেহ ঘর ভাঙ্গে কেহ ভাঙ্গয়ে দুয়ার
কেহ লাথি মারে কেহ করয়ে হুঙ্কার।

বৈষ্ণব মতবাদের হরি নাম কীর্তন এই সময় ইসলাম ধর্মের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে না পারিলেও ইসলাম বিস্তারে বাধা প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কোন কোন মুসলমান দলে পড়িয়া হরি নাম

কীর্তন করিত বলিয়া শুনা যায়। বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব হিন্দু জাতিকে ইসলাম গ্রহণ হইতে বহুলাংশে রক্ষা করিয়াছিল। একথা সত্য যে সমস্ত বৈষ্ণব কবিরা ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করিয়াছিলেন।

বৈষ্ণব সাহিত্যের পাশাপাশি মুসলমানদের বিভিন্ন প্রকার কাব্য ও পুঁথি সাহিত্যের সৃষ্টি হয়। ইহাতেও কতিপয় হিন্দু কবি অংশ গ্রহণ করেন। ময়নামতির গান রচনা করেন কবি ভবানী দত্ত, ইহার সম্পাদনা করিয়াছেন নলিনী কান্ত ভট্টশালী ও বৈকুণ্ঠ নাথ ঃ

"শুনহে রসিক জন এক চিত্ত এক মন।
কহেন ভবানী দাস অপূর্ব কথন ॥

ময়নামতির গানে আলীম, আরবী, আলী (ওলী), সিকদার প্রভৃতি মুসলমানী শব্দ থাকায় ডক্টর শহিদুল্লাহ উহা কোন মুসলমান কবির রচনা বলিয়া মনে করেন।

পুঁথি সাহিত্য মুসলমান কবি সাহিত্যিকদের বাংলা ভাষায় এক বিশিষ্ট অবদান। ইহা মধ্যযুগীয় ভাষা ও সাহিত্যকে বিশেষভাবে উন্নত ও পরিপুষ্ট করিয়াছে। পুঁথি সাহিত্যের আদি কবি শাহ্ গরীবুল্লাহ্। তিনি বিখ্যাত গ্রন্থ আমীর হামজা ও জঙ্গনামার রচয়িতা। সৈয়দ হামজা রচিত বিখ্যাত পুঁথি হাতেমতাই ও আমীর হামজা। মোহাম্মদ সগীর প্রণীত ইউসুফ জলিখা, কবি শাকের মামুদের মধুমালতী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য পুঁথির মধ্যে সত্যপীরের পুঁথি, সোনাভান, লাইলী মজুন, গোলে বাকাওলী, ময়নামতি লোর চন্দ্র উল্লেখযোগ্য।

অনুবাদ সাহিত্যও এই যুগের বিশেষ আকর্ষণীয়। অনুবাদ সাহিত্যে নবী বংশ, কিফায়াতুল মুসলেমীন, য়ুসুফ যুলায়খা, লাইলী মজুন, যিকর নামা, গুলে বাকাওলী, মুসার-সওয়াল, মওতনামা, হাতেম তাই প্রভৃতি। রামায়ণ ও মহাভারতের অনুবাদের বিবরণ ইতিপূর্বে দেওয়া হইয়াছে।

পুঁথি সাহিত্যের ন্যায় পল্লী সাহিত্য বা লোক সাহিত্যেরও কদর এদেশে অপরিসীম। লোক গাঁথা বা লোক কাহিনী, জারীগান, সারীগান, ভাটিয়ালী গান, মুর্শিদা গান, বাউল গান, রাখালী গান লোক-সাহিত্যের পর্যায়ে

পড়ে। এ দেশের মাটে ঘাটে, পথে প্রান্তরে, আলো বাতাসের সহিত মিশিয়া আছে এই লোক-সাহিত্য। বিশ্বের লোক বিজ্ঞান ও লোক সাহিত্যের ইতিহাসে পূর্ব-বাংলার লোক সাহিত্য বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। বাংলা সাহিত্যেব ইতিহাসে ইহা এক গৌরবময় ঐতিহ্যের অধিকারী। লোক সাহিত্যের সহিত সমাজের নাড়ির যোগসূত্র অতীব গভীর। শুধু ভাষা ও ভাবের উন্নতি বিধান নহে, ইহা এদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

বাকেরগঞ্জ ও যশোর-খুলনার ইতিবৃত্ত

॥ তের ॥

সুন্দরবন বর্তমানে খুলনা ও বাকেরগঞ্জ জিলার মধ্যে সীমাবদ্ধ। যশোর জিলায় এখন সুন্দরবন বা গভীর জঙ্গল নাই। এক অতি অজানা প্রাচীনকালে এই সমস্ত স্থান অতল সমুদ্রের মধ্যে অবস্থিত ছিল। যুগ যুগ ধরিয়া গঙ্গানদীর পলি দ্বারা এখানে দ্বীপ ও চরভূমি সৃষ্টি হইয়াছিল। এই সব স্থানে যথাসময় জঙ্গল সৃষ্টি হইয়া ব্যাঘ্রের আবাস ভূমিতে পরিণত হইত। যশোর-খুলনা ও বাকেরগঞ্জের প্রায় সর্বত্র পুরাকালে সুন্দরবনে পূর্ণ ছিল, তন্নিমিত্ত এ জিলাত্রয়ের ইতিহাস ও সুন্দরবনের আদি ইতিহাস এক ও অভিন্ন।

যশোর-খুলনা ও বাকেরগঞ্জ গাঙ্গেয় বদ্বীপের দক্ষিণ ভাগ। স্থানিক পুরাতত্ত্ব, বদ্বীপ গঠন, চরভূমি ও জঙ্গল সৃষ্টির বিস্তারিত ইতিহাস গ্রন্থারম্ভেই বর্ণনা করিয়াছি। সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের পটভূমি ও প্রতিটি বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণী যথাস্থানে বর্ণিত হইয়াছে। আমরা অত্র গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে প্রাচীন ও আধুনিক সুন্দরবনের ইতিহাস ও তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রধান ও খুঁটিনাটি বিষয়ের আলোচনা করিয়াছি। দ্বিতীয় খণ্ডে অতি প্রাচীন কাল বা আদিম যুগ হইতে বার ভূঞাদের আমল এবং মোগল যুগের প্রাথমিক পর্যায়ের ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর বর্ণনা দিয়াছি। বিস্তৃত ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন বঙ্গ বা পূর্ব-পাকিস্তানের অন্যান্য জিলারও সংশ্লিষ্ট ঐতিহাসিক বিষয় সমূহ আসিয়া পড়ায় উহারও বিবরণ দিতে হইয়াছে। ইংরেজ আমল ও মোঘল যুগ এবং বিভাগোত্তরকালীন দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস দ্বিতীয়খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয় নাই। তবে এই আমলের যে সমস্ত বিষয় আলোচনা প্রসঙ্গে প্রাচীন ঘটনাবলীর সঙ্গে বিশেষভাবে বিজড়িত সেই সমস্ত বিষয়ও যাথাস্থানে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইতিহাসের ধারাবাহিকতা ও সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে সর্বত্র প্রয়াস পাইয়াছি।

কোন একটি জিলার ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিতে পার্শ্ববর্তী জিলার ইতিহাস আসিয়া যায়। যশোর-খুলনার প্রাচীন ইতিহাস সর্ব দিক দিয়া এক

ও অভিন্ন। মহাত্মা খানজাহান আলী, হোসেন শাহ, নসরত শাহ, গাজীকালু প্রভৃতির ইতিহাস এ দুই জিলার সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তেমনই বাকেরগঞ্জ জিলার ইতিহাস খুলনা জিলার পূর্বাংশের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট। প্রত্যেক জিলার নিজস্ব ইতিহাস ও ঐতিহ্য আছে। প্রতিটি জিলার সংক্ষিপ্ত পরিচয় জিলাওয়ারী ইতিহাস অধ্যয়নে বিশেষ সহায়ক হইবে। তজ্জন্য পৃথকভাবে জিলাওয়ারী সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল। ইতিপূর্বে জিলাদ্বয়ের প্রাচীন রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস বিভিন্ন অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। যে সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয় পূর্বোক্ত অধ্যায় সমূহে আলোচনা করা সম্ভব হয় নাই, সেই সমস্ত বিষয় একে একে এখানে সন্নিবেশিত করিতেছি।

বাকেরগঞ্জ

যশোর-খুলনার ন্যায় প্রাচীন ইতিহাস ও কীর্তিরাজি বাকেরগঞ্জ জিলায় খুব বেশী নাই। এ জিলার প্রাচীন ইতিহাসও দুষ্প্রাপ্য। খলিফাতাবাদ (বাগেরহাট) শুধু খানজাহান আলীর কর্মকেন্দ্র ছিল না। এখানে স্বাধীন বঙ্গের একটি ঐতিহাসিক টাঁকশাল বহুদিন ধরিয়া অবস্থিত ছিল। মোঘল যুগে বঙ্গের ২৪টি সরকার বা জিলার অন্যতম সরকার খলিফাতাবাদের প্রধান নগরী এখানে অবস্থিত ছিল। ঈদৃশ নানা কারণে এখানে জনাকীর্ণ শহর ও অসংখ্য হর্ম্যরাজি নির্মিত হইয়াছিল। মুরলী, যশোর, বারবাজার, মীর্জানগর, ব্রাহ্মণনগর, কাগজপুকুরীয়া, লাবসা, সাতক্ষিরা, ধানদিয়া, ঈশ্বরীপুর (যশোর), বেতকাশী, চাকশ্রী প্রভৃতি ক্ষুদ্র বৃহৎ বহু শহর তুর্ক আফগান আমলে বা উহার পূর্বে ও পরে যশোর-খুলনায় স্থাপিত হইয়াছিল।

বাকেরগঞ্জের ইতিহাস লেখক বিভারীজ সাহেব বলিয়াছেন যে, বরিশালের উত্তরাংশ এক কালে জঙ্গলাকীর্ণ ও নদনদী বিধৌত প্রদেশ ছিল। প্রাচীনকালে শত শত বৎসর ধরিয়া গঙ্গানদীর পলি দ্বারা সমুদ্র তীরে চরভূমি ও জঙ্গল সৃষ্টি হইয়াছিল। এ জিলার গৌরনদী, চন্দ্রদ্বীপ প্রভৃতি নাম নদী ও দ্বীপের পরিচয় বহন করে। বাকেরগঞ্জ জিলায় দ্বীপ ও চরভূমির সংখ্যা খুব বেশী; যথা চর আণ্ডা, চর মমতাজ, চরকুকরী মুকরী, চরগাঁ, চর কাউয়া,

মনপুরা, রাঙ্গাবালী, চর কেওড়া, চর সাঙ্গর, চর জাহাজপুর, চর বদনা, চর করমজি, চরামদ্দি, চরশ্যামরায়, চর খাগকাটা, চর কলমী, চরগাজী প্রভৃতি। শাহাবাজপুর, মনপুরা, চর কুকরী মুকরী প্রভৃতি বড় বড় দ্বীপে অসংখ্য মনুষ্য বসতি বিদ্যমান।

বাকেরগঞ্জ জিলায় জঙ্গল কাটিয়া অসংখ্য গ্রামের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, সেইজন্য বহু গ্রামের নামের সহিত কাটিযুক্ত শব্দ আছে। যেমন কুলকাটি, ঝালকাটি, সরূপকাটি, কানাইদাসকাটি, বর্ষাকাটি, ঘাঘরকাটি প্রভৃতি। সুন্দরবন বিভাগের ন্যায় নদী নালা ও অসংখ্য খাল বরিশালের সর্বত্র বিদ্যমান। এমন কি বরিশাল শহরের মধ্যে বহু খালের অবস্থিতির জন্য অন্যান্য শহরের ন্যায় আবর্জনাদি নিকাশের পৃথক ব্যবস্থা করিতে হয় না। বাকেরগঞ্জই একমাত্র জিলা যেখানে অসংখ্য নদনদীর জন্য কোন রেল লাইন স্থাপন সম্ভব হয় নাই।

বাকেরগঞ্জ জিলায় কোন সুপ্রাচীন রাজপাট বা শহর ছিল না। তুর্ক-আফগান আমলে বাকলা চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। কচুয়া ইহার রাজধানী, পরবর্তী রাজধানী মাধবপাশা। নবাব সিরাজউদ্দৌল্লার সময় আগা বাকের এখানে আসিয়া সেলিমাবাদ ও বোজর্গ উমেদপুর পরগনার শাসনভার ও রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া একটি বাজারের পত্তন করেন। তাঁহার নামানুসারে এই স্থানের নাম হয় বাকেরগঞ্জ। এই স্থান বোজর্গ উমেদপুর পরগনার মধ্যে অবস্থিত। পূর্বে এখানে জিলার হেড কোয়ার্টার ছিল এবং ১৮০১ খৃঃ শাসন কার্যের সুবিধার্থে বরিশাল উঠিয়া যায়। এই স্থান কৃষ্ণকাটি ও খয়েরাবাদ নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। বরিশাল শহরের পূর্ব নাম ছিল গিরিধি বন্দর। বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম বরিশালের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া ইহাকে বাংলার ভেনিস নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন।

পর্তুগীজরা সর্বপ্রথম বাকলায় একটি ব্যবসায় কেন্দ্র স্থাপন করিয়া উহার নামকরণ করে "গ্রেদ বন্দর" (Great Port)। পর্তুগীজ বা ইটালিয়ানরা ট বা ড কে দ উচ্চারণ করে। বরিশাল শহরের গোড়াপত্তনের পূর্বে পর্তুগীজরা এই স্থানকে "গ্রেদ বন্দর" নামে আখ্যায়িত করিয়াছিল। এই "গ্রেদ বন্দর" রূপান্তরিত হইয়া গিরিধি বন্দরে পরিণত হয়। বরিশাল, বগুরা, কাউনিয়া,

আলীকান্দা ও আমানতগঞ্জ — এই পাঁচটি গ্রাম লইয়া বরিশাল শহরের ভিত্তি পত্তন হয়। ১৮১৯খৃঃ রিচার্ড হান্টার নামক এক ইংরেজের নিকট হইতে বর্তমান বাকেরগঞ্জ কালেকটরির জায়গাটুকু ৫ (সিকা) টাকায় গভর্ণর জেনারেল মার্কুইস অব হেষ্টিংসের নামে ক্রয় করা হয়। এই হস্তান্তর সম্পর্কীয় দলিলে দেখা যায় যে ঐ জমির পরিমান ছিল ৩ কানি বা ২০,৭৩,৬০ বর্গ ফুট।

বাকেরগঞ্জের প্রতিষ্ঠাতা আগা বাকেরের দুর্ভাগ্য যে অধিক দিন রাজকার্য পরিচালনা করিতে না করিতে ১১৬০ বঙ্গাব্দে (১৭৯৩খৃঃ) তিনি স্বীয় পুত্রসহ বিদ্রোহীদের হস্তে নির্মমভাবে নিহত হন। মুসলমানেরা মোঘল আমলে সর্ব প্রথমে এই অঞ্চলেই বসবাস আরম্ভ করে। এখানে কোন প্রাচীন সৌধ নাই। বোরহান খাঁ নামীয় একটি বৃহৎকায় দীঘি মাত্র অতীত দিনের সাক্ষ্য দিতেছে। ইহার নিকটেই বাকেরকাটি নামে একটি গ্রাম আছে। এ জিলার অন্যান্য প্রাচীন স্থান হইতেছে মসজিদবাড়ী, শিয়ালগুনী, শায়েস্তাবাদ, চন্দ্রদ্বীপ, শাহবাজপুর, গৌরনদী, গৈলা-ফুল্লশী, রামসিদ্ধি, বাংলাবাদ প্রভৃতি। অন্যান্য প্রসিদ্ধ স্থানের মধ্যে রহমতপুর, শিকারপুর, বাটাজোড়, চাখার, উলানিয়া, উজিরপুর, সাতুরীয়া, নথুল্লাবাদ। ইদিলপুর ও ফুল্লশীর কথা এবং চন্দ্রদ্বীপের ইতিহাস যথাস্থানে বর্ণিত হইয়াছে। শায়েস্তা খান প্রতিষ্ঠিত শায়েস্তাবাদের নওয়াব মোয়াজ্জেম হোসেন বাকেরগঞ্জের কৃতি সন্তান। তৎপ্রতিষ্ঠিত পুস্তকাগারের খ্যাতি সর্বত্র পরিব্যাপ্ত ছিল। পাক-ভারতের স্বনাম ধন্য জননায়ক, দরিদ্রের বন্ধু সর্বস্বত্যাগী মহাপুরুষ স্বনামধন্য এ, কে, ফজলুল হকের জন্মস্থান এই জিলায়। ফার্সি ভাষায় সুপণ্ডিত, বহু গ্রন্থ প্রণেতা, শিক্ষাবিদ মনীষী অশ্বিনীকুমার দত্তের বাড়ীও এই জিলায়। আরও বহু মনীষীর জন্ম দিয়াছে এ জিলার মৃত্তিকা।

বাকেরগঞ্জ জিলা ৪২৪০ বর্গমাইল এলাকা জুড়িয়া বিস্তৃত। ১৯৬১সালের আদম শুমারী অনুসারে ইহার লোক সংখ্যা ৪২,৬১,৭৬৭। প্রতি বর্গ মাইলে লোক সংখ্যার হার ১০০৫জন। শতকরা শিক্ষিতের হার ২৪·৮। আবহাওয়া মধ্যম,আর্দ্র ও লবনাক্ত। এ জিলার দক্ষিণাংশে খেপুপাড়া অঞ্চলে ও বঙ্গ সাগরীয় দ্বীপে মগ জাতীয় লোকের বসবাস আছে। ইহারা আরাকানের জলদস্যু বা

অত্যাচারী "মগের মুল্লুকের" মগদের বংশধর নহে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী জঙ্গল আবাদ ও ধান্য ফসল উৎপন্নের জন্য এই সমস্ত মগের পূর্ব পুরুষদিগকে ব্রহ্ম ও চট্টগ্রাম হইতে এখানে আনায়ন করে।

কথিত আছে যে সুগন্ধা বা সুন্ধা নদীর চর পড়িয়া এ জিলার দক্ষিণাংশ সৃষ্টি হইয়াছে। সেলিমাবাদ এবং বাকলা-চন্দ্রদ্বীপ এই নদীর চরে সৃষ্টি হইয়াছিল। বাকেরগঞ্জের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ সুন্দরবন। গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে এ বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। বহুকাল ধরিয়া পণ্ডিত ব্যক্তিদের আলোচনার বিষয় "বরিশাল কামানের" কথা যথা স্থানে বিবৃত হইয়াছে। সুন্দরবনের ব্যাঘ্র-হরিণ ছাড়া মেঘনা দ্বীপ ও ভাণ্ডারিয়া বিলে এখনও বন্য মহিষ পাওয়া যায়। শাহাবাজপুর পূর্বে নোয়াখালির অন্তর্গত ছিল। ১৮৫৯খৃঃ ইহা বাকেরগঞ্জ জিলার অন্তর্ভুক্ত হয়। শাহাবাজপুর দ্বীপে ডোরা হরিণ পাওয়া যায়। চিতাবাঘও বাকেরগঞ্জের জঙ্গলে পাওয়া যায় বলিয়া শ্রুত হয়।

বাকেরগঞ্জ জিলার উত্তরে ফরিদপুর জিলা, মেঘনা ও শাহবাজপুর নদী, পশ্চিমে বলেশ্বর নদী ও খুলনা জিলা এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। প্রধান নদী— মেঘনা, বলেশ্বর, তুর্কী, আড়িয়াল খা, নয়া ভাঙ্গানী, সফীপুর, বিষখালি, বিঘাই ও লোহানিয়া। কয়েক শতাব্দী পূর্ব হইতে অধুনা কাল পর্যন্ত প্রায়ই ঝড় ও প্লাবনে এ জিলা আক্রান্ত হইয়া আসিতেছে সে বিষয়ে অন্যত্র বর্ণনা করিয়াছি। বাকেরগঞ্জের প্রধান ফসল ধান, পাট, মরিচ, ইক্ষু ও নারিকেল সুপারী।

বাকেরগঞ্জ জিলার মহকুমা ৫টি, যথা — সদর উত্তর, সদর দক্ষিণ, পিরোজপুর, ভোলা ও পটুয়াখালি। থানার মোট সংখ্যা ৩৪, ইউনিয়নের সংখ্যা ৩২৭, মিউনিসিপ্যাল কমিটি ১টি এবং শহর কমিটি ৫টি। এছাড়া অন্যান্য জিলার ন্যায় ১টি জিলা কাউন্সিল আছে। এ জিলার সর্ব মোট গ্রামের সংখ্যা ৩৭২৩।

প্রবাদ আছে যে কৈবর্ত জেলেরা এ জিলার আদি বাসিন্দা। আদিম অধিবাসী এবং বৌদ্ধরাও এদেশের প্রাচীন অধিবাসী ছিল। ষোড়শ শতকের

মাঝামাঝি সম্রাট আকবরের সময় বাকেরগঞ্জ মোঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। ইহার পূর্বে পাঠান ও দেশীয় হিন্দু-মুসলিম অধিবাসী বারভূঞাদের সঙ্গে মিলিত হইয়া মোঘলদের প্রতিরোধ করিয়াছিল।

আইন-ই-আকবরী হইতে জানা যায় যে, "হাসিল নেমক" নামে এক প্রকার কর লবন প্রস্তুত কারকদের নিকট হইতে আদায় করা হইত। শাহবাজপুর ও মনপুবায় প্রচুর লবন পাওয়া যাইত। সুন্দরবনাঞ্চলের লবন শিল্প কি ভাবে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল সে সম্পর্কে গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছি। মগ পর্তুগীজ অত্যাচারেব কাহিনীও বিস্তারিত আলোচিত হইয়াছে।

ঢাকা কালেক্টরেটের অধীন ছিল এ জিলা। উক্ত কালেক্টরেটের নাম ছিল ঢাকা জালালপুর। যখন ফরিদপুর ও নোয়াখালি জিলার সৃষ্টি হয় নাই। বাকেরগঞ্জ, ফরিদপুর ও ঢাকা জিলা তখন ঢাকা জালালপুরের অধীন ছিল। ঢাকার কালেক্টব উইলিয়াম ডগলাসের সময় বাকেরগঞ্জ জিলার স্থায়ী জরিপ হয় এবং বাকেগঞ্জেব রাজস্ব আদালত ঢাকায় থাকিয়া যায়। শাসন ও বিচারকার্য পরিচালনার্থে ১৭৯৭ সালে ৭ রেগুলেশান অনুযায়ী ঐ বৎসর বাকেরগঞ্জ জিলার সৃষ্টি হয়।

বৃটিশ অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে বাকেবগঞ্জের শস্যশ্যামল ক্ষেত ও ধান্যের খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। ধান চাউলের জন্যই বাকেরগঞ্জ এলাকার প্রতি বৃটিশ সবকাবের দৃষ্টি পতিত হয়। বাংলার শস্যাগার (Granary of Bengal) বলিয়া এ জিলাব খ্যাতি ছিল। নলছিঠি থানাধীন বারইকরণ নামক স্থানে ১৭৮১ খৃঃ একজন জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করা হয়। তখন বিচার ও শাসন একই ব্যক্তির দ্বারা চালিত হইত। ১৭৮৪ খৃঃ জলদস্যু দমনের জন্য সুন্দরবনাঞ্চলে একজন কমিশনার নিযুক্ত হয়। বারইকরণ হইতে হেডকোয়ার্টার বাকেরগঞ্জে স্থানান্তরিত হয় ১৭৯২ খৃঃ। ১৮৭১ খৃঃ পর্যন্ত রাজস্ব আদায় ঢাকার কালেকটরেটের অধীন ছিল। ঐ বৎসর হইতে বাকেরগঞ্জে রাজস্ব আদায় বিভাগ স্থাপিত হয় এবং সমস্ত দলিল দস্তাবেজ এখানে আনীত হয়। ১৮০১ সালে গিরিধি বন্দরে (গ্রেদবন্দর)

হেডকোয়ার্টার স্থানান্তরিত হয়। গিরিধি বন্দরই পরে বরিশাল নামে অভিহিত হয়।

১৮৭২-৭৩ সালের বেঙ্গল এডমিনিষ্ট্রেশান রিপোর্টে বাকেরগঞ্জ জিলার অন্তর্গত মাদারীপুর মহকুমার নাম দেখা যায়। পরে মাদারীপুর মহকুমা বাকেরগঞ্জ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ফরিদপুর জিলার অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৮৪৫ খৃঃ ভোলা, ১৮৫৯ খৃঃ পিরোজপুর এবং ১৮৮১ খৃঃ পটুয়াখালী মহকুমার সৃষ্টি হয়।

এইক্ষণ আমরা বাকেরগঞ্জ জিলার প্রাচীন ইতিহাস ও কীর্তিরাজির দিকে পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিব। সুন্দরবন আবাদ ও জন বসতি স্থাপনের বিষয় যথাস্থানে বর্ণনা করিয়াছি। তুর্ক-আফগান আমলে দক্ষিণাঞ্চলে জঙ্গল মধ্যে মস্‌জিদ ও বসতবাটি নির্মিত হইয়াছিল। পরে এই সমস্ত এলাকা প্লাবন বা প্রাকৃতিক বিপ্লবের পর জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া পড়ে। পটুয়াখালীর অন্তর্গত গুলিশাখালী থানার উত্তর পশ্চিমে মীর্জাগঞ্জের সন্নিকটে জঙ্গল পরিস্কার করার সময় একটি মস্‌জিদ আবিষ্কৃত হয়। তখন ঐ গ্রামের নামকরণ হয় মস্‌জিদবাড়ী। সমসাময়িক কালে খুলনার দক্ষিণে অনুরূপ একটি বৃহৎকায় মস্‌জিদ জঙ্গল ও মৃত্তিকার তলে আবিষ্কৃত হওয়ার জন্য তথাকার নাম হয় মস্‌জিদকুড়। ইহার ইতিহাস অন্যত্র বর্ণিত হইয়াছে।

গৌড় সুলতান বরবক শাহের রাজত্বকালে এক গুম্বজবিশিষ্ট একটি মস্‌জিদ ইং ১৪৬৫ খৃষ্টাব্দে নির্মিত হইয়াছিল। উক্ত মস্‌জিদগাত্রে একখানি আরবী শিলালিপি দেখিতে পাওয়া যায়। উহা এখন কলিকাতাস্থ এশিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত আছে। বিভাগ পূর্বে কলিকাতা ছিল বঙ্গের রাজধানী। সেজন্য পৌরাণিক শিলালিপি, মুদ্রা, প্রস্তর মূর্তি প্রভৃতি বহু ঐতিহাসিক নিদর্শন কলিকাতা যাদুঘরে ও অন্যত্র রক্ষিত আছে। সম্ভবতঃ এগুলি ফেরত পাওয়া যায় নাই। সরকার কর্তৃক উহার পুনরুদ্ধার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করি। আরবী ভাষায় লিখিত আলোচ্য শিলালিপির বঙ্গানুবাদ নিম্নে দেওয়া গেল;

—আল্লার রসুল বলিয়াছেন, যিনি এই জগতে একটি মস্‌জিদ নির্মাণ করিয়া দিবেন, আল্লাহ বেহেশতে তাঁহার জন্য ৭০টি গৃহ নির্মাণ করিয়া

দিবেন। এই মস্‌জিদ সুলতান মাহমুদ শাহের পুত্র, ধর্ম ও রাজ্যের স্তম্ভস্বরূপ আবুল মোজাফফর বরবক শাহের রাজত্বকালে ৮৭০ হিজরীতে মোয়াজ্জাম উজীল খার দ্বারা নির্মিত হয়। "বিভারীজ সাহেব ইং ১৮৭৪ সালে এই মস্‌জিদ অভগ্ন অবস্থায় দর্শন করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন যে বাকেরগঞ্জ জিলার ইহাই একমাত্র প্রাচীন কীর্তির নিদর্শন। কেহ কেহ বলেন ইহাই এই জিলার প্রথম ইষ্টক নির্মিত অট্টালিকা।

বাংলা দেশের অতীব প্রাচীন স্থান গৌরনদী থানার অন্তর্গত রামসিদ্ধি বা বাংলাবাদ। ঢাকার বিক্রমপুর এবং ফরিদপুরের কোটালীপাড়া এবং বাকেরগঞ্জের গৌরনদী অঞ্চলই প্রাচীন বঙ্গের আদি কেন্দ্রস্থল ছিল। বাঙ্গালী কৃষ্টি, বাংলার ঐতিহ্য এবং বঙ্গের অতি প্রাচীন ইতিহাস এখানকারই ইতিহাস। প্রাক বিভাগ যুগের সমগ্র বঙ্গদেশ প্রাচীন বাংলা দেশ নহে। সিলেট প্রাচীন কালে পৃথক দেশ ছিল। কুমিল্লা নোয়াখালী অঞ্চল সমতট রাজ্যাধীন ছিল। রাজশাহী অঞ্চল পৌণ্ড্রবর্ধন বা বরেন্দ্রভূমির অন্তর্গত পৃথক রাজ্য ছিল। যশোর-খুলনা, কুষ্টিয়া কখন প্রাচীন বঙ্গের অধীন ছিল এবং কখনও অন্য নামে কথিত হইত। কিন্তু বাংলাবাদ (গৌরনদী), কোটালীপাড়া, বিক্রমপুর অঞ্চল চির দিনই প্রাচীন বঙ্গের মণিস্বরূপ বিদ্যমান ছিল। সেজন্য এখানকার প্রাচীন ইতিহাস এবং বঙ্গের আদি ইতিহাস এক ও অভিন্ন।

উত্তরবঙ্গ ও পূর্ব বঙ্গের আগত দরবেশদের অব্যবহিত পরে অন্যান্য জিলার ন্যায় বাকেরগঞ্জেও ইস্‌লাম প্রচারের ঢেউ উঠিয়াছিল। মসজিদবাড়ী, কসবা, পিরোজপুর অঞ্চলে সম্ভবতঃ প্রথমেই এই ঢেউয়ের দোলা লাগে।

সৈয়দুল আরেফিন এ জিলার বিখ্যাত ইস্‌লাম প্রচারক এবং সুফী দরবেশ। পটুয়াখালী মহকুমাধীন বাউফল থানার কালিগুঁড়ি গ্রামে তাঁহার কবরগাহ অবস্থিত। প্রবাদ আছে যে দিগ্বিজয়ী তৈমুর লঙ্গের সময় এই দরবেশ মধ্য এশিয়া হইতে বঙ্গে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি বাকেরগঞ্জ জিলার ভাটি অঞ্চলে স্বীয় আস্তানা প্রতিষ্ঠা করিয়া ইস্‌লাম প্রচারে রত হন। এই সাধকের চরিত্র মাহাত্মে মুগ্ধ হইয়া বহু বিধর্মী দলে দলে ইস্‌লাম কবুল করিয়াছিলেন।





উপরে : মস্‌জিদবাড়ীর মস্‌জিদ—বাকেরগঞ্জ (জঙ্গল আবাদ করায় সময় ইহা আবিষ্কৃত হয়)— ৪৬৩

নীচে : কসবা মস্‌জিদ (নবগুম্বজ), গৌরনদী, বাকেরগঞ্জ—৪৬৫

বাংলাবাদের সন্নিকটে কসবা নামক গ্রাম অবস্থিত। কসবা ফার্সি শব্দ, উহার অর্থ শহর। পাঠানেরা এদেশে আগমন করিবার পর প্রায়ই প্রাচীন শহর ও নগরী তাঁহাদের আবাসস্থল নির্ধারণ করিত। বারবাজার, মুরলী, খলিফাতাবাদ প্রভৃতি স্থানে হিন্দু-বৌদ্ধ সভ্যতার ধ্বংসাবশেষের উপর পাঠানেরা নূতন করিয়া জনপদ ও শহরের পত্তন করিয়াছিল। কথিত আছে যে সাবী খান নামক জনৈক পাঠান ষোড়শ পতকের প্রথম ভাগে কসবা অঞ্চলে আগমন করেন। তিনি সর্ব প্রথম এখানে একটি রাস্তা নির্মাণ করেন। এই রাস্তার পশ্চিম দিকে সাবী খান একটি নব গুম্বজবিশিষ্ট বৃহৎকায় মসজিদ নির্মাণ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন ইহা খানজাহানের সময় নির্মিত। এই মসজিদে প্রস্তর নির্মিত স্তম্ভ আছে এবং সর্বদিক দিয়া ইহা মসজিদকুড়ের মসজিদের ন্যায়। খানজাহান বাকেরগঞ্জের কোন অঞ্চলে লোক পাঠাইয়া আবাদ করেন বা নিজে সেখানে গিয়াছিলেন সেইরূপ কোন প্রমাণ আমাদের হস্তগত হয় নাই। ইহা তাঁহার মৃত্যুর পরে নির্মিত হইয়া থাকিবে। বাকেরগঞ্জের এই প্রাচীন কীর্তিটি সরকারী কর্তৃত্বাধীনে আসিয়া উহার মেরামত ও তত্ত্বাবধান সুচারুরূপে চলিতেছে।

সাবী খান জনহিতকর কার্যের জন্য খ্যাতিলাভ করেন। কথিত আছে যে তিনি কোন পাঠান শাসন কর্তার অধীনে কোতয়াল ছিলেন এবং তদনুসারে পার্শ্ববর্ত স্থানের নামকরণ হয় কোতয়ালী পাড়া বা কোটালীপাড়া। "সাবীখাঁর জাঙ্গাল" বলিলে তাঁহারই সময় নির্মিত প্রাচীন রাস্তা বুঝায়। সাবী খাঁ খনিত একটি প্রাচীন দীঘির তীরে সাবীখাঁর পাড় নামে একটি গ্রাম আছে।

বিভারীজ তদীয় গ্রন্থে সাবীখান সম্পর্কে একটি অত্যদ্ভুত গল্পের অবতারণা করিয়াছেন। উক্ত গল্পের বর্ণনায় জানা যায় যে সাবীখান একজন বিখ্যাত শিকারী ছিলেন। আরও কথিত আছে যে তাঁহার মাতা পিতা কর্তৃক সুন্দরবনের জঙ্গলে বিতাড়িত হন বা তাঁহাকে বনবাস দেওয়া হয়। জঙ্গলের মধ্যে অপরিচিত মাতা ও পুত্রের মধ্যে প্রণয় মিলন ঘটে এবং তাঁহারা বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হইয়া বহুকাল যাবৎ স্বামী স্ত্রীস্বরূপ একত্রে বসবাস করেন। পরে মাতা স্বীয় সন্তানের গাত্রে — কোন একটি চিহ্ন দেখিতে পাইয়া পূর্ব পরিচয়ের

কথা প্রকাশ করিয়া দেন। এহেন মারাত্মক ভুলের জন্য সাবীখাঁর অনুশোচনা হয় এবং তিনি মস্জিদ প্রতিষ্ঠা, রাস্তা নির্মাণ এবং দীঘি খনন প্রভৃতি জনহিতকর কার্য করিয়া প্রায়শ্চিত্য করিবার জন্য আদিষ্ট হন। বিভারীজ বর্ণিত এই গল্প নিছক আজগুবি ও কল্পনাপ্রসূত এবং প্রকৃত ইতিহাসকে বিকৃত করণ ও ধামাচাপা দেওয়ার অপকৌশল ভিন্ন অন্য কিছু নহে।

বাকেরগঞ্জ থানার শিয়ালগুণি গ্রামে একটি প্রাচীন মস্জিদ আছে। কথিত আছে যে গাজী নসরত এই মস্জিদ নির্মাণ করেন। এক কালে উহা সুন্দর কারুকার্য শোভিত ছিল। এখনও উহার কিছু কিছু নিদর্শন দৃষ্ট হয়। এখানে একখানি শিলালিপি ছিল বলিয়া জানা যায়। বহু কাল পূর্বে উহা অপসারিত হইয়াছে। ইহার সন্নিকটে পিলখানা বলিয়া একটি গ্রাম আছে। সম্ভবতঃ এখানে এককালে কোন স্থানীয় শাসনকর্তার হস্তীশালা ছিল।

অন্য একটি মস্জিদ নিয়ামতীর সন্নিকটে বিবিচিনি গ্রামে অবস্থিত। কথিত আছে যে নিয়ামতের ভগ্নী চিনিবিবি নামক জনৈক মহিলা এই মস্জিদ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই মস্জিদ সুউচ্চ ও বৃহৎকায় একটি ঢিপির উপর নির্মিত হয়।

মেন্দিগঞ্জে একটি পুরাতন মসজিদ আছে। উহার লিপি হইতে জানা যায় যে ১৭১৩ খৃঃ মোহাম্মদ সফি কর্তৃক এই মস্জিদ নির্মিত হইয়াছিল।

শূজাবাদ নলছিটি নদীতীরে অবস্থিত ক্ষুদ্র গ্রাম। ইহা একটি ঐতিহাসিক স্থান। বরিশাল শহর হইতে ৫ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত এই গ্রাম। মোঘল সম্রাট শাহজাহানের দ্বিতীয় পুত্র শাহশূজা মগ-বর্গী আক্রমণ প্রতিরোধ কল্পে এখানে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। শাহশূজা বাংলার সুবাদার ছিলেন। শূজাবাদ দুর্গের ভগ্নাবশেষ আজিও দৃষ্ট হয়। দুর্গটি চারি সমকোণা বিশিষ্ট চতুর্ভুজ। মৃন্ময় প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত এই দুর্গের প্রতি কোণে একটি করিয়া ঢিপি স্থাপিত হইয়াছিল। দুর্গ মধ্যে চারিটি ক্ষুদ্র পুকুর রাস্তার দ্বারা চিহ্নিত করা হইয়াছিল। চৌরাস্তার সঙ্গম স্থলে শাহ্‌শূজার আবাসবাটী ছিল।

বাকেরগঞ্জ কালেকটরেটের এক দলিল হইতে জানা যায় যে জনৈক পাঠান মগদের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাঁহার

পরিবারবর্গকে শূজাবাদ গ্রাম দান করা হয়। আসমান সিং এই বংশের শেষ প্রদীপ। ইংরেজ আমলে নরহত্যার অপরাধে ফাঁসি কাষ্ঠে তাঁহার প্রাণদণ্ড হইলে এই বংশের ধারা লয় প্রাপ্ত হয়।

ঝালকাটি থানায় দুইটি দুর্গ আছে। একটি ঝালকাটি থানার সন্নিকটে রূপাসিয়ায় এবং অন্যটি রাজাপুরের নিকটে ইন্দ্রপাশায় অবস্থিত। ইহার কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। মেজর রেনেলের মানচিত্রে বাকেরগঞ্জ জিলার দক্ষিণে আরও দুইটি মৃত্তিকা নির্মিত দুর্গের কথা আছে। একটি সম্ভবতঃ বাউফল থানার সোনারকোটে অবস্থিত ছিল। ইহারই সন্নিকটে কিল্লাঘাটা বা দুর্গের অবতরণ-ঘাট বলিয়া একটি জায়গা আছে। অন্যটির সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না।

কথিত আছে যে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতনের অব্যবহিত পরে তাঁহার এক দল অনুগামী শারিকাল নামক স্থানে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। ঘাটি নির্মাণ করিয়া এখান হইতে ইংরেজদিগকে প্রতিরোধ করার ইচ্ছা তাঁহাদের ছিল। কিন্তু ১৭৭৯ খৃঃ ইংরাজেরা এই দুর্গ দখল করিয়া লয়।

বাকেরগঞ্জের অন্যতম প্রধান স্থান বাকলা বা চন্দ্রদ্বীপ। বাকলা নামে কোন শহর ছিল কি না জানা যায় না। বাকলা নামক প্রাচীন স্থান মেঘনা নদীগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। নদীয়া বা নবদ্বীপ অপেক্ষা প্রাচীন বাকলার সংস্কৃত শিক্ষা-কেন্দ্র বৃহৎকায় ও প্রসিদ্ধ ছিল। ঢাকার ইতিহাস প্রণেতা টেইলর বলেন যে, বাকলার পণ্ডিত সমাজ জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশেষ দক্ষ ছিলেন। মোঘল আমলে বাকলার নাম হয় ইসমাইলপুর। এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা দনুজমর্দন দেব। একটি পৃথক অধ্যায়ে আমরা এ রাজ্যের প্রাচীন ইতিহাস বর্ণনা করিয়াছি। এখন সংক্ষেপে উহার অবশিষ্ট ইতিহাস সংযোজন করিতেছি।

পটুয়াখালী মহকুমার বাউফল থানার মধ্যে তেতুলিয়া নদীর পশ্চিম তীরে কচুয়া নামক স্থানে চন্দ্রদ্বীপের রাজধানী ছিল। মগ জলদস্যুদের অমানুষিক অত্যাচারে অথবা নদী ভাঙনে রাজধানী অন্যত্র স্থানান্তরিত হয়। শ্রীশচন্দ্রের রামপাল লিপিতে চন্দ্রদ্বীপের তারামূর্তি ও মন্দিরের ইঙ্গিত আছে। কচুয়ার রাজবাড়ী ও সমস্ত স্মৃতিসৌধ বিলীন হইয়াছে। মাধবপাশার

রাজবাড়ী জরাজীর্ণ অবস্থায় বিদ্যমান। আমরা সেখানে রাজবংশের কাহাকেও দেখিতে পাই নাই। ইহা এখন পরিত্যক্ত অর্ধভগ্ন রাজপ্রাসাদ। জরাজীর্ণ রাজবাড়ীতে কতিপয় অর্ধভগ্ন অট্টালিকা কালের সাক্ষী হিসাবে দণ্ডায়মান আছে। রাজবাড়ী সংলগ্ন কাত্যায়নী মন্দির, মদনগোপাল মন্দির, মনসা মন্দির ও ভোগ মন্দির নামে কয়েকটি মন্দির আছে। বাকেরগঞ্জ জিলার এককালীন ঐতিহ্যবাহী বিখ্যাত রাজপুরীর জাঁকজমকের কথা মনে পড়িলে যে কোন দর্শকের হৃদয় বিগলিত হইবে। ধ্বংসের অবতাররূপে রাজ প্রাসাদটি বেদনাদায়ক অবস্থায় আজিও দণ্ডায়মান আছে। কিন্তু ঐতিহাসিক রাজবাড়ীর চাকচিক্যের কথা স্মরণ করিলে যে কোন দর্শক অশ্রুজলে সিক্ত হইবেন। কিন্তু সে গৌরবময় দিন আর ফিরিয়া আসিবে না।

আবুল ফজল তদীয় আইনী আকবরীতে চন্দ্রদ্বীপ ও বাকলাকে একই রাজ্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। মোঘল আমলে ইহার নামমাত্র কর ধার্য ছিল। সম্রাট আকবরের রাজত্ব কালে চন্দ্রদ্বীপ রাজ্য ৪টি সরকারে বিভক্ত হয়। যথা :— ১) বাকলা বা ইসমাইলপুর, ২) শ্রীরামপুর, ৩) শাহ্‌জাদপুর, এবং ৪) আদিলপুব বা ইদিলপুর। আবুল ফজল আরও বলিয়াছেন যে, সরকার বাকলা সমুদ্র তীরবর্তী স্থান, এখানে বৃক্ষলতা বেষ্টিত একটি দুর্গ ছিল। ঐ সময় বাকেরগঞ্জ অঞ্চলে এখনকার ন্যায় জলোচ্ছ্বাস হইত। আরও বর্ণিত আছে যে এক বার এইরূপ ভয়াবহ জলোচ্ছ্বাসের সময় রাজা প্রাণ বাঁচাইবার জন্য নৌকায় আরোহণ করেন এবং তৎপুত্র পরমানন্দ রায় বহু লোকজন সমভিব্যাহারে মন্দিরের উপরিভাগে আরোহণ করেন। ব্যবসায়ীরা দলবদ্ধভাবে সুউচ্চ ভূমিতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ৫ ঘণ্টা ব্যাপী প্রলয় ঝটিকা, মুহুর্মুহুঃ বজ্রপাত ও জলোচ্ছ্বাসের প্রলয় কাণ্ড চলিতে থাকে। সমুদ্রের বারিরাশি ও তরঙ্গ মালা প্রলয়ঙ্করী রূপ পরিগ্রহ করে। রাজা নৌকা ডুবিয়া সদলবলে নিধন প্রাপ্ত হন। একমাত্র সুউচ্চ মন্দিরটি ব্যতীত সব কিছুই ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই জলোচ্ছ্বাসে দুই লক্ষ লোকের প্রাণহানি ঘটে (১৫৮৩ বা ১৫৮৪ খৃঃ।)

র‍্যাল্‌ফ ফিচ বলিয়াছেন; "আমি চট্টগ্রাম হইতে বাকলা আগমন করি এবং সেখানে একজন শান্তিপ্রিয় হিন্দু রাজার সাক্ষাৎ পাই। তিনি বন্দুকের সাহায্যে শিকারে দক্ষ ছিলেন। তাঁহার রাজ্য খুব বড় এবং ধনধান্যে ভরা ছিল। এখানে প্রচুর ধান্য, সিল্ক ও সুতী বস্ত্র পাওয়া যাইত। এখানকার ঘরবাড়ী পরিচ্ছন্ন ও উঁচু ছিল। রাস্তাগুলি প্রশস্ত ছিল। লোকের কোমরে একখানি ক্ষুদ্র বস্ত্র জড়ান থাকিত। নারীরা গলায় এবং হস্তে রূপার অলংকার ব্যবহার করিত। তাহারা পায়ে রৌপ্য ও তামার গহনা এবং হস্তে অঙ্গুরীয় ব্যবহার করিত।

দনুজমর্দনের এক অধস্তন বংশধর— একমাত্র কন্যা সন্তান কমলা জীবিত থাকে। কমলার সহিত বলভদ্র বসুব বিবাহ হয়। কমলার পুত্র পরমানন্দ বসু রাজ্যের উত্তরাধিকার লাভ করেন। পবমানন্দের পুত্র জগদানন্দ বাকলার জলোচ্ছ্বাসে প্রাণত্যাগ করেন। কন্দর্প নারায়ণ এই জগদানন্দের সুযোগ্য পুত্র। তিনি রাজধানী কচুয়া হইতে বরিশালের সন্নিকটে মাধবপাশায় স্থানান্তরিত করেন। ইনিই সুবিখ্যাত বার ভুঞার অন্যতম ভুঞা হিসাবে সুপরিচিত।

বঙ্গদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসে বার ভুঞাদের দান অপরিসীম। ভুঞা অর্থ ভৌমিক, ভুইমালি বা ভূম্যাধিকারী। প্রভাবশালী জমিদার, রাজা বা স্থানীয় শাসক ভুঞা উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৫৭৬ খৃঃ সম্রাট্ আকবরের সময় দায়ুদ খার মৃত্যুতে গৌড়বঙ্গের স্বাধীনতা লুপ্ত হয়। ইতিমধ্যে মোঘলদের প্রতাপে ভীত হইয়া অসংখ্য পাঠান বঙ্গে আসিয়া স্থানীয় হিন্দু-মুসলমানদের সহিত একযোগে মোঘল শক্তিকে প্রতিহত করিবার চেষ্টা করিত। এই গণজাগরণ ও বিদ্রোহের সময় যঁাহারা স্বাধীনতা রক্ষার জন্য নেতৃত্ব গ্রহণ করেন তাঁহারাই ইতিহাসে ভুঞা নামে খ্যাত।

ভুঞা শব্দ এই আমলের পূর্বেও দৃষ্ট হয় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। সংস্কৃত অভিধান 'মেদিনীকোষে' "দ্বাদশ রাজকাম" বা বারভুঞার নাম দৃষ্ট হয়। ঘনরাম চক্রবর্তী ও মাণিক গাঙ্গুলী রচিত ধর্মমঙ্গলে এবং বাহরিস্তান গায়েবীতে বারভুঞা নাম দৃষ্ট হয়। আইনী আকবরীতেও ভুঞাদের কয়েকটি নাম দৃষ্ট হয়। র‍্যাল্‌ফ ফিচ ঈসা খানকে বার ভুঞার প্রধান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

বারভূঞাদের পরিচয় দিতে গিয়া সমস্ত লেখকগণ দ্বাদশ জন প্রধান ব্যক্তির ইতিহাস প্রণয়নে এত মতানৈক্যের বেড়াজাল সৃষ্টি করিয়াছেন যে এ বিষয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা একরূপ দুষ্কর হইয়া পড়িয়াছে। এদেশে ৩৬০ আউলিয়া, পাঁচপীর প্রভৃতি কথাগুলির যে ভাবে উৎপত্তি হইয়াছে তদরূপ 'বারভূঞা' শব্দেরও উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কেহ কেহ বলেন যে ১২ মাস ও ৩৬০ দিনে বছর তজ্জন্য কথাগুলির উদ্ভব হইয়াছে। হিন্দুদের বারয়ারী কথাটির উদ্ভব হইয়াছে অনুরূপ ভাবে। "পাঁচপীরের" পাঁচ জনের যেমন সঠিক অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। বার ভূঞার দ্বাদশ জনের অবস্থাও অনেকটা তদরূপ। আমরা যথাসম্ভব এই স্বনামখ্যাত ভূঞাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে চেষ্টা করিতেছি:

(১) খিজিরপুরের মসনদ-ই-আলা ইসা খাঁ ও তদীয় ভ্রাতা মুসাখাঁ — ঢাকা

(২) শ্রীপুরের চাঁদ রায় ও কেদার রায় — ঢাকা

(৩) বাকলার কন্দর্প নারায়ণ রায় — বাকেরগঞ্জ

(৪) ভুলুয়ার লক্ষণ-মাণিক্য — নোয়াখালী

(৫) ভাওয়ালের ফজল গাজী

(৬) চাঁদ প্রতাপের চাঁদ গাজী

(৭) যশোহরের মহারাজ প্রতাপাদিত্য — খুলনা

(৮) বিষ্ণুপুরের বীর হাম্বীর — বাঁকুড়া

(৯) হিজলীর ইসা খান লোহানী ও উড়িষ্যার ওসমান খাঁ।

অন্যান্য ভূঞার মধ্যে দীঘপতিয়া, পুটিয়া, নাটোর ও দিনাজপুরের রাজগণের নাম বিভিন্ন লেখকগণ কর্তৃক আলোচিত হইয়াছে। সাতোরের রামকৃষ্ণের নামও কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন। আমাদের মনে হয় বারভুয়ার নেতা দ্বাদশ জনের অধিক হইবেন। কোন কোন নাম এখনও অজ্ঞাত আছে।

কন্দর্প নারায়ণ ও তৎপুত্র রামচন্দ্র রায়ের বিষয় আমরা এখন সংক্ষেপে আলোচনা করিব। রাজা কন্দর্প নারায়ণ বীর যোদ্ধা ছিলেন। তিনি মগ ফিরিঙ্গিদের সহিত বীর বিক্রমে যুদ্ধ করিয়া স্বীয় রাজ্য রক্ষা করিয়াছিলেন। প্রতাপাদিত্যের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব ছিল। মগ ফিরিঙ্গি দমনে প্রতাপ কন্দর্প নারায়ণকে সাহায্য করিয়াছিলেন। প্রতিবেশী রাজা ভুলুয়ার লক্ষণ-মাণিক্যের

সহিতও কন্দর্প নারায়ণের যুদ্ধ হইয়াছিল। ভুঞাগণ যেমন দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় তৎপর ছিলেন তেমনই তাঁহারা আবার পরস্পব ঈর্ষা পোষণ করিতেন। এই ঈর্ষা, আত্মকলহ ও যুদ্ধে পরিণত হইত। এই ভাবে নিজেরা যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হওয়ায় দেশের উপকার অপেক্ষা ক্ষতিই হইত অধিক। প্রজাসাধারণ দেশীয় রাজায় রাজায় যুদ্ধ দর্শনে হতভম্ব হইয়া পড়িত। মোঘল হস্তে ভূঞাদের পতনের মূল কারণ ইহাই।

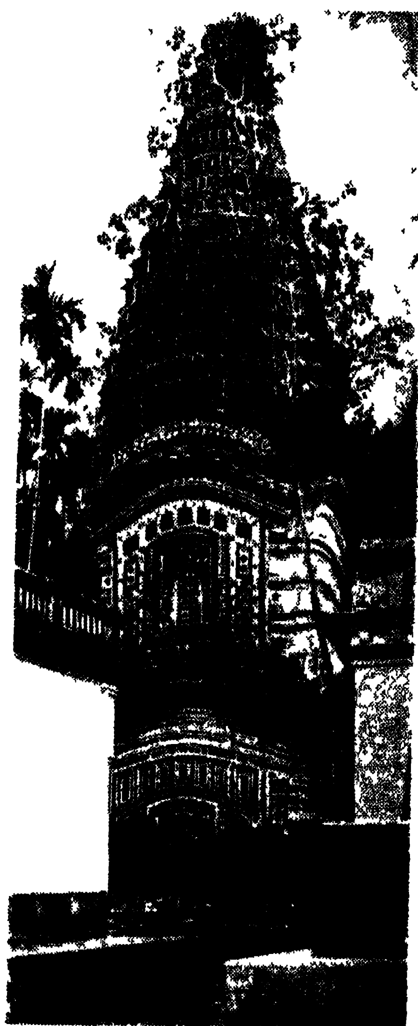
রাজা কন্দর্প নারায়ণেব মৃত্যুব পর তাঁহার নাবালক পুত্র রামচন্দ্র রাজা হইয়াছিলেন। রামচন্দ্রের বিধবা মাতা প্রতাপাদিত্যেব কন্যা বিমলা বা বিন্দুমতিব সহিত স্বীয় পুত্রেব শুভ বিবাহ স্থির করিয়াছিলেন। রাজপুত্রের বয়স তখন মাত্র ১৫ বৎসর। যথা সময় মাধবপাশায় বিবাহের ধুমধাম পড়িয়া গেল। রাজ তরণীসমূহ ববযাত্রী বহন করিবার জন্য প্রস্তুত হইল। যশোর নগরেও আনন্দের ধুম পড়িয়া যায়। দুই ভুঞা বাজ পরিবারের মধ্যে বিবাহ বন্ধনে সর্বত্র বিপুল সাড়া পড়িয়া গেল। এই বিবাহের সময় সামান্য একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া বহু কিছু ঘটিয়া গেল যাহার ফলে প্রকৃত পক্ষে উভয় রাজ পরিবারে অশান্তির ছায়া নামিয়া আসে। ঈদৃশ নানা কারণে যশোর-খুলনা ও বাকেরগঞ্জের ভুঞাদের পতন ত্বরান্বিত করিয়াছিল।

রামচন্দ্রের বিবাহের রাত্রে রমাই টুঙ্গি নামক জনৈক হাস্যরসিক ভাঁড় রসরঙ্গে মত্ত হইয়া পড়ে। এই লোকটি স্ত্রী বেশে সজ্জিত হইয়া রাজ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া মহারাণীর সহিতও রসিকতা করিয়া আসিল। অন্দর মহলের এই ঘটনায় রাণী অপমান বোধ করিয়া রাজ সমীপে সে কথা জানাইয়া দিলেন। প্রতাপাদিত্য ক্রোধে অগ্নিসর্মা হইলেন। রাজাদেশ হইল জামাতা রামচন্দ্র ও রমাই টুঙ্গির শিরশ্ছেদ। প্রতাপের হুকুম অনড়, তাঁহার ভয়ে সকলেই ভীত। কেহ কিছু মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিল না। প্রতাপ-কন্যা বিমলা বাসর ঘরে স্বামীকে এই সর্বনাশের কথা গোপনে প্রকাশ করিল। বালক রামচন্দ্র একেবারে মুষড়িয়া পড়িলেন। মহারাণী, যুবরাজ এবং রাজপুরীর মধ্যে হাহাকার পড়িয়া গেল। প্রতাপের নিষ্ঠুরতার কথা সকলেই জানিত। কেহ ভয়ে টু শব্দ করিল না।

অবশেষে উপায় স্থির হইল। যুবরাজ উদয়াদিত্য অতীব কৌশলের সহিত সংগোপনে রামচন্দ্রের পলায়নের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। রামচন্দ্র গভীর নিশীতে বাসর শয্যা ত্যাগ করিয়া দ্রুতগামী বাছাড়ী নৌকায় অতীব সন্তর্পণে আরোহণ করিলেন। তাঁহার দ্রুতগামী তরণী রাজবাড়ী ত্যাগ করিয়া নিরাপদ স্থানে পৌছিলে বাকলার শিশু রাজা রামচন্দ্রের কামান গর্জিয়া উঠিল। নিশাশেষে রাজা প্রতাপাদিত্য কামানের শব্দে বুঝিতে পারিলেন রামচন্দ্র তাঁহার প্রাসাদ হইতে রাত্রেই সরিয়া পড়িয়াছে।

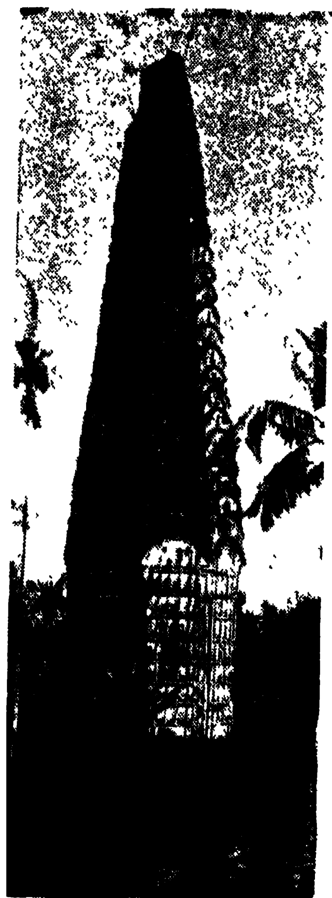
ইতিমধ্যে নানা জনে নানা কথা প্রচার করিতে লাগিল। কেহ কেহ বলিল প্রতাপাদিত্য জামাতার রাজ্য গ্রাস করিবার জন্য এহেন দানবীয় কার্য করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন । রামচন্দ্র নিরাপদে মাধবপাশায় পৌছিয়া শ্বশুরালয় ও স্বীয় পত্নী বিমলার সহিত সর্ব প্রকার সম্পর্ক রহিত করিয়া দিলেন। এদিকে রামচন্দ্রও নানা দিক দিয়া বিপদগ্রস্থ হইয়া পড়িলেন। আরাকান রাজ পর্তুগীজদের হস্ত হইতে সন্দ্বীপ অধিকার করিয়া বাকলা রাজ্য আক্রমণ করিলে রামচন্দ্র তাঁহার সহিত সন্ধি স্থাপন করেন।

এদিকে প্রতাপ কন্যা বিমলা সুন্দরী কৈশোর অতিক্রম করিয়া যৌবনে পদার্পন করিয়াছেন। বিবাহের কয়েক বৎসর পরে বিরহী কন্যা অকস্মাৎ একদিন স্বামী সন্নিধানে যাইতে মনস্থ করিয়া পিতার নিকট আবদার করিলে প্রতাপ উহাতে সম্মতি দিলেন। বহু ধনরত্ন ও লোকজন সহ রূপবতী রাজকন্যা স্বামী সন্ধানে নৌকাযোগে যাত্রা করিলেন। যথা সময় মাধবপাশার রাজবাড়ীর সন্নিকটে নদী তীরে তরণী নঙ্গর করিল । কিন্তু রাজা রামচন্দ্র এই সংবাদ জানিয়াও স্ত্রীকে গ্রহণ করিলেন না। নৌকা মধ্যে বিমলার বিষাদময় দিনগুলি অতিবাহিত হইতে লাগিল। এই সময় স্থানীয় লোকেরা অশেষ কৌতুহলের সহিত নদীতীরে দলে দলে আসিয়া নব বধূ দর্শন মানসে ভীড় জমাইতে লাগিল। বিপুল জন সমাগমের জন্য সেখানে হাট বাজার বসিয়া গেল এবং সে হাটের নামকরণ হইল "বৌ - ঠাকুরাণীর হাট।" অবশেষে এইরূপ দোটানার মধ্যে রাজমাতা পুত্রবধুকে রাজবাড়ীতে আনিবার জন্য স্বয়ং নৌকায় গমন করিলেন। শাশুড়ী ও বধু মাতার এহেন অপূর্ব মিলনে চারি দিকে ধন্য ধন্য

বামে :— সরকার মঠ, মাহিলারা, বাকেরগঞ্জ।

দক্ষিণে :— গোবিন্দপুর মঠ— বাকেরগঞ্জ





বামে :— সুতালরী মঠ, বাকেরগঞ্জ,

দক্ষিণে :— "পঞ্চরত্ন মন্দির, নলডাঙ্গা, যশোর।

পড়িয়া গেল। রাজ মাতার অনুরোধে রামচন্দ্র তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া সুখী দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

এই ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে মহাকবি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বিখ্যাত উপন্যাস "বউ ঠাকুরাণীর হাটে" চমকপ্রদ বর্ণনা দিয়াছেন। ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর বিকৃতি থাকিলেও এই উপন্যাস রবিবাবুর তুলিকায় সুন্দর রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। কিন্তু বউ ঠাকুরাণীর হাট নামে আমরা সেখানে কোন হাট দেখিতে পাই নাই। নদীতীরবর্তী ঘাটের চিহ্ন আছে কিন্তু বহু পূর্বে সে হাট উঠিয়া গিয়াছে।

বিমলার গর্ভে রামচন্দ্রের কীর্তিনারায়ন ও বাসুদেব নামে দুই পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। পিতার মৃত্যুর পর কীর্তিনারায়ন রাজা হইয়াছিলেন। তিনি নৌযুদ্ধে বিশেষ দক্ষ ছিলেন। মেঘনা তীরবর্তী স্থান হইতে ফিরিঙ্গিদের উৎখাত করিয়া তিনি ঢাকার নবাবের সহিত সখ্যতা স্থাপন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ভ্রাতা বাসুদেব রাজা হইয়াছিলেন।

এই জিলার বিভিন্ন স্থানে বহু দীঘি আজিও প্রচীনত্বের সাক্ষ্য বহন করিতেছে। পুরাকালীন দীঘি সমূহের মধ্যে কচুয়ার কমলা সাগর, বরিশালের ৬ মাইল পশ্চিমে মাধবপাশায় দুর্গাসাগর দীঘি অবস্থিত। অন্যান্য দীঘির মধ্যে রামসাগর, শুকসাগর, কন্দর্পনারায়নের দীঘি, গজনীর দীঘি, পরেশ সাগর, বিবির পুকুর প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মুসলীম কীর্তির পাশাপাশি বাকেরগঞ্জ জিলার বহু হিন্দু কীর্তি বিদ্যমান ছিল। এ জিলার গৌরনদী থানার মাহিলারা গ্রামে একটি সুউচ্চ মঠ অভগ্ন অবস্থায় আজিও বিদ্যমান। এই মঠ সরকারের মঠ বলিয়া পরিচিত। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের এক বিবরণীতে জানা যায় যে ১৭৪৬-৫৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বাংলার নবাব আলীবর্দিখাঁর রাজত্বকালে উহা স্থানীয় হিন্দু সমাজ কর্তৃক নির্মিত হয়। ইহা নিঃসন্দেহে একটি হিন্দু মঠ।

এই জিলার গোবিন্দগঞ্জ গ্রামে আরও একটি প্রাচীন হিন্দু মঠ আছে। সরকার মঠ অপেক্ষা ইহার উচ্চতা কিছু কম। এই মঠের উপর আগাছা জন্মিয়া উহার ধ্বংস ত্বরান্বিত করিতেছে। সুতালরী গ্রামে আর একটি অনুরূপ মঠ ছিল।

ইহার উপরিভাগ ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। জনৈক প্রতিপত্তিশালী হিন্দু তদীয় মাতার সমাধিপরি এই মঠ নির্মাণ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি ইহা কীর্তনখোলা নদীগর্ভে বিলীন হইতে চলিয়াছে।

যশোর

যশোর অতীব প্রাচীন স্থান। প্রাচীন কাল হইতে যশোর নামের উৎপত্তি হইয়াছে। যশোর আরবী শব্দ, উহার অর্থ সাঁকো। কানিংহাম তদীয় ভারতের প্রাচীন ভূগোল গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, এক কালে যশোরের সর্বত্র নদীনালায় পূর্ণ ছিল। স্থানে স্থানে বহু দ্বীপও ছিল। বর্তমান যুগের ন্যায় রাস্তাঘাট কিছুই ছিল না। নৌকাই এক স্থান হইতে অন্যস্থানে যাতায়াতের একমাত্র বাহন ছিল। নদী বা খালের উপর যখন সাঁকো নির্মিত হইতে থাকে তখন এই স্থানের নাম মুরলী হইতে যশোরে পরিবর্তিত হয়। কেহ কেহ বলিয়াছেন যে খানজাহান বাঁশের সাকো নির্মাণ করিয়া ভৈরব নদী পার হইয়া মুরলীতে আগমন করেন। এই বাঁশের সাঁকো হইতে যশোর নামের উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে শেষোক্ত মতের কোন সমর্থন খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যশোর নাম খানজাহান আলীর পূর্ব হইতে ছিল। মুরলী বা যশোর-টলেমী বর্ণিত গঙ্গরোজিয়া। আনুমানিক অষ্টম শতকে বৌদ্ধ গ্রন্থ "আর্য মঞ্জুশ্রী মূলকল্পে" যশোর নাম দৃষ্ট হয়। উহাতে আছে — "উপ বঙ্গে যশরাহ্য দেশঃ কানন-সংযুক্তা।" ইহাতে সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যায় যে সমগ্র যশোরাঞ্চল বন জঙ্গলে পূর্ণ ছিল। বর্তমানের খুলনা-বাকেরগঞ্জের ন্যায় যশোরও নদ-নদী বিধৌত দেশ ছিল। নদ নদীর পার্শ্বেই ছিল সুন্দরবন ও জঙ্গল। সেজন্য কোন কোন গ্রামের জঙ্গল গাঁ, জঙ্গলবাদাল বা অনুরূপ নামকরণ হইয়াছে। বর্তমান যশোরকে সুন্দরবনাঞ্চল বলা যাইতে পারে। কিন্তু প্রাচীনকালে যশোরই ছিল সুন্দরবন দিয়ে ঘেরা। ইরান ও আরব সীমান্তের একটী ঐতিহাসিক স্থানের নাম যশোর। উহার সহিত এই যশোরের কোন সম্পর্ক স্থাপন করা যায় না।

বারভূঞার রাজা প্রতাপাদিত্যের রাজধানীর নাম হইয়াছিল যশোহর,

যশোর নহে। নাম ও স্থান উভয়ই পৃথক। প্রাচীন যশোর হইতে সুন্দরবন সংলগ্ন যশোহর নগরী প্রায় ৭৫ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। ইহাকে বর্তমানে ঈশ্বরীপুর বা যশোরেশ্বরীপুর বলা হয়। ইহা সাতক্ষীরা মহকুমার শ্যামনগর থানার মধ্যে অবস্থিত। গৌড়ের যশ হরণ করত তথাকার আনীত ধনরত্নের সাহায্যে যশোহর (যশ হরণকারী) নগরীর প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। যশোহরকেও এখন যশোর বলা হয়। একটি খুলনা জিলার অন্তর্গত প্রতাপাদিত্যের যশোর এবং অন্যটি যশোর জিলা ও বর্তমান যশোর শহর।

খানজাহানের বহু পূর্বে যশোর-বারবাজার অঞ্চলে হিন্দু-বৌদ্ধ শহরের অবস্থান ছিল বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। বিহার হইতে স্বয়ং বুদ্ধদেব সমতট যাইবার পথে যশোরাঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করেন বলিয়া অনুমিত হয়। চীন পরিব্রাজক হুয়েনসাঙ ও তাম্রলিপ্ত (তমলুক) হইতে এই পথ দিয়া সমতট ও সিলহটে গিয়াছিলেন। সেই প্রাচীন আমলের কীর্তিরাজির নাম নিশানার কোনই চিহ্ন নাই। উহার কোন ইতিহাসের সন্ধান পাওয়া একেবারেই দুষ্কর। ময়নামতী বা মহাস্তান গড়ের ন্যায় বারবাজারে খননকার্য চালাইলে কিছু লুপ্ত ইতিহাসের উদ্ধার হইতে পারে। অত্র গ্রন্থে হোসেন শাহ, খানজাহান, গরীব শাহ ও বোরহান শাহ, যবন হরিদাস, গাজী কালু ও মুকুট রায় প্রভৃতি প্রসঙ্গে যশোরের প্রাচীন ইতিহাস সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। এখন অবশিষ্ট ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিতেছি।

ভরতভয়না যশোর জিলার অতীব প্রাচীন স্থান। এখানকার সুউচ্চ মৃত্তিকার টিপি দর্শনে ইহা সহজেই অনুধাবন করা যায়। প্রবাদ আছে যে, এককালে এখানে ভরত রাজার বাড়ী ছিল এবং এই রাজবাড়ীর দক্ষিণে প্রকাণ্ড নদী এবং নদীর দক্ষিণ পার হইতে সুন্দরবনের প্রারম্ভ ছিল। এই মতানুসারে ভরত রাজার নামানুসারে এই স্থানের নামকরণ হয় ভরতভয়না। এখনও স্তূপ ও টিপির মধ্যে খোঁজ করিলে বহু মৃত্তিকা নির্মিত মূর্তি পাওয়া যায়। এইরূপ একটি পোড়া মাটির মূর্তি ভরতভয়না হইতে জনৈক অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি আমাকে আনিয়া দিয়াছিলেন। প্রায় ৪০ বৎসর পূর্বে এই গ্রামে একটি মসজিদ আবিষ্কৃত হয়। মসজিদ না হিন্দু মন্দির ইহা লইয়া যশোর দেওয়ানী আদালতে

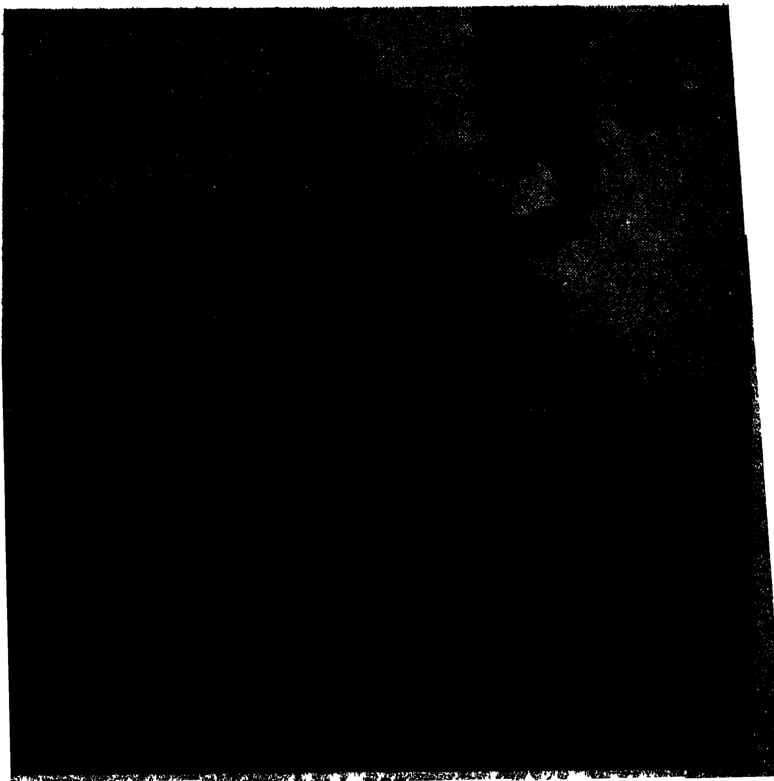
মোকদ্দমা হয়। সৈয়দ নওশের আলীর চেষ্টায় মুসলমানেরা জয়লাভ করে। এখানে হিন্দু-বৌদ্ধ আমলের শহর ছিল, পরে পাঠানেরা এখানে বসবাস করে তাহা সহজেই অনুমেয়।

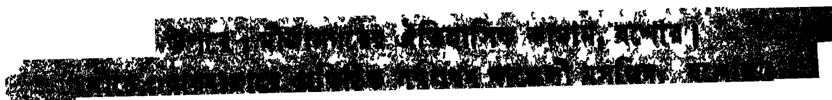
গৌড়-বঙ্গের একটি ঐতিহাসিক টাঁকশাল মোহাম্মদাবাদে (উত্তর যশোর) অবস্থিত ছিল। হোসেন শাহ, তৎপুত্র নসরত শাহ ও গিয়াসউদ্দীন এই টাঁকশাল হইতে মুদ্রাঙ্কন করিয়াছিলেন। আইন-ই-আকবরী হইতে জানা যায় যে শেরশাহ মোহম্মদাবাদ আক্রমণ করিলে হোসেন বংশীয় জনৈক নৃপতি তাঁহার গতিরোধ করেন সে বিষয় অন্যত্র আলোচনা করিয়াছি। শেরশাহ বঙ্গের অন্যতম স্বাধীন সুলতান। যশোর হইতে ভূষণা (ফতেহাবাদ) পর্যন্ত তিনি এক দীর্ঘ রাস্তা নির্মাণ করেন। এই রাস্তা দিয়া শের শাহের আমলে ডাক চলাচল করিত। বৈরইল গ্রামে নব গঙ্গার তীরে একটি ডাক চৌকির অফিস ছিল। এখনও লোকে ঐ স্থানকে চৌকির ভুই বলিয়া থাকে। এ জিলার শৈলকুপা গ্রামে একটি প্রাচীন মসজিদ ও মাজার আজিও হোসেনশাহী বংশের কীর্তি ঘোষণা করিতেছে। দরগাপাড়ায় এই মসজিদ অবস্থিত। কথিত আছে যে নাসির শাহ (নসরত শাহ) একদা রাজধানী গৌড় হইতে ঢাকা যাইবার পথে এই স্থানে অবস্থান করেন। মওলানা মোহাম্মদ আরব তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। তিনি খ্যাত নামা দরবেশ ও রাজ মোর্শেদ বা ধর্মগুরু। মাওলানা সাহেব এই স্থানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া স্থায়ীভাবে আস্তানা নির্মাণ করিয়া তথায় বসবাস আরম্ভ করেন। তাঁহার শিষ্য, হাকিম খাঁ, সৈয়দ শাহ, আবদুল কাদের বাগদাদী এবং একজন ফকিরও সেই দলভুক্ত ছিলেন। সুলতানের আদেশে এখানে কিছু লাখেরাজ সম্পত্তি প্রদত্ত হয় এবং তাঁহার নামানুসারে স্থায়ী মৌজার নাম হয় নাসিরপুর। শৈলকুপার মস্‌জিদ একটি প্রাচীন কীর্তি, উহা সরকারী তত্ত্বাবধানে নূতন আকারে মেরামত হইয়া সযত্নে রক্ষিত হইতেছে। এই মস্‌জিদের পুরাতন কাঠামো দূরীভূত হইয়া একেবারে নূতন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। ইহা গৌড় পাণ্ডুয়া ও খলিফাতাবাদের স্থাপত্য শিল্পের ন্যায়।



শৈলকুপার শাহী মসজিদ, যশোর।







আইন-ই-আকবরী হইতে জানা যায় যে উত্তর যশোর সরকার মোহাম্মদাবাদের অন্তর্গত ছিল। বঙ্গদেশ তখন ২৪টি সরকার বা জিলা ছিল, তন্মধ্যে মোহাম্মদাবাদ একটি এবং এ জিলার পশ্চিম দক্ষিণ ভাগ সরকার খলিফাতাবাদের অধীন ছিল। মোহাম্মদাবাদ গৌড়বঙ্গের অন্যতম টাঁকশাল। এই প্রাচীন স্থানের কোন সঠিক ইতিহাস পাওয়া যায় না।

মোঘল রাজত্বকালে যশোর একজন ফৌজদারের অধীন শাসিত হইত। ইরানের বাদশাহ শাহ ইসমাইলের অন্যতম বংশীয় মীর্জা সফশিকান শাহজাহানের সময় যশোরের ফৌজদার ছিলেন। ফৌজদার নুরুল্লা খানের সময় যশোর, হুগলী ও বর্ধমান একই সঙ্গে শাসিত হইত। মহানগরী কলিকাতা তখন সম্ভবতঃ জঙ্গলে পূর্ণ ছিল। এই সময় সুভাসিং ও রহিম খানের বিদ্রোহ দেখা দেয়। নূরুল্লা খান বিদ্রোহ দমনে ব্যর্থকাম হইলে জবরদস্ত খান তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি জবরদস্তীমূলক শাসনের মাধ্যমে বিদ্রোহী পাঠানদের ভাগীরথীর অন্যতীরে বিতাড়িত করেন। মোঘল রাজত্বের শেষদিকে মোহাম্মদপুরের সীতারাম রায়ের আধিপত্য বিস্তৃত হয়। সীতারাম রায় দুর্ধর্ষ শাসক ছিলেন। বীর যোদ্ধা হিসাবে তাঁহার খ্যাতি ছিল। তাঁহার সেনাপতির নাম ছিল মেনাহাতী। চাচড়ার জমিদারী ও রাজবংশের সৃষ্টি হয় মানসিংহের সহিত সহযোগিতা এবং প্রতাপাদিত্যের পতন ঘটাইয়া। মোঘল ও ইংরেজ আমলে এই ভাবে দেশের সর্বনাশ করিয়া অনেকে রাজা ও জমিদার বনিয়া যাইতেন। কালের কষাঘাতে সে সব ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। সীতারাম রায়, চাঁচড়া, নলডাঙ্গা প্রভৃতি রাজবংশের ইতিহাস এখানে আমাদের আলোচ্য বিষয় নহে।

মোঘল আমলে যশোর অঞ্চলের শাসনকেন্দ্র ছিল মীর্জানগর। ত্রিমোহিনী ও মীর্জানগরে মোঘল ফৌজদার শাসন এলাকার প্রাণকেন্দ্র ছিল। এখানে সেকালের বহু কীর্তি বিদ্যমান। মীর্জানগরের নওয়াব বাড়ী মোঘলদের শেষ কীর্তি। একটি প্রচীন মস্‌জিদ সে যুগের সাক্ষ্যস্বরূপ হইয়া আছে। সম্প্রতি মীর্জানগরের ঐতিহাসিক কামানটি স্থানান্তরিত করিয়া যশোর-খুলনা ও নড়াইল রাস্তার সঙ্গম স্থলে স্থাপিত হইয়াছে। বাংলার সুবাদার শায়েস্তা খাঁর

সময় যশোরের ফৌজদারের পদ বিলুপ্ত হয়। তখনও মুরলীতে একটি ফৌজদারী কাছারী অবস্থিত ছিল।

বর্তমান যশোর জিলা ২৫৪৭ বর্গ মাইল এলাকা জুড়িয়া বিস্তৃত। এ জিলর লোক সংখ্যা ২১, ৯০, ৯৫৯ জন। প্রতি বর্গ মাইলে শতকরা লোক সংখ্যার হার ৮৬০ জন। শিক্ষিতের হার ১৬'৮২। এখানে আর্য, দ্রাবিড়, মোঙ্গল ও আদিম অধিবাসীরা বাস করিত। যশোর শহরের লোক সংখ্যা ৬৯৩০৪। এ জিলার উত্তরে কুষ্টিয়া, পশ্চিমে কুষ্টিয়া ও ২৪ পরগনা, পূর্বে ফরিদপুব এবং দক্ষিণে খুলনা জিলা অবস্থিত। যশোর সদর, নড়াইল, মাগুরা ও ঝিনিয়াদহ এ জিলার চারিটি মহকুমা। থানার সংখ্যা ২০, ইউনিয়ন ১৯৭টি, পৌর কমিটি ১, শহর কমিটি ৩, এবং গ্রামের মোট সংখ্যা ৩৪৭৩। দেশ বিভাগের সময় র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদে বনগাঁ ও গাইঘাটা থানাদ্বয় যশোর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পশ্চিম বঙ্গভুক্ত হইয়া যায়। বনগাঁ পূর্বে যশোরেব অন্তর্গত একটি মহকুমা ছিল। মধুমতি নদীর পূর্বতীরে আলফাডাঙ্গা থানা এবং মাগুরা মহকুমাধীন মোহাম্মদপুর থানার ৪টি ইউনিয়ন ১৯৬০ সালে যশোর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফরিদপুর জিলার অন্তর্ভুক্ত হয়।

মুর্শিদাবাদের নবাব সরকারের পতনের পর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি দেওয়ানী বিভাগ কলিকাতায় স্থানান্তরিত করেন। ১৭৭২ খৃঃ কোম্পানী সরকার যশোর বা মুরলী কসবায় রাজস্ব সংগ্রহের জন্য একজন কালেক্টর নিযুক্ত করেন। কিছু দিন পরে এই ব্যবস্থার অবসান হয়। ২৭৮২ খৃঃ মোঘল ফৌজদারের ন্যায় একজন শাসক বা ম্যাজিষ্ট্রেট যশোরের জন্য নিয়োজিত হয়। সেই সময় যে কোর্ট কাছারী স্থাপিত হয় উহাকে লোকে মুরলীর কাছারী বলিত, যশোর নামেও অবিহিত করিত। ১৭৮৯ খৃঃ এই সমস্ত অফিস মুরলীর পার্শ্ববর্তী কসবা বা সাহেবগঞ্জে স্থানান্তরিত হয়। তখন হইতে এই স্থানের নাম স্থায়ীভাবে যশোর এবং সমগ্র জিলার নামও যশোর হয়। এইভাবে প্রাচীন মুরলী নাম ধীরে ধীরে পর্দার অন্তরালে চলিয়া যায়।

সমুদ্র হইতে দূরে অবস্থিত বলিয়া খুলনা-বাকেরগঞ্জের ন্যায় সামুদ্রিক প্লাবন বা জলোচ্ছ্বাসের কোন ভীতি যশোর জিলার নাই। এ জিলার





উপরে : শিব মন্দির চাঁচড়া, যশোর।

নীচে : রাণীভবানী প্রতিষ্ঠিত মন্দির, মোহাম্মদপুর, যশোর।

পশ্চিমাংশ উঁচু এবং পূর্ব ভাগ নিম্ন। সেজন্য পূর্বাংশে মধ্যে মধ্যে বন্যার প্রকোপ দেখা দেয়। যশোরে অসংখ্য বিল আছে। নদী ও খালের সংখ্যা খুব কম। মাথাভাঙ্গা, গড়াই, মধুমতী, কুমার ও নবগঙ্গা জিলার প্রধান নদী। কপোতাক্ষী ও ভৈরব একরূপ মজিয়া গিয়াছে। ঢেউয়ের তাণ্ডবের জন্য নদীর নাম হইয়াছিল ভৈরব। এখন মরানদীর উপর চাষীরা ফসল ফলাইতেছে। ইহাই নিয়তির খেলা। মধুমতি দিন দিন হীনবল হইয়া পড়িতেছে।

যশোর গেজেটিয়ার প্রণেতা এল, এস, এস ওমালী আই, সি, এস বলিয়াছেন যে ঝিনিয়াদহ মহকুমায় ইংরেজরা রাজত্বের প্রথম দিকে অশ্বারোহণ করিয়া বন্য মহিষ শিকার করিত। এখনও জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে চিতাবাঘ ও বন্য শুকর আছে। বন্য শুকরে কোন কোন স্থানে পান ও ইক্ষু ফসলের ক্ষতি করিয়া থাকে। যশোরে প্রচুর পরিমাণে ধান্য ও পাট উৎপন্ন হয়। বাকেরগঞ্জ ও খুলনার ন্যায় এ জিলায় নারিকেল সুপারীর বাগিচা নগণ্য। এখানে প্রচুর আম, কাঠাল ও লিচু জন্মিয়া থাকে। খেজুর গুড়ের জন্য এ জিলা বিখ্যাত। কোটচাঁদপুরের চিনির কারখানাসমূহ এক সময় দেশের চাহিদা মিটাইত। এই কুটির শিল্প বহু পূর্বে বিলুপ্ত হইয়াছে।

যশোরের প্রাচীন ঐতিহাসিক স্থান অসংখ্য। যথাস্থানে এই সমস্ত স্থানের বিবরণী দেওয়া হইয়াছে। চাঁচড়ার রাজবাড়ী ও শিবমন্দির যশোর শহরেই অবস্থিত। সীতারামের বহু কীর্তি নদীগর্ভে বিলীন হইয়াছে। রাণী ভবানী প্রতিষ্ঠিত মন্দিরটি এখনও বিদ্যমান আছে। নলডাঙ্গার রাজবাড়ীর চিহ্ন নাই বলিলে চলে। কপোতাক্ষী তীরে সাগরদাড়ী গ্রামে কবি মাইকেল মধুসূধন দত্তের জন্ম ভূমি। তাঁহার অমিত্রাক্ষর ছন্দ এক অভিনব অবদান। বহু কাব্যের মাধ্যমে বাংলা ভাষার সেবা করিয়া তিনি অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। ছতিয়ানতলার মুন্সি মেহেরুল্লাহ এ জিলার কৃতি সন্তান। যশোরবাসীরা একটি রেলষ্টেশানের নাম "মেহেরুল্লা নগর" রাখিয়া সকলের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। এ জিলার মৃত্তিকা আরও অসংখ্য হিন্দু-মুসলীম কৃতি সন্তানের জন্ম দিয়াছে।

খুলনা

খুলনা জেলার অধিকাংশ এলাকা পূর্বে ২৪ পরগনা ও যশোরের অধীন ছিল। খুলনা সদর ও বাগেরহাট যশোর এবং সাতক্ষিরা মহকুমা ২৪ পরগনা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া খুলনা জিলার সৃষ্টি হয়। আইন-ই-আকবরী হইতে জানা যায় যে যশোরের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ এবং খুলনার উত্তরাংশ সরকার খলিফাতাবাদেব অধীন ছিল। ইহাবই দক্ষিণে সুন্দরবন অবস্থিত ছিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে লবন কর আদায়ের জন্য খুলনায় রায়মঙ্গল এজেন্সির প্রধান অফিস ছিল।

ইংরেজ আমলের প্রথম দিকে খুলনার পূর্ব তীরে জন বড রেণী নামে একজন অত্যাচারী নীল কুঠিয়াল বাস করিতেন। স্থানীয় হিন্দু জমিদার শিবনাথ ঘোষের মধ্যে প্রায়ই তাঁহার দাঙ্গা হাঙ্গামা হইত। এই দাঙ্গা নিরোধের উদ্দেশ্যেই এখানে নয়াবাদ নামে একটি থানা প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন খুলনার লোকে পদব্রজে যশোর গিয়া কোর্ট-কাছারী করিত। ১৭৮১ খৃঃ পর্যন্ত এই থানার অস্তিত্ব ছিল। ১৮৪২ খৃঃ যশোর জিলাধীন খুলনা মহকুমার সৃষ্টি হয়। ইহাই বঙ্গের প্রথম মহকুমা এবং মিঃ শোর ছিলেন প্রথম এস, ডি, ও। বর্তমান ডেপুটি কমিশনারের কুঠিতে এস, ডি, ও, অফিস স্থানান্তরিত হয়। তখন খুলনা শহর মীর্জাপুরের মাঠ নামে অভিহিত হইত। ১৮৮১ খৃঃ কলিকাতা হইতে প্রকাশিত দৈনিক "ষ্টেটসম্যান" পত্রিকার ২রা মে তারিখের এক খবরে প্রকাশিত হয়;

"New District : From the first instant the much talked new district of Khnlna formed of the Sub-division of Satkhira, Narail, Khulna and part of Basirhat has been organised at Head quarters of the Sub-division bearing the name of the district. The district is a third class one, having a district Magistrate and Collector at its head of affairs. The chief civil authority for the time being is a Subordinate judge. The civil and the Sessions Judge of Jessore, it has been arranged will hold Sessions from time to time at the Head quarters."

অর্থাৎ, "নূতন জিলা: সাতক্ষিরা, নড়াইল, খুলনা ও বশিরহাট মহকুমার অংশ বিশেষ লইয়া পহেলা তারিখ হইতে খুলনা নামে নূতন একটি জিলার স্থষ্টি হইল। জিলার নামকরণ হইল মহকুমা সদরের নামানুসারে। জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের অধীন ইহা তৃতীয় শ্রেণীর জিলা হিসাবে গণ্য হইবে। একজন সবজজ দেওয়ানী আদালতের কর্তৃত্ব করিবেন। নির্ধারিত ব্যবস্থানুযায়ী যশোরের দেওয়ানী ও ফৌজদারী জজ মধ্যে মধ্যে জিলার প্রধান শহরে বিচার কার্য পরিচালনা করিবেন।" এই ভাবে ধীরে ধীরে একটি গ্রাম হইতে থানা এবং থানা হইতে মহকুমাব স্থষ্টি এবং ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে এই জিলার প্রতিষ্ঠা হয়। ১৯৬১ সালের অক্টোবর মাসে যশোর, খুলনা, বাকেরগঞ্জ ও কুষ্টিয়া জিলা লইয়া খুলনা বিভাগের স্থষ্টি হয়। ইহা পূর্ব পাকিস্তানের চতুর্থ বিভাগ।

খুলনা নামের উৎপত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকার কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। কবি কঙ্কন বিরচিত চণ্ডিকাব্যের নায়ক ধনপতির লহনা ও খুল্লনা নামে দুই স্ত্রী ছিলেন বলিয়া কথিত আছে। খুল্লনা পতিগতপ্রাণা আদর্শ নারী তন্নিমিত্ত স্থানের নাম হইয়াছে খুলনা। দ্বিতীয় প্রবাদ এই যে খুলনা শহরের বর্তমান স্থান সুন্দরবনে পূর্ণ ছিল। সুন্দরবনের উত্তর প্রান্তের এই স্থানে কাঠুরিয়াগণ ঝড় তুফানের সময় নৌকা নঙ্গর করিত। একদা ভয়সঙ্কুল ঝটিকার সময় নৌকার মাঝিরা নিরাপদ স্থানে যাওয়ার জন্য গভীর নিশীথে নৌকা খুলিবার উপক্রম করিলে জঙ্গলের মধ্য হইতে খুলোনা-খুলোনা গায়েবী আওয়াজ উত্থিত হয়। এই মতে এই খুলোনা হইতে খুলনা নামের উৎপত্তি হইয়াছে।

অন্য মতে খুলনা শহরের পূর্ব পারে 'খুলনেশ্বরী' কালীবাড়ী বহু পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই স্থানের পার্শ্বে প্রচুর উলুখড় জন্মিত তজ্জন্য সাধারণে উহাকে উলুবনের কালী বলিত। কেহ কেহ বলেন এই খুলনেশ্বরী নাম হইতে খুলনা নামকরণ হইয়াছে। কিন্তু তাহা ঠিক নহে। ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত বলিয়া মন্দিরের নাম ঢাকেশ্বরী, যশোরে প্রতিষ্ঠিত বিধায় যশোরেশ্বরী তদ্রূপ খুলনায় প্রতিষ্ঠিত বলিয়া মন্দিরের নামকরণ হইয়াছে খুলনেশ্বরী। [illegible]

নামানুসারে মন্দিরের নামকরণ হইয়াছে, মন্দিরের নাম হইতে স্থানের নাম হয় নাই।

উপরোক্ত কোন একটি মতও ঐতিহাসিক প্রমাণের অভাবে গ্রহণযোগ্য নহে। এ সবই প্রবাদ বাক্য বা কিংবদন্তী। প্রকৃত বৃত্তান্ত এই যে, বহু পূর্ব হইতে খুলনা শহরের পূর্ব তীরে 'কিসমত খুলনা' নামে একটি ক্ষুদ্রকায় গ্রাম ছিল। বর্তমানেও ঐ মৌজার অস্তিত্ব আছে। এই 'কিসমত খুলনা' গ্রামের নাম হইতেই জিলা ও হেড কোয়ার্টারের নাম হইয়াছে খুলনা।

পূর্ব পাকিস্তানের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তে এই জিলা অবস্থিত। সুন্দরবনসহ এই জিলার আয়তন ৪৬৫২ বর্গ মাইল। তন্মধ্যে ২৩১৬ বর্গমাইল এলাকা সুন্দরবন। সুন্দরবনের এক পঞ্চমাংশ আবার নদীনালায় ভরপুর। খুলনা জিলার বর্তমান লোক সংখ্যা ২৪,৪৮,৭২০। প্রতি বর্গমাইলে জনবসতি ৫২৬ জন। শিক্ষিত লোকের সংখ্যার হার শতকরা ২৭·২ জন। আবহাওয়া মাঝারি ধরনের, আর্দ্র এবং লবনাক্ত। এ জিলার প্রধান ফসল ধান্য, পাট, নারিকেল, সুপারী, পান ও তামাক। ভৈরব, কপোতাক্ষী, শিবসা, পশর, ইছামতি, রায়মঙ্গল, রূপসা, হরিণভাঙ্গা, হরিণঘাটা প্রভৃতি এ জিলার উল্লেখযোগ্য নদী।

খুলনা জিলায় ৩টি মহকুমা— খুলনা সদর, সাতক্ষিরা ও বাগেরহাট। থানার সংখ্যা ২২। ইউনিয়নের সংখ্যা মোট ২০৬। খুলনা শহরে ১টি পৌর কমিটি এবং বাগেরহাট ও সাতক্ষিরায় দুইটি শহর কমিটি আছে। সর্ব মোট গ্রামের সংখ্যা ২৭৬০।

খুলনা শহরের প্রাচীনত্ব বলিতে কিছুই নাই। চার্লি নামক জনৈক ইংরেজ নীল কুঠিয়াল এখানে একটি বাজার প্রতিষ্ঠা করেন। উহা পূর্বে চার্লিগঞ্জ ও সাহেবের বাজার নামে খ্যাত ছিল। খুলনা ষ্টীমার ষ্টেশনের পূর্ব পার্শ্বের বাড়ীটি খুলনা শহরের সর্ব প্রথম ইষ্টক নির্মিত ইমারত। খুলনা শহরের বর্তমান লোক সংখ্যা খালিশপুর শিল্প এলাকা ও দৌলতপুর সহ অন্যূন তিন লক্ষ। খুলনা জিলার বিস্তারিত পৌরাণিক ইতিহাস যথাস্থানে বিধৃত হইয়াছে। এখন আমরা এই জিলার অবশিষ্ট ইতিহাস বর্ণনা করিব।

ডুমরীয়া থানার মাগুরাঘোনা গ্রামে একটি মস্‌জিদ ছিল বলিয়া সতীশবাবু বর্ণনা করিয়াছেন। অনুসন্ধানের পর জানিয়াছি উহা ঠিক নহে। তবে সেখানে ছালামত খাঁ নামীয় একটি প্রাচীন জলাশয় আছে। আরশনগরে কয়েকশত বৎসর যাবৎ একটি এক গুম্বজবিশিষ্ট মসজিদ ইষ্টক ও মৃত্তিকার ঢিপির মধ্যে আবৃত ছিল। ১২৬৫ সালের ২৯শে চৈত্র স্থানীয় উৎসাহী ব্যক্তিরা উক্ত ঢিপিতে খনন কার্য চালাইয়া দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে একটি স্তম্ভ আবিষ্কার করে। পরে ইহার পূর্ব ও পশ্চিম প্রাচীর ভগ্ন অবস্থায় আবিষ্কৃত হয়। মাত্র দুই হাত উঁচু প্রাচীর পাওয়া গিয়াছে। উহার গাত্র কারুকার্য খচিত। উক্ত ভগ্ন মসজিদের সংলগ্ন একখণ্ড প্রস্তরের উপর আরবী ভাষায় লিখিত আছে;

"মান বানায়া মাসজেদান, বানা আল্লাহো লাহু বায়তান ফিল জান্নাতে··· ইত্যাদি। ১৩৬৬ সালের ১৪ই ফাল্গুন তারিখে মওলানা মঈজউদ্দীন হামিদী উহার কিয়দংশের পঙ্কোদ্ধার করেন। উহার অর্থ এইরূপ, "এই দুনিয়ায় যে ব্যক্তি একটি মসজিদ নির্মাণ করিবেন আল্লাহ আখেরাতে তাঁহার জন্য অনুরূপ একখানি গৃহ নির্মাণ করিয়া দিবেন।" ১৩৬৬ সালের ২রা জ্যৈষ্ঠ হইতে এখানে ওক্তিয়া নামাজ এবং পরে জুম্মার নামাজ অনুষ্ঠিত হয়। মসজিদের পূর্বদিকের তিনটি দরজায় পাঁচখানি প্রস্তর পাওয়া গিয়াছে। কেহ কেহ বলেন খানজাহানের অন্যতম শিষ্য সৈয়দ মোহাম্মদ আফজাল এখানে বসতি স্থাপন করিয়া মসজিদ নির্মাণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই মসজিদ খানজাহান বা তাঁহার কোন শিষ্যের দ্বারা নির্মিত হয় নাই। খানজাহান নির্মিত কোনও মসজিদে এইরূপ কিছু লিখিত নাই। বাকেরগঞ্জের মস্‌জিদ বাড়ীতে অনুরূপভাবে আবিষ্কৃত মস্‌জিদে এইরূপ লিখিত আছে। অবশিষ্ট লিপিগুলির পঙ্কোদ্ধার হইলে আরও অজানা তথ্যের সন্ধান মিলিবে। গৌড় সুলতানের কোন রাজ কর্মচারী ইহার নির্মাতা হইতে পারেন। মস্‌জিদের পূর্ব পার্শ্বের জলাশয়ের নাম মস্‌জিদ পুকুর এবং উত্তর দিকের পুকুরকে খিড়কির পুকুর বলা হইত। উভয় পুকুর ভরাট হইয়া গিয়াছে। মস্‌জিদের দক্ষিণে বহু কবর আবিষ্কৃত হইয়াছে তন্মধ্যে পাকা কবরটি সৈয়দ আফজালের বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। আরশনগরে একখানি প্রাচীনকালীন প্রস্তর পড়িয়া আছে। সতীশ বাবু বলিয়াছেন যে,

কয়েকজন মুসমান "পুরুষানুক্রমে দুগ্ধাদি দিয়া পাথরখানির পূজা করিয়া আসিতেছে।" অনুসন্ধানের পর জানিয়াছি মুসলমান কর্তৃক পূজাব কথা আদৌ ঠিক নহে।

রাজা প্রতাপাদিত্যেব পূর্বে পারভেজ খাঁ নামক জনৈক পাঠান সেনাপতি কালীগঞ্জের দক্ষিণে যমুনা নদী তীবে একটি এক গুম্বজবিশিষ্ট মস্‌জিদ নির্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহারই নামানুসারে গ্রামের নাম হয় পারভেজপুব, সাধারণে পরবাজপুব বলে। সম্ভবতঃ তুর্ক-আফগান আমলে এখানে একটি নৌঘাটি ছিল। ইহারই অদূবে মুকুন্দপুবের গড়। মস্‌জিদটি আমরা কয়েক বৎসব পূর্বে জরাজীর্ণ অবস্থায় দেখিযাছি। এই মসজিদের সম্পত্তি লইয়া খুলনা সবজজ কোর্টে একটি মোকদ্দামা হয় তখন উহার একটি দলিল বাহির হইযা পড়ে। উক্ত দলিল হইতে জানা যায় যে মোঘল ফৌজদার নুরুল্লা খান পারভেজপুব নিবাসী সৈয়দ কাশিমকে তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত কবেন এবং বাদশাহী জবিপের ৫০ বিঘা জমি মস্‌জিদের রক্ষণাবেক্ষণেব জন্য ১১০৪ হিজরী ১৯ সে রমজান তারিখে দান কবেন। অত্র গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে ৪৯ পৃষ্ঠায় বঙ্গেশ্বর নবাব নুরুদ্দীনের সময় মস্‌জিদ নির্মিত বলিয়া লিখিত আছে। নবাব নুরুদ্দীন বঙ্গেশ্বর ছিলেন না। তিনি যশোরের মোঘল ফৌজদার নুরুল্যা খাঁ যাঁহার নামে ঈশ্বরীপুবের সন্নিকটে একটি স্থানেব নাম হইয়াছিল নূরনগব। এই মসজিদ নূরুল্লা খাঁর পূর্বে নির্মিত হয় তবে উহার বক্ষণাবেক্ষণের জন্য তিনিই জমি দান করিয়াছিলেন। আমাদের অনিচ্ছাকৃত ভুলের ত্রুটি স্বীকার করিতেছি।

তুর্ক-আফগান আমলে সিলেট ও সোনারগাঁয়ে পাঁচপীরের খ্যাতি ছিল। লাবশা অঞ্চলও পাঁচপীরের মোকাম বলিয়া কথিত হয়। তন্মধ্যে মাইচম্পার দরগা অন্যতম। তবে পাঁচপীর কথাটির ভিতব কোন ঐতিহাসিক সত্য নাই বলিয়া মনে করি।

লাবশা অঞ্চল প্রচীন বুড়ন দ্বীপের অন্তর্গত ছিল। বাবুলীয়া বুডনের রাজধানী ছিল। এই রাজ্যের পতনের পর তুর্ক-আফগান আমলের প্রথম দিকে লাবসা অঞ্চলের শ্রীবৃদ্ধি হয়। লাবশাহ্ ফার্সি শব্দ, লবে+শাহ্ বা বাদশার ঠোঁট। কেহ কেহ বলেন এই লবেশাহ্ হইতে লাবশা নামের উৎপত্তি

হইয়াছে। অন্যমতে লবাদশাহ নামক জনৈক ইসলাম প্রচারকের নামানুসারে লাবশা নামের উৎপত্তি হইয়াছে। এখানে এককালে ইসলাম প্রচারের ঢেউ উঠিয়াছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। লাবশায় একটি সমৃদ্ধিশালী শহর ছিল বলিয়া জানা যায়। প্রাচীনকালীন বহু অট্টালিকা, কয়েকটি মস্‌জিদ, মাদ্রাসা ও ব্যবসায় কেন্দ্র এখানে ছিল। এখনও থানাঘাটায় একটি প্রাচীন দীঘি ও মস্‌জিদ আছে। লাবশা, বাবুলিয়া, বাঁশদোহা, বাঁকাল, সুলতানপুর প্রভৃতি স্থান ঐশ্বর্যময়ী বুড়ন রাজ্যের অধীন ছিল। বর্তমান সাতক্ষিরা শহরের দক্ষিণ তখন সুন্দরবনের প্রান্ত সীমা ছিল। প্রাচীন বুড়ন, বাবুলীয়ার গণরাজা ও ধানদিয়ার তিওর রাজা সম্পর্কে যথাস্থানে আলোচনা করিয়াছি।

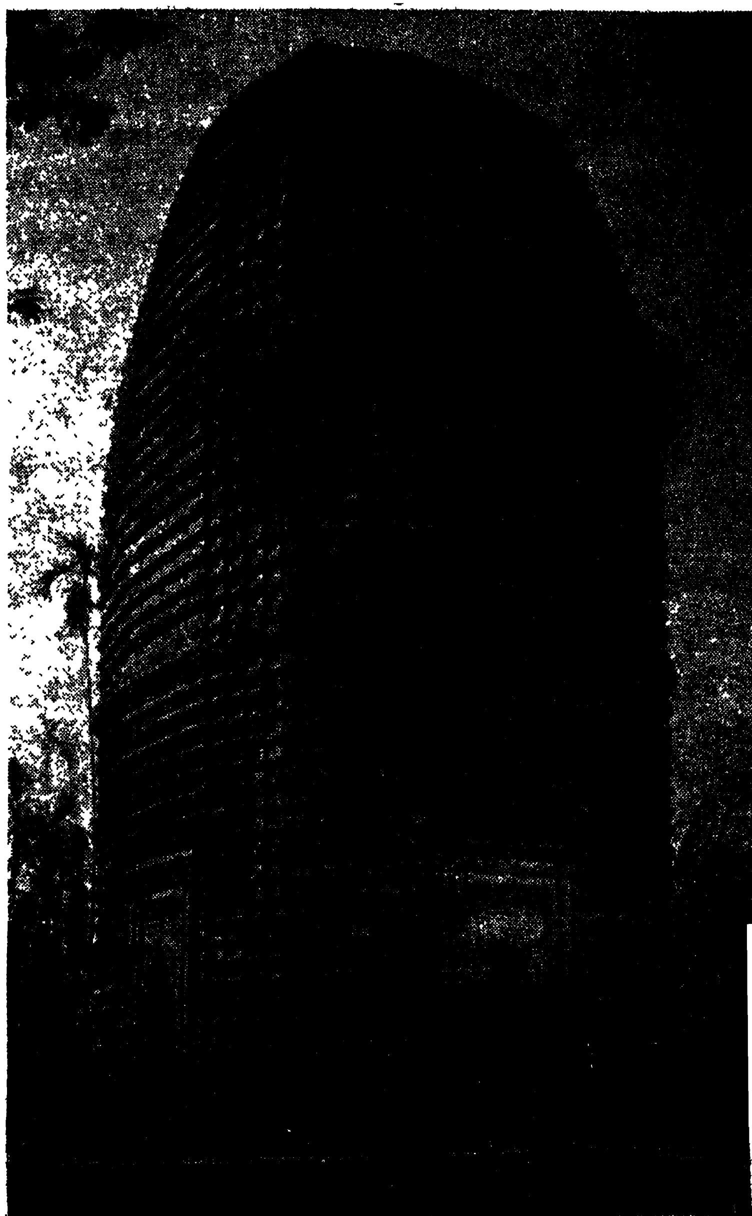
লাবশা গ্রামে প্রায় ৫০ বৎসর পূর্বে রাস্তা খননের সময় একটি বৃহৎকায় ইমারতের ভগ্নাবশেষ মৃত্তিকা গর্ভে আবিষ্কৃত হয়। থানা ঘাটায় এককালে শাসনকেন্দ্র ছিল বলিয়া প্রবাদ আছে। ইং ১৯৬৬ সালে পলাশপোল গ্রামে একটি প্রাচীন অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ মৃত্তিকাগর্ভে পাওয়া যায়। এই সমস্ত নিদর্শন এতদঞ্চলের প্রাচীনত্বের পরিচয় বহন করে।

শাহ্ সুলতান বাগদাদীর নামানুসারে সুলতানপুর গ্রামের নামকরণ হইয়াছিল। শাহ মনোয়ার, শাহ আনোয়ার প্রমুখ ইস্‌লাম প্রচারকগণ দাস বংশের রাজত্বকালে এতদঞ্চলে ইসলাম প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে। পরবর্তীকালে প্রাকৃতিক দুর্যোগে এই স্থান জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া বসতবাটীর চিহ্ন লোপ পায়। বহু কাল পরে আবার জঙ্গল আবাদ করার পর এখানে মনুষ্য বসতি স্থাপিত হয়। জঙ্গল অপসারণের পর সুলতানপুরের মস্‌জিদটি আবিষ্কৃত হয়। প্রবাদ আছে যে শাহ সুলতান বাগদাদী এই মস্‌জিদের প্রতিষ্ঠাতা। ইহার দেওয়ালের বেষ্টন ৫০″ ইঞ্চি এবং ভিতরকার মাপ ৩৬′ স্কোয়ার ফুট। এক কালে মনোরম কারুকার্য খচিত মস্‌জিদ আজিও সেদিনের স্মৃতি বহন করিতেছে। সুলতানপুর মস্‌জিদের তত্ত্বাবধায়ক কাজী গয়েশউদ্দীন তিতুমীরের পক্ষে যুদ্ধে যোগদান করিয়া শহীদ হইয়াছিলেন। সেকালে বাবুলীয়া, লাবশা, সুলতানপুর ও ধানদিয়ার মধ্যে যাতায়াতের জন্য সুন্দর রাস্তা ছিল বলিয়া জানা যায়।

কলারোয়া থানার অন্তর্গত সোনাবাড়ীয়া গ্রমে ৬০´ ফুট উচ্চ একটি প্রাচীন মঠ আছে। ইহার ইতিহাস পাওয়া দুষ্কর। গোলাকৃতি তিনতলাবিশিষ্ট এই মঠের ভিতর ঘুরানো সিড়ি আছে। সে যুগের ক্ষুদ্রাকৃতি ইষ্টক ও টালি দ্বারা এই মঠ নির্মিত হইয়াছিল। কোন জানালা না থাকায় ইহার ভিতর সর্বদা অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে। মঠের মধ্যে একটি শিবমূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। উহার গাত্রে সংস্কৃত ভাষায় লিখনী আছে। প্রবাদ মঠের আর একটি তলা মৃত্তিকা গর্ভে প্রোথিত আছে। মঠের সম্মুখস্থ পুকুরে দর্শকগণ নৌকা রাখিত বলিয়া জানা যায়। ইহা একটি হিন্দু মঠ।

খুলনা জিলায় তুর্ক-আফগান আমলে বহু হিন্দু-বৌদ্ধ মঠ ছিল বলিয়া জানা যায়। পাইকগাছা থানায় মঠবাড়ী নামে একাধিক গ্রাম আছে। তেরখাদা থানায়ও মঠবাড়ী নামে একটি মৌজা আছে। উহা এখন জয়সেনা গ্রাম নামে পরিচিত। তুর্ক-আফগান আমলের শেষ দিকে বৌদ্ধ বা হিন্দুরা এই মঠ ত্যাগ করিয়া দক্ষিণাঞ্চলে গমন করিলে লেখকের পূর্ব পুরুষেরা এখানে বসবাস আরম্ভ করেন। কিছু দিন পূর্বে ঐ স্থানে খনন কার্য চালাইয়া প্রাচীন কালীন ইট পাওয়া যায়। খুলনা জিলার বিভিন্ন স্থানে এই ধরনের বহু মঠ ছিল। উহার কোন চিহ্ন নাই বলিলে চলে।

সুন্দরবনাঞ্চলের পুরাকীর্তি সমূহের মধ্যে অযোধ্যার মঠ বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। এই মঠ কবে কাহার দ্বারা নির্মিত হইয়াছিল তাহার কোন ইতিহাস নাই। এই স্থান এক কালে দ্বীপাকৃতি ছিল, উহার নাম ছিল অজুদ্বীপ বা অজুদিয়া এবং এই অজুদিয়া নাম হইতে পরবর্তী কালে অযোধ্যা নামের উৎপত্তি হইয়াছে। রামায়ণে বর্ণিত অযোধ্যা নগরীর সহিত ইহার সম্পর্ক নাই। এই গগনচুম্বী মঠের উচ্চতা ৬৪´৬´´ ফুট বা ৪৩ হাত। ইহার নিম্ন দিকের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ২৫´৫´´ করিয়া। মঠের ব্যবহৃত ইষ্টকের মাপ ৬´´×২´´×৩´´। ১½´´ পুরু ইট এবং ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা প্রকার টালিও ব্যবহৃত হইয়াছে। মঠে ব্যবহৃত ইষ্টক ও টালি সূক্ষ্ম কারুকার্য খচিত এবং এখনও উহা রৌদ্রালোকে ঝক্ ঝক্ করে। এক স্থানে হস্তী পৃষ্ঠে ও পশ্চাতে ধনুক ধারীর মূর্তি অঙ্কিত আছে। দক্ষিণ প্রাচীরের কার্ণিশের অগ্রভাগে মকরাঙ্কিত



অযোধ্যার মঠ, খুলনা।

জঙ্গল পরিষ্কার করার সময় মঠটি আবিষ্কৃত হয়

আছে। মঠের পূর্ব দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে একটি করিয়া ক্ষুদ্রকায় দরজা আছে। স্থানীয় লোকেরা জঙ্গল মধ্য হইতে মঠটি আবিষ্কার করিয়া সরকারের গোচারীভূত করে এবং ১৯০৪ সালের ৭ আইনের (পুরকীর্তি রক্ষা আইন) অন্তর্ভুক্ত হয়।

প্রায় ৪০ বৎসর পূর্বে মঠের জঙ্গলময় ভগ্ন স্থানসমূহ পরিষ্কার করিয়া ২২০০০৲ ব্যয়ে উহার মেরামত করা হয়। তদবধি মাঠটির রক্ষণাবেক্ষণ সুন্দরভাবে চলিয়া আসিতেছে। অযোধ্যা গ্রামের একটি জমি খনন কালে অসংখ্য কারুকার্য খচিত ইট পাওয়া যায় সেইজন্য ঐ জমিকে লোকে ইটের ভুই বলে।

মঠের দক্ষিণ দিকের উপরিভাগে পালী ভাষায় 'উদ্দেশ্য তারক' নাথ লিখিত আছে। মঠের ভিতর একটি লম্বাকৃতি গুম্বজ, ১২।১৩ফুট উঁচু হইবে। উহার উপরিভাগ ফাঁকা এবং উহার চারিদিক দেওয়াল বেষ্টিত। সেজন্য উহার ভিতরে কি আছে দেখা যায় না। কোদলা গ্রামের পার্শ্বে বলিয়া ইহাকে কোদলার মঠও বলা হয়।

ভৈরব নদী এই স্থানের দক্ষিণে প্রবাহিত ছিল এখন উহা একরূপ মজিয়া গিয়াছে। প্রায় দুইশত বৎসর পূর্বে এই স্থানের সন্নিকটে আখাই নগর গ্রামে ভৈরব গর্ভে একখানি জাহাজ ডুবিয়া যায়। অযোধ্যার পার্শ্ববর্তী কাটাখালি গ্রামে একটি বিশালাকৃতি গাব গাছ ও একটি তেতুল গাছ আছে। গাব গাছের বেড় ২০´ ফুট এবং শাখা প্রশাখা ১ বিঘা জমি জুড়িয়া বিস্তৃত। তেতুল বৃক্ষটির বেড় ৩২´ ফুট। এগুলি প্রাচীনত্বের সাক্ষ্য বহন করিয়া আছে।

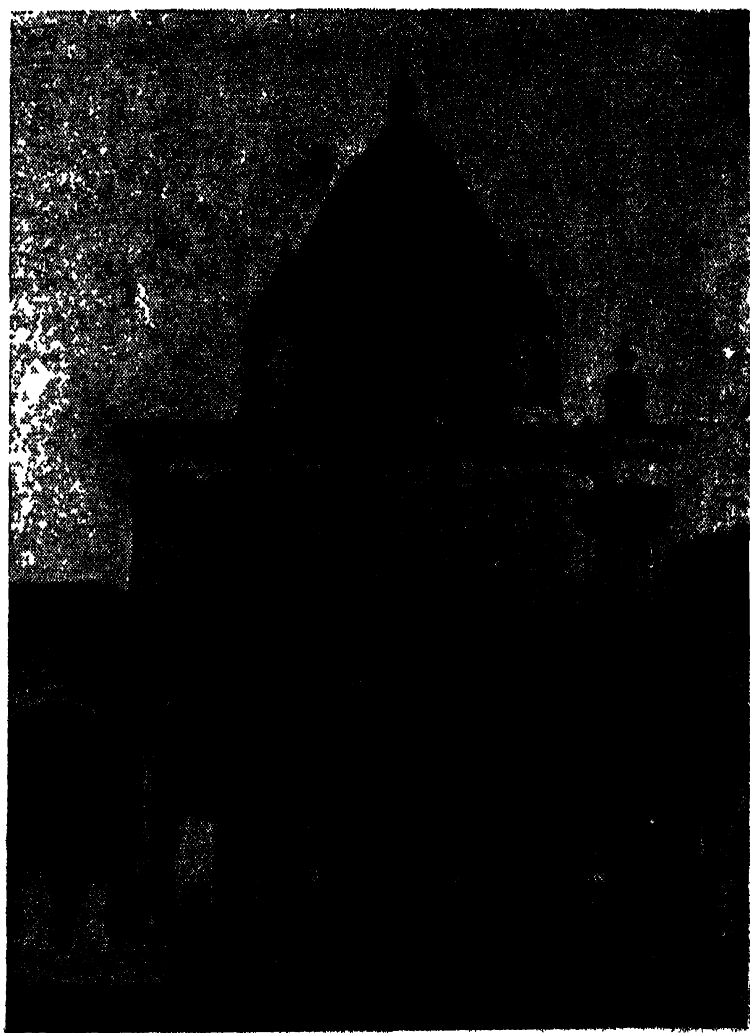
স্যার মর্টিমার হুইলার প্রণীত গ্রন্থে (Five thousand years of Pakistan) লিখিত আছে "খুলনা-বাগেরহাট রেললাইনের যাত্রাপুর ষ্টেশান হইতে ২½ মাইল দূরে একটি স্মৃতি মিনার বা মঠ আছে। ষষ্ঠদশ শতাব্দীর বঙ্গাক্ষরে লিখিত অংশ বিশেষ হইতে জানা যায় যে জনৈক ব্রাহ্মণ কর্তৃক স্বীয় দেবতা তারক বা ত্রাণকর্তা সম্ভবতঃ ব্রহ্মার উদ্দেশ্যে ইহা উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল।" সতীশ বাবু বলিয়াছেন: "প্রবাদ এই মঠটি প্রতাপাদিত্যের

ব্যয়ে তাঁহার দ্বার পণ্ডিত অবিলম্ব সরস্বতীর স্মৃতি স্তম্ভস্বরূপ নির্মিত।" প্রকৃত পক্ষে এইরূপ কোন প্রবাদের সূত্র পাওয়া যায় নাই।

২৪ পরগনা জিলার দক্ষিণে বনাঞ্চলে অযোধ্যার মঠের আকৃতি বিশিষ্ট ১০০´ ফুট সুউচ্চ "জটার দেউল" অবস্থিত। হাণ্টার সাহেব তদীয় বিবরণীতে ইহাকে বৌদ্ধ স্থাপত্যের নিদর্শন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সতীশ বাবু ইহাকে প্রতাপাদিত্যের বিজয় স্তম্ভ বলিয়া অনুমান করিতে কোশেশ করিয়াছেন। জটার দেউল পাল রাজগণের সময় নির্মিত বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন। মিঃ সুইনহো জটার দেউলকে বৌদ্ধমঠ বলিয়াছেন। বর্ধমান জিলার মেমারীর সন্নিকটে অবস্থিত মন্দির, ২৪ পরগনার জটার দেউল, বাঙ্গালারার (বাঁকুড়া) সিদ্ধেশ্বরী মন্দির, পাহাড়পুরের বৌদ্ধস্তূপ, ফরিদপুর জিলার মথুরাপুরের দেউল প্রভৃতি প্রায় একই প্রকার স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন। ৯৭৫ খৃঃ রাজা জয়চন্দ্র কর্তৃক জটার দেউল নির্মিত হয় বলিয়া প্রবাদ আছে। এই প্রবাদের সূত্র হইতে আরও বলা হইযাছে যে জটার দেউল বহুলাংশে নষ্ট হওয়ায় এ বিষয় সিদ্ধান্ত করা দুষ্কর। সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরকে কেহ কেহ জৈন মন্দির বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। অযোধ্যার মঠ ও জটার দেউল শিখর জাতীয় মন্দির গোষ্ঠির পর্যায়ভুক্ত। উভয়ই বৌদ্ধ মন্দির বা মঠ হইতে পারে।

বারভুঞার ইতিহাস বাঙ্গালী জাতির এক গৌরবময় কাহিনী। বাকেরগঞ্জ প্রসঙ্গে ভুঞাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছি। যশোহর রাজ্য প্রসঙ্গে মহারাজ প্রতাপাদিত্যের যৎসামান্য ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে তাঁহার কীর্তিরাজি সম্পর্কে বিভিন্ন স্থানে আলোচনা প্রসঙ্গে বর্ণনা করিয়াছি। এইক্ষণ প্রতাপ সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলিব।

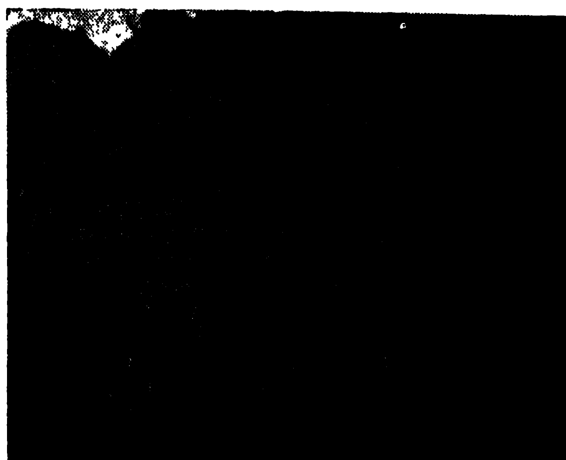
প্রতাপাদিত্য প্রতিষ্ঠিত যশোরেশ্বরী দেব মূর্তি ঈশ্বরীপুরের ঐতিহাসিক মন্দিরে অবস্থিত। মন্দিরটির পুরাতন আকৃতি নাই। ইহা পুনর্নির্মিত হইয়াছে। মন্দিরের সংলগ্ন একটি নাট মন্দির বা নাট্যশালা আছে। ইহার অদূরে ত্রিকোণ মন্দির অবস্থিত। রাজধানীর উত্তর দিকে সুউচ্চ মৃত্তিকার ঢিপিকে বুরুজপোতা বলা হয়। গোপালপুরে প্রকাণ্ড একটি দীঘি ও মন্দির আছে। মন্দিরটি লইয়া কিছু দিন পূর্বে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিরোধ ঘটে। সরকার হইতে সিদ্ধান্ত হয়



মহারাজ প্রতাপাদিত্য প্রতিষ্ঠিত যশোরেশ্বরী মন্দির, ঈশ্বরীপুর, খুলনা।



সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে নির্মিত, টেঙ্গা মস্‌জিদ, ঈশ্বরীপুর, খুলনা।





উপরে : চকশ্রী মস্‌জিদ, খুলনা।

নীচে : হাম্মামখানা, ঈশ্বরীপুর, খুলনা।

উহা মন্দির, মসজিদ নহে। ড্যামরেলী বা ড্যামরাইলের নবরত্ন মন্দির বিখ্যাত। গড় কোমলপুর, মহৎপুর, দশালীয়া প্রভৃতি স্থানে প্রতাপাদিত্যের গড় বিদ্যমান আছে। ধুমঘাট মৃণ্ময় দুর্গের কোন চিহ্ন নাই। এখন সেখানে ধান্য ফসল ফলে। বংশীপুরের পার্শ্বে যমুনা গর্ভে প্রতাপের পতন কালে যেখানে রাজপুরনারীরা ডুবিয়া মারা যান সে স্থান লোকে দেখাইয়া থাকে। উহাকে শরৎখানারদহ বলা হয়। কুশুলীয়ার মাঠে প্রতাপ পুত্র উদয়াদিত্য বীর বিক্রমে মোঘলদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। মৌতলার পার্শ্বে জাহাজঘাটা কুঠারবন নামক স্থানে নৌ-ঘাটির কেন্দ্র ছিল। ঐ স্থান জাহাজঘাটা নামে পরিচিত। প্রতাপের সময় বা তাঁহার পতনের অব্যবহিত পরে মোঘল শাসনামলে ৫ গুম্বজ বিশিষ্ট বিখ্যাত টেঙ্গা মসজিদ ও হাম্মামখানা নির্মিত হইয়াছিল। ঈশ্বরীপুরের টেঙ্গা মসজিদ সেকালের স্থাপত্য শিল্পের চমৎকার নিদর্শন। এখানে নিয়মিত নামাজ হয়। টেঙ্গা মসজিদের প্রাঙ্গণে কয়েকটি বৃহৎকায় পাকা কবর দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে একটি কবর ১৬হাত লম্বা। কালীগঞ্জ থানার মৌতলা গ্রামে একটি প্রাচীন কালীন ১ গুম্বজবিশিষ্ট মসজিদ আছে। ইহার সন্নিকটে নামাজ গড় বলিয়া একটি স্থান আছে। রামপাল থানার চকশ্রী গ্রামে এই সময় একটি মসজিদ নির্মিত হইয়াছিল। প্রতাপাদিত্যের নৌ-সেনাপতি ফ্রেডারিক ডুদলীর নামানুসারে যমুনা নদীর দক্ষিণ তীরে একটি গ্রামের নাম হইয়াছিল ডুদলী। এখানে জাহাজ নির্মাণের একটি কারখানা ছিল। এই সময় ঈশ্বরীপুরে বঙ্গদেশের প্রথম গীর্জা নির্মিত হইয়াছিল।

মহারাজ প্রতাপাদিত্য কর্তৃক বসন্তরায় ও তাঁহার বংশাবলীর নিধন তাঁহার চরিত্রের মহাকলঙ্ক। স্বীয় প্রভুত্ব বিস্তার ও সিংহাসন নিষ্কণ্টক করার জন্য ভাবী দাবীদারদিগকে তিনি রায়পুরের রাজবাড়ীতে একই সঙ্গে নিজ হস্তে হত্যাসাধন করেন। বৃদ্ধ পিতৃব্য বিচক্ষণ বসন্তরায়কে নির্মমভাবে হত্যা করায় দেশব্যাপী জনসাধারণ প্রতাপের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়া গিয়াছিল। প্রধান প্রধান অমাত্যের অনেকেই প্রতাপ-বিরোধী দলে যোগদান করিয়া তাঁহার সর্বনাশ করিয়াছিলেন। এই নির্মম হত্যাকাণ্ডের সময় একটি শিশুকে পশ্চাৎ দ্বার দিয়া সরাইয়া কচু বনে লুক্কায়িত রাখা হয়। তজ্জন্য তাঁহার নাম হইয়াছিল কচু রায়। তাঁহারই বংশধরেরা পরে রাজা হইয়াছিলেন। প্রতাপের বংশধরদের পিতৃব্য

হত্যার জন্য 'খুড়ো কাটা' এবং 'খাড়া' দিয়া হত্যা করার জন্য 'খাড়া কাটার' বংশধরও বলা হয়। প্রতাপের সমস্ত প্রতাপ, অহমিকা, বিক্রম, অত্যাচার সবই ধুলির সহিত বিলীন হইয়াছে।

বাগেরহাটের প্রাচীন ইতিহাস যথাস্থানে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার নামকরণ সম্পর্কে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন যে এখানে খানজাহানের বৃক্ষলতা শোভিত বাগিচা ছিল। বাগ ফার্সি শব্দ, উহার অর্থ বাগিচা এবং এই বাগের মধ্যে হাট বসিত বলিয়া এই স্থানের নাম হইয়াছে বাগেরহাট। খানজাহানের নিজস্ব কোন বাগিচার প্রমাণ পাওয়া যায় না। সেই জন্য এই মত গ্রহণযোগ্য নহে। খুলনা গেজেটিয়ার প্রণেতা ওমালী আরও দুইটি অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন বাকেরগঞ্জের প্রতিষ্ঠাতা, মুর্শিদাবাদের প্রতিনিধি আগা বাকেরের রাজ্য বাগেরহাট পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আগা বাকের প্রতিষ্ঠিত শহর বলিয়া উহার নাম হয় বাকেরহাট এবং তাহা হইতে বাগেরহাটে রূপান্তরিত হইয়াছে। আর একটি মত হাস্যাস্পদ। কথিত আছে যে, এই অঞ্চল সুন্দরবন অধ্যুষিত ছিল এবং ব্যাঘ্রের আনাগোনায় ভরপুর ছিল। ব্যাঘ্রাধিক্যের জন্য এই স্থানের নামকরণ হইয়াছিল বাঘেরহাট এবং উহা হইতে বাগেরহাটে দাঁড়াইয়াছে। ইহার কোনটিই ঠিক নহে।

অন্য মতাবলম্বীরা বলেন যে এই স্থানের পার্শ্ব দিয়া চির দিন নদী প্রবাহিত ছিল। নদীর এক টানা পথকে বাঁক বলা হয়। স্থল পথে যেমন মাইল বা ক্রোশ হিসাবে পথের হিসাব করা হয় তেমনই নৌকার মাঝিরা বাঁক হিসাবে নদীপথে যাতায়াত করে। দূরবর্তী স্থানের লোকেরা বাঁকের মাথায় বা শেষ প্রান্তে আসিয়া হাট করিত এবং সেই জন্য এই হাটকে বাঁকের হাট বলা হইত। সম্ভবতঃ বাঁক হইতে বাঁকেরহাট এবং তাহা হইতে বাগেরহাট নামের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া মনে করি।

তুর্ক-আফগন আমলের পূর্বে খুলনা জিলায় বর্ণ হিন্দুদের বসতি নগণ্য ছিল। সর্বপ্রথম বসতি সম্ভবতঃ স্থাপিত হইয়াছিল দক্ষিণ ডিহি বা পয়োগ্রামে। খানজাহানের সময় পীরালী হিন্দু ও পীরালী মুসলমানদের উৎপত্তি হয়। শুকদেব ও রতিদেবের বংশধরেরা মুসলমান ধর্ম গ্রহণ না করায় তাঁহাদের সময় হইতে হিন্দু পীরালীদের উৎপত্তি হয়। শুকদেবের পুত্র গৌরদাস ও কালাচাঁদ।

কালাচাঁদ দক্ষিণ ডিহিতে একটি মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন। এই প্রাচীন মন্দিরটি এখনও ভগ্নাবস্থায় পড়িয়া আছে। আগাছা জন্মিয়া যাওয়ায় আমরা উহার ফটো লইতে পারি নাই। গৌরদাসের প্রপৌত্র রামবল্লভ এবং পৌত্র মনোহর বীর যোদ্ধা ছিলেন। তিনি গৌড়ের শেষ স্বাধীন সুলতান দায়ুদ খাঁর নিকট হইতে "লস্কর খাঁ চৌধুরী" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মনোহরের বিশেষত্ব ছিল যে তিনি গড়ে একই সঙ্গে এক মণ ভোজ্য দ্রব্য উদরস্থ করিতে পারিতেন। সেইজন্য তাহার নাম হইয়াছিল মণকে মনোহর।

মহেশ্বরপাশা ও সেনহাটী প্রাচীন স্থান। তুর্ক আফগান আমলের কিছু পূর্বে এখানে ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য সমাজের বসতি স্থাপিত হইয়াছিল। ভৈরব ও কপোতাক্ষী তীরের অধিকাংশ বর্ণ হিন্দুর বসতি হইয়াছিল মোঘল যুগে। রাজা মানসিংহের পৃষ্ঠপোষকতায় বহু বর্ণ হিন্দু পরিবার জমি প্রাপ্ত হইয়া খুলনায় বসবাস আরম্ভ করিয়াছিল। মহেশ্বরপাশার মন্দিরটি প্রায় ৩০০ বৎসরের পুরাতন। সেনহাটীতেও প্রাচীনকালীন অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ আছে। জনৈক দৌলতখাঁর নামানুসারে দৌলতপুরের নামকরণ হইয়াছিল। এই শহর এখন ধন দৌলতের প্রধান কেন্দ্রস্থল।

মোরেলগঞ্জের প্রতিষ্ঠাতা মোরেল সাহেব অত্যাচারী জমিদার ছিলেন। কৃষকদের পক্ষে অত্যাচারী মোরেলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী কৃষক রেহিমুল্লা কয়েক দিন যুদ্ধ করিয়া শহিদ হন। কথিত আছে যে মোরেল রেহিমুল্লার সন্তান সন্ততিদের নদীগর্ভে ফেলিয়া হত্যা করেন। এ বিষয় লইয়া মোরেলের বিরুদ্ধে খুনী মোকদ্দমা রুজু হইলে তাঁহার বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা বাহির হয়। সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র তখন খুলনার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। তিনি ওয়ারেন্টসহ পলাতক মোরেলের অনুসরণ করিতে করিতে বোম্বে উপস্থিত হন। বঙ্কিম বাবু বোম্বে পৌঁছিবার কয়েক ঘণ্টা পূর্বে মোরেল জাহাজ যোগে ইংল্যাণ্ডে পলায়ন করেন। প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক আচার্য স্যার প্রফুল্লচন্দ্র খুলনা জিলার কৃতি সন্তান। খুলনা জিলা আরও বহু মনীষী, সুফীসাধক, কবি-সাহিত্যিক ও জননেতার সূতিকাগার।

১৯৪৭ সালের ঐতিহাসিক জুন ঘোষণায় তৎকালীন বড়লাট লর্ড লুই মাউন্টব্যাটেন খুলনাকে হিন্দুস্থানভুক্ত বলিয়া বিবৃতি দান করেন। ৩রা জুন হইতে ১৭ই আগষ্ট পর্যন্ত এই জিলা হিন্দুস্থানভুক্ত ছিল। বেলভেডিয়ার হাউজের বিচারাদালতে বিস্তৃত শুনানীর পর ঐ বৎসর ১৮ই আগষ্ট র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদ অনুযায়ী সম্পূর্ণ খুলনা জিলা পাকিস্তানভুক্ত হয়। আধুনিক খুলনা এখন অগ্রগতির পথে।

প্রমাণ-পঞ্জী (Bibliography)

1. Imperial Gazetteer of India— (Jessore, Khulna and Bakerganj portion)— W.W. Hunter
2. Ancient Geography of India— Cunninghum, 1924
3. The Indian people — Hurlton
4. Murrays Handbook—India, Burmah and Ceylon—10th Edn. 1918
5. Man Eaters of Sundarbans — Tahwar Ali — 1961
6. History of Bengal, Charles Stewart M.A.S. — 1903
7. History of Bengal, vol. I — R.C. Majumdar (Dacca University)
8. Do vol. II —Sir Jadunath Sarker Do
9. Geography and History of Bengal — H. Blockman
10. History of Bakerganj — H. Beverege B.C. S. — 1876
11. Revnue History of Sundarbans — F.E. Fergitter I.C. S. — 1934
12. Khulna Settlement — L.R. Faucus I.C.S. -- 1927
13. Report on Jessore — James Westland
14. Khulna Gazetteer — L. S.S.O' Mally I.C.S. — 1914
15. Jessore Gazetteer Do 1912
16. 24 Parganas Gazetteer do 1914
17. Dacca Gazetteer B.C. Allen I.C S. 1922
18. Nadia Gazetteer I.H. E. Garrett I.C. S. 1910
19. Bakerganj Gazetteer, J.A. Jack I.C.S. 1918
20. Report on Jessore, Faridpore & Bakerganj — Col. Gastril
21. Antiquities of Sundarbans — 1929, (Varendra Research Society)
22. Do 1930 Do
23. Do 1931 Do
24. A Short History & Ethnography of Cultivating pods (Bengali)— — Mahendranath Karan, 1919
25. Social History of the Muslims in Bengal — Dr. M. A. Kareem (Asiatic Society of Pak.)— 1959
26. Hussain Shahi Bengal — Dr. M. R. Tarafder — 1965
27. Social & Cultural History of Bengal — Dr. M.A. Rahim 1963
28. Reaz-us-Salatin, Ghulam Hussain Salim (Tr. A. Salam)
29. Tabakat—i —Nasiri— Minhaj—i— Seraj (Tr. H.G. Raverty)
30. Muntakhab-ut-Tawrikh— Badauni, Abdul Quader
31. Aini Akbari — Abul Fazal — (Tr. Gladwine)
32. Travels of Ibn Batuta (Rehala) - H.A.R. Gibb.
33. Tarikh—i— Ferozshahi— Zia Barani (Edt. S. A. Khan Saheb)
34. Palas of Bengal— R. D. Bannerjee

35. Hinduism & Buddism— vol. II — Elliot
36. On Yuan Chwang — Watters
37. Baharistan — i — Ghaibi — Mirza Nathan(Tr. M. I. Borah)
38. Tarikh — i — Firishta—Firishta— (Tr. Joan Biggs)
39. Studies in Indian History—Elliot
40. Advanced History of India — Majumdar, Roy choudhury & Dutt
41. Muslim Rule in India—Dr. A.B.M. Habibullah
42. History of Muslim Rule in India—Iswari Prosad
43. Cambridge History of India—Edt. by Sir Woolsay Haigg—1928
44. Inscriptions of Bengal —vol. IV—Shamsuddin Ahmed— 1st. Edn.
45. Dacca— A Record of Changed Fortune — A.H. Dani— 1st. Edn.
46. Five Thousand Years of Pakistan— Sir Mortimur Whiller
47. Muslim Architecture in Bengal — A. H. Dani
48. Gour — Its ruins & Inscriptions — I. H. Ravenshaw
49. Coins & Chronology of the Early Independent Sultans of Bengal — Nalini Kanta Bhattasali
50. Census Report — Edt. by Mr. Porter 1931
51. Census of Pakistan (Jessore) 1961
52. Do (Bakerganj) 1961
53. Do (Khulna) 1961
54. Life and Conditions of the people of Hindustan (A.D. 1200-1550)— Kunwar Muhammad Ashraf
55. Indian Mussalmans— W.W. Hunter
56. Sufism — Margarett Smith
57. Preaching of Islam— T. W. Arnold
58. Influence of Islam on Indian Culture — Tarachand

১। যশোর খুলনার ইতিহাস ১ম খণ্ড— সতীশ চন্দ্র মিত্র — ১৩২১
২। ঐ দ্বিতীয় খণ্ড ঐ — ১৩২৯
৩। বাংলার ইতিহাস — (আদি পর্ব) — নীহার রঞ্জন রায়
৪। বাংলার ইতিহাস — রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়
৫। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস — নগেন্দ্র নাথ বসু
৬। বঙ্গের ইতিহাস -- পীরালীকাণ্ড — ব্যোমকেশ বন্দোপাধ্যায়
৭। ইসলামের ঐতিহাসিক অবদান (এম, এন, রায়)— অনুবাদক, — অধ্যক্ষ আবদুল হাই
৮। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত — অচ্যুৎ চরণ চৌধুরী

৯। বাংলার পুরাবৃত্ত — পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১০। বিশ্বকোষ — নগেন্দ্রনাথ বসু

১১। স্বাধীন সুলতানদের আমলে বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর — সুখময় মুখোপাধ্যায়

১২। হযরত শাহ জালাল ও সিলেটের ইতিহাস — মুর্তজা আলী

১৩। মুসলীম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস — মওলানা আকরম খাঁ

১৪। বাংলা সাহিত্যের কথা —২য় খণ্ড — ডক্টর মুহম্মদ শহিদুল্লাহ

১৫। বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা —১ম ভাগ — গোপাল হালদার

১৬। ঐ দ্বিতীয় ভাগ ঐ

১৭। মুসলীম মানস ও বাংলা সাহিত্য — ডক্টর আনিসুজ্জামান

১৮। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস — দীনেশ চন্দ্র সেন

১৯। বঙ্গে সুফী প্রভাব — ডক্টর এনামুল হক

২০। পূর্ব-পাকিস্তানে ইসলামের আলো — চৌধুরী সামসুর রহমান

২১। পূর্ব-পাকিস্তানের সুফী সাধক — গোলাম সাকলায়েন

২২। কাব্যে আমপারা — কাজী নজরুল ইসলাম

২৩। পীর খানজাহান আলী — শেখ আবদুল আজিজ

২৪। পীর খানজাহান আলী — পশুপতি ভট্টাচার্য

২৫। তাজকিরাতুল আউলিয়া — মোহাম্মদ সামসুল হক

২৬। বায়জিদ বোস্তামির সংক্ষিপ্ত জীবনী — মৌঃ নুরুল কবীর নদভী

২৭। সুফী কাহিনী — এ, এফ, এম, আবদুল জলীল, ৬ষ্ঠ সংস্করণ

২৮। মুসলীম সংস্কৃতি — ঐ

২৯। হযরত খানজাহান আলী — ঐ

৩০। ভোলগা থেকে গঙ্গা — রাহুল সংস্কৃত্যায়ন — ১ম সংস্করণ

৩১। বিশ্ব ইতিহাস প্রসঙ্গ — জহরলাল নেহেরু

৩২। ভারতের দেব দেউল — জ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষ - ১৯৪১ প্রকাশক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

৩৩। সুন্দরবনে ভ্রমণ কাহিনী — হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন

৩৪। সুন্দরবনে আরজান সরদার — শিবশঙ্কর মিত্র
৩৫। বাংলায় ভ্রমণ — প্রথম খণ্ড — রেলওয়ে প্রচার বিভাগ
৩৬। ঐ দ্বিতীয় খণ্ড ঐ
৩৭। বার ভুইঞা — মোক্ষদাচরণ সামধ্যায়ী
৩৮। প্রতাপাদিত্য — নিখিল নাথ রায়
৩৯। গাজী কালু চম্পাবতী কন্যার পুঁথি — ১৯৫০
৪০। বোনবিবি জোহরা — পুঁথি
৪১। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য — দীনেশ চন্দ্র সেন
৪২। চৈতন্য মঙ্গল — বৃন্দাবন দাস
৪৩। চৈতন্য ভাগবৎ — ঐ
৪৪। চৈতন্য মঙ্গল — জয়ানন্দ
৪৫। চৈতন্য চরিতামৃত — শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস কবিরাজ
৪৬। মনসা মঙ্গল — বিজয় গুপ্ত
৪৭। আত্মচরিত — আচার্য স্যার প্রফুল্ল চন্দ্র রায়

যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান ও পত্র পত্রিকার সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে;

1. B. L. College Library, Daulatpore, Khulna.
2. Dist. Bar Association Library, Khulna.
3. Collectorate Library, Khulna.
4. Library of the Archeological Dept. Lalbag Fort, Dacca.
5. Dacca Museum & Library, Dacca.
6. Varendra Research Society & Library, Rajshahi
7. Library of the Royal Asiatic Society of Bengal, Calcutta.
8. Bengali Academy Library, Dacca.
9. Girls' College Library, Khulna.
10. Library of Jessore Institute, Jessore.
11. Personal Library of Late Principal A. D. Sinha, Icegati, Khulna.
12. Public Library of Khulna.
13. Library of Haji Mohsin High School, Daulatpur, Khulna.
14. Collectorate Library, Bakerganj.
15. Judges' Court Library, Khulna.
16. Personal Library of the Author at Noor Manzil, Khulna.

পত্র-পত্রিকা।

১। Pakistan Observer
২। Pakistan Times
৩। The Statesman
৪। Morning News
৫। The Wave
৬। দৈনিক পাকিস্তান
৭। দৈনিক আজাদ
৮। পূর্বদেশ
৯। দৈনিক ইত্তেফাক
১০। দেশের ডাক

1. Journal of the Asiatic Society of Bengal
2. Modern Review
3. বাংলা একাডেমী পত্রিকা
4. মাসিক মোহাম্মদী
5. মাসিক সওগাত, প্রভৃতি



নির্ঘণ্ট

ENGLISH